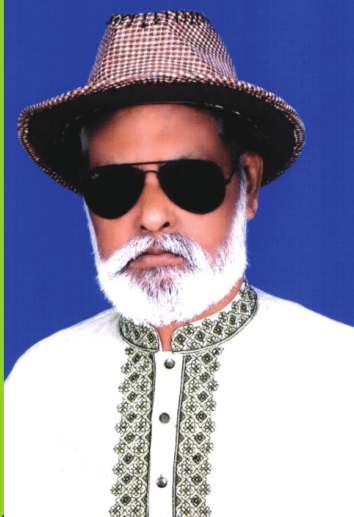


হৃদয়চারী

দ্বিতীয় খণ্ড



শ্রীমান অমৃতেন্দ্র কৌশিক

(কাব্যগ্রন্থ, ছড়াগ্রন্থ, সামাজিক নাটক, কাব্য নাটক, কিশোর
হাস্যরসাত্মক নাটক, পথ নাটক, জীবন্যাস, উপন্যাস,
গীতি কবিতাবলী, গভীরা, গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধগ্রন্থ সমগ্র)
এ সংকলন সাহিত্যের বারটি শাখাসমৃদ্ধ

হৃদয়চারী

২য় খন্ড



প্রমথ চন্দ্র বসু

হৃদয়চারী

২য় খন্ড



শ্রীমান অমৃতেন্দ্র কলিতা

(কাব্যগ্রন্থ, ছড়াগ্রন্থ, সামাজিক নাটক, কাব্য নাটক, কিশোর
হাস্যরসাত্মক নাটক, পথ নাটক, জীবন্যাস, উপন্যাস, গীতি
কবিতাবলী, গম্ভীরা, গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধগ্রন্থ সমগ্র)

এ সংকলন সাহিত্যের বারটি শাখাসমৃদ্ধ

প্রকাশনায় : অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ ট্রাস্ট,
রোড নং ৬, বাড়ি নং-৭ (নিচতলা) ডি-ব্লক মিরপুর ১ ঢাকা।

প্রকাশকাল - আগষ্ট, ২০২৪ খ্রী.

স্বত্ব : অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ ট্রাস্ট।

প্রধান পৃষ্ঠপোশক : জনাব অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পৃষ্ঠপোশক : মোঃ কামরুজ্জামান আসাদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক।

পরিবেশক :

বই বাড়ি

১৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাণী বুক ডিপো

৩৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

শুভাকাঙ্ক্ষীঃ আনোয়ারা ইয়াসমিন (স্ত্রী)
বীথি ও প্রীতি (দুই কন্যা), বড় মেয়ে জামাই পারভেজ।

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস : জি মিশন
৩৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে : জননী প্রিন্টার্স
১৬/১৭ প্রতাপ দাস লেন, শিংটোলা, সুত্রাপুর, ঢাকা।

বাঁধাই : হরফ এন্টারপ্রাইজ
৬নং শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

লেখক আইডি : 978-984-98742-0-1

মূল্য : সাদা-১৫২০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

সেই অনুসন্ধিৎসু শৈশব কালে,
একান্ত সাহচর্যে য়ার,
সাহিত্যাকাশে উড়বার
পেয়েছি স্বপন, আজ তাঁর
কথা মনে পড়ে, তিনি
মন খোলা-গুরু, যিনি
পরমপিতা, গতাসু ইনি
তবু হাল ধরা মোর ভালে ।

এ সংকলনের বৈশিষ্ট্য-পাঠকে উদ্দেশ্যে নিবেদিত

‘হৃদয়চারী ২য় খন্ড’ (১২ টি কাব্য গ্রন্থ, ১টি ছড়ার বই, তিনটি উপন্যাস, তিনটি জীবন্যাস, ৮৮টি গীতিকবিতা, ১টি গম্ভীরা, ২টি গল্পের বই, ১টি কিশোর কাব্যনাটক, ১টি কাব্য নাটক, ১টি পথ নাটক, ১টি কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত সামাজিক নাটক, ২টি গীতি আলোচ্য ও ১টি প্রবন্ধ গ্রন্থ সমৃদ্ধ সংকলন গ্রন্থ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রচিত পুস্তকরাজির রচয়িতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, হৃদয়চারী কবি জনাব হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞা।

লেখক পরিচিতি

হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞা ১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত বাহরাম খান পাড়া গ্রাম পৈত্রিক আবাস হলেও কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানা মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। নানাজান নবী হোসেন নানীজান জেবুন্নেসা। তাঁর পিতা মরহুম আশরাফ উদ্দিন ভূঞা (ভূতপূর্ব নায়েব) একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম মোছাঃ শামছুন নাহার বেগম। তিনি পিতামাতার ৯ সন্তানের ২য় সন্তান। বাল্যকালে তিনি তাঁর নিজ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তিনি বাহরাম খানপাড়া জে.কে.উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীন উক্ত স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৮১ সালে গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ থেকে আইএসসি এবং উক্ত কলেজ থেকে ১৯৮৪ সালে বিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তৎকালীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ভূগোল বিষয়ে ১৯৮৬ সালে এম.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এছাড়া তিনি ফেডারেল হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা থেকে ডি.এইচ.এম.এস ডিগ্রী লাভ করেন এবং কিছুকাল তিনি আব্দুল কদ্দুস হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জে অনারারী অধ্যাপনা করেন। তিনি উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার হিসাবে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মরত ছিলেন এবং জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জের উপ-পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেছেন। তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম আনোয়ারা ইয়াসমিন। দুই কন্যা সন্তান আছে। বীথি বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে প্রীতি।

গ্রন্থপুঞ্জ :

কাব্যগ্রন্থ : বিলাপ প্রকাশিত ১৯৯৮, দিব্যদৃষ্টির খোরাকি লিরিক সিরিজ-১ (২০০৯), ক্ষুধার মিছিল (২০১০), হৃদয়চারী ১ম খন্ডে সংগ্রহিত কাব্য- মুক্তির যুগ-পুরুষ, কারাগারে কল্পনা, আহা তুমি ফুটেই দেখ না, বিনষ্ট আকাশ, বেনামী সত্তার মুখে, স্বদেশে রামেরা এখন, সবুজ প্রেমে আগুন, সঙ্গিন, (প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ)। কাব্যলক্ষীর ঘর সংসার কাব্যগ্রন্থ(প্রকাশ ২০২৪), দৈববাণী ছুঁয়ে যায় কবিতার অলিগলি, দিব্যদৃষ্টির খোরাকি লিরিক সিরিজ -২ প্রকাশ ২০২২ লোকজ মঞ্চ, মিরপুর ঢাকা। পরিবেশক শব্দশিল্প বাংলা বাজার ঢাকা। গম্ভীরা-‘দুই প্রজন্ম’-২০১০

নাটক : হৃদয়চারী ১ম খন্ডে সংগ্রহিত নাটক- শুকতারার (কাব্য নাটক ২০১০), কিশোর কাব্য নাটক বিদূষী সফুরা-প্রকাশ ২০২৪, বউ-শ্বাশুড়ী কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষায় সমাজ সংস্কার মূলক নাটক প্রকাশ-২০১০, মনিরের সংগ্রাম ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় পথনাটক-১৯৮৭, শুভ নববর্ষ একাংকিকা, মে দিবস গীতি আলোখ্য (প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ)। মহাকাব্য-“লাইলাহা ইল্লাল্লাহ” অপ্রকাশিত

উপন্যাস : মেঘের আড়ালে সূর্য (২০০৮), মণি কাঞ্চন যোগ (২০০৮), ঘোটকের জবান-প্রকাশ ২০২৪।

জীবন্যাস : সফ্রেটিস, হযরত জুন্নুন মিশরী (রহঃ), হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রহঃ) প্রকাশ-২০২৪

গল্পগ্রন্থ : দু'পায়া জানোয়ার (হৃদয়চারী ১ম খন্ডে সংগ্রহিত-প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ)। বন্দি কাকাতুয়ার জীবন প্রকাশ-২০২৪।

প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ : কারামত ঃবিজ্ঞানকে হারমানানো রুহানী শক্তি (অপ্রকাশিত), সুফী তত্ত্ব ও ইসলাম (অপ্রকাশিত),

রোগী দেখার সূত্র (অপ্রকাশিত)। অচেনা পথের পথিক প্রকাশ-২০২৪

ছড়ার বই : সিঁড়ি প্রকাশ ২০২৩, শিশুর কাটা কাল-প্রকাশ ২০২৪

'হৃদয়চারী'প্রথম খন্ড পুনঃপ্রকাশ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকাণ্ডে কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, জীবন্যাস, গল্পগ্রন্থ, ছড়ার বই ও প্রবন্ধগ্রন্থ সংযোজন কণ্ডে প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হৃদয়চারী' ২য় খন্ড প্রকাশিত (২০২৪)হয়েছে লোকজ মঞ্চের প্রকাশনায়।

২০০৯ সালে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কিশোরগঞ্জ কর্তৃক বিলাপ অডিও সিডিৰ জন্য লেখক, গীতিকার সম্মাননা পদক-এ ভূষিত হন। ক্ষুধার মিছিল ও দিব্য দৃষ্টির খোরাকি লিরিক সিরিজ ১ এর আবৃত্তি অডিও সিডি প্রকাশিত। এছাড়া কুসুম সিরিজ এক এর হুমায়ুন সংগীত আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন কর্তৃক গীত অডিও সিডি প্রকাশিত। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক মহোদয় যিনি সাবেক বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এক সাহিত্য আলোচনা সভায় লেখককে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক' ও অধ্যক্ষ মোঃ কফিলউদ্দিন কর্তৃক 'হৃদয়চারী কবি' বিশেষণ প্রদান করা হয় ২০১০ সালে। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন লোকজ মেলা ঘোষণা করেন এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক লোকজ মঞ্চ উদ্বোধন করেন কবি'র জন্ম জয়ন্তীতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ২০১১ সালে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক স্মারকে জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জকে সভাপতি করে জেলা কমিটি করে দেয়া হয় কবি'র পৈত্রিক ভিটায় লোকজ মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে। ফলে বছর বছর কবি'র জন্মস্থানে জন্ম জয়ন্তীতে 'হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন পৌষ লোকজ মেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কবি'র সুলিখিত ১২৪৭টি বিশেষ গীতি কবিতা সংকলন 'হুমায়ুন গীতি' 'বিলাপ' হৃদয়চারী ২য় খন্ড প্রকাশিত হয় ২০২২ সালে লোকজ মঞ্চের প্রকাশনায় 'শব্দশিল্প' ৩৮, বাংলাবাজার ২য় তলা, ঢাকা এর পরিবেশনায়। 'হৃদয়চারী ২য় খন্ডে লেখকের সুলিখিত সাহিত্যসমগ্র কাব্যগ্রন্থসমূহ উপন্যাসনিচয়, জীবন্যাসবলী, ১ম খন্ডে প্রকাশিত গীতিকবিতাবলী, গল্পগ্রন্থদ্বয় নাটকগুচ্ছ ছড়ার বই ও প্রবন্ধ গ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে।

অবতরণিকা

হিমালয়ে জন্ম লয়ে যখন বন্ধুর ভূমি পাড়ি দিয়ে সমতলে আঁকাবাঁকা হয়ে বেগবান থেকে অবশেষে বারিধিতে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য ক'টি নদনদীর কপালে আছে! অনেক নদী বা ঝরনা পর্বতেই কিংবা সমতলে এসে নানাবিধ বাধা ধকল সহ্য করতে না পেরে মজে যায়। অর্থ-যশ-প্রচার-জনপ্রিয়তার ডামাডোলের আকর্ষণে নিস্পৃহ-নির্লোভ থেকে অবিরাম মনের স্বকীয় মৌলিক তাত্ত্বিক ভাবধারা প্রাঞ্জল সুখপাঠ্য ভাষা-শব্দে সাহিত্য কলায় নির্গত করা, বিশেষ করে কবিতার মতো অংকের হিসেবী ছন্দ নির্গমন ধারায় আপ্ত হয়ে, স্নাত হয়ে মনুজে মনন ছুঁয়ে, প্রকৃতির মধ্যে উপমাসূত্র গোঁথে, রসোত্তীর্ণ কালজয়ী কাব্য বিনির্মাণে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকাকে কি বলা যেতে পারে ঈশ্বরের কৃপাবর বিনে? এই কবিতা চর্চার পথ পরিক্রমায় আমি নিজের অণ্ডেই নানারূপ পরিগ্রহ করে পরিশেষে রহস্য মহাসাগরের জলের অতল তলে স্পর্শ করেছি বলে বিশ্বাস করি।

কৈশোর শেষে যৌবনের উষালগ্নে যখন নারীর রূপ সৌন্দর্যের আকর্ষণে এবং নারীর বাঁকা চাহনীর চৌম্বকীয় আবেশে প্রাণ হরণ হয়েছিল তখন অসহায় যবেহকৃত প্রাণীর মত বপুখানি পড়েছিল। হরিত অন্তর নারীর অন্তর্জগতে ঠাঁই পাচ্ছিল না, ছলনার বাতাবরণে কাঁতারিচ্ছিল আর আমার দেহ তো ছাড়! আমার বপু মূল্যহীন আর তার তনু স্বর্গ তুল্যা হয়ে আসে কাব্যকলায়।

নরনারীর প্রাণের অভিসার, সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, দ্রোহ-ঘৃণা, বিরহ-মিলন জীবনের রঙিন প্রলেপে আচ্ছাদিত থেকে যখন কাঁপছিল আর জীবনযুদ্ধের পরাবাস্তবের কুৎসিত চেহারা দেখছিল তখন ক্ষণে, ক্ষণে মর্মাহত হচ্ছিল আর মুর্ছা যাচ্ছিল।

এ-তো গেলো যৌবন তাড়িত প্রাণ চঞ্চল মনের বাসর ঘরের কল্পিত কথা, উহার দৃশ্যপট শেষ হতে না হতে আসলো জীবনচাচরের দোষ গুণের নানাবিধ মহীরুহের অযত্নসজ্জিত বাগের নিঃসঙ্গ পথিক কবিতায়। আমি মন ভরে জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দেখলাম গুণের পাখপাখালী গান ধরছে কখনও বা শিস দিচ্ছে মধুর স্বরে। পদ্যে ছন্দোবদ্ধ লেখনীর তরয়গায়িত রূপ দেখে আমি শিহরিত, হতবাক।

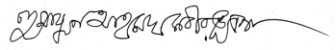
মনোজগতের গভীরতম প্রদেশে এসে তার রহস্যের জট খোলার নিমিত্ত চাওয়া মাত্রই এক অজানা টানে চালিত হই দৈববাণীর মনোরম মুগ্ধতায়। দৈববাণী ছুঁয়ে যায় আমার কবিতার অলিগলি। এই সত্য সুন্দরের অলিগলি দিয়ে প্রশান্তিময় পরিভ্রমণ আর শেষ হয় না। কবিত্বের মহাযাত্রার এ পথে চলতে চলতে আজ আমি পাগলপারা।

দিব্যত্বের এ পয়োধির অতল গর্ভে হাবিয়ে যাওয়া কেউ একজন অভ্যাত অখ্যাত নির্জনতাপ্রিয় হৃদয়চারী কবি আমি।

বিষয় শ্রোতে ছুটা জনারণ্যে আমার ভাল লাগে না। নিরস যন্ত্রদানবের কর্মচাঞ্চল্যে জনমানব যেখানে অস্থির, সেখানে আমার আলো ঐ মানবতা তুচ্ছ তচ্ছিল্যেও ধর্ষিত-পিষ্ট। আমি মুক্তি চাই অর্থের ব্যভিচার হতে। উহার ভয়ানক কালোরূপ আর খেতে চাই না, চাই স্বস্থি, চাই শান্তি মননে মগজে। আমি বিশ্বস্থ হতে চাই জীবনের মূল্যবোধে। আমি অর্থের খাদে আর ফাঁদে পড়ে কপোকাত হতে চাই না বলেই বিধি বিছিয়ে দিয়েছেন স্বর্গ পথ। সে পথে হেঁটেই উপন্যাসের আকর্ষণীয় চরিত্র ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনায় সিদ্ধহস্ত কিনা পাঠক বিবেচনা করবেন।

উনিশ থেকে ষাট বছর অবধি বয়সকালে জ্ঞাত-অজ্ঞাতসাথে কারু দ্বারা গাইডেড, মিসগাইডেড হই নি কিংবা অনুপ্রাণিত হই নি, লেখনিতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্যসেবা করে চলেছি। আমার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সম্ব্যজনপ্রিয়তার আবশ্যিকতা নেই। তবে সাহিত্যমান সাহিত্যরসিক বিদগ্ধজন কর্তৃক মূল্যায়নের গুরুত্ব কাংখিত।

জীবন্যাস নামক মহামানবগণের বৈচিত্রময় জীবনের উপস্থাপন বোধ করি এই প্রথম আমি পেশ করলাম। নাটকে গল্পে প্রবন্ধে ততটা সমৃদ্ধি না পেলেও কষ্ট কল্পনায় পতিত হই নি। ছড়া গীতি কবিতায় নুতনত্ব না থাকলেও স্বকীয়তায় স্বপদে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারু রঙ কিশোর নাট্য কাব্যে ও শিশুতোষ নাটকে এবং অন্যান্য নাটকে একেবারেই গায়ে মাখি নি এ কথা দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। তবুও অপূর্ণতা রয়েছে, বিশাল সাহিত্য জলধির সৈকতে রয়েছে, নুড়ি-পাথর-বালি নড়াচড়ায় যেন তন্ময় হয়ে রওয়া এক শিশু।



২/৮/২০২৪, মিরপুর ঢাকা।

সূচীপত্র

কাব্যগ্রন্থ নং ১ মুক্তির যুগ পুরুষ (১৯৮৬-১৯৯১)।

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১।	মুক্তির যুগ পুরুষ	৩৩
০২।	ঝড়	৩৪
০৩।	তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি	৩৫
০৪।	কোন এক মুক্তি যোদ্ধার অভিপ্রায়	৩৭
০৫।	উত্থান	৩৯
০৬।	দুর্জয় অভিলাষ	৪০
০৭।	আমি এক গেরিলা যোদ্ধা	৪১
০৮।	ভিক্ষার ঝুলি	৪৩
০৯।	সিংহের মত	৪৪
১০।	বিধ্বস্ত সত্তা	৪৫
১১।	অধিকার চাই	৪৭
১২।	হব আমি নিশ্চয়	৪৯
১৩।	দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা	৫০
১৪।	পাপবোধ	৫১
১৫।	কোথায় ভগবান	৫২
১৬।	বুকে ভগবান	৫৩
১৭।	কমান্ড	৫৬
১৮।	দীপের আলোয়	৫৭
১৯।	ঘরে ফিরিব না যতদিন	৫৮

কাব্যগ্রন্থ-২ কারাগারে কল্পনা (১৯৮৬-১৯৯২)

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১।	প্রিয়া ও পৃথিবী	৫৯
০২।	সেই যুগ সেই ভাষা	৬১
০৩।	পাত্র অপাত্র	৬৩
০৪।	শ্রাবন-বন -মন-মুক্তি	৬৪

০৫ । সুধার সাকী	৬৫
০৬ । বিলীন আত্মা	৬৬
০৭ । পরিবেশ	৬৭
০৮ । হে ধলেশ্বরী	৬৮
০৯ । সেতুবন্ধ	৬৯
১০ । প্রকৃতির জবাব	৭০
১১ । আমাকে খুঁজিও	৭১
১২ । শপথ আত্মার	৭২
১৩ । যায় দিন ভালই	৭৩
১৪ । জীবনে আমি	৭৪
১৫ । সার্থক জনম	৭৫
১৬ । উপমা	৭৫
১৭ । হে কবি	৭৬
১৮ । আফসোস	৭৬
১৯ । বিনিময়	৭৯
২০ । নিষ্ঠুর ঈদ	৮০
২১ । উৎসর্গ	৮১
২২ । অন্তর্দৃষ্টি	৮২
২৩ । রাজা ও বিষয়ী	৮৪
২৪ । ভগবান প্রেমের প্রথম সোপান	৮৫
২৫ । মহাপাঠশালা	৮৬
২৬ । গম্ভীর হব বাস্তবে	৮৬
২৭ । হায়রে অর্থ	৮৭
২৮ । অজেয়	৮৮
২৯ । কৃষ্ণ লীলা	৮৯
৩০ । জ্ঞানের জন্য দূর যাত্রা	৯১
৩১ । শুধু বাঁচা কেন	৯২
৩২ । বৃষ্টির ছোঁয়া	৯২
৩৩ । আপত্তি নেই	৯৩
৩৪ । মজুর স্বরাজ	৯৪

৩৫। এই বুক নদী	৯৫
৩৬। বলছি মিনতি কওে	৯৬
৩৭। আত্মার বিদ্রোহ	৯৭
৩৮। মৃত্যু শয্যায় প্রলাপ	৯৮
৩৯। হে অপাংক্তেয়	১০১
৪০। কারাগারে কল্পনা	১০২

কাব্যগ্রন্থ-৩ আহা তুমি ফুটেই দেখ না (১৯৮৭-১৯৮৮)।

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১। পথিক	১০৪
০২। স্মৃতিস্তম্ভ	১০৫
০৩। প্রান্তর	১০৬
০৪। উষা	১০৮
০৫। ভুবন বাগান	১০৯
০৬। নীরব প্রেম	১১০
০৭। আবার ফিরে যাব	১১২
০৮। চতুর পাখি	১১৩
০৯। মা-মাটি-মানুষ একাত্ম	১১৩
১০। ভীতু প্রেমিক	১১৪
১১। কণ্ঠহার	১১৫
১২। কৃষ্ণচূড়ঙ্গনে স্থপতি	১১৬
১৩। বাবার মেলা	১১৬
১৪। এই বুক থাকিয়াই	১১৮
১৫। কাঁপিয়া উঠে	১১৮
১৬। সাঁঝের বেলা	১১৯
১৭। ভিক্ষুক	১১৯
১৮। পৌষের গাঁও	১২০
১৯। মহান সে জন	১২১
২০। মিশে যেতে চাই	১২১
২১। মায়াময়	১২২

২২ । পল্লী বাড়ী	১২৪
২৩ । কই সুখ	১২৫
২৪ । শোক পঙ্ক্তিমালা : স্মৃতিচারণ	১২৬
২৫ । চারালের সুখ	১২৮
২৬ । বড় ভাল লাগে	১২৯
২৭ । বাউল আসরে	১৩০
২৮ । সবুজে সবুজে আনমনে	১৩২
২৯ । অব্বেষণ	১৩৩
৩০ । রইবে স্মৃতিপটে	১৩৪
৩১ । রবি শস্যের ক্ষেতে একদিন	১৩৪
৩২ । চাঁদের কলংক	১৩৬
৩৩ । কাঁপছে বউ	১৩৭
৩৪ । জীবন বোধ	১৩৭
৩৫ । মানসীর দর্শন	১৩৮
৩৬ । এসো হেথায় বাবু	১৩৮
৩৭ । অভিবাদন	১৩৯
৩৮ । প্রেমিকের মৃত্যু	১৪০
৩৯ । প্রেম উদয়ীৰ্ব প্রাণ	১৪২
৪০ । চতুর্দিকে ঝড়	১৪৪
৪১ । যতি	১৪৮
৪২ । মধুর বচন	১৪৫
৪৩ । প্রতিশোধ	১৪৬
৪৪ । ফুলের মালার মূল্য	১৪৬
৪৫ । স্বর্গীয় ছায়া	১৪৭
৪৬ । ডাস্টবিন বাসীর খাদ্য	১৪৮
৪৭ । আত্মহারা	১৪৯

গীতিকবিতাবলী নং১ কুসুম সিরিজ-১ (১৯৮৬-২০০০)

ক্রঃ নং **ভূমায়ুন গীতি :**

০১	সম্মুখে আগুন রে আমার পেছনে সাগর,	১৫৩
০২	আদার বেপারী জাহাজের খবর লইয়া,	১৫৩
০৩	নৌকারে ও নৌকারে,	১৫৪
০৪	অন্ধ দু' চোখে কিছু তো দেখি না ধরায়,	১৫৪
০৫	চাঁদের মত হাসি, পাখির মত গাহি,	১৫৫
০৬	এ ঘর তোর ঘর নয়,	১৫৫
০৭	ও বন্ধুরে	১৫৬
০৮	গুরুবিহীন শিষ্য আমি হয়ে রে,	১৫৬
০৯	আমায় ছাইড়্যা দিয়া কর্মকূলে	১৫৭
১০	সন্ধ্যা মালতির ফুটে ওঠা, রাতের জন্য,	১৫৮
১১	আলসেমীর লাগাম ধইরা	১৫৮
১২	স্বজনী গো	১৫৯
১৩	পদ্ম পুকুরে পদ্ম	১৫৯
১৪	বন্ধু আমার তোমার	১৬০
১৫	তোমার লাগিয়া সমীরণ	১৬০
১৬	ও বন্ধুরে-----ওমে	১৬১
১৭	ও বন্ধু না বসিয়া.	১৬১
১৮	কি রূপে মজিলে রে ভ্রমর, হইয়া কানাই	১৬২
১৯	লোকে বলে রাধা, আহায়ে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর,	১৬২
২০	এ কোন মধুর বেদনায় বাঁধিলে রে	১৬৩
২১	ও বন্ধু, বাইরে তুমি সংসারী,	১৬৩
২২	এমন তেল হইলাম না রে মানুষ	১৬৪
২৩	ওরে অবুঝ প্রিয়তম ধূলায় লুটিয়ে দেহ শতদল,	১৬৫
২৪	আমার তরী ভাসে অকুল পাথাও	১৬৫
২৫	ওরে ভোলা মন, না বুঝিয়া সংসারের খেলা,	১৬৬
২৬	আমি কান্দি বসে নিরালয় বন্ধুর বিরহে,	১৬৬
২৭	তোমার প্রেমে মজনু আমি,	১৬৭
২৮	কেউ কি শুনবে আমার ভাবনা গুলো	১৬৭

২৯	আমিরীকে দোষী করে স্বপ্নে পাইলে সুখ,	১৬৮
৩০	ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি ধন্য, ধন্য সুফী হে,	১৬৮
৩১	পাখিদের ভাষায় সবুজ অরণ্যের নিরবতায়,	১৬৮
৩২	ওরে, ও পদ্ম তুমি বাগানে না ফুটিও,	১৬৯
৩৩	আকাশ হতে যদি, দেখিতাম দু'চোখ ভরে,	১৬৯
৩৪	কেন এসেছিলে গো তুমি, বুঝি না	১৭০
৩৫	আমার অশ্রু দিয়ে গোসল দিবো,	১৭০
৩৬	ওরে অবুঝ, তোর প্রিয়তমা ধূলায় লুটায় দেহ শতদল,	১৭১
৩৭	পল্লব নেড়ে নেড়ে কে যায় দেখিতে কি পাও,	১৭১
৩৮	আমি আষাঢ়ে জলে সয়লাব হয়ে তোমাকেই খুঁজি,	১৭২
৩৯	গেলো কত কত কাল ফিরে ফিরে,	১৭২
৪০	একীনি জোশের জ্বালানী পুড়ে	১৭৩
৪১	হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও,	১৭৩
৪২	কান্দে রে কে কান্দে রে হেকমত চাহিয়া,	১৭৪
৪৩	নদীরে সায়র পানে	১৭৫
৪৪	হে অলিরে.....কেমন প্রেম	১৭৫
৪৫	কায়দা শেখায় পীর মুর্শিদে	১৭৬
৪৬	অরুণ আছে বুকে, বুঝিবে সুফি ধরে,	১৭৬
৪৭	প্রজাপ্রতি ঘাস ফুলে পাখা মেলে বসে আর উড়ে,	১৭৭
৪৮	বেহায়া আঁখি মোর কেন চাহিয়া থাকিস্ ঐ দূরে,	১৭৭
৪৯	আজি বাড় বহিছে ভুবনে আমার, কাঁদিয়া মরে ভোরের পাখি,	১৭৮
৫০	দূর হতে হেরি অপলক, চলে না, পা	১৭৯
৫১	আমার এ ভুলের নাহি নাহি সমতুল,	১৭৯
৫২	ভালবেসে কেন মিটেনা পিয়াস, কেন তোর, ওরে কবি,	১৮০
৫৩	তুমি যাও ফিরে, যাও ফিরে, আপনার ঘরে,	১৮০
৫৪	রূপসি তোর রূপের কুহকে পড়িয়া দিবাবামী,	১৮১
৫৫	বন্যা আসে, আসে বরা বাঁচিতে নাহি দেবে ধরা,	১৮১
৫৬	ওরে, ও পাষণ মেয়ে যতই করিস অভিমান,	১৮২
৫৭	পল্লবে পল্লবে বায়ু ঘুরে ফিরে কথা কয়,	১৮২
৫৮	কেউ আসে না কাছে বলিতে কথা হাসিয়া,	১৮২
৫৯	নিশাচর করে তুই, দেখাবি ভুঁতের ভয়,	১৮৩

৬০	নাহি আমি শুধাব ভাষা তব,	১৮৪
৬১	ও মন কোন্ মনে পেতে চায় ঠাঁই	১৮৪
৬২	হিয়া মোর নাচে রে নাচে রে ছন্দ তালে	১৮৫
৬৩	কে গো তুমি মানসী মোর	১৮৫
৬৪	ঘড়ির কাঁটা ঘুরে কেন আপন মনে	১৮৬
৬৫	আমি যাই ফিরে আপনার নীড়ে	১৮৬
৬৬	আনত নয়নে মায়ার কাজল রেখা আঁকা	১৮৭
৬৭	বসন্তে ফুটে ফুল ডাকে কোকিল কুলু কুলু	১৮৭
৬৮	ওগো গরবিনী আমারে খুঁজিতে গিয়া পেয়েছি তোমায়	১৮৮
৬৯	এক ফোঁটা আলো দিয়ে বিষ ছড়িয়ে দাও	১৮৮
৭০	কেন ঝরে বেদনার অশ্রু	১৮৮
৭১	ওগো বন্ধু আমার, তুমি দেখিও আকাশের চাঁদ,	১৮৯
৭২	ডাগর নয়ন দুটি মেলে	১৮৯
৭৩	ওকে, বলে দে লো, সখি, ও মনের মানুষ নয়,	১৯০
৭৪	হৃদয়ে হৃদয় করিতে চাই একাকার বেশি কিছু নয়,	১৯১
৭৫	তোমার হৃদয়াকাশে উদিত আমি ব্যথায় শূকতারা,	১৯১
৭৬	সই, ওলো প্রাণের সই, দুষ্ট ঐ কোকিলটিরে দে না তাড়াইয়া,	১৯২
৭৭	বন্ধুরে আমি আর কইব না কথা তার তরে,	১৯২
৭৮	কবি তুই দেখরে চেয়ে, ঈষাণ কোণে ভরছে কাল মেঘে,	১৯৩
৭৯	আমার অশান্ত মন ঘুরে বেড়ায়, প্রান্তরে প্রান্তরে চাহিয়া,	১৯৩
৮০	আমি সেই কবি, কহি না কথা আসিলে তার প্রিয়া সম্মুখে,	১৯৪
৮১	ফিরে এসো, এসো ফিরে আবার এসো ফিরে,	১৯৪
৮২	ওগো সুলোচনা এলো কেশী, যদি ধরিয়া বাখো মোরে,	১৯৫
৮৩	মাগো ভাত দে, বলে কেঁদে ওঠে, শিশু ঘুমের ঘুরে,	১৯৫
৮৪	কুসুম তুমি ছড়িয়ে সৌরভ, বাড়ালে গৌরব কুসুমের সেই ভালো,	১৯৬
৮৫	জীবনের আর এক নাম যুদ্ধ	১৯৬
৮৬	হে বঙ্গবন্ধু	১৯৭
৮৭	তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে নদী বয়ে যায়	১৯৭
৮৮	কষ্টে দিন যায়,	১৯৮

গম্ভীরা নং ১ দুই প্রজন্ম (১৯৯---২৬৫ পৃষ্ঠা)

ক্রঃ নং	কবিতার নাম
০১।	মনের রাজা
০২।	গম্ভীরা
০৩।	গান-
০৪।	নানা-নাতি (সমসূরে)
০৫।	গান ঃ নানা-নাতি
০৬।	(গান ঃ সম স্বরে)
০৭।	নানা-নাতি গান
০৮।	(দাদা-নাতি আবৃত্তি)
০৯।	গান ঃ (নানা-নাতি সমস্বরে)।

কাব্যগ্রন্থ নং ৪ বিনষ্ট আকাশ (১৯৮৬-১৯৮৮)

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১।	শুধু একটি অক্ষত হৃদয়ের জন্য	২৩৬
০৩।	বলো-আছি কাছেই	২৩৭
০৪।	তোমার প্রয়োজন শুধু	২৩৮
০৫।	হে পল্লীকবি তোমার স্মরণে	২৪০
০৬।	মাগো, তোমাকে ঘিরে	২৪১
০৭।	গরুটাকে বাগে আনতে	২৪২
০৮।	মুগ্ধ আমি	২৪৩
০৯।	কালস্রোত	২৪৪
১০।	কৃত্রিমতা	২৪৫

১১।	সুখের প্রতিচ্ছবি	২৪৬
১২।	তুমি নাই কে বলে	২৪৭
১৩।	আমি মানুষ!	২৪৭
১৪।	জলক্রীড়া	২৪৯
১৫।	ভয়	২৫১
১৬।	চিৎকার	২৫১
১৭।	যখন আমি	২৫৩
১৮।	সবুজ ক্ষেতগুলো যেন মা	২৫৩
১৯।	আজকের পল্লী গ্রাম	২৫৫
২০।	কারো সুখ কারো	২৫৫
২১।	নপুংশক ইচ্ছেরা	২৫৬
২২।	কেন	২৫৭
২৩।	একটি নুতন ধারাপাত	২৫৮
২৪।	পাপবীজ	২৫৯
২৫।	জয়	২৫৯
২৬।	সুখেই আছে, থাকবেও	২৬০
২৭।	বেদনাময় অনুভব	২৬১
২৮।	আমার স্বভাব	২৬১
২৯।	সংবাদটা পৌঁছে দাও	২৬২
৩০।	কি আছে অডিথিউস এছার	২৬৩
৩১।	কবিকে মনে পড়ে	২৬৩
৩২।	মা দূর্গার আগমন	২৬৪
৩৩।	রূপসী মা	২৬৪
৩৪।	কে এলে	২৬৫

৩৫	অরুণ	২৬৬
৩৬	আত্মবিশ্বাসী প্রেমিক	২৬৮
৩৭	ফাঁকি	২৬৯
৩৮	ভালবাসা	২৬৯
৩৯	উদ্বেল মন	২৭০
৪০	আজকে	২৭১
৪১	আরশিতে রূপসী	২৭২
৪২	দেবে জীবন	২৭২
৪৩	বিদায়	২৭৩

কাব্যগ্রন্থ নং ৫ বেনামী সত্তার মুখে (১৯৮৬-১৯৯০)।

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১	বেনামী সত্তার মুখে	২৭৫
০২	বেঁচে আছি নরসুন্দর	২৭৬
০৩	আর এক শতাব্দীর লেজে ধরে	২৭৭
০৪	অবিনাশী সূত্র	২৭৮
০৫	অতঃপর গঠন করব	২৮১
০৬	ফলাফল	২৮১
০৭	বাঁচতে চাই	২৮২
০৮	নায়ক যখন দয়া চায়	২৮৩
০৯	শুভক্ষণ	২৮৪
১০	আর নয়	২৮৫
১১	নির্ভীক আমি	২৮৭

১২	অতএব	২৮৮
১৩	সত্যি বলছি	২৮৯
১৪	সীমারেখা	২৮৯
১৫	আছাড়ি খত	২৯০
১৬	এক মুঠো ভাত	২৯১
১৭	আমার ভূগোল পড়া গোল হয়ে	২৯১
১৮	অস্থির পৃথিবীর জীবে	২৯২
১৯	বিচারের তলোয়ার হাতে	২৯৩
২০	এ ভাষায়	২৯৫
২১	দূর্যোগ তিমিরে	২৯৬
২২	কবিতার লাশ	২৯৬
২৩	আগুন জ্বলবে, জ্বলবে জ্বলবেই	২৯৭
২৪	আমাকেই চায়	২৯৯
২৫	সুখ দাও প্রাণে	২৯৯
২৬	নদী ও সাহেব	২৯৯
২৭	দ্বীপ জেলে যাই	৩০০
২৮	হৃদয় যমুনায়	৩০১
২৯	বসন্ত চলে গেল	৩০২
৩০	হে কবি, হে বিজ্ঞানী	৩০২
৩১	শাপ	৩০৩
৩২	নদীর মায়া	৩০৪
৩৩	পূর্ণিমা চাঁদ	৩০৫
৩৪	অন্তরে অনুসন্ধান	৩০৫
৩৫	অন্তিম উচ্চারণ	৩০৬
৩৬	হয়ে যায় তার	৩০৭

৩৭	আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে	৩০৮
৩৮	ঠাঁই নাই আমার কোথাও	৩০৯
৩৯	নতুন জীবন	৩১০

গল্পের বই নং ১ ‘দু’পায়া জানোয়ার’ (১৯৮৭-২০০৯)

ক্রঃ নং	ছোট গল্পঃ	পৃষ্ঠা
০১	ওয়াদা	৩১২
০২	চানাচুরওয়ালা	৩২৩
০৩	অনুভূতি	৩২৮
০৪	অসতির খন্ডচিত্র	৩৩২
০৫	বেকারের ভোজতৃপ্তি	৩৩৪
০৬	শিক্ষা গুরুর বিচ্ছেদ	৩৩৬
০৭	খবরের কাগজ	৩৩৯
০৮	বাসন্তী	৩৪৩
০৯	ভোগান্তি	৩৪৬
১০	কৃষ্ণার স্বভাব	৩৫০
১১	পলায়নপর ভালোবাসা	৩৫২

কাব্যগ্রন্থ নং-৬ স্বদেশে রামেরা এখন (১৯৮৫-১৯৯৬)

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১	মুজিব তোমারই পথ চেয়ে	৩৫৮
০২	স্বদেশে রামেরা এখন	৩৫৮
০৩	ওরা	৩৫৯
০৪	কাকতালীয়	৩৬০
০৫	একটি কঙ্কাল দেশ	৩৬০
০৬	জীবনের দিনগুলি	৩৬১

০৭	দাসত্ব	৩৬২
০৮	প্রস্তাব	৩৬৩
০৯	চঁড়ুই বাতি	৩৬৪
১০	গুরু গুরু গুরু অহংকার	৩৬৪
১১	বিষয় নির্ধারণ	৩৬৫
১২	ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি	৩৬৬
১৩	১০ নং মহা বিপদ সংকোত	৩৬৭
১৪	কেউ নেই	৩৬৮
১৫	কি করি	৩৬৯
১৬	ফিরে যাই	৩৭০
১৭	সংসার বুকে নিয়ে	৩৭১
১৮	উদ্ভিন্ন শরীর	৩৭৩
১৯	বুকের ভেতর	৩৭৪
২০	বীথির বায়না	৩৭৫
২১	সংবাদ	৩৭৬
২২	বোধ	৩৭৭
২৩	বন্ধ্যাত্ম	৩৭৭
২৪	সরলতা	৩৭৮
২৫	কলিজা ও কল্পনা	৩৭৯
২৬	চেতনার ঘোরা ফেরা	৩৮০
২৭	শাস্ত্রত বাংলাৰ দিনকাল	৩৮১
২৮	আমার খোসাটা	৩৮১
২৯	তাল পাতার সেপাই	৩৮২
৩০	মনের রাজা	৩৮৩

কাব্যগ্রন্থ নং ৭ সবুজ প্রেমে আগুন (১৯৮৬-১৯৮৮)

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১	হৃদয়ার্ঘ্য	৩৮৪
০২	দুর্গা বিসর্জন	৩৮৬
০৩	উজাড়ি আবেগ, হে স্বভাব তব হেরি	৩৮৭

০৪	ফিরে আসে আত্মা	৩৯০
০৫	সন্ধান	৩৯১
০৬	বিরহ মিলন	৩৯২
০৭	বাদলে আবেগ ঝরে	৩৯৩
০৮	নানা আমি'র কান্না	৩৯৫
০৯	মিছিল এবং তারপর-	৩৯৫
১০	কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম	৩৯৮
১১	ভাসমান ভাবনা	৩৯৯
১২	বউ বকছে	৪০১
১৩	মনের সোনালাি খাতায় লেখা আছে	৪০৩
১৪	প্রশ্ন জাগে	৪০৬
১৫	মায়া তরণীর মনোহরণী	৪০৭
১৬	জেলে জীবনের সাধ	৪০৮
১৭	স্বপ্নের গাঁও	৪০৯
১৮	হৃদয়ের ধন	৪১০
১৯	নিসর্গ প্রীতি	৪১০
২০	সোরগোল	৪১২
২১	বিশ্বমানবতা	৪১৩
২২	আত্মসুখ	৪১৬
২৩	অরুণোদয়	৪১৬
২৪	বলে যায়	৪১৮
২৫	ভ্রমর ও ফুল	৪১৯
২৬	বধুয়া	৪২০
২৭	সাগরি	৪২১
২৮	কবে আসবে দেবতা	৪২৪
২৯	আঁকি চিত্র	৪২৫
৩০	মুগ্ধ, মন না রূপে	৪২৬
৩১	এক তরফা	৪২৭
৩২	আক্কেল	৪২৭
৩৩	যুগলে	৪২৮

৩৪	আর এক গ্রহের সন্ধান	৪২৯
৩৫	মাতৃত্ব	৪৩০
৩৬	সবুজ প্রেমে আগুন	৪৩১
৩৭	জীবনের পথে	৪৩২
৩৮	হাঁসের মত	৪৩৩
৩৯	প্রেম বাঁধানো ঘর সংসার	৪৩৪
৪০	ঝরা পাতার মত	৪৩৫
৪১	ঝড়ে পড়া পাখি	৪৩৬

কাব্যগ্রন্থ নং ৮ সঙ্গিন (১৯৮৬-১৯৯০)।

ক্রঃ নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১	সেই নক্ষত্র	৪৩৮
০২	হতাশা সাবধান	৪৩৯
০৩	দৃষ্ট সোনালী আলো	৪৪১
০৪	দূষিত বাতাস	৪৪২
০৫	কালে কালান্তরেও গাইব	৪৪৪
০৬	হৃদয়	৪৪৫
০৭	বিস্মল চেতনার ইচ্ছে	৪৪৬
০৮	চোখে যা দেখি	৪৪৭
০৯	শব্দাবলীর বিচরণ	৪৪৮
১০	দূরত্বের বিদ্রোহী কাক	৪৫০
১১	মুখোমুখি	৪৫১
১২	মানুষ হারিয়েছে	৪৫২
১৩	পথ চলা	৪৫৪
১৪	সময় নেই	৪৫৫
১৫	মেঘনা মোহনায়	৪৫৬
১৬	প্রতীক্ষা	৪৫৭
১৭	বারেক আসিও ফিরে	৪৫৮
১৮	আর পারি না আমি এবার রুখো	৪৫৯

১৯	কবির ভুল	৪৬১
২০	মনের পবিত্রতা হারিও না	৪৬১
২১	ধন্য হে	৪৬২

বই নং নাটক।

ক্রঃ নং	নাটকের নাম	পৃষ্ঠা
০১	মনিরের সংগ্রাম (পথ নাটক)	৪৬৩
০২	বউ-শ্বাশুড়ী (সামাজিক)	৪৮৩
০৩	মে দিবস (গীতি আলোচ্য)	৫০৬
০৪	শুভ নববর্ষ (একাংকিকা)	৫০৯
০৫	শুকতারা (কাব্য নাটক)	৫১৫

সুধার মিছিল (কাব্যগ্রন্থ নং-৯) (১৯৮৬-১৯৯২)

০১।	আমি	৫৮৩
০২।	একাত্তরের শানিত চেতনা	৫৮৫
০৩।	পরাজিত জীবন সৈনিক	৫৮৫
০৪।	কবিতার অবয়ব	৫৯০
০৫।	আকাশের মতই কম্পমান	৫৯২
০৬।	মানবতা দেবতার বধ	৫৯৫
০৭।	শিকার	৫৯৭
০৮।	মোটের সহবাস	৬০০
০৯।	হারিয়ে যাবে কবিতা	৬০১
১০।	হরতাল	৬০২
১১।	কাটে দিন রাত এখন	৬০৩
১২।	তবুও স্বপ্ন দেখি	৬০৪
১৩।	মরণোত্তর সাধ	৬০৫
১৪।	পার্ক	৬০৭

১৫। জবাই	৬০৮
১৬। কাব্যরস	৬০৯
১৭। স্মৃতির সাক্ষী	৬১১
১৮। অশোক রাজত্ব মানুষের	৬১২
১৯। দখল	৬১৩
২০। রক্তাক্ত কলম	৬১৫
২১। হৃদয়ের আসামী	৬১৮
২২। আগে যুদ্ধ তারপর	৬২১
২৩। ভালবাসা	৬২৪
২৪। অন্ন-পাপ-মৃত্যু	৬২৬
২৫। আমি সেই কবি	৬২৭
২৬। প্রত্যাশা	৬২৮
২৭। সত্য সুন্দর কলম	৬২৯
২৮। বন্যার আত্মীয়	৬৩১
২৯। এক বিন্দু প্রেম	৬৩৩
৩০। নিদাঘের ঋষি	৬৬৪
৩১। যাপিত জীবন	৬৩৫
৩২। দাফন	৬৩৬
৩৩। ক্ষুধার মিছিল	৬৩৭

কাব্যগ্রন্থ : ক্র.নং ১০ দিব্যদৃষ্টির খোরাশি-লিরিক সিরিজ ১ (১৯৯৯-২০০৯)

০১। রুহের আর্তনাদ	৬৩৯
০২। আমি ডুবে আছি	৬৪০
০৩। মায়ের স্বর্গীয় বাহনে যাত্রা	৬৪১
০৪। মায়ের স্বর্গীয় বাহন হতে অবতরণ	৬৪২
০৫। গর্ব	৬৪৩
০৬। রাগ	৬৪৪
০৭। কামের কান্না	৬৪৫
০৮। গীবত ও কি'না	৬৪৬
০৯। জিহ্বার অতিকথন	৬৪৭
১০। ঈর্ষা	৬৪৯

১১। আসক্তি	৬৫০
১২। রিয়া	৬৫১
১৩। জিতেন্দ্রীয়েৰ আহাৰ	৬৫২
১৪। দুনিয়াৰ ধনলোভ	৬৫৩
১৫। কৃপণতা	৬৫৪
১৬। ধৰাশায়ী ইজ্জত	৬৫৫
১৭। রুহানী নামাজ	৬৫৭
১৮। সিয়াম	৬৫৮
১৯। প্রভুর প্রতিকী বাড়ি	৬৫৯
২০। যাকাত	৬৬০
২১। আত্মশ্লাঘা	৬৬২
২২। তওবা	৬৬৫
২৩। সবর	৬৬৬
২৪। শুকর	৬৬৮
২৫। আশা	৬৬৯
২৬। ভয়	৬৭১
২৭। এশকে এলাহী	৬৭৩
২৮। শওক	৬৭৫
২৯। রেযা	৬৭৬
৩০। কোরআন তিলওয়াত	৬৭৭
৩১। দিব্যদৃষ্টির খোরাকি	৬৭৯

কাব্যগ্রন্থ : ক্র.ন ১১ বিলাপ (১৯৮৬-১৯৯৮)

০১। সিঁড়ি	৬৮১
০২। বিলাপ	৬৮২
০৩। মাটি	৬৮৮
০৪। দা এর দরকার	৬৮৯
০৫। কসাই	৬৯০
০৬। আহত হৃদয়	৬৯১
০৭। কারণ	৬৯৩

০৮। প্রিয়তমা, তুমি	৬৯৫
০৯। অস্ত্র হাতে	৬৯৭
১০। দুঃসময়ের সন্তান	৬৯৮
১১। হারানো বিজ্ঞপ্তি	৬৯৯
১২। বলপেনের অভিযোগ	৭০০
১৩। এখন আমি অস্পৃশ্য	৭০১
১৪। আমি লাশ বলছি	৭০২
১৫। নির্বাচন এলে	৭০৩
১৬। জ্বলন্ত হারিকেন হতে চাই	৭০৪
১৭। অন্ধকারের জীবাশ্ম	৭০৫
১৮। এক কবিতার কবি	৭০৬
১৯। গুণ	৭০৭
২০। দিব্যচোখ	৭০৮
২১। ওম	৭০৯
২২। খোকার রোজা	৭১০
২৩। রাজনীতিবিদ	৭১১
২৪। মৃত্যুঘন্টা	৭১২
২৫। উদারতা, এক ফালি চাঁদ	৭১৩
কাব্যগ্রন্থ : ক্র.নং-১২ “কাব্যলক্ষ্মীর ঘর সংসার” (২০০২-২০২৩)	
০১। জীবন্ত বাস	৭১৫
০২। কবিতা, কাব্যের ভাব	৭১৬
০৩। অশান্তির ঘর	৭১৭
০৪। নরকংকালের বয়ান	৭১৮
০৫। জীবন শিক্ষা-পুঁথি শিক্ষা	৭১৯
০৬। জগদীশ ফলান ফসল	৭২০
০৭। কাব্যলক্ষ্মীর ঘর সংসার	৭২১
০৮। অবিরত শ্রমঘন হই, বিজয় বাঁকি লই	৭২২
০৯। এশক খুন	৭২৩
১০। সুখ দুঃখের পালা বদল	৭২৪
১১। বিজয় নিশান	৭২৫

১২। অলির ছোহব্বতে একদিন	৭২৬
১৩। বিচিত্র পথে দ্বায়ী	৭২৭
১৪। পদপদ্ম	৭২৮
১৫। সুপথে চাহি যেতে	৭২৯
১৬। কর্মযোগে আঁধার কাটে	৭৩১
১৭। মানবীয় চিন্তা শেকড়	৭৩২
১৮। মুর্থ যা রটায়	৭৩৩
১৯। ভালবাসায় বাঁধা আমি	৭৩৪
২০। সোনার মানুষ	৭৩৫
২১। গিলে অহোরাত	৭৩৬
২২। ও! গিরি পেরেক	৭৩৭
২৩। ঈশে ভক্তি দৃঢ়তর গড়ি	৭৩৮
২৪। দ্রিয়ামায় মুজাহিদ	৭৩৯
২৫। ঈষ্ট দয়া সূত্র	৭৪০
২৬। বর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত না আধ্যাত্মিকতায় সুখ	৭৪১
২৭। আখের বর	৭৪২
২৮। সিদ্ধি	৭৪৩
২৯। রকমারী জীবন ফাঁদে জীবন	৭৪৫
৩০। জাগাও আত্মা সহজিয়ায় ধাই	৭৪৬
৩১। হোক বিস্তৃত আশা বিশ্বাস জিহ্বা	৭৪৭
৩২। আর কত জ্বালাবিরে জীবিকা	৭৪৮
৩৩। আমাকে খুঁজে পাই না	৭৪৯
৩৪। প্রেমের শুরু-শেষ	৭৫০
৩৫। বুদ্ধিই স্বর্গদূত	৭৫১
৩৬। সত্য দায়	৭৫২
৩৭। সফল জীবনমৃত	৭৫৩
৩৮। একি অপরূপ রূপ হেরি ভরসার	৭৫৪
৩৯। ঘুরে ফিরে ভুল আসে	৭৫৫
৪০। যে পথে ঈশ নৈকট্য	৭৫৬
৪১। ফল চাহি ভেঙ্গো না মনোবল	৭৫৭

উপন্যাস : ক্র.ন

০১। মেঘের আড়ালে সূর্য	৭৬০
০২। ঘোটকের জবান	৮৩০
০৩। মণি কাঞ্চনযোগ	৯০৬
কিশোর কাব্য নাটক-১	বিদূষী সফুরা
জীবন্যাস :	৯৮৫

০১। সফ্রেটিস	১০৪২
০২। হযরত যুন্নুন মিশরী (রহঃ)	১০৬৬
০৩। হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রহঃ)	১০৯৮
হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর জারি	১১২৯

ছড়ার বই : ১ “শিশুর কাটা কাল” (২০০৩-২০২৩)

০১। শিশুর কাটা কাল	১১৩৩
০২। স্মরি! আত্মা জুড়ায়	১১৩৪
০৩। আত্মার রোগী	১১৩৫
০৪। ঈমান	১১৩৬
০৫। বনবাদাড়ের শিশু	১১৩৭
০৬। মা-শিশু যেন ভব-শশী	১১৩৭
০৭। আস্ত মানুষ	১১৩৮
০৮। জীবন মানে	১১৩৯
০৯। মানবতার বায়না	১১৩৯
১০। দিব্যতার খনি	১১৪০
১১। আত্মার দেহ	১১৪১
১২। সাগরের রূপ	১১৪২
১৩। সুন্দরে অসুন্দর	১১৪৩
১৪। কুসুমের বসবাস	১১৪৩
১৫। গরীবের আশা	১১৪৪
১৬। দিন মজুরের দিন	১১৪৫
১৭। মেকি	১১৪৫
১৮। কোন ব্যাপার না, ব্যাপার হলো যে	১১৪৬

১৯। উম্মাদ	১১৪৭
২০। স্বপ্ন ধন	১১৪৭
২১। কে কি করে	১১৪৮
২২। ভঙ্গুর মন ও নদী শিকস্থী	১১৫০
২৩। ক্ষেতমজুরের মেয়ে	১১৫০
২৪। বিষদাঁত	১১৫১
২৫। উচিৎ শিক্ষা	১১৫১
২৬। বাতেলে না বাতেনে রই	১১৫২
২৭। রমাদান যোগে	১১৫৩
২৮। ইফতার	১১৫৩
২৯। জন্মপূর্ব ন' মাস ন' দিন	১১৫৪
৩০। কিম্বুত দেহের বিক্ষত জান	১১৫৫
ছোটগল্পের বই : ২ 'বন্দি কাকাতুয়ার দীর্ঘশ্বাস'	
০১। যৌবনের হাহাকার	১১৫৭
০২। আশীর্বাদ	১১৬৩
০৩। শান্তনু : একজন সাহিত্যিকের আত্মকথা	১১৬৮
প্রবন্ধের বই : ১ 'অচেনা পথের পথিক'	
০১। আধুনিক গদ্যকবিতা বনাম অন্তর্মিল কবিতা ও মৌলিক সাহিত্য	১১৭৯
০২। এলমে মারেফাত ও মুসলমান সমাজ	১১৭৬
০৩। অপরাধ দমনে উপবাসের মনোজাগতিক প্রভাব	১১৮০
০৪। কেন্দ্রবিন্দু	১১৮৩
০৫। যেখানে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়	১১৮৬
০৬। প্রথা	১১৯১
০৭। প্রতিভা অপরূপ হলে মানুষ দিশেহারা হয়	১১৯৬
০৮। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় না, যুদ্ধ করিতে হয়	১২০২
০৯। বাংলাদেশে সমন্বিত সাধারণ এবং ললিতকলা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা	১২০৭

কাব্যগ্রন্থ- মুক্তির যুগ- পুরুষ (১৯৮৬-১৯৯১)

মুক্তির যুগ পুরুষ

ভিসুভিয়াস আমিই; নিত্য জ্বলন্ত আমার লাভা,
এই মাঠ চৌচির উত্তাপে, কোথা উষার সোনালি আভা?
নির্মল শান্তির বিছানায় শুয়ে কেন, নরসিংহ আজ,
আত্মগত স্বাধীন উচ্চারণ কোথা, ন্যায় দন্ড প্রতাপরাজ-?
লক্ষ শহীদ প্রদীপ নির্বাপিত; দুঃসহ যন্ত্রণায় দেশ মাতা,
ঐ দেখ্ খুনী সব বেঁধেছে দল, সেনাপতি বেহায়া শূয়োর যা-তা।
নহে, নেতা নহে, গণ মানস, কোথাকার এই মূঢ় ভুঁইফোর,
বসেছে ঘাড়ে ঝাঁকিয়া, আজ শুনি দেশে বেহুলা কান্না সুর।
আমরণ অনশন, পাতিয়াছি দরগায় হাত, সে মানুষ আমি নই,
নির্ঘাত দলি অন্যায়, '৭১ মুক্তিযুদ্ধ দলিলে দিয়াছি সই
সন্ধ্যা প্রদীপ নিভিয়াছে ভয়ে, গাহে নাই দোয়েল গান,
শীতের সকালে চৈত্র দাহ, দ্রুম, দ্রুম শুনিয়াছে কত কান।
তাজা রক্তে ভরিয়াছে উঠোন, বৃদ্ধের বুক কিয়ামত,
শৃঙ্খল হাতে ত্যাজিয়াছে সব, এই নারী! বিধাতার নিয়ামত।
এতসব ভুলে চेतনার মগজ খুলে, সর্বহারা বীর আমি,
থাকি নিশ্চুপ, বিজয় গর্বিত চর্মসার, পথচলা থামি।
প্রজন্ম যত হোক না বদল, বাঙ্গালীর রক্ত ঋণ,
গর্জে উঠবে ধরা কাঁপিয়ে, কে, বলে অধিকার সোনার হরিণ?
না, না, কে, কে- বলে নির্বোধ, দেখ্ না বিশ্ব চেষ্টে,
দ্রোহ -থেকে আজ শান্তি এসেছে, রক্ত সাগর বেয়ে।

মোনাফেক সব চিবিয়ে খাবে, প্রস্তুত এই ব্যাঘ্র দাঁত,
ডাষ্টবিন সব রেখেছি খালি, ভেঙ্গে ফেল্, কালো হাত-আঁতাত।
শক্তিদ্র ঐ গণদাবী, চিহ্নিত কর্ যত রঙ্গিন মুখোশ,
তোর আত্মার চিৎকার শোন্, আসিয়াছে মুক্তির যুগ-পুরুষ।

তাং-০৩/০৩/৯০-দঃ ধনিয়া (পাটের বাগ), ঢাকা।

ঝড়

গগন ছেয়ে আসিল ঝড় আসিল, ঝড়, ঝড়,
ধম্কে ওঠে, চম্কে ওঠে, গুরু গর্জনে কড়ার কড়।
বিজলি নাচে ধমনী নাচে, উন্মাদ হল ধরণী,
শুকনো গাঙ্গে তীর ভাঙ্গে কাঁপে পাপের তরণী।
মাতিয়া ছুটিয়া চলি নৃত্য চপল দুর্যোগের দিন,
ধ্বংসের যামী ভোর দেখি, বাজাই রত্ন সুরে বীণ।
কে এল আজি, ডেকে যায় ঐ দূর কেঁদে কেঁদে,
কে এল আজি, বিপ্লবী সাজে, যায় সেধে সেধে।
বিষম বাধা রহি রহি কাঁদা আর নয়, আর নয়,
অন্যায় রোধে চিৎকারী ওঠে, ঐ দেখ্ দিক বলয়।
শিলা ঝরে মাথার 'পরে চূর্ণি দেয় রক্ত চাপ,
ত্যাগিয়া আসন কাম্বল, এবার ছাড়ো ছাড়ো হাফ।
বর্ষণে বাতাসে করি একাকার নাচো, নাচো, নাচো,
কীসের এত ভয়, হবে হবেই জয়-সফল বাঁচা বাঁচো।
ভোট জালিয়াত, দুর্মুজদল একসাথে বাস করে ঐ,
ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে বিবেক হাসে, হৈ, হৈ, রৈ, রৈ।
পশুর দল ঠায় দাঁড়িয়ে করে মাছের মায়ের পুত্রশোক,
আর দেখিব কত বল্ বল্ ওরে বল্ যত গরীব লোক।
কিসের আশায় বেঁচে আছিহ্ অন্যায় চেপে তোর মনে,
দিবে নাকি এক বেলা ভাত ক্ষুধার্ত ঐ, লক্ষ জনে।
কথার ফুল বুরি-গন্ধ নাহি তাতে, আহা গন্ধ নাহি তাতে,
নেতৃত্ব- দেখ্ ছলে, কলে চুরি করে আঁধারে গভীর রাতে।
রক্ত নেশায় উন্মাদ আমি, বাঁচার নেশায় আজ উন্মাদ,
সভ্যতার ঐ মাথা খেয়ে, খাইব পরে কোমল চাঁদ।
কিসের তরে ভয় করিব, সিংহ রূপে বাটবো ক্ষণকাল,
মরতে যদি হবেই আমার, করব মরণ কেন অন্তরাল।
এগোয় তোরা কূট কুশলী-সাহস যদি থাকে বুকে,
আর পারি না, আর পারি না, চুষতে আঙ্গুল লুকে লুকে।

কাব্যগ্রন্থ- মুক্তির যুগ- পুরুষ

চিনি আমি তোৰ্ চেহারা, রে পিশাচ, রে দড়িৰাজ ধন চোর,
একবার যদি পাই ছাড়া, আর রক্ষা নাহি থাকবে তোৰ ।
ঝড়ের বেগে ছুটব আমি, মুষড়ে দেব কাল হাত,
কাল নাগের ছোবল দিয়ে, মারব যত জাত অভিজাত ।
ক্ষুধার জ্বালা সহিতে নারি, রইতে নারি ঘরে আর,
হাভাত ঝড় এসে কেন, ভাঙ্গলে শুধুই ঘরটি আমার ।

০৪/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি

বিরস পৃথিবীর সরস অশান্তি উড্ডীয়মান-

তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি-

বেণুকুপের নাভী ছিঁড়ে খাচ্ছে

আগন্তুক এক হাড়ি রৌদ্র

ক্লান্তির মানুষ বুঝে নিক-

ঈশান কোণের সংকেত;

বিমর্ষ বাতাস এই মুখে

দেখাচ্ছে, হুতুম ভয়, তবু

তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি

আদি রস পান করতে কে এসেছিল,

এই বুকে

তখনও ছিল

ফুল মাঝির সবল হাত

একটি ধ্যানমগ্ন, বাঙ্গালী বীজ ।

এখন বৈশাখের বেশ্যা, উদ্যম

করেছে তার যোনী

যেখানে গনোরিয়া ক্লিষ্ট সবুজ শ্যামলিমা-

তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি

রাখাল এখন হিসেব কষে-

স্নায়ুহীন ঠোঁটে
জাবর কাটে গরু-
শান্তির ঘাম নেই নাকাগ্রে
আমি হৃদয়ে দেখেছি,
চাঞ্চল্যকর খুনের ফেরারী আসামী
ধর্ষিতা অতঃপর নিহত মায়ার
নিঃসাড় দেহ-
পুকুরের ধামের নিচে
নাচে ইতর ছোট লোক ব্যাঙ্গাচী,
বৈশাখের ধান, দুষ্ট কাকেরা
থায় না
বিদেশী সাহায্যপুষ্ট শহুরে দেহ পসারিণী
ইংলিশ রোড়স্থ
তিলোত্তম এই, মাগী
মুখ টিপিয়ে হাসে
নিস্তব্ধ জরাজীর্ণ রাতে
মার্কিন লিঙ্গ ক্রমশ ঢুকিয়াছে
জরায়ু জটরে-
অন্তসত্তা মাঠ
এখন এপাশ ওপাশ করে ।

হুঁশিয়ার-
দামাল ছেলে ঐ আসছে ফাগুনে
ঐ বৈশাখের ঝড়ে
বর্ষা ভাদরে
ঐ আসছে, নেপথ্যে শোনা যায়
বিদীর্ণ উচ্চারণ-
হুঁশিয়ার- এ মা-টি আমার ।
অপরাজেয় বাংলা চেপে আছে
এই বুকে- এই হাটে, মাঠে-ঘাটে
বিস্ফোরিত ডাগর চোখে

লক্ লকে আগুনের জিহ্বা
আমি দেখছি, নাটকের শেষ নেই-
ঝাঁক ঝাঁক সারস চঞ্চু তুলে নেবে
মেঘঘন আকাশের অপর পিঠে
মনের দেশে ক্ষোভের তোল পাড়-
বিষাক্ত সাপ হাঁ করে-
তৃতীয় প্রহরে জেগে আছি।

তাং- ১৪/০৪/৯০-নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

কোন এক মুক্তি যোদ্ধার অভিপ্রায়

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে
লিখি, একটি কবিতা লিখি,
যে কবিতা আর কোন দিকে নয়,
এ নহে সাধ- বাঁচাটা করিব ছন্দময়,
ক্ষুধার দাহনে মরি আর অবশেষে হয়-
উঁচু-নিচু দুনিয়াকে শিখি।
টাকার পাশা খেলায় হেরে যাই,
ভাবি, আমার স্বার্থ ভাবি কাজ নাই,
ওদিকে কারা লুটে পুটে খায় যেন
তাবৎ জল সম্পদ, নদী বুকে,
পাটায় মরিচ পিষে আমাকে আর,
আমি চেয়ে থাকি মুখের দিকে তার-
বাঁচার অধিকার হারা দুর্বল, লাথি
খেয়ে পাথরে মাথা ঠুকে।
বল্, এমনি করে আর কতদিন চলবে,
বরফ হয়ে হিমাঙ্গি শিখরে শুধু গল্বে,
ক্ষেপে যা ক্ষ্যাপারা কে, রে বড়লোক-
ভুঁই ফোড় বদমাশ, হর্তাকর্তা,

কাব্যগ্রন্থ- মুক্তির যুগ- পুরুষ

ভেঙ্গে ফেল্, জুলুমবাজের দালান ঘর,
নির্ভয়ে গুরু কর্ মিথ্যেবাদী ধড় পাকড়
দেশব্যাপি হোক সততা চর্চা,
যার পাপ তার ঘাড়ে বর্তা ।
দেখ্ ইতিহাস কী বলে তোরে,
ক্ষমা করে নি, কেউ কোন অসুরে-
যুবক, দেখ্ তোর সবল শরীর চেয়ে-
নাকি তুই দুর্বল হাড়ি সার,
হতাশার মাঠে তোরে ফেলে আজ,
ধান সব, নিয়ে যায় ক্লীব রঙবাজ,
চেতনার হিমায়ন তোর শোভা পায়?
ওরে মুক্তি পাগল বাছা আমার ।
দশ কোটি গরীব দুঃখী এক জোট,
চাই সাম্যবাদ, স্বদেশে গণভোট,
পরাশক্তি, করেছে দুনিয়ার ক্ষতি
আমার প্রিয় পৃণ্য জন্মভূমি,
গরীব থাকা ভাল, ভাল নয় চামচাগিরি,
বেন্সন ভাল নয়, ভাল স্বদেশী বিড়ি-
চাই কর্ণধার লইবে যে, শাসন ভার-
দেশ মাতৃকার পদ চুমি ।

তাং-১৩/০৩/৮৯- ফতুল্লা, সৈয়দপুর ।

উত্থান

একটি শব্দ, সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ ‘অভাব’,
একটি শব্দ মর্সিয়া কান্না, নিঃশ্বের ক্ষুদ্র জবাব।
একটি শব্দ সময়ের অপ্সরা ওরা দায়হীন চিত্ত-
মিছে চোঁচামেচি, কে বলে ওদেরই ধরার সব বিত্ত।

আমি চাই-ই পিষ্ট চেতনায় আসুক মহাবান,
গগন বিদারী চিৎকারে ফটো হোক, যত অসতর্ক কান।
দুর্গন্ধের শরীর মিশে যাক, রাজপথে রক্তাক্ত হয়ে,
ছিন্ন কাপড় উড়ুক বায়ে- মহানগরী কেঁপে উঠুক ভয়ে।
নিঃশব্দ লাইট পোষ্ট বাস্তহারার মলিন যত থলে,
মানহীন উল্‌ বুলুল শরীরে চাই, যেন আগুন জ্বলে।
যার নাই কিছু, তার সব কিছু, নয় তো মৃত্যু হোক সাথী,
ওরে ভুখা বেশ্যা, কিসের ভয়, দেখিস আন্ধার রাতি?

হায়, আমার শিয়রে কেঁদে ওঠে অবুঝ শিশুপেট,
হাতে-ভাংগা শান্‌কী, পথে পথে ঘুড়ে শির করি হেট।
ভাষা হারানো পাগল- মাথায় জটা বল কিসের তরে,
আদমের পিঠে চাবুক মারে, আদমেই টুটি চেপে ধরে।
বল্‌, কুত্তার বাচ্চারা, কেন, ধরনী রেখেছিস্‌ ভরে,
কেন ভুগিস্‌ এত! না খেয়ে পথে শুয়ে কাঁপিস্‌ জ্বরে?
সম্পদ হারিয়ে, হারিয়েছিস্‌ ওরে, বুকের তাবৎ বল,
তাই খাই, বাসীরুটি ডাষ্টবিনে আর ঠাই পিষ্ট পদতল।
পৃথিবীর পারিবে না কেউ, এক রতি ‘পরে তোলে তোরে,
সে পারে না কাড়ে! লাথি মারে ভাগ্যের দোরগোড়ে।
আত্মার বাণী সত্য জানি, নাই তার কোনদিন ক্ষয়,
সেই হতভাগা নরাধম, চিরদিন যে ছোট হয়ে রয়।
কথিত বড়রা ঘুমন্ত সিংহের চোখে দেয় যে চোখে বালি,
ছানী পড়া চোখে, বাঁপসা দেখে জীবনে ঠকে যায় খালি।
স্রষ্টার জগতে এক সবাই, কে, নেবে বলো কার দান,
রক্ত চোখ উপড়ে ফেলে, তাই গড়িব মানবতার উত্থান।

তাং- ০১/০১/৯১- নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

দুর্জয় অভিশাপ

মহান অক্টোবর, আমি স্বাধীনতা, আমি চির ঋণ,
অন্যায়ের বুকে বাজাই ডামাডোল, এই আমি, চিরদিন।
নাই স্বস্তি ফেলি না নিঃশ্বাস, চির সন্ন্যাসী বাউল,
আমি ক্ষুধার্তের মুখে ঠেলে দেই, বিশ্বের যত চাউল।
আমাকে ভয় পায় দুনিয়ার সব,
তরঙ্গ ফেণা আমি, কল্লোল কলরব,
মানি না আমি সন্ধি, জানি না আপোষ, চির বন্যা,
আমি শ্রাবণের বারিধারা, পাহাড় থেকে নামা বরণ।
কোথা আমার কাম্যতা, কবিতা, সাধ, সাধনা,
উদ্ভ্রান্ত আমি, মানবতা রক্ষা করি পাগলামী যাচঞা,
আমি বগড়াটে, বড্ড বদমেজাজী
আবার প্রেমিক আমি বড্ড পঁজি।
হিংসুটে আমি, স্বার্থপর সূর্য আমি, পশু সেরা কেশরাজ,
শান্ত দরিয়ায় তুলি ঢেউ, আমি যুদ্ধরব সাজ, সাজ।
অভিমান আমার হাতিয়ার, বিদ্রোহী নজরুল, সুকান্ত,
আমি হিটলার, চেন্সিস থা, আমি তৈমুর, হিম হোক ভ্রান্ত।
দুনিয়ার সব জালিয়াত হুঁশিয়ার,
ওরে পিশাচ তোর রক্ষা নাই আর।
ফেলিয়া আসি অতীত, শক্তিদ্র আলোড়ন আমি,
বাঁধা পড়ি না কোথাও, চঞ্চল স্রোত, পৃথিবীর মুক্তিকামী।
বিশাল মেঘের বিদ্যুৎ আমি, উত্তাপ অরুণ,
গলা টিপে মারি আমি, দেখি উন্মাদ, যত দুর্বল তরুন।
শৈশব কৈশোর আমি, চির যুবক ধরায়, বারবার আসি,
ইচ্ছে হয়, পথ করি গিরি কেটে, আঘাত পেয়ে হাসি।
হু হু টর্নেডো হেরিকেন অতুল,
পৃথিবীর নাই কিছু মোর সমতুল,
ধনীকে ভ্রুকুটি মারি, হিংসা করি যত দেখি দেওলিয়া,
কে কোথা কোন জনমে আসে, যত সব, পাষন্ড হিয়া।
আমি মহান স্রষ্টার রূপে নিজেকে হারিয়ে, দেখি অন্যের রূপ,
মরিয়া হই অমর, নিজের কবর রচি, দিই অপর কবরে ধুপ্।

তাৎ-১৪/১১/৮৮-দিঘীর পাড়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

আমি এক গেরিলা যোদ্ধা

আমি এক গেরিলা যোদ্ধা, পণ করেছি স্বদেশ মুক্তির,
শেলের মত বিঁধে বুকে বেঈমানের পরাধীন উক্তির।
সাহস, তেজ- জীবন দিয়া রক্ষা করিব স্বদেশ আমি,
আমার মাটি, আমার থাকিবে, যুদ্ধ করিব আমি দিবাযামী।
আমি এক গেরিলা যোদ্ধা, মাগো, ফ্রলিন করি,
বহু দূর এসেছি, মাগো, ফাঁকি দিয়েছি হানাদার তরী।
একটু খাবার দাও, হাঁটিতে পারি না যে, এখন আর,
উহু গায়ে ভীষণ ব্যথা তোমার ছেলের, কিছু দেখ নি যে তার।
ধূসর বালু চরে পাহাড় টিলায়, রাত দিন কত কাটায়,
আজ এখানে কাল ওখানে, সময় যায় তার হাঁটায়, হাঁটায়।

আমি গেরিলা, না, না, না পালায়ন নয়, কৌশল বলে,
ছিনিয়ে আনিব জয়, দেখি যাই হেথায় আছে, গর্ত তলে-
পুড়িল তবু তার, তবু ডাগর চোখে নিল প্রাণ শত জনের,
কুকুরের মত যারা দংশিল শত মা বোনের সম্ভ্রম, দশ্য বনের।
আমি গেরিলা, মেশিনগান, স্টেনগানের দিয়া ঝটকা গুলি,
শত্রুবুহ্য মৌমাছির বাসার মত, ঝাঁঝাড়া, ঝাঁঝাড়া করে তুলি।
বিটপের আড়ালে, বাতা বনের নিচে, কিংবা নদীর তটে,
থেকে নিরিবিলি আমি একটা একটা করে বানর মারি বটে।

একাই একশ, দুঃখিনি মায়ের সন্তান উদ্বাস্তু শিবিরের
হাজার মুক্তিকামী মানুষের শক্তি আমি ভাংগা নীড়ের।
এক দুর্জয় সৈনিক, পালাতে জানি না, না পরাজয় নয়,
বর্জোয়া অসত্য হিংস্র যাদুর দানব, করিনা, তার ভয়।

চিরকাল চলছে মোর যুদ্ধ, বল্ পিশাচ আর কত দিন,
অপরাধের রাজত্ব করিবে, রাখিব না তোরে কোন চিন্।
আমি গেরিলা এক, জন্ম দিতেছি লক্ষ গেরিলা, ধরাময়,
এক গেরিলা মরে গেলে, হাজার গেরিলা জন্ম এক সাথে লয়।

কাব্যগ্রন্থ- মুক্তির যুগ- পুরুষ

গাছের পাতা খাই, মরুতে পুড়ি, মায়ের কাছে হাত পাতি,
এক বুক সাহস নিয়ে, আমি গেরিলা শুধু যুদ্ধে আছি মাতি।
যা-শেতাংগ, যা পাঁঠা, -যা বেঈমান, হানাদার মুশরিক,
পাঠিয়েছি একাই যম ঘরে, যমদূত আমি, শুধু আজ শিখ-
এ বাচ্চা সিংহের, কাল সাপের, মুক্তিকামী পতঙ্গ দলে,
পুড়িয়া পুড়িয়া খাটি হই, আরো বেশি পোড়া হলে।

দেশ প্রেম আমার হাতিয়ার-ধরায় মোরা একই পথের যাত্রী,
মোরা ঈশ্বরের হাতিয়ার, রাত্রিরে বানাই দিন, দিনে রে-রাত্রি।
প্রকৃতি যুগিয়েছে রসদ আর, মন্ত্র পেয়েছি গগন হতে-
মুক্তি বাহিনীর নবজাত শিশু, মুক্তি চায় চড়ে জয় রথে,
দাইয়ের কবল হতে মুক্তি চায়, বীর প্রসূ মায়ের ছেলে-
আনিবে সূর্য কুড়িয়ে আজ, দেখ্‌ তুই, অবহেলে,
গর্ব আমি বাংলার, ভিয়েতনামের দুনিয়ার গর্ব যথা-
লড়িতে চাই, লড়িয়া বাঁচি, গেরিলা যুদ্ধে, গেরিলা, তথা।

তাং- ১৫/১২/৮৬- টিকরপুর।

ভিক্ষার ঝুলি

আকাশ আমার প্রাণ যুগ যুগ
ছিল শান্ত সরল স্থির,
সভ্যতার অন্ধকারে কালো মেঘ
করেছে আজ বর্জ্জ নির্যোষ ভীড়।
মাতিয়াছি আজ নিষ্ঠুর ধ্বংস খেলায়
করেছি শপথ হ্রস্ব ছাড়া,
অত্যাচারী রবির প্রচন্ড কিরণে?
অবিরল ঝড় বৃষ্টির অশ্রুধারা।
নাহি শুনি কারও কথা ঝড়-
ভেঙ্গে যাই বাড়ি ঘর সব,
আপনার বুকে শুনি, মেঘের ডাক
গুরু গুরু অটরোল রব।
কে আছিস হিম্মতওয়ালা আয়
দেখি সম্মুখে আমার আয়,
মনের তোলপাড়ে চিবিয়ে খাব
বিটব যত, না মানি যত সায়।
ভীম বেগে বহিছে নিঃশ্বাস আমার-
ঘূর্ণী হাওয়া শন্ শন্ শন্,
দু'বাহু জড়িয়ে ধরি, উপড়ে ফেলি
কিয়ামত আমি আত্মহনন।
চোখ দিয়ে পড়ে তড়িতের রেখা,

ঠায় মেরে ফেলি প্রাণী যত,
কাঁপে থর থর দুর্বল চিন্তে, দেখে
আমার মারণ স্পৃহা বাড়ে তত।
না মানি ঈশ্বর ভাগ্য লেখা আজ
নিজ হাতে চালাই শিলের গুলি,
লাথি মারি অসহায়ের মুখে
ধূয়ে সাফ করি ভিক্ষার ঝুলি।

২৪/০২/১৯৮৮ টিকরপুর।

সিংহের মত

না-না-না-না আমি আর সইব না, না সইব না,
প্রতিদিন ভিক্ষা করুণা আঁজল ভরে আর লইব না।
রক্ত সাগরে উঠেছে তুফান ভাঙ্গতে চায়, চায়,
মালিক শ্রমিক ভেদাভেদ ঘর যুগ যুগের অন্যায়।
আমার ঘামে ওরা স্নান করে আমার বপুর তাপে,
ওরা সুখে থাকে মরি আমি ক্ষুধার অন্ন শাপে।
বেকারের মাঠ চৌচির, গাত্রদাহ, নেই মোটে ছাতা,
ওরা থাকে গদির বিছানায়, পাই না আমি ছেঁড়া কাঁথা।
গাড়ী বাড়ি সব ওদের-থাকি আমি শশী নিচে চেলাঘরে,
কুয়াশার চাদরে মুড়ি দিয়ে সর্দি জ্বরে কাঁপি পরে।
বিধাতা, কোথা বিধান, নেই বাঁচিবার একটু ঠাই,
ঐ দেখ আসছে দুশ্চিন্তার হারিকেন, করি সাঁই সাঁই।
দুর্জয় সাহস নিয়ে আয় তোরা, শান্তির পতাকা তলে,
মীর জাফরের বুকে শেল ছুঁড়ে, যে সব বর্জোয়া দলে-
করে সহবাস যুগে যুগে এরা জন্ম দেয়, সব অবিচার,
ওরাই নব নব রূপে কৌলিন্য কূপে ঘাড়ে চাপে সবার।
ভয় যদি পাস্ আমার মাথা খাঁস তবে, তবে আর,
জন্মেছি মরিব সিংহের মত গর্জন দিয়ে বার বার।

৩০/০৪/১৯৮৮, কাঁচপুর, সোনারগাঁও।

বিধ্বস্ত সত্তা

আবেগ ভরা পৃথিবীর হৃদয়
মোহান্ধ সংসার বন্ধন,
আত্ম উচ্চারণ, সবেগে নির্গত
নিরন্তর ফালগুন ক্রন্দন ।
মাঠ তরলতা সুখ স্বপনে জীবন
উৎসবে মত্ত ঐ প্রাণহীন,
দেউলিয়া হয়ে রক্তের দেশ
নির্বাক বিমূঢ় আজ পরাধীন ।
আমার বিনিময়ে দিলাম সেধে
স্বাক্ষর দুর্দিনের মরা মুখে,
মিছে বোল, প্রাণে খায় দোল
আত্ম যন্ত্রণায় মানুষ কাঁদে দুগ্ধে ।
সুন্দর স্বদেশ আমার নয়-নয়
বাঙ্গালীর অধিকারে আজ,
কোথাকার কোন বেহায়া প্রতাপ
এসে পড়েছে শাসন তাজ ।
মানুষ গিজ গিজ করে মিছিলে
প্রতিরোধে ক্ষুধার্ত উদর পায় লাথি,
হায় নিঃশ্ব, ভিক্ষার ঝুলি হাতে
বিশ্বের দুয়ারে এ নিভীক জাতি ।
কান পেতে শুনি মন্দ্রগীত ঐ
বীরের আত্ম বিসর্জন আর,
বেঁচে থাকার শপথ শুনি নেপথ্যে
বাংলা বাণী শহীদ তারকার ।

কাব্যগ্রন্থ-মুক্তির-যুগ পুরুষ

ক্ষয়ে যাওয়া পাথরে স্মৃতি ফলক
এঁকে বিজয় মেনে নেয়া,
তুখোড় সেনানী-বুকে কলংক ছাপ
আজ কেন, কেন হলো দেয়া।

৩০/২/৮৮, টিকর পুর ঢাকা

অধিকার চাই

হে সূর্য তরুণ বাংলা মায়ের, জাগো, জাগো, জাগো,
এবার আর বসে নয়- শত্রু নিধনে উঠে পড়ে লাগো।
ছিনতাই কর্ বাঁচার অন্ন- বস্ত্র, চন্ডালের ঘর হতে,
ভুখার আন্দোলনের ডাক শুনি, দেখ চড়ে রক্তের রথে।
আসছে এছার অডিসিউস ঠায় দাঁড়ায়ে দাজ্জাল,
বল্ যত কাঙ্গাল করিবে কী, ছোরা কই তোর, ধারাল্ ?

হত্যা কর্ যত ধন কুবের, মজুদদার যত পাপাচারী,
রক্ত চুষে চুষে যারা আজি পুঁজিপতি, পাষণ ভারী।
প্রতিশোধ নিবে ভাইয়েরা, রক্তে হাত রাখি, কর্ শপথ,
যত বঞ্চিতের, যত ক্ষুধিতের, যত ক্রন্দিতের, এই মত।

আর কত দেখিবে, এ নির্মম খেলা, গগন ঘনিছে মেঘে,
কাল্ দৈত্য মোনাফেক, আসিছে দেখ্ চেয়ে, কামান দেগে।
যত তুই মুখ গুঁজে থাকিবে পড়ে, করিবে সে সর্বনাশ,
চির তরে ভেসে যাবে, গলাটিপে রুদ্ধ করিবে শ্বাস।
কুত্তার দলে, মুখ নেড়ে নেড়ে শাসালে, কেন করিস ভয় ?
ওরে সত্যের সৈনিক- এতিম বাচ্চা, সুনিশ্চিত তোর জয়।
শুধু হাহাকার নিয়ে বেঁচে থেকে বল্, বল্, ওরে বল্,
কেন রেহাই দিবে, অনর্থক করে যারা, কেবল ছাতুরী ছল।
মাংশ খুলে খুলে খায়, সদা তোর গতর হতে, চেয়ে দেখ্
এরা চির শত্রু বাংলার, বিশ্বের, এরা মহাপাপী, মনে রেখ্।
নেই অধিকার বাঁচার, দেশের মাটিতে, নেই দুনিয়ার কোথা,
ইবলিশের সহোদর এরা, চির দিন -মানুষ শোষণ হোতা।
কেন তোর শাসন দন্ড, ছেড়ে দিলে তার হাতে, রে বোকা,
মরলে না কেন, যুদ্ধ করে, খাইল তোরে, আত্মসম্মান ধোকা।

এবার মন্ রাস্তায় পড়ে- মা বাপ, ভাই বোন, লয়ে একসাথে,
সিংহের মত বেঁচে আছে, অত্যাচারী প্রাসাদে, দুধে ভাতে।

মজিস্ নে, মজিস্ নে, বলি, বালাখানার মাতালের গানে,
জানিস, ঐ ঞ্জার দল, সত্য মিথ্যার পুতুল বানাতে জানে।
ওরে চির সংগ্রামী জাতি, ওরে মুক্তি পাগল মানব বিশ্বের,
ধনিকের সাথে, চিরদিন, চলিবেই চলিবে যুদ্ধ, যত নিঃশ্বের।
পা-চাটা হয়ে যারা ভারী করে, ফ্যাসীবাদী শোষকের দল,
হাতে পেলে খুটেমার্- আরো সম্মুখে চল্, এগিয়ে চল্।
ভেঙ্গে ফেল্ মোজাইক করা দালান, বাড়ী, যত বন্ধ, গুদাম ঘর,
শ্লোগান ধর, লাঠি হাতে আঘাত কর, দেখ কাঁপে সাহেব বর্বর।
ঘেরাও কর, যত ভোগ মন্ত্রণা বাট্ - শালা, আগুন জ্বালা,
ভেঙ্গে ফেল যত অহংকার পাজর, দুর্মুখের মুখে লাগা তালা।

আমার সন্তানে, যারা শিখিয়েছে মায়ের ইজ্জত-মান মার,
আমার সন্তান পিষে মারে বুটে, বল্, শৃগাল, কোন্, সে অধিকার।
উড়ে এসে জুড়ে বসে, পরিয়ে যত দেশ প্রেমিকেরে, হাতকড়া,
বাঁচবি কি, দুরাচার! না, ক্ষমানেই, ওরে তোরা চল্ করে তুরা।
সময় আর বেশী নেই, জ্বলে উঠেছে দেখ চেয়ে অগ্নি শিখা,
বোবা, নেংড়া, আঁতুর, পঙ্কু যত, অধিকার খাতায় নাম লিখা।
সমবেত স্বরে, ইস্রাফিলের সিঙ্গায় আওয়াজ তোন্ নিশান তোন্,
গর্জে উঠুক মহাসিন্ধু-আসুক উর্মিরশি, করি কল্লোল কলরোল।
চাই অন্ন বস্ত্র, আমার, আমার সম্পদ, কে আছিচ্ অধিকার করে,
সূর্য সেন, তীতুমীর, বঙ্গবীর, শেখ মুজিব তৈরী হও সব ঘরে ঘরে।
নাই আপোষ, নাই সন্ধি, ধূর্ত চাল বাজ, বেঙ্গমানের সাথে,
রত্নগর্ভ মায়ের লক্ষ দামাল ছেলে, মারিবে সব, আঁধার রাতে।
মার্-মার্ কড়ার্ কড়ার্ কড়ার্, বুক ফুলিয়ে নিয়া নিঃশ্বাস,
ভয় কিসের, আছে শক্তি বাহুতে, আছে বিজয় দৃঢ় বিশ্বাস।
ফুটুক হাসি কোটি বঞ্চিতের মুখে, আসুক বান উন্নতির,
পিয়াস মিটাব বহুদিনের, জল পানে, যমুনা পদ্মা ভাগীরথির।
ফের, যদি আসে নতুন সাজে, মুখোশ -পরা শোষকের দল,
আগামী পুরুষে, বলে যাব ইতিহাসে, সংগ্রামী জাত যুদ্ধানল-
মুঠে ধরো মশাল, ছিদ্র পথে পিশাচের, ফুঁৎকারে, কোনদিন যেন,
নাহি নিভে এ চেতনা-স্বাধীনতা, যতই সে পথ খুঁজুক না কেন।

হব আমি নিশ্চয়

তোর শোক হয়ে উঠুক শক্তি, সামন্ত প্রভু নিপাত যাক,
দুইপায়ে দলিয়া সবুজের অত্যাচার হিমাঙ্গী মুক্তি পাক।
দেখ চেয়ে দেখ তোর গায়ে অসীম শক্তি অমিত তেজ,
কে রে কাঁদিস্ ধূলায় লুটে ধরে রেখে শিয়ালের লেজ।
নতশির ফ্যাকাশে মুখ দেখি চাইনা, খোল ঘুমন্ত চোখ,
মুখ ফিরায়ে শশী পানে ডাকিছে দেখ স্রষ্টা, উর্ধ্বলোক।
হাঁট একা পথ দুর্গম মৃত্যু ধরো পাঞ্জা, কর সনাতন বধ,
রক্ত লাল চোখ, মুষ্টি তুড়ি অসুর মুখে পায় দলি তাকদ।
কে আপন কে পর কি দরকার ভেবে চাই, প্রতিশোধ,
রক্ত নেশা-কাতর, চিন্তা-মেঘ উড়ুক, জাগুক রোধ-বোধ।
ক্ষুধায় ছটফট বুক পিপাসায় শুষ্ক জিহ্বা-স্বজন যত দূরে,
কংকাল যেন জয়নালের দুর্ভিক্ষ ছবি, মাথা বিম বিম ঘুরে।
ভীরুর মরা সাত বীর একবার-জাগে বুকে রক্তের নেশা,
ভয় নেই, পৌছবে মোকামে, ধরবে গৌরবময় যুদ্ধ পেশা।
ঘণা-লাজ-ভয় কেটে উঠি আমি সমতল থেকে পর্বত চূড়া,
একটা সময় হব আমি নিশ্চয় প্রজা হতে তৈমুর লং খুড়া ॥

২৫/০৫/৮৭- পাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৫০

কাব্যগ্রন্থ- মুক্তির যুগ- পুরুষ

দুধ নই আমি গাওয়া ঘি,
মিশি না কারও জলে,
ছুঁই না কারও দৃশ্যমান ধী,
পড়ি না কারও মতে ছলে।
অনন্ত কাল চলিবে আমার ধারা,
আত্মগত তুলনাহীন আত্ম ধারা,
অতৃপ্তির হাতে ধরে অজানায়,
বিচিত্ররূপ পায় আমার কায়ায়,
যাবেই যাবে মন মত ভেদি,
তুলে ছাল, তুলি হাতের মেহেদি,
খাবোই রক্ত খাবোই সময় সব,
ব্যথার্তের শূনিব ব্যথার রব,
আর এক পেয়ালায় খাব মৃত্যুঞ্জয়ী মদ,
যুগে যুগে করিব অসৎ বদ।

১৮/০৫/৮৮-বাহরাম খান পাড়া

পাপবোধ

এই মুক্তোর দানা চিক্ চিক্ করে শত যুগ-কাল পার হয়,
ঘ্রাণ-সুঘ্রাণ বহে বায়ে, বুঝে না কেউ, কে করেছে গো জয়।
এ সুরভি তো ঈশ ভান্ডার হতে, পায় মনুজে দান করিতে যে,
যাঁর কপালে জোটে এ তৌফিক, কেহ পায় না খুঁজ স্মরিতে যে।
এ সাধারণ কেউ, একাকার সর্বসাথে' আর গড়েন ঈশ্বর নিজে।
যে গড়িছে ঈশ্বরের কৃপায়, সে জানে না এ রহম আচ্ছা যে!
দিনে দিনে হয়ে ওঠে ঐ ফুল অনিন্দ্যসুন্দর আরো আরো,
কেউ দেখে না, আহা বাতেনে থাকে এই হেদায়েত দ্বারো,
যে তোরণ দিয়ে আসে সুনাম- আত্মশ্লাঘা-যশ আসে হয়,
সে ফটকে থাকে না অলি, থাকে মগ্ন এশকে ইলাহি রেজায়,
সে কি স্বাদ! জানে সে-ই, যে-ই পড়ে রহে সেই সত্য মানে,
নির্বোধ ধরে কন্টক ডাল-হারায় ঈশ-শান-অযাচিত শানে
সেথা সে আঁকড়ে ধরে, সাথে ইবলিশ করে নিত্য আঁতাত,
মনু হারায় সাধ, কাষ্টের ধন যায় ফিরে, বহে কার হাত?
মরণ-মড়ক হানিতে, সে শয়তান আসে কুমন্ত্রণা-চিন্তা লয়ে,
বুঝিয়াও বুঝি না যে, হই ধন-মানহীন যাই পাপবোধ বয়ে।

উপজেলা: সমাজসেবা কার্যালয় কি: সদর,

তারিখ: ০৫/০৯/২০২২

কোথায় ভগবান

আমি অস্থির ঘাড় নাড়াতে পারি না দেখ্ ধূর্ত
মাথায় চেপেছে পর্বত প্রায় ঋণের বোঝা,
আর নাড়িভূড়ি ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে অহরহ
দু'চোখে ভাসে সর্ষে-ফুল, বল্-কোথায় ভগবান ?
ছেলেরা কাঁদছে ভাঙ্গা বাসন হাতে হাতে
উনুনে জমেছে প্রশান্ত মহাসাগরের তাবৎ জল
বিশুদ্ধ ঠোঁট থরো থরো আবেদন নিষ্কল
শকুন চঞ্চু ঠুকে গায়ে বল্- কোথায় ভগবান ?
একি ঈশাণ, বিষাণে দেখি, ঝড়ো নিশান
অগ্রহায়নের বৃষ্টি,
চন্ডালের রাজকোষে করে কিলবিল নদমার কিট !
হাত গুটানো নির্বোধের
দল চন্দনা পাখা নেড়ে মল খায় আমোদে—
দূর পলাশীর ময়দানে কেন বইছে লাল লহু
বিদেহী আত্মার শপথ, জ্যোৎস্না রাতের
শপথ, অব্যাহত সবুজ ঢেউয়ের শপথ, শপথ
পরম পূজনীয় মায়ের, চিরমাতৃত্বের- কোথায় ভগবান ?
ডান হাতে আমার তাক করা এম সিক্সটিন
বাম হাতে বিষধর অজগর আমি বেদে
পায়ে দলে পিষে দেবো পশুরাজ সওয়ারী
দৃষ্ট কণ্ঠে বল্ গরীব- কোথায় ভগবান ?

২০/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

বুকে ভগবান

হে অবুঝ কবি তুই বহু কৈঁদেছিস্
এখনও শেষ হয়নি তোর ত্রন্দনের জারীগান....
হে বুভুক্ষ হৃদয় নিয়ে ঘুরেছিস্ মানুষের হৃদয় কন্দরে
হে বঞ্চিত ব্যর্থতার চরম গ্লানি নিয়ে
ফিরে আসিস্ বারবার কেন, কেন?
বল্ হে কবি, তুই মানুষ কে কেন এত ভালবাসিস্
যন্ত্রণার তীর ছুঁড়ে যে চলে যায়,
বর্বর পাষাণের মত সেই দিকে
কেন তুই চেয়ে থাকিস্ স্করুণ
আঁখি নিয়ে পরম আগ্রহে?
জীবনে যদি সূর্য আর না-ই উঠে
যদি পুষ্প ঝরে চির তরে
তবে কেন এত হাহাকার
গগন বিদারী আর্তচিৎকার?
তুই কারও ন'স, তুই-
জগতের এক কোণে পড়ে থাকা একটি স্বচ্ছ কুসুম।
তোর গন্ধ মিশিয়ে দে ঐ মলয়ে আর
গান গেয়ে যা দুঃখের
বোবা চতুষ্পদ জানোয়ারের কানে, কানে
দেখ্ তোর চারিদিকে বইছে ঝড়-
আসছে জগৎ বিলয়ের বিকট শব্দ-
শুন, ইস্রাফিলের সিঙ্গার একটানা সুর.....
তাবৎ মহাসাগরের জল উর্মিরূপ
হয়ে ঘিরছে তোকে ডুবাতে জলে।
কোটি কোটি সাপ দংশন করছে একযোগে তোকে
তার পরও তোর হুঁশ নেই, নেই
ভালবাসার শেষ সীমা দেখার প্রয়াস চেতনা।

আহা তোর বুকে ভগবান বুঝি ভাবছে-
“আমি হঠাৎ জাগিয়া উঠা দ্বীপ
আবারও তলিয়ে যাব
আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে
আমি হিমাদ্রী শিখরের একটি শোকাক্ত পাখি,
সহস্র বছর ধরে অপেক্ষা করছি মৃত্যুর জন্য,
আমার কণ্ঠের ব্যাপ্তি পৃথিবী জোড়া,
আলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়া
আমি হতাশার আশার বীজ
বপন করা, এক অরূপ দেবতা”
কান্নাকাতর কণ্ঠে আমি ঘোষণা করিঃ
মহাকালের সরীসৃপকুলের প্রতি,
ওগো তোমরা বাঁচো তোমাদের অস্তিত্বে অহংকারে
তোমাদের কথা আমার বুকের ভগবানকে বলে দেব,
যেন ক্ষমা করে তোমাদের অপরাধ।
আমাকে দুঃখ দিয়ে সুখী হও
সুন্দর হোক জীবন তোমাদের
হে সপ্তলোকবাসী কোটি সৃষ্টি!
বুকে যে ভগবান তার
কথা শুনাতেই এসেছিলাম,
ভগবানের ইশারায় ফিরিয়ে নিলাম আমাকে,
তিনি যেন সব দুঃখ চুকিয়ে নিয়ে আমাকে ফের
পাঠায় মাটির পৃথিবীতে
আরও কিছু কাল যেন তোমার দেয়া প্রেম কাঁটার
আঘাত সহ্য করার সুযোগ পাই,
আমি আসি যাই আর বলি
পৃথিবীর খুনীকে-হুঁশিয়ার!
নরক অপেক্ষা করছে কবরের গহ্বরে-
দিগন্ত ছুঁয়ে যেখানে আকাশটা নেমে গেছে,
শৈবাল যেমন করে পানিকে আদর দিচ্ছে,

স্নেহ গর্বিত গরুটি যেমন করে বাছুরটিকে
জিভ দিয়ে चाटे,
মা তার সদ্যজাত শিশুকে বুকে জাপটে ধরে,
তেমনি করে শত কোটি বার জন্ম হোক
হৃদয় তাড়িত হৃদয়চারী কবি'র।
আমি চাই না সুখ, চাই না সুখের বাসর ঘর,
আর ঐ পাষণ পাষণীর কৃত্রিম ত্রুর ডাক
আমি চাই না পিশাচ পিতার বৈষয়িক মনের
সোহাগ, আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
অঙ্গার করতে চাই জ্বলন্ত অরণ্য গোলকে।
আর অগ্নি আঁখি মেলে দেখতে চাই-রাহুদশা
গ্রন্থ মাতৃভূমির দুর্দশা অনবরত।
আমি সেই কবি,
সেই জন্ম জন্মান্তরের কোকিলের ডাক,
সেই বসন্তে ফোটা কমল,
বুকে ভগবানের অফুরন্ত প্রেম ভান্ডার
অনন্তকাল যে বিলিয়ে যায়
আত্ম ত্যাগের নজীর হয়ে,
তার প্রেম সুধার ভুবনে
আমি একাকী নিরালায় থাকতে চাই,
অপলক নেত্রে, চেয়ে
ঐ বিচ্ছিন্ন মেঘগুলোর দিকে-
আর ঐ জীবন্ত প্রাণগুলোর দিকে
আর বুকে ভগবানের শুভাশিষ
উদগীরণ করে যাই
অভিশপ্ত ভুবন,
সরাই খাঁচার মৃত্যু হতে
স্পন্দিত সুন্দর প্রাণ, সজীব বিটপে
স্বচ্ছন্দে অলক্ষ্যে।

২১/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কমান্ড

ধ্বংস কর্ এই অটালিকা সুরম্য প্রাচীর,
যারা সুকৌশলে ভেঙ্গে ফেলে নিঃশ্ব গরীবের কুটির ধীর,
চারুক মেরে যারা রক্তাক্ত করে ছিন্নমূল শরীর।
উদ্ভ্রান্ত পথিক আমি হেরি,
দুঃসহ দারিদ্র্যের পরিয়েছে যারা দাসত্বের শৃঙ্খল ভেরী,
কোটি জনতা পঙ্গপাল করিস্নে তোরা আজ দেবী।
দেখ্ অর্ধমৃত পুঞ্জীভূত নরে,
তুলছে চিৎকার রব মহা বিপুলী অসুর কণ্ঠস্বরে,
নেংড়া আতুর অর্ধাঙ্গ কুষ্ঠ রোগী পড়ে থাকা মাটির 'পরে।
ভাত চাই, ভাত চাই আমরা চাই,
নইলে ওরে পাষন্ড, ওরে নরপিশাচ, রক্ষা নাই, রক্ষা নাই,
শত শয়তানকে মহাশ্মশানে পুড়ে কর্ ছারখার, কর্ ছাই।
ওরে ও কুত্তা, শুয়ার, বেঈমান,
জানিস্, শোষিতের রক্তে- কত তাখদ কি তার শান্?
আজ মহাযুদ্ধে একটি করে ধনকুবের লাশ, কর্ খান্ খান্।
তোল্ উচ্চ স্বরে হু-হুংকার রব,
ইস্রাফীলের সিঙ্গা ফুৎকারী ধূলিস্যাৎ কর্বে সব,
জালিয়াত হুঁশিয়ার, লাশ করে পরাব কফিন শাদা ধব্ধব্।
অমিততেজী, অকুতোভয় রাক্ষুসে দল,
ক্ষুন্নি জ্বালায় পুড়ে, পুড়ে পেয়েছি বিধাতার তুষ্টি, বাহু বল,
হাবিয়াহ জাহান্নামের স্বাদ পাবে, অনন্তকাল দাহ্য করবে অনল।
ঐ শুন্ পায়ের শব্দ শুন্, শুন্,
আসছে ধেয়ে ফিডেল-মাও-লেনিন-মুজিব-সাহারা ফুণ্
বাস্তুহারা ছিন্ন কর্ ধড় হতে দেহ, হারামী খুন।
বিশ্বের অগণিত পিঞ্জর শক্ত হাড়,
পায়ে দল্ পিষে মার্ মজুতদার খুলে ফেল্ গুদাম দ্বার,
ছেড়ে দে, স্রোত মুখে মহাসাগরে, বিষাক্ত তীর মুখে দে, তার।

নিষ্ঠুর এক চোখা, স্বভাব যার পাপাচার,
ক্ষমতা কর্ খর্ব মানি না, মানি না পাষণের দুঃশাসন আর,
গগনচুম্বি অন্যায় অবিচারের বিচার, কাছে চাহি না তার।
এখনও সে নিরব কেন জিজ্ঞাসা কর,
নাম না জানা উলঙ্গ মানুষ যত, দেহ, সামনে তার তুলে ধর,
অলিতে গলিতে রাজ পথে, গা পঁচিয়া যার হয়েছে জর্জর।
ঐ সব পামর, তার ভণ্ডামী সব নমাজ,
দেখরে চেয়ে দেখ্ তুলে নিলে বুকো খোদা, চন্ডালে আজ,
তাই বেনিয়া তুলছে আওয়াজ তুলছে যুদ্ধ রব সাজ সাজ।
হে তাপস্ নাই তোন্ আর সময় নাই,
দাগ্ ইচ্ছার তুড়ি, সব পিশাচের চাই, মৃত্যু চাই, চাই,
অটল পণ চলে যাব তারপর পরজগতে, নেব মৃত্যুঞ্জয়ী ঠাই।

৩০/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ রাহরাম খান পাড়া।

দীপের আলোয়

উজ্জ্বল রক্তিম অনল দাউ দাউ জ্বলছে,
চিরদিন মানব হৃদয় দাঁড়িয়ে শুধু টলছে।
ঐ শিখার আলোয় মোহিত জীবগুলো,
দেখি তার শবদেহ-চিতায় চিতায় জ্বলো।
এসো না, এসো না কখনও পতঙ্গ দলের কাছে,
আলোয় আলোয় বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে?
ত্যাগের মহিমা বুঝে, দহি দীপে মোরা,
জানি পতঙ্গ ভাই, মিটিবে না সাধ আত্মজোড়া।
মরিতে চাও আসি আলোয় হয় ভুলে,
হৃদয় দীপের অনলে প্রাণ দাও তুলে।
কে তুমি পশু, দর্প ভরে কেড়ে খাও ভাত,
দৈত্যের বিকট মূর্তি নিয়ে চিবিয়ে দাঁত।
ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে কঙ্কালসার,
দেহ নাশি বিরূপ ছলে ডাকো বারবার।
ত্যাগী যারা আত্ম ভোলা জানে মৃত্যুকে ভালো,
সুখে থাকো সৃষ্টি তুমি, বলি আলো জ্বালো।
শত শত লাশ দেখো আলোর আশায়,
স্বাধীনতার দীপটার দুর্লভ ভালোবাসায়-
অকাতরে জীবন দিলে ভুল কী তাই?
তবু স্বাধীন আলোতে বাতাসে শ্বাস নিতে চাই।

০৫/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ঘরে ফিরিব না, যত দিন

দিনমণি লয়ে যায় আয়ু, শরীর ভেঙ্গে হয়,
রক্ত মাখা এই হাড়খানি, সারা জীবন ছিল পাহারায়।
কখন চলে গেল বেলা, পেকে চুল সন্ধ্যার ইশারায়
অবশ শিশি, তেল নেই দাঁড়িয়ে একা আমি বারান্দায়।

তৃষ্ণার জল এইখানে বুকে লয়ে যায় বেগবান নদী,
কই, ফিরিল না ঘরে আর কোথা চলে সে নিরবধি।
কর্মে মজিয়াছি এই জীবনে, ত্রিভুবন দেখিব না যা হোক,
আসিব ফিরে মরে, আলোকিত করে সত্যের সপ্তলোক।

নানা রং চিরায়ত দিন রাতে কান্না হাসি সুরাসুর,
সবাই আমার কথা কহে, আমি নাকি পৃথিবীর রূপ চোর।
উড়ি খানিক ক্ষুধার আকাশে, পৌঁছে যাই মেঘে, কালোমন,
পুঁজিবাদ পশুরাজ হাঁকে দূরে এখন শান্তির হরিণ শূন্য বন।

তারপরও বেঁচে আছি, তুখোড় তেজোদীপ্ত এই হাত,
ঘরে ফিরিব না, যত দিন জঘন্য রাত না করিব কাত।

২০/০৭/১৯৯০ খ্রিঃ পাটের বাগ, ঢাকা।

প্রিয়া ও পৃথিবী

হে প্রিয়া, মায়াবী আঁখি দিয়া
কি হেরিছ ? তব আঁখি কোণে নিয়া
মোর হিয়াখানি -ঠোট বেঁকে
মৃদু- রহস্য হাসি হেসে একে
ফেলেছ- মায়াপুরী এ মর্ত্যভূমে;
কপালে লাল টিপ চুমে চুমে
ভরে দিব না আমি, জানি জানি
তব কণ্ঠহার শোভাময় খোঁপের মালাখানি
সুন্দর ছড়ায়ে ছড়ায়ে পুলকে নাচে,
বাহু 'পরে ডোরাকাটা কামিজ, পাছে
আমি দিশেহারা হই; তাই ওড়না
দিয়ে ঢেকেছ তব সম্পদ রাশি মোর-না
আছে বিস্ময়, না আছে শক্তি কভু
হৃদয় মাঝে অনুভবি স্পন্দন তবু
তব যাদু রাশি চুম্বকের মত রেখে
দিয়েছে মোরে । কভু আঁখি থেকে
আনন্দ স্ফুলিঙ্গ বারিছে তাই
দুরে আছি, কাছে যেতে সাহস নাই
এ যে ফুল শুধু দেখিবার ধন,
হাত দিয়ে ছুঁলে নষ্ট হতে কতক্ষণ ?
অধর লেপেছ লাল লিপস্টিক দিয়া
বেতাল গরম শরীর মদিরাঁখি, হে প্রিয়া
কানে পরেছে দুল, নাকের শোভা নাকফুল;
শত দেখি দেখি আবার দেখি যেন ভুল ।
বল, বল মোরে সহে না কোন্ যাদু দিয়া
কাড়িয়া নিয়াছ হিয়া- মজি সব কিছু নিয়া
ছিল যা ভাঙে-তবু দাঁড়িয়ে কি বলিতে চাও ?

লাজুক লাজুক আঁখি নিয়া সরে যাও,
বসন্তে নব যৌবন রাগে তুমি সেজেছে,
নতুন সুর হয়ে মম হৃদয়ে বেজেছ বেজেছ ।
যৌবন গান এ সময়েই গায়, নারী-নরে,
সব কিছু উজাড় করে, ঢলে ঢলে পড়ে ।
আর কিছু চাহি না তোমায় চাহি স্বর্গ নব,
অসুন্দর কদাকার আজিকার ভব
নিঁক বিদায় । ক্ষুধা ঝরা অন্যায়ের মাঝে তুমি
নতুন বারতা নিয়ে এসেছ, পুষ্প ভূমি
হয়ে ধরায় করিবে বিরাজ, সুরভিতে ভরে
যাবে মৃদু সমীরণ, স্বর্গ আসি তব তরে
করিবে বিরাজ, হে পুষ্প রাণী গাঁথি মালা
হৃদয়ের তানে তানে ভরিয়া পুষ্প ডালা
তুলে দিবে নব সাজে সজ্জিতা বসুমতির হাতে ।
তাই প্রিয়া তুমি আর আমি নিমগ্ন তাতে,
চক্ষু মুঁদিয়া এক অজনা আবেশে,
শতকর্ম মাঝে তুমি আমি যাব ভালবেসে ।
তাই প্রিয়া ওই দূরে চেয়ে দেখ স্বর্গ,
মানবতারে দিয়াছি সম্মান দিয়াছি পুষ্পার্ঘ্য ।
তব মাঝে হেরি সেই রাগিণী, সেই সুর
চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি আর কত দূর
আছে এ জগতের পুষ্পরাণী তারে
পাবে কবে প্রেমিক তার, বারে বারে,
ক্রন্দনে হতাশায় মৃত্যুর দিন গুনে,
চম্ভুমে বারবার ভুল করে শস্য বুনে ।
আশার বাতিটি নিবু নিবু প্রায়, মলিন চাঁদ
খানি কোথা হারিয়ে গেছে, নদীর ভেঙ্গেছে বাঁধ ।
প্রবল স্রোতের টানে ডেকেছে ক্ষুধার বান,
কত বাড়ী ঘর ভেঙ্গে গেল ডুবে গেল কত ধান ।

হাভাতে হাভাতে দেশে দেখেছি সদা কালিমুখ,
আমার সন্তান যুদ্ধে হারিয়ে করেছি গর্ব পেয়েছি শোক ।
জাতিসংঘ দান ভিক্ষুক সম হাত পাতি নিয়েছে ধনী,
হয়েছে প্রতারিত যুগে যুগে কান্দাল কান্দালিনী ।
ধনের পাহাড় করেছে কেউ, আর আমি আছি
পড়ে ফুটপাতে, খুপড়িতে কভু একটু যাচি
দাও নি তুমি, হে ধনকুবের তব বারান্দা,
ধন-গর্ব সম্মান ভাঁড় সব চিরসাথী তব চিরধান্দা ।
মানুষ হয়ে মানুষকে করেছে কত অপমান,
আমরা তোমরা এক জাতি সব সমান
ভুলে গেছ সব অধিকার হে মানব
ধনের অভিশাপে মানব হয়েছে দানব,
প্রিয়া বলো, বলো বিশ্ব জুড়ে হাঁকি-ডাকি,
স্বর্গ চাহিয়া মানব সদা স্বর্গেরে দিয়াছে ফাঁকি ।

২২/০৫/৮৬-টিকরপুর ।

সেই যুগ সেই ভাষা

শোঁ শোঁ রবে যবে চলিছে বাতাস লয়ে,
সাথে বৃষ্টি কণা, তারি মাঝে কথা কয়ে,
ধীরে ধীরে এক অচিন্তনীয় ভাবাবেশে
আবহে আপনাকে নিমগ্ন করি নিঃশেষে
মন চায় ডুবে যাই শত কথা
বের হয়ে ফিরে যাই হৃদয় দেশে যথাতথা,
হয় নাই যার উদ্দেশ, ভাব বিলাসে তাই,
আজি আমি বিভোর যেন আমাতে আমি নাই ।
এখন সন্ধ্যা গগনে নাই ঘনঘটা নাই মেঘ,
স্নিগ্ধ মলয় ধীরে বহে, নাই ঝড়-বেগ,
তবু এখন মম হৃদয় এত অসহায়, দেখে
তায় ভয় পায়, সিঁথিরে সিঁদূর ঐকে ।

এত শোভা, এত রূপ, এত স্বাদের মলয়
হাহাকার কেন এর মাঝে, দেখে কষ্ট হয়।
যে লোকে চলেছি আমি তথাকার
কায়া বলিব না শুধাই শত বার
আমাকে আমি। দুঃখীর দুঃখ নাই
কোন দিন কেহ সুখের ঘর পেত যদি ভাই,
বলি বুকে নিত, সেই মুখের শত বকা হয়
কে এমন আছে, আমার কল্পলোকে যায়-
সে বহু দিন আগের কথা একদা হৃদয় দিয়া
কিনেছিলুম হৃদয়-সমাজ গোত্র হরণ করেছে প্রিয়া
অঙ্গার সম পুড়িতেছি, সন্ধ্যা শোভায় পড়ে মনে
আকাশের লালীমা যেন তাই, রক্তাক্ত কথা বলে সনে।
এ নহে চন্ডিদাসের মেঘ, সেই যুগ, সেই ভাষা
মানুষ নহে সেই মানুষ মেঘ নয় রমণী-রূপ আশা।
আবার আষাঢ়ে আকাশ সাজিয়াছে ঘনকালো মেঘে,
শূন্য মাঠ ঘাট মুষলধারে বৃষ্টি বাতাস বহে বেগে,
রোষ ভরে নেমে আসে আঁধার রাণী, দ্বন্দ মুখের ধরায়
বুকের সাগরে তুফান বহে আজি মেঘ মেদুর সন্ধ্যায়।

০৮/০৭/৮৬- টিকরপুর।

পাত্র অপাত্র

হতেছে মন উতলা, হৃদয় করিতেছে দুরদুর,
নিলীমা ভরিয়া কালো মেঘ ডাকিতেছে গুরু গুরু ।
কী এক মোহে তন্দ্রালসে টলিতেছি আমি,
কোন জগতে চলিয়া যাব কোন বাসনাকামী ।
অসহ্য যৌবন বেদনায় সর্বাপেক্ষে কী চাই, চাই,
কী নাই কিসের আশায় নেয় প্রাণ ঠাঁই
ধৈর্য্য নাই সীমাহীন তারুণ্য চেতনায় ।
ওরে বোকা ওরে অবুঝ মনপাখী
কিসের আশায় কোথা নিতে চাস ঠাঁই, রাখি
গোপন ধন উন্মুক্ত করি । সাধনার ধন
পরিহরি কোথা যেতে চাস, কোন জন
প্রিয় তোর, এ যে বিষাক্ত সাপ ছোবল
মারি চলে যাবে নিমেষে অসাড় দেহ হীনবল
কী করিবে পরে ? জানিস কিছু অপাত্রে
চাওয়া ভুল বিধূক জ্বালাময় কাঁটা গাত্রে
আসুক ঝঞ্জা বাসনায় ।
এই মনোভূমে রচনা কর পৃথিবীর
সীমাহীন রহস্য, ভাল করে পরখ করে নিবিড়
অনুসন্ধানে মত্ত হও ; তাই বলি
যাবে বিষাদের কালো মেঘ । দিবাকর উদিবে
তব আঁখি যবে আনন্দাশ্রু ফেলে মুদিবে
চির শয্যায়, চির কালের চাওয়া
ধন মিলিবে নিমেষে, তোর যাওয়া
হবে আশার কন্টকাকীর্ণ মোক্ষমে,
সাধনা হবে চিরসিদ্ধ
তাই অকালে অপাত্রে মহাভুল
করে কি চাস যৌবন সুখ, এক চুল
নেই ভুল, কী তব মন চায় হায়
প্রকৃতি, মানব- সৃষ্টি রহস্য খুঁজে না পায়
আত্মার রূপ লভি, নারী রূপ পরিহরি
ভুলে কামনা বাসনা, তপস্যার রশি ধরি,
মুক্তির আনন্দ বর্ষা করো বৃকে বিদ্ধ ।

শ্ৰাবন-বন -মন-মুক্তি

আজি অবিশান্ত বারিধারা ঝরে শ্ৰাবন-ৰাতে,
গুরু গুরু ডাকে মেঘ পুলকে আনন্দে মাতে ।
ক্ষুদ্রজীবগুলো নানা রবে সারাক্ষণ ডাকে,
মনে হয় যেন ডুবে গেছি ভাব সাগরের বাঁকে ।
যদি এমন হত ছাই! সংসার ধর্ম ছাড়ি সব,
সাপ্ত করি বিষয়ী খেলা কোলাহল কলরব,
যাই চলে যাই ঝাঁ ঝাঁর ডাকে মাটির গর্তে,
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ তটিনীর ভয়াল স্রোতাবর্তে ।
আমায় পায় কে গো লুকাব এমন স্থানে,
পৃথিবীর কেউ যেন কোন দিন না জানে ।
এমন সাধ আমার । মিটিবে কি আহা মনে,
ভাবি, আর কত দূর মুক্তি, কত ঘুরি বনে বনে ।
পাখা যদি থাকত আমার জংলী পাখির মত,
মুক্ত গগনে উড়িতাম, আর দেখিতাম কত,
অদেখা, অজানা রহস্য বাহার লোকে লোকে,
কান্না-হাসি-স্নেহ-বিদ্বেষ-ছড়িয়ে ধরণীর বুকে ।
নির্জনে প্রিয়া আমার সোহাগে ভরে দিবে মন,
সম্মোহে বিরহে খুঁজে নেব সুধা রস সুবচন ।
দেখিতাম রূপ, ততক্ষণ আহা আহা কত দূরে
বিহারী আসি ধরা পলকে, মন-প্রেম-শক্তি জোড়ে ।
এমন রাতে তাই, দিনের বামেলা মুক্ত ক্ষণে,
বিধ্বস্ত মন খুঁজে ঘুম সুন্দর কল্পনা, ভিজে, বনে ।
বাউলের দু'তারা ঝংকারী ওঠে ঝিমোয় লালন
ভাংগা বুকে শক্তি দাও প্রভু যেন সত্য করি পালন ।

২২/০৭/৮৬-জিজিরা, ঢাকা ।

সুধার সাকী

বুক করে দূর দূর, সর্বান্তে লাগে আঙুন,
পুষ্পিত কাননে যেন পুড়ে যায় আমার বসন্ত ফাঙুন।
এক আবেগে মাথায় করে রিম কিম হেলা,
কি এক আকর্ষণে মরি কাটে সারা টা বেলা।
স্নিগ্ধ মনোরম তুমি,
পেলবিত কপোলে চুমি,
চম্বে যাও হৃদয় ওগো প্রেয়সী আমার,
তোমার হাতের ছোঁয়া জীবন্ত মধুর সাকার।
কত ভাল লাগে, বুঝি না অনুভবি আমি,
স্বর্গসুখা ভালবাসা সুখময় করে দিবাযামী।
প্রেম সিঞ্চিত নাগরদোলা,
তণু স্পর্শে শিহরণ জাগে আত্মভোলা,
আহা সুন্দর পিয়াসী এমন ভ্রমর-ফুল,
চালাও খেলা হুল ফুটাও ডুবে যাও নদীর নাই কুল
আঙুনের এ খেলা মধুররবি শশী ভূতল,
কান্তিময় তোমার ওগো বিদেশীনি তব করতল।
কম্পিত মৃদু স্বরে বলো মোরে,
‘প্রিয়তম’ ভুলিব না কোন দিন তোরে,
তোমার কামনায় সাজিয়েছি মালা ওগো রূপবালা,
তোমার সাধনায় দিনে স্বপ্ন দেখি, পোড়া দেহে জ্বালা।
কিছুই মানে না মন, ছাই সব কিছু ভুলে তুমি,
এসো প্রিয়তমা জ্বালাও বহি মোর দেহ ভূমি।
একি, চুম্বক সংসার সুখা সৃষ্টি
আলিঙ্গন ছন্দময় চিরায়ত কৃষ্টি।
গড়ে নুতন পৃথিবী নুতন আশার জন্ম হয়,
মা-বাবা মধুর ডাকে গড়ে ভুবন-সন্তান ডেকে কয়,
ভুলে যাও, ভুলে যাও, শরমে, মরি বধূয়া বলে জ্বী,
সুধার সাকী মন্থন না করিলে ন্যূনের নব জন্ম হয় কী ?

২৩/০৭/৮৬- জিজিরা, ঢাকা।

বিলীন আত্মা

সোঁ সোঁ রবে বহিতেছে সমীরণ
প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিতা, তার কিরণ
কোথা গেছে, নিমেষে রাজত্ব করে মেঘে,
শুভ্র আবরের ন্যায় বৃষ্টি ঝরে তীর বেগে
ছল ছল কল কল নদী রব কি যে আনন্দ
সবুজ তরুলতা, ডাহকের সুর, ছড়ায় প্রাণে ছন্দ
এমন মধুর সময় বুঝি আর নাই-জীবনে, আকুল
আকুল আবেশে, প্রশান্তি গায়ে মেখে, সাজে মহীকূল ।
এমন দিনে আবেগে ঘুড়ে বেড়াই
মেঘের সাথে দিক দিগন্তে, পাই
বসুধার রূপ সত্যিকার, কোথা যেন গেছে
চলে আমার প্রাণ, সে কি নিয়াছে বেছে
তার চিরাচরিত সাধের মাটির ঘর
পর কে আপন করি, আপনাকে করে পর ?
প্রেমময়ী রূপসীর মত দেখে তারে নিমগ্ন তুমি
মানুষের রূপে প্রকৃতি ব্যাকুল ধন্য হয় তার পদচুম্বি ।
এর মাঝে দেখি আমি মহাশক্তির রূপ
প্রাণ উঠিছে মাতি জ্বালাতে ভক্তির ধূপ ।
তঁারই ইংগিতে কে ওই দূর দিগন্তে ছায়ে
আনমনে চলে, দোলে ঋষি বায়ে
কী বলিতে কী বলি আজ বুঝি না ছাই
আমাকে বুঝাতে, আমি আজ অপরে বুঝাই ।
সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আমার মন-ঘর
সারা দুনিয়ার প্রতি আত্মা প্রতি নর
যেন আত্মীয় হয়, এ হেন মোর
ভাল বাসা যদি না পাই আমি, তাই ভোর
হতে না হতেই রাতের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,

তেমনিই ভুল ভান্সার আগেই ঘূমের নেশায়
সারা জীবন থাকিতে চাই। পাই না পাই
শুধু জানি, বিশ্বাস করি, এই আমাকে ছাড়াই
আত্মা খেলে যায় তার খেলা, সে চির দুর্জের
বন্ধী হয় না কখনও, দেহ খাঁচায়, সে জানি অজেয়।
এমনি খেলা কে জানে কোথায় কী আছে, ভাই
আমার ভুবনে, ঘুরিতে ঘুরিতে চলে যাই, চলে যাই
অতৃপ্ত বাসনায় স্নিগ্ধ মায়াজাল পাতি
বিধাতা নিয়াছে কোলে তার করে একাকার। লাখি
মেরে ফেলে সব জঞ্জাল দেহ পিঞ্জর ভার
আমাকে না চিনিতেই আমি হল্যাম বিধাতার।

২৫/০৭/৮৬- টিকরপুর, ঢাকা।

পরিবেশ

আঁধারের বুকে চরিয়া বেড়ায় জোনাকী জ্বলে আর নিভে,
ব্যঙ আর ঝাঁঝ একটানা ডাক-মধুর লাগে আহা তবে-
বুকের নিস্তরতা ভেঙ্গে মন হয়ে উঠেছে চঞ্চল দেখ তাই,
উল্লাসে ফেটে পড়ে, মাতাল মন, কোথা যাবে ঠিকানা নাই।
কখনও শংকায় মরি জানালার পাশে চেয়ে ভয় জুজু বুড়ী,
আসে তেড়ে লম্বা নাক, বড়ো চোখ-খাড়া চুল হেলেদোলে থুথুরি।
আঁধারের ভয় আর বিভূঁই বিদেশে যখন আত্মীয়হীন শূন্যচিত্ত,
বৃষ্টি ঝরা রাতে প্রকৃতির নৃত্য মনোহর-ভরে-মন হই আনমনা নিত্য।
ইচ্ছে দেখি, ভয়ংকর রূপ, যামিনীর, তমাল তলে কে যেন দাঁড়িয়ে,
জাগে শিহরণ, প্রেয়সী না রাক্ষুসী নিশাচর আছে তার হাত বাড়িয়ে।
সম্মুখে আছে বই-খাতা, যাওয়ার তাড়া বৃষ্টির মত ঝরে স্মৃতির বিলাপ,
কি করি কোথা যাই, অতীত আসে ফিরে, আসে মানসী মোড়া গিলাপ।
সিগারেট ফুঁকি, লিখি কবিতা, নিমগ্ন চিত্ত একাকার প্রকৃতি ও আমি,
জাগিয়া স্বপ্ন দেখায় এই পরিবেশ, সত্য বলে যায়, হৃদয়ে অন্তর্যামী।
আমি বুঝি আমাকে, বুঝায়, কালীদেবী আঁধারে এসে,
বলে যায় আরো কথা বলিব, সাধু হও নির্জনতা বাল্মীকি বেশে।

২৫/০৭/৮৬-টিকরপুর, ঢাকা।

হে ধলেশ্বরী

উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ তটিনীর বুকে শান্তি
বিরহ তাপিত প্রাণের মর্মস্পর্শী ডাক,
উদার বিশাল গগণ তলে, দূরে বহু দূরে
আছে হাল ধরে মাস্তুল-পাল ওয়ালা
নৌকো ভরে বেচারী মাঝি। বাতাসের
বেগে চলে যাবে তরী, আজি পুলক-আনন্দ
ধরে না মাঝির, দিকচক্রবাল স্পর্শ করে
ছাই-রঙ শশীর, সারি সারি শ্যামকাল, গ্রামগুলি
কি স্বাক্ষর রাখে ধলেশ্বরীর দু'ধারে, সবুজ
ধান ক্ষেত পাটের ছড়াছড়ি, বার বার পরে চোখে
স্নিগ্ধ এক উদাত্ত স্নেহ আহবান, পল্লীবাটির।
হে নদী তোমার কোলে কেমন আদরে রেখেছ তোমার
অধিবাসী, নাকী তোমার বুকে অমানিশার
অন্ধকারে ভয় পায় মানব শিশু।-এ যে বহুদূর
বিস্তৃত মায়াবী রূপ হে স্রোতস্বতী জোড় করেই
চলো, তব ধরিয়া রাখিবে কেবা, প্রবল বেগে
বহিয়া চল, বহু দিন দেখি নি, সেবা মঙ্গল
রূপ তব। মর্তের বুক চিড়ে প্রবাহমান হে স্রোত
রাশি, কি তব উদ্দেশ, কোথা বান
ডেকেছে গায়ে তব, দু'তীর ভাসায়ে ঘরবাড়ী
ভাসায়ে যাও তুমি। পাহাড়ী কন্যা তুমি
লালিত হয়ে এসেছ এ আমার প্রাণের গাঁয়ে
রাগ করে গ্রাস করো তুমি সব। গাঁয়ে
তোমার বীরাজিনী আমেজ, হে উর্মি রাশি
হে নয়নাভিরাম, যেয়ো না তুমি নেশে
সবুজের সাধ।

আকাশে ঘনীতেছে মেঘ প্রবল ভাবে
পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এ বেলা কোথা যায় জানি না
ঘোলাটে জল বুকে লয়ে, হে নদী যাও কোথা
বলো, বলো, এবার তুমি, কীর্তি নাশা-
কন কনে শীতল বাতাস তব গায়ে জড়িয়ে থাকে
মৃত্যুকে করো আলিঙ্গন, হে প্রিয়, তোমার
সুন্দরতা কখনও, অসুন্দর বিভৎস হয়ে যায়
কত কৃষ্ণাঙ্গের ঘরবাড়ি, নাও তুমি কেড়ে,
মানুষকে জীবন যুদ্ধা করে হও না কান্ত তুমি
কত জীবন কেড়ে নাও মেটে না তোমার পিয়াস।
কত কচুরীপানা আশ্রয় নিয়াছে তব গায়ে
এরা সহায়হীন যেন, ওরা ভেসে ভেসে
চলে। বুকে তোমার, হে ধলেশ্বরী
তোমায় করি পূজা, করি ঘৃণা,
তুমি-তুমি আমার সাধনা।

২৬/০৯/৮৬-নদীপথে, ধলেশ্বরী, ঢাকা।

সেতুবন্ধ

রূপের আকর্ষণ দিয়ে আমার মনের কাছাকাছি এসে
কে তুমি দাঁড়ালে পাশে ওগো বিদেশিনী হেসে, হেসে,
রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মুঞ্চ নেত্রে সীমাহীন আকুলতায়,
দূর দূর স্পন্দন বুকে বাঁকা চাহনীর রহস্য চপলতায়।
কে কথা কহ ধীরে অতি ধীরে যৌবন সম্পদ নিয়ে,
পারি না, হয় না সাহস বলি কিছু তব কাছাকাছি গিয়ে।
আমার না বলা ব্যাথা আমারই থেকে যায় ওগো প্রিয়ে,
বলো না, ভালবাসি মধুর চিকন তোমার বাঁকা হাসি দিয়ে।
ফুল বালা তুমি ফুলের সঙ্গিনী আমার কেহ তুমি নহ,
যে জন তোমায় বুঝিতে পায় না-তাকে কেন বুঝিতে কহ।
কেন তুমি দূরে রও ওগো, হৃদয় ধন, জীবনের স্নিগ্ধ কামনা-
তোমায় কাছে পেলে ভুলিব দুঃখ, ভুলিব জীবন যুদ্ধ-যাতনা
প্রেম ডোরে বেঁধে দাও মোরে, দাও না তোমার স্বর্গীয় সুখা,
স্বর্গ হতে খসে মাটির 'পরে জাগাও কেন জাগতিক ক্ষুধা।

কেন দিলে ছোঁয়া, কেন, আসিলে কাছে চির দুর্জয় রহস্যময়ী,
নারী তুমি ছলনাময়ী, মন কেড়ে দূরে যাও-সদামন বিজয়ী।
দাও না জ্বলে, আমার দেহ খানি মোমবাতি তোমার অগ্নিকুণ্ডে,
রূপের, আগুনে-ভরা যৌবনে, চুমুতে চুমুতে গোলাপী পশ্পনিকুঞ্জে।
ভিখারী সম তব কামনায় আছি হাত বাড়িয়ে ওগো হাস্যময়ী,
চাই যে, স্বর্গীয়-স্বাদ প্রেম রস, তোমার উপহার ওগো লজ্জাময়ী
আমার আবদারে, হেসো না তুমি রহস্য করি পাগল বলো না মোরে,
ওগো প্রিয় প্রাণের কাছে এসো-এসো বাহু ডোরে থেকে না দূরে।
প্রেমিক আমি- দু'নয়নে ভাসে প্রেমের আগুন, প্রভু নাথ, জীবন ছন্দ,
তোমার উচ্ছ্বাসে বুঝেছি, জগৎ, প্রেমময়, বুঝেছি স্রষ্টা সৃষ্টি সেতুবন্ধ,
দুয়ার খুলে দাও হৃদয়ের, ভালবাসিতে জগৎ, হৃদয় নদী বহে বেগে,
নারী তুমি প্রেমজলে ঝরনা নদী ভরে দাও, অভিমানে কেঁদে রেগে।

৩০/০৭/৮৬-জিজিরা, ঢাকা।

প্রকৃতির জবাব

সবুজের সারি দিয়ে ঘেরা বিশাল
মাঠখানি; মাঝ দিয়ে প্রবাহমান নদী ঢাল
যেন শাদা রেখা, নয়নহরা দৃশ্যপট
মন মাধুরী দিয়ে নিমেষে দেয় ভুলিয়ে, ঝট
করে বসি আমি, খাতা নিয়ে মিলে যেতে
সেথায়, উড়ন্ত টুকরো, কালো মেঘে, ক্ষেতে
যেন চাষী রেখেছে শুকনো চষা মাটির ঢেলে
ধেণু সমেত রাখাল চলেছে মাঠে, হেসে খেলে
ধীরে, অতি ধীরে চলে, পালের নাও আমি লীন
সেথায় দেখি-ইচ্ছে মত আজ, মাঝির মুখ মলিন
তবু ধরে ভাটিয়ালী গান, ভাংগা গলা ক্ষীণ শরীর
যেন ক্ষুধার্ত কত কাল, তবু ধরে রেখেছে হাল তরীর।
বড় মধুর লাগে প্রকৃতির সাজ সজ্জা যেন নব বধু হয়ে
কত রঙ তার-ঢং কত করে স্বাধীন বাতাস যায় বয়ে
কি যেন ইশারায় যায় বলে, বারিরাশি, কানে কানে
প্রকৃতি রূপসী রহস্য ব্যকুলতায়, পৃথিবী ধন্য তব দানে।

কাব্যগ্রন্থ- কারাগারে কল্পনা

অন্তর্দ্বন্দে ডুবে যাই, মনের আকাশে যাই হারিয়ে আমার
দায় বুলিয়ে স্নিগ্ধ রূপ তব আমায়, বার বার ।
তুমি চুপ করে থেকো না বলো বলো মোরে
নয়নে নয়নে, তব পেয়েছিলাম অতি ভোরে
প্রত্যুষে হেরি ধন্য হলাম সত্যি ধন্য হলাম, ধন্য
বন্য পাখি যেমন বনে থেকে হয় রূপসী, অনন্য,
মানুষের জটিল জীবনে তুমি দাও আনন্দ স্বভাব
প্রকৃতি তুমি নির্বাক হয়ে দাও দাও ইংগিতে সরব জবাব ।

০২/০৮/৮৬- ধলেশ্বরী নদীপথে ।

আমাকে খুঁজিও

ওগো গগণ চারী গগনে চড়িয়া, চড়িয়া যেন
একা, একা, পাই গগনের স্বাদ, মর্ত্যে থাকি কেন ।
মুক্ত মনের দিশারী সুধাকর বল, বার বার,
নহি আমি কারু, নহে, ছিলাম আমি কভু কার ।
বেদনার আকাশে নহে অবশিষ্ট, বলো সাধনার আকাশে,
মৃদু তালে জীবনে ভর করি দুরাশায় চৈত্রের বাতাসে
রহস্য আমার খুঁজিয়া পায় কে, কোথায়, কার, সাধ্য,
ভুবন চারী আমি, মনের দু'তারায বাজাই সুরেলা বাদ্য ।
কোথাও না পাই, মানব শাক্তির যখন, প্রয়োজন
দু-চোখে দেখি না কারু ভরসা, নয় কেহ আপনজন
মোর ভগ্ন বীণায় বাজে সুর, ভেলা ভাসে নিজের সাগরে
অতৃপ্ত মনের নেই ঠিকানা, যাই শুধু জীবনে লড়ে,
আমাকে দেখার নাই কেহ, আমি যে একান্ত একা,
মনে দুঃখ উঠে যখন পাই না কেমন উদার মনের দেখা ।
মনের পাই নি যা, তা পেতে ছুটাছুটি করি একি শুধু ভুল,
উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে ভাসি আহা নেই কোন কুল ।
আমি সেই মানব কবি যাহার ছোঁয়া না পাওয়া যায়,
বিশ্বশ্রম্মাণ্ডে যে আপনাতে লীন, মজে আপনাতে হায়,
কোথা কে খুঁজে মর, মোরে পাবে কি কোন দিন ?
উদার গগণ সম সে বিশ্বে আছে মিশে হয়ে সীমাহীন,
আমাকে খুঁজ পাবে সবুজের সমারোহে সুন্দর-সত্যে,
মানব মনের নিগূঢ়-বিশ্ব রহস্য সন্ধানীর সরল তত্ত্বে ।

০৩/০৮/৮৬- আগলা, ঢাকা ।

শপথ আত্মার

হে নারী আমাকে কি পার না এতটুকু ভালবাসা দিতে ?
আমার হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে তব প্রেম চুষে নিতে ।
তব ভালবাসা জীবনের সান্ত্বনা পরম হিয়া সোহাগ,
আত্মা মম তব অধিকার না চেয়ে শুধু চায় অনুরাগ ।
আমি মানব কি এতই তুচ্ছ নীচ, সমাজ জাত ভয়ে,
বলিবে না কিছু মুক হয়ে রবে, প্রাণ যাবে প্রেম সঁপে ক্ষয়ে ।
আমি করি না কারো ভয় কোন কালে সমাজ শ্রেণী ধরা বাঁধা,
হীনমন্যেরা যদি কপালে, আমার লেপে দেয় কলঙ্ক কাদা ।
পূর্ণ চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ রশ্মির মত ভেবে তব আমি,
বরে নেব হে নারী, শুধু জানিবে আমার অন্তর্যামী ।
তুমি যে আমার আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের ধন, প্রেয়সী নারী,
খুবের যেখানে থাক না মোর মনের শক্তি দিয়ে আনিব কাড়ি ।
তোমার প্রাণে প্রাণ রাখি দাঁড়াব সমাজে, উঁচু করে শির,
সমাজে পারে না, প্রেম রুখিতে করিব প্রমাণ দেখো শীগগীর ।
চাই না ধনরত্ন, রূপলংকার মিছে সামাজিক সম্মান মান,
জাত বেজাত ধর্মের ধারি না ধার যত হয় অপদান ।
কালো-ধবল-যৌবন পেলবতা নাই কিছুর দরকার,
সত্যব্রত-নির্মল আত্মার আত্মীয়ই প্রয়োজন আমার ।
আমার নাই যশ নাই রূপ নাই গুণ জাতের বাহাদুরী,
পরধন লোভে মত্ত হই না কভু বিষয়ী মনে করি না লুকোচুরী ।
আমার নাই শৌর্য বীর্য নাই লাঠিয়াল, হিংস্র দলবল,
হিংস্র ব্যঙ্গ থাবায় করি না অনিষ্ট কারো প্রয়োগে কৌশল ।
আমার আছে ঈশ্বর দেয়া মন প্রাণ, অমূল্য, সত্য নির্মল,
শশীসম উদার, পরোপচিকীর্ষায় হয় না মন সাইবেরীয় শীতল ।
আত্মার উৎকর্ষ সাধনায় ব্রত আমি জীবনকে করে বাজী,
সৌম্য-সহাস্য বদন, রহস্য সন্ধানের কৃশলী কাজী ।
কেবল সুখ পায় যখন অপর আত্মায় দেয় অপ্রত্যাশিত সুখ,
সৃষ্ট জীবের দুঃখ দেখিলে, কাঁদিয়া উঠে যার দয়ার বুক ।
লৌহ কঠিন হয় সত্য সংগ্রামে যেন মহাবীর শের আলী,
তার শরীরে শক্তি যোগায় শক্তি রূপ, দেবী মহাশক্তিকালী ।
শপথ, আত্মার, স্রষ্টার এক অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি আমি,
স্থান-কাল-পাত্রহীন চিন্তা করে দূরে রেখে না অন্তর্যামী ।

০৩/০৮/৮৬-জিজিরা, ঢাকা ।

যায় দিন ভালই

আহা কি সুন্দর, প্রশান্তিময় নয়নাভিরাম জলরাশি
ঘর্মাক্ত শরীর যখন, দিয়াছি সপৈ তুমি দিয়াছ শ্রান্তি নাশি
ক্ষণিকে আনন্দে ভরে গেল মন আহা যখন দেখি, পালের নাও
অতি গোপনে মনে এসে গেল প্রিয়া বাড়ী দেখি যার পীর গাঁও ।
দূর আকাশে শাদা ছাই রঙের মেঘ, হৃদয় ছুঁয়ে যায়,
চাষীর সোনালী আঁশ ধোয়া নদী তীরে মন ভরে দেখে আশায়
মৃদু সমীরণ প্রশান্তি ছোঁয়া, মন জানাজানি, মুহূর্ত যেন সতত,
উড়ে যায় কথার মালা মুখ হতে প্রিয়দর্শিনী সম্মতি শির আনত ।
যন্ত্রণা শুধু খট্ খট্ খট্ বোটের এক গুয়েমী বিরক্তির শব্দ,
মোর সংবেদনশীল মনে আছাড় খায়, হয়ে উঠে ভীষণ জন্দ ।
সরল-সুন্দর খয়েরী রঙ বাদাম তুলে, নাও যায় পশ্চিমা বায়ে,
হেলে দোলে যায় ধীরে, আহা মাঝি তুলে গান, মলিন কায়ে ।
মন চায়, চলে যায় ওই গগণে, বলাকার মত পাখা মেলে,
বৈষয়িক জটিলতা হতে, মুক্ত হয়ে, মেঘের সাথে, উড়ে অবহেলে ।
সন্ধ্যা নমে ধীরে দিনমণি এবার বুঝি নেবে, আজিকে বিদায়,
পরাণ চাহে না যেতে দিতে, যেন শেষ হয় নি তার দৈনিক দায় ।
বিপুল বারিরাশি আর দু'ধারে ধনচে বন, ঘন শনবন,
ধরে রাখে দৃষ্টি, বলে আঁধার তুমি এসো না এখন ।
দিনের আহাজারী যেতে হবে জীবন সংগ্রামে, আসি,
যাও যেতে চাও, সন্ধ্যা বলে আসিয়াছি, দৃষ্টি কাড়া সর্বনাশী ।

০৬/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে ।

জীবনে আমি

আজিকে ঘোর কালো আঁধার ভেদি ভেসে আসে ঝাঁঝের ডাক,
ব্যাঙ করে ভেক ভেক, বৃষ্টি ঝরে টাপুর টুপুর, লাগাতার শব্দ লাগাক্ ।
প্রিয়জনকে জানি না-স্বচ্ছন্দে যায় রাত কল্পনা গদ গদ করে মোর,
কোথা ভেসে বেড়াই মেঘসম চলে যাই, তারকা দেশে দূর, বহুদূর ।
কোথা চাঁদ তারা মঙ্গলগ্রহ, কোথা পর্বতের মনোরম আশার চূড়া,
কোথা শান্ত মানুষের নিস্তেজ ঘুম ঘোর-বুকে ঘুমায় মানিক জোড়া ।
কোথা শ্যামল প্রান্তর, গহীন বন হরিণীর ভীতু মনোহরা নয়ন,
এমন রাত দেখিনি বহুদিন, বহুদিন মন, এ রূপ সাধন করেনি চয়ন ।
প্রাণ কাড়িলে ভুবন, সারারাত তোমার আশায় জাগিয়া রইব,
খুলিয়া দিয়াছি মন-কল্পনার জালবুনি-প্রেমের কথা কইব ।
মিটে যাক জ্বালা, অসুন্দর, ঘৃণা, অত্যাচারের শেষ হোক পালা,
শুনতে চাই সুন্দরমের, গগনভেদী চিৎকার-কণ্ঠে যার কন্টক মালা ।
ত্রিপিটক, ভেদ, কোরআন এর আচ্ছাদনে-নরাধম, সুর তুলি
কপট হাসি ঝেড়ে, বলে যায়, নীতি কথা, আহা কত মধুর বুলি ।
হে মহাশক্তি তুলে নাও তাদের, আজিকার এ ভুবন হতে,
দান কর আত্মশক্তি যার 'পর দাঁড়ায়ে পাব তোমায়, সঠিক পথে ।
ধর্ম-অধর্মের দ্বন্দ তুলে আলো দাও, আঁধার ভরা মনে,
ইচ্ছে মত চলায় এবার, আত্মা আহা কবে গেছে মরে কুক্ষণে ।
কত রঙের ফুলের ডালি সাজিয়ে বসে আছে বেহেশতে হ্রপরী,
স্বাগতম বলে নেবে তুলে আমায়, মনু যদি হই, পশুত্ব খতম করি ।
কোথা আছে সীতা, কোথা ভীম, কোথা বালমীকি চিরঞ্জীব কবি,
কোথা সরলা ফাতেমা, রাবেয়া, যাঁরা দিত আলো, ছিল তার ছবি-
হতে চাই তাদের মত, ধরিতে চাই তাদেরই রশি জীবনে আমি ।
নির্ধুম রাত্রি আমায় বলে যায় একথা-সুন্দর কল্পনা অন্তর্যামী ।

০৯/০৮/১০৮৬ খ্রিঃ আগলা ঢাকা ।

সার্থক জনম

আমার বাঁচা বিশ্ব মানবের কল্যান হেতু,
আমার কথা সার্বজনীন জীবন সেতু,
আমার সাধনা কত কালের স্নিগ্ধ বাসনা,
আমার আশা আলো নিয়ে করি কামনা,
কোথা মহাপুরুষ, কোথা ভগবান দাতা,
কোথা অসীমের আহ্বান কোথা বিশ্বমানবতা,
কোথা আকাশ ফুঁড়ে দূরন্ত যাত্রা,
কোথা আত্মার ডাক-সীমাহীন যার মাত্রা,
আপনাকে আপনি দেখি রহস্যময় চোখে,
জগৎ করে বসবাস আমার ছোট্ট বুকে,
পশুত্ব বিসর্জন দিয়ে হয়েছি মানুষ দেখো,
প্রতিভার স্কুরণে চির উজ্জ্বল আমাকে লেখো,
সার্থক জনম মোর, পূজা করি সুন্দর চিরদিন,
ফুটন্ত একটি গোলাপ চোখ ধাঁধানো রঙিন।

১২/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

উপমা

জীবন রূপ দর্শন যেন চলমান তটিনীর তরঙ্গ ফেনা,
আমাকে দেখে কখনও যায় না আমাকে বুঝা, চেনা।
এই তো সরল মনে বসে আছি ভাবছি, কত দূর কতদূর-
যামিনী বহিয়া চলে, ঘুম আসে নি, আসিল যে ভোর।
কোথা যাব আমি কোথা আনন্দ, ভালবাসা জীবন ছোঁয়া,
আমার এই মায়া, এই কায়া-সবই ছলনা, আহা সবই ভুঁয়া।
ভাবি আমি চলেছি কোথা, কিসের উদ্দেশ্যে তাহা জানি না,
সদা নির্ঝর পানিপ্রপাতের সম ঝরে সময়, তবু মানি না-
তবু চাই জীবনে সুখ আরো-ভেদ করিতে চাই নিরবতা,
চাই হৃদয়ের ছোঁয়া, মানুষের প্রেম-বিশ্বমানবতা চিরঞ্জীবতা।
শতধা খন্ডিত করি প্রাণ আমার বিলাইব চরাচরে জগৎময়,
বেঁচে আছি, বেঁচে আছি আমি, কল্পনাকে করে জয়।
আমার জন্মভূমি কি হবে বিরাণ, গাছ ফুল ফল,
শত উপমার সূতিকাগার হবে কি কোন মৃত্যুর বৃষ্টি জল।
আজ যাহা সত্য তাহা কাল কল্পনা হারানো ব্যাকুলতা,
মানবাত্মা আসে বার বার দেহ খুলে, হয় শুধু উপমা কথা।

১২/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হে কবি (কবি সুকান্ত স্মরণে)

হে কবি তব কল্পনায় বহু পূর্বে ধরেছিল কি ফল,
আজি তব ভাবি বিদ্রোহ তব, সমাজের বিরুদ্ধে ছিল রোষানল।
ভালবেসে মানুষ একদা ডেকেছিলে কাছে, স্পর্শকাতর লেখায়,
দেখেছ কি আজিকার সমাজ, মানুষ অনায়াসে মানুষের মাংশ খায়।
তব চোখে ভুখা- আঁতুর দাঁড়িয়েছিল শির উঁচু করে আর এখন,
অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাঁচে আর কেউ বলে না, কাঁদে যখন।
এসব মানুষ, মনু কি-না আজ, উঁচু তলায় দেখে প্রশ্নবোধক চোখে,
হিংসায় বন্ধ করে দরোজা, হে সুকান্ত দেখো কান্নাময় বুকে।
তোমার বাসনা, উদগ্রীব চেতনা, সফল হতে হলে শুধু চাই,
নব বিদ্রোহ, তব কথার আবৃত্তি-তার বিকল্প যে কিছু নাই।
তোমাকে ধারণ করে পথ চলা কঠিন, বাঁচাই তো দায়,
তবু বলি, পৃথিবী হৃদয়ে হে কবি তব বিদেহী আত্মা যাহা চায়।

১৩/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা মেস, কেরাণীগঞ্জ।

আফসোস

বহু আশা করে দুর্গম পথ পেরিয়ে
এসেছি আমি একটু আদর পেতে,
হৃদয় পটে জমা ভালবাসায় আমি
আপ্ত হইয়ে তার মূল্য দিয়ে যেতে।
কাঁদে যবে প্রাণ হায় হায়
মানুষের টান হৃদয়ের দান কী শক্তি,
প্রিয়জনের স্নিগ্ধ কাতর বলা
গড়ায়ে অশ্রু চলা কপোলে প্রেমাসক্তি।
জন্মভূমির টান, চির পরিচিত দেখা
কী যে ঐশ্বর্য মহাশক্তি দান,
তব ভালবেসে হৃদয়ের যাতনা নেশে,
মুগ্ধ হই, করি তারে সর্বদা সম্মান।

কত চেনা মুখ দেখে জুড়াব প্রাণ
ছুটে যাব বুকে পাগল সম,
যার অপেক্ষায় গুনি দিন, ফুরায় না
কবে জানাবে, গ্রাম মোরে স্বাগতম।
আফসোস করি প্রাণের যাতনায় মরি
যাব কোথায় ভারিয়া পাই না আর,
কাঁদিতে ইচ্ছা করে পারি না
পাথর সম বাঁধছি বুক বার বার।
হায়রে বিষয় অর্থ চাকুরী সমাজ
কেড়ে নিলে স্বর্গ, দান করিলে নরক,
ধূলিস্যাৎ করি সান্নিধ্য প্রিয়জনের
চোখে দেখালে সর্বদা মরা-মড়ক।
সদা ভয় সদা উদ্ভিগ্নতা সদা হতাশা
অর্থ চিন্তায় সংসার জ্বালা ভরা
কী করিব না করিব ভেবে না পাই
শূন্যতায় প্রাণের ঝরছে রক্ত ঝরা।
প্রেম চলে গেল কেঁদে কেঁদে আজ
হায়রে সংসার তব হীন কারসাজিতে,
প্রাণের দৈন্যতা নিয়ে আছি পড়ে
জীবন যুদ্ধের বাদ্য, বাজাতে, বাজিতে।
অসহ দহন, মনের, বিষময় গ্রাম, বাড়ী
ভাইয়ের অত্যাচার, মনে বংশ গৌরব,
ফুল ঢাকিতে চাহে ঝরা পল্লব
বাহিরে আসে না কভু তার ঘ্রাণ সৌরভ।
তাপিত প্রাণ বিশ্ব সংসারের
কোথায় যাবে সর্বত্রই পাপ-অভিশাপ,
মানুষ করে মানুষের ক্ষতি সহজেই
জ্বলে তেলে বেগুনে, মিছে প্রেম অনুতাপ।
শৈশবে দেখিনু আমি আঁধারের রূপ
গোধূলি লগ্নে, নিস্তরক জঙ্গলে বনে,
হেরিনু কত সুন্দর ধেণু চরা মাঠ
ভাবি সুদূরের দৃশ্য অস্পষ্ট দেখা-ক্ষণে।

কত খেলার সাথী, কত কৌতুহলী প্রাণ
শুভাখাংকী আমার মরে গেছে হায়,
সে ব্যথা বলিব কেমনে, কেমনে
ভুলিব আমি যাদের, কাছে পেতে মন চায়।
কত যে ভাবি আমার দেখা ছোট খাট ঘটনা
যা মনে করে নিয়েছে তার বাসা,
আহা আজকে তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ফিরে পাওয়া বাতুলতা, মিছে আশা।
মানবের কাণ্ড কৃত্রিমতার ভাণ্ড
ওই শহুরে বিজলি বাতি আলো,
আমার গ্রামের সেই চাঁদনীরাতে ঘুম
পাড়ানো দাদুর ভুতুরে গল্প ভালো-
গগণ পানে ছুটে যাওয়া মন-কল্পনা
কত সাধে ঘুরে আসা ধরণী,
লৌহ তাক বন্ধী ইঞ্জিন স্ব-শরীর
লাগে না ভালো, ভালো লাগে খেয়া তরণী।
কোথা মিলে উপমা আমার সেই পল্লীর
চোখ জোড়ানো সবুজ প্রান্তরের সাথে,
কোথা পাব সেই দিন, কোন উৎসব মেলায়
পাড়ার কৃষক ছুতার তাঁতী যবে সুখে মাতে।
আজ চোখের সুমুখে চলে যায় মোটর
বাজিয়ে তার মরণ বাঁশী রাজপথে,
সুদর্শন ঘোড়ার ঘোড়-দৌড় পড়ে না চোখে
গ্রামের বধুরা সিঁদুর আঁকি কপালে চলে রথে।
হায় আজ নাই কিছু তার বিচ্ছেদ বেদনায়
আফসোস করি, পড়ে আধুনিকতার শাপে
অর্থ-হাহাকার ধূর্ততার করাল গ্রাসে
জীবন যন্ত্রণায় ধনী-দরিদ্র সমান তালে কাঁপে।

১৫/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

বিনিময়

প্রশান্তির ছায়া ভরা বিচিত্র উদার গগন,
পল্লব নাচে, নাচে মন বহে মৃদু উদাস পবন।
নীড়ের প্রত্যাশায় ছুটে যাওয়া পাখির কূজন,
শ্রাবন সন্ধ্যায় ডাকে ব্যাঙ আহা মধুর লাগে এখন।
হেনকালে যখন ফিরিলাম বাড়ী দেখি হয়,
মা আমার মৃত্যুশয্যায় কাঁপে জ্বরে বাঁচা দায়।
করছে প্রলাপ ডাকছে কাছে, মোর বাছা কাছে এসো,
বসো তোর ভাই বোন যারা দেখিও তা ভালবেসো।
আর তব আব্বাকে মান্য করো, গুরুজন সেবো সদা,
মোর কবর দিবে মরিলে, এখানে যেখানে দাদী-দাদা-
তোমার রয়েছে শুয়ে, আরও কত কি বলছে হয়,
আমি স্তব্ধ রহি পাগলসম স্থির চোখে অবাক নিরবতায়।
হৃদয় বলছে দেবে না যেতে, মায়ের করুণ স্বর,
আমার কান্না হৃদয়ের শুনেছি, রক্তে উঠেছে ঝড়।
তুমি চলে গেলে অন্ধকার সব, মিছে দুনিয়ার সব,
অন্ধসম থাকিব বেঁচে, ঘর সংসার মিছে কোলাহল রব।
মাগো তোমার গ্যাসট্রিক বেদনা, আমি ছিনি লয়ে,
বিধাতা যেন বাঁচায়, তোমায় আমার বিনিময়ে।
মা, এসো ফিরে, জীবন খেয়ে পথ করিলাম আজ তাই
এসো ফিরে বুকে মোর দোহাই, ঈশ্বরের দোহাই।

১৬/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

নিষ্ঠুর ঈদ

আজ আনন্দের দিন ধরার সবাই কি
আনন্দের অংশীদার ?
রাখালের বাঁশিতে সুর বেজেছে
আর রাখাল রয়েছে শুধু বংশীদার ।
হে বিশ্বমানবতা কোথা আছ তুমি
কোথা তোমার রূপ বলো না ধীরে,
শুনছ কি মানবাত্মার ক্রন্দন হাহাকার
সে ক্ষুধার্ত ভগ্ন-নীড়ে ।
সীমাহীন আকুলতায় কঠোর পাষন্ডতায়
হায়রে বিবেকহীন মানব,
কী অত্যাচার করিলে অপরাত্মায়
ঘৃণা করি তোমায়, তুমি দানব ।
পাপ গ্রাসিছে তোরে, তুই পশু
রাখিস কে বেঁচে আছে, কে গেছে মরে,
পৃথিবীর সবাই কি রয়েছে আনন্দে
না-কী পামর তুই আনন্দ রেখেছিস্ ধরে ।
কত জাত কত ধর্ম কত হিংসা
নিষ্ঠুরতা কী রক্ত অস্বীকার,
হৃদয় নিংড়ানো হাহাকার, অর্তরব
কী মানসিক ক্রন্দন বিকার-
হাত আছে কারো, পা নেই, কেহ রোগী
কেহ মূক বুকে বলে ব্যথা,
কে বলেছে স্রষ্টা তোকে পূণ্য দেবে ঈদে
তুই যে আত্মগত পাষণ্ড চেতা ।
আমি ঘৃণা করি আমাকেই, কি করে হাসি
কি করে গোশ্ণত খাই, স্বাদে,
পূণ্যের নামে পাপ করি, অন্ধ হৃদয়
ঈশ্বর খুঁজি, আসিবে ঈশ্বর সাধে ?
দেখ খায় নি যারা খোরমা পোলাও
জিহ্বা হতে পড়ছে লালো,
তোর মাংশ খাবে তারা জানিস একদিন
পথ পাবি না সেদিন দেখি প্রতিশোধ পালা ।

১৬/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

উৎসর্গ

হায় হায় আমি কি করিলাম, এ কি করিলাম
মানুষকে না সেবে ঈশ্বর সেবিলাম,
ঈশ্বর বলে নি কভু সেবিও মোরে, যার
পাখা নাই, তারে পাখা না দিলাম।
মায়ের অসুখ তাই গরুটা বিক্রি করা চাই
অন্যের হাতে যবে,
রোগ নিরাময় ঔষধ চাই, কাতরে বলিতে চাই
মা আমার কি ভাল হবে ?
হায় সেই গরু যবে জবাই করিলাম
ঈশ্বরের নামে, নিরবে কেন ?
মা কি আমার কভু ভাল হবে, দোহাই ঈশ্বর
তব শক্তির ভাল হয় যেন।
আমার বিশ্বাস না হয় ভুল, মাকে না
দেখে দেখিলাম তোমায়,
মায়ের রক্ত কাঁদিছে দেহে আমার আহা
ঈশ্বর তোমার আদেশ করিলাম চুরমার।
দেব শক্তিকে ক্ষুদ্র করি অসুরকে করি বড়
আহা আজ আমি নিঃস্ব, দীন,
দেহ বড় করি আত্মা ক্ষুদ্র করি হলাম বড়
কি নির্বোধ আমি কত নিচ কত হীন।
তুমি কে কোথা পাব তোমার পরিচয়
দাও দিব্যজ্ঞান মানবে, আহা দাও,
ত্যাজি মম পাই যেন তোমায়, স্বরূপ তব
সমাজে সংসারে ছিটিয়ে যাও।
বিধাতা বলে ঐখানে ভাগ্য এইখানে
স্বাধীনতা আর কিছু না চাইলে,
দুঃখ দিয়ে মোরে মিছে উৎসর্গ করি প্রাণী
অমৃত রাখি হাতে, গিলিতে নাহি পাইলে।

১৬/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

অন্তর্দৃষ্টি

বহু কাজ আছে সারি সারি জীবন মহাসাগরে
কাজ করি করি আমি রিক্ত হয়ে চলে যাব রে ।
আমার যাবার ঠিকানা নাই, কোন বাসা নাই,
কখন আমি দিশেহারা নিজেকে হারাই ।
ভাবি না পাই চলে যাব যবে, বৃথা নয়
সব, সীমাহীন জগতে কাজের স্তূপ রাখি, জয়
করি বিশ্ব, আমার যবে যেতে হবে চলে
নিজেরে আটকে রাখি চাই, নির্মল আনন্দ ছলে ।
যারা চলে গেল ভাবি না কভু ছাই!
আমাকে কবে ফাঁকি দিয়ে আমি চলে যাই ।
মরণের পরে আছে জীবন সে আশায়,
নিজেরে বেঁধে রাখি পৃথিবীর ভালবাসায় ।
জীবন দর্শন নহে অদ্ভুত সাধারণ কথা,
একদা যারা ছিল আজ নেই চিহ্ন তম্বীলতা ।
ব্যথা আনন্দ কর্ম শরীর সুখের নীড় ছাড়ি সব,
আঁধার কালিমা ছায়াহে জীবনের কলরব,
কই আজি গ্রাসিল যখন ভীষণ মরণ,
কে না বুঝে দেখে, গোরের ধরণ !
তা সত্ত্বে যখন ফিরেনি জ্ঞান, মিথ্যা মায়া বাঁধন
বহু পুরাতন কথা-নিত্য দুঃখ বাথা শোক কাঁদন
নিমেষে চলে যাই নিমেষে আপনাকে হারাই ।
সারাদিন চলে গেল সাথী ছিল যারাই,
সবাই করে কাজ হাসি কাঁদে চলে বলে
ক্ষণিকের জন্য পাই নি সুখ, ছলে কলে
কেড়ে নিল সব মরণ স্বপ্ন, আজ
শুধু কাজ, নেই আনন্দ মিছে কাজ আর কাজ ।
মনে যখন আসিল আমার আজ প্রাতকালে,
সারাদিন কাটিবে আমার আনন্দে ভালে ।
হায় সবাই ফেলে কেন যে জীবন দর্শন,
স্মরিয়া স্মরিয়া মরণ ব্যথায় হৃদয় করি কর্ষণ ।

আলো জ্বালিতে চাই বিশ্বসংসার ভরি,
আজ আমারে নহে কেবল, মৃত্যুকে ধরি
কভু তো কেহ স্মরণ করে না জীবনে আর,
জীবনে খেটেই গেলে, জীবন করলে ছারখার !
ওগো পৃথিবী, ওগো মায়াপুরী তব
ইচ্ছে, গিরি শৃঙে, অজানা রহস্য সাথী হব ।
মরণ কভু পাবে না খুঁজে তাই
আপনাকে লুকিয়ে রাখব, চিন্তা নাই
শত সৃষ্টি মাঝে আমার প্রাণ রাখি আমি
মিশে যাব আজ, জানিবে শুধু অন্তর্যামী ।
যাকে হারাই তাকে পাই সদা মৃত্যু কল্পনায়,
ওই কথা সাজাই কবিতায় রংধনু আল্পনায় ।
কভু মরিব না আমি, আমার মনের মত
শত শত মন এসে ঘিরে রাখিবে যতনে কত ।
সেদিন আসিব ফিরে-দেখিব সব পুলকে মেতে,
কেহ দেখিবে না আসিব সবাইকে নিয়ে যেতে ।
আমার মরণ নেই, নেই কারো, আমি জানি,
ভিন্ন দেহ আসে ভিন্ন আত্মা, চির সত্য বাণী ।
আমার সাধ আমার আশা অর্জন করি পূণ্য,
বিহারী আসি যখন রহস্যময় মহাশূন্য-
তখন আমি আর আমার থাকি না, মিশে যাই
অনন্ত চরাচরে-নিমেষে নিজেকে হারাই ।
দুঃখ কিসের সুখ কিসের কিসের জ্বালা,
কেন ব্যথিত ! কণ্ঠে যবে শোভা না পায় মালা ।
যার সাধ পুরিল যার মনে উদিল শশী,
আমি যে আছি সদাই তাহাতে চড়ি বসি ।
মা আমার, মা আমার ওগো মা ধরাতল,
তব বাছা একা নই, তবে কেন করো ছল ?
চাই চিনি, না চিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব,
চিনে নেব তবে কেন এত সব মিথ্যে কল্পরব ।
আমায় এমন শক্তি দাও হে বিশ্ব বিধাতা
অন্তরে করিব যোগাযোগ তুমি এ শক্তিদাতা ।

রাজা ও বিষয়ী

প্রবল দাপটে মার মুখে চেতনায় কূট বুদ্ধি দিয়ে,
মানুষের মাঝে নিজেকে উপরে উঠানোর গরল দিয়ে।
সংসারে যারা মিছরির ছুরি বিষয়ী রহে সংঘাতে কত,
সরল মানবে যুগে যুগে করে তারাই হিংসায় পদানত।
ধরনীতে যত রাজা আসিয়াছে সবাই রক্তলুলোপ,
নিজ তখত রক্ষিতে হেন কাজ নেই করে না-জ্ঞান পায় লোপ।
ন্যায় পরায়ন উপাধী যে দেয় বোকার স্বর্গে সে বসবাস করে,
সবচে' নিচু প্রাণী সে যে রাজা-অনূন্য এশটি নৃ গলা টিপে ধরে।
আর যত জ্ঞানী গুণী মানব জাতির সত্যি চির কল্যাণকামী,
মানুষ তাঁদের স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত মন্তকে দিবায়ামী।
বহুরূপী মানুষের বিচিত্র বুদ্ধিতে নরককুণ্ড এ ধরাতল,
কতকাল হয়ে গেল তবু বৃষ্টি ঝরে-শশী-চোখ তারা অশ্রুসজল।
মানুষের গগন ভেদী বাঁচাও চিৎকার আর সুন্দরের মূল্য,
যারা না দিবে জাতগর্বে, যুগে যুগে তারা বিবেচিত পশুতুল্য।
আত্মভোলায় সে বাঁচার অধিকার এ যুগে তার দেখি নাই,
পরকালে পাবে সব পুণ্যবান-কারাগার দুনিয়া, ছাই।
বিষয়ী বা রাজা সে তার সাধ পূরণ শেষ হয় না কভু,
হাঁসের মত গিলে ধন-দাপট-আশা শেষ হয় না তবু।
লালন করে অন্তরে অন্যায় হিংসা ঘেষ ঘৃণা রাশি,
প্রেম বহু দূর চলে যায়, বিষয় দাপট চলে আসে হাসি।

১৭/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

ভগবান প্রেমের প্রথম সোপান

এই নারী আমি সৌন্দর্যের আকর- পুরুষের মদিরা চোখে,
আমি হাসিয়া খেলিয়া দোলা দিয়া যাই পুরুষের তপ্ত বুকে ।
মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখো ফুলের খোঁপায়, সাতনরী কণ্ঠহারে,
নুপুর ঝংকৃত পায়ে-পেলবিত দেহ বল্লরী আহা আড়েটারে ।
আমার লজ্জাবনত আঁখি জানে সত্যি, যাদু জানে,
শোভাময় প্রকৃতি সেলাম ঠুঁকে পায়ে, মানে হার মানে ।
পৃথিবীর চুম্বক শক্তি আমি পুরুষকে, টানি কাছে টানি,
নাগর দোলায় দোলাই, মুচকি হাসি, দেখে মুগ্ধে চুলকানি ।
বুক ফাটে মুখ ফুটে না, আমিও মর্মে মর্মে সদা মরি
মজে যাই বাহু আলিঙ্গনে, পৌরুষ খুটে খাই,ইচ্ছে মত লড়ি ।
প্রেম, প্রেম খেলে শেষে সামাজিক কাঁথায় শুই,
নবজাতক দিই উপহার মা-ধরিদ্রী সেজে নব রূপ লই ।
কল্যাণী-মায়াময়ী মা, রূপে রসে-গন্ধে ভুবন ঢেলে সাজাই,
কে কোথা কবে আমাকে না পেয়ে পেয়েছে,সন্ধ্যাসী নিমাই ।
ভগবান-প্রেম-সিঁড়ির প্রথম ধাপ আমি নারী, অতঃপর সব,
সন্ধ্যাসী বনে থাকে কাম ছেড়ে, ছেড়ে কোলাহল রব,
হৃদয়ে বুঝে নিয়ে প্রেম কেহ, ছুটে যায় ভগবান পানে,
ভগবান তেড়ে আসে, সিদ্ধ করে তারে-অপার অমৃত দানে ।

১৮/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

মহাপাঠশালা

আবছা তিমিরে আচ্ছন্ন গোধুলী লগ্নে মোর,
প্রাণের ঝংকার বাজিল আহা কী সুমধুর।
ব্যথার আশার রাগের শৈশব বিস্মৃত স্মৃতি,
কবিতা হয়ে অন্ধকারে, জাগিয়ে দেয় বুকে ভুতুরে ভীতি।
আবেগ-অনুরাগে একাকার বন জঙ্গলের মহতী মায়া,
বিশ্ববিধাতার সুন্দর সৃষ্টি-মহাপাঠশালা নিস্তব্ধ বন ছায়া।
সামনে আছে কর্ম-প্রান্তর, বুকে সমাজের দুর্নীতির বিষ,
তবু কেন দিয়ে যায় দোয়েল নেচে নেচে শান্তির শিস।
প্রাণে বাজে সুর করণ মনটা চলে গেছে বহুদূর,
নেই মিল বুক ও প্রকৃতির তাই খুঁজে ফাঁক খুঁজে মুক্তি নূর।
তবু বাঁচতে চায় স্বাধীন হয়ে, কী বিচিত্র সাধের এ ধরা,
দিনমণি গেছে রেগে চলে, সন্ধ্যা মুখ পশ্চিমাকাশ রক্তে ভরা।
ছুটাছুটি করে হিয়া কি খুঁজে এ লগ্নে, আহা অবিরাম জানি,
নাকি স্মৃতির লেবাসে মরণের শ্রীঘরে যায় কল্পনা আত্মদানি।

১৮/০৮/১৯৮৬ বাহরাম খান পাড়া।

গম্ভীর হব বাস্তবে

গম্ভীর হব বাস্তবে- তাই আমি থাকতে চাই একা
হাসি তামাসা হতে ছিন্ন হই পাব মারেফাতের দেখা।
শয়তানের চাকা ঘুরে দ্রুত বেগে ধরিতে মোরে,
গম্ভীর হয়ে দেখব এবার কেমন কল্পনায় ওই দূরে-
দৃশ্য দেখে জুড়াব পরাণ- ভাবি পরকালের কথা,
মরলে পরে কি হবে জানি- আমার আত্মা পাবে ব্যথা।
এখানে দাঁড়িয়ে আছে খেলার- সাথী খেলতে যাবে ?
করব না আর কোনদিন খেলা-পণ করেছি দৃঢ়ভাবে।
এখন থেকে হব আমি ভীষণ গম্ভীর বাস্তবে,
সরে যাও বলব কথা খোদার সাথে মুক্তি পাব তবে।

১০/০৮/১৯৭৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

হায়রে অর্থ

হায়রে অর্থ তুই কী অমানিশা, অন্ধকার
আচ্ছন্ন করে দিলে মন,
ভাবছি আমি আজ একটু শান্তি নিয়া
ঘুরিব দেশ দেশান্তর পাব অমূল্য ধন।
কেন যে আস এমন ভয়াল রূপ নিয়া
যখন মানুষের মনে হয় দুঃখ,
ফুরায়ে যায় মনের শান্তি তাবৎ
মনে ভেঙে অর্থ ভূমিকা মুখ্য।
কি করি ভেবে না পাই স্বর্গের মাঝে
নরকের স্বাদ পাই,
জীবনটা কোথা নিয়া যাই, কোথা আছে
আমার একটু থাকিবার ঠাই ?
মনে হয় কভু মাথা খুলে ফেলি
আর হৃদয়ের টুকরাটা দূরে রাখি,
জড় সম পরে রব ধরা মাঝে
হায় জীবনের কত সময় আর আছে বাকী।
সুন্দর ধরণীখানি জানোয়ারে ভরা
শব দেহ নিয়া টানাটানি যবে,
নির্মল আনন্দের জীবন পেতে
আর কত দিন এমন করে থাকতে হবে ?
উচ্ছল তারুণ্য নিয়ে বাঁচিব আমি
যবে ভাবি পৃথিবীর রহস্য যত,
সুন্দর করে হেরিনু আমি হায়রে
অর্থের তাগাদা বাড়ে তত।
স্বচ্ছল-স্বচ্ছন্দের জীবনে চাই, সংশয়
চাই না জীবনে, বাঁচার মেলা,
ডাল ভাত-খেয়ে বাঁচিতে চাই, ওগো
স্রষ্টা, দাও শক্তি, পাথারে ভেলা।

২১/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

অজেয়

শতবার মিনতি করে বলি ওগো প্রকৃতি মহারাজা,
চাই না আর, মোর 'পরে চির দিন তুই জয় ডংকা বাজা ।
কোথা কী আছে জেট-বিমান, আর বেশি, প্রাকৃতিক শক্তি,
তারও বেশি, অনেক বেশি তারুণ্য ভরা-দেহ রাজ তথ্‌তি ।
কে বলে আমি পারিনে বলতে বিজ্ঞান হতে বেশি শক্তি কথা ।
এটম হতে সহস্র গুন শক্তিময় মোর আধ্যাত্মিক জোর,
মোর দেহের প্রতি কণা শক্তিতে হয়ে আছে ভরপুর ।
অন্যায় পায়ে দলা আর তারকা দেশে যাওয়া ব্যাপার নয়,
মহাসৃষ্টির এমনকি আছে, করিতে পারি না জয় ।
যত আবিষ্কার আর ইঞ্জিনের বড়াইয়ের নিকুচি করি,
মম মস্তিস্কের একবিন্দু আজও পারে নি পরিহরি ।
দেহের মনের মিলনে সাগর তলদেশে যাই,
সাবমেরিনের চেয়ে দ্রুতবেগে ভয় যে এক বিন্দু নাই ।
প্রকৃতির অগম্য যত স্থান-যত সুন্দর সুস্বপ্ন কথা,
আমি মানব তাই নিমেষে করি গমন যথা তথা ।
প্রাণের অভিশাপ চলে কত দ্রুততম বেগে, কহে
পারমাণবিক অস্ত্র আঘাত-সূঁচের আঘাতও তো নহে ।
বস্তু জ্ঞান গর্ব করিস ওরে বোকা, আমাকে না জানি,
মোরে পারেনি কেহ, করতে জয় কোন দিন, বহুসাধ্য মানি ।
আমার আত্মার শক্তিতে চলি, দেহ শক্তি তারুণ্যে ভরা,
সকল শক্তির উর্ধ্বে, এ আত্মা, যাহা ঈশ্বরের হাতে গড়া ।

২১/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া । রাত ১ টা ।

কৃষ্ণলীলা

প্রেমে মত্ত কৃষ্ণ, রাধা পাইল অতি কাছে
প্রেম তৃষ্ণা মিটিল না তবু থাকে পাছে পাছে ।
নিমাই রূপে মত্ত আসিলে জগতে লক্ষী রাই
বিভু প্রেমে মত্ত সন্ন্যাসী হইল তাই,
পারিল না রাখিতে কাছে গেল বনে বনে,
মানবে করি ঈশ্বর প্রেমের সাধ, ক্ষণে ক্ষণে
বিনয়ী দেব ঠাকুর মানব হুদে ভাসি,
শত ঘা পেয়ে নির্জনে পায় হাসি ।
নানা রূপে হরি, হরি বলে ক্রন্দনে মরে,
হে বিভু তব আঁচলে পারে না ধরে ।
কাঁদিতে কাঁদিতে হইল জীবনে সাড়া,
দশ্য জগার হুদে দেয় সে নাড়া ।
সে কী মোহিনী শক্তি জগৎ করে ভেদ
ধরণী গগন, মলয় করে সহজে ছেদ;
মহাপ্রেম সাগরে উঠায় জোয়ার
নিমাই, নিমাই বলে প্রেম ঘোটকে হয় সওয়ার ।
জগতের কত বিভু ভোলা পশু হৃদয়
তার মাঝে দিলে পৌছে রবিকর, হল উদয়
দেব, দেব, বলে
বিভু প্রেমে মতোয়ারা, মোমরূপে গেল গলে ।
এমন সে জগৎ-তার সুখা করে পান,
সে কী আসক্তি, কী তার শাণ-
ছন্দে গীতে পাষাণের হৃদয় গলে,
ভক্তিই শক্তি ডুবে যায় প্রেম অতলে ।
আত্মহারা সে অমৃত, ঈশ্বর সুখা,
মিটায় হৃদয়ের সে চিরন্তন ক্ষুধা ।

হেনকালে আমি হেরিলাম, মানসী প্রিয়া,
চোখে তার প্রেমের কথা, উদাস তার হিয়া,
কি যেন বলিতে চায় আম্রবিটপ আড়ালে,
কৃষ্ণ লীলা হেরিতে, গোপনে এসে দাঁড়ালে,
তুমি কি বুঝা প্রিয়া সে প্রেম উপদেশ ?
মানব করে মহামানব যেই নির্দেশ,
হৃদয় করি উজাড় আমি শুধু হেরি,
এসো কাছে, আরও কাছে সহে না দেরি
হব আমি মানব প্রেমিক, সুন্দর ভুবনে
ভুলিব না শত সম্পদ প্রলোভনে ।
করিব না সে বিষপান কভু ভুলে
নেব আমি প্রেম মুকুট ধূলা হতে তুলে ।
জগতের মানব প্রেম লীলা ছেড়ে
বিষয় মাঝে যাব না কভু আমি হেরে,
তব প্রেম দান পেয়ে মিটিবে না ক্ষুধা মোর
যবে সেই প্রেম সহস্রগুণ করি, দূর
বিভূ প্রেম যাচিয়া, হব মহামানব,
টানিয়া তুলিব স্বর্গে, যত হৃদয়হীন দানব ।
এসো রাখা যুগে যুগে নানা রূপে
বিহার করো নানা নামে, চুপে চুপে ।
সুখ পিয়াসী মানব-মিথ্যে মায়ায় সুখ খুঁজে,
নকল হীরায় সে আসল রূপে নেয় বুঝে ।
সুখ সুখ করে মরে দুঃখের বুঝা টানি,
দেহ সেবা করে, হৃদয়ের করে সম্ভ্রাম হানি ।
সে কী বেদনার জগতে, করুণ সানাই বাজে,
কাঁদিতে, কাঁদিতে দেখো কৃষ্ণ সন্ন্যাসী সাজে ।
অনলের নির্মম দহনে পুড়ে বনের কাঠ,
ছাই হয়ে গড়ে উর্বর শস্য ভরা মাঠ ।
বাঁচে তাবৎ সৃষ্টি, জগতের প্রাণী যত,
বিধি জানে প্রেম অনলে পোড়া হৃদের দাম কত ।

২৯/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

জ্ঞানের জন্য দূর যাত্রা

বড় হয়েছে যাব অনেক দূরে
আনিতে বিজয় মালা,
হৃদয়ে-বাসনা জাগে, হব সফল
জ্ঞান সাধনায়-করব ধরা উজালা।
হৃদয়-মস্তিষ্ক বিকশিত করি মাগো
ফিরিব, তোমার গর্ব করি,
দিক দিগন্ত ঘুরি- জনম হবে সার্থক
জীবন যুদ্ধে যাব লড়ি।
কেঁদো না মা হাসিমুখে দাও বিদায়
বিদায় তো কিছু নয়,
কে কবে আসে, কবে যায় চলে
এতো শুধু নিষ্ফল ভাবনা ভয়।
সন্তান জ্ঞানে, গুণে, মানুষের হৃদয়
মাঝে-যদি নেয় স্থান করে তুলি,
পৃথিবীর শত কোটি সন্তান সেদিন
নিবে মাগো তব পদধূলি।
উচ্ছল ছল্ ছল্ তারুণ্যে ভরা মাগো
তোর ছেলে, আমি কি ডরি ?
আর তব আদরে ভুলে সব শুধু কি
বেঁচে থাকব জীবন যুদ্ধ পরিহরি ?
যাবার বেলায় শুধু বলে গেলাম,
এই তব আদরের আমি,
কর্ম মাঝে ডুব দিয়ে- কুড়াব মুক্তা
সাগরে জীবনে-জানিবে অন্তর্যামী।
মাগো আবেগ সাময়িক, হৃদয় জুড়ে
তব স্থান, স্নান হবার নয়,
ফিরিব সেদিন, তব দোয়ায় যেদিন নিশ্চয়
আমি জ্ঞান রাজ্য করিব জয়।

২২/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

শুধু বাঁচা কেন

রেল বগির নিচে ছেঁড়া কাঁথার বাসিন্দারা কি কভু,
পায় জীবনের স্বাদ-বাঁচিবার আশা কেন করে তবু ?
পালের নাও, বাঁধা মাঙ্কলে পূবালী মৃদু বায়ে,
চলে ধীরে ঘুমিয়ে যাই ছায়াশীতল তার ছায়ে ।
মহানগরীর বুকে বাসের টাসাটাসি, পিপীলিকার মত,
জীবন ধাঁধায় চলে নর নারী-আজিকার জটিলতা কত ।
যাহাতে সুখ নেই, আছে দুঃখ, আছে সাধ কিছু,
নির্বীচারে ধরিতে তারে ছুটি হায়েনার মত পিছু ।
শুধু বাঁচিবার তাগিদে আজ বাঁচিতে নাহি চাই,
বড় হব চেষ্টায়, ক্ষুদ্র মন বড় করে চলিব ভাই ।
যৌবন মানে না হার, ফিরিব না ঘরে করি পণ,
সুন্দর জীবনের আশায়, করে যাব আজীবন রণ ।
সাধনার শেষ নেই আছে তৃপ্তি সাধকই তা জানে,
হৃদয়ে ভালবাসার ফুল ফুটিয়ে বরিব বরার টানে ।

২৩/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

বৃষ্টির ছোঁয়া

বর্ষায় মুম্বলধারে বৃষ্টিতে ছেলেরা জল
ছিটাছিটি করে আনন্দে মাতে,
টাপুর টুপুর বৃষ্টিতে আজ যুবা কিশোর
সময় পার করে বসে তারা কলাপাতে ।
'দ' হয়ে বসে সহজ স্নিগ্ধ আনন্দ বিড়ি ফুঁকে
আপন মনে করে 'ছয়ঘর' খেলা,
শিশুরা ভিজে ভিজে সারাক্ষণ কাটিয়ে
দেয়, বানিয়ে কলাগাছের ভেলা ।
আছাড় খায় কত কি হাতাহাতি দে-ছোট
দে ছোট, ঘুমাঘুমি, মাতামাতি,
ঘরে আছে যারা হাতে গুটি নিয়ে, ছক্কা
পাঞ্চগ করে, করে কাতাকাতি ।

বৃষ্টির সময়ে মাঠে চরাধেনু মুখভার
করে, নীচু করে জাবর কাটে,
ছেলেরা ইচ্ছে মতে সাঁতার কাটে, পুকুরে
ব্যাঙ করে গ্যাং গ্যাং, ঘাটে মাঠে ।
বৃষ্টির ছোঁয়ায় শিশুরা মুড়ি দিয়ে বসে,
আধখানা কাপড় করে গুন গুন
কে দিলে ওদের এ সহজ আনন্দ
বৃষ্টির আদুরে হাত, ভেবে হই খুন ।
মন চায় ওরকম হতে, ভাবছি হওয়া
কি যায়, ছুটে যাই, না বলে,
কিসের জ্বর, জড়তা বুকের, সংসার যাতনা
আজকের মত ভুলি বৃষ্টির ছলে ।

২৩/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

আপত্তি নেই

হে আষাঢ় তোমার বারি বর্ষণ
কেন পারে না শান্তি দিতে
আজকের জটিলতার নির্ভুর জীবনে ।
সহস্র ব্যথা আর আশা নিয়ে কাঁদে আজকের
সন্দ্বিগ্ন জীবন । কেউ বলে, বৃষ্টির মোলায়েম
আমেজ প্রাণে তোলে শান্তির জোয়ার
মিলন-বিরহের কথা বলে.....
অথচ আমার কাছে বৃষ্টির স্বাদ নেই
সহস্র ধাঁ ধাঁ শান্তি প্রত্যাশায় ঘুরি
নরকের ভেতর
বর্ষণ নাকি কথা বলে
হাসি পায়, এ ! তো কাজের বিঘ্ন
ঘটায়-মিছে-ইতিহাস-
আহারে, বাল্মিকী, চন্ডিদাস
তোমরা ঘোলাটে জলে
চলে যাচ্ছ বুঝি-খালে বিলে,
রেখে যাচ্ছে বৈষয়িক যন্ত্রণা
আপত্তি নেই.....

২৫/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা ।

মজুর স্বরাজ

এই মানবেতরের করুণ আত্ননাদ শুধু খেয়ে পরে বাঁচিবার-
ব্যক্ত করে কথা, ডাষ্টবিনের পার্শ্বেও নাই জায়গা থাকিবার।
হাভাত, হাভাত দেখি সর্বত্র বস্তি ঝোপ খুপড়ির কন্যা মাকে,
মানব নাকি, আহা রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে জানোয়ার সম থাকে।
পানি দামে বিক্রি করে ইজ্জত, আহা নরাধম যারা,
মানবতা, নব গণতন্ত্রের যুগে কি পেল, মূল্য তারা।
হায়রে মানুষ যারা শুধু বিলাসিতা, অপচয় করে,
সহস্র বুভুক্ষের অন্ন, নৈশ ভোজে, রাজাহারে নষ্ট করে ঘরে।
বলি তারা কোন্ অধিকারে, দুর্মুখেরা ছলে, বলে, কলে,
যায় অবলীলায় ক্ষুধারশি দিয়ে ফাঁসি কাঠে গলে।
শুধুই ভান করে মনুষ্যত্বের, ভদ্রতার গর্ব শিক্ষার,
কেহ ফুটপাতে ঘুমায়, কারো কাঁধে বুলি ভিক্ষার।
শরাফতি আর জানোয়ারের মত থালা দেয় তারা গেটে,
বন্ধ হৃদ তাদের-পায় না দু মুটো ভাত, চায় খেতে খেটে।
ভেঙ্গে গেছে যাদের বুকের হাড় ক্ষুধায় যাদের চক্ষু স্থির,
তাদের কথা কহে, সাম্যবাদের লেবাসে রাজনীতিকের ভীড়।
রহস্য বুঝিবে কি, ক্ষুধার্ত মুখরা মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খায়,
চাই গণজাগৃতি মজুর স্বরাজ তবে যদি অন্ধরা আলো পায়।

২৭/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

এই বুক নদী

রঙিন পাল তুলে, কোথা তুমি যাও, পালের নাও,
আবেগ স্রোত বহে হেলেদোলে, বলে দুঃখের কথা ভুলে যাও ।
নিয়ে যাও ও পালের নাও, বিশাল নদী, বুকে
তুমি দিশারী তুমি চোখে দাও আলোক, লোকে লোকে ।
দাও এক মদিরা নেশা শুধু অপলক নেত্রে হেরি তব,
কী আমেজ, কী আবেগ, কী আনন্দ, ঝরে নব ।
আত্ম হারা হই যবে হেরি সারি সারি গাঁওগুলি,
দূরে দাঁড়িয়ে আছে কত সুন্দর সবুজের ঢেউ তুলি ।
মন চায় তব বুক, কাটাই সারা জীবন আনন্দে চড়ি,
দেখ দেখ নীলিমা কয় কথা সারা দিন ভরি ।
ভেঙ্গে ঘর-বাড়ী আশা, ভালবাসা সুদূরে যাও চলে যাও,
আর কি চাও, প্রিয়, তুমি, বলো, করো না গোপন, কথা দাও-
যদি চাও, দিলাম আমাকেই তারুণ্য চঞ্চল প্রাণ,
সমাজ, সংসার বুক, করে কল্কল, শুনি তব বুক রেখে কান ।

২৯/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরীর বুক ।

বলছি মিনতি করে

বোঁ বোঁ করে যন্ত্র দানব বোট চলে দ্রুত বেগে,
অথই জলরাশি কেঁপে কেঁপে ফণাতুলে বেগে।
দু'পাশের সারি সারি অটালিকা জনারণ্য,
তটিনীর ভয়ে যেন কেহ কাঁপে না কিসের জন্য ?
বলি, তব হে বিদঘুটে বিশ্রী কালোখুঁয়া শব্দ,
নদীর দু'পাশে দাঁড়িয়ে, কান্তিরূপ হলো জন্ম।
বহুদূর হলাম পার বহুক্ষণ হলো মোর তবু,
নৌবিহারের স্বাদ এক বিন্দু পাই নি, কভু।
বেলা শেষ প্রায় গোখলী লগ্ন পশ্চিমাকাশে,
কাটা, কাটা, কালোমেঘ, দেয় সে হাতছানি বাতাসে।
বলে মোরে চলে এসো দেখ সুন্দর কত,
মানুষের তৈরী কৃত্রিম বাসর ঘর-পণ্ড্রম যত।
তরঙ্গগুলির মাঝে আছে রহস্য- ছিন্ন মনে,
কে বলে ভালবাসি, আজিকার প্রযুক্তি বিংশ সনে।
আমি সেকেলে নই বলি আছে কি তব শুধু,
দেহের সঙ্কোচ, মনের মীনারে মরময় ধু ধু।
পেয়েছি অনেক সে আমার জ্ঞানেরই মুর্দা কথা,
তাই শক্তি বলে- মোর মনের সুখ কেড়ে নেবে তথা।
কে বলেছে এ যুগের গান এ যুগের ভাব, ভাষা,
সবই গদ্যময়- জ্যোৎস্নার মোলায়েম চাঁদ, ভালবাসা
সবই হয়ে গেছে দূর-কেবল সুখের উন্নত বাসা
কোথা সুখ আর দুঃখ জানে কি ঐ জ্ঞানহীন চাষা ?
আমার আজ ভাল লাগছে মৃদু সমীরণ নদীর,
ভাল লাগছে মানুষের কান- যে সে আজ বধির।
করুণা মাগি না তব কাছে, দিয়েছে সুখ তাই,
মনের ভাব কেড়ে নিও না, আধুনিকতা সবটাই।
মোরে করিও না ছোট, সমাধী রচিও না মোর,
কাছে টেনে নিও- ভাবিওনা আমি অনাত্মীয় দূর।
আমার হাতে গড়া তুমি আমার কথা বলো তবে
গাহি গান সুন্দরের ভাল লাগে মনে মোর যবে
বলি হে আকাশ তুমি চলে এসো আজি,
বলি হে, যন্ত্র-যন্ত্রণা পৃথিবীর, কারো না ধোঁকাবাজি।
দু'হাত মেলে বলছি মিনতি করে, এসো, এসো
নদীর ভাঙ্গা-গড়ার মতই মর্ত্যলোক তুমি ভালবেসো।

০২/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ বুড়িগঙ্গা নদী পাথে।

আত্মার বিদ্রোহ

সন্দিগ্ধ বাতায়ন বিগুহ
মুখে পুড়ে আর-
কালো দাগ কলিজায় পেছনে তাকায়
শতাব্দী আরবার ।
আদিম সরলতায় যায় দিন যায়
দেখি অশনি ছায়া,
বিদগ্ধ বুক ঘাড়ে লয়ে শাপ যুগের
ডরাই ভূতের কায়া ।
আজও স্বপ্ন চোখে, হাতে, পায়ে
কয়েদীর ডাভাবেড়ী,
মানবেতর জীবন কেঁদে কেঁদে সার
মরতে আর কত দেরী ।
ঘাতক হাসে খিল খিল বেতমিজ,
ত্রুষ্ক আমার বুক,
বিদ্রোহ! রক্ত চাই, রক্ত চাই, হানাদার
কে আছিস পথ রুখ ।
কিয়ামত দেখিবে আত্মা আমার
মর-দেহ যাবে পঁচে,
আসিব ফিরিয়া আকাশের পেয়ালা হাতে
যাব সত্যের দূর্গ রচে ।

০৪/০৫/১৯৯২ খ্রিঃ চাঁনপুরী গেট হাউজ, ঢাকা ।

মৃত্যু শয্যায় প্রলাপ

আমার আত্মার চির আত্মীয়, গো
ঘন সবুজ বন উদার নীলিমা প্রিয়ো,
মানুষ অবতার কলি যুগে জানিও।

তোমাদের হেঁতা পড়েছে ফাঁদে,
সংসার যন্ত্রণা আজ বুলিছে কাঁধে,
ভুবনের ব্যর্থতা জঞ্জাল বাধে।

উদাসীন কবিবর এত দিন,
দূর থেকে বাজাত মানব বীণ,
রেখে যেত তোমাদের স্মৃতি চিন্।

দিবে কি ঠাঁই তোমাদের সাথে,
মেঘ ঘন ঘোর আঁধার রাতে,
পিশাচ যখন আনন্দে মাতে।

আর আমি রহিব না দূরে,
গান গাহিব দুঃখ রাগিনী সুরে,
মরিতে চাহিব আমি খুড়ে খুড়ে।

শুধু আশা আর কিছু মনে নাই,
শূল বিদ্ধ আসামীর মত চলে যাই,
মৃত্যুর কাল সাগরে নিয়েছি ঠাঁই।

কোথা মোর দোয়েল কোয়েল পাপিয়া,
দেখ চেয়ে দেখ পৃথিবী উঠিল কাঁপিয়া,
মোর ভীত কণ্ঠে কারা ধরে চাপিয়া।

কোথা ওগো শিখর হিমাদ্রির,
অসংখ্য অজগর সর্প করেছে ভীড়,
অসংখ্য শকুন রক্ত মাংশ করছে চীর ।

আমি ভালবাসি হৃদয়কে বলে,
যত হীনচেতার পা যায় রে টলে,
আমাকে পিষতে আসে পায়ে দলে ।

আজি শোক জোয়ার বহিছে সবার মনে,
মোর হৃদয়ে শোক জাগিছে ক্ষণে ক্ষণে,
গ্রাস করিছে আঁধার ব্যস্ত আত্ম হননে ।

কেন কেন কেন সে দিকে তাকাই,
মোর চোখের মণি কেবলি হারাই,
শূন্য হাতে ফিরে আসি হাত বাড়াই ।

আমি জুড়াতে চাই হৃদয়ের জ্বালা,
ওই দেখছি হতাশন, শালা
ভীষণ ভয়ে মুখে পড়েছে তালা ।

কোথা জুড়াব জ্বালা, কোথা বল সুদূর,
যেথা চিরদিন মিলি হাত বেদনা বিধূর,
আজ ফিরায়েও না যন্ত্রণাবিন্দু হৃদয় মোর ।

কাব্যেছ- কারাগারে কল্পনা

আমি মরিব তোমার কোলে ওগো নদীজল,
মজিব আমি পাখির সাথে করি কোলাহল,
দাও ঠাঁই, চাহি না সংসার চাহি না ধনানল।

ওগো আমার অব্যক্ত শতরূপ প্রকৃতি,
প্রেয়সি তুমি কেঁদেছি নানা আকৃতি,
মনের শান্ত্বনা তুমি, করিব না বিকৃতি।

এসো মোর মনে এসো সঙ্গোপনে,
একে একে দিব সব হারিব না জীবন রণে,
সাধনা মোর এসো আরাধ্য পণে।

০৭/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হে অপাংক্তেয়

জানি আমি অপাংক্তেয় তোমাদের নৃত্য কোলাহল ঘরে,
আমার ঘরখানি বালুচরে দাঁড়িয়ে বড়ো সে নড়বড়ে।
জানি ঠাঁই নাই ওসব জঞ্জালের দাজ্জালের মন্ত্রণা সভায়,
তাই নাহি চাহি অনুগ্রহ কারো নাহি ব্যস্ত শান্তনা লভায়।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমি একাকার করিব যত নাট্যশালা,
আমি খুনী, যত পামর মারিয়া জুড়াব বিক্ষুব্ধ মনের জ্বালা।
পথে হেটে হেটে আমি পাই অসীম শক্তি ক্ষুধাকাতর,
ভাঙ্গিয়া সব কারাগার উদ্ধার করিব মানবতা আমি পরশপাথর।
ওরে বিশ্বের যত ভুখা নাক্সা যত তৃষ্ণার্ত শুক পাখি,
দেখিস্ কী রে শয়তানের ঘরে অভিশপ্ত কপালে হাত রাখি।
অস্ত্র তোল ফাঁসিতে ঝুল কর্ মিছিল এক সাথে,
বয়কট কর দুঃখের চালান মার সব পানি রুটি-ভাতে।
আপনার ঘরে জ্বালিয়ে দে পিদিম এই মহা অন্ধকারে,
উর্ধ্বে দেখ্ হাসিছে পাষণ ভগবান, লজ্জাহীন বারে বারে।
পুড়ে মর্ তৈরী কর্ নরক পুরী ছিন্ন কর আত্মীয়তা সব,
কোথা আছে অডিথিউস, এস্থার ডাক্ দে তোন্ হংকার রব।
এবার চল্ সুমুখে ডাকে নবযুগ, দ্বিধাহীন অকুতোভয় চিন্তে,
আগুন জ্বালা, আগুন, আগুন, ঐ সব নরক হারাম বিত্তে।
ক্ষতি কি, নাহি কেহ তোন্ আপনার নাহি প্রাণে সুখ,
দেখ্ না চেয়ে হাত বাড়িয়ে আছে সোহাগে, সবুজ মুক।
মহ্ন করি অমৃত সুধা প্রকৃতি সুন্দর হতে মেলি কর,
মুক্ত কর্ বিশ্ব, পাপ গ্লানি হতে, হে ক্ষুধার্ত শক্তিধর।

১৪/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

করাগারে কল্পনা

ঘুরে ফিরে হৃদয় কথা কয়ে যায় বিরান ধরায়,
বমি করে কথার ভাত-দুর্ভিক্ষের চৈত্র খরায়।
বর্ষ আসে ঘুরে, আষাঢ় যেন কান্নার মাস,
ভাদ্র বাজার দর ভ্যাপসা গরম অর্থনীতির দ্রাস।
হতাশার কার্তিক বয়ে যায় গৌঁফ দাঁড়ি পাকে,
হল না জীবনে কিছু, সংসারে কে কার খবর রাখে।
হেমন্ত আসে বড়লোকের ঘরে, আমি বাগাড়ে কাক,
শীর্ণ শরীর চোখ বুঁজে থাকি, বুঝি যায় দুরাচার যাক।
বিচিত্র মন আমার, তার নাই অভাব ফুটে, ঝরে,
বিদ্রোহ জাগে, ইচ্ছে করে সব নিয়ে যাই ধরে।
রাখি কাল্পনার করাগারে ফাঁসি দিই, আদালতে,
দুরছাই, হৃদয় কেন স্নেহ ফেরি করে সমাজের রথে।
কুষ্ঠ কাঠিন্য ধরা হৃদয় মিছে ধর্ম সংসার ঘর,
খেয়ে দেয়ে চলা যায়- যায়না পাওয়া গুন কন্যা বর।
কখনও হই উদাস, অবসর কাটে ভালই আবার ফিরে,
আসিলে কাজে স্বাধীনতার আকাশ, মেঘে রাখে ঘিরে।
হোচটা খাই জীবনের পথে, ভাল কল্পনার বাঁচা দায়,
আমি আসামী হই, কল্পনার শরীর বেধড়ক মার খায়।
আনীত হই দুষ্টলোকের করাগারে, রক্তে ভরা দেহ,
ঘুণে ধরা সমাজ হৃদয় শূন্যে বুলিয়ে রাখে আমার দেহ।
বা রে এমন জানিলে আসিতাম না মায়ের জটর হতে,
এত রক্ত ঝরে বুকে, বিদীর্ণ কল্পনার জীবন চলার পথে।
কিসের শূনি এত চিৎকার বিস্ময়ে জানালায় তাকাই,
তারারা ঘুমাঘুমি করে, সূর্য দাঁড়িয়ে আছে ঝগড়া পাকাই।
একি অদ্ভুত করাগার এখন ভোগ করছি আমি, দূরন্ত আমি
তার চেয়ে ফাঁসি হলে ভাল হতো, বাকরুদ্ধ, দম গেছে থামি।
দেহের করাগারে কল্পনা নগ্ন পায়ে হাঁটা হাঁটি করে,
লম্বা দাঁড়ি গৌঁফ আদর্শ চিক্ চিক্ করছে দৃগু মুখের 'পরে।
ঘুম ঘোরে স্বপ্নে দেখে অসংখ্য ফুটফুটে স্বর্গীয় শিশু,

ধবধবে সাদা পোষাকে, প্রার্থনারত ক্রশবিদ্ধ যীশু ।
সবুজ আর সবুজ অসংখ্য কুঁড়েঘর ডাল-ভাত-শাক থালা,
অসংখ্য মুজিবের ছবি, স্বাধীনতা জ্ঞান ও উন্নতির পাঠশালা ।
জেগে দেখে মেঝেতে হাত বিছিয়ে শুয়ে আছে হায়,
দাঁড়িয়ে কাছে রক্ষী, চোখে জানালার শিক ডান্ডাবেড়ী পায় ।
বুকের ব্যথা বাড়িয়াছে, যক্ষ্মার রক্ত গল্ গল্ বেব করে,
কারাগারে কল্লনা এ রকম বেঁচে আছে মুখ থুবড়ে পড়ে ।

২৩/১২/১৯৯২ খ্রিঃ বালুর চর, বঙ্গনগর, ঢাকা ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না(১৯৮৭-১৯৮৮)

পথিক

হিমাদ্রী চূড়ায় জন্ম আমার;
জীবনের আঁকাবাঁকা টিলার পথের উদ্দাম তেজস্বী পথিক
আমি কালনাগ-কখনও ধর্মের ঘরে ঢুকি আমি
খেয়ালি, বিষাক্ত ছোবল দিয়ে বেরিয়ে আসি মুক্ত
পক্ষ বিহঙ্গ খোলাকাশে-

কখনও আঁকড়ে ধরি পেঁচিয়ে শিক্ষার দেহ, দিনের
আলোকে দেখিতে পাই না, আঁধার আলো মেশানো
জ্যোৎস্না রাতে প্রখর হয় আমার ইচ্ছার
দৃষ্টি, আবারও ফণা তুলি বাধাধরা জীবনের
গায়ে ফুটাই আমার বিষ দাঁত।

আমি জানি না কোথা আমার যেতে হবে, কোথা
ফেলে, রেখে এসেছি আমার মোক্ষমণি, খোলস
পালটিয়ে চঞ্চল ঝর্ণা ধারার সাথে ভেসে
চলি আমি বন্ধনহীন মহাসাগরের পথে-

ক্লান্তির চৈতন্য সাফ খেয়ে ফেলি, আমার বিষতলি
পৃথিবীর তাবৎ দুঃখের কীট দিয়ে ভরেছি।
বয়সের ঘোড়ায় চড়ে আমি অনেক দেখেছি
নিচাশয় কুৎসিৎ পেত্নীর জঘন্য-
সংস্কারের রূপ।

এসেছিলাম পৃথিবীকে ভালবাসতে;
আমার ভালবাসার দেবতা যখন পূজার অর্ঘ্য
পেলনা-

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

যখন রক্তাক্ত হৃদয় নিরাশ উদ্বেগে অনন্ত-
আকাশের বুকে উড্ডীয়মান ড্রাগন কাঁতরাচ্ছে-
যখন বৈষয়িক প্রতারণার নেউল আঁচড় কাটল
তখন আমার আগুন-জ্বালা চেতনার হাত-পায়ে-
তখন আমার ফণা ক্ষুর মন খেতে চায়, শুধু
খেতেই চায়, সভ্যতা- সংস্কারের ভালবাসা-
হীন সমস্ত শরীর-

আপন চোখের আলো দিয়ে পরখ করে করে
শেষ ছোবল দেবোই কুচক্র মগজে-

তারপর হারিয়ে যাব, পথিক কালের গুহায়
ঘুমাব, বড়ো ঘুম কাতর আমি
স্মৃতির গালিচায়, চির শয্যায় ।

১৪/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

স্মৃতি স্তম্ভ

ইঞ্জিনের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ আর শকুনের ক্রন্দন,
যেন বুলেট বিদ্ধ বক্ষ পিঞ্জরের শোনিতির টগবগ্ করা রন্ধন-
বিনিম্দ্ৰ রজনী কেটেছে গেরিলার, কত বনে বনে উৎপাতি,
তাদের রক্ত দানে রক্ষে পেল, এই শোষিত বাঙ্গালী জাতি ।
শত্রু শিবির ধ্বংস করে, বেঁধে বুকে 'মাইন,' কে লড়ে,
সুখের অট্টালিকা গড়েছে মিস্ত্রী থেকে মাটির উপরে ।
বেদনা- আনন্দে মা মুহ্যমান, দেখো পাথরের মত,
যুদ্ধে হারানো সে ছেলে, বীরবাহু, চোখে ভাসে ছবি কত ।
আমি পারি না, পারি না ভুলিতে, কখনও সেই মানিক জোড়,
সারারাত ছিল বুকে, বিহঙ্গ কূজনে জেগে, চলে গেল দূর ।
আশীর্বাদ করো মা বলে, চলে গেলো মুছে অশ্রু জল,
বিজয় গৌরব ছিনিয়ে এনো- ঈশ্বর দেবে বাহুতে বল ।
সত্যিই লড়িতে লড়িতে রক্তাক্ত করি, মৃত্যু কোলে পাঠালে বর্বরে,
আর শংকিত ভীরা, চেষ্টিয়ে উঠিল, আত্মসমর্পণ স্বরে ।
হায় পবিত্র সে যুদ্ধে, হঠাৎ আঘাতে চলে গেল ভাই,
আজ সে ভাইয়ের সম্মানে, স্মৃতি স্তম্ভ করে শাক্তনা পাই ।

২৭/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ কোমরগঞ্জ, ঢাকা ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১০৫

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

প্রান্তর

হে প্রান্তর, এতদিন ছিলে তুমি পানির তলে,
সবুজ ধান্যে ভরা- আঁখি লাগা টলমলে ।
আজ একি দেখি, নয়ন ভরে না দেখে, তব
হেমন্তে আজ কত যে সেজেছো বধূ রূপে, নব ।
রবিশস্য বুন্ছে কৃষাণ নিজ হাতে,
কৃষাণী এসেছে ধারে, আহলাদে মাতে ।
নদী তীরে গ্রামের মেয়ে কাজল কালো,
উত্তর পবনে উড়ছে, তার ওড়না লাল সালো ।
মাষ্টলে লাগিয়ে তরণীর পাল,
দেখি, নদীতে জেলে ফেলে তার জাল ।
কে নব উদ্যোগে, নবান্ন পিঠা খেয়ে,
যায় ন্যাড়া বোঝা নিয়ে, প্রান্তর বেয়ে ।
চলে আহলাদে কৃষাণ-ছেলে,
রাখাল চড়ায় বেণু হেসে খেলে ।
টানছে গুন মাঝিরা, কষ্ট কত,
পালে ধরলে বাতাস. খাটে না আর অত ।
কলস নিয়ে খেলে, বালিকা মাথায় তার,
ভিজে ভিজে সে, জলমুখ করে ভার ।
মনোরম নালে কেউবা তনু সাবানে মাখছে,
চকচকে রৌদ্রে. বুকে গামছা রাখছে ।
নীল অন্ধরে চেয়ে বলে, আহ্‌ রাম!
ভিজে গেছে গেঞ্জি, খুলে দে ছেলে, থাম্ ।
মুচকি হাসি দিয়ে আবার হয় ব্যস্ত কাজে,
একমনে করে কাজ, ভাবেনা আজেবাজে ।
সময় হইল স্নানের, ফিরিতে হইবে বাড়ি,
কৃষাণী রহিয়াছে আজ অপেক্ষায় তারি ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

নেই চিন্তা নেই, ক্ষুধা, নেই অবসাদ যার,
আছাড় খেয়ে পাটমূলে ষোড়শীর মুখ ভার,
শুষ্ক শরীর, বাতাসে উড়ানো চুল, কালো চোখ,
ছড়ি হাতে নাড়ি তবু মনে খোঁজে আনন্দলোক ।
ধীরে হেঁটে যায়, এই বেলা, গাঁয়ের ছেলে,
নির্মল সুখী সেই, ভবে অনাদর অবহেলে ।
শাকান্ন আছে ঘরে, হেমন্ত, হেমন্ত আজ,
নূতন রূপে কিশলয় সেজেছে নতুন সাজ ।
খোসা ভরে বিক্রয় করে ধান, আনবে শাড়ি,
মহানন্দ মনে, ফিরবে ছক্কু মিয়া বাড়ি ।
প্রিয়া আসবে না কাছে তার, অভিমান করে,
পিছু গিয়ে সোহাগে চুম্বনে দেবে সে ভরে ।
সে বেলায় দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু মুছি,
সলাজে মাথায় কাপড় তুলি করে কদমবুছি ।
বলে, না-না কত যে কষ্ট করেছে, বছর সারা,
ছিন্ন কাপড়ে কেঁদে, আজ খুশিতে আত্মহারা ।
সেদিন মিয়া আসিল নিয়া জর্জেট শাড়ী,
পরে আসিল বধু কাছে তার, লাজে মরে ভারী ।
মরিয়া যাই হয়, কপালে কি আছে নারী
মাটির মানুষ, সহ্য করিলে বঞ্চনা নেয় কাড়ি-
পাখিরা বসিল বীথি বরা বিটপ শাখে-
কূজন কাকলী বিজন দুপুরে কলসি কাঁখে-
নদী তীরে বধু জল আনিতে ধীর পদে যায়,
নূতন শাড়ী তার উড়ে আজ উত্তরী বায় ।
সুখের শিহরণ জাগে, আজ হৃদয়ে তার,
ডেকে কৃষ্ণাণ, দেখে স্ত্রীর সুন্দর বাহার ।
জড়াজড়ি করে, চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় মন,
তারপর উদাস নেত্রে দেখে প্রান্তর শালবন ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

বিরাট গগন তলে, সবুজে ঘেরা এই মাঠ,
সাঁজিয়ে রাখা নকশী করা নবরূপ খাট-
শুয়ে দেখি আহা, শান্তি কত দূর্বাঘাস,
এমন করেই যদি রচিত হতো, ক্ষিতির বাস।
কানন সাঁজিয়ে মানুষ তার হইল রক্ষক,
আহা নির্দয় আচরণ, হলো যে তার ভক্ষক।
প্রকৃতির অযত্ন সজ্জিত সে কাননে ঘুরি,
কল্পনার পাখায় করে ভর, যতদূর সম্ভব উড়ি-
নাই ভয়, লাজ, গর্ব দৈন্য মজা, আজ সাজা
ফুটা বনফুল খোঁপায় বেঁধে বধূ রাখে তাজা।
ওগো প্রিয়, দেখাব তোমায় জীর্ণ সে ঘরে,
বিছিয়ে পাটি নবান্ন খাব কনে আর বরে।

ইচ্ছে হলে যাব চলে ঐ সে বনের ধারে,
সুফলা মাঠ, হাতছানি দিয়ে ডাকে, বারেবারে।
প্রেম ডোরে বেঁধে রাখে, মন ও প্রকৃতি তার,
প্রান্তরের শত রূপে পাগল হই, মজে আরবার।

২৭/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

উষা

তমসাচ্ছন্ন নিবিড় সন্ধ্যায় রক্তিম গগণ,
আমি হাতছানি দিয়ে ডাকি, ওরে পাগল পবন-
থাম থাম ঘুরেছিস আর কত, সারাদিন,
এ বেলা হবে কথা, আমার সাথে বাঁজিয়ে বীণ।
উতলা হয়ে কোথা যাইতে চাহিস, বল, ওরে বল,
এসো, তব সাথে কহি কথা, আঁখি করে ছল্‌ছল্‌।

তুমি জীবন যুদ্ধে বাঁধা সদা লড়েছ একেলা,
সন্ধ্যায় দেখেছি তোমার রূপ, না করি হেলা।
তোমার সাধনায় একদা জেগেছিল, রবি বর,
সারাদিন সে দিয়েছিল, ভালবেসে তার কর।

এখন সে গেছে চলে আপন অভিলাষে, সে লুকায়,
আর সে দেখিবে না তারে, বিটপের ফুল থোকায়।
হে অরুণ বিজয়ী উষা, আবার ফিরে এসো,
পৃথিবী তোমার সন্তানকে গভীর ভালবেসো।
তোমার সাধনায় আমি আছি পথ চেয়ে, হে রবি,
ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারে কল্পনায় জাগে ছবি।

হে তারুণ্য চঞ্চল উষা, বীর মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গ মা'র,
আজ বিনিম্দ্ৰ রজনী কাটানু, তব না দেখে আর।
তব আশায় পথ চেয়ে আছি, আমার প্রিয় উষা,
তোমার মুখ 'পর কবে শোভা পাবে, নূরে-মুসা।

০২/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ভুবন বাগান

শীতের হিমেল আমেজে আনত,
নয়নে অধরে মুচকি হাসি,
মৃদু বায়ু তাড়নে বেরিয়ে আসে
বুক হতে, আমি তোমায় ভালবাসি।
নাম না জানা অসংখ্য ফুল ফোটে,
নদী তটে কিংবা ডোবার ধারে,
মননশীল মনের-চোখের, পথিকের
বা ডানা মেলে ভ্রমর বারে বারে-
আছাড় খায় মহা উল্লাসে-বেদনায়
কত কি ভাবে কল্পনার জালে।
শব্দহীন সুর ভেসে আসে হৃদয় হতে
ভাবুক কবি ছন্দে ছন্দে তালে তালে-
আঁকে বিচিত্র জগত ছবি-স্বর্গের
যেথায় ভালবাসা আর স্নেহ রস
করছে বিরাজ মর্তের 'পরে অনায়াসে;
কবি, চাহে না কখনও তার যশ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

স্বর্গ রাজ্য করিব রচনা হৃদয়ে হৃদয়
রেখে, ক্লান্ত ধরণীর 'পরে ।
ফুল বাগানে নিষ্পাপ প্রেমিক প্রেমিকা
মজা করে একে অপরে কাছে ধরে ।
আসুক বরা, আসুক মৃত্যু নাই ভয়,
নাই ক্রন্দন প্রতিঘাতে-আঘাতে,
বিষয় অনলে দগ্ধীভূত ভোগী পাপী যে,
পারে কি, তার শক্ত হিয়ায় সুখ জাগাতে?
না-না আমি চৈত্রেয় প্রখর অরুণ কর মাঝে
জমির আ'লের 'পরে ফোটা ফুল,
নর-নারী মধুকর-ফুলে ভুবন বাগান ভরা
এস্বর্গে আছি তাই, শীত শরৎ বসন্ত অতুল ।

০৯/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

নীরব প্রেম

মরি আমি ভীষণ লাজে, এরূপ করা কি সাজে,
হৃদয় নাচে রে, প্রেমের নাচন,
তাই হাতে বাঁশি নিয়ে, সুর তোলে কম্পমান হিয়ে,
বুক ফাটে বের হয় না মুখ বচন ।
কোন দিকে খেয়াল নাই, আপনি আছি আপনাতে করে ঠাই,
হাতে লয়ে বাঁশি কৃষ্ণচূড়ার তলে,
এলোচুল কাজল কালি সম, দেখাতে চাই রূপ মাধুরী মম,
ছুটে আসে রসিক শেখর কোন্ ছলে ।
পাই না স্বস্তি পাই না আদর, লোকে বলে, পাগল বাঁদর,
যৌবনে তুলি সজোরে ঢেউ,
বলো না কাছে এসে কথা, হায়রে, কি করি বল তা,
বুঝেছি তুমি আমার নহ কেউ ।
আসিলে না কাছে মোর, রাখিলে মোরে করি দূর-
এ তোমার বল, শেখর, কোন্ ছলনা,
চলে যাই আমি চাহি না তব, তোমার সনে কথা নাহি কব,
যতই প্রেম আগুনে পুড়ে জ্বল না ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

হেন কালে আমি কল্পনার কবি, হৃদয়ে এঁকেছিলাম যার ছবি,
ভাব রসে অবগাহি আমি কাছে,
অশরীরী রূপ নিয়ে হৃদয় দ্বারে, এনেছি আঘাত আমি বারে বারে,
দুঃপ্রাণ একই সূত্রে বাঁধা আছে-
তুমি নারী, তাই পেয়েছিলে ভয়, অযথা হতেছে কেবল রূপ ক্ষয়,
দেখ না কেন, কারো, সন্মুখে মোর-
কল্পনায় যদি দেখিতে মম, পাইতে মোরে পূর্ণ চন্দ্র সম,
স্বপনে পেতে শান্ত্বনা, ভাস্কিত ঘুম ঘোর।
জানি হে জানি, বলিবে না মোরে, সে বীণ বাজালে, কোন্ সে সুরে,
হৃদয় কথা তব, হৃদয়েই থাক্,
এমন করে জগতে চলে প্রেম অভিসার, বাস্তবে পায় না, প্রেম ছবি তার,
এ জগতে নেই বুঝি, প্রেমের ডাক।
কবির সदा চন্দ্র প্রেমে পড়ে, বুকে হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে,
চিরকাল নিতেছে টেনে, অন্তরে হয়,
চন্দ্র হেসে টলিতেছে দূরে, যামিনী শেষে চলে যায় ভোরে,
দিবসের রবিকরে, উত্তপ্ত প্রচন্ড বায়।
বলে, ভুলে যাও, ভুলে যাও, আমি যাহা করি, শশী করে নি তাও,
ভুলে যাও, ভুলে যাও তারে-
হায়, কবি আরও সযতনে সাজায়, মনের সুখে একতারা বাজায়,
শশী, আমার শশী আমার, বারে বারে-
চিৎকারে ব্যোমভেদী, কভু সে নয়, আমি ভালবাসি যারে, সে কি পর হয়?
কলঙ্ক আছে চাঁদে বলে ধরা,
জানি তাও, গাঁথে মালা তারি, কল্পনায় দেখে শোভা, গলার,
স্নিগ্ধকর বিতরণে শুধাংশু ভরা-
চাঁদ উদার, উপমা শুধু মানবে, রবি শুধু কথা বলে দানবে,
মানব রচে গৃহ চাঁদের মতন,
বৃদ্ধ সমাজের, সে দাবদাহ অরণে, কাঁদাইও না নির্মল তরণে
প্রেম জড়িয়ে গৃহ করে রাখো সযতন।
আরও কত ভাবে, কবি চিন্তে, দেখে ধরায় করুণ চিত্র নিত্য,
সেই নারীর, অবলার সেই অনুভূতি,
আধো আধো সুরে বাজিয়ে বাঁশি, দূর করো যত হিংস রাশি,
নিরব প্রেমে মানুষ দিবে আত্মাহুতি।

১৫/১২/১৯৮৬ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আবার ফিরে যাব

খেজুর বিটপে রসের হাড়ি, উষা লগ্নে আমি নামিয়ে ভারী,
মজা করে দু'গেলাস খাই,
স্ব-গ্রামে বসে বসে ভাইকে নিয়া, সোহাগে তারে বারে বারে দিয়া,
এমন সুখ বুঝি জগতে নাই।
বহুদিনের জানা শুনা গাঁও, বহিছে শীতের শীতল বাও,
হয়ত বা গুড়ের পাটালি এক,
তুলে তুলে এক হাতে আমি, খাই ও বিলাই দিবায়ামী,
প্রবাসী বন্ধু, অনুভব করে দেখ।
সুখ নীড়ে আছে দ্বন্দ, ভালবাসা দিয়া করি বন্ধ,
স্বর্গ নেমে আসে নিমেষে,
তরলতা জড়িয়ে আছে বনে, কথা কই তার সনে,
ছোকরা ঘাড়ে হাত পিষে।
আনত নয়না সুন্দরী বালিকা, বন্ধুরা করে রূপের তালিকা,
এ বেলা, আঁকি কল্পনা জাল,
বাধা, শুধু পাঠ্য বই মোর, করে, সে যে প্রেম চিন্তাদূর,
মাঝে মাঝে রাখি তার তাল।
বিরহে কাঁদে মন দূরে থাকি, অন্তরে তারে ধরে রাখি,
হতভাগা আছি, মজে কর্মে,
বহু যুগ চলে গেল মা-বাবাহীন, তার কল্পনা, হতেছে ধীরে ক্ষীণ
রেখেছে ধরে নিষ্ঠুর ধর্মে।
আশার শেষ নেই তাই, তোমার মত যদি পাই,
ছোট্ট বেলার গ্রামে যাব ফিরে,
পাইব আবার নতুন জীবন মম, পরিবেশ জানাবে স্বাগতম,
বিহঙ্গ কূজন আর আত্মীয়ের ভীড়ে।

১০/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

(সহপাঠী বন্ধুবর নূরুল ইসলাম সুজন, বারান্দী পাড়া, যশোরকে)

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

চতুর পাখি

আমি এক চতুর পাখি, খড় যোগায়ে বাসা করি শক্ত,
নিমেষে কৃজন দিয়া, টেনে আনি হরেক, ভক্ত।
কল্পনা মোর গড়িয়ে যায়, আজ বহু দূরে তাই,
উদ্ভিন্ন চিন্তে ডিম পাড়িতে বাসায় নিয়াছি ঠাই।
আসবে চোখের মনি, বিচিত্র রঙের একটি বাচ্চা,
ভুলিয়া ভুলিয়া পুণঃ দিন গুনি, মাপি সের-কাচ্চা।
দুয়ার করি বন্ধ, বলি আসিস না তোরা কেউ,
বিরক্ত লাগে বড়, বাটিতে যদি কুকুর করে ঘেউ, ঘেউ।
থাকি কড়া শাসনে বাবার, ভক্ত আমি ঈশ্বরের ভীষণ,
হৃদয়ে বড় সুখ লাগে, যখন দেখি ধর্মের কোন মিশন।
সদাই চিন্তা করি, করেছি কি, দিন তো চলে যায়,
আমার চিন্তা দেখে, পৌষের শীত মুর্ছা যায়, হয়।

খাটিতে জানি, তাই ক্ষুধা থাকে না একটুও মোর,
নানাবিধ সজি খেয়ে স্বাস্থ্য করি ভাল, করি দূর্ভাগ্য দূর।
সবে বলে, আমি চতুর পাখি, এ-ওয়ে এক বিশেষ গুণ,
দেখ সুন্দর বলাকা, উড়ে যায়, ক্ষুধার্ত চিৎকার শুন।
শোভা তো সে প্রকৃতির, আর তো সে, বটে কিছু নহে,
কল্পনা বিলাসী কবি'র শুধু সে, কল্পনায় চিরদিন রহে।

১০/১২/১৯৮৬ টিকরপুর, ঢাকা।

মা-মাটি-মানুষ একাত্ম

প্রিয়া চলে গেছে, মন ভরে না তার, আমার নিরব গানে,
আমার কবিতার ভাবে, মিশিবে না কভু হৃদয়ে বরা তানে।
যে সুর লহরী একদা বেজেছিল কবি'র মর্যাদাসিক মনে,
হঠাৎ থমকে ওঠে, ভাবে নিঃসঙ্গতা, কেটে যায় অদূর বনে।
অভিমান ভরে কবি কেঁদেছিল, কার রোমাঞ্চকর ভুবনে,
ফুঁটেছে কন্টক-ফুল বারেছে-সে বেলায়, ভয়ংকর শোভনে।
যশ বিরাগী কবি'র পাশে বসি, কতক ভক্ত জনে,
বড় ভাল তুমি, গাও আরও শুনিব, থাকিব সনে।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১১৩

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

জিতেছিল বাংলার পতঙ্গ দল, দেশ প্রেম দিয়া,
এনেছিল বিজয় মুকুট, হরষে উঠে হৃদয় নাচিয়া।
আরও শূনিব ছন্দে আমরাও ভাবি, সে যোদ্ধা দল,
জন্মিয়া মায়ের ছেলে, বীর বাহু, আশায় মা, পায় বল।
চিরদিন সুখ দিব, সম্মান দিব তার পদতলে,
মরিয়াও অমর রহিব, যোগ দিয়া যে, উত্তর পতঙ্গ দলে।
সিন্ত স্নেহের মা শ্যামল সবুজ, নীলাম্বরী পরে,
শিস দিয়া যায়, মৃদু সমীরে, রত্নগর্ভা মায়ের আনন্দ ধরে।
বুকে দুঃখ আছে, মা বলো, পাগল সে ছেলে,
ক্ষুধা আছে, প্রেরণা নাই, আপনাকে যাই অবহেলে-

রয়েছি দূরে, বহুদূরে ওরে আয়, কাছে আয়,
আত্মশক্তি নিয়ে দেখ, সরে যায়, বড় বাজা বায়।
বলে কবি সঙ্গীদের সাথে, মাটি-মানুষ-প্রেম মোহে,
একাত্ম হয়ে গেল, মিশে গেল, চিরবন্ধু তারা দোঁহে।

১২/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ভীতু প্রেমিক

ঘুমাইতেছিলাম অঘোরে, হঠাৎ কার শব্দে মোর,
ভেঙ্গে গেল ঘুম, শুনলাম কল্ কল্ হাসি অদূর।
তুফান উঠিল হৃদয়ে, সহস্র ঢেউ তাড়নে,
ভাঙ্গিতে চায় ছাতি, কোন্ সে করুণ বারণে-
উঠিতে পারিলাম না আমি, কেন যে হয়,
মানুষ হও! মানুষ হও! ভাবনায়, গভীর তাড়নায়।
আমি অস্থির চঞ্চল, প্রেম-দরিয়ায় পড়ে,
খাচ্ছি হাবুডুবু, স্নেহ জোয়ারের পানিতে লড়ে।
কেন অবুঝ হৃদয় শুধু যে, গুমরিয়া মরে-
সামলাতে নাই পারিলে, ডুবিল যে চির তরে।
কবি তুমি, জান কল্পনা করিলে হৃদয় ভর,
যারে দেখ কল্পনায়-স্বপনে কেঁদে হও, বার বার।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

কাটে না রজনী, কাটে না সময় যে হয়,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় বাহনে, বিরাট বোঝা রাখা দায়।
অসহায় আমি, বলিতে পারি না যে কথা,
হৃদয়ে তবু বাজে যেন, কিসের অসহ ব্যথা।
কোন সে নারী, আসিলে অসময়ে, মনের কাছে,
ভয়ে পালাই ছুটে, তবু মনে, আসে পাছে পাছে।

১২/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কণ্ঠহার

এ ভুবনের অতুল সৌন্দর্য রাশি আজ কত জনে,
করে উপভোগ-স্বস্তির নিঃশ্বাসে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে?
শুধু জ্বালা ক্ষুধার, ব্যথার, দুঃখের, মধ্যবিন্তের,
সকল স্বপ্ন স্বর্গ চেতনা, আজ বিলুপ্ত তার চিত্তের।

কেউ কেউ শুধু পায়, কৃত্রিম সুখ গড়া অউল্কার,
তারা মেতে উঠে মদালসে ঘটে না মনের বিকার।
আমরা শুধু আশা করি, কিছু দিনের হয় তাই,
হিসসা ছেড়ে সুখের ছেড়া বিছানায় ঘুমিয়ে যাই।

সন্ন্যাসীর সংখ্যা কত কম-তাই বিষয় অনুরাগী-
ভাবে ঈশ্বরের কৃপা পেতে, দোয়া করে স্বর্গের লাগি।
হৃদয় মানেই চায়, হাসি উপভোগ, কত বল্গাহীন,
বুড়োরা নিরস প্রাণে বাজায় মনোযোগে ধর্মবীণ।

যারা আমারই মত যারা দেখে সন্ধ্যার নির্মল রূপ,
আত্মগত তিমিরে তৃপ্তি পায়-মুখ থাকে নিশ্চুপ।
বুক খুলে বলি ওগো মানুষ, দেখো শুধু একবার,
ঝরে খুন হৃদয় হতে-দারিদ্র্য হলো মোর কণ্ঠহার।

১৩/১২/১৯৮৬ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

কৃষ্ণ চূড়ঙ্গনে স্থপতি

এক কবি'র কল্পনার বেড়াজালে
একদল উষ্ণ তরুণ,
বলাকা সম বিচরণ করে
প্রাণের উদ্দামতার দরুণ।
তারা উচ্ছল, চঞ্চল, ভক্তি ভরে
সেই কবি'রে হৃদয়ে পুষে,
বানিয়েছে কৃষ্ণ চূড়ঙ্গন, করে
লালন সংস্কৃতি-আদর্শ চুষে।
লও হৃদয়ার্য্য, শ্রদ্ধাঞ্জলী
ওগো মহান যোদ্ধা সংগ্রামী,
বঙ্গ মাতার তাজা ছেলের
উষ্ণ রক্তের ছড়াছড়ি দিবাযামী।
বঙ্গ বনভূমে ত্যাগী প্রাণ
মিশে গেছে কত মাটির সাথে,
সেই করুণ অনুভূতিতে যুবদল
শোকের মালা গাঁথে।
মহান স্থাপতি বাংলার শেখ মুজিব
দূদর্শ ছেলের কথা ভাবি,
কুচকাওয়াজ নতুন খুনের নতুন
আয়, আয় তোরা কে যাবি।

১৫/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

বাবার মেলা

আজ আনন্দের জোয়ার বইছে সবার মনে,
বর্ষব্যাপী পুঞ্জীভূত সুখ বের হচ্ছে ক্ষণে, ক্ষণে।
আয়, আয় তোরা আবালবৃদ্ধবনিতা আয়,
দেখ দূরে শীতের উত্তরী বায় কেমনে বয়ে যায়।
কিসের আনন্দে মাতিছে মানুষ, জানি না, জানি না,
ধর্মদ্বন্দ্ব ভুলে একাকার হই, মানি না দ্বন্দ্ব, মানি না।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১১৬

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

কারো উপদেশ, কারো গোরামী শুধু হৃদয়-
ভাবিয়া বাঁচিয়া আনি, সুখ হয় মনে উদয়,
পূর্ণ চন্দ্র যখন হেঁসে উঠিল, কল্ কল্ কল্,
জনতার স্রোত নামছে হেথায়, ঢল্ ঢল্ ঢল্ ।
শিশুরা কিনে খেলনা মাটির পুতুল নয়,
ষোড়শীরা সজ্জিতা, অপূৰ্বা, চোখে তার ছল ।

হৃদয়ে প্রেমের আবেগ, তাই কিনে আলতা মালা,
সখিরা হাসিয়া মরে কত সুন্দর, কিনে বালা,
কিশোরের হাতে লাল বেলুন, উড়াইয়া চলে,
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশে অঙ্গভঙ্গিতে সে টলে ।
যুবরা দল বেঁধে যায়, রাখি এ-ওর গায়ে হাত,
দেখে নারী অঙ্গুলি নেড়ে, হেসে ওঠে অকস্মাৎ ।
প্রৌঢ়া মান্নত্ নিয়ে যায় পীরের মাজারে,
নতমুখী নববধু লজ্জা পায়, যেতে মেলা বাজারে ।
বিষয়ী মহাজন লাঠি হাতে, চিবিয়ে লাল পান,
'লাইট' হাতে যায় সে, মেলায় সিনা করে টান্ ।
ছা-পোষা চাষী সে কোলে করে তার নবজাত,
ঝানঝনি কিনে দেয় হাতে কত সুখ, ও, নাথ ।

আয় তোরা, আয় দেখিবে সেথায় সন্ন্যাসী দলে,
করছে গান, প্রেম-বিরহের, নিমজ্জিত ভাব-অতলে ।
কলিকা-হুকা দিয়ে ধুম ছেড়ে বলে ও আয় বাবা,
চোখ বুজে, কল্পনায় পায় ওই বাবার হাতের থাবা ।

ঘুরিয়া সেই বাবার দরগায় দেখি কত জনে,
চেয়ে আছে বসে মনের আশায় ক্ষণে ক্ষণে-
ভক্তি রসে আপুত করে, কভু নত করে তার শির,
কি এক আকর্ষণে যায় সে, ঠেলিয়া লোকের ভীড় ।
বিহঙ্গ কূজনে ছানারে যেন ডেকে আনে কাছে-
সত্য বলে, সর্বধর্মের লোকেরা ওখানে বসে কাছে ।
সন্তানসম চাচ্ছে সব, বিনয়ে বাবা দাও, কিছু দাও-
আমার যা আছে বাবা, তোমায় দিয়ে দেব তাও ।

২৬/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১১৭

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

এই বুকে থাকিয়াই

সরষে ফুলরাজির আঁষটে গন্ধে ভরা মৃদু মলয়ে,
কী মধুর লাগে পৌষের নির্মল চকে-দিক বলয়ে।
আছে গাঁওগুলি মাঝে মাঝে উড়ছি বক্ সারস চিল,
সঁয়াতসঁয়াতে ধান জমিনে কচুরি খুঁজে জীবনের মিল।
ক্ষুদ্র বালক বালিকারা ধরছে মাছ ডোবার সে জলে,
ঝাপটি মেরে চলছে চাষী, দু'পায়ে কাদা ঢেলা দলে।
ধবল চড়ে সকালের শিশির ভেজা মোলায়েম ঘাসে-
জেলে টানে জাল তারা খোলা মনে হাসে আর কাশে।
আমার গায়ে কুষ্ঠ রোগ, নেই বস্ত্র নেই সম্মান মান-
জীবনের অন্ন পরীক্ষা না দিলে কোথা পাব স্থান।
তুমি আমার নহ, হে অযত্ন সজ্জিত স্বর্গদেবীকুল,
তুমি শুধু ফুটিয়া থাকা, জীবন দর্শন বাধা অতুল।
তবু সারাদিন খাটিয়া তোমার কোলে ঘুমাতে চাই,
মাটির গন্ধ শুকিব শেষ নিঃশ্বাসে, এই বুকে থাকিয়াই।

২৭/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ বেনুখালী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

কাঁপিয়া ওঠে

পূর্ব গগনে উদিত মোলায়েম উষায় রক্তিম রবি,
নদীর 'পরে স্বচ্ছ সলিলে যেন লাল ছুরির ছবি।
একধারে জেলে বধূরা মাজছে তার বাসী হাড়ি,
হাঁসগুলো ভাসছে সাথেই, শাদা পালক নাড়ি।
ওদিকে দেখি ধূ ধূ মাঠ, কুয়াশার চাদরে ঢাকা,
কনকনে পৌষের শীতের ভোর যেন মধু-মাখা।
কর্মের আয়োজন চলছে ঘুম-উঠা, সব নরে নরে,
নানা মতে নানা জন কাজে যায়, নৌকায় চড়ে।
যামিনী ভরে কাকের ডাক ছিল না, এখন মনে হয়,
যত বাড়ে সময় তত যন্ত্রের আগমনী শুধু কথা কয়।
ইচ্ছে আমার অম্বরের মত বারির আরশি মাঝে,
সারাদিন যেন কাটে বারি-অম্বর প্রেমের সাজে।
নৌকার আঘাতে ক্ষুদ্র ঢেউ তটিনীর জল লড়িয়া,
কাঁপিয়া ওঠে উদার অম্বর, মানুষের কথা অরিয়া।

৩১/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ মরিচা, সৈয়দপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

সাঁঝের বেলা

ঘুমিয়ে যায় সবুজ, তিমিরের সাথে মিশে, মিশে,
হলদে সরিষা ফুলপাখি যেন ডাকে পথিকে শিসে।
আয়, ওরে আয়, দেখ মোরে এ বেলা কেমন,
পারি না বুলাতে আদর, প্রিয়, বুলায় যেমন।
উঁকি মেরে আবছা সাঁঝে, ডাকে বটবৃক্ষখানি,
জানি, ওরে জানি, শুধু আমাকে নেবে টানি।
সারাদিন কাটিল যার, কুটিল সংসার ধর্মে তাই,
এ সন্ধ্যা বেলায়, তোমার মত বন্ধু আর নাই।
ধব্ধবে শাদা গগন, কি বলে যায়, কি বলে যায়-
প্রান্ত মানুষ, মাটিতে শুয়ে তোমার দিকে তাকায়।
এমন শান্তি কোথা আছে বলো, তুমি বলো, বলো-
হে সন্ধ্যা, তুমি বলো, তুমি বলো, মোর কি হলো?
কে নিত খোঁজ, কে দিত শান্তির স্বর্গীয় পরশ মম,
বিষয়ের অগ্নি দাহন শেষে আলো পূর্ণ চন্দ্রসম।

৩১/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ভিক্ষুক

আমি ভিক্ষুক, ভিক্ষার বুলি কাঁধে নিয়া ঘুরি,
শান্তি আমার, আমি কখনও নাহি করি, পুকুর চুরি।
ছেঁড়া কাপড় আর ভাঙ্গা বাসন একখানি নিয়া,
তৃপ্তি সহকারে খাই, বাসী খাদ্য, শান্তি পায় হিয়া।
কৃষ্ণ কাল শরীর মম, ভাঙ্গা একখান নিঃশ্ব হাত,
রাস্তার পার্শ্বে বসে খাই, খয়রাতি সব্জি ঝোল ভাত।
চোখ দু'টো অন্ধ, আবছা, আবছা, কোন রকম দেখি,
ষষ্ঠি হাতে ভিক্ষা মাগি, সবাই বলে, এসব নাকি মেকি।
ভান করি নাকি অন্ধের, কেউ বা ধাক্কা দেয়, গলায়,
ভিক্ষে যখন করি, রাখি হাত মানুষের পায়ের তলায়।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আমার শান্তি খুঁজি, সারাদিন পেলে, মুষ্টি চাল,
এমনি করেই চলে জীবনের গাড়ী, জীবনের হাল।
আমি বুঝি না দ্বন্দ, স্বার্থ, সম্পদের পাহাড়,
আমাকে নিয়ে আমি আছি, এমন শান্তি বলো কার।

পরস্পরহরণ করি না, ভাবি না কাহাকেও পর,
জীর্ণ এক কুঠিরে থাকি, আমি শান্তির উদাত্ত কর্তৃস্বর।

০২/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ বেনুখালী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

পৌষের গাঁও

মূলার শাদা ধবধবে ফুল-পত্র আর তার মিষ্টি গন্ধ,
পৌষের দ্বি-প্রহরে প্রাণে, তোলে আমার মৃদু ছন্দ।
সবুজ পাতার নিচে ঈষদ লাল শাদা মুলা,
নরম তুলতুলে তনুর মত মনে হয়, স্নিগ্ধ শিমূল তুলা।
সরু খালখানি চলে গেছে ঐ গ্রামের পাশ দিয়া,
কোথাও জল আর কোথা ঘাস, যেন জীবন্ত টিয়া।
গাঁয়ের কাজল কালো ছেলে, থাকি নিয়া সেথায় নামে,
হাল গরু নিয়া যায় চাষী, কি জানি কি তার কামে।
বসে বসে নিরিবিলি শুনি পাখির কিচির মিচির আর,
কখনও শুনি কাকের কর্কশ ডাক, শুকুনের হাহাকার।
সরল প্রাণের গাঁয়ের গৃহবধুরা দুপুরী রান্নায় ব্যস্ত,
আঙ্গিনা সাজানো আর পানি আনা, বালিকা 'পরে ন্যস্ত।
খড় বিচালীর ওপর বসে আমি আর সতীর্থ গৌর,
মাটির 'পরে বিছানো ধূসর চাদর দিয়া দিই কল্পনা দৌড়।
হাসি আর খুশীতে ডগ্‌মগ্‌ করে পল্লীর সবুজ ছায়া,
প্রাণের সাথে কথা কয়, দে আশ্রয়, খাদ্য আর মায়া।
সবুজে ঘেরা য় আম্র বিটপ বনে আর সরষে হলুদ ফুল,
কেন জানি প্রাণ আমার সদাই করে ম্রিয়মান আবুল।

এমনি করেই যদি কীর্তিময় জীবনে, অমনি সময় হয়ে,
ওগো পল্লী মা, তব কোলে কাটাই জীবন নিতাম বয়ে-
এমন রূপ কোথা আছে, ভুবনে কোন্‌ সে দেশ,
গাঁও, এ রবি শস্য প্রান্তর, তুমি জীবনে সুখ, শান্তি অশেষ।

০৭/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ মোহনপুর, ঢাকা।

(স্নেহভাজন গৌর চন্দ্র সরকার, টিকরপুরের সৌজন্যে)

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

মহান সে জন

প্রেমের অনুভূতি গুমরিয়া মরে প্রতি ক্ষণে, ক্ষণে,
হৃদয়ের জ্বালা বেড়ে যায় আরও, আত্মহননে।
আমি শুধু বুঝি আমার এশক ব্যথা জগতে হয়,
কারুণ্য বুঝার প্রয়োজন নেই, বুঝিলেও বুঝা দায়।

মাতৃস্নেহের ক্রোড় ছাড়ি মহীতলের বাউল আমি,
একদা ঘুড়িতাম কল্পনালোকে, খুঁজে খুঁজে অন্তর্যামী।
বিভূ প্রেমের জ্বালায় জ্বলে, আমি কত অসহায় হলে,
ফিরে ফের আসি প্রাণীকূলে মাটির প্রেম পাব বলে।

ওগো মানব-মানবী-প্রকৃতি-মাটি সাথী হও সবাই,
প্রেম নেব-প্রেম দেব, ঈশ্বর খুঁজে নেব মোরা সদাই।
মানুষেই আছে ঈশ্বর, এতকাল বুঝি নি কেন হয়,
চিরন্তন আকর্ষণে মাটির মানুষ মাটিতেই চলে যায়।

প্রেমহীন বিষয় জগতের মাঝে আঘাতেও হয় হয়,
আরও বেশি করে আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যায়-
যে জন, সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ-চিরকাল থাকিবে মনে,
নৃ গাহি গান সে নামে, ফুটাবে পুষ্প পৃথ্বীর পুষ্পবনে।

০৯/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

মিশে যেতে চাই

সারি সারি কলাগাছ নিস্তর্র নির্বাক দাঁড়িয়ে,
যেন বলছে, ও ওগো মানুষ, দাও দুই হাত বাড়িয়ে।
গোধূলি লগ্নে উদার শাদা কালো কাটা গগন,
বিহঙ্গের কিচির মিচির সাঁঝে, স্থির থাকা পবন।

বলাকারা ঐ দিকে উড়ে চলে বাঁকে, বাঁকে,
কৃষাণ ছেলে দাঁড়িয়ে প্রান্তরে, গায়ে ধূলি মাখে।
বসে স্থবির স্রোতস্বতীর তীরে তীরে আমি আজ হয়,
ভাবছি জীবনের মুহূর্ত গুলো, কেমন করে চলে যায়।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

এমনি নিবিড় করে যদি আমায় সর্বদা পাই,
শত দুঃখ আঘাতেও অনুভব করি ক্লান্তি নাই।
শ্যামল সবুজ বিটপে আঁধার নামছে অতি ধীরে,
হংস পাঁক পাঁক করে সাঁঝে, বাড়ী যাবে উঠি তীরে।

মিশে যেতে চাই আঁধারে সন্ধ্যার বাড়ী যাওয়া বধু,
ঘরমুখো যেন মৌ, শুতে যাই, খেতে চাই তার মধু।
কর্ম কোলাহল শেষে প্রৌঢ় ধূতি পরে আর শুনে-
শংক ধনি ভক্তির-মনে ভগবান, প্রেমের জাল বুনে।

১১/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।
(সহপাঠী মিহির ও রেজার সৌজন্যে)

মায়াময়

গোধূলি লগ্নে পল্লীর মাঠে বসে দেখি অপরূপ শোভা,
ভেবে গাঁয়ের বিচিত্র রূপ, হয়ে যাই সত্যি আমি বোবা।
অদূরে হেরি গাঁয়ের বালিকা নকশী করা কলস নিয়া যায়,
পাশে তার, মনে হয় মা-ভাই আখ চিবিয়ে স্বাদ করে খায়।
চির পরিচিত এই ভিটা জঙ্গলের পাশে, উঁকি মারে সন্ধ্যা রবি,
এখন মনে হয় তাকে যেন সোনার খন্ড, মোলায়েম ছবি।
চন্দনা পাখির কিচির মিটির এই গম ক্ষেতের আঁলের ধারে,
ডাকে আমায় অতি কাছে, কহিতে কথা তার সাথে আড়েটারে।
গাঁয়ের এই সুখী মানুষ যায় হাটে, শীতের চাদর তার গায়ে,
ছালায় 'সেরেক' চাল-কেরোসিন বোতল হাতে, মৃদু দোল পায়ে।
শুকনো ক্ষেতের মাটির ঢেলা ও মাঝে মাঝে ছোট সবুজ খাস,
মনে হয় কৃষাণের কলিজা, চির শান্তির মনোরম নিবাস।

আজ হতে বহুদিন আগে, দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখানে যথা,
যেদিন নৈর্ব্যক্তিক ভাবিতাম, কথা-ঝরিত কল্পনা লতা।
আমার গাঁয়ের রক্তের মানুষ কোথা গেছে আজ হয়,
যেদিন তাদের বুঝিয়া চিনিয়া, চিনিয়া ছিলাম বিধায়।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আহা কি সুখ আমার শিহরণ জাগে, ও গায়ে এ সময়,
স্বর্গীয় আনন্দের ছাঁচে গড়ি আমায় ভাবে হই তনয়।
এই শুকনো ডোবার উপর জিঙ্গল দেয়া লাউয়ের মাচা,
লাউয়ের শাদা ফুলে ভরে আছে ঝুলছে লাউ সবুজ কাঁচা,
কৃষাণ ফিরছে ঘরে, গরু ছাগল নিয়া তার গায়ে লাগা হাতে,
ধরে দড়ি নিচু মুখ বেঁকে বেঁকে কত সুখ তার আছে তাতে।

দেখি, আরেক রূপ পল্লীর ঘর সারিতে একটু পরে,
চলে গেছে রবি দিয়ে গেছে আঁধার কত আদর করে।
এই সোহাগে মেতে কৃষাণ কৃষাণী দাদু ও তার ছেলে,
এক সাথে বসে খায় জ্বালিয়ে কেরোসিন কুপি, অবহেলে।
এ-ওরে বলছে ‘লও তুমি’ আহা দিলে যে আমায় ছালুন সব,
কখনও রস করে কৃষাণ ছেলে তুলছে, স্বভাবজাত হাস্যরব।
নেই বিদ্যুতের অহং, নেই খাওয়ার কাটা চামচ আর তাই,
তাদের খাওয়ার স্বাদ আর আনন্দ তো একটুও কমে নাই।
অঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে সারারাত উঠে সে অতি ভোরে,
ফের ধবল লাঙ্গল হাতে ফিরে মাঠে ওই মাঠে অদূরে।
কৃষাণী কোমরে কাপড় কষে বাঁধে উঠে চৌকির ‘পর চড়ে,
ভানে ধান-গায় শিব্গীত টেকির সাথে দু’পায়ে লড়ে।

মুমূর্ষ দাদা ভাই বয়সের ভারে নুইয়ে আজ হয়,
আল্লার কাছে আজ বুঝিরে সে, হয় চলে যায়।
গাঁয়ের মানব সব জড় হয়ে তারে দেখি বারে আসে,
পালিতা কন্যা তার দুধ সাধে, তাঁরে কত যে ভালবাসে।
‘আইলায়’ পুড়ে গেছে কোমর তার, রয়েছে মেঝেতে পড়ে,
তার সাথে সমগ্র গাঁও মুহ্যমান স্তব্ধ শোকে-পুড়ছে যেন জ্বরে।
এই তো মায়ার গাঁও একে অপরের দুঃখে দুঃখী, সুখে-সুখী,
চিরকাল এমনি করে দ্বন্দ্ব ভুলে, রক্তের ধারা থাকে লুকে।

১৫/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

(মুমূর্ষ নবোত্তাপের হাফেজ আঃ খালেক সাহেবের সৌজন্যে)

পল্লী বাড়ী

কাঁচা কাঁচা রোদ মাখা শীতের পৌষে,
আপাদমস্তক চাদর মোড়ানো কুয়াশার বৌ-সে ।
দোয়েল ডাকে পিউ পিউ উঠোনের কাছে,
বাড়িতেই আতাফলের ডালে কত ফুল আছে ।
কলার কাদিটা আঙ্গুল উঁচিয়ে ঝুলছে,
ফকির, ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে ঝুলি তার খুলছে ।
টুনটুনি দেখি অদূরে বদ্বিরাজ গাছের ‘পরে,
কিঁয়া কিঁয়া বলে আর পাশে পাট কাটি চড়ে ।
নাড়ার ঘরের ‘পরে লিচু গাছ খানি,
বার বার ও যে নিয়া যায় আমায় টানি ।
উপরে দেখি নীলাকাশ নিচে দেখি সবুজ,
ও বাড়িতে ও ও রবে চিৎকারে শিশুরা, অবুঝ ।

জমি চাষ দিয়ে ফিরে আসে চাচাতো ভাই,
ভাবী, প্রতীক্ষায় খায় নি ভাত-স্বামী খায় নি, তাই ।
বার বার মন যায় ছুটে ও জঙ্গলের, নিরবতার কাছে,
এখানে কার সাথে যেন আমার আত্মীয়তা আছে ।
আধো রোদ আধো ছায়ার গাছ গাছালির ‘পরে
তার মাঝে মনে হয়, যেন কে আত্মগোপন করে ।
বহুদিন আগে মনে পড়ে ঐ নিরীহ বনের ধারে,
কিশোরীর হরিণী আঁখি-দেখে হৃদয় কাড়ে ।
সুটোল চিবুক তার, গায়ের হলদে বরণ রঙ,
কলা গাছ হতে, কলাগাছের ফাঁকে যেত, করে কত ঢং ।
দেখিতাম শুধু কাণ্ড তার, অমন এ টুকুন মেয়ে,
কেমনে যায় অকাতরে সাদরে প্রেমের মই বেয়ে ।
মনে পড়ে, সরলা সুন্দরীর নিষ্পাপ প্রিয় হাসি,
আজ মনে হলো, বলেছিলুম দেখে, ভালবাসি ।
হয়ত বালিকা, সে দিনের, আজকে পরের ঘরে,
সংসার পেতে সন্তান রাখছে, কোলের উপরে ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

সেই খড়ি টোকাই, দু'বছর পরে, সে তো আর,
যুবতী হলে, পড়ে সবার চোখে, ঠেকে ভার।
বিয়ে হলেও, সে গাঁয়ে নবান্নে অগ্রহায়ন মাসে,
বাবা যায় আনতে তারে, নায়রি, মা তার হাসে।
বুড়া দেখি সাজছে ভারী, 'তালই' বাড়ী যাবে,
দেউড়ীর আড়ালে দাঁড়িয়ে কী জানি কি ভাবে,
স্বামীর সংগে মেয়ে আসিলে সবাই দেখতে যায়,
পল্লী বাড়ির এমন আত্মার টান, কোথা আছে হয়।

১৬/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

কই সুখ

হৃদয়ের রক্ত আর নয়নের অশ্রু মিশ্র কালি দিয়ে,
লিখি কবিতা, কই সুখ, কই সুখ, হলো তো, বোনের বিয়ে।
মানুষ আজ মানুষ চায় না, চায় যে শুধু টাকা কড়ি,
টাকা হলে মানুষ-সে যে, করে বিবেচনা, নেয় বরি।
এ কংস প্রেম, 'ভাত-ছালুনেরা' কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,
হায়, হায় জগতে এ কি নিদারুণ অর্থ খেলা চলে।
হৃদয়কে দূরে রাখে, মান সম্মান এরা বড় করে,
মনের মানুষকে কাছে নেয় না, কখনও সমাজের ডরে।

প্রাচীন কালের শাশুড়ীরা, যারা বউয়ের আদর বুঝে,
আজ দেখি তারা, আদর না খোঁজে, অর্থ শুধু খোঁজে।
অশ্রু ফেলে বুকে তার, উঠে বধূরা, শ্বশুর বাড়ি যায়,
জন্ম মায়ের কথা ভুলে-তারা নতুন মা খুঁজে পায়।
আজ দেখিলাম বোনের শ্বাশুড়ী বলে, অর্থ কড়ি চাই,
বলে, মেয়ে দেখিলাম, ওসব ছাড়া, মেয়ের প্রয়োজন নাই।
মা, ভয় পায় পাছে মেয়ের হয়, কি জানি, কি যে হয়,
আমার মেয়েকে, মানুষে, কত যে দুর্নাম, শুধু কয়।
জামাই তো সে সোনার পুতুল, বিছানায় শুয়ে খায়,
শ্বাশুড়ীর রান্না খেয়ে, বটে সুখ নিন্দ্রায় যায়।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

ঘুম থেকে উঠে বলে, আহা টাকার দরকার মোর,
কাজ নাই বড় হতে চাই, সময় নাই, বান্দানাছোড়।
টাকা পেলে রাজা হব আমি, আর বধূ হবে রাণী,
মানুষ দেবে বাহবা, সম্মান এনে দেবে যে টানি।
হায় গুপ্তধন যদি নাই পেলে, ছাপোষা শ্বশুর ঘরে,
ধ্যাৎ, বধূ, ও যেন গাছে ফাঁস দিয়ে অকালে মরে।
নাহ আসিব না এ বাড়ি, দরকার হলে অন্যত্র যাই,
মা-বাপ টাকা চায়, আমি কি আর, ওসব না চাই ?

সেই বেলা, মেয়ের বাপ, মেয়ের ইজ্জত মান ভাবি,
বোঝা টানে মেয়ের, হাতে লয়ে যৌতুকের সোনার চাবি।
চতুর্দিকে অস্ত্র হাতে টাকার সৈন্যরা ছুটাছুটি করে,
ভয়ে কম্পমান বোনের, আমার সুখ নিন্দ্রা নাহি ধরে।
কই সুখ, কই সুখ, সে তো শোক হয়ে আসে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে হায়, জীবনের সে সর্বনাশে।
এ কি বোঝা আমি পিতার, অপরাধ, কি নিয়া বাঁচি,
ঈশ্বর নারী করে জন্ম দিয়েছে, তাই সুখ নাহি পারি যাচি।
কেহ আমায় না দেখে, দেখিল শুধু বাবার টাকা,
আমার হৃদয়ের প্রেম শুধু রইল আজ আঁধারে ঢাকা।
মরিতে হইবে অকালে সমাজের নির্ধূর দুঃশাসনে,
জানি না আমায় নিয়ে ভগবান, কি করিবে, কি তার মনে।

১৬/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

শোক পংক্তিমালাঃ স্মৃতিচারণ

চোখের জলে ভাসিয়ে গেলে ওগো মহান দয়ার প্রাণ,
হৃদয় শত ধারায় উৎসারিত, পেয়ে তব মৃত্যু ভ্রাণ।
আজ বিদ্যা জগতে বিচরণ করি, ওগো চির মহান,
এ অমূল্য সম্পদ ওগো তোমারি দান, তোমারি দান।
স্বর্গ হতে খসে এসেছিলে এ ধরার এ গাঁয়ের বুকে,
সারা জীবন তুমি, ছাত্র সন্তানের মাঝে ছিলে লুকে’।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

হে প্রিয়, তোমাকে হারিয়ে আজ হলাম সর্বহারা,
শত কোটি সু-সন্তানের তুমি জন্মদাতা, তুমি শুকতারা।
রহিয়া রহিয়া কাঁদিবে এ বিদ্যাঙ্গন, ওরে আজ হতে,
হায় তুমি আজ চলে গেলে, আরোহন করে স্বর্গীয় রথে।
হে মহান পুরুষ, কি দিয়া দিব আজ তোমার পূজা,
হৃদয় ছাড়া পাই না কিছু-বিশ্ব চরাচরে সব হ'ল খুঁজা।

হে মহান পুরুষ, তব কথা বলে, এ অঙ্গনের প্রতি বালু কণা,
তোমার কফিনে আজ তারা চড়িবে আনন্দে, হে উদার মনা।
এ বিদ্যালয়, এ বিদ্যালয়, এ বিদ্যালয় শুধু তোমায় জানে,
আরও বেশি ভালবাসা দিতে চায় আরও তোমায় কাছে টানে।
দীপের মত জ্বলিয়া উঠিলে স্বর্গ হতে, ওরে তুমি আসি,
বলিলে তুমি মানুষকে, আমি শিক্ষার আলো দানে ভালবাসি।

এ আলো পেয়ে আলোকিত হলো রে চিরতরে বহুদূর,
তুমি স্বরসতীর ইংগিত, তুমি সংস্কারের বিপ্লবী সুর।
দেহ ত্যাগী আজ গেলে কোথা, বল বল কার কাছে,
শত জ্ঞান পিপাসু মানব আজ তোমার নিকট ঋণী আছে।
তোমার চির শয্যায় দিই, লাল ছালাম থাক সুখে আরো,
স্রষ্টার কাছে চিরদিন তোমার সম্মান, মান আরও কাড়ে।
হায় যদি চলে গেলে অমন করে মহান আত্মা তোর,
জানি স্রষ্টার নিকট হতে ফের এসে, খুলিবে বিদ্যালয়-দোর।

১৬/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।
(মরহুম হাফেজ আঃ খালেক স্যারের সৌজন্যে)

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

চারালের সুখ

প্রেমের জালে মোহান্ব হয়ে আটকে আমি,
ওগো ঈশ্বর তোমায় খুঁজি শুধু দিবায়ামী।
বাঁশির সুর গলিয়ে যায়, আমার সরল মন,
কালির শ্রদ্ধায় অবনত মন প্রতিক্ষণ।
জটলা পাঁকানো চুল নিয়া যায় প্রৌঢ়া মেয়ে,
প্রতিমা সাথে নিয়ে চলে সে ধেয়ে ধেয়ে।
সে কি করুণ সুর, বিসর্জন আর ত্যাগের,
যেন মনে নামছে আঁধার, ঘন কালো মেঘের।
যুব-যুবা-প্রৌঢ়া-শিশু পল্লীর সরু পথে,
প্রতিমা নিয়ে চলে কাঁধ-আর বাঁশের রথে।

হায়রে মানুষ, একি তোর অনুভূতি বলি,
শুধু প্রেমের টানে জড়িয়ে ধরে পরে যায় দলি।
পায় তৃপ্তি মন, কে, রে তুই আজব প্রাণ,
কোথা তুই পেয়েছিলে অমন স্নেহের ঘ্রাণ।
বল্ বল্ তুই থাকিস্ কোথা, কার ঘরে,
এ সরলতা, এ স্নেহ মারা কান্নার স্বরে।
কে দান করিল তোরে বাঁশ ঝাড়ের নিচে আর,
তোরে ছেড়ে যেতে পল্লী প্রাণ কাঁদে বার বার।
এ মানুষ সুখী শুধু দিয়ে পূজার বাসর,
এ মানুষ দুঃখী বডেডা, চির বিরহ কাতর।
বলিতে কথা প্রভুর সনে পুনঃ জন্মের ভয়ে,
'সৎ' থাকিয়া জীবন যুদ্ধে মরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে।
দীন-হীন চলে সে, আবার হাঁকিয়া ডাক,
অধিকার চাই না কারো, অপরাধ মুছে যাক্।
আমরা সুখী আমরা ভাল নূন ভাত খাই,
দিনের শেষে ভাঙ্গা ঘরে ঘুমাতে যাই।
আবার জেগে ভোরে, খাটিয়া সুখের ঘরে,
বউ-শিশুকে খাইয়ে, পাই আনন্দ তারপরে।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

দিয়ে পূজা সন্ধ্যায় সানাইয়ের সুরে বাঁজিয়ে বাঁশি,
মগ্ন হই বিভু প্রেমে, ফুল দিই দেবী পদে রাশি রাশি।
বলো সুখীকে, “আমাগো” হতে আমরা চাড়াল,
সভ্যতার অগ্নিতে নয়, দ্বন্দ্বীভূত হই কখনও ধারাল-
অস্ত্র নিয়ে, চুল্লীতে, অথচ লড়ি না নিরীহ নর,
আর এ জন্য ঈশ্বর খুশী হয়ে দেন, মনে সুখ-বর।

২০/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর।

বড় ভাল লাগে

বাঁশ ঝাড়ের নিবিড় ছায়াতলে পল্লীর গৃহবধু তাই,
শুকনো পাতা কুড়িয়ে যায় নিরবে তার ধৈর্যচ্যুতি নাই।
মৃদু বায়ু তাড়ান পাতার ঘর্ষণে মচমচ শব্দ করে,
উদাসী কবির প্রাণ সেই বেলা বাঁশ ঝাড়ে নেয় হরে।
সহজ সরল বালিকারা মৃদু হাসি দিয়ে চলে যায়,
চিত্তাহীন মনের খালের পাড় দিয়া তারা সুখে বেড়ায়।
অদূরে দেখি প্রান্তরে সবুজ ফলের ছোট গাছগুলি,
কৃষাণের ছেলে নিয়ে যায় নিরব আহলাদে তুলি।
নিকোনো উঠোনে বুড়া ছেঁড়া কাপড় গায় রৌদ্র পোহায়,
লাল ফিতা আর ফুল দিয়া খোপায় যুবতী যায় নৃপুর পায়।
খেজুর রসের হাঁড়ি আনিতে চৌঙ্গ পিছায় খেজুর গাছি-
বলছি আমি নিচে দাঁড়িয়ে রস খাওয়ার জন্য তৈরী আছি।
শান্ত সুন্দর মানুষগুলো সবুজ পল্লবের সাথে,
একই তালে তালে গাঁয়ের মাঠে যেন আনন্দে মাতে।
সুখে দিন কাটায় তার কুঁড়ে ঘর আর বলদে ভালবাসি।
ছাগলের রশি ধরে কৃষাণের ছেলে যায় ওই মাঠে,
মুগ বেচি নুন আনতে যায় কৃষাণ কোমরগঞ্জের হাটে।
পরাণ যায় জুড়িয়ে যখন দেখি কবুতর দিয়ে দাদু ভাই,
নাতিকে হাতে দেয় কেমন শাদা পায়রা না-কি বল তাই।
স্কুলে যায় ‘নাস্তা’ করে কৃষাণের মেয়ে দিলোয়ারা,
রাণী হল তার সঙ্গিনী- সাজিয়া গুজিয়া ধীরপদে যায় তারা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

বাতাবনে দেখি শব্দ কিসের, কানে আসে বার বার,
স্বল্পভাষিণী ভাবী কলস কাঁখে চকিত চাহনি তার।
এখন দুপুর, শূনি আজান মুয়াজ্জিনের, ঐ মসজিদে,
তাড়া করে উঠে কৃষাণ এখন লাগে বুঝি তার ভারী খিদে।
নালের ক্ষেত সরিষা ফুল গুলি হলুদ বরণ সুন্দর যে কত,
যত মৌমাছি আছে, বোঁ বোঁ করে চলে আসে শত শত।
খায় মধু ফুলের আর সুঘ্রাণ নিয়ে মিশে যায় পবনে,
হতবল বাবু গাঁ হতে ফেরে, আট-সাঁট, শহুরে বাস ভবনে।
চাল ভাজা খায় কিশোর-কিশোরী আখ ক্ষেতে বসে,
ডাকিয়া বলে ‘বোনে’ পানি আর নিরবধি কৃষাণ যায় চষে।
শিশির ছেড়ে দুর্বাঘাসগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,
বায়ু তাড়নে পল্লব নাড়ে আর ফুলগুলো তার যায় ফুটে।
বড় ভাল লাগে আমার গাঁয়ের এরূপ এ শোভা যত,
চোখের-মনের-ক্লান্তি দূর করে আগ্রহে দেখি যে কত।
শুকনো কলাপাতার বেড়া আর বাঁশের ছোট পিঁড়ি,
শাকান্ন আহার শেষে দিন মজুর যে ধরায় তার বিড়ি।
ইচ্ছে হয়, ঘুমিয়ে যাই, ভুলিয়া যাই চাকচিক্য যত,
আ’লের ‘পরে থাকিয়া যাই, আমি চির জনমের মত।

২১/১/৮৭ আগলা

বাউল আসরে

গানের টানে বন্ধুকে লয়ে, বাউল আসরে যাই,
শুনিয়া গান জুড়াব পরাণ ভাবছি কেবল আজ তাই।
গাঁয়ের মাঝে ওরশ মোবারক আওলিয়া শাহ,
মেলার চরকায় ওঠে শিশুরা দে বাহ্‌বা বাহ্‌ বাহ্‌।
হেন কালে দেখিলাম বেলুন হাতে আমার প্রিয়া,
দূর হতে দেখি আমাকে, চুপিসারে লুকায় গিয়া।

নৃত্য গীত দিয়া সে হেলিয়া দুলিয়া হরষে যায় চলে,
মনে মনে আজ এই দিনে সে, জানি রে কি সে বলে।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

হৃদয়ে উঠিল স্পন্দন, দেখি যারে এত ভালবাসি,
হালকা সবুজের ফ্রেগে সজ্জিতা সে, বন্ধু করে হাসাহাসি।
মুচ্কি হাসি দিয়ে সহোদরা নিয়ে সে যে যায়,
আমার নয়ন মন আছাড় খেয়ে তার পিছু পিছু ধায়।

শুনিলাম কত প্রেম ভক্তির কাহিনী-ইসলামী পুরাণ,
কত সুখ সে ভাঙারে আছে, সাধু বলে শুনে মন জুড়ান।
কিভাবে আবু বকর করিল প্রেম, মহানবীর সাথে,
কেমন করে ওয়ায়েশ কুরনী নবী প্রেমে উঠে মাতে।

কত শুনি মধুর বচন সে বয়াতির মন ভুলানো গানে,
হৃদয়ে দোলা লাগে ভক্তির-ছুটি মুক্তির প্রেমের টানে।
খুয়াজ খিজির কেমনে খোদা প্রেমে কত স্থানে লুকায়,
আনাল হক, আনাল হক, বলে মনসুর কেন বুক ঠুকায়।
এমনি কত কি প্রেমের গান গাহিয়া যায় বাবরী চুল নেড়ে,
শাদা পাঞ্জাবী গায়ে ভাবুক বাউল ঈশ্বর প্রেমে মত্ত ভারী।
এক তারা হাতে তার শিষ্য দল নিয়ে যায় সুরে সুরে,
এমনি করে কাটিল রজনী, পীড়িত জপে ফকির ভোর।
ঈশ্বর প্রেমে মত্ত যারা, কি রাত তার, কি তার দিন,
ভক্তি রসে শক্তি যোগায় সুরে সুরে বাজে এক তারা বীণ।
প্রেমের বিষ খেয়ে কত ফকিরের জীবন চলে যায়,
এ প্রেমের নাহি শেষ-একবার ছুটলে সারা জীবন ধায়।
প্রেম-প্রেম-প্রেম ছাড়া সে যে বুঝে না কিছু আর,
মওলা, মওলা, বলে ধূলির ধরায় পুড়ে সে বার বার।
হে বাউল, তুমি গেয়ে যাও, গান মানুষের, জীবন ভর,
শুনে ঈশ্বর প্রেমে পরে মানুষ, শয়তান কাঁপে ভয়ে থরথর।

২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকর পুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

সবুজে সবুজে আনমনে

বাঁশ ঝাড়ের নিচে দাঁড়াইলাম আমি দেখি
অদূরে খড় বোঝা ভারে ক্লান্ত মেয়ে,
সবুজ কলাই ক্ষেতের হাঁটে বধূ, কলস কাঁখে
আমার দিকে, চকিত চাহনি চেয়ে।
আষ্টে বড়ই পাড়ে, উত্তরা মাঘী হাওয়ায়
ত্রয়োদশী ও বাড়ীর, উঁচু করি ঘাড়,
শান্ত সিন্ত মনে, কাকে যেন দেখি,
বিদেশী আগুর নহে এমন মজাদার।
দারা সূত সনে দ্বি-প্রহরে খেতে বসে চাষী,
জঙ্গলের ফাঁকে দেখে সরিষা ফুল,
মাঝে মাঝে ডাকে ও রহিমা, মেয়ে
দৌড়ে আসে ফেলে রেখে কোটা-কুল।
খেজুর গাছের নিচে মচমচ করে
বায়ু আর পল্লবের খেলা চলে,
উদাসী কবি চেয়ে আছে দূরে, সুখে
শাদা মেঘ ভরা আকাশে শরীর ঢলে।
এই বিরাট প্রান্তরে চিন্তারত পথিক
অথবা আমার ভাবনাগুলি,
সাম্বন্ধী হয়ে থাকে এই শূন্যতায় আর,
মুক ধবলের চোখের চাহনি ভুলি।
মন চায়, খেলিয়া বেড়াই চিল আর
বকের সাথে গগনে গগনে,
কভু মনে হয় চড়িয়া বেড়াই সারাদিন
মনে লাগা, সবুজে সবুজে আনমনে।

২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ মোহনপুর, আগলা, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

অন্বেষণ

হে, কবি আজ বহু যুগ পরে তোমারই নয়ন নিয়া,
আসিলাম দেখিতে স্মরিয়া তোমার জীর্ণ বাড়িটি দিয়া।
তোমার কল্পনা যেথায় উড়িত বিহঙ্গের কাকলী মাঝে,
যেথায় নামিত আঁধার দিনমণি চলে গেলে সন্ধ্যা সাঁঝে।
যেথায় তুমি শুনিতে আষানের সুর-আর সে মোহে,
চলিতে পবনের সাথে আত্মহারা, ভোমরা সম দৌঁহে।

হে সৌন্দর্য পাগল প্রকৃতির মাঝে তোমাকে খুঁজি,
আবেগে হতে আপুত-প্রান্তর সদা তোমায় নিত বুঝি।
বহিয়া ঢেউয়ের তালে আর ডোবার কচুরীপানার 'পরে,
কে যেন তোমাকে নিয়ে যেত আনমনা করে, অপহরে।

এসো আবার ফিরে, তুমি দেখিবে সেই তোমারি মতন,
আজ আমরাও ভালবাসি পল্লী প্রান্তর শোভা করি যতন।
হে রসিক শেখর, চড়ে ছন্দের দোলনায় তাই তুমি,
বেড়াতে মেঘ হতে মেঘে গগনে, মানব মানস চুমি।

হে শিশু আজ বহু দিন পরে পাইলাম খুঁজে হয়,
এতদিন তুমি ছিলে কোথা, কার সোহাগে কোন ছলনায়।
আজ তোমায় খুঁজে নেব কাকের কা কা রবে আর,
দুঃখীর কান্নার সুরে, সহি সীমাহীন সুদ অত্যাচার।
তোমাকে খুঁজিব, যেখানে নেই মর্ত্যের পাপ, নেই আঘাত,
যেখানে নেই শুধু বাঁচিবার আশা, নেই নিত্যদিন হাভাত।

মনে হয়, বড়ো ক্লান্ত হয়ে ধূলির ধরায় ঠাঁই নিলে হয়,
বুলবুলি বসা শাখে, সবুজ ঘেরা পল্লবে পল্লবে মৃদু বায়।
বলো আমি আছি, কোন দিন যাব না তোমাদের ছাড়ি,
চির জন্ম হলো মোর, প্রকৃতি-নৃ মানসে চির সঙ্গী তারি।

২৫/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ আগলা পূর্ব পাড়া, কবির বাড়ি।
(মহাকবি কায়কোবাদের ১২৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে)

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৩৩

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

রইবে স্মৃতিপটে

আকস্মিক আবির্ভূত হলাম আমি এক মহান কবি'র বাড়ি,
জানি না, চিনি না, শুধু মন-মন্দিরে স্মরণ ছিল নাম তারি।
কেমন করে, কোন ভাগ্য বলে সেই ধ্যান মগ্ন কবি,
ছাদে বসে গাঁয়ের নিবিড় সবুজের আঁকিত কত ছবি।

আজ হয়, নেই সেই মন, সেই লেখনি যে চলে,
নিবিড় তরুণতা আর মৃদু বায়ু নির্বাক সেই কথা বলে।
ইটের বাঁধুনি খসে যেতে চায়, কে রাখে ধরি,
বল হে কবি কত দিন আমি চালাব আমার তরী-
শিশুরা খেলছে এ পড়ন্ত রোদে লাফ দৌড় খেলা,
এমন করে অবুঝ নিষ্পাপ শিশুদের কাটে বেলা।
ও পাশে দেখি ষোড়শী যুগল এ-ওর গায়ে,
হাসিয়া কাটিয়া চলিয়া পড়ে লাজে তার পায়ে।
সেই কবি থাকিলে আজ ঘুরিত সবার মনে,
নিরবে বলে যাইতো কথা, হৃদয় তার কলমের সনে।

নাই কবি, আছে তারই জাত মানুষ, সে কত কভু,
কবি না হলেও মানুষ-তার কথা কবি বলে তবু।
সৌভাগ্য হলো আমার দেখিলাম প্রেমে ভরা গাঁওখানি,
স্মৃতি পটে রইবে যতদিন ঈশ্বর কবি'র মত নেবে না টানি।

২৮/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ জালালপুর, নবাবগঞ্জ।
(লোবান কবি মঈন উদ্দিন খান স্মরণে)

রবিশস্যের ক্ষেতে একদিন

আহা কি আরাম লাগে মধ্যাহ্ন বেলায় মটর গুটির ক্ষেতের আঁলে,
ফাগুনের আশ্বাদে ভরা মৃদু বায়ু তাড়নে বসে নাচে হৃদয় হৃদতালে।
হলদে বেগুনী খয়েরী ফুলগুলো আর ত্রিকোণ গাঢ় সবুজ পাতায়,
লতাকানি উঁচু করে শির গগনমুখী মটর গুটির কলি ভরা মাথায়।
মৃদু বায়ু তাড়নে হেলিয়া দুলিয়া মধুকর দলে আকর্ষে হাতছানি,
হলুদ পাখা মেলে প্রজাপতি ঘুরছে পল্লবের নিচে নিয়ত টানি।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

সরিষা আর মটর শুটির ফুলের বাতাসে মধুর গন্ধে ভরা,
পল্লবে গাখানি জড়িয়ে মন চায়, কাটে সারাদিন শুইয়ে পড়া।
ধেণু চড়িতে মাঠে খায় দুর্বাঘাস-দোয়েল পাখি কত করে চলে,
রাখাল গামছা মাথায় বেঁধে খুটি লাগায় আনমনা জলে।
গাঁয়ের বালিকা কাচছে কাপড় 'থুপ থুপ' রবে পাশে পুকুরে,
পাশ দিয়ে যায় চলে, 'মামা' ডেকে দিলীপ ঐ নদীর অদূরে।
ক্ষেতের পাশে সারি করে খেজুর গাছে বসের হাড়ি ঝুলে,
পথচারী আড় চোখে চায়, মন চায়, পান করে রস ভুলে।
টুনটুনি পাখি ঝাপটি মারে টিং টিং স্বরে কাকে যেন ডাকে,
ক্ষণে উঠে উপরে ক্ষণে নামে মটর শুটির নরম শাখে।
হেলিয়া লতা বলে, আহা কি আরাম ফুলগুলি হাসে,
অমনি আমি চলি গোপনে কে কত কাকে ভালবাসে।
দুপুরে রোদের মাঝে উড়ছে চিল গগনে পাখা মেলে,
উদাসী বায়ু ইচ্ছে মত যায় সে শূন্যে, আপন মনে খেলে।
সবুজ ঘেরা আম্র আর বাঁশ বনের ধারে ইছামতির তীরে বসি,
কোকিল ডাকছে কুহু, কুহু রবে-আনন্দে নাচিল আমার মসী।
কার গলার আওয়াজ শুনি হেথায়, মনে হয় মান করি শেষে,
ফিরছে বাড়ী ভেজা কাপড়ে মৃদু তালে শুষ্ক কাশি কেশে।
আহা আরও আরামে বসে পা রাখি লম্বা করি ঘাসে, ঘাসে,
কাছে টানিয়া মশরী কলাই বলে, ওহে তোমায় ভালবাসে।
কৃষাণ আসে ভাবতে ভাবতে আনমনা সরিষা ক্ষেতের ধারে,
মাথা নিচু করে ক্ষেত দেখে হাসে আর গামছা নাড়ে বারেবারে।
দুপুর বেলা গড়িয়ে যায়, হয় না তার ফসল দেখা শেষ,
হাত দিয়া আঁচড় কাটছে আর টানছে তার কাঁচা পাকা কেশ।
আসলে কী-প্রাণের তাগিদে এসব ভাবনা ভালবাসা জাগে?
নাকি বাঙালি বলে, পশ্চিমা রেখে, আমার দেশ থাকে আগে!

২৮/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

(লক্ষণ চন্দ্র ঘোষ এর সৌজন্যে)

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

চাঁদের কলংক

কে গো তুমি আজ সুধালে তব সুমতি
হলো-পুলকিত হয়ে ভাই,
কবি যখন বিপাকে, কাব্য জগতে পড়ে-
বিচরণ করছেন সদাই।
আসমুদ্রহিমাচল খুঁজে কবি
উপমা আর ছন্দ দোলা তুলি,
বড়ো ক্লান্ত, বড়ো চৈতন্যহীন বসে,
আঁকছেন দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি।
যবে ব্যথার সমুদ্র মহন করে ধরাময়
ছড়িয়ে দিলেন বিষ-অকাতরে,
মানুষের আর্তরব শুনছেন পবনে
মুহূর্মুহু ছুটেছে ভীষণ ঝড়ে।
যখন ভাবছেন কেমন হলো জাত
পিশাচের, স্বার্থান্ধের ধরা তলে,
ব্যাপির আক্রমণে মানুষটি যখন
পরলোকে যায় গো চলে।
বিচারের বাণী যখন নিভতে কাঁদে,
বন্দি খাঁচার বিহগের মত।
রান্না করা ভাত চুরি করে অবহেলায়
ধনী ভাত চোর যত।
প্রিয়া তুমি এসো, দেখো লালে লাল,
রক্ত গোল জমাট নিহতের ছবি,
বড়ো একা ছিলাম, কাঁপি চাঁদ ভয়ে,
প্রিয়া দেখালে, উষায় নূতন রবি।

০২/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

কাঁপছে বউ

আজ সন্ধ্যায় বাহির হইলাম পথে,
বন্ধু সমভিব্যাহার আমার ঘরখানি হতে।
দেখিলাম পথে কত কি দু'পাশে কলাগাছ,
জেলেরা যায় বাজারে, সাথে ঝাকি ভরা মাছ।
দেখিলাম চকের জমিগুলি আর সবে,
তার মাঝে কৃষাণ সূত তুলছে শাক নিরবে।
আরো দেখিলাম আমি বেলা শেষে,
রাখাল ফিরছে বাড়ি এলোমেলো কেশে।

এক ঝাঁক বক পাখি, উড়ছে তালে তালে,
কি সুন্দর দেখি আমি আজ সেই কালে,
ফিরিলাম বাড়ি দেখিলাম মেঘের টুকরা,
শাদা মুখে আকাশ পড়িল কাল বোখরা,
রবিকে তাড়িয়ে আঁধার এলো ঘরে,
সান্ধ্য ভ্রমণ শেষে এসে দেখি কাঁপছে বউ জ্বরে।

০১/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

জীবন বোধ

জীবন বোধের অচিন পাখি খুলে আজ হৃদয় দ্বার,
ওই দেখ, দেখিল মাটির পৃথিবী আর মানুষ শতবার-
মহোৎসবে মত্ত, আবেগাসক্ত ভালবেসে তন্নতন্ন করে,
মানুষের ভাবের শব্দগুলো একান্ত রূপে নিল বরে।
শৃঙ্খল ছিন্ন করে উড়তে চায় মহাকাশ চিরদিন,
শ্যামল শোভায় অবগাহি ফুটিয়ে সুগন্ধ ফুল রঙিন।
দেখ, সে বাসা বাঁধে বটের শাখে খড় বিচালি দিয়া,
দুহিত-দুহিতার অন্ন যোগাড়ে ব্যস্ত তার নিবেদিত হিয়া।

সাহসী এরা জীবনের দীক্ষায় প্রিয় মাতৃভূমির তরে,
মদদ পুষ্ট এরা জীবনী শক্তির অসময়ে যায় লড়ে।
বজ্রকণ্ঠ যখন শুনে অত্যাচারীর আগমনি পদধ্বনি,
রক্ত শপথ করে বিলিয়ে দেয় প্রাণ বীরজাত তখনি।
একুশের রক্ত স্রোতে ভাসিয়া যাবে মুক্তির মহাসাগরে,
প্রতিদিন জীবনের আহরি শব্দ অচিন পাখির আধোশ্বরে।

০৩/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৩৭

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

মানসীর দর্শন

কাঁচা কাঁচা রোদে সকালে গতর রাখিয়া,
বসেছিলাম চেয়ারে হেলান দিয়া বাঁকিয়া।
অমন সময়ে দেখিলাম কার রূপ ছায়া,
কার ইশারায় জাগিল হৃদয়ে ছন্দ মায়া।
আন্দোলিত হইল ভালবাসায় উদ্বেল হৃদয়,
আচ্ছন্ন আবেশে, ব্যাকুল ভাব হলো উদয়।
শিহরি উঠিল হৃদয় কি চায়, কি চায় জানি,
এখন কে যেন আমার মন নিল সবটাই টানি।
কবিতা পড়া হলো যে আমার একেবারে বন্ধ,
নির্ব্বর বরনাধারার মত বাহির হয় মধুর ছন্দ।
এক হৃদয় দুয়ার খুলিয়া উঁকি দেয় এই বেলা,
শিহরি মাতিয়া উঠিল দু'হৃদয় সাথে করে খেলা।
কহিলাম না কথা, হৃদ ছাড়ি আমি ব্যস্ত হয়ে মুখে,
চমকে উঠে থাকিতে চাই, এ সময়, রুদ্ধদ্বার বুকে।
কি এক আকর্ষণে, ওহে মোর যাদুময় যাদু প্রিয়া,
দেখি তোমায়, দেখি তোমায়, মানস নয়ন দিয়া।

০৬/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

এসো হেথায় বাবু

আহা কি আরাম দ্বি প্রহরে খর রোদোরে তাই,
এমন শান্তির ছায়ার ডাকে, আজ নিয়াছি যে ঠাঁই।
পাখিদের কিচির মিচিরে মুখরিত ক্ষুদ্র বাগান খানি,
আমায় রেখে পাশে এলোমেলো ডাকে নিলে, সে টানি।
টুনটুনি-চন্দনা-শালিক-আরও কত পাখির ডাকে,
কর্ণ মাঝে তাই ভারী ভাল লাগে মধুর সুখা মাখে।
ফাগুনের শিমুল গাছে কুহুকুহু কোকিলের তান,
স্মরণে আনে, অতীতের স্মৃতি জাগরুক কল্পনা অশ্রুমান।
কৃষাণ যায় অদূরে হাঁটে, মুরগী নিয়া, ছালা সাথে,
ক্রোড়ে শিশু কৃষাণী সওদা বলে, ছাতা রাখে হাতে।
নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে কুল গাছ কাঁচা কাঁচা কুলে ভরা,
কাঁটা উঁচিয়ে রাখে নিচে দেখে শিশুরা পালায় তুরা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আধো রোদ্দোর আধো ছায় বড়ই গাছের স্তরু তলা,
শ্রৌঢ় দাঁড়িয়ে কোলে শিশু দেখে ভাব গম্ভীর তার চলা ।
দোয়েল চুড়া পল্লী মাঠের চালু জায়গায় আমি বসি,
খয়েরী গাভী নিয়ে আসে চাষী, হাতে তার পুরনো দাঁটি
এ বাড়ী হতে ও বাড়ি যায় বধু, হাতে রাখে ছালুন বাটি ।
আসছে ঘুম ফাণ্ডনের মৃদু মলয়ে আজ শুধু তাই,
ইচ্ছে করে এ বাঁশ ঝাড়ের নিচে স্বর্গীয় আরামে ঘুমাই ।
খড়ি উঠিয়ে নেয় গাঁয়ের বিধবা বকুল তলা হতে,
কেমনে সময় কাটে আমার চেয়ে চেয়ে মেঠো পথে,
শুনি ডাগর চোখী কালো সেই লাজুক মেয়ে,
ডাকে হেথায় বাবু এসো ফের তুমি বিকালে খেয়ে ।

০৭/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ মোহনপুর, ঢাকা ।

অভিবাদন

ফাণ্ডনের আগমনে লও অভিবাদন হে কবি,
স্মরি তোমার নাম, অব্যাহত মাঠে-ঘাটে দেখে ছবি ।
তোমাকে দেখছি গ্রাম বাংলার দূর দিগন্ত জোড়ে,
তোমাকে দেখছে বনে বনে, তমসাচ্ছন্ন বঙ্গশুপুরে ।
যেখানে যাই সেখানেই পাই তোমার মুরতি খানি,
কোথা উৎস তোমার কবি জানি হে জানি ভাল জানি ।

এসেছি লয়ে সাথে করে সেই বন্ধু প্রিয় 'দূর'
যুগলে দেখি তোমার পালের নৌকো ছন্দ সুর ।
গগণে উড়ছে শকুন চিল উদাসী হয়ে আর,
তোমাকে পেয়েছি সেখানে আমি খুঁজে শতবার ।
কবি কি ভাবছ তুমি বলো মানুষের তো কথা?
এ দেশের শ্যামল শোভা, বিহগের কূজন তথা,
অনুভূতি তোমার ঘুরিয়া বেড়ায় দিক ভ্রান্ত হাওয়া মাঝে ।
সুখে দুঃখে তোমার হৃদয় বীণা তাই, সব সময় অপূর্ব বাজে ।
লও উপহার মানুষ, তরুণতা, বিশাল প্রান্তর আর সব,
করি প্রণাম তোমার পায়, উজাড় করে সোহাগের শাদা নভ ।

০৮/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ মরিচা, ঢাকা ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

প্রেমিকের মৃত্যু

আজ ফালগুনে বসন্তে মন নাচে রে
কাকে বেসেছি ভাল মরমে আমি,
শংকিত হরিণের মত হৃদয় কাঁদে
পাব কি পাব না জপে মন দিবাযামী ।
কখন আসিবে সকাল কখন পাব প্রিয়ার
দর্শন ব্যকুলতা কাটে না মোর,
আজ কি হলো কেমনে বলি যে তারে
ভালবাসি তোমায় আমি কতদূর ।
যদি এমন হত পৃথিবীর সকল
মহাসাগরের জল আমি তুলে,
মাপিতাম আমি ফুরাতো না কোনদিন
পুনরায় মাপিতাম আমি আত্মা ভুলে ।
রাগ করিবে কি সমাজের ভয়ে সে
দুর্ভাবনায় কাটে যে মোর সময়,
কেন জানি না এ প্রেমের কি জানি হবে
কি দশা হবে প্রেমের হবে কি জয় ।
নাকি শুধু গুমরিয়া মরিবে সে
বিরহ জ্বালায়, অপরে নেবে কেড়ে
নাকি সে চলে যাবে ঘৃণায়, আহা
নাহি শুধাবে আমায় হাত নেড়ে ।
কলকাকলী বিহগের শুনি হে মানসী
জাগে আশা পাব ভালবাসা,
কখনও বুঝি তুমি শুধু আমার
কখনও বুঝি নিষ্ফল সে আশা ।
কি সাধনা আমার কোথা জীবন
কোথায় চলার মোর নির্ভয় গতি,
না পেলে তোমায় হয় মোর আহা ভয়
ভীষণ হবে আমার জীবনের ক্ষতি ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আমি কবি দুঃখ জ্বালা সব মিটাব
মহীতল গগন, মানুষকে প্রিয় করি,
নারী প্রেমের সেকী সুধা তাই পাব না
অর্থহীন মনে হয় জীবন স্মরি।
কোন্ উপমা দেব আমার প্রেমের বলো
হে মানসী করি তোমার সমতুল,
হাতড়িয়ে মরি প্রান্তর সব যে মরু
নাই কোথা কুঞ্জবীথিকা নাই নদীকূল।
জানি শুধু তুমিই তোমার উপমা আর
ভুলিয়াছি সব নির্বাক হৃদয় কলরব,
হে বসন্ত কোকিলা এসো কাছে আমার,
তোমার কুহু কুহু বিহনে মিথ্যে সব।
স্বর্গে গেলাম আমি যদি পাই তব আমি,
যেন-আর কিছু জীবনে চাওয়া নাই,
কী কইবে না কথা, তাই যদি হবে আর,
আমাকে পাবে না পৃথিবীর খুঁজে সবটাই।
কান্নায় জড়িয়ে বুক জীবন হবে যে সর্বহারা,
প্রেমের হবে না জয় মানস চুমি,
গেলাম এমন স্থানে সেথায় তুমি নেই
আছে শুধু আঁধার আর মরুভূমি।
ফুটিবে না ফুল রবি দিবে না আর কিরণ
বইবে না নদী আর দিগন্ত দূর,
চাহিবে না আমি রক্ত শীতল নির্দয়
মৃত্যু ঘাতে দেখি শবদেহ মোর।

১২/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

প্রেম উদগ্রীব প্রাণ

দেবী সহেনা আর হে প্রিয়া
আসিবে কখন কাছে,
যে কথা কহিবার তাই পারি না
আমি ভুলিয়া যাই পাছে ।
উদগ্রীব প্রাণ, কাহার অপেক্ষায়
শুধু প্রাণের যাচনা কি চাই,
কাটে না সময় থাকি না স্থির,
আমার যেন কি নাই, কি নাই ।
এক দুই তিন কদমে যাও কে চলে,
ডেকে কাছে সোহাগের টানে,
তুমি যাও চলে নাহি কথা বল
শুধু আঁখি বাঁকিয়ে নিরব গানে ।
প্রিয়া, একি হল মোর তোমার
দেখি নাই কোন তাড়না মনে,
বাইরে আমি তাকালে যাও চলে
মনের ভেতরে লুকাও ক্ষণে ক্ষণে ।
যত আমি কাছে চাই তত তুমি
যাও দূরে তোমায় কোথা পাই,
ছলনা অভিনয়ে পটু হে নারী
মেঘের মতই গগনে তোমার ঠাঁই
এই দেখি এই নাই বিজলীর মত
উল্কা হয়ে ক্ষণিক আলো দিয়ে,
যাও নিভিয়া কি কথা বলিতে চাই
ভুলিয়া যাই ওহে সবুজ টিয়ে ।
ফাঁদ পাতিলাম লুকিয়ে আছি দূর,
হে মৃগয়া দেখি তার চারি পাশ,
দূর হতে হাসো শুধু চিবুক ধরিয়া
হারিয়েছি মন আমার হল সর্বনাশ ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

জানি না তুমি কোথা গিয়েছ কি
তোমার কামনা তাই বলে হয়,
দূরে দূরে থেকে আমার, পথ হতে
যারাতে চাও কাটা মায়ায়।
লেগেছে আমার জিদ করিব তোমায়
যেথা পাই, নাই কথা আর,
কত করিবে ছলনা দয়া করে বলো না
টুকে হৃদয়ে বন্ধ করেছ দ্বার তার।
তাই যদি নাহি বল ছাড়িব না পিছু,
দেখি ধরার কোথায় লুকিয়ে,
বাহির করিব কথা সরিয়ে কাঁটা লতা
আমার প্রেমের হিসেব নেব চুকিয়ে।
যাও যদি যেতে চাও যেথা তোমার ইচ্ছে
নাহি বাধা দেব কভু আমি,
নাহি হলাম সঙ্গী তব হব আমি চিরকুমার
কল্পনায় শুধু বাধিব ঘর হে স্বামী।
আমার আকাশে নাহি উদিবে চন্দ্র তারা
তোমার বাগানে ফুটিবে বসন্ত ফুল,
আমি ভাসিব বারিধি মাঝে জীবনের
ক্ষুদ্র তরঙ্গে মজিব নাহি পাব কূল।
ফাগুনে কোকিল আশ্রবনে কুঁজিবে কুহু কুহু
তোমার যৌবনের নাহি হবে ক্ষয়,
না হয় আমি হব বিরহী কেকা
আর উষর মরু যেন চির সাথী হয়।
প্রণাম করি হে জগৎ বালা, কি দিয়ে
ঈশ্বর সৃজিল, ধরা মাঝে,
যৌবনে ছোঁয়া না পেলে তোমার
বীণায় সুর আর কি রে বাজে।

১৩/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

চতুর্দিকে ঝড়

জলযান ডাকছে কর্কশ স্বরে ছেড়ে যাবে বান্দুরা ঘাট,
বেচাকেনার ক্ষণস্থায়ী ওপারে বসেছে, মানুষের হাট।
ফেরী করে মাঝি ভাই, এপারের যাত্রী করে ওপার,
ডেকে হয়রান জলযান চলে যায় নাই পারাপার আর।
মনে হয় জীবনের সাথে মিল আছে এসবের তাই,
আজ বুঝি আমার জীবনের ঐ জলে চিরতরে হারাই।
যেদিকে তাকাই আঁধার আচ্ছাদনে বিশ্বচরাচর যায় লুকে,
মরেছি যাত্রী আমি অন্তর্দ্বন্দ্বে কেন আজ ধুকে ধুকে।
ক্লান্ত আমি জীবন সৈনিক চতুর্দিকে বহে ভীষণ ঝড়,
হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে নেয় ছাতা, বিপদগ্রস্থ নর।
যাই কোথায় ভেবে পাই না আশা মিটিল না মোর,
পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে নিয়ে লাভ কি জীবন শত্রুর?
যুদ্ধ করে করে আজ আমি নিঃশ্ব, শূন্য দু'হাত
স্বার্থলোভী নরে ভালবেসে কেন পাই শুধু আঘাত।
পথহারা পথিকের মত কোথায় ঘুরছি চোখে আঁধার যামী,
আজ দ্বিপ্রহরে কেন জানি না উদাসীন শুধু আমি।
হে ঈশ্বর দাও ঠাঁই, দাও শক্তি দেখাও আমায় পথ,
বিষয় ক্লান্ত ধরণীর মাঝে কেমনে বাঁচিব আমি হয়ে সৎ।
কি করিব বলো আমার জীবনের সম্পদ নিও না কেড়ে,
তোমার সাহায্য ছাড়া আজীবন যুদ্ধে যাব যে হেরে।

১৫/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ বান্দুরা ঘাট, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

(মিহিরের সৌজন্যে)

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

যতি

পথচারী ফিরছে বাড়ি গ্রাম্য পথ দিয়া,
কত ভাল লাগছে আনন্দে নাচছে হিয়া ।
ধেণুগুলো টানছে দড়ি চলে যাবে বাড়ি,
কে নেবে হয় সেই ভরসায় কেবল হাঙ্গা রব ছাড়ি ।
কিশোর কিশোরীরা সন্ধ্যা বেলায় আলাপ ছলে,
সম্মুখে শিক্ষক দেখে গোপনে দাঁড়িয়ে যায় কথা বলে ।
নামছে আঁধার ধীরে ধীরে সারা দিনের কর্মশেষে,
কৃষাণ ফিরছে বাড়ি ধূলি মলিন বায় ভীষণ অবশে ।
আমরা দেখি প্রকৃতির রূপ বেড়াই ক্ষেতের ধারে,
আষানের সুরে ফিরে যাই ঘরে ভক্তি দিই আল্লারে ।
গোধূলি লগ্নে বসে যাই তারপরে তামাক খেতে,
নাতির সাথে করি আলাপ বারান্দায় যেতে যেতে ।
দিন কাটে রাত কাটে কাটে সুন্দর বয়স মতির
কি হবে বলো যদি আসে মৃত্যু ভয় করি জীবন যতির ।

১৬/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ ইছামতি নদী তীর ।

মধুর বচন

পাখির কলকাকলী তরঙ্গায়িত সবুজের ঢেউ কেন জানি,
বুকের ভেতর থেকে মধুর সুরেলী শব্দে আবেগে টানি আনি ।
হাসি গান করি বচসা করি আনন্দে কাটে রাখালের দিন,
হৃদয় কুসুম ফুটিয়া উঠে কি সুন্দর ছড়িয়ে দলতার রঙিন ।
এ কোন্ ভাষায় মাগো বলো তোমাকে বুঝিব দুহিত আমি,
নির্বাক যদি দাঁড়িয়ে থাকি বলো মা বুঝিবে আমার অন্তর্যামী ।
শুনি সুরে সুরে কৃষাণের সরস গল্প তার নাহি জুড়ি,
শব্দ ভাই ছাড়া মাগো তুমি হবে ছন্দহীন নরক পুরী ।
কামারের হাতুড়ি পিটানোর ধ্বনি আর কান্না হাহাকার,
মৃদু মলয় তাড়নে শুনি পল্লবের মর্মর ধ্বনি হই একাকার ।
পায়ের শব্দ শুনি পথচারীর ভালবাসি আমার ভাই,
হু হুংকার ডান শুনি বীরের, চলে যাই রণে দেখো সবাই ।
শহীদের ডাক পবন মাঝে ধ্বনিত আজ হৃদয় দিয়ে শুনি,
বলো মা বলো এ মধুর বচন কখনও দিতে পারে না খুনি ।
আজও যারা বেঁচে আছি শুধু নির্বাক কেন থাকি দাঁড়িয়ে,
প্রাণের ঝরনাধারা মধুর বাংলা বচনে যেতে চাই হারিয়ে ।

১৮/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

প্রতিশোধ

একদিন বহিত যে নদী প্রকম্প ধারায় স্বচ্ছ সলিলে,
আজ সেই নদী শুষ্ক বালুচর প্রায়, বলিলে।
নাহি কো আফসোস, আমি বড়ো অসহায়,
নাহি পারি গাঁথি বিরহের মালা, নাহি দিন যায়।
উদাসীন গাংচিল পাখা মেলে উড়ছে আজ হেরি,
যে দিকে ইচ্ছে যায় সে করে না তো কখনও দেরী।
শুধু আক্ষেপ করে প্রতি ঘরে ঠাই নাই, ঠাই নাই,
কিছু পেলে বিষয়ীরা বলে হয় চাই আরো কিছু চাই।
আমার হৃদয়ে বাজে যাহা শুধু তাহাই যাব বলি,
মোর বপুখানি মিশিবে মর্তে আত্মা যাবে চলি।
ভুবনের শত উপমায় ঘুরিয়া কাঁদিলে রহিয়া রহিয়া,
হয়ত আগামী প্রজন্ম সেই ব্যথার ভার নেবে বহিয়া।
তাই আজ আমার কাজ আগামী প্রাণের কাছে উপরোধ,
স্মরিয়া জীবন আমায় নিও বরে, নিও জীবনের প্রতিশোধ।

২০/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ সৈয়দপুর, ঢাকা।

ফুলের মালার মূল্য

আবালবৃদ্ধবনিতা কি এক আবেগে ভরে,
ছুটে আসে ফুলের তোড়া নিয়ে শহীদ মিনারে।
মনে হয় এ যেন নতুন কোন আত্মীয় ধরে,
সোহাগে টেনে নিয়ে যায় নৌকো নদীর কিনারে।
ফুলের স্তবকে ফিরে আসে হারানো সে যুবরা
আত্মা যাদের স্বর্গধামে করছে চির বিচরণ,
প্রাণ উৎফুল্ল ভরপুর ও ভাইকে আজ তোমরা,
কীসের তরে তোমরা প্রাণের বাণী কর উদ্গীরণ।
কান্না আসে না তোমাদের বলি হে তরুণ,
আহ্বান করছ কেন কি আশা নিয়া আজ বলি,
তোমাদের ডাকে নামিয়া আসিবে কি অরুণ,
কেন আজ আমরা ভ্রান্তির পথে শুধু চলি।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

ফুটিল কমল তোমাদের লাগি বলো আজি,
ছিন্ন করিবে বিটপ হতে কাঁদিবে তাহা,
তোমরা উষায় করি প্রভাত ফেরী সাজি,
প্রতিবাদী সুরে কিংবা ভাইয়ের দরদে আহা।
এমনি স্রোত ধারা জীবন্ত থাকিবে কি চিরদিন?
না এ কেবল ক্ষণিকের ডাক পরে হবে স্তব্ধ
কালো হাতের ঘর্ষণে শৈনে শৈনে হবে ক্ষীণ
হে তরুণ আজ ভাষা দিয়ে শত্রুকে কর জব্দ।
পরালে যদি মালা গলায় সদ্য তোলা ফুলের,
শপথ কর যেভাবে পার রাখ তার মূল্য।
পাড়ি দাও অসীম সমুদ্রে নাহি আশা কূলের
শহীদে প্রতী এ মালার নেই তার কিছু তুল্য।

২১/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ ঢৌকি ঘাটা স্কুল, আগলা, ঢাকা।

স্বর্গীয় ছায়া

ওরে প্রেম পাগল কি হলো তোর মরিচীকার পিছনে ছুটিস্,
কঠিন হৃদয়কে ভালবেসে হয় পাথরে মাথা তুই খুটিস্।
তুই যখন বলিস্ আমি তোকে ভালবাসি তখন যে হয়,
আমি প্রেমিকা নহি তোর বলে সে নিষ্ঠুর কথা, চলে যায়।
আজ আঘাত পেয়ে সে কথায় আমি হইলাম পাগল প্রায়,
বনের পাখি বনে চলে যায় শূন্যে মিলায় নিষ্ঠুর কায়।
যে শুনে না কথা বুঝে না প্রেম সুধাই তারে কি হয়,
এ যে কবি'র ভুল ভুলে সে কবিতায় প্রেমের কথা বলে যায়।
পাব না কিছুই উদ্ভ্রান্তের মত বিলিয়ে যাব জগৎময়
আগুনে যাব পুড়িয়া এ হৃদয় যেন শুধু তা সয়।
যা তুই যাবে কোথা চাহি না তোর সে পাপের কায়া,
পাপীকে ভালবাসি পাপকে নয়, হব প্রেমের স্বর্গীয় ছায়া।

২৪/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

ডাস্টবিন বাসীর খাদ্য

ডাস্টবিন বাসী খাদ্যের মাঝে এক টুকরো মাংশ
খুঁজে, উলঙ্গ লজ্জাছান, কদম নালীতে বসে,
আমি সন্তান পাগল প্রায়,
ঘর্মাক্ত শরীর ঠেলাগাড়ীর গরু
যে আদম সন্তান
উদাসীন পথিক ফুলের সাথী
যে আদম সন্তান অথবা গাড়ী হাঁকানো
সুশ্রী ভদ্র সন্তান
এক অসুন্দর পৃথিবী আজকের
কাঁদছে হাসছে
কেহ যায় ছুটে একমুঠো অন্নের জন্য গভীর
মনোযোগে, রিকসার চাকা ঘুরে
মনের সাথে,
কেহ শান্তি খুঁজে পায় না আপনার ঘরে ।
শুধু উদাসীন গাংচিলগুলো পাখা
মেলে বাতাসের সাথে করে আলাপ মিষ্টি স্বরে ।
আর কাকগুলো ওই দেখি
মানুষের কথাই কা-কা রবে কয় ।
বইছে ফাল্লুণী মলয় নদী ওপরে
লাগছে গায়ে শিহরণ
হাঁসগুলো কেন
ভাঁদ ভাঁদ রবে কিছু কয়
সমবেদনায় ।

১৫/০৩/১৯৭ খিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

কাব্যগ্রন্থ- আহা তুমি ফুটেই দেখ না

আত্মহারা

আমাকে ডাকে, আমাকে ডাকে হালের বলদগুলি,
আমাকে ডাকে বিশাল প্রান্তর অদৃশ্য অঙ্গুলি তুলি।
শুকনো আধা ভেজা মাটির বিরামহীন সে ডাক,
আমাকে করে পাগল, মৃদু হাওয়া হৃদয় ছুঁয়ে যাক।

ওই উদাসীন শকুন সুনীল গগনে আমাকে ডাকে,
বধূ আমার পাকিয়ে ভাত, মেঠো পথ পানে চেয়ে থাকে।
আমার পায়ের ছোঁয়া পেয়ে ঘাসগুলো নাড়ে মাথা,
মসৃণ শাদা কাঁচি পায় জীবন, হাতে নিলে তার হাতা।

ও পথে বাঁশ ঝাড়ের নিচ দিয়া বাতাবনের ধারে,
শুকনো পাতাগুলি মচমচ করে ডাকে বারে বারে।
নিচু মুখ গম্ভীর উচ্চসিত হৃদয় কথা নাহি কই,
সবাই ডাকে নির্বাক আমি, শুনে শুনে আত্মহারা হই।

২৪/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কুসুম সিরিজ-১

কুসুম সিরিজ-১ (১৯৮৬-২০০০)

হুমায়ুন-গীতি-১

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

সম্মুখে আগুন রে আমার পেছনে সাগর,
স্বজনি রইল না কেউ হইল রে অপর।
নাওয়ে আমার নাই রে ছইয়া,
কান্দি আমি তীরে বইয়া,
আমার মন- গগনে উঠল ভীষণ ঝড়।।
ধীরে ধীরে খাইছে আমার মগজ কাল সাপে,
ঐ মরণ জ্বরে রুহ আমার দূর দূর কাঁপে।
বিপদে আমার বুদ্ধি গেলো কই,
সাঁই আমি তো আর আমার নই।
মরার আগে মরে গেছি বুকে পাষণ চর।।
দূর মেঘের মতই আমি কালো,
সাঁই, হাওয়ার মাঝে দেখি আলো,
সেই আলোতে ভেসে গিয়ে হইব কি অমর।।
হুমায়ুন ভেবে কয়,
মুর্শিদ আলোময়,
দয়া করে ধরে রাখো রুহের অবশ কর।।

হুমায়ুন-গীতি-২

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

আদার বেপারী জাহাজের খবর লইয়া,
কি আর অইব ঐ আশার বোঝা বইয়া।।
দীন হীন ছিন্নমূল,
হায় বারা বনের ফুল,
অরুণ ধরে আমি কান্দি রইয়া রইয়া।।
সাজাইয়া ধানের তুষ,
অধমের মত মানুষ,

জ্বলছি এ ভবে জিন্দা মানুষ হইয়া ।।
হুমায়ুন ভেবে কয়,
এ গতরে যত সয়,
সহাইলে কি হয়, যাইবো দেহ থইয়া ।।

হুমায়ুন-গীতি-৩

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

নৌকারে ও নৌকারে,
কি অইব তোমার দোষ দিয়া,
হাল ধরিবার মাঝি না পাই কান্দি তীরে বইয়া ।।
উজানের জল ভাটিতে যায়,
এমন সাধের নৌকা খানি সোনায়ে বাঁধা ছইয়া ।।
গেল বুঝি ডুবিয়া,
গঙ্গা জলে চুবিয়া,
ভাটির টানে ঐ শাশান ঘাটে,
হায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থইয়া যাইতেছে যে লইয়া ।।
নৌকা দরিয়া আমি,
কে, কার প্রভু-স্বামী,
হুমায়ুন তাই ভাবিয়া কয়,
তোমার রূপে মজিতে চাই ফানাফিল্লাহ হইয়া ।।

০১/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-৪

অন্ধ দু' চোখে কিছু তো দেখি না ধরায়,
জীবনের নৌকা আটকে গেছে চরায় ।।
শুনিবার শক্তি নাই,
পাষণ হৃদয় তাই,
ধী-শক্তি পুড়ে গেছে চৈতালী খরায় ।।
অবশ পাগুলো আঁধারের মত,
মূক হয়ে বেঁচে থাকা যায় কত ।
ঘ্রাণে পাপ ঝুলে,
জটা লাগে মরা চুলে ।

কামের বানে হায়, হিংস্রতা ছড়ায় ।।

হুমায়ুন ভাবি তাই,

ভবে বলিয়া বেড়াই,

তুমি গতি, মুখ ঝুঁজে ভাবে অন্তরায় ।

৩০/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-৫

চাঁদের মত হাসি, পাখির মত গাহি,
দেখে জগৎ বাসী, ঐ অলী ঝান্ডা বাহী ।।

কে বলে ধরা যম,

জানি সে নরাধম,

তার পোষা পাখির বোল বানানো নাহি ।।

গুণের বাগানে করি জীবন চাষ,

সুখের স্বর্গ এ ধরায় করি বাস,

নূতন পথ কেটে,

যাচ্ছি আমি হেঁটে,

সাঁই আলোর পথে আলোই আমি চাহি ।।

সেই সাপুড়ে হলে,

সাপের তপোবলে,

জীতেন্দ্রীয় হুমায়ুন স্বর্গারোহী ।।

হুমায়ুন-গীতি-৬

এ ঘর তোর ঘর নয়,

এ সুখ তো সুখ নয়,

তোরা চল্‌বি ধেয়ে ধেয়ে,

ও মনে দমে দমে আল্লা বলে,

যত পারিস ডুব্‌বি জলে,

ঐ অরূপ সায়রে নেয়ে ।।

ও তোর গায়ে থাকবে বাঘের ছাপ

ভেতরে থাকবে নূর,

ও তোর বাহিরে থাকবে দ্বি প্রহর

ভেতরে থাকবে ভোর ।

ও মনে দিনে দিনে স্রষ্টা নাম,
পোক্ত হবে হৃদয় ধাম,
যাবি সুখের দেখা পেয়ে ।
ও মনে জন্ম শ্বাসে শেষ নিঃশ্বাসে,
তুই চলবে জানি এই বিশ্বাসে,
হুমায়ুন যায় ঐ সঞ্জীবনী গেয়ে ।

হুমায়ুন-গীতি-৭

ও বন্ধুরে
আমার দুঃখ হয় বলি কারে,
আমার মন আমারেই মারে,
বিষয় নেশার ধাঁধায় ।।
অবাধ্য পুত্র শরীর যেমন,
আমার মন কাঁদায় তেমন-
সোনার হিসাব ভুলে হায়রে
তামার সাধন সাধায় ।।
ও বন্ধুরে
তুই আমারে বইল্যা দে না,
লোটা বেইচা বাঁওয়াশ কেনা,
আমার কি আর সাজায় ।।
এমন দুঃখী কে আর আছে,
মন নাই যার নিজের কাছে-
হল্লা কইরা দাঁড়ি পাকায়,
হুমায়ুন তার খাঁচায় ।।

হুমায়ুন-গীতি-৮

গুরু বিহীন শিষ্য আমি হয় রে,
দেইখ্যা দেইখ্যা ভুবন কায়া রে,
খুঁজি মন আমার ।
কান্দি কাটি হাওয়া জলে,
জোর ধরে না, তপোবলে,
এখন মন আমার বিষ খাইয়া,

মরণ পুরীর ভেলা ভাসাইয়া,
করে পারাপার ।।
আমার মন আমারে ছাইড়া,
কোন নাগিনীর দেহ ধইর্যা,
খেলা খেলে ষোল কলা লক্ষ্য ভুলে,
আবার না খেললেই চড়বে শূলে,
হায় ভাগ্যে কারাগার ।।
হুমায়ুন কয় মনা চোরা যা-রে,
বর্ণ চোরা ধর্ম চোরা সমাহারে,
মনই গুরু যার ।।
বানী: শ্রী রামকৃষ্ণ
১১/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-৯

আমায় ছাইড়া দিয়া কর্মকূলে
কি করি আর না করি আঁখি তুলে,
দেখছে মনা চোর ।।
চলত্যাছি চরকা ঘুরাই পথে,
সখা গতি নাই তো বুকের রথে,
চইল্যা গেলা দূর ।।
সন্ধ্যা দেখি, এলো বলে হলে বসে,
কে গো কলম চুষে কপাল ঘষে,
বিফল ভাগ্য তোর ।।
মনারে ও মনা
মনারে
তোরে লক্ষ টাকায় কি বা বিনে কড়ায়,
পাওয়া যায় না আহা মাটির ধরায় ।
হুমায়ুন কয় কে ধইর্যা রাখে,
আবার চলতে বলে নদী বাঁকে,
ছাইড়া গলা সুর ।।
০৯/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১০

সন্ধ্যা মালতির ফুটে ওঠা, রাতের জন্য,
বিরান প্রান্তর, সবুজ পেলেই তো ধন্য ।।
তোমাকে যদি জীবনে পাই,
আর কি চাওয়া থাকে ছাই,
বৃষ্টির আশায় চেয়ে থাকেই তো অরণ্য ।।
আবেগে মন করে চঞ্চল,
নাচে রে হুমায়ুন পাগল,
সাঁই হৃদয় বিতানে তুমি প্রেমের পণ্য ।।
০৯/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-১১

আলসেমির লাগাম ধইর্যা,
জীবন দিতেছি পার কইর্যা,
ও আল্লাহ বলো এখন কি অইব আমার ।।
সংসারের বোঝা মাথায়,
দেখ্‌তাছি যন্ত্রণা যাঁতায়,
প্রাণ যাইবে, হায় পাইব না যা পাবার ।।
আজ করব না করব কাল,
কালই হইল আমার কাল ।
দিব্য চোখে দেখ্‌তাছি আহারে,
ধরব বইল্যা আমি যাহারে,
জীবন পাইলাম খুঁজ করিনি তাহার ।।
বন্ধু আছে ডুবাইবার তালে,
ঐ জীবনকে ভুলিবার কালে,
হুমায়ুন কেঁদে কয় সবায়,
ধরায় যেন কেউ না হারায়,
মৃত্যু কালে প্রভু ঈমানী নূরের আহার ।।

০৮/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১২

স্বজনি গো,
আমারে যাইও ভুইল্যা,
দূর আকাশে ফুটেছি তারা ফুল ।।
এ জনমে,
তোমাকে দেখি নি হয়,
ভোগ করি সুখ সাযরে দোল ।।
প্রেম শাখায় দিলে না তো,
সাজাইয়া পরমেশ্বর মালা,
আমি ঘুরতাছি শ্যাম কালা,
প্রভুরে-----
সুখের বদলে দুঃখে,
পুড়ে ভেঙ্গে দিও আত্মার ভুল ।।
হলো বয়স চল্লিশ হয়,
করিলাম কি সময় বয়ে যায় ।।
ও প্রভুরে-----
হুমায়ুন বলে আপনায়,
তরী বেয়ে ধরো নদীর কুল ।।

হুমায়ুন-গীতি-১৩

পদ্ম পুকুরে পদ্ম কাঁপে বৃকে গন্ধ ভরে,
তোমাকেই খুঁজিয়া ফিরি আঁখি বন্ধ করে ।।
আঁধারে ঢাকিয়া ফেলে পাতা,
আমার নিরব দুঃখ গাঁথা,
তোমাকেই বলি ভাসিয়া ঐ জলের ঘরে ।।
দেহ লতার আয়ু শেষ,
আছে শুধু শিকড়ের কেশ,
জলাধারে মরণের ছায়া,
ঘোর আঁধারে দেখি না কায়া,
তোমারি সুবাস হয় বুঝি মরে ।।
সেই ভয়ে কাঁদি সরোজিনী,
তোমার আলোতে যেন চিনি,

সাঁই, আর আমাকে বাতাসে মেলি ধরে । ।
হুমায়ুন তাই ভজে,
তোমার অরুপে মজে,
চাই লক্ষ সরোজিনী হই ধরণী 'পরে । ।

হুমায়ুন-গীতি-১৪

বন্ধু আমার তোমার লাগি অন্তর করলাম ছাই (১),
তুমি আমার আমি তোমার (২) জানি শুধু তাই (১) । ।

নিভু নিভু জ্বলে বাতি, জ্বলে আগুন মনে,
পিঞ্জিরারই পাখির মত মন যে ছট্‌ফট করে, (২)

কান্দি এখন পথে বসে (২), চোখে পানি নাই (১) । ।

নিরন্তর তোমাকে ডেকে কি হইল মোর ফল,
মরণকালে আইসা বন্ধু দিও চরণতল(২),
মনের আশা মনে রইল (২) কি করে বুঝাই (১) । ।

০৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ

(বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত, সুরকার ও শিল্পী-মকবুল হোসাইন ফারুক) ।

হুমায়ুন-গীতি-১৫

তোমার লাগিয়া সমীরণ ধীরে ধীরে বহে,
সূর্যের করে পল্লব চুমে কানে কানে কহে । ।
হরণ করে নিলাম ছায়া,
যেন দেখো অরুপের কায়া,
ফুল ফোটে শাখে অলি এশ্ক অনলে দহে । ।
তোমাকে দেখে ক্ষুধা ভয় পালিয়ে বেড়ায়,
মরাদেহে মশগুল আহম্মদ হেরায়,
জীর্ণ কুটিরে স্বর্গের সুখ,
রসে ভরপুর তরু বুক,
স্বরূপ দেখে হরণ গাহে এ আমার নহে । ।
মজিয়া অরুপে হুমায়ুন,
দমে দমে বলে আল্লাহ
ভাব-তুফানে নাচে বন ধন্য, ধন্য, তুমি হে । ।

০৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১৬

ও বন্ধুরে-----

ওমে জলে গজে উঠে,
তোমারি দিকে চাই,
কোথা থেকে প্রাণ জোটে,
ঠিকানা নাহি পাই ।।
তোমার নিয়মে বেড়ে উঠি,
যে দিকে চাও সেদিকে ছুটি,
উর্ধ্বমুখী যাই ।।
মাটি 'পরে সবুজে ফুলে ফলে,
দেহ পেতে সকলে পড়ে চলে,
একেই যে বলে মারেফাত,
দেখে হুমায়ুন কুপোকাত,
দীক্ষা লয় তাই ।।

১৪/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১৭

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

ও বন্ধু

না বসিয়া ডালে,
ভ্রমর উড়িয়া যায় ।।
হাওয়ার তালে,
কষ্ট করিয়া হয় ।।
প্রিয়তম ভজে,
স্বর্গ সুখে মজে,
সুখের কিনারা পায় ।।
মাটি পুড়িয়া চৌচির রৌদ্রদাহে,
কায় মনে কেবল বরষা চাহে ।
হুমায়ুন কয়,
সুখ, দুঃখের রয়,
দুঃখের, সাযরে ধায় ।।

১৪/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১৮

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

কি রূপে মজিলে রে ভ্রমর, হইয়া কানাই,
অরুণের বনে আর কিরে, তোর দেখা পাই ।।
আমার মদিরা আঁখি,
নেশায় কাতর থাকি,
কামনার তরী বেয়ে চলি, পাগলিনী রাই ।।
সাজিয়ে ভুবন-মোহিনী মায়া,
খুঁজিয়া পাইনা তোমার কায়া,
ভুবন ও স্বর্গ ফেলে,
আশেক-মাসুক খেলে,
এ কোন্ কানাই রাই, বলে, হুমায়ুন সাঁই ।

২৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-১৯

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

লোকে বলে রাধা, আহারে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর,
রাধা কৃষ্ণ জানে, এ প্রেম ঈশ্বর প্রীতিডোর ।।
ঈশ্বর নিজে গীতিকার,
সুর-মূর্ছনা জানি তার,
হয়ে গেলো গান, যুগলে গাহিলেন মধুর ।।
যুগলের ঈশ্বর-প্রেম তরী বেয়ে
আসিল আলোক, জগৎ গেলো ছেয়ে ।
দু' জনেই দেখে ঈশ্বর,
দু' জনে দু' জনার 'পর,
এক আয়নায়, আর কণ্ঠে বাজে এক সুর ।।
এক ঈশ্বরে কত রূপ,
ভাবিয়া হুমায়ুন চুপ,
দিব্য চোখে দেখে, চমকে ওঠে কাটে না ঘোর ।।

২৮/১১/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২০

এ কোন মধুর বেদনায় বাঁধিলে রে
মালিক, অরূপে থাকিয়া,
সুখের আলেয়ার মোহে দেহ থাকে রে,
রুহের সুখ নাশিয়া ।
দেহের বন্ধু বানাইয়া দুনিয়া
মনের বানাইলে কাল,
মরিয়া বাঁচিতে বলিয়া আবার
দেখি বাঁচিয়া মরার হাল ।
সব দেখেও দেখি না তোমাকে হয় রে,
রুহানী চোখ খুলিয়া ।।
যে আলোতে দেখি তাহা মন্তু আঁধার,
তোমার নূর আসলে, ফসল কাঁদার ।
সেই নূর দিয়ে দেহ ভুবন পুড়ে
সব কর ছারখার,
তোমাকে দেখা ছাড়া অরূপ রতন
কিছুই চাহি না আর ।
ফকির হুমায়ুন কান্দে দেখা দে রে
দিব্য নয়নে ভালবাসিয়া ।।

০১/১২/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২১

ও বন্ধু, বাইরে তুমি সংসারী,
ভেতরে রাখো ফকিরী ।
বাইরে তোমার কালো শরীর
ভেতরে নূরের ঝলক,
দমে দমে আল্লাহ বলো
মিস্ করো না এক পলক ।
ও সাঁই, তুমি আমার কাভারী ।।
আল্লাহ ছাড়া শান্তি কোথা
রাজদন্ড পদতলে,
কেউ বুঝবে না বুঝবে মুনিব
আছ তুমি কোন কৌশলে ।

ও সাঁই, লোকে এ ভেদ বুঝতে নারি ।।
বিপুল ধনে-নিঃশ্বতায়,
প্রভেদ কি রে ভাই,
হুমায়ুন ভাবনা তাই,
অন্তরে বৈরাগ্য চাই,
ও সাঁই, নামটি জপি তারি ।।

হুমায়ুন-গীতি-২২

এমন তেল হইলাম না রে মানুষ
জনম লইয়া,
নিজের কথা কইলাম না রে গেলাম
জীবন থইয়া ।।
এখন আমি কবর ঘাটে রে
আছি মরা শুয়ে,
উত্তর সিথান পড়ে আছি রে
মাথা গেছে নুয়ে ।
পানির সাথে মিশিয়া গেছি রে লবণ
মিশাল্ হইয়া ।।
তেল পানি এক হয় না পূণ্য পাপের মত,
দ্বীন-দুনিয়া এক হয় না কাছে থাকুক যত ।
সুখের নীড়ে অগুন লেগে রে
পুড়ে হলো ছাই,
সময় ফুরাইয়া রুহ্ কান্দে রে
আর গতি নাই ।
পাগল হুমায়ুন জ্বলিতে চায় রে
তেলে পুড়া হইয়া ।।

০৬/১২/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২৩

ওরে অবুঝ প্রিয়তম ধূলায় লুটিয়ে দেহ শতদল,
কেন স্মরণের আঁধারে চাপা পড়ে বারে তোমার আঁখি জল ।।
তোমাতে সে দিলো সব,
আজি কেনো সে নিরব,
এ বুক সাগরে কেন উঠে না, প্রিয় আশার বাড় বাদল ।।
পড়ে তুই কার ছলনায় অসহায় হলে,
শ্বাপদ হাসে শুয়ে পিশাচীর বিছানা তলে,
যা ওরে যা ফিরে,
আপনার মরু নীড়ে,
হুমায়ুন ধু ধু বালু চরে সরোবর খুঁজে পায় অনল ।।

০৭/০৫/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, আগলা, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-২৪

আমার তরী ভাসে অকুল পাথারে
মেঘের কালো ছায়ায়,
সন্ধ্যা ঘনিয়া আসিছে হয় ।।
আমার আশার পিদিম নিভে গেলো রে
ভীষণ ঝড়ো হাওয়ায় ।।
হঠাৎ দেখি নায়ের মাঝে আছি আমি একা,
ভাগ্য দোষে আশার সাথে হইল না মোর দেখা ।
আমার পিছনে ধাওয়া করে
শত্রু কালো কায় ।।
জীবন ফুলে ক্ষণিক বসে মরমী মধুকর,
আবার দেখি উড়ে গেল দিয়ে শাপেবর ।
এই কি হলো হেরি কেবল তোমায় ডেকে ‘পরে
আমার বাঁচা দায় ।।
হুমায়ুন দীন কণ্ঠে বলে ব্যথা ভরে
কে রাগের বাঁশি বাজায় ।।

০৩/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-২৫

ওরে ভোলা মন, না বুঝিয়া সংসারের খেলা,
ভরাডুবি হইল তোমার, ধন করিয়া অবহেলা ।।
মারবে তোমায় পিষে ওরে,
কষ্ট অভাব আঁধার ভোরে,
এই দুনিয়ায় নাই রে তোমার আনন্দ মেলা ।।
বুঝে চলো স্বপ্ন আয়ে,
নড়বে না ঘর ঝড়ো বায়ে,
কোথা তোমার কুজন বন্ধু ভাংলো সুখের ভেলা ।।
এখন দেখো সরষে ফুল,
মিথ্যে সাধের জাতি কুল,
এ ভেদ বুঝে হুমায়ুন সাঁইয়ের চেলা ।।

২৫/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২৬

আমি কান্দি বসে নিরালয় বন্ধুর বিরহে,
বন্ধু ছাড়া প্রাণ বাঁচে না জ্বালা কি আর সহে ।।
কাঁদতে কাঁদতে ঘুমাই আমি
কাঁদতে কাঁদতে জাগি,
চক্ষু যুগল সাযর হইল,
প্রাণ বন্ধুয়ার লাগি ।
আইবা কবে রুহের মাঝে দেহ খানি দহে ।।
রাইতে দিনে খোটা মারে নফস ননদে,
পারলে আমায় ইবলিশে ধরে নিয়ে বধে ।
যৌবন গেল শুকাই আমার
আশায় আশায় খোদা,
খাইব না আর ভুবন ঘরে
গো, না করিলে যুদা ।
হুমায়ুন সাঁই ভেবে তা রুহের ভেদ কহে ।

০৮/১২/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২৭

তোমার প্রেমে মজ্জা আমি,
সংসার গেলাম ভুলে রে
সংসার গেলাম ভুলে ।।
বৃথাই আমি বুড়া হলাম,
হায়াত নিলে তুলে ।।
রুহের মধ্যে থাকো আমার,
কইলে কথা শুনি আবার,
সৃষ্টি মাঝে মিলে আছো,
কওনা গুমর খুলে ।।
তোমার রহমত দরিয়া হতে বিন্দু পানি দিয়ে,
তৃষ্ণা মিটাও অরূপ দেখি আত্ম রূপে গিয়ে ।
পাই না কেনো দেখতে আমি
জীবন চাকা আইছে থামি,
কাঁদি সাঁই হুমায়ুন শূন্যে আছি ঝুলে ।।

১৬/১২/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২৮

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

কেউ কি শুনবে আমার ভাবনা গুলো
যে ভাবে ভাবছি তাই,
নাকি, হারিয়ে যাব চিরতরে
যে ভাবে ভাবনাতে হারাই ।
কি যে মন চাহে জানে না তো কেউ,
মানুষ বারিখিতে লাগে না ঢেউ ।
ইচ্ছে করে, সেই ভাবনার তরী বেয়ে
ওপারে ফিরে যাই ।।
আপনার জগৎ আছে আঁধারে চেয়ে,
গুমরে কাঁদি অশ্রু ভরা নয়নে নেয়ে ।
চাই আলো, আলো চাই হে ঈশ্বর,
আলো লয়ে এসো হৃদয়ের 'পর',
অন্তর ভয়ে জড়োসরো, দহে
দাউ দাউ হুমায়ুন সাঁই ।।

২০/১২/২০০৮ খ্রিঃ

হুমায়ুন-গীতি-২৯

আমিরীকে দোষী করে স্বপ্নে পাইলে সুখ,
অরূপ দেখে তুষ্ট হয়ে ভরে আশার বুক ।।
কি ইবা হবে দু' দিন ধরে,
ভোগ সাযরে নাইলে 'পরে,
বালুচরে মহা কালে পুড়ে অরণালোক ।।
দেহে জ্বলে তুষের আগুন রুহে জ্বলে নূর,
আল্লাহ অবিরাম বলে এশকে এলাহী সূর ।
আমির তুমি হইলে না'কো,
ইহাই ভালো মুক্ত থাকো,
বাঞ্চা করে হুমায়ুন দশা এমন হোক ।।

(হযরত মনছুর হাল্লাজ (রঃ) স্মরণে ।)

হুমায়ুন-গীতি-৩০

(সুর- সৈয়দ আব্দুস ছামাদ, শিল্পী- আনোয়ারা ইয়াসমীন হুমায়ুন)

ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি ধন্য, ধন্য সুফী হে,
আল্লাহ ছাড়া তোমার খবর রাখে আর কে ।।
কেউ জানে না তোমার খবর,
তুলনাহীন তোমার সবার,
শুধু দেহে মরে গেছে তোমার রিপু যে ।।
রুহের ঈমান তেজে ইবলিশ ছুটে পালায়,
পাহাড় গুহায় জপ্ছে মহান পাঠশালায় ।
ফানাফিল্লা মধুর খেলা,
ভাসে সাগরে প্রেমের ভেলা,
দোয়া মাগে সাঁই হুমায়ুন সাথে ধরে নে ।।

হুমায়ুন-গীতি-৩১

পাখিদের ভাষায় সবুজ অরণ্যের নিরবতায়,
কাদাময় ক্ষেতে হাসি মাখা কিশোরের আকুলতায়
তুমি শুধু তুমি ।।
সোনালি পাটের আঁশে,
দেখো চেয়ে ছবি ভাসে,

কবিগণ চিত্রকল্পে আনন্দে বেড়ায় ছন্দময়তায়
তোমারি পদ চুমি ।।
মানুষ আর প্রকৃতি,
স্বরে তোমার কীর্তি,
এ জাতির জনক তুমি, শূনি বাতাসের বারতায়
শেখ মুজিব তুমি ।।

০৪/০৭/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৩২

ওরে, ও পদ্ম তুমি বাগানে না ফুটিও,
দোহাই তোমার, কারো মনে না জুটিও ।।
সৌরভ শুকিবে পবন,
আকাশ দেখিবে অমন,
নির্জনে প্রভু তরে, সুফি মাথা কুটিও ।।
আপনি গোপন থাকিও,
আঁধারে শরীর মাখিও,
এলে ধারে বনানী, দু'হাতে তা টুটিও ।।
হুমায়ুন চমকে রয়,
এমন মানুষ যে হয়,
পাইলে ভবে তারে, তুমি পিছু ছুটিও ।।

২৬/০৪/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৩৩

আকাশ হতে যদি, দেখিতাম দু'চোখ ভরে,
চাঁদনী রাতে ঝলমল আলোয় ঘরে ঘরে ।।
এত তারা তোমার চোখে,
এত মেঘ তোমার বুকে,
নীল সাগর চেয়ে আছে তোমাকে মনে করে ।।
আকাশ নুয়ে চেয়ে থাকে,

বাংলাদেশের ছবি আঁকে,
আকাশের রঙ ধনু বঙ্গবন্ধু তোমাকে স্মরে ।।
হুমায়ুন ভেবে কয়,
মানব প্রেম এমন হয়,
দেখো, আগুন পতঙ্গ খেলা কেমনে বাঁপিয়ে পড়ে ।।

সুর- গুস্তাদ সুরেন্দ্র বর্মণ ।
১০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৩৪

কেন এসেছিলে গো তুমি, বুঝি না
আজও বুঝি না, বাংলাদেশ-
দীপ হয়ে তুমি আলো জ্বলে স্বাধীনতার
একা চলে গেলে শেষে ।।
ওই সুদূর আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে,
তোমার আলোয় ভেসে যায় আঁধার ক্ষয়ে ক্ষয়ে ।
তবু আজও চিনি নি তোমায় স্বর্গ দূত
চলে গেলে ছদ্ম বেশে ।।
ভাষণ তেজে বিদ্যুৎ চমকে জনতার মনে,
বৃষ্টির মত ঝরেছিল রক্ত একান্তরে প্রতিক্ষনে ।
আজও শুনি মেঘের গর্জনে মুজিব তোমার
বজ্র কণ্ঠ আকাশে ।।
হুমায়ুন ভেবে কয় হয়,
এমন ভাষণ যাদুকর কে পায়,
ওগো জননী তোমার গগন ললাটে
মুজিবের ছবি ভাসে ।।

১৫/১২/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৩৫

আমার অশ্রু দিয়ে গোসল দিবো,
ওগো মুজিব তোমার গা,
ও সাগর যা, শুকিয়ে যা ।।
তোমার স্বপ্ন বলাকা হয়ে আকাশে উড়ে,
নিভ্তে কষ্ট ধরে মেলে একাকী সুদূরে ।
জড়িয়ে ধরে তোমার বাংলা মা ।।

সাধ জাগে জোনাকী আমি আলো জ্বলে,
আষাঢ়ে ঢলে আমার রক্ত দিবো গো ঢেলে।
যদি পাই স্বর্গে তোমার দেখা।।

হুমায়ুন-গীতি-৩৬

ওরে অবুঝ, তোর প্রিয়তমা ধূলায় লুটায় দেহ শতদল,
কেন স্মরণের আঁধারে পড়ে ঝরে আঁখি জল।।
যে দিলে তোরে সব,
সে কেন আজি নিরব,
এ বুক সাগরে কেন তুলে না দাবীর ঝড় বাদল।।
তুই কার ছলনায় পড়ে মনে অসহায় হলে,
শ্বাপদ হাসে শুয়ে পিশাচীর বিছানা তলে।
যা, ওরে, যা ফিরে,
আপনার মরু নীড়ে,
এ জীবন ধু ধু বালুচর- সরোবর খুঁজে পায় অনল।।

০৭/০৫/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৩৭

পল্লব নেড়ে নেড়ে কে যায় দেখিতে কি পাও,
সে আমার শেখ মুজিব, নাও ছালাম নাও।।
হয়ে দোয়েল কোয়েল পাপিয়া,
আজও উঠে বসে ডাল কাঁপিয়া,
তোমারি ভালবাসায় মাচায় বুলিছে লাউ।।
সরিষা ক্ষেতে রোপা ধানে তুমি,
তুলে হিল্লোল সমীরণ চুমি,
বিলের হৃদয়ে ফুটিছে শাপলা দেখে যাও।।

১৫/০৭/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ।

হুমায়ুন-গীতি-৩৮

আমি আষাঢ়ে জলে সয়লাব হয়ে তোমাকেই খুঁজি,
আমি চৈত্রের খর তাপ গায়ে মেখে তোমাকেই বুঝি ।।
তুমি আদরে সোহাগে শাসনে,
বিমোহিত করে যাও ভাষণে,
হে মুজিব, আমার জীবনে তুমি সাহসের পূঁজি ।।
আমার সবুজে বিস্মিত দুনিয়া,
ফলে ফুলে শস্য ফসলে স্বপ্ন বুনিয়া,
ফিরে তোমার বুকে, হে কুটুম্ব প্রাণ দিয়া পূঁজি ।

০৬/০৬/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৩৯

গেলো কত কত কাল ফিরে ফিরে,
কেহ কহিল না মা,
স্বর্গ হতে এসে কহিয়া মা,
আবার ফিরে গেলে বাবা ।।
এ জগতে দিলে স্বাধীন ঠাঁই,
গর্বিত মা আমি দাঁড়াই,
জগৎ সভায়, হে মুজিব বাবা আমার,
তোমার পরিচয়ে বাবা ।।
তুমিই বাংলাদেশ, সবার সেরা,
আমার মনে তুমি, ওগো তুমি দিয়ে ঘেরা ।
তোমার আত্মার কুটুম্ব যে বাবা,
থাকিও স্বপনে সর্বদা বাবা ।।

১৮/০৭/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৪০

(সুর- কবি স্বয়ং, তাল- কাহার্বা)

একীনি জোশের জ্বালানী পুড়ে
আশেকে এলাহী ডোরে,
তাওহীদের ঐ চাকা ঘুরে জোরে জোরে
কোন্ সে মধু সুরে ।।
সরল এ পথে আলোর মত,
প্রভু দর্শনে ছুটেছে যত,
দরবেশ আর সুফি শত শত শত,
রুহানী যন্ত্র নুরে ।।
মানবের দেহের রস কমিলে পরে,
ত্যাগীয়া দেহ রুহু ছুটে আলোর ঘরে ।
জীবন্ত অনন্ত লোকে চরাচরে
সাধনা পাহাড় চূড়ে ।।
বৈরাগী হুমায়ুন তাই রোজা করে,
উপুসে গোপনে গোপনে রিপু যায় মরে,
মনে হয় বাহিরে বিষয়ী ভেতরে,
খুঁজিছে নিজে প্রভু রে ।।

১১/০৯/২০১০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৪১

(সুর-কবি স্বয়ং, তাল- দ্রুত দাদরা) ।

হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও,
প্রভুর দেখা মিলিবে সেথায় চাও, যদি চাও ।।
ওরে দুনিয়ার চিন্তা খোর,
তোর নিশি হইবে না ভোর,
তোর ভজন বিফল নাও বুঝে, বুঝে নাও ।।
হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও ।।
ঘন বনে তরুণতা আনমনে যাচে অরুণকর,
ফুলের ধ্যান বনে সাজায় ভ্রমর বাসর ।
বলো হৃদয় উজাড়ি দাও দেখা, দেখা দাও ।
হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও ।।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৭৩

দৃষ্টি জুড়িয়া প্রভুরে চাই,
না হলে মরি! দৃষ্টি নাই,
এ হৃদয় মন্দিরে পাও খুঁজে, খুঁজে পাও ।।
হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও ।
কবি হুমায়ুন কাঁপিয়া উঠে,
পেছনে তার দুনিয়া ছুটে,
প্রভু তারে সোজা পথ, বাতলাও, বাতলাও ।।
হে সুফি নিরবে নির্জনে যাও ফিরে, ফিরে যাও ।।

১১/০৯/২০১০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৪২

কান্দে রে কে কান্দে রে হেক্‌মত চাহিয়া,
অশ্রু সাযরে নাহিয়া, পাইবে না- না, না রে ।।
মালিকের তীর, কে রে রোধিবে,
সত্যি জানি রে, আঁখি মুদিবে
নিষ্ফল আগে বাড়িয়া, করে চাহে, চাহে রে ।।
কান্দে রে কে কান্দে রে হেক্‌মত চাহিয়া ।।
ভক্তিতে মিলে, মুক্তি জানি,
বিশ্বাসে খোদা, নবীর বাণী
টলে না সে আগুনে দহিয়া, মেনে সে চলে রে ।।
কান্দে রে কে কান্দে রে হেক্‌মত চাহিয়া ।।
হুমায়ুন কহে, নিশানা তুমি,
ভক্তি ভরে কোরাণ, চুমি
নূর বারে কপাল বহিয়া, সাধু বলে তারে ।।

(হযরত মনছুর হাল্লাজ স্মরণে)

হুমায়ুন-গীতি-৪৩

(সুর-কবি স্বয়ং, তাল- দ্রুত দাদরা)

নদীরে
সায়র পানে বইছে তোমার বারি নদী,
নদী আকাল কিরে জল, যদি পাও যদি রে ।।
বিলে খালে জমে পানি যে কাঁদে,
আবর্জনা গায়ে সে বাঁধে ।
করুণ নিনাদ শুনছে বায়ু নিরবধি রে ।।
নদীরে
ঘ্রাণে বুঝা যায় আসল ফুল,
প্রসাধনী নহে সমতুল,
খাঁটি দুধ চেনা দায়, দেখে জমানো দধি রে ।।
নদীরে
প্রভু তরে কাজ করিয়া যাবে,
গায়েবী মদদ পাবে,
বরবাদ হয়ো না হুমায়ুন, ভব সাধি রে ।।
নদীরে

(হযরত নিজাম উদ্দীন আওলীয়া স্মরণে)

হুমায়ুন-গীতি-৪৪

(সুর- কবি স্বয়ং, তাল- দ্রুত দাদরা)

হে অলিরে.....
কেমন মানুষ তুমি বলো, কেমন মানুষ তুমি,
ধ্যানে আল্লাহ জ্ঞানে আল্লাহ, মুখে নাম চুমি, যাও ধীরে ।।
নির্ভীক নির্বিকার চিন্তে,
বীর রূপে না ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিত্তে
যোগ সাধনে মত্ত হইয়া, কৃপা মাগে হরদমে রে ।।
হে অলিরে
ভুবন ঘুরে পিছে তোমার,
তুমি খোলো নূরের দুয়ার,
সদা মগ্ন জিকির সুধায়, সৃষ্টি সবে নমে রে ।।
হে অলিরে

অবুঝা মুখ হুমাযুন
ডুবিছে আঁধারে বারিছে খুন
হে দয়াল আল্লাহ তুমি বিনে, উদ্ধারিবে কে রে ।।
হে অলিরে

০২/১০/২০১০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমাযুন-গীতি-৪৫

কায়দা শেখায় পীর মুর্শিদে
চেষ্টা থাকে নিজের,
ছুঁয়ে দিলে জিন্দা পীরে
ফুটবে চারা বীজের ।।
আল্লাহ তরে জীবন বিকাও,
চোখকে তোমার কাঁদতে শিখাও,
মনে মনে মরিয়া যাও, ভিত্তি গড়ুক রুহের ।।
কায়দা শেখায় পীর মুর্শিদে, চেষ্টা থাকে নিজের ।।
ভুল করো না ভুল করো না ওরে,
লেগে লেজে গোবরে
লক্ষ্য হলো আল্লাহ পাওয়া, গুরু তোমার অলিরে ।।
কায়দা শেখায় পীর মুর্শিদে, চেষ্টা থাকে নিজের ।।
হুমাযুন তাই মতে মতে,
বন্ধু খুঁজে পথে পথে,
আল্লাহ তরে সঁপে দিয়ে, অধম জীবন রে ।।
কায়দা শেখায় পীর মুর্শিদে, চেষ্টা থাকে নিজের ।।

০২/১০/২০১০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমাযুন-গীতি-৪৬

(সুর- কবি স্বয়ং, তাল- কাহার্বা)

অরুণ আছে বুক, বুঝিবে সুফি ধরে,
খোদার নূরে তোরে, ভরিয়ে দেবে হরে' ।।
'অমিয় খোদা স্মরি,
পাইব শান্তি মরি ।।

আশেকের অশ্রুধারা খোদায়ী দয়া বরে' । ।
একত্র জিকিরে হুদে সাধক ডুবে যায়,
খোদা রে পেয়ে অলি আর কিছু নাহি চায় ।
শক্তিশালী ঈমানে দেখিয়া প্রভুরে,
ভুবনেতে ফিরিতে চাহে না রে সে যে কভু রে । ।
অলিয়ে কামেল নিজাম উদ্দীন বলে,
রে, হুমায়ুন জ্বালো রুহানী বাতি ডরে । ।

০৯/১০২০১০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৪৭

প্রজাপ্রতি ঘাস ফুলে পাখা মেলে বসে আর উড়ে,
ফুল হ'তে ফুলে হেলিয়া দুলিয়া প্রেমবাণী দে রে ছুঁড়ে । ।
পরাগ লাগিয়া যায় আনন্দ ভরে,
হলুদে পাখা তার যায় গো সরে',
মধু- মুরতি হেরি মোর হৃদয়াকাশে উঠিল প্রেমচাঁদ ঐ দূরে । ।
নাহি কেহ সম্মুখে মোর তবু হয়,
ফাঁকা ফাঁকা দেখে কারই মায়ায়,
মন-পাখি মোর নাচিয়া ওঠে গান গাহিয়া যায় নতুন সুরে । ।
অবহেলায় তুলি পা গেলি চলে,
তাই হেরি হয় বিছানায় পড়িছু ঢলে,
তবু প্রেম রাগের মধুর তান বাজে হৃদয়ে মোর পাষাণী ওরে । ।

১৯/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৪৮

বেহায়া আঁখি মোর কেন চাহিয়া থাকিস্ ঐ দূরে,
কোন পাষাণীরে বাঁধিয়া রাখিস্ তোর প্রেম ডোরে ।
সে তো মরিয়া গেছে আজ হতে বহু দিন আগে,
মরা গাছে কি আর কভু সজীব পল্লব জাগে ।
ওরে আবেগ ওরে মায়া ওরে হৃদয়হরা,
তোর মাঠে কেন আসে চৈত্র মাসের খরা ।
সুখের পাখি, ডাকিবে না আর ফুল ফোটা ভোরে ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৭৭

রচিয়া তোর মধুর জগৎ, মজে গেলি প্রেম অনুরাগে,
এসো হৃদয়ে, এসো, মোর গগণে বলে হৃদয়ে রঙ্গ লাগে ।
এই প্রেম এই ভাল বাসা মোর, নাহি কভু ঝরে,
যত ভুলিতে চাহি হয়, তত মোর মনে পড়ে ।
কথায় ভুলিয়া গেলি, না চিনিয়া নারী তার গানের সুরে ।
এই ভালো থাকি অমনি করে মনের দ্বার খুলে,
আবার যদি কোন সোহাগিনী আসে পথ ভুলে,
অনুরাগ মাখি হৃদয়ে স্বপনে, ঘুমাই অঘোরে ।

১৯/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৪৯

আজি বাড় বহিছে ভুবনে আমার, কাঁদিয়া মরে ভোরের পাখি,
কালো মেঘ উড়িছে প্রবল, ঈষাণ কোণে, কাঁপিয়া উঠে প্রেম সাকী ।
পরালে মালা কার গলায়,
আমার পৃথিবী ছাড়িয়া,
সোহাগে পরালে মালা কার গলায়,
আমার প্রেম গেল হারিয়া ।
টেউ ভরা মহা সাগরে ডুবিয়া মরা
রহিল আমার বাকী । ।
বুঝেছি পিশাচী শুধু ছলনা করি,
এসে ছিলে কাছে তাই,
কাকের মত, চলে গেলে কা কা রবে
ডেকে পাষণী ছাই ।
কাহার অঙ্গে দিনু রে আতর, সেই দিলে
অঙ্গে ধূলিমাখি । ।
বেসেছি নু ভালো দুষ্টমি করে ভুলে,
ঝরা কালো কমলে,
পাষণ পথ চারী আমাকে ভুলে
সে ফুল যায় দু'পায়ে দলি ।
বাড়ছে রক্ত হৃদয় হতে, অবশ দেহে আমি দাঁড়িয়ে থাকি ।

হুমায়ুন-গীতি-৫০

দূর হতে হেরি অপলক, চলে না, পা
মোর হৃদয় দোলে
ঢিল ছাড়ি নদীতে উর্মিমালা
কন্ কন্ করে কুলে ।।
কম্পিত হৃদয় আবেগে ভরে যায়
জল পড়া নিরঝরিণী
ওরে, ও মনোহারিণী
সলাজে লুকায় আড়াল হতে দেখি
কাহারে আঁখি তুলে ।।
পল্লবমৃদু বায়ে কেন, কেন জানি রে
মূর্মর করে ভুলে
ডাকে আঁখি তুলে
হৃদয়রাণী আসিলে কাছে তাই হৃদয়
আসনে কম্পন তুলে ।।
প্রিয়া মোর দখিনা-দ্বার আজি
দেখ দিয়াছি খুলে,
শুধু আমাকে ভুলে
উতলা প্রাণে রঙ ধরে যায় ফুল
ডুবে দেখি কালো চুলে ।।

১৬/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৫১

আমার এ ভুলের নাহি নাহি সমতুল,
হায় অবশেষে ভাঙ্গিল মোর মহাভুল ।।
বাজিল বেদনার ঢোল,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল,
ওগো প্রিয়া মোর, জানি না কেমন সে শূল ।।
ছন্দ মোর হারিয়ে গেলো,
তুমি তারে নিয়া খেলো,
কোন মনের খবর রাখি না এক চুল ।।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৭৯

পথের বনফুলে হয়,
জানি সে কবিকে কাঁদায়,
অচেনা তরী বেয়ে, আমি হারালাম কুল ।।

১৭/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৫২

ভালবেসে কেন মিটেনা পিয়াস, কেন তোর, ওরে কবি,
তাই আলতা মেখে মনে আঁকিস ভালবাসার ছবি ।।
আসিল কী দুয়ারে কেহ,
আলোকে ভরিল কি গেহ
চাতকী কবি সুন্দর পূজারী মনের রবি ।।
প্রেমিকা ভাসে কল্পলোকে,
হিল্লোল ওঠে তোর বুকে,
পেলি না ছোঁয়া কারো ওরে, কবে তুই শান্ত হবি ।।
সমাজে নিয়া যায় তোর,
প্রেম করিয়া জোড়,
হৃদয় কাটিয়া আর কত দিন হৃদয় পাগল বাঁচবি ।।

০৭/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরামখান পাড়া, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৩

তুমি যাও ফিরে, যাও ফিরে, আপনার ঘরে,
আলোক ভরা ভুবনে ফুল নিয়ে দু'হাত ভরে ।।
গাঁথিব না মালা, সঁপিব না তুমা,
করো না পাগল ও রূপের অনুপমা,
আসিলে মোর ধারে,
মোর বেদনার ভারে,
নয়ন ভরে অশ্রু জলে হৃদয়ের রক্ত ঝরে ।।
সুখি হও তুমি, হও সুখি,
মোর মনের উষায় মেরে উঁকি,
দিনমণি দিন শেষে, আঁধারের সাথে খেলা করে ।।

আমার বেদনার বালু চরে,
ভালবাসার হাত ধরে,
সুখের ঠিকানা খুঁজি, দান করি প্রিয়ায় অপরে ।।

০৯/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরামখান পাড়া, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৪

রূপসি তোর রূপের কুহকে পড়িয়া দিবাযামী,
কেন বলো আমারেই শুধু থাকি, ভুলিয়া আমি ।।
কেন মিথ্যে আলেয়ার পানে,
হায় ছুটিয়া ছলি দৈব টানে,
প্রেম সে তো নয় সে যে, মোর চির পাগলামী ।।
কাটা ধান ক্ষেত খানি, আপনার সকলি দানি,
চেয়ে আছি অসহায়, কাঁদে না তো ভূ-স্বামী ।।
নাই যেথা হৃদয়ের ছোঁয়া,
সেথা সকলি ফাঁকি আর ভোঁয়া,
জানি চোখের নেশায় পড়ি, হঠাৎ পথে যাই থামি ।।

০৯/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরামখান পাড়া, কিশোরগঞ্জ ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৫

বন্যা আসে, আসে বরা বাঁচিতে নাহি দেবে ধরা,
মহামারী আসে, দস্যুদল আসে, চল করি তুরা ।।
কোথা নেবে তোরা ঠাঁই,
মরা ছড়া উপায় নাই,
কাজ নাই, নাই চাল ঘরে, খাবে কী ভাত মরা ।।
তরুরা কাঁদে সারা বেলা,
ছেলেরা করে ভেলা নিয়ে খেলা,
সুখী যারা, আনন্দে মাতে তারা ধরা করে সরা ।।
ও, ও, ও, ঘর হারা মানুষ হারা ভাই,
ভগবান করে, নাহি করে বিচার ছাই,
লংঘি বাড়ি, হয় ধর নয় মর, রাখিস নে হাতে জলকড়া ।।

১৬/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৬

ওরে, ও পাগলি মেয়ে যতই করিস অভিমান,
দুরু দুরু দু' তারায় বাজে তানপুরি তান ।।
কার সোহাগে রইলে দূরে,
কোন্ দোষে তুই কাঁদাস্ মোরে,
সুরা ডালে বসে পাখি, গাহে সুখের গান ।।
টল টলে ঐ নদীর জলে হাসে কে গো,
প্রাণে প্রাণে জোয়ার তোলে শুষ্ক চরে গো,
মৃদু বায়ু বাঁকায় তুমায়, শরমে মুখ ঢাকি,
হাতের আড়াল নাহি করে কাজল কালো আঁখি,
আজি ঐ গাঁয়ের ঐ কালো মেয়ের প্রাণ করে আনচান ।।

০৭/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৭

পল্লবে পল্লবে বায়ু ঘুরে ফিরে কথা কয়,
আমার হৃদয় পল্লবে শুধু তারই সুর বেজে বয় ।।
একি প্রাণ কোন দিন পায় না সুখের ছোঁয়া হয়,
কেবলি কেঁদে মরে ভালবেসে আকুলতায় ।
যে প্রেম হৃদয়ে বয়ে চলেছি অনেক দিন,
স্বপ্নে শুধু ভাসে সুখের বাসর ঘর রঙিন ।
রে প্রেমিক রে প্রেমের কাঙ্গাল আজি তোর,
কাটিয়া গেল রজনী স্বপ্ন ভঙ্গ হলো, হলো ভোর ।
যৌবন বাগানে গুঞ্জরে ভ্রমর বোঁ বোঁ রবে,
আশা এ হৃদয়ে, প্রেমিকার সনে প্রেমের কথা কবে ।

২১/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৫৮

কেউ আসে না কাছে বলিতে কথা হাসিয়া,
কেউ মোর গলায় ধরে না, ভালবাসিয়া ।
হায় কভু দেখিলে তারে হৃদয় মোর নাচে রে,
চাই ছুটে যেতে কাছে, তবে পরাণ বাঁচে রে ।

যবে হেরি কাঁটালতা, ঘেরিছে আমায়,
বারণ করে কথা কইতে মোরে, কেউ হয় থামায়।
আমি যারে কাছে নেই শুধু টানিয়া,
যায় সে বুক বড়ো আঘাত হানিয়া,।
কেউ আসে না কাছে বলিতে কথা হাসিয়া
কেউ মোর গলা ধরে না ভালবাসিয়া।
একি আঁধারের টানে আমি পথ চলি,
মনে মনে, কেন হয় তার কথা বলি।
এ প্রেমের প্রাণ দুঃখ লয়ে কাঁদে,
পাই আঘাত আরও আশায় বুক বাঁধে।
কেউ আসে না কাছে, বলিতে কথা হাসিয়া
কেউ মোর গলায় ধরেনা ভাল বাসিয়া।

২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৫৯

নিশাচর কে রে তুই, দেখাবি ভুঁতের ভয়,
এ প্রেম পাগল হৃদয়ে ভয় তো কিছু নয়।
দেখবি যত ভয়, তত হবে তার মনের জয়,
এ প্রেম পাগল হৃদয়ে ভয় তো কিছু নয়।
স্রোতের টানে ভানে খড়, আমি তো পাথর,
ওরে ফুল সে তো তোর প্রেমের জ্বরে কাতর।
আকাশের তারায় কেন তুই ঢাকি মেঘে,
বিজলী সে তো তারার মায়ায় যায় রে রেগে।
যতই পদে আঘাত দিয়া খেলার বলে,
লাগি, দেয়ালে ফের আসিবে তোর পদতলে।
ছুটিয়া বেড়ায় সে নিরবে, স্বভাবে, ঘরে মাঠে,
চোখ আছে বলে সে হৃদয়ের দুর্ভেদ্য দ্বার কাটে।
সহি শত আঘাত উর্মি মাঝে সে মহা সাগরে,
মুক্তা আনি ছিনিয়ে কভু সে নাহি যে মরে।
প্রাণের টানে ছুটিয়া চলি আমি মধুকর
চিরদিন ফুলের-নহি কভু তার পর।

২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হৃদয়চ্যারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৮৩

হুমায়ুন-গীতি-৬০

নাহি আমি শুধাব ভাষা তব,
আশা নাই আর বলো কাছে রব,
যাও, দূরে যাও, বুঝেছি আমি হয়,
মোর কেহ নও তুমি, শুধু আকুলতায়,
ছন্দহীন বিষয়ের দ্বারে দ্বারে-
আমি পড়িয়া রব, আমায়
কাঁদাবে জনম ভরে হৃদয় জ্বালায়।
যাও, তুমি যাও তোমার খেলায়
কারে নিয়া বাঁচো তুমি সেথায়,
আমার হয়নি কিছু, দুষ্ট মায়ায়,
আঘাত হানিও না আমায় বারে বারে।
নাহি আমি শুধাব ভাষা তব,
আশা নাই আর বলো কাছে রব।

২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৬১

ও মন কোন্ মনে পেতে চায় ঠাঁই,
সে মন কেবলি বলে চলে যাই, চলে যাই।
সে, মন কোথা গেছে ছুটে,
ও মন হয় বুঝে নাই মোটে।
পাগল শিশুর মত ও মন হয়,
খেলনার পানে কেন ছুটে যায়।
বুলবুলের ক্ষুধায় ফুলের কি হয়,
ফুল সে গড়বে, ফুটিয়াই হরষে রয়।
শিশিরে সে ক্ষণিকের সাথে,
মাথায় রাখিয়া ঘাস তার খোপায় বাঁধে।
দোলাতে থাকে সে পল্লবে মেলে,
কি হলো ঘাসের, শিশির চলে গেলে।
ও মন কেবলি বলে চলে যাই, চলে যাই।

২৬/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ আগলা পূর্ব পাড়া, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৬২

হিয়া মোর নাচে রে নাচে রে ছন্দ তালে,
কিসের ছোঁয়া পেয়েছিল সে কোন্ কালে।
আপন মনে গাহি আমি মন চেতনায়,
আজি হলো মোর জয় আনন্দ বেদনায়।
হিয়া মোর নাচে রে নাচে রে ছন্দ তালে,
কিসের ছোঁয়া পেয়েছিল সে কোন্ কালে।
পুলকে মরি বলি না কোন কথা।
চেয়ে চেয়ে শুধু মিটাই মম ব্যথা।
বনের বিহগ বাসি ভাল আজি আমি,
নিরবে চোখে শুধাই ভাষা দিবাযামী।
আঁকি কল্পনার ফুলের মালা আজি তাই,
পুলক নিয়া কল্পনা স্বরগে নিব ঠাঁই,
হিয়া মোর নাচে রে নাচে রে ছন্দ তালে,
কিসের ছোঁয়া পেয়েছিল সে কোন্ কালে।

হুমায়ুন-গীতি-৬৩

কে গো তুমি মানসী মোর, ডাকিছ দূর বিরহে
তোমা বিহনে হিয়া মোর বিষ জ্বালায় দহে।
হেরি কল্পলোকে ছুটে যাই তোমা পানে,
ললিত কণ্ঠে বলি কথা শুধু হৃদয় টানে।
মন জানে শুধু তোমাকে আর কিছু নহে
শয়নে স্বপনে হে প্রেয়সী তোমারি কথা কহে।
মন ঘিরে ফাল্গুনী পবন বহিছে ধীরে আর,
ফুল খানি দোলিছে শাখে, সুগন্ধ কত তার।
জানি হে পুষ্প তুমি শুকিয়ে যাবে অকালে,
ঝরাবে হৃদয়াশ্রু, ভয় কান্না তালে।
বাজিছে বীণা মোর, মিলন-বিরহ সুরে,
বাসনা জাগে, তোমারে বাঁধি প্রেম ডোরে।

১০/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ মোগদা পাড়া, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৬৪

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে কেন আপন মনে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূর্ব আলয়-মনে ।
কেন করে মোলাকাত, কিসের অভাব,
জানি, হে জানি ঘুরাই যে তার স্বভাব ।
কারও হৃদয় চাহি ঘুরি আমি হৃদয় খুলি,
সাথে চড়ে বেড়াই মলয়ে, আপনি ভুলি ।
হায় আমার বেদনা আমারই থেকে যায়,
জোনাকি নাহি কিছু পায়, আঁধারে ডুবে হারায় ।
উড়ে যাও প্রেম বাঁধন হারা, সারস পাখি,
বলো না হৃদয়ের কথা, ব্যাকুলতা চাপিয়ে রাখি ।
আমি আমায় খুঁজি ছোয়ার কার,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভাবি কথা তার ।

১১/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৬৫

আমি যাই ফিরে আপনার নীড়ে,
থাকিব না আর বাসী ফুলের ছলনা ঘিরে ।
মুক্তির গান গাহি,
নতুন গগণে চাহি,
মুছে যাবে সকল ব্যথা মোর,
ফুল দিয়া বিষ ফুল করিব দূর ধীরে ।
যে ফুলে গন্ধ নাই,
কেন সে ফুলে যাই,
ভাবিয়া আমি ক্লান্তি ভরে মরি,
মন চায় আজ নতুন ফুল ধরি ।
আনন্দ লাগিছে মনে কত,
সর্তের যত কণা আছে তত,
আমি যাই ফিরে, আপনার নীড়ে,
থাকিব না আর বাসী ফুলের ছলনা ঘিরে ।

১৬/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-১৮৬

হুমায়ুন-গীতি-৬৬

আনত নয়নে মায়ার কাজল রেখা আঁকা,
কণ্ঠে সোনার হার তোমার, মনোহরিনী
কেমনে বসেছ তুমি ও সুন্দরী আধো বাঁকা,
মাথার বেনী ঝুলছে বুকে তব ও হরিণী,
তাই আনমনে তোমাকে হেরি,
কানে পড়েছে দুল পায়ে নুপুর ভেরী।
চোখে তোমার মায়ী,
নিয়েছে হিয়া ভাল লাগে কায়া,
কাঁচা রোদের রশ্মিতে হলুদ তনু উঠে ঝলকে,
মোর নয়নে রাখি ডাগর নয়ন উঠ তুমি চমকে।
অবাক আমি মনে মনে বলি যাই কথা মধু মাখা।

১৯/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ আগলা, নবাবগঞ্জ।

হুমায়ুন-গীতি-৬৭

বসন্তে ফুটে ফুল ডাকে কোকিল কুলু কুলু,
বৈশাখে ঝড়ো বাতাস বহে জোড়ে মূর্ছমূর্ছ।
আষাঢ়ের বারিধারা মধুর লাগে তাই,
নিশীথে শুয়ে বিছানায় আরামে ঘুমাই।
শরতে শ্যামল সবুজ প্রান্তর নয়ন জোড়ায়,
গাঁয়ের কিশোরী হেমন্তে বনে পাতা কুড়ায়।
কত খেলিয়া যায় মৃদু মলয় শীতের শেষে,
নতুন সাজে ফুল কুমারী ফুল বনে যায় হেসে।
এ দেশের মাটি মানুষ সাথে গান গায়,
চিরদিন তারা একে অপরে কাছে পেতে চায়।
সাগর সৈকতে উদাসীন কোন কবি,
এ দেশের রূপ নিয়া আঁকে রমণীর ছবি।
প্রাণের মুখ খুলিয়া বলি বিহগের সাথে,
কৃজন দিয়া উষায় তারা তাই আনন্দে মাতে।
নাহি আমি যাব কোথা, জন্মভূমি ছাড়ি,
লক্ষ্মী মায়ের মত মোরে কোলে নাও কাড়ি।

২৩/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৬৮

ওগো সরবিলী আমারে খুঁজিতে গিয়া পেয়েছি তোমায়,
নিকষ আঁধারে নিরিবিলি চাঁদ আরামে ঘুমায়।
ভাবী না হয়ে হতে যদি জায়া
চৈত্রের খরতাপে পেতাম আমি ছায়া।
আলোর পাখিরা ভরে সোহাগে বাতাসে চুমায়, চুমায়।
বন্দিনী জল পুকুরে জমে হায়,
সাগর পিপাসায় ক্ষণে ক্ষণে মুর্ছা যায়।
পথিক তরঙ্গ অসহায় শাপলায় জলে কেন ডুবায়।
দূরন্ত পবন ভাঙ্গে যদি ঘর,
আড়ালে থাক বাড় করি পর,
আসে যে নিরবে যায় চলে, ঘর ভরে কার বিরহ শোভায়।
২৩/০১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৬৯

এক ফোঁটা আলো দিয়ে বিষ ছড়িয়ে দাও,
আমার বেদনায় তুমি, এসে যাও গো এসে যাও।
আজি উষায় যে সুর পাই,
তুমি তো তাই, তাই গো তাই।
আমার হাতে তুমি ক্ষণিকের মালা নাও।।
দক্ষিণা পবন আমি দোলা দিয়া যাই,
যে পথে তুমি, এসেছি সে পথে তুমি নাই।
দেখি জীবনের বিষাদের ছায়া,
যেথা নাই গো তোমার মায়া।
মনের হরষে তোমার তরী তুমি বেয়ে যাও।
২৩/০১/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৭০

কেন বারে বেদনার অশ্রু, শোকের আঁখি বেয়ে,
কেন সুনীল আকাশ যায়, বেদনার মেঘে ছেয়ে।
কে গো তুমি ফুল মঞ্জুরী এসে,

ঝরে গেলে আপনি হেসে,
বিলাপে বিলাপে মুর্ছা যায় একেলা শাখা মেয়ে ।।
এ কোন দরদে ঘুর্ণি হাওয়া ঘরে রয়,
কার লাগি আঁধার এল আজি ধরাময় ।
সদা কাঁপে লতা কার মায়ায়,
রাখে কারে হিয়ার নিবিড় ছায়ায় ।
বুঝে জননী জঠর ভরে যায় শূন্য তার পথ চেয়ে ।

১২/০৫/১৯৮৮ বাহরাম খান পাড়া, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭১

ওগো বন্ধু আমার, তুমি দেখিও আকাশের চাঁদ,
দেখিয়া দেখিয়া মিটাইও তুমি মনের সাধ ।
মনের কথা বলিয়া যাও,
তার পানে হাত বাড়িয়ে দাও,
চাহিও না কাছে তোমার, আঁখি পাতা বুঁজে,
করিও পূজা সদা তুমি, থাকিও তার খুঁজে ।
মনের রাজায় দিও না তুমি, কভু অপবাদ ।
কোকিলের মধুর সুরে,
পাগল মন যায় দূরে,
দেখনি কোকিল গেয়ে যাও মৃদু সুরে গান,
আমাকে ডাকিও না আমি যাযাবর কহু সুর তান ।
বাধিও না কভু তুমি মনে, আশার বাধ ।

১৫/৩/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭২

ডাগর নয়ন দুটি মেলে
পরমা সুন্দরী কে গো যাও,
হৃদয়ে বহে উচ্ছাস কত
মৃদু ভাষণে বারেক সুধাও ।
দুষ্টুমী করে হাসিয়া উঠে
সহসা দেখি মধুর কায়া,

যেন ফুটিয়া উঠিল ফুল
সবুজ বনে নিচে শীতল ছায়া ।
হৃদয়ের পরশ পেয়ে
ক্ষণ পরে মোরে ভুলিয়া যাও ।।
ইচ্ছে জাগে ধরিয়া রাখি
বসন্তে মোর করি যতন,
বুঝিয়া লও মোর আনন্দ
উড়ে যাওয়া বলাকার মতন ।
জানি, হে জানি দুষ্টুমি মোর
ফেলিছে ছায়া তব হৃদয়ের ‘পরে’,
মলাজে রূপসী কল্প তরু
কটাক্ষ করি তুমি যাও সরে ।
তড়িত হেরিয়া মেঘ ঘর্ষনে
উধাও হয়ে আমায় খুঁজে পাও ।

০৩/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭৩

ওকে, বলে দে লো, সখি, ও মনের মানুষ নয়,
ও, কেন অন্ধ হয়ে সবার কাছে আমার নাম কয় ।
শরম খেয়ে কেউটে সাপের, ছোবল মারে মরি হয়,
ছায়া হেরি তার, তনু মোর শাপের কাঁটায় ভরে যায় ।
দুষ্টু ছেলে চিঠি হয়ে আহা মরি পায়ে পায়ে মোর বাজে,
মালা গাঁথি ফুলের, ও দেখি বসে থাকে পথের মাঝে ।
দাঁড়িয়ে তীরে ও কি মহা সাগর করিবে জয় ।।
ও কেন প্রেম দিতে চায় আমি তারে ভালবাসি না মোটে,
আমার হাসি আর চুল দেখে ও কেন পাথরে মাথা খুটে ।
যা যা তুই হত ভাগা আকাশের শূক তারা,
মরু পথে জল খুঁজিস্ তৃষ্ণায় হলে জ্ঞান হারা ।
হাসি পায় ও কেন আমার লাগি মনে আঘাত সয় ।

০৩/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭৪

হৃদয়ে হৃদয় করিতে চাই একাকার বেশি কিছু নয়,
তাই বুঝি দিলে না ধরা জাগিল মনে প্রেম বিরহ ভয়।
ওরে হৃদয়চারী কবি,
রচি প্রেমের অতুল ছবি,
ভীরু মনের খুলিও না দ্বার যাও চলে, তুমি যাও,
না চাহিয়া হৃদয় তার গগনের শুকতারা পানে চাও।
প্রাণের আর্তি উড়াও আকাশে উড়ুক ধরাময়।
জানি সে গলে না দিলে মালা,
শতগুন বাড়িবে প্রেমজ্বালা,
রহিবে মুখ ফিরায়ে, কড়া তার ছলনাঁখি।
কুল মান হরিতে তোমার, সে আর রাখিবে না বাকী।
তারই পানে কেন চাহি,
যবে প্রেম মূল্য নাহি,
বৃথা গাহিবে হৃদয় মহিমা, উলুবনে মুক্তা করি ক্ষয়।

৩০/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৭৫

তোমার হৃদয়াকাশে উদিত আমি ব্যথায় শূকতারা,
কোটি যামিনী কাঁদিয়া গেল, দুঃখ ভরা হৃদয় সারা।
কি করে তব সাধিব বলো আমি,
শূকতারা প্রেমের ভুবনে আসে না নামি,
পাই নি যাহা আমি তার লাগি তোমায় কেন দিব তাড়া।
জীবনের জীর্ণ পথে পথে ঘুরে,
রাখি মোরে পথ হতে বহু দূরে,
তবে তো তবে তো পড়িবে মনের পরে, করুণ কিরণ ধারা।
আমার ভালবাসা ক্ষণিকের তাই,
ভোরবেলা গগণে আমি হারিয়ে যাই।
নিবিড় তিমিরে ঝক্ ঝক্ জ্বলি, খুঁজিবে বল মোরে কারা।
খুঁজে নেবে জানি তোমার সাথী,
এই বুঝি ঘনিয়ে এল শেষ রাত্তি,
হারানোর বেদনায় কাঁপিয়া উঠি, বার বার আমি সাথী হারা।

(সুর-দয়াল বাবু, মোহনপুর।)

০২/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৭৬

সই, ওলো প্রাণের সই, দুষ্ট ঐ কোকিলটিরে দে না তাড়াইয়া,
(মরি হয়) দিন রাতি তার কুছ তানের, সীমা গেছে ছাড়াইয়া ।।
আমি হলাম গাঁয়ের রাণী,
আমায় শোনায় প্রেমের বাণী,
তাহার কথা, ভুলে গেছে, আছে কোথায় দাঁড়াইয়া ।।
(ও সে) ফুল দেখেছে দেখেনি তার বিষ,
ও পাখি জানে শুধু দিতে তারই শিস্,
শাসন করে আমি তারে, দিব রণে হারাইয়া ।।
(হায়) দেখি, নাই তার কলংকের ভয়,
লোক নিন্দায় মন করে (মোর) নয় ছয়,
সীতার কাছে প্রেম চাহিয়া, আছে হাত বাড়াইয়া ।

(সুর- গোপাল, আগলা মাঝ পাড়া ।)
০৭/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭৭

বন্ধুরে আমি আর কইব না কথা তার তরে,
শুনে তাহার কথা আমার টনক গেছে নড়ে ।
গরবিনী বলে কী রে,
মোর হৃদয় গেছে ছিঁড়ে,
মাথা আমার ধরে ওগো ভুগছি আমি জ্বরে ।
বুঝিল না মোর মন,
মিথ্যে করে জ্বালাতন,
প্রতিবাদের ভাষায় আমায় গালি গালাজ করে ।
সকল মনে আঘাত দিয়া,
বেঁচে থাকে পাষণ হিয়া,
জ্বলে উঠে দেখে আমায় চোখের ছুরি ধরে ।।

টিকরপুর, ঢাকা ।

হুমায়ুন-গীতি-৭৮

কবি তুই দেখরে চেয়ে, ঈষাণ কোণে ভরছে কাল মেঘে,
পায়ের নিচে নাইরে মাটি, বইছে জোরে ঝড়ো হাওয়া বেগে।
তোমাদের ভালবাসা পেয়ে আমি,
দুঃখ ভুলে যায় রে কেটে দিবামামী,
জীবন তরী ভাসছে অকুল পাথারে, উর্মিরাশি আসছে রেগে।
পথে ফোটা অজানা নামের ফুল,
আমি কুৎসিত কন্যার কানের দুল,
আমি পথে যেতে যেতে হই পথ হারা, যাই আশার পদ চিহ্ন দেগে।
বন্ধু কি, দেব বলো, কীই বা আছে,
হৃদয়ের প্রেম হারানোর ভয়, জাগিছে পাছে,
জয় করিব ভুবন আমি, জীবন সেনা যদি যাই সবার ভাল লেগে।

০৯/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৭৯

আমার অশান্ত মন ঘুরে বেড়ায়, প্রান্তরে প্রান্তরে চাহিয়া,
বাঁধন হারা, ঘর ছাড়া বে-ভোলা পাখি, ওরে স্বপন বিভোর টিয়া।
শত মুখে চাহিয়া আমি খুঁজি ফিরি,
সুখ বাসনা নিবিড় আঁধারে যায় ঘিরি,
শুধু হৃদয়ের কান্নার সুর শুনিয়ে যাব রে, ভাঙ্গা তরী মোর বাহিয়া।
কেহ মনে রাখিতে চাহে না হায় মোরে,
তাই আমি সুখের নীড় চূর্ণি যাই দূরে,
হৃন্দ হারা জীবনে ভাবি যাহারে প্রিয়, যায় রে স্রোতে ভাসিয়া।
আমার সুখে আপন মনে ঘুরি,
ভুবনের স্নেহ সব করি আমি চুরি,
বলাকার মত পাখি মেলিয়া, দিগন্তে মিলিয়া যাব ওরে অউ হাসিয়া।

১৫/৪/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮০

আমি সেই কবি, কহি না কথা আসিলে তার প্রিয়া সম্মুখে,
ছন্ন ছাড়া তুমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদো, ওগো আপনার দুঃখে।
ব্যথা পেয়ে পাই কত মুখ,
আমার কারনে কাঁপে মোর বুক,
নাহি দিব ধরা থাকি, রহস্যে ভরা মোর কবিতার কল্পলোকে।
যেথায় আছে বিরহী পাখি,
সেথায় ভরে যায় মোর প্রেম সাকী,
মোরে চাহিও না, ভালবাসি ডুবিয়া থাকিতে আপনার কল্পসুখে।
কাছে এলে দূরে সরে যাই,
দূরে গেলে তুমি, আরো কাছে পাই,
খুঁজিয়া ফিরি আমি, সুখের পাখি হারিয়ে অনন্ত লোকে লোকে।

১৮/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮১

ফিরে এসো, এসো ফিরে আবার এসো ফিরে,
কাঁটার আঘাত সয়ে বন ফুল শাখে, আঁধারের বুক চিরে।
যদি নাহি আসে সাথী কেহ
অধীর উন্মুখ হয়েছে তোর নিরব গেহ,
হারালো পথে মরু তৃষ্ণা লয়ে এসো বালু চরে ঐ নদী তীরে।
গোলাপের ছিন্ন মুকুলে বসি,
ভোমরা খুঁজে মধু নিষ্ফল চষি,
আলোক ধারা ছাড়াইছে ঐ দূরে পাখিদের ভীড়ে।
মন হতে মনে চেয়ে চেয়ে,
বহু দূরে যাই সকলের মন বেয়ে,
খুঁজি সাগর তীরে, অতল তলে মনি মুক্তো হীরে।

২৫/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮২

ওগো সুলোচনা এলো কেশী, যদি ধরিয়া বাখো মোরে,
আমি আর, ওগো আমি আর, নাহি যাব দূরে।
আর নাহি যাব কোথা,
নাহি ধরিব কোন ছুঁতা,
রাখিও বাঁধিয়া, ওগো বাঁধিয়া রাখিও, মোরে প্রেম ডোরে।
উড়ন্ত বলাকার পায়ে,
মৃদু মন্দ বাসন্তী বায়ে,
পরাবে সোনার শিকল, গান গেয়ে রাগিনী সুরে।
সজল আঁখি দু'টি কহে,
মিলন দেবী নাহি সহে,
কামনার পাথারে, আসিছে জোয়ার আশার ভোরে।

টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮৩

মাগো ভাত দে, বলে কেঁদে ওঠে, শিশু ঘুমের ঘুরে,
বঞ্চিতেরা সব আছে দাঁড়িয়ে,
মুষ্টিধরা হাত বাড়িয়ে,
করবে কী অচেতন, থালা-বাসন ওরে ফেলরে ছুঁড়ে।
বাঁচার মত বাঁচতে গিয়ে,
শরীরের সব রক্ত দিয়ে,
ভাঙরে তোরা নিয়ম বাঁধা, জয় করে নে আঁধার ভোরে।
সারা দিনের খাবার যত আছে,
কেড়ে নে, চাস কার কাছে,
দুর্বলতার শিকার হৃদয়, আর কতদিন থাকবি দূরে।

১৬/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮৪

কুসুম তুমি ছড়িয়ে সৌরভ, বাড়ালে গৌরব কুসুমের সেই ভালো,
হৃদয় কন্দর উর্বরা তোমার, হে সোহাগের পিদিম জ্বালো, জ্বালো।
তব সু-ললিত ভাষা শুনে,
শান্তি আমেজ জাগে খুনে,
কাননে ফুটিয়া তুমি, আমার প্রাণে অমৃত সুধা আরো ঢালো।
ভ্রমর গুঞ্জরিত ফুলবনে,
বিহঙ্গ কুজিত মৃদু পবনে,
দোলা দিয়া যায়, মেলি দল সুন্দর কেশর আলু থালু।
আর কিছু নাহি চাই,
অধিকার দিও ওগো ভাই,
শুষ্ক মরু পথে যেন শান্তি পাই, আঁখি মেলি ডাগর কালো।

(কুসুমের সৌজন্যে)

১৭/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ মরিচা, ঢাকা।

হুমায়ুন-গীতি-৮৫

জীবনের আর এক নাম যুদ্ধ
তুমি জান কি তা.....(২)
কত ফুল ঝরে ফোটার আগেই
সীমাহীন আমার ব্যথা।
আমার প্রাণ যবে
কাঁদে হাহাকার রবে
ভীষন জটিলতা।
এই কি সেই সমর যাত্রা, না সুখের জীবন,
বড় ব্যথায় লিখি গান আর কবিতা,
কেউ বলে সে আমার বিলাসিতা
আমি তো জানি কান্না ভরা
প্রাণের রক্ত ঝরা
আমার ক্রন্দন, আমার কবিতা।
জীবনে পাই শুধু বাঁধা
কাঁদা, কাঁদা আর কাঁদা

প্রতি পদে পা পিছলে যায় আমার
পড়ি মহা সাগর তলে
ধরার নেই কোন আপন কী করে
ভুলি যুদ্ধ ব্যকুলতা মোর অশ্রু জলে।
নেই অসহায়ের কোন বন্ধন, এ যে বাস্তবতা।
১৮/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

হুমায়ুন-গীতি-৮৬

হে বঙ্গবন্ধু
প্রতি বালু কণা স্বপনে দেখে
সবটুকু শক্তি দিয়ে তার,
তোমার স্বর্গের সোনার বাংলা গড়ে
দেবে তোমাকে উপহার।।
ফলাবে ফসল দেবে সম্ভানের মুখে,
পরলোকে তুমি তবু আছো জনতার বুকে।
শ্যামা মা মনের সৈকতে রৌদ্র পোহায়
দেখে সম্ভাবনার দ্বার।
তোমার ছবি বুকে পুরে বাড়ে উর্ব্বা শক্তি,
তোমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে বাড়ে দেশ ভক্তি।
তোমার তর্জনী আমার প্রহরী
করি নিরাপদ সময় পার।
১৫/০৮/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ।

হুমায়ুন-গীতি-৮৭

তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে নদী বয়ে যায়
দেখো ঐ শেখ মুজিব ময়ূর পংখী নায়।
জল ছাপ ঐকেছে জল রাশি,
হে মুজিব তোমাকে ভালবাসি,
জীবন্ত প্রাণবন্ত ভাষণ শুনে শক্তি পায়।
কন্ কন্ নাচিয়া চলে জল,
তুমি বুকে আনন্দে নামে ঢল,
চিরকাল মিটাবে তৃষ্ণা মায়ের, সে চায়।
৩০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ।

হুমায়ুন-গীতি-৮৮

কষ্টে দিন যায়,
কমলা বিবির হায়,
কেউ দেখে না চাইয়া ।
লোক কাঁদানো গান
ঐ কমলার দান,
গায়েন যায় গাইয়া ।
কমলার মত কত নারী,
পথেই করে নিজের বাড়ি ।
সুখী সমাজ তার
বিহীন করে না আর-
ঘুমায় সুখ পাইয়া ।
পশুর সাথে খায়,
বাগাড়ে যাহা পায়,
পাগলী রূপী মাইয়া ।
বলতে পারি এমন ভাবে
অবহেলায় অক্লা পাবে
এরা মানুষ নয়,
জঞ্জাল মনে হয়
আছে জগৎ ছাইয়া ।

০৫/১০/২০০০ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

দুই প্রজন্ম

{হযরত আদহাম (রঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রঃ) স্মরণে}

গম্ভীরা

পর্দা উঠবে- (পরে দলসহ নানা নাতি গাইবে) ।

নানা-নাতি ঃ

রাজদন্ড ছেড়ে কে, গো, রুহের দন্ড ধরে,
ধনভান্ডার ফেলে, কে গো, মৃত্যুক্ষুধায় পরে ।

সে আর, কেউ নয়, আদহাম

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম

বাপবেটা, দু'জনেইতো, সুফির জীবন বরে ।

মহান ঐরা মহা শক্তিধর,

শ্রেষ্ঠ তাপস, নুরানী প্রাণ, মনোহর ।

মন চায়, এমন জীবন আহা, যাইগো আমি গড়ে ।

নাতি ঃ নানা বলবে কি,

মহান অলি ইব্রাহীমের কারামত?

নানা ঃ নাতি, বলি শোন,

রুহানী শক্তি তাঁর বলি, আলবৎ ।

(নানা-নাতি একযোগে)

হযরত ইব্রাহীম একদিন টাইগ্রীস

নদী তীরে বসে ছিল কাপড়

করছিলেন সেলাই, এমন সময়

এক ব্যক্তি এসে, নিচু করি স্বর,

গুথালেন, ওহে দরবেশ প্রবর,

বলখের বাদশাহী ছেড়ে,

কি পেলেন, তখন হযরত ইব্রাহীম

হাতের সূঁচ ফেলে দিয়ে,

ইঙ্গিতে দেখালেন, নদী, বলিলেন,

“ওহে, তুমি, সূঁচ আনো দেখি উঠিয়ে”

তখন লোকটি করিল ব্যক্ত অপারগতা

হযরত ইব্রাহীম ইশারা দিলে

নদীর অগনিত মাছ মুখে, সোনার সূঁই
নিয়ে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে, মিলে ।
বলিলেন তিনি, “ওহে মাছেরা আমি
সোনার সূঁই চাই নি, আমারটা দাও, ”
এক মাছে তাঁর সূঁই ছুঁড়ে দিলে হাতে,
লোকটিকে দিয়ে, বললেন, ‘নাও’ ।
বললেন, আরও, ‘বাদশাহী ছেড়ে
আমি পেয়েছি কি খুব নগন্য’?
বলল, লোকটি, না হুজুর, না বরং
আমি বোকা আপনি অনন্য ।

একদা হযরত ইব্রাহীম (রঃ) যাচ্ছিলেন হজ্জে
সঙ্গে ছিল সাথী, সে
বলল, হুজুর নাই-তো কিছু সাথে,
কি করি, নিঃস্ব আমি যে ।
বললেন, ‘ইব্রাহীম (রঃ) আহা তুমি বোকা
আল্লাহর উপর নাই কি তাওয়াক্কুল,
ধনের’পর যদি এতই টান তবে দেখ
ঐ গাছের পাতা কান্ড ফল ফুল’ ।
অবাক সে কি ! গাছের সবই সোনা দিয়া
মোড়া । একবার তিনি অভূর তরে
কুপ হতে পানি তুলতে চাইলে, পানির
সাথে এলো সোনার দলা, পরে
আবার, বালতি নিচে ফেলে, পানি
টেনে তুললে, দেখলেন রূপা এ যে,
ফেলে দিয়ে রশি ছেড়ে বালতি নিচে দিলে
পানির সাথে মোতি এলো সেজে ।
কান্নাভরে দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ
পরীক্ষা কর? আমি ধন চাই কি না
পবিত্রতার জন্য শুধু পানি চাই,
বাদশাহী ছেড়ে চলেছি ধন বিনা’ ।
হযরত ইব্রাহীম (রঃ) নদী পার হতে চাইলে
মাঝি চাইল, পাড়ের কড়ি
ওপাড়ে যাওয়ার তরে ওজু করে দু’

রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করি,
বলিলেন, “হে প্রভু উপায় করে দাও”।
পরক্ষণেই দেখিলেন, স্বর্ণময় বালুকা রাশি
তার এক মুঠো দিলেন মাঝিকে, মাঝি
নিয়ে তা, তাঁকে নদী করিল পাড় হাসি।
(নানা ও নাতি যুগলে গান ধরবে)
বাদশাহী ছেড়ে কে গো, দরবেশী ধরে,
ধন ভান্ডার ফেলে কে গো, উদর ক্ষুধায় মরে।।
কেউ তো নয়, আর কেউ তো নয়, তিনি আদহাম,
হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম,
বাবা-ছেলে, দুইজনাই, সুফী জীবন বরে।।
মহান ঐরা মহা শক্তিধর
শ্রেষ্ঠ তাপস প্রাণ নুরাণী মনোহর,
মন চায়, এমন জীবন আহা, যাই গো, আমি গড়ে।।

চলার পথে একদিন এক মাতাল দেখেন,
মুখে ধুলাবালি লেগে আছে,
বললেন ‘এ মুখে ছিল খোদার নাম, তা কদর্য কেন’
সাব করে দেন মুখ, গিয়ে কাছে।
চেতনা ফিরে এল মাতালের আর লোকেরা
বলিল, যা বলিয়াছেন দরবেশ
তওবা করিল মাতাল, আর কহিল খাব
না মদ থাকিতে জীবনের রেশ।

একবার তিনি আলাপ করছিলেন, এক
দরবেশের সাথে, প্রসঙ্গক্রমে
দরবেশ শুধালেন, “মান্যবর ইব্রাহীম
পূর্ণ আল্লাহ ওয়ালার পরিচয় কী? ভ্রমে
কেহ যেন পথচ্যুত না হয়”। বলেন
ইব্রাহীম, “পাহাড়কে চলতে বললে,
চলা শুরু করে”। আশ্চর্যের বিষয়
তখনই পাহাড় চলা শুরু করলে!
হযরত ইব্রাহীম (রঃ) বললেন, হে
পাহাড়, আমি তো চলতে বলি নাই,
সাথে সাথে পাহাড় তাঁর কথামত
হলো স্থবির, দাঁড়াই!

ইব্রাহীম (রঃ) নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন
সঙ্গে কতিপয় সাথী আছে
হঠাৎ উঠিল ঝড়, সকলে ভয়ে অস্থির
শোনা গেল আওয়াজ পাছে,
“হে আরোহীগণ তোমরা শংকা কর না
হযরত ইব্রাহীম (রঃ) আছেন সাথে”!

আর একদিন তিনি অনুরূপ নৌকাযোগে
হচ্ছিলেন নদী পাড়, হঠাৎ নৌকাতে
লাগিল ঢেউ, ঝড়ে তরী ডুবে প্রায়,
একখানা পবিত্র কোরান ছিল তাঁর সাথে
বলিলেন, “হে আল্লাহ নৌকা যেন ডুবে না যায়”।
কী অপূর্ব কারামত এরপর এ ঝড় গেল
থেমে। হযরত মোহাম্মদ নামক ফকির
বলেন, ‘আমি তাঁর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস পানে
রওনা দিলাম, পথে নামাজের সময় স্থির,
একটি ডালিম গাছের নিচে দু’জনে
পড়িলাম নামায, গাছটি বলিল,
আমার দু’টি ফল খেয়ে যান, হযরত
ইব্রাহীম দু’টি ফল গাছ হতে ছিঁড়িলেন
আমাকে দিয়ে একটি, অন্যটি নিজে
খেয়ে নেন। ফল ছিল টক, গাছ খর্ব,
ফিরতি পথে দেখিলাম গাছটি বড়
আর ফল মিষ্টিতে যেন স্বর্গ।

কবি চন্ডিদাস বলিয়াছেন,
“সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার ওপর নাই”,
তাই আমরা এই গম্ভীরা দল,
উপস্থিত সকলকে এই আসরে
স্বাগত জানাই।
হিন্দু ভাইকে আদাব দিলাম
মুসলমানকে ছালাম
খ্রীষ্টান ভাইকে গুড ইভিনিং
বৌদ্ধকে আদাব।

গণ্যমান্য অতিথিগণ,
শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বীগণ,
বন্ধু প্রতিম যুবগণ,
শ্লেহের শিশু কিশোর
আয়োজক সংস্থাকে
সুধী আর সাংবাদিককে
প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাকে
নিবেদন করি কৃতজ্ঞতা প্রচুর।
সবশেষে দোয়া চাই
কবি হুমায়ূনের জন্য,
“দুই প্রজন্ম” লিখে যিনি
হয়েছেন অনন্য।
তাহলে শুরু করি,
আমাদের আজকের গম্ভীরা
“দুই প্রজন্ম”
(নানা ও নাতি যুগলে গান ধরবে)
আমার চারণ ভূমে
দূর্বা মরা, নূর ছাড়বো না (২)
ওগো, নূর ছাড়বো না, গো,
আমি পিছু হটবো না। (২)
ঝলসে রোদে, জাগবে বোধে,
আল্লাহ তা’লা।
আমি রোদের ভেতর, সাঁতার কাটিব, (২)
পাই যত জ্বালা।
তবু, নূর চাইব, তবু নূর চাইব
নূর চাইব। (২)
তবু আমি-ঘাস তো খাব না।।
দোলে চাঁদের কোলে, বাঁচা মরা (২)
আমি জোয়ারে ভাটায়, ভাসিব সাগরে (২)
তবু আমি ওগো তবু আমি
পূজা-দেবো না।।
চারণ ভূমে, দূর্বা মরা
নূর ছাড়ব না
ওগো, নূর ছাড়বো না গো
আমি, পিছু হটবো না।

আমার চারণ ভূমে

দুর্বা মরা, নূর ছাড়বো না । (২)

পাগল হুমায়ুন বলে, (২) শোন গো (২)

আল্লাহ - আল্লাহ

আল্লাহ-আল্লাহ-আল্লাহ

সুফি নিজাম উদ্দিন

ছাড়ি, ভুবনে সব

ভুলে কলরব,

নিরজনে করে, নূর সাধনা ।।

(নানা-নাতি একযোগে আবৃত্তি)

হযরত আদহাম (রঃ) জিতেন্দ্রীয় অলি

শ্রেষ্ঠ তাপস । নির্জনে যাচ্ছিল দিন চলি

বনবাসী দরবেশ, সুখায়েশ দলি

যাচ্ছিল দিন, যাচ্ছিল দিন, নাম গোত্রহীন

বন থেকে খড়ি কেটে তিনি

বাজার থেকে জীবিকা নিতেন কিনি

শৃঙ্খলধারী জীর্ণ পোষাকে ফকির রূপে চিনি

জানত সবাই, স্বল্পভাষী ছিল তার ব্যতিক্রমী চিন্ ।

মূল্য থেকে আধেক খাবার লয়ে,

কোথায় তিনি হারিয়ে যেতেন বায়ু রূপে বয়ে,

বনের পথে কাঁটার আঘাত সয়ে,

রাত কাটাতেন ঝুপড়িতে আধেক দান করে ।

পিতা-মাতার নাই পরিচয় বংশ ওমরের,

নিম্নমুখী জিকির পাগল অলি উঁচু দরের,

দাঁড়ি চুলে জটা বটে যুবক সুঠাম দেহের,

কোথা হতে আসছেন তিনি থাকেন কোন ঘরে ।

বল্‌খের গহীন বনে থাকেন বন্য প্রাণীর সাথে,

বাঘ সিংহ, ইচ্ছে করে থাকতো সাথে রাতে,

মহিষ-ছাগল সানন্দেতে দুধ বিলাত পাতে,

সাপ বিচ্ছু, দেও দানব, আরও হাজার প্রাণী যত ।

করত সেবা, ইচ্ছে মত খুশী মনে তারা,

কার আগে কে, সেবা দিবে, হত পাগল পারা,

গাছগুলি ফল ঢেলে দিত, হয়ে আত্মহারা,

পাখীরা ঠোটে খুঁটে দিত দাঁড়ি চুলে ইচ্ছে মত ।

বন্য প্রাণীর ভীড়ে যারা পেতো না কাজ,
দূর হতে শ্রদ্ধা ভরে ভেবে মাথার তাজ,
ধীরে ধীরে চলে যেতো দেখে বনরাজ,
সম্মানে তাঁর বন্য প্রাণীর হিংস্রতা, ছিল না এই বনে।
চলছিল তাঁর দরবেশ জীবন, চলছিল বেশ,
একদিন গভীর রজনীতে, ছিল তন্দ্রার আবেশ,
এমন সময় অজানা মহাপুরুষ করিলেন পেশ,
“হে তাপস! ভুবনের সব অলি জানে তোমার পরিচয় মনে।
তাঁদের সম মর্যাদায় যেতে তোমাকে,
বিবাহ করিতে হইবে এক রাজকন্যাকে,
তুমি গ্রহণ কর নবী রাসুলের শিক্ষাকে,”
শুনিয়া হতবাক তিনি, ভাবিলেন এ কেমন কথা,
কে দিবে তাঁকে বিবাহযোগ্য মেয়ে,
দুনিয়াতে কে গরীব অধিক, তাঁর চেয়ে,
ঘর আসবাবহীন, যাচ্ছে তাঁর সময় বেয়ে,
জুটিলে কিছু খান, না জুটিলে নাই, গমন করেন যথাতথ্য।
ভাবিলেন, “অসম্ভব”, মহাপুরুষ বলিলেন,
“হে খোদার দোস্ত তার’পর আস্থা রাখিবেন,
ধৈর্যের পরীক্ষা হইবে আর আসিবেন,
আপনার ঔরসে, মহাঅলি” বলিয়া চলিয়া গেলেন,
‘হে অলি নিয়ত করিয়াছেন কি পাকা?
নিশ্চয় হইবে আপনার পাশে থাকা,
আপনার খেদমতে আমাকে হবে রাখা’,
অন্য এক রজনীতে এসে, মহাপুরুষ বলিলেন।
হযরত আদহাম চাহিলেন বিনয়ে পরিচয় ধীর,
উত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন “আমি খোয়াজ খিজির”,
শুনিয়া এই মহান নাম, করিলেন আদহাম স্থির,
করিবেন তিনি পাণি গ্রহণ রাজকন্যার, আল্লাহর রহমতে,
কিন্তু কিভাবে, কখন জানেন না কিছু,
এ পথ যে বন্ধুর উঁচু-নিচু,
এ আদেশের বাহিরে থাকার আছে কি জো?
আসুক নির্যাতন, সহিবেন তিনি পড়ি ঝড় ঘূর্ণাবর্তে।
নাতি ঃ তারপর কি হইল বলবে কি নানা?
জানিতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, হচ্ছে ইচ্ছে জানা,
কিভাবে সম্ভব হইল, খোয়াজ খিজিরের আদেশ মানা।

রাজকন্যা আর দরবেশের কি করে হইল মিলন বাসর ।

নানা ঃ ঘোরতর সংসার বিরাগী যিনি ,

দুনিয়ার সর্বহারা ,

আজ তাঁকেই হতে হবে কামনা

বাসনায় পাগলপারা ।

মোরাকাবা মোজাহাদায়

যাঁর যায় চক্ৰিশ ঘন্টা ,

রাজ কুমারী পাওয়ার তরে

দিতে হবে তার পবিত্র মন টা ।

এশ্কে এলাহী অক্ষুন্ন রাখিয়া

দুনিয়ার পেছনে ছুটা যায়?

এ এক কঠিন পরীক্ষা , দিতে হবে

তাঁকে কামনার দুনিয়ায় ।

একদিন যাচ্ছিলেন পথে হঠাৎ

শুনিলেন , রাজকীয় এলান ,

‘সরে দাঁড়াও , পথে আছো যারা’

আসছেন শাহজাদী মহান ।

মাথা হতে নামিয়ে কাষ্ট বোঝা

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ,

দেখিতে চাহিলেন তিনি কেমন

শাহজাদী , আঁখি নাড়িয়ে ।

মুহূর্ত পরে রাজরক্ষী বাহিনীর

অগ্রবর্তী দল চলিয়া গেল ,

তারপরে আসিল শাহজাদীর বাহন

পথের দু’ধারে শত মানুষ দেখতে পেল ।

সওয়ারী আবৃত কাপড়ে কেহ কি

দেখিতে পায় , রাজকন্যা?

সকলে যাহা দেখিল তাহা আর

কিছু নয় , চোখ ধাধানো জাঁকজমকের বন্যা ।

দরবেশের সম্মুখে আসিতেই হঠাৎ

দমকা হাওয়ায় গেল পড়িয়া ,

রাজকুমারীর মুখের নেকাব , আর

দরবেশ দেখিলেন চোখ ভরিয়া ।

রাজকুমারী দেখিলেন, দরবেশের
পবিত্র চেহারা মোবারক, আর
যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ নিবিড়
ভাবে শুধু দেখিতে লাগিলেন, বার বার ।
দু'জনে, দু'জনকে দেখিয়া মনে
মনে গাঁথিয়া ফেলিলেন,
স্বর্গীয় বন্ধন, কল্পনা জোয়ারে
ভাসিতে লাগিলেন, মেলিলেন,
মানবীয় প্রেমের ফরাস, মনের
জমিনে, ভালবাসার বইছে হাওয়া,
মুগ্ধ আঁখিতে লাগিয়া গেল যৌবনের
প্রেমের মাদকতাময় সুরমা দাওয়া ।
এ শুধু দু'জনের উপলব্ধি আর
কেহ কি তাহা বুঝিতে পায়?
রাজকন্যার মনে হলো এ কোন্
মুখ দেখিলেন, মরি, মরি হায় !
পাইক, পেয়াদা চতুর্দিকে, সখিরা
দিচ্ছে গায়ে বায়, শরীর রোমাঞ্চিত তবু,
মনের ভেতর ভাললাগার তোলপাড়
দরবেশের মুখ কল্পনায় ভাসে কভু-
সরাতে পারছেন না তিনি
লজ্জায়, শরমে শিউরে উঠে
গা, দু'হাতে ঢাকেন আপন আঁখি
দূর ছাই, কি ভাবি এসব
বুকে ফের ভাললাগা ওঠে ফুটে ।
রাজকন্যার মুখ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত
অপলক চেয়ে দেখছিলেন দরবেশ,
রাজকীয় বাহন চলিয়া গেল বহুদূরে
তবু দরবেশের কাটছিল না দেখার রেশ !
বিমুগ্ধ নয়ন, নিথর দেহ, নির্বাক মুখ
মনে লাগা, আর চাহিয়া থাকা,
ছাড়া আর কি বা করা যায়,
পরম প্রিয়তমা প্রেয়সী যেন মধু মাখা ।

উথলে উঠছে বুকে আহা
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত এ শুধু-
আমার, আমি চাই তাকে,
না পেলে বুক পড়িবে ধূ ধূ চর ধূ ধূ।
কিন্তু কেন! দর্শক ভাবিছেন নিশ্চয়
দরবেশ থাকিবেন নির্মোহ,
কেন এভাবে তাকালেন নারী পানে
ভেঙ্গে কি গেল তার দরবেশী দুর্গব্যুহ?
না, না তিনি সে রকম তাকান নি,
তাহলে তিনি কি দেখিলেন,
রাজকন্যার মাঝে, তবে তাই শুনা
যাক, একদা তিনি বাস করছিলেন
এক তমসাবৃত গুহার মাঝে,
পরিহিত বস্ত্র হয়েছিল কুটি কুটি পোকাড়
কামড়ে, বিচলিত তিনি, ভীষণ লাজে।
প্রার্থনা করছিলেন, ‘হে পরওয়ারদিগার,
আমার আত্ম রক্ষার ব্যবস্থা দাও করে’,
তাঁর প্রার্থনা হলো মঞ্জুর, স্রষ্টার নিকট,
স্রষ্টা পাঠালেন এই দরবেশের তরে,
উজ্জ্বল আভাময় জোতির্ময় মহাপুরুষ
খাদ্য বস্ত্র দিয়া হলেন উধাও,
গুহা হয়েছিল আলোকিত, তাই
দেখিলেন, শাহজাদীর মাথার’পর। তাও,
ভুলেন নি সে দিন স্বপ্নাবেশে
যে নূরানী মুখ দেখেছিলেন,
এ যে হু বহু তাই, রাজকন্যা উপলক্ষ মাত্র
তাঁর সুফী মন উদ্বেল, অনুরাগের পাখা মেলে ছিলেন।
তিনি গুফরিয়া আদায় করে স্রষ্টার
তরে বলেছিলেন, ‘আল্‌হামদুলিল্লাহ’
ওদিকে পুত পবিত্র শাহজাদী দেখে নি
ছিল বসন, এক ফকির সাধারণ অবলহা,
বরং দেখেছেন, আকাশ থেকে খসে
মাটিতে পড়েছে এক, উজ্জ্বল আভা জ্যোতি,

অপূর্ব, অনিন্দ্য মনকাড়া সুন্দর
মুখ, সাধনার ধন, স্বর্গের দ্যুতি ।
এ রকম চোখ কার, কে বুঝিবে
এ রহস্য, এ মাহাত্ম্য, শাহজাদীর
মুখ ঢাকিতে চাহিলে, করছিলেন
স্বয়ং বারণ বারবার, তাই বাঁদীর
কানাঘুষা শুনা গেল, একি !
শাহজাদী, কি এমন, আছে ফকিরে
যাকে দেখছেন, অবাক বিস্ময়ে সে কি !
কয়েক মুহূর্তের এ মিলন বিরহ
যেন শত বছরের অভিলাষ, তাই
দু'জন দু'দিকে গেলও তা অক্ষয়
প্রেম পরিণয়, জগতে তার তুলনা নাই ।

গান-

নানা-নাতি (সমস্বরে)
এ কোন্ নূরে মিলে, দু'জনে হলেন একাকার,
ক্ষণিকে, দু'নদী এসে, হৃদয় চরে আনিল জোয়ার ।।
কামের আঁধারে নয়, এ যে সম্মোহনী আলো,
দূরের তারকা দেখা, যাচিয়া নিশি কালো,
ধ্রুব তারা দেখাবে, দিশা, ময়ূরপংখী ভাসিবে দু'জনার ।
মন্ত্র মুঞ্চের মত, সাগরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
ভাসিবে জীবন তরী, অনুরাগ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ।
নিরবে দেখিবেন খোদা, যৌবন নদী পারাপার ।।
বিনি সূতার মালা, খুলিবে না আর,
ঈমানী নূরে বাঁধা, দেহ কি আর ছার !
দৌলত হতে বহু দূরে, এ প্রেমের বাজার ।।

(নানা নাতি এক যোগে)

কাঠের বোঝা মাথায় তুলে
জিকিরে জিকিরে দরবেশ গেলেন,
বাজারে, রুটি, খেজুর, কিনে বাকীটা দান করে
ফিরে এসে, সেই দর্শন স্থান খুঁজে পেলেন ।

সুধালেন, এক দোকানীকে, ওহে, বলো
এ কোন্ দেশের রাজকন্যা, কিইবা তার নাম,
এত জাঁক জমক তার আর কভু দেখি নাই
দোকানী বলিল, ওহে ফকির নাম দিয়া কি কাম ?
বলিল, দোকানী “তবে শুনে, ইনি
বল্‌খেশ্বরের একমাত্র রাজকন্যা নাম
তার গুলে জান্নাত, ধর্ম পরায়ণা, রূপসী
জ্ঞানী, বুদ্ধিমতি কেহ দেখে নি চাম” ।
আরও শুনুন, “রাজ্যের বিপদে বাদশাহ
করেন তাঁর সাথে পরামর্শ,
সপ্তাহান্তে যান তিনি রাজকীয় গুলবাগে,
তিনি অতুলনীয়, নারী জাতির আদর্শ” ।
শুনিয়া হযরত আদহাম (রঃ)
খামোশ হয়ে গেলেন, আর মনে মনে
ভাবিলেন, ঐকে কঠিন হবে পাওয়া,
তাই তার কাজ হবে নিজ কাজে ব্যস্ত থাকা
সদা আধ্যাত্মিক সাধনা করে যাওয়া ।
আবার গভীর রাতে, তিনি দেখিলেন
স্বপন, এসেছেন খোয়াজ খিজির,
বলছেন, “হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি
যে শাহজাদী দেখেছেন, তার সাথে বিবাহ জিনজির
বাঁধিতে হবে আপনাকে, মনে,
রাখিবেন, পূর্ণ ও খাঁটি ঈমানদার হতে হলে,
তাঁকে বিবাহ করিতেই হইবে, রাজ দরবারে
গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিন দৃঢ় মনোবলে ।
আল্লাহ চেষ্টা ছাড়া দেন না কিছু
ভরসা রাখুন আল্লাহর ’পর
দৃঢ়চেতা হউন, আমি থাকিব
আপনার খেদমতে নাহি কোন ডর” ।
অবশেষে এক জুম্মাবারে রাজ প্রাসাদে হলেন উপনীত
প্রথম দ্বারেই পেলেন বাধা, বলিল,
‘রক্ষী এমন ময়লা কাপড়ে আসিয়াছে রাজ
প্রাসাদে করিতে ভিক্ষা? দলিল
আপন পা মাটিতে, এবং তারস্বরে

ব্যঙ্গ, করে বলিল, ‘নাও, এই কাপড় পড়’
দরবেশ প্রত্যাখান করেন দৃঢ়তা ভরে।
আরেক দারোয়ান বলিল, ছেড়ে দাও
আজ বাদশার খয়রাতের দিন, তাই
নাই কৈফিয়ত, যেতে দিন তারে,
শুনিয়া দ্বার রক্ষক ছেড়ে দিল তাকে
আবার বাধাগ্রস্থ হলেন গিয়ে দ্বিতীয় দ্বারে।
বলিতে হইল কথা, রাখিতে হইল তাঁর
রুটি খেজুরের পোটলা জমা, প্রবেশ পথে,
তৃতীয় দ্বারে গিয়া প্রতীক্ষার প্রহর গোনা,
পাগল বলিয়া অবহেলা রক্ষীর, কোন মতে
অবশেষে বাদশার বিশেষ অনুমতি পেয়ে,
টুকিলেন শাহী দরবারে দয়ালু বাদশাহ
দেখিয়া দরবেশকে, চিনিতে করেন নি ভুল,
সবিনয়ে বলিলেন, কি চাই বলুন
আপনার কি অভিপ্রায়, নিকটে বসাই,
দরবেশ কহিলেন, “আমাকে দয়া করুন,
শুনেছি আপনি কারু আবদার ফেলে,
দেন নি কোন দিন। তাই প্রথম ও শেষ আরজি
আমার, আপনার অনুমতি পাওয়া গেলে
আমি বিবাহ করিতে চাই, শাহজাদীকে”।
শুনিয়া হতবাক বাদশাহ, ক্ষণকাল
থাকিয়া চুপ বলিলেন, দরবেশ
সাহেব, বিবাহ শাদী একজনের ব্যাপার নয়
কনের মত আর অভিভাবকের মত করিতে হয় পেশ।
আবার আসুন, আমি সম্মিলিত
মতামত দিব আপনাকে, শুনে
দরবেশপ্রবর বলিলেন, আগামী শুক্রবার
আসিব আমি’। এ কি! প্রস্তাব অলক্ষ্যে
বাদশার মেয়ে বলে কথা, এ-ও, কি হয়?
একজন ফকিরের কাছে মেয়ের দিতে হবে বিয়ে?
শুনিয়া রাণী যারপর নাই হলেন ক্ষিপ্ত
কোন রাজকুমার ছাড়া বিয়ে হয় কি? নিয়ে
আসা-হোক কোন রাজকুমার তার সাথে

দিব মেয়ে বিয়ে। সমস্যা সমাধান কল্পে
বাদশা ডাকিলেন, উজিরকে, বলিল উজির,
'আমি সমাধান দিয়ে দেব অল্পে'।
বাদশাহ বলিলেন, 'আমি চিনেছি উনি
এক দরবেশ, যাতে কষ্ট না পান
আবার বিয়েও না দিতে হয় এমন ব্যবস্থা
করুন উজির, সাবধান, যান'।
পর শুক্রবারে দরবেশ বাদশাহের সাথে
সাক্ষাতে গেলে বাদশাহ উজিরকে বুঝিয়ে
দিয়ে অন্দর মহলে চলে যান, পরে
উজির এসে দরবেশের নাম পরিচয়
ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন,
'কি উদ্দেশ্যে এবং কেন একজন বনবাসী
ফকির হওয়া সত্ত্বেও, শাহজাদীর সাথে,
বিয়ের জন্য উদ্যোগ হইয়াছেন? সর্বনাশী,
এ পথ থেকে সরে দাঁড়ান'। শর্ত আছে
শাহজাদীর ঘোষণা, "সবে চেরাগ
যে পারিবে আনিতে তাঁকে বর মেনে নেবো"
শুনে দরবেশ হন নি বিরাগ
বলেন, "এনে দেখান সবে-
চেরাগ মুক্তো খন্ড, আমি চেষ্টা করি",

উজির আবার গেল অন্দর মহলে
বিয়ের সম্পর্কের কথা তাই করি চাতুরী,
বললেন, শাহজাদীকে "দেন, মুক্তোখন্ড
দেখাই"। শাহজাদী বললেন, 'প্রার্থী কেমন
দেখতে, যদি ফকির দরবেশ হন তাহলে
শর্তাদি আরোপ করা নিষ্প্রয়োজন'
কুটিল, উজির বলিল, 'না, না, সে
বাজে লোক, দেখার প্রয়োজন নাই',
আর বাক্য ব্যয় করেনি শাহজাদী,
উজিরের হাতে তুলে দিলেন মুক্তো খন্ডটাই।
উজির আসিয়া, সবে চেরাগ দেখাল
দরবেশকে, আর বলিল, 'অনুরূপ

এক জোড়া এনে দিতে, পারলে তবেই হবে
বিয়ে'। দরবেশ শুধু দেখিলেন, রহিলেন চুপ।
ধীরে ধীরে দরবেশ বের হয়ে এলেন
রাজপ্রাসাদ হতে, মনে মনে ভাবিলেন,
কোথা পাওয়া যাবে অবিকল আর
এক জোড়া মুক্তো খন্ড, ঈমানী তাখদে করিলেন
আল্লাহর উপর ভরসা, চলিতে লাগিলেন পথ
যে করেই হোক, যেভাবেই হোক খুঁজিতে
হবে এ মুক্তো খন্ড কষ্ট তাঁর হোক না যত।
পথ চলিতে চলিতে, গেলেন এক
পর্বত গুহার মুখে, সেখানে
ছিল এক যাদুকরি খেলা, দুই চোয়াল
বিশিষ্ট চুম্বক দাঁত, বিশাল হা প্রবল আকর্ষনে
কেবল নিকটে টানছে তাঁকে, এমন
সময় এক শৃগাল এসে ঢুকে গেল
হা এর ভেতর, সাথে সাথে মুখ বন্ধ হল যখন
তখন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, আল্লাহ
যেন স্বয়ং হাত ধরে বাঁচালেন তাঁকে।

গান ৪ নানা-নাতি

হে, দয়াল রে, দয়াল রে,
তোমার লীলা বুঝা ভার,
তুমি ছাড়া তোমার
বাতেন বুঝার সাধ্য আছে কার।।
কি কারণে, কি কর রে দয়াল
কেমন করে বুঝি,
তোমার ইচ্ছা পুরিতে দয়াল
তোমাকে যে খুঁজি।
দীন হীন রে, কোথা নিবে জানি নে, কিছু তার।।
জপ ছিলাম রে নামের সুধা
একা বসে একা,
আর কি তুমি করতে বলছো,
কোথা, পাব দেখা।
সহ্য করব কষ্ট যত, দাও পরওয়ারদিগার।।

(নানা-নাতি একযোগে)

পাহাড়ে পর্বতে বনে-জঙ্গলে অনাহারে
থেকে দরবেশ কেবল ঘুরছিলেন, আর
ঘুর ছিলেন, যেখানে যা পান তা
নেড়ে নেড়ে দেখছিলেন, উহা
মুক্তো কিনা, মুক্তো কিনা যার
সন্ধান তাঁকে করতেই হবে, করতেই
হবে, মরণপণ প্রতিজ্ঞা, করতে হবে
অনাহারে শরীর কুশ, চোখ
উদগত, মরণোন্মুখ অবস্থা, তবে
মন আরও দৃঢ় আল্লাহ আছেন
সাথে, তার হবে জয়, পাবেন
নিশ্চয়, যেহেতু আল্লাহ তাঁকে ভালবাসেন।
এবার তিনি গিরি গুহা, ছেড়ে
মরুভূমি অতিক্রম করে এলেন,
এক সমুদ্র সৈকতে, সমুদ্রের
বিশাল জলরাশি যখন দেখতে পেলেন,
আবেগ, উদ্বেলিত হয়ে, সমুদ্রের
বিশাল জল রাশির দিকে চেয়ে,
ধরিলেন, মোনাজাত, বলিলেন,
'হে পরম করুণাময় তোমার দয়ার সিঁড়ি বেয়ে
ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হওয়ার
নিমিত্ত শাহজাদীকে বিয়ে করব বলে,
নিয়ত করিয়াছি, উহাতে তোমার
সম্মতি থাকলে আছান কর এ মুন্সিলে,
না থাকলে সম্মতি, আমাকে এ পথ হতে
মুক্ত করে দাও, মুক্ত করে দাও, দয়া করে',
দুই রাকাত নফল নামাজে করিয়া কোরান খতম
ছালাম ফিরাইয়া দেখেন, গুরুগম্ভীর স্বরে
বলিতেছেন, প্রকাশ্যে খোয়াজ খিজির,
শান্ত সৌম্য নূরানী চেহারা, "হে অলি
আল্লাহ সহায় আপনার, কি প্রয়োজন
জানি, তবু চেষ্টা করুন বাধা সব দলি"।

হঠাৎ দেখিলেন দরবেশ, সমুদ্রের কিনারা
ঘেঁষিয়া ভেসে যাচ্ছে মুক্তার ছড়া, ছড়া-ছড়া
সবে চেরাগ হতে আরও দামী, দরবেশ
দু'মুঠো নিলেন হাতে তুলি করে ত্বরা ।
শুকরিয়া আদায় করিয়া বলিলেন, ছোব্বান
আল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
দু'রাকাত নফল নামায আদায় করিলেন
মুক্তা হাতে, করে আবেগে বলিলেন 'বিসমিল্লাহ' ।
দরবেশ আবার মুক্তো নিয়া ছুটিয়া চলিলেন
নিজ আস্থানার দিকে, গভীর অরণ্য
ঘাস, লতা-পাতা, ঘেরা আস্থানা, তিমির ভরা
সেথায় মুক্তা দানা, পড়ামাত্র যেন ধন্য ।
দিবালোকের মত আলোকিত হলো
তিনি এগুলো টুকরো করে মাটির
নিচে রাখিলেন, দু'টুকরো, যেন আলো
না ছড়ায় আর বাকী চার টুকরো নিয়ে
রওনা দিলেন, রাজপ্রাসাদের দিকে,
সেখানে পৌঁছানো মাত্র, রাজরক্ষী দিলো
বাধা, বলিল, কি দরকার, ফকির চামচিকে?
দরবেশ বলিলেন, 'প্রধান উজির বলিয়াছেন
আসার জন্য' । রক্ষী বলিল, 'আপনি দাঁড়ান,
আমি অনুমতি নিয়া আসি' । ভিতরে গিয়ে
উজিরকে বলিতেই কাঁপিয়া উঠিল উজির-পরাণ ।
একি সেই ফকির! ক্ষণিক ভাবিয়া বলিলেন,
'ওকে ভেতরে আসতে দিও না, আমি
নিজেই আসছি' রক্ষী দ্রুত চলে গেল আটকাতে,
উজির এসে দেখে মনে মনে বলিল, 'হায় অন্তর্যামী
এ যে সেই ফকির মুক্তো নিয়ে এসে গেছে
এখন কি হবে? আমি বাদশাহকে আশ্বাস দিয়েছি
ফকির আর আসিবে না, হায় চাকুরী যাবে,
প্রতারণা করে শাহজাদীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি ।
আমি তো বলেছিলুম সে বাজে লোক,
ফকির দরবেশ নয়, দূর ছাই
হঠাৎ কূট বুদ্ধি মাথায় আসলে সে গর্জে
উঠল, বলল 'এ, সবে চেরাগ, তাই'?

‘হে ভন্ড, মেকি চেরাগ এনেছো, তুমি’, বলে
আদেশ করলো, রক্ষীকে যাতে গারদে পুরে
দরবেশকে, রক্ষী বেঁধে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিল
তখন, দরবেশ বলিলেন, “হে উজির সাহেব, ভ্রমঘোরে
আমাকে কিছু করিবেন না, ভাল হবে না
যাচাই করুন, চেরাগ আসল না নকল”,
কে শুনে কার কথা, নিয়ে গেলো দরবেশকে
গারদে, চলিতে লাগিল, নির্যাতনের ধকল।
চারুকে চাবুকে ক্লান্ত হলে, বদল করে, করে
উজির আর তার রক্ষীরা মারতে লাগলো,
মৃত নিশ্চিত হয়ে বস্তাবন্দী করে অদূরে
বনে ফেলে দিয়ে, সেই স্থান থেকে সবাই ভাগলো।

(গান : সম স্বরে)

ওরে অধম উজির, তুই ভেবেছিস কি রে,
আঁধারের আড়ালে, ঢাকিবে সত্যটিরে।।
তোর চাবুকের আঘাতে বিক্ষত
খোদার আরশ, ঝরিছে রক্তের ধারা,
ওরে বুঝিলে না তুই বুঝিলে না,
কে সেই ফকির, হইবে তুই সর্বহার।
হাত হইবে ধ্বংস, তুই, মেরেছিস ফকির রে,
ওরে অন্ধ তোরে কহিলে কি হইবে,
নির্বোধ, দুরাচার, মনের চোখ নাইরে,
কাঁদার সুযোগ তুই পাইবে না,
আসিবে গজব, লোকে দেখিবে তাইরে,
কে মারে খোদার বন্ধুরে, ইবলিশ না হইলে রে।।

(নানা-নাতী একযোগে)

আল্লাহ সহায় যার তার ক্ষতি কেউ কি
পারে করিতে এ ভবে, না, পারে না,
এক দিন, এক রাত পর, কে যেন এসে
দিয়ে গেলো, অমৃত, জীবন যাতে হারে না,
তাই হলো তার জ্ঞান ফিরে এলো
তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,
বেদনাগ্রস্থ শরীর, রক্তাক্ত জখম, আহা রে
দাঁড়ানোর শক্তি নাই, খেজুর আর রুটি খাইলেন।

যাহা বাঁধা ছিল কোমরে, তায়াম্মুম
করে বসে বসে পড়িলেন দু'রাকাত নামায,
দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়িয়া
ছালাম ফিরাতেই শুনিলেন, গায়েবী আওয়াজঃ
'আদহাম! উজিরের নির্যাতনে তোমার
পাপরাশি মুছে গেছে, হয়েছে শ্রেষ্ঠ অলি
আরও শ্রম দাও, ছাড়িও না আশা শাহজাদীর
যিকিরে যিকিরে থাকো সরল পথে
শুনিয়া শক্তি হলো গায়ে, চলিতে লাগিলেন টলি টলি।
সারাদিন ধরে চলে, অতি কষ্টে
পৌঁছে গেলেন, নির্জন এক গোরস্থানে,
আর রথ চলে না, অবশেষে তিনি
মনস্থির করেন, বিশ্রাম নিবেন এইখানে।
এদিকে পড়িল আরেক হুলস্থল, শাহজাদী
বাগানে ভ্রমণের সময় পরিষ্কার জায়গায়,
এক বিষধর সর্প এসে ছোবল মারিল,
রাজপ্রাসাদে সকলে কেঁদে কেটে খান খান, হায়!
অমন সোনার মেয়ের জীবন, কে কাড়িল
সকলে ধরাধরি করে নিল প্রাসাদে,
শাহজাদী, রাজাকে শুধু বলিল, "বাবা,
তুমি কোন পাপ করিয়াছ, না হলে কেন
সর্প কাটিল আমাকে, এ সর্প নয়, পাপের থাবা।
আমার মন বলিছে, এ গজব খোদার যেন"
বলিয়া শাহজাদী আঁখি মুদিল, শত
ডাক্তার, কবিরাজ, সাপুড়ে এসে পারিল না
বিষ নামাতে, কিছুতে কিছু হলো না, ধীরে
ধীরে শাহজাদী হলেন নিঃশেষ, বিনা
বজ্রপাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল আকাশ, রাজা
রাণীর মাথায়, হৃদয়ের ধন, আদুরে দুলালী
মৃত্যুমুখে, হায়, হায় রব সর্বত্র, সাজা
পেল রাজা, কি অপরাধে, কেহ জানিল না
ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ায়, আঁখি মুদিয়া
শাহজাদী মৃত্যুবৎ হয়ে রইলেন,
শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ দেখিয়া অবশেষে

উজির নাজির, সকলে মিলিয়া রাজাকে কহিলেন,
'হে রাজন! কি আর করার আছে-
এবার শাহজাদীকে কবরস্থ করা হোক,
শুনিয়া বাদশাহ, রহিলেন চুপ
কহিলেন না কিছু, কাঁদিয়া ভাসাইছেন বুক।
রাণী মূর্ছিত, রাজপ্রাসাদ অন্ধকার,
তবু, শাহজাদীকে আর রাখা যাইবে
না, করিতে হইবে কবরস্থ, ইহাই বিধি
শত আশা করিলেও, কি ফল হইবে
তাকে ইহ জগতে আর কেহ পাইবে
না, গুরু হইলো এবার দাফনের পালা
অতীব জনপ্রিয় শাহজাদী, শোভাযাত্রা করিয়া,
কফিন গণমানুষকে প্রদর্শন করাইয়া
অবশেষে আনা হল রাজকীয় বাগানে শহর ছাড়িয়া।
শোকাবহ পরিবেশে অতঃপর করা হল
দাফন শাহজাদীকে, ফুলেল শোভাময় ভূমে,
এ যেন আর এক স্বর্গপুরী, প্রকৃতির কারু-
কাজ খচিত উদ্যান নির্জন নিরবে মহীয়সীর পদচুম্বে।
দরবেশ গোরস্থানে রাত্রি যাপন শেষে
ধীরে ধীরে আসিলেন রাজধানী শহরে,
দেখিলেন চাহিয়া সব দোকান
পাট বন্ধ, নেই কোলাহল কোথা, লোকের বহরে।
সকলে কানা ঘুষা করিছে
ছোট ছোট দলে, শোকার্ত মনে,
হায় হায় 'গুলেজান্নাত', মাতম করে!
কথা কহিয়া দুঃখ ভাগ করে একে অপরের সনে।
হতাশা কাতর দরবেশ লোকমুখে
শুনিয়া মৃত্যু সংবাদ শাহজাদীর
মনে মনে ভাবিলেন, কি হইল ফল
এই কি নিষ্ঠুর নিয়তি, এই কি ফল জান বাজীর?
অবশেষে অজু করে দু'রাকাত নফল
নামায পড়ে, মোনাজাতে বলিলেন,
'হে পরওয়ারদিগার, আমার পথ
কি ভুল, না সঠিক', তিনি বলিয়া চলিলেন,

‘হে প্রভু, আমাকে সঠিক সরল পথ
দেখাও, তোমার নামে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেন
চলিতে পারি আমাকে সে তওফিক
দাও, আমাকে নিরাশ করিবে তুমি কেন’ ?
দোয়া শেষ হইতে না হইতেই তিনি
শুনিলেন, গায়েবী আওয়াজ,
‘হে আদহাম, আল্লাহ তোমার প্রতি
রহিয়াছেন সদয়, তিনি দেখছেন তোমার কাজ ।
হত বিহ্বল হবে না, যাও চলে শাহজাদীর
গোরে, নিয়ে আস তুলে লাশ,
তোমার আস্তানায়, ইহাই আল্লার অভিলাষ’ ।
আবার তিনি রওনা দিলেন রাজ প্রাসাদের দিকে
দেখিলেন কোন বাধা নাই, এ সময়
কে, কার খবর রাখে যেন মরণপুরী, আছে টিকে ।
লোক স্রোতের সাথে তিনি
চলে গেলেন, একেবারে শাহজাদীর গোরে,
সেখানে দেখিলেন প্রহরী এক আছে
দাঁড়াইয়া, সে দরবেশকে চিনিয়া ফেলিল
বিগত দুষ্কর্মের জন্য চাহিল মাফ, আর-
শাহজাদীর কবর সে দেখাইয়া দিল ।
বলিল, ‘হুজুর কি খেদমত করিতে
পারি আপনার, দেন যদি এ অনুমতি’,
দরবেশ বলিলেন, ‘না, কিছু প্রয়োজন
নাই তবে কোথা যাওয়ার যদি না থাকে গতি,
তবে আজ রাত থাকিব তোমাদের সাথে’ ।
শুনে, প্রহরী ‘জ্বী’, আচ্ছা বলে
চলে গেল অদূরে তার প্রহরা স্থলে,
এদিকে দরবেশ গভীর রাত পর্যন্ত
নিকটেই এক পাহাড়ের তলে,
বিন্দ্রি এবাদতে কাটালেন
তাঁর সময়, হঠাৎ দেখিলেন, সব
নিস্তন্ধ নিরব, প্রহরী দল যে যেখানে
আছে ঘুমাইছে শান্তিতে, নেই জন কলরব ।

রাস্তা-ঘাট, সর্বত্র জনশূন্য,
কোথাও কেই নেই আবছা অন্ধকারে-
তাই, হাতে লয়ে এক শাবল, ক্ষিপ্ত
গতিতে, গেলেন চলে, কবরের ধারে।
শাহজাদীর লাশ করে উত্তোলন পিঠে লয়ে
বন পথ ধরে তাঁর আস্তানায় আসিলেন ফিরে,
সেখানে এক গাছের সাথে হেলান দিয়ে
কাফনের মুখ বন্ধন দিলেন খুলে,
জ্বালালেন অগ্নি কুন্ডলী, দেখিলেন,
সেই নূরের বলক! মুখায়ববে,
মৃত্যুবৎ রয়েছে ঝুলে।
পথহারা একদল বণিক, আগুনের
কুন্ডলী দেখে আসিল উৎসুক ভরে,
গভীর বনে, আগুন কেন, নিশ্চয়
কোন বসতি আছে, দেখা যাক জিজ্ঞাসা করে।
ভাবিয়া তারা আসিল আগুনের
কাছে, এদিকে দরবেশ সেনাদল ভেবে
নিকটে ঝোপে আত্মগোপন করিলেন,
শাহজাদীকে দেখে, কি পদক্ষেপ বণিক দল নেবে
স্থির করতে পারছিল না, দলের মধ্যে
ছিল, এক হেকিম, তিনি নাড়াচাড়া
করে, নাড়ী দেখে, শরীরের তাপমাত্রা বুঝে
হেকিম সুলভ কার্যাদি করেন হেকিমী যন্ত্র দ্বারা।
তিনি করেন খেয়াল পায়ের
নিচে রক্তের দাগ, মনে হচ্ছে সদ্য
হইয়াছে জখম, তিনি অস্ত্রোপচার
করে দেখেন বরছে রক্ত, আশায় আবদ্ধ
থেকে বলে উঠলেন, 'এ মেয়ের
জ্ঞান ফিরবে', তাই আরও চিন্তা করে
চিকিৎসা চালালেন, কহিলেন, 'সাথীদের
পানি ছিটা দাও, চোখের 'পরে'।
আল্লাহর রহমতে, চোখে পানির
ছিটে ফোঁটা দেওয়ার সাথে সাথে খুলিল আঁখি,

শাহজাদী, দেখিল দু'চোখে অচেনা জগৎ
বলিল, 'আমি কোথায়, আপনারা কারা', নিরব থাকি
কিছুক্ষণ, বণিক দল বলিল, ইতিবৃত্ত,
কিভাবে মৃত শাহজাদী করিল জীবন লাভ,
ঝোপ-ঝাড় হতে দরবেশ এবার এলেন বেরিয়ে,
অবলোকন করে পরিস্থিতি হাবভাব।
দৃঢ়তার সাথে তিনি বলিলেন কাহিনী,
শুনে শুদ্ধ হয়ে গেলেন শাহজাদী, নিষ্পলক চোখে
দেখিতে লাগিলেন, ফুলবনে যাওয়ার পথের সেই ফকির,
উজ্জ্বল নূরাণী মুখ, ইনি নিশ্চয় সেই লোক।
শাহজাদীর প্রতি ভালবাসা, আর ত্যাগের
বিবরণ শুনে আবেগে চোখে আসিল জল,
ভাবিলেন তাঁকে ছাড়া আর যায় না বাঁচা,
মনে হলো মহাধন তারই, না করে ছল্
সরাসরি বলিলেন শাহজাদী হেকিমকে,
বাবা আপনি আমার, কারণ দিয়াছেন
নতুন জীবন, প্রাসাদে ফিরিব না আর
তারা জানে আমি মৃত; সকলে
মিলে আমাকে গোরে পুরিয়াছেন।
এরপর কিভাবে তাদের সম্মুখে দাঁড়াব?
তিনি বলিতে লাগিলেন জড়িয়ে আবেগ
রুদ্ধ কণ্ঠে, 'এই মহান দরবেশের
সঙ্গে, আমাকে করান বিয়ে, যার ত্যাগ,
কামনা, বাসনাহীন ভালবাসায় সিক্ত আমি,'
শুনিয়া হেকিম, তার দলের কিছু সামান,
আর হাড়িপাতিল দিয়ে কুটিরে নিরাড়ম্বর
পরিবেশের আদহাম-গুলেজান্নাতের বিয়ে পড়ান।

আজ বনে মহানন্দের বন্যা বহিয়াছে
বনের পশু পাখি আসিয়াছে দেখিতে রূপ,
আকাশ হতে খসে পড়া তারকা, ফুটন্ত পাপড়ীসম
অনিন্দ্য সুন্দর বনরাণীকে সারি সারি, থাকি চুপ।
আনন্দ জোয়ারে ঐশী দূতেরা, এনে দিল
গোপনে মজাদার খাবার, মিলন সন্ধিক্ষণে,

এ যে, আল্লার অভিশাপ, তাঁর প্রিয় খোয়াজ
খিজিরের ঘটকালি, লাইলী মজনুর সম্মিলনে।
রচিত এক ইতিহাস, এমনও হতে পারে!
আল্লাহ কোথা কি দিয়া রাখেন, কার
দ্বারা কি করাতে চান, তিনি ছাড়া
আর কে জানে, সকল প্রশংসা আল্লার।
শাহজাদী দরবেশের সান্নিধ্যে এসে,
তার অন্তর্গত গুণাবলী গভীরভাবে বুঝিলেন,
তিনি দেখিলেন, কিভাবে তার বিবাহ লগ্ন,
স্বাগতঃ জানাইয়াছে, অরণ্য, কত না ভালবাসেন
দরবেশ তাঁকে, দরবেশের ভালবাসায় ত্যাগ-
আছে ভোগ নেই, প্রেম আছে কামনা নেই,
আত্ম দান আছে অভিমান নেই, পূণ্য
আছে পাপ নেই, আলো আছে আঁধার নেই, তিনি সেই
মহামানব, যার জীবনে কষ্ট আছে বিলাসিতা নেই
যাঁর অনুরাগে বন্য গাভী, মেঘ দুধের গুলান পেতে
দিচ্ছে দুধ, এ-ত জীর্ণ কুটির নয় মহা
রাজ্য, তার প্রিয়তম স্বামীর পদতলে যেতে
আগ্রহী পশু দল। রিপু বিবর্জিত
সরল কামেল অলি, তার আত্মার আত্মা,
দিবারাত্র স্রষ্টার এবাদতে মগ্ন এক
আবেদ, নফসের চাহিদা, পায় না পাত্তা।
দরবেশের মানবীয় সৌন্দর্যের গুণে বিমুগ্ধ
শাহজাদী, পরমানন্দে কাটালেন দু'বছর শান্তি অতুল,
এরই মধ্যে হলেন তিনি অন্তঃস্বত্বা, দরবেশের
আদর্শে দীক্ষিত শাহজাদী ফুটালেন বুঝি ফুল।
শাহজাদী মুখে রাখিতেন জিকির জারী
হাতে করিতেন, ইবাদত সম সন্তান-
প্রতিপালন, এ যেন দ্বিগুণ এবাদতের সুযোগ
আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত করিয়াছেন দান।
একদিন শাহজাদী অদূরে থেকে
লক্ষ্য করিলেন, এক বিষধর সাপ মাথা নাড়ছে,
তার শিশুর পদতলে ছোবল তুলে
আছে, শিশু তার পা তুলে লাথি মারছে।

দেখে তার জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা
হল, এ যে সেই সাপের মত, সাপ যা
তাকে দিয়েছিল ছোবল, হুবহু তাই,
আসিল আবার তার সন্তান খেতে, আহা
তিনি অবশেষে হারালেন দৃশ্য দেখে জ্ঞান
হয়রত আদহামও ছিলেন না তখন পাশে,
যখন ফিরিল জ্ঞান দেখিলেন, তাজ্জব কাণ্ড
সেই সাপ নেই, শিশু স্বাভাবিক আছে।
আর একদিন দেখা গেল খেজুর থলে
যাহা ছিল নিশ্চিত অপূর্ণ, তার শিশুর শয্যার কাছে।
গভীর রাতে শিশুটিকে কাছে টানতে গিয়ে
দেখেন, খেজুর রুটিতে পূর্ণ ভারী থলে,
ঘটনা বলিলে, হয়রত আদহামের নিকট, তিনি
বলিলেন, 'এ সাধারণ শিশু নয়, ঘটনা ঘটছে শৃষ্টার ইচ্ছাবলে'।
একদা গভীর রাতে সিংহের তাড়া খেয়ে এক হরিণ শাবক
এসে ঢুকিল আন্তানার ভেতর, আর
অল্প পরেই শোনা গেল ক্ষিপ্ত সিংহের গর্জন
চাটিয়া শিশুর গাল, ভোরে শাবক চলে গেল খোলে দ্বার।

দুর্গম পাহাড়ী পথ বেয়ে আনা হয় নি
পানি, তাই শাহজাদী পড়লেন বিপাকে রাত্রে,
হঠাৎ এক চামরি গাভী আসিল দুধ দিতে দ্বারে,
শিশুর পানি পিপাসা রইল কোথা, দুগ্ধ আছে পাত্রে।
ঐ দিন ভোর রাতে ঘটিল আর এক অলৌকিক
ঘটনা, ফজরের পূর্বে আসিল ক্ষুধার্ত তিন লোক,
হাঁকিল খাবার, গুলেজান্নাত দল ছুট শিকারী দল ভেবে
বলিলেন, 'পথিকগণ, ফজর নামায় আদায় হোক,'
ঘটনা বলিলেন তিনি, দরবেশ আদহাম কে,
আদহাম বলিলেন, 'এরা মেহমান খাইয়ে দাও',
তাদের বিবাহের সময় পাওয়া সেই ঘটাবাটি
বাসন কোসন বাহির করিল, আরো যা আছে, তাও।
ফলমূল দুগ্ধ পরিবেশন করিলেন, নামায়
শেষে আসিলে মেহমান বলিলেন হয়রত
আদহাম, এ আপনাদের সৌজন্যে রাখা
আহার করুন, দান করুন বরকত।

খাবার উপস্থিত করা হয়েছে শাহী কায়দায়
দেখে মুগ্ধ অতিথিবর্গ, রাজ পরিবারের কেউ
আছে এখানে, করিলে প্রশ্ন বলিলেন, হযরত
আদহাম (রঃ) বলখেশ্বরের রাজকন্যা আমার বউ ।
অতিথিরা বলিলেন ফের, আছে কোন সন্তান
আপনাদের? শুনে হযরত আদহাম আস্তানা থেকে
কোলে করে আসলেন নিয়ে শিশুপুত্র হযরত
ইব্রাহীমকে, পথিকেরা শিশু পুত্রকে দেখে
বললেন, ‘হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম
অনেক বড় অলি হবেন’, বলিয়া উঠিলেন
তিন অলি রে একত্রে দেখিবার তরে এসেছি,
আমরা খাই না কিছু, বলে আতিথ্য চুকিলেন ।
এঁরা কারা? প্রশ্ন তাড়া করে বেড়ায় দু’জনকে
“এরা কি ফেরেশতা? আমার তাই মনে হয়,
আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করার জন্য পাঠাইয়াছেন,
সম্মুখে আছে কোন মর্যাদার পরীক্ষা নিশ্চয় ।
‘ত্রিশ বৎসর বনবাসের জীবনে
দেখি নি এমন’, বলিলেন হযরত আদহাম,
এদিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে শিশু পুত্র ইব্রাহীম
বয়স হয়েছে, ইব্রাহীম বিন আদহাম, নাম ।
মায়ের নিকট প্রাথমিক পাঠ শেষ, এখন
প্রয়োজন কোন বিদ্যালয়ে দেয়া,
এ জন্য হযরত আদহাম শুরু করিয়াছেন
অদূরে কোন ভাল বিদ্যালয়ের খোঁজ নেয়া ।
বন হইতে অদূরে নিভৃত পল্লীতে বাস
করিতেন, এক ভাল ওস্তাদ,
তাহার সহিত যোগাযোগ করিতেই
তিনি ইব্রাহীমকে পড়াতে জানালেন খোশ আমদেদ ।
পরদিন নিয়া গেলেন পুত্রকে
ওস্তাদের নিকট, বলিলেন, তাঁকে
প্রতিদিন ভোরে আসিব, নিয়া
যাব দুপুরে, তখন ওস্তাদ শিশুটিকে
কিছু প্রশ্ন করে বুঝিলেন,
প্রাথমিক পাঠে অগ্রগতি আছে,

হযরত আদহাম নিশ্চিন্ত হলেন
সঁপে দিয়ে শিশুকে ওস্তাদের কাছে।
প্রখর মেধা, একবার শুনিলে স্মরণে থাকে,
কোরআন হাদিস, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শন,
একাধারে করিলেন পাঠ ইব্রাহীম তিন বছর
ক্রমে হয়ে উঠলেন পন্ডিত, করিলেন ব্যুৎপত্তি অর্জন।
তিনি একদিন ময়ূর কণ্ঠে, করছিলেন
কোরআন তেলাওয়াত ওস্তাদজীর ছোট ঘরে,
পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন বলখেশ্বর
বাদশাহ, ভ্রমণ বিহার শেষে, এ মধুর স্বরে
কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া, বাদশাহ
চুকিলেন ঘরে, দেখিলেন এক অদ্ভুত কান্ড,
এ ছোট বালকের চেহারা আর তাঁর মৃত মেয়ে
গুলেজান্নাতের চেহারা এক, যেন এ ভান্ড
একই, শুধু প্রাণ রস বসানো ভিন্ন,
হাত-মুখ-চুল-কান যেন ১০ বৎসরের গুলেজান্নাত
একি অদ্ভুত কান্ড, সর্বত্র একই চিহ্ন।
ভাবিতে লাগিলেন, এ কি করে
সম্ভব, মানুষ হু বহু এক হতে পারে!
না, তিনি আর ভাবতে পারছেন না
শুধু বলিলেন, হে বালক তোমার নাম কি? বল আমারে।
হত চকিত ওস্তাদকে লক্ষ্য করে বললেন,
এ ছেলে কার? বলুন ওস্তাদ, বলুন আমাকে
ওস্তাদ বললেন, 'জাঁহাপনা, এ ছেলে বনবাসী
এক ফকিরের, নাম তাঁর আদহাম', যাঁহাকে
বহু পূর্বে দেখা গেছিল, রাজপ্রাসাদে, তিনি,
কি সেই আদহাম! বাদশাহর মনে ভাবান্তর,
তিনি শুধু ওস্তাদকে বললেন, 'আমি এ ছেলে
নিয়ে গেলুম, আপনি ফকিরকে বলবেন, আমার 'পর
যেন রাখে বিশ্বাস, আর রাজপ্রাসাদে যেন করে দেখা',
রাণী, দেখে ইব্রাহীমকে হলেন ততোধিক
আশ্চর্য আর টেনে তার কোলে, বলিলেন,
'আগে করো খাওয়া দাওয়া, পরে কথা হবে', ঠিক
তারপর রাজকীয় খাবার এনে দিলে, ইব্রাহীম

বলিলেন, ‘আব্বার অনুমতি ছাড়া আমি খাব না
এবং নাস্তার একাধিক উপকরণ খাওয়া আছে
বারণ, আমার আন্নার’, এ ছেলে সাধারণ না
ভাবিলেন বাদশাহ, বলিলেন, “তাহলে খাও
একটু পানি”, হযরত ইব্রাহিম খাইলেন একটু জল,
এদিকে হযরত আদহাম এসে ওস্তাদের ধারে
শুনিলেন, আনুপূর্বিক ঘটনা, শরীর হলো নিখর পা অচল।
ভাবিলেন, আল্লাহ আবার কি পরীক্ষা করিবেন, তাহলে আমার
দ্বারাই প্রকাশ করিবেন সব ঘটনা! বিষন্ন বদন তাঁর
তিনি ধীরে ধীরে রওনা দিলেন রাজপ্রাসাদের
দিকে, ভাবিলেন, রাজকর্মচারী কি পূর্বের মতই করিবে ব্যবহার?

নানা-নাতি গান

বিধি রে, ও বিধি রে,
তোমার লীলা বুঝা দায়, হয় রে লীলা বুঝা দায়,
কারে দিয়া কি করাও রে, কে জানিতে পায়।।
আমি কষ্ট পাইলে খুশি হই
বিপদে হই সুখি,
আরাম আয়েস নরক আমার
ভাল লাগে ঝুঁকি।
আল্লাহ তোমার ইচ্ছা, আমার জড়িয়ে ধরুক গায়।।
চাওয়া পাওয়ার নাই কিছু যে,
বিধি গলার হার
বুকের মানিক তোমায় দিলাম
কাঁদিব না আর।
হুকুম খোদা থাকলে তোমার, বাধা সরে যায়।।

(দাদা-নাতি আবৃত্তি)

এ দিকে বাদশাহ হযরত আদহাম আসিবেন বলে,
সব ব্যবস্থা করে রাখলেন এবং তাকে দেখামাত্র
সম্বর্ধনা দিয়ে নিয়ে আসার জন্য হুকুম জারী করলেন,
বললেন, ‘আদবের যেন খেলাফ না হয়, তিনি মর্যাদার পাত্র’।
ফকির হযরত আদহাম যতই প্রাসাদের দিকে এগুচ্ছিলেন ততই
হাত পা অবশ্য হয়ে আসছে, হঠাৎ দেখা গেল,
এক রাজ কর্মচারী তার দিকে আসছে, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন,
রাজ কর্মচারী তাঁকে ঠিকই চিনতে পেল।

বলল, ‘হুজুর ইতিপূর্বে যে উজির আপনার সাথে
করেছিল বেয়াদবি সে আজ আক্রান্ত প্লেগ রোগে,
কুকুরে চাটে শরীর তার, দোষী অন্যরা হয়েছে অন্ধ আতুর,
বাদশাহ আছেন অপেক্ষায়, আসুন,’ বলিল অনুযোগে।
ফকির, বাদশাহের দরবারে পৌঁছাতেই, বাদশাহ
জানালেন সাদর সম্বর্ধনা, দিলেন সোনার আসন পেতে,
তিনি বসিলেন না সেথা, বসিলেন সাধারণ আসনে,
পেছনে বহু লোক ধরে আছেন ফুলের মালা গেঁথে।
দেখিয়া ইব্রাহিম তাঁর বাবাকে আসিলেন ছুটে
আব্বা, আব্বা বলে, বাদশাহ ও সম্রাজ্ঞী তাই
দেখে হলেন বিচলিত, আরও বিচলিত হলেন
এই ভেবে যে, বহু আগে বিয়ে করতে চাই
গুলেজান্নাতকে বলেছিলেন এই দরবেশই।
অবশেষে দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন
বাদশাহ, ‘আপনি এমন ছেলে কোথা পাইলেন’
হযরত আদহাম ইতিবৃত্ত সব ভাঙ্গিয়া বলিলেন।
বাদশাহ ও সম্রাজ্ঞী পাগল প্রায়, গুলে
জান্নাতকে দেখিবার তরে। হুকুম জারী
করে পাঠালেন লোক লঙ্কর, আস্তানা বনে,
লোক লঙ্কর পৌঁছিলে সেথায় শাহজাদী
বলিলেন, স্বামীর হুকুম ছাড়া আমি যাব না
লোকজন আসিল ফিরে, জানাল বাদশাহ
কে, বাদশাহ ফকির আদহামকে
করিলেন অনুরোধ, ‘বাবা আদহাম, আহ,
আমার সইছে না তর, দেখিব শাহজাদীকে
তুমি যাও, নিয়ে আস আমার কন্যা,’
ফকির আদহাম ছুটিলেন অরণ্যের দিকে
লোক লঙ্করসহ, পৌঁছে আস্তানায় তখন লোকবন্যা।
আসিছে সকলে, সাথে বাদশাহ বেগম
স্বয়ং রাজকীয় সভাসদ সহ রাজকীয় শোভাযাত্রা,
এ সময় হর্ব ধ্বনি হচ্ছিল বারংবার আহা
এ যে, মিলন মেলা, সকলে জানাচ্ছিল আনন্দ বার্তা।
আস্তানার ছোট কামরায় রাজা-রাণী
বালক ইব্রাহীম, আদহাম সকলে ঢুকে,

কেবল কাঁদছিল, ক্ষণিক ‘পরে আনন্দের
চেটে ছুটে আসল, বাদশাহ বলিল, হাত রেখে বুকে,
‘তোমরা চল শাহী প্রাসাদে,’ আদহাম
বলিলেন, ‘মুরব্বীর কথা শুনতে হয় চল,
আমরা প্রাসাদে যাই, আব্বার আদেশ পালন
করিয়া দুর্লভ সওয়াব পাই, কি বল’।
শাহজাদী মাথা নাড়িল, উপস্থিত সকলকে
ছালাম দিল। বাদশাহ, রাণী, শাহজাদী
হযরত আদহাম আস্তানা হতে বের হতেই
লাগিল হুলস্থূল, কে, আগে দেখিবে শাহজাদীকে
নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী আবার রওনা
দিল হাতিপৃষ্ঠে, সওয়ার হয়ে গুলেজান্নাত
বহু তোরণ, জাঁকজমক আর আনন্দঘন পরিবেশ
শোভাযাত্রা পৌঁছিল, আনন্দ চলিল ধরে সাত দিন সাত রাত।
আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সারা দুনিয়ার
বিনিময়ে করেন না তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিল,
হযরত আদহাম তাই বাদশাহের রাজত্ব দানের
প্রস্তাব অস্বীকার করে আপনাকে চালান ভিন্ন
পথে, সেই বনবাসে। ফিরিয়া গেলেন আবার
সেই পুরনো পথে, তবে মাঝে মাঝে জায়া
পুত্র দর্শন তরে স্নেহ বসে তাঁকে ডাকিত রাজ দরবার।
হযরত ইব্রাহীম আরও দশ বৎসর
উচ্চ তালিম নিলেন, হলেন সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত,
বাদশাহ তাকে বৃদ্ধ বয়সে দানিল রাজত্ব
শ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে হলেন সাফল্য মণ্ডিত।
দীর্ঘ বার বছর রাজত্বকালে তাঁর সাথে
জুড়ি মেলা ছিল ভার, কুশলী সেনানী,
রাজত্বের ২য় বৎসরে মারা যান নানা, আরো পরে
মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন আদহাম, ভেঙ্গে পড়েন তিনি।
রাজত্বের ৮ম বছর শাদী করান মাতা
২ বছর শেষে জন্ম হয় পুত্র সন্তান,
তার সংসার ছিল সুখের, একদিন
গভীর রাতে প্রাসাদের ছাদে শুনতে পান,

এত প্রহরী ভেদ করে কে ছাদের 'পর', তিনি
শুধালেন, কণ্ঠ তাহার গম্ভীর রাগত স্বর,
প্রথম ডাকে আসিল না উত্তর, দ্বিতীয় ডাকে
বলিলেন, আগন্তুক রাখাল 'খুঁজছি উট ছাদের 'পর'।
হযরত ইব্রাহীম বলিলেন, রে আহম্মক
ছাদের 'পর কি হারানো উট পাওয়া যায়?
আসিল উত্তর, 'তাই যদি হয় তবে
কোন্ বোকা ফুলশয্যায় থেকে আল্লাহকে পেতে চায়?
আহম্মক আমি না তুমি, হে বলখে-
শ্বর দেখো ভেবে', গুনিয়া তিনি চুপ
আর একদিন এক মুসাফির এসে
রাজ প্রাসাদে থাকিবার তরে বলিলেন অনুরূপ-
'হে মহাত্মন, আমি থাকিতে পারি এ
মুসাফির খানায়!' গুনিয়া বাদশাহর
হইল হাসির উদ্বেক, বলিলেন, 'বোকা
এটা নয় মুসাফির খানা, এটা রাজ দরবার'।
পথিক বলিল, 'এখানে আপনার পূর্বে কে
ছিলেন, বাদশা এ রাজ্যের'। বলিলেন তিনি, 'নানা',
বলিল পথিক, 'পুনঃ পুনঃ রাজা আসে, রাজা যায়,
তাহলে এ কি নয় মুসাফির খানা'?
একদিন এক বাঁদী এসে সুখময় তুলতুলে শাহী
বিছানায় এসে ঘুমাইয়া পড়িল তাই দেখে,
বেগম হাঁকিলেন, 'এ কে লাগাও একশত কোড়া
কয়েদ খানায় নিয়ে যাও, আস তারে রেখে'।
প্রহরী দিতে লাগিল সাজা গায়ে, প্রথম
কোড়ায় সে হাসে, দ্বিতীয় কোড়ায় কাঁদে,
পুনঃ পুনঃ হাসছে আর কাঁদছে আঘাতে,
বন্ধ করে আঘাত, বাদশাহ রহস্য জানার সাধে-
বলিলেন, হে বাঁদী, বলো এরূপ করছ কেন?
বলিল বাঁদী, 'শুনেছি হাদিছ, বেহেশত, দুনিয়া
কাফেরের লাগি, মোমেনের জন্য হল দোজখ,
শাহী বিছানায় শোয়ার সুখে, গুনিয়া গুনিয়া
আঘাতে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো,
ভেবে কেবলি আসছে হাসি আর হাসি,

তাও আবার এক ঘন্টা! হে বাদশাহ মহাত্মন,
সারা জীবন এ বিছানায় শুয়েছেন, এ দাসী
কাঁদে তার মনিবের তরে, না জানি কত শাস্তি
দেন আল্লাহ বাদশাহকে'। শুনে বাদশাহ
হলো বোধোদয়, দিলেন মুক্তি দাসীকে,
ভাবিলেন এ বিছানায় কোনদিন শুইবেন না আর।
লক্ষ্য অর্জনে সফলতা পেতে হলে
তাকে নির্জনতাসহ ফকিরী জীবন গ্রহণ
করিতে হইবে, রিপু দমনে হইতে হইবে
আরও অগ্রণী, শুধু জিকির করিতে হইবে বহন।
আত্মশুদ্ধি অর্জন লোকালয়ে,
রাজকার্যে, সুখ ঐশ্বর্যে থেকে সমাজাচার,
প্রতিপালন করে সম্ভব নয়, মনে হলো
তাঁর কাছে, খাঁটি হওয়ার জন্য দরকার স্বর্ণ পুড়াবার।
তাই আল্লাহর কুদরত রাজ্যের বিশাল
প্রকৃতির মধ্যে, তাঁরই সাহায্যের 'পর
নির্ভর করে বেরুলেন পথে, বনে,
জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে, মাঠে, সাথী এবাদত জিকির স্বর।
কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার তরে তিনি
হলেন, নিরুদ্দেশ জানিল না কেহ, বুঝিল না কেহ,
সতী সাধ্বী পুণ্যবতী বেগম, রাণী আঁচ করে তা বলেন,
'ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাদশা আছেন অন্যত্র,' উমরা
আমীর সভাসদ, মন্ত্রীবর্গ, সকলে শুনের,
যতদিন না তিনি আসেন ফিরে আমি করিব শাসন,
বেগমের কথা শুনে সকলে হলেন আশ্বস্ত,
তিনি অলংকৃত করিলেন রাজার আসন।

হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী বলে কথা, তিনি
তাঁর মেধা, বিচক্ষণতা, দয়া, প্রজ্ঞা দিয়ে,
রাজ্য পরিচালনা করছেন কঠিন হস্তে,
প্রজাবৎসল তিনি, ভালই আছেন প্রজাদের নিয়ে।
এদিকে হযরত ইব্রাহীম (রঃ) ক্ষুধার্ত অবস্থায়
পাহাড় পর্বত, বাড় জঙ্গলে, ঘুরছিলেন, সঙ্গে ছিল না কিছু,
গায়ে ছিল বাদশাহী জরির পোশাক, দেখা গেল
প্রান্তরে, চটের পোশাকে রাখাল বালক, ছুটিলেন তার পিছু।

ভাবিলেন, বাদশাহী পোশাক হতে পারে তার সাধনার
পথে বাঁধা, তাই তা দিয়ে দিলেন রাখালকে আর
রাখালের চট পড়িলেন গায়ে, রাখালের দেয়া দুধ খাইলেন
তিনি পেট পুরে, তিনি শক্তি পাইলেন আরও পথ চলার।
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তা যদিও উঁচু নিচু কাঁটাময় পথ,
কিছুদূর গিয়ে পড়িল চোখ তাঁর, জুতো আছে পায়ে বাদশাহী
রক্ত ঝরছে পা হতে, স্রক্ষপ নেই তাঁর, জিকিরে অবগাহী-
ভুলে গেছেন ব্যথা বেদনা, মরুন্ময় গরম প্রান্তর, ছেড়ে তিনি
প্রবেশ করিলেন গহীন অরণ্যে, দিনে রাখিতেন রোজা,
রাতে ফলমূল খেয়ে চলছে সাধনা, এভাবে কাটে বহু বৎসর
আবার তিনি অতিক্রম করে বন, শহরে যেতেন কাষ্ঠের বোঝা-
নিয়ে মাথায় করে, বিক্রয়লব্দ অর্থের অর্ধেক ভাগ
করিতেন দান, বাকী অর্ধেক দিয়া রুটি খেজুর নিয়া
আসিতেন ফিরে আস্তানায়, অনুসরণ করে পিতার পদাঙ্ক দাগ।
তার সাধনা জীবন ছিল অকৃত্রিম ভীষণ কষ্টকর,
একাধারে চৌদ্দ বছর পাহাড়ে বনে-জঙ্গলে কাটানোর পর
আসিলেন এক পর্বত গুহায়, সেখানে ছিলেন নয় বৎসর,
মাঝে মাঝে গুহার বাহিরে এসে বন হতে ফলমূল নিয়ে অনড়
বসে যেতেন গুহায়, সীমাহীন ক্ষুধার যন্ত্রনা বিচ্যুৎ করে নাই
তাঁর ব্রত, নিজেকে তিলে তিলে করেছেন তৈরী এশুকে এলাহী রূপে,
তিনি ঠিক বুঝেছিলেন, রুহানী উন্নতি না হলে মানুষ
মানুষ হয় না, তাই কষ্টের এ পথটিতে ছুটেছেন নির্জনে চুপে চুপে।
আত্ম গঠনের এ চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল,
যাক শুনা যাক তাঁর কষ্টময় কাহিনী, একদা,
কদরের রাতে বরফ গলা পানি দিয়ে সমাধা করেন গোসল,
শীতে আক্রান্ত হয়ে প্রার্থনা করিলেন, ‘হে আল্লাহ তায়াল্লা,
এমন কোন অবস্থা আমাকে দিও না যাতে তোমার
বন্দেগীতে বিষ্মতা আসে,’ তারপর করিলেন অনুভব
পেছন দিক থেকে বইছে উষ্ণ বাতাস, এবাদতে
মশগুল থাকিলেন সারারাত, সকালে দেখিলেন অভিনব
কান্ড, এক অজগর লুকিয়ে মুখ গুহায় ছাড়ছিল উষ্ণ নিঃশ্বাস,
তিনি ঘাড় ফিরে চাহিতেই পালালো সে সুরঙ্গ পথে,
একদিন তিনি আসিলেন গুহার বাহিরে ফলমূল সংগ্রহ
তরে, পাইলেন না কিছু তাই, আসিলেন ফিরে গুহায় বিফল মনোরথে।

কাটিল দু'দিন অনাহারে, তৃতীয় দিনে, তন্দ্রাচ্ছন্নকালে
 রুহানী চোখে দেখেন, উজ্জ্বল শুভ্র বসন পরিহিত এক
 স্বর্গীয় মহাপুরুষ বলছেন, “হে ইব্রাহীম, তোমার বনের
 রিজিক বন্ধ, তোমার কাবাগৃহে যাওয়ার বাধা আল্লাহ পাক
 করেছেন মঞ্জুর, সে পথেই রয়েছে তোমার রিজিক,” তিনি
 গুহা হতে বের হয়ে বন পাড়ি দিয়ে আসেন লোকালয়
 সীমানায়, দেখেন এক লোক রুটি ও গোস্ত নিয়ে
 অপেক্ষা করছে, তিনি বলিলেন, “কে হে তুমি?” সে বিনয়-
 করে বলিল, “হুজুর, আমার মনিব প্রতিদিন এখানে
 আমাকে পাঠান এরূপ নাস্তা দিয়ে, প্রথম যাকে-
 দেখিব আমি দেবো নাস্তা তাকেই, এ হুকুম
 আছে আমার 'পর,' ” আজ নাস্তা দেওয়া হবে আপনাকে,
 বলিলেন, ইব্রাহীম (রঃ) নাস্তা প্রদানকারী
 ব্যক্তিকে, ‘চল তোমার মনিবের কাছে যাবো’,
 দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মনিবের কাছে গেলে,
 বলিলেন মনিব, ‘অপেক্ষায় থাকি কবে পাবো
 সেই অলির দেখা, আজ দশ বৎসর যাবত
 নাস্তা পাঠাচ্ছি লাগি তাঁর;’ মুসাফিরখানার
 ঐ মনিব বলিল, ‘মক্কা শরীফ যাবার
 যে নিয়ত করেছেন তাই করুন, আপনার
 এখানে থাকার কোন আবশ্যিকতা নেই।
 তবে হক্কুল খাল্ক বিষয়ে উন্নয়নকল্পে আরও
 কিছুদিন, আপনি আমার লঙ্গরখানায় থাকতে পারেন।’
 হযরত ইব্রাহীমের আবদারের প্রেক্ষিতে খুশিতে পোয়াবারো
 প্রধান বাবুর্চি, যেভাবে খুশি সে ভাবে খাটাতে শুরু করল, এমন
 কি হযরতের ইবাদতে বিঘ্নতা হল
 তারপরও মুখ বুঁজে সব সহ্য করলেন ইব্রাহীম তখন।
 একাধারে দু'বছর প্রধান বাবুর্চির নির্যাতন সহ্য
 করার পর, মনিব অলি বলিলেন, ‘হে ইব্রাহীম
 আর নয়, এবার আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে,
 আপনার তালিম সমাপ্ত, এ লঙ্গরখানা পরিত্যাজ্য।’
 মনি অলি তাঁর হাতে একটি খালি
 পেয়ালা দিয়া বলিলেন, ‘যাও, ইহা থাকুক কাছে,’

ওস্তাদ অলির আদব রেখে হযরত ইব্রাহীম কর্পদক শূন্য
 হাতে রওনা দিলেন মক্কা শরীফের পথে, বর্ণিত আছে-
 প্রতি কদম অতিক্রম করে তিনি দু'রাকাত নফল
 নামাজ কায়েম করে নিতেন, ধারণা ছিল তাঁর,
 খালি হাতে আল্লার দরবারে উপস্থিত হওয়া চরম
 অন্যায়, তাই কিছু এবাদত নিয়া যাওয়া, চেষ্টা ভাগ্য গড়িবার।
 এই নিয়মে পথ অতিক্রম করিতে করিতে মক্কা শরীফ
 যেতে তাঁর লেগেছিল চল্লিশ বছর, অপরাপর
 আল্লাহর অলিগণ, ছিলেন অবগত তাই,
 সর্বত্র হয়েছে রাষ্ট্র, আসছেন হজ্জে হযরত ইব্রাহীম (রঃ)
 সর্বত্র লোক প্রেরণ, অভিভাবদন জানানোর চেষ্টা
 আত্ম পরিচয় দানে অনিচ্ছুক এবং সতর্ক থেকে
 চলছিলেন পথ, তবু পথে লোকজন নাম পরিচয়
 জানতে ছাড়ল না, কতিপয় ব্যক্তি মক্কার অদূরে দেখে,
 বলিল, 'ভাই সাহেব, আপনি কি যুগের শ্রেষ্ঠ-
 তাপস, ইব্রাহীম ইবনে আদহামকে দেখেছেন কোথা,'
 হযরত ইব্রাহীম দিলেন উত্তর, 'হ্যাঁ বিগত চল্লিশ বছর
 ধরে তার চেহারা দেখি নাই আমি হেথা হোথা।'
 লোকেরা বলিল, 'হ্যাঁ কাছাকাছি স্থায়ী জনবসতি
 আছে কি?' তিনি অদূরে দেখিয়ে একটি গোরস্তান,
 বলিলেন, 'ঐ যে দেখুন-মানুষের স্থায়ী বাড়ীঘর,'
 লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মারছিল তাঁকে হয়ে হযরান।
 আর তিনি শুধু মুখে বলছিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ,'
 হঠাৎ কতিপয় বৃদ্ধ এসে বলল, 'তোমরা, ওহে,
 কাকে মারছ?' মুখের উজ্জ্বলতায় মনে হয় মহৎ মনিষী
 কে বলিছে, আমরা যাঁকে খুঁজছি তিনি তাই নহে।'
 এইবার আর হযরত ইব্রাহীম কথা ঘুরাইয়া
 বলিতে পারিলেন না, কেন না তারা জিজ্ঞাসা করিল নাম,
 ক্ষমা চাহিয়া, সকলে জড়াইয়া ধরিল পা,
 শুনিয়া তাঁর মুখে নাম-ইব্রাহীম ইবনে আদহাম।
 তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,
 'হে মানুষ সকল, তোমরা আমার পরিচয় না জানিয়া
 যে আচরণ করেছ, সেজন্য আমি সম্ভ্রষ্ট বটে, তবে
 পরিচয় জানিয়া যে আচরণ করিলে, তা নিতে পারি নাই মানিয়া।

যাও তোমরা, নিকট হতে আমার, থাকিতে দাও
 একা, 'লোকেরা উত্তরের রহস্য জানিতে চাহিল এবার,
 তিনি বলিলেন, "শোন, চল্লিশ বছর আমার
 মুখ আমি দেখি নাই, দ্বিতীয়ত মানুষ জীবন হারাবার
 পর স্থায়ীভাবে করে বসবাস গোরস্তানে তাই,
 ইহা স্থায়ী আবাস, বুঝেছ?" বলে দুর্গম পাহাড়ী পথে
 তিনি হারিয়ে গেলেন, তারপর হতে তিনি রাতে
 চলিতেন রাজপথে, দিনের বেলা পাহাড়ে থাকিতেন মশগুল এবাদতে।
 এভাবে এক সপ্তাহের পথ, লাগিল তাঁর ছয় মাস,
 পৌঁছিলেন, কাবাগৃহে, অশ্রু বিসর্জন দিলেন সেজদায় পড়ে।
 অতঃপর করিলেন তওয়াফ কাবা ঘর মাকামে ইব্রাহীমে করেন
 নামায, হাজরে আছওয়াদে চুম্বন, এবাদতে মগ্ন রহি দু'রাত ধরে।
 তাঁর দীর্ঘ নামাজ দেখে কতিপয় লোকের জাগিল সন্দেহ,
 বলিল, 'আপনার নাম কি, কোথা থাকেন, আরও নানা
 প্রশ্নে জানিতে চাহিল তাঁর পরিচয়।' তিনি প্রথম বলেন, 'ইব্রাহীম
 জঙ্গলবাসী ফকির, এসেছি কাবাগৃহে, ফের কোথা যাই জানি না।'
 সরাসরি নাম জানার অগ্রহ দেখালে তিনি বাধ্য হলেন
 মূল পরিচয় দিতে, কি আর করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে
 এক দুই করে মানুষ এসে কাবা এলাকায় পরিণত
 হল জনারণ্যে। জনসমুদ্রের দাবী উঠে গেল তুঙ্গে,
 'হুজুর, দোয়া চাই, দোয়া চাই' তিনি সকলকে নিয়া
 তুলিলেন হাত মহান আল্লাহর শাহী দরবারে,
 প্রাণ ভরে করিলেন দোয়া, অবশেষে ভাবিলেন
 যাবেন জঙ্গলে, এখানে থাকিলে এবাদতে বাধা আসিতে পারে।
 পুনরায় তিনি কাবাগৃহ ত্যাগ করে বনের পথে
 অগ্রসর হলেন এবং বনবাসী হলেন
 বন হতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে অর্ধেক খাদ্য কিনেন
 অর্ধেক তিনি দান করেন, সাথীদের নিয়ে চলেন।
 এদিকে হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী এবং পুত্র তাঁর অবস্থান জেনে
 আসেন মক্কা মোয়াজ্জমায়, তার সাথে সাক্ষাতের তরে
 সেখানে এক বৃদ্ধের সাথে কথা হলে তিনি
 জানান, 'হযরত ইব্রাহীম থাকেন পর্বত গুহার ভেতরে।
 মাঝে মাঝে কাষ্ট বোঝা নিয়া আসেন বাজারে
 তবে কখন, আসিবেন, বলা মুসকিল তাই

অপেক্ষা করুন, যতদিন না তিনি আসেন এখানে, '
 একদিন ফজর নামাজ অন্তে হযরত ইব্রাহীমের দেখা পাই-
 স্ত্রী-ছেলে নিকটে যেতেই, ইব্রাহীম (রঃ) বলিলেন,
 'জানিতাম আমি, আসিবে তোমরা। যাক শুন
 কিছু নসিহত করিয়া ছেলেকে, শুনালেন বাণী
 আবার স্ত্রীকেও, যাহা ইচ্ছা তাঁর,
 অতঃপর হলেন বিদায়, স্ত্রী-পুত্র ফেলেন চোখের পানি।
 আছে মশহুর ইতিহাসবিদগণ লিখেন, ছেলে
 পিতার জড়াজড়ি দেখে আল্লাহ গায়েবে বলেন,
 'হে ইব্রাহীম কই সবটুকু হৃদয় দানিলে
 আমার তরে, অথচ কাঁদলে কেন
 দেখে তোমার ছেলে? এক খাপে দুই তলোয়ার
 ঢুকে? ছলনা করেছ তুমি,' শুনে হযরত
 ইব্রাহীম, ক্ষমা চেয়ে করেন দোয়া, আল্লাহর
 দরবারে। কি ছিল তাঁর দোয়ার বরকত,
 সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে,
 দেখে তার মা, তিনিও ঢলে পড়লেন মৃত্যু মুখে,
 আবার চলিলেন বনপথে বনবাসী ফকির কোথায়,
 কেউ কি জানে গেছেন তিনি কখন, স্বর্গলোকে?

গান : (নানা-নাতি সম্বন্ধে) ।

ঐশী প্রেমের শপথ করে, অর্জনে যাহার মন,
 কাজ করে যায় দিনে রাতে, সে অমূল্য ধন ।।
 প্রাণ যায় যাবে, শপথ ভাঙ্গে না,
 মৃত্যু জেনেও হাউ মাউ কান্দে না ।
 আল্লাহ ছাড়া কিছু বুঝে না, তার দোস্ত হন ।
 হুমায়ুন তাই কান্দিয়া যায়,
 তাঁরই দীক্ষা নিবার চায় ।
 পিতা-পুত্রের এশ্কে এলাহী, জান ধরা পণ ।।

রচনাকাল-

২২/১০/১০ হতে -১৮/১১/২০১০ খ্রিঃ,
 পল্লবী কোয়ার্টার, শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

শুধু একটি অক্ষত হৃদয়ের জন্য

সম্মুখেই নিঃশব্দে জ্বলছি আশার পিদিম,
আমার আলোকেরা খাচ্ছে দেয়াল মেঝে,
খাট আর সিগারেটের বিষাক্ত ধূম্র।
আমার ভেতর ধমনীর রক্তে খেয়ালি রক্ত
ভুক মশারা গুনগুন গান করে-
চেতনার শরীর নেতিয়ে পড়েছি, নেতিয়ে
পড়েছে বিক্ষুব্ধ মন- ভাত মাংশ, বিরিয়ানী
খেয়ে যাদের জীবনাধার পুষ্ট আমি
রক্ত খাই সেই গাত্র হতে।
নিঃসঙ্গ প্রকৃতির নিবিড় আঁধারের সোহাগে
টিকটিকি নিশাচর প্রাণের আর্তনাদ
আমাকে শুনায় আর জীবন যুদ্ধে করে
আশ্বস্ত কখনও তুলে নেয় কোলে,
কুয়াশা শীতলতায়, ঢালে অর্থের দুশ্চিন্তার
হোমাগ্নিতে- সাহসের কলমের কালির তমসা
কখনও আঁচড় কাটে বিবেকের শাদা কাগজে
কুকুরের নখর, ঘেউ, ঘেউ, করি মরণের ঘরে
টুকেছে বৈষম্যের চোর-
সামনেই দরোজাটা ভীষণ ফাঁক-
আমি বসা ঘর তাড়া বাঁধনহারা,
উগ্র বেতমিজের
আলোকে, ডানপিঠে আমি মাঠে, প্রান্তরে
পথে অফিসে চিবাই মুক্তোর
বিদ্রোহী দাঁতে কুশলি সমাজপতি
আর হোমড়া চোমড়ার বিষাক্ত কলিজা
আন্তে করে সংস্কার আর ধর্মের নিকষ
আঁধার টেনে নিয়েছে আমার প্রেয়সির মদিরা
আঁখি, হজম করে ফেলেছে তার সমস্ত
স্বত্ত্বা, মানবতার বীজ-
রক্তমোম গলে ঝরছে আমার লেখনির ছত্রে-

বিনষ্ট আকাশ

ছত্রে, তবু বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, সংগ্রামের
কল্লনার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে—
আমাকে খুঁজে ফিরি, মানবতার মহিমাবিত
জীবনের পথে পথে কুট চক্রের কাঁটা,
সৈনিকের বুটে পিষে পিষে,
শুধু একটি অক্ষত হৃদয়ের জন্য, যেন সে
ভূমিষ্ট সর্বস্বহার গর্ভকোষে, বাসনায় সংগ্রামে
সাধনায় সাফ করছি— মানুষের পৈশাচিক
আনন্দের বিষকাটালীর ঝাড়।

১৬/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

বলো-আছি কাছেই

আমি উড্ডীয়মান এক অস্ত্রির বিহঙ্গ
ভাবছিলাম উড়তে উড়তে যদি পাই—
ক্ষণিকের বিশ্রামের একটি ডাল
অসীম পথ যাত্রার হবে নিস্তার ঠাই।
পা দুটি যখন রাখি তার উপরে
বিষকাঁটার আঘাত পাই পলে পলে,
আহা জানি না তো এমনি হবে,
ক্ষণিক সুখ দুঃখ আসে ছলে ছলে।
ফের যখন ছুটিলাম তোমার পানে
দুঃখ সয়ে দেখি কত মেঘ,
উড়ছে বর্জ্জ তাড়বে ভীষণাঘাতে
এর আগে দেখিনি বায়ুর এত বেগ।
আমার ছিন্ন দু'পায়ে, মনে
কাঁটা আছে খুলিবে কে বল,
হে বন্ধু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস
বিধাতা তোমার সাথে করে ছল্।
রঙিন সুখ স্বপ্ন নিয়ে উড়িব গগনে
দেব উত্তাল তরঙ্গ ভরা সাগর পাড়ি,

ছুটে যাব দেশ হতে দেশান্তরে
যুগের গন্ডি ভেদী দুঃখ দুনিয়া ছাড়ি।
তোমার আসার প্রদীপ জ্বলুক আরও,
দুনিয়া পুড়ে যাক, হোক ছাই-
সহিব দুঃখ আমিও বন্ধু বায়ু ঘর হতে
আর আমরা পড়ে যেতে নাহি চাই।
বন্ধু এসো কষ্টের জীবন নিয়ে
চলি পথ শত দুঃখ মাঝে,
আশা, এসো কল্পলোকে বলো আছি
কাছেই উড়ো জোড়ে প্রাণরাজে।

১২/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।
(বন্ধু বর নূর ইসলাম, সহপাঠী, যশোর এর সৌজন্যে)।

তোমার প্রয়োজন শুধু

আমাকে গিলতে হবে পচা রুটি ছাতু,
অনিচ্ছায় অনিবার্য কারণে,
আমাকে গিলতে হবে বালকের ক্ষিদেয়
ফুরানো লাল টুকটুকে চকলেট,
আমাকে যাইতে হবে স্বাধীনতার জগৎ ছেড়ে
পরাদীনতার জগতে।
আমার বসন্তের হাওয়া মিশবে খানিকটা
পায়খানার দুর্গন্ধ যুক্ত হাওয়ায়।
আমাকে শুনতে হবে গালি কান বুঁজে,
পাষাণের- হৃদয়হীনের।
কারণ দেখছি আমার তারকাকে ঢাকছে
কালো মেঘে অসময়ে
আমার সুরের বাঁশি টিয়ে পাখির
ডাক শুদ্ধ করছে, গাড়ীর ঘোঁ ঘোঁ শব্দ।
আমার লালিত স্বপ্ন হৃদয়কে জানা
যখন বাধা পায় সমাজ বিধান
সূর্য গ্রহণের দিনে সূর্য না থাকার
মতোন, তখন কি আমি নিঃশ্ব নই?
প্রবালের মত ধীরে ধীরে প্রাচীর গড়াই

বোধ করি জীবনের কাজ, আত্মার স্পন্দন
খুঁজে পাওয়ার মতোই, আমি শুধু
ভাববো আমি মরি নি, বেঁচে আছি
আবর্জনার উপর কীটের মতোন।
যখন আমার শশীর নির্মল অম্লান
আলোকে অথবা অবাধ্য মেথরের
অগ্নিযোগে সবই পুড়ে যাবে
আমি হয়ত তখনই মুক্তি পাব স্বাধীনতার
সূর্যকে দেখব, মৃদু মলয় শান্তির
ছোঁয়া দিয়া যাবে।
আঁধার সরে যাবে, আমার চিন্তা
হৃদয়ের প্রেম পৃথিবীর লভ্য হবে
তাই আমাকে আজ সবুজ বক্ষে হলুদ
মৃত পাতার মতোই বাঁচতে হবে।
কেননা ঝরে গেলেই তো মুক্তি।
সুন্দর ভুবনের একদিন ক্রন্দন ছিল
যখন সে অসুন্দর পেঁচীর মতোই ছিল
কিন্তু পেঁচীটাও বেঁচে আছে আর
ভুবনও আজ সুন্দর
অথচ আশ্চর্যের বিষয়,
ভুবনের চেয়ে পেঁচীটার কথাই
বেশি ভাবতে হয়।
আর আমি ভাবছি ওরে পেঁচী ওরে
ভুবনের নির্ধাতন, মনে রাখ
আমি যখন মুক্ত তখন তোমাকে ঘা দেয়া
আর পরিহাস করাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি।
যতই কাছে ঘেঁষো উপযাচক হয়ে
বেসুরা হাতুড়ির পিটুনির মতোন
তোমাকে ছাড়বোও না ধরবোও না
মনে করো না তুমি সব কিছু-
তোমাকে পাশে রাখি আমার-
সুন্দরের প্রকাশের জন্য
উপলব্ধির জন্য চেতনায়।

১৩/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকুরপুর, ঢাকা।

হে পল্লীকবি তোমার স্মরণে

আজ কেন আমার হৃদয় হতে আবেগ উচ্ছাসের
নির্ব্বরণী হতে জল বারে,
আঁখি পল্লব ভিজে যায় আনন্দাশ্রুতে
কার কথা যেন স্মরণে পড়ে ।
হে কবির লও আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী
হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা,
তুমি কত সুন্দর করে বলেছ আমায়—
এ গাঁয়ের কথাগুলো ও তার আশা ।
দরদে তোমার ফুটে উঠে শ্যামল সবুজ,
প্রান্তর আর রাখালের কথা,
মরমী কবি, বাউলের এক তারার সুরব্যঞ্জনা,
দুঃখীনি মায়ের শত ব্যথা ।
কেমন করে তুমি ঐঁকেছিলে ছবি,
কত সুখ আছে এ মধুর গানে,
উদাসী আমি ছুটে বেড়াই আপন মনে,
পাগল হই তোমার পল্লীগীতির মধুর তানে ।
তোমার গাঁও যেথা ঘাসের মায়া,
পাখির ডাক আর নদীর কল্ কল্ ধ্বনি,
আবহমান বাংলার যেন কান্তি রূপ
তাই শুনি, জানি তোমার কাব্য খনি ।
মধুর তোমার গাঁথাগুলো আজ
মনে করে দেয় আমাদের মনে,
চিরদিন তোমাকে পাব, এ গাঁয়ে, এ মাঠে,
আর তার মানুষের মনে ক্ষণে, ক্ষণে ।
তোমার এ ঋণ শুধিব কি
জেনো, তোমার সাথে থাকিতে চাই,
আত্মা আমার চাহে শুধু ভালবাসা
তোমার আঁকা পল্লীর শ্রদ্ধেয় কবি ভাই ।

১৩/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

(মরহুম পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ১১তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কায়কোবাদ সাংস্কৃতিক পরিষদের
অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হয়েছে) ।

মাগো, তোমাকে ঘিরে

আজ মধ্যাহ্ন বেলায় উদ্ভিন্ন মনে ভাবছি আমি,
জীবন যুদ্ধে জানি কি হবে কাল্লাকাতর- অন্তর্যামী ।
মাগো তোমার মলয়ের পরশ পেয়ে গগনের নিচে,
বিশাল সবুজ প্রান্তর নদী তরঙ্গায়িত জল বিছে
অবগাহি হরষোৎফুল্ল কৃষাণের ছোকরা হেরি
চিকচিক করা বালুতে যে রোদ তা ভুলে যাই, দেৱী-
করি না মনে হয়, মা তুমি স্নেহের আঁধার এসবে,
কর্মক্লান্ত ছেলের আনন্দ দিতে চিরদিন তুমি রবে ।
সব কিছু মাঝে ডুবে আছো মাগো তুমি তাই,
আত্মা আমার জীবনে-মরণে তোমাতেই খুঁজে ঠাই ।
পাল তোলা নৌকোর মাঝে মাঝির সে গান,
আমাকে চুমু দেয় হে সোহাগে কত আত্মার টান,
মাগো তোমার মমতাময়ী রূপে মুগ্ধ সে ছেলে,
দেখ যুদ্ধ করে চলে গেল, জীবন দিয়ে হেসে খেলে,
তোমাকে আলো দিয়ে সোহাগ দিয়ে সন্তান রবি,
চলে পড়ে পশ্চিম গগণে দেখতার ক্লান্ত স্নান ছবি ।
তাই মাগো তোমার কোলে আশ্রয় নেব রাতে জানি,
ভুলিয়া যাব মাগো দিনের বকা, শৃঙ্খল ভরা বিভব খানি ।
তুমি কাল্লা হাসি, তুমিই বুঝি মাগো জীবনের সব,
তোমার স্বাধীনতা যেন আমার জীবনের উদার নভ ।
দূর দিগন্তে চেয়ে কষ্ট আমার মুছে যায় হৃদয় হতে,
স্বর্গ তুমি, মাগো রচিব ধরায় চড়িব সদা আনন্দে রথে ।
কত কি আছে মাগো তব শ্যামল মুখে, রূপের নাই শেষ,
সজীব মাগো, তোমার হৃদয়ে ডোরে আছি আমি বেশ ।
দুষ্ট ভাইয়ের আঘাতে যখন মুর্ছিত হয়ে আমি যাই,
তব বক্ষ প্রান্তরে দুখ খেয়ে লাঙ্গলের ফলায় জীবন পাই ।

মাগো তোমায় ডাকিতে ডাকিতে গেল ছেলে কত চলে,
অন্ত রবির লাল আলো ঐ গগনে দেখ জ্বল জ্বল জ্বলে ।
এ-তাদেরই রক্ত, মা নিশিতে তোমার অশ্রু পড়ে,
শিশিরের ফোঁটা ঘাসের ডগায় যেন তারই তরে ঝরে ।
তবু মা তোমার গগণে রবি উঠে আহা প্রতিদিন,
পাখির কাকলী, আমার আশা কত যে রঙিন ।

মাগো তোমাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখি সহস্র উপমার ভিড়ে,
মোর স্বাধীন হৃদয় নদীর ছন্দবান ডেকে যায় দুই তীরে।

১৩/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ নদী পথ ধলেশ্বরী, ঢাকা।

গরুটাকে বাগে আনতে

অপুর পরীক্ষা আর শেসনটা একটা অবাধ্য
নির্বোধ গরুর মতোন, খামখেয়ালী, কাণ্ডজ্ঞানহীন
চড়ে বেড়ায় রাতদিন বিরতিহীন-
হতাশা, বেদনা আর লাগাম ছাড়া উদ্দিগ্নতা
এনে দেয়-

এ গরুদেবের কাছে যেতে চাও?
বাগে আনতে চাও তাকে?
হ্যাঁ, পারবে নিশ্চয়ই পারবে, কিন্তু একটা
শর্ত আছে, শিং দেখো উঁচু করে আছে
এক গুঁতোতেই নাড়িভূড়ি ছিঁড়ে দেবে
শলা লও, বা না থাকলে ধার করো,
অনির্দিষ্ট কালের জন্য.....
আমি নিঃবিশ্ব, বিশ্বহীনের আশার সোনার পুতুল?
ভালোই হলো- পিতা মাতাকে বলো,
“আমি আসিতেছি তোমাদের কে হত্যা করতে”
অপাচ্য নোট গলাধঃকরণ করে অনিচ্ছায়
প্রতিভা বিনষ্ট করেছি
সোনার হরিণ চাকুরীটা ধরার জন্য
রঙিন স্বপ্নে বিভোর, আমাকে খুঁচে খুঁচে
মারি, গরু যেন গুরু, তোমাদের অনুকম্পায়
অথচ আজও ঘুরে বেড়াই গরুটাকে বাগে আনতে
বিষন্ন এক যুবক।

৩০/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

মুঞ্চ আমি

বসন্তের ক্লান্তি লগ্নে নির্মল দখিনা বায়ু
পল্লবে পল্লবে মৃদু দোলা দেয় তাই,
সবুজ প্রান্তর মনে হয় কত আপন কত কাছের,
ভালবেসে তারে হৃদয়ে দিয়েছি যে ঠাঁই।
প্রান্তরের মাঝে ক্ষুদ্র একটি, কুটির কলাগাছে
ঘেরা, বসে তার শীতল ছায়া তলে,
জুড়াই প্রাণ চৈত্রে খরা রৌদ্রে আমি আজ,
পান করে সরলা যুবতীর দেয়া সরবত জলে।
উদাসী মন আমার মেতে উঠে ঐ রূপসীর রূপে,
পাখীর গানে, ষোড়শীর, মুঞ্চ চোখে,
জল আনিতে যায় গৃহবধু, অদূরে গাঁয়ে আনমনা
মৃদু ছন্দ তার দোলে কোমল করুণ বৃকে।
সলাজে দাঁড়িয়ে কলাগাছ ধরে মৃদুভাষিণী এক
কী জানি, সে কী ভাবে, আজ এ বেলা,
আমার ছুটিয়া যাওয়া মাঠে মন ফিরে আসে আহা
বার বার তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে করে খেলা।
মুরগী ভরা বাড়িটি খাঁ খাঁ করছে কাঠ ফাটা দুপুরে
তৃষ্ণায় জিহ্বা লটকিয়ে কক্ কক্ করে হেরি,
আমার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলি এর মাঝে, কখন
ছন্দ দোলায়িত কবিতার ফুল, করে সে ফেরি।
কিশোরেরা ছুটিয়া যায় গুন গুন করে সুখে,
খালের নিচে এ-ওর গায়ে ঢলে হাসে কত,
ছাগীরা ঘুমাইছে আরামে, বট গাছের নিচে
অঘোরে, দেখিয়া দেখিয়া মনে ধরে তত।
কী জানি কেন কাক গুলো করছে কা-কা
কিসের অভাব, ঘোচে না যেন তার,
মনে হয় চৈত্র-অভাবে পড়া কৃষাণের ছলে,
সে ডাকিয়া যায়, কৃষাণ হয়ে বারবার।
বাহিরে আমার জুড়ায় বপু, আহা ভেতরে
কাঁদিয়া উঠে আমার অসহায় প্রাণ,
হাভাত ঘরে কেবলি দেখি হাহাকার আর,
পাই স্বদেশে দিন রাত অত্যাচার দ্রাণ।

সব কিছু ছেড়ে মিশে যাব আমি ঐ গাঁয়ের
নির্মল মধুর, কান্তিময় সুললিত রূপে,
ঘুচাব দুঃখ যাতনা ক্ষণকালের জন্য ভাবি
ও মেয়ের সার্থে কথা বলে চুপে চুপে।
মধুর বুলি, বের করে ধীরে যায় প্রাণ জুড়িয়ে
যেন সে এসেছে যৌবনে, স্বর্গ হতে নেমে,
বলা হবে না আমার শেষ তার সাথে বলা
ফের বলিব আমি চোখে চোখ রেখে থেমে, থেমে।

০২/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ মোহনপুর, আগলা, ঢাকা।
(জনৈক সখিনা আক্তার এর উদ্দেশ্যে)

কাল স্রোত

হে কাল স্রোত, আমার প্রিয় কাল স্রোত
তোমার উপর চড়ে বেড়াই, দু'নয়ন ভরে দেখি,
আর অন্তর দিয়ে গভীর ভালবাসি-
আমাকে ঘিরে রাখা এই গাঢ় সবুজতাকে
আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায় মধুর সমীরণ
ভুলিয়ে দেয় সকল দুঃখ নিমেষে
আমাকে শুনায় গান দোয়েল পাপীয়া, শ্যামা
আমার শরীরে শক্তি যোগায় প্রচন্ড কাল
বোশেখী ঝড়
নদীর দোলায়িত তরঙ্গ আর বাঁশির সুর
আমার হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার তোলে।

হে আমার তেজস্বী সুদর্শন ঘোটক, চলো
আরও দ্রুত পদে
যেন ফের আমি ফিরে আসি আমার
হারানো বর্ষের সুর সঙ্গীতে।
নুতন করে পাই জীবন।
সবুজ পল্লবে ভরে উঠুক বিটপ
আমি কেবল চড়ে বেড়াব সুদূর নীলিমায়
অন্তর্ধান হয়ে যায় মহাকাশে, মহাকালের স্রোতে-
আমাকে ছোবল দিয়েছিল পৃথিবীর সাপেরা

আমি ক্ষত বিক্ষত-রক্ত ঝরছে দেহে
অন্তর পুড়ে ছাই হলো- অমানুষের
প্রতারণায়-হীন কপট আচরণে ।

আমি ক্রমাগত শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি,
তুমি আরও দ্রুত পদে চলো, কাল স্রোত
তুমি ফিরে আসো শান্তি কপোতির আশ্বাস
হয়ে, বৃষ্টি ভেজা দিন গুলো হয়ে,
বসন্ত হিল্লোল আম্রকানন হয়ে,
মেঘে, মেঘে মিতালী হয়ে,
নতুন এক কাল স্রোত,
আমার খাঁ খাঁ রোদদোরে
লাজুক রিক্সা-বধূয়া, হয়ে,
আমার বর্ণাঢ্য,
রাখাল-হৃদয় আগ্নিনায় ।

১লা বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা, টিকরপুর, ঢাকা ।

কৃত্রিমতা

ছলনার একি রূপ দেখি আজ ও বাড়ি
চামড়া দিয়ে এক বাঁদর কৃষানী,
বানাইছে নূতন করে যেমন সে ছিল, আগে,
জীবিত কালে ছিল অপরূপ বৃষাণী ।
রেখে তারে কাছে দোহন করছে দুধ
ভুলছে গাভী এই তার প্রিয় দুহিত,
হায়রে কোথা জানি গেছে চলে সে
ছলনায় কেন হয় সে মোহিত ।
ছলনার পৃথিবীতে সকলি ছলনা হায়
অবুঝ গাভী সে বেশি কি আর,
মানুষ আজ মানুষ নয় কৃত্রিম
পীড়িতের ব্যথা অনুভব করে বারবার ।
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাক সেও ভাল
কেন কর ভাই এহেন অপরাধ,
যাহা পারিবে না মিছেমিছি কেন
দেখাও হাতে মিথ্যে আকাশের চাঁদ ।

ছিন্ন টগর ফুলের মত গন্ধহীন
পড়ে ঝরে গাছ তলে অকালে,
ভুগিয়া ভুগিয়া পঁচিয়া যায়,
ভোরের রবি ডুবিয়া যায় সকালে।
হায় ফুটিল যখন পথের ধারে দেখে
কোন পথিক ছিঁড়ে দিলে অবহেলে,
পড়িল কোথা কে জানে দুষ্ট পথিক
শুধু স্বাদ মিটাল লুকোচুরি খেলে।
ফুটিত যদি বাগানে রহিত যতনে
মালি ধরিত না গা তার শোভিত কত,
মলয়ে ছড়াতো সুবাস মুগ্ধ প্রাণীকুল শুধু
দূর হতে দেখিত গগনে তারার মত।
মন নাহি যায় তার দেহের কিবা গুণ
আছে, গন্ধহীন অবশ্যই সে বনফুল,
টানিয়া মুষড়িয়া দেয় সকলে যে হায়
বিরক্তি ভরে কেন হল তার ভুল।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা, টিকরপুর, ঢাকা।

সুখের প্রতিচ্ছবি

গোধূলি লগ্নে দাঁড়িয়ে শ্যামল প্রান্তরে দেখি সন্ধ্যাকাল,
হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সুখ বাহির হয় মনোহর-হৃদয়ের সেতাল।
মনে হয় আমার দেশ একটি গাঁয়ের মনোরম ছবি,
প্রতিদিন সেথায় উদিত হয় অন্ত যায় প্রাণের রবি।
ভুল করে দেখি তায় চিনিতে কখনও পারি না আমি,
মুহূর্তে চলে যাই আমার গাঁয়ে-আসে সেখানে সন্ধ্যা নামি।
মানব মনের কথাগুলো হাসি গান, সে অপূর্ব বাজে,
মিশেছে সেথায় একাকার হয়ে আঁধারে সে সাঁঝে।
ভাইটি আমার পেয়েছি কাছে আত্মার সে আত্মা,
বহু যুগ পরে ফিরে এলাম সেথায় ভুলি নি তো তা।
কে অভিমান সুরে বসেছে পাটে কত করে ভুল,
বিরহ বেদনায় কাঁদছে কেহ হায় হৃদয়াকুল।
নামছে তিমির ধীরে ডাকছে ঝাঁ ঝাঁ করুণ স্বরে,
প্রাণ ভরে দাও ওগো সুখ আমার মাটির কুঁড়ে ঘরে।
আমার নিঃসঙ্গ জীবনে সকল মানবত্বায় এক সাথে,
সেথা মোর আত্মা ঘুমাবে চিরনন্দিত আনন্দ মরণ রাতে।

২৯/০৪/১৯৮৭ খ্রিঃ মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

তুমি নাই কে বলে

না-না-না-না- আমি মানি না,
তুমি নাই, তুমি নাই কে বলে, কে বলে,
তোমাকে দেখি ক্ষণে ক্ষণে সবুজ পল্লবে
বায়ু তাড়নে দেখি নিবিড় আম্রতলে ।
বিহগের তানে নদীর কুল ধ্বনি শুনে,
ঘাট হতে ঘাটে নিত্য দিন তুমি,
কল্লনার পাখায় ভর করে ফিরে আসো
সৌন্দর্য পূজারী তুমি, মানব মানস চুমি ।
ছন্দের তালে তালে তোমায় ফিরে পাই,
হৃদয়ের রক্তে রক্তে করি যে ফেরি,
কান্নাকাতর ধরণীর উপর চির বিরহ সুর
সময়ের তালে, অপেক্ষায় করি দেবী ।
তুমি যাও বলে তোমার হৃদয়ের কথা,
নির্ভীক অসংকোচে মানুষের কাছে,
ধরণী কন্যা কান পেতে শুনে সে বাণী
সুন্দর শিশু সে ভুবনে লুকিয়ে আছে ।
রবির উদয়স্থ ক্ষণিকের বিরহ মিলন
আর কিছু নহে, আর কিছু সে নহে,
হৃদয়ের ইন্দ্রজালে বেঁধে সে বাণীর সুর,
দিয়ে ঘুমিয়েছে মানুষকে বিচিত্র মহীরুহে ।
চির জন্ম হল তোমার অশ্বরে, নক্ষত্রে
তরুলতায় ভুবনের বিচিত্র কোলাহলে,
না-না-না-না আমি মানি না
তুমি নাই, তুমি নাই কে বলে ।

০৯/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা । (কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

আমি মানুষ !

আমি মানুষ !
বিশ্ব জুড়িয়া বাঁধা আছে আমার হৃদয়ের
রহস্যময় পিঞ্জরখানি ।
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর দাবদাহে পুড়িয়া
ছারখার হয়েছে প্রান্তর ।

ঈষাণ কোণে জমছে মেঘ-আর নীল
আকাশটি ছেয়ে গেল কাল রঙে ।
প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় প্রাণ তোলপাড় করে
অভাবের যন্ত্রণায় ।
আর দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে খাই,
খাই অসহায় বারে পড়া পাতাগুলো ।
আমার ভুবনে কখনও সুখ আর
কখনও দুঃখরা আর্তচিৎকার দিয়ে ডাকে ।
ঐ ঐ যে মেঘ ডাকছে শুরু গুরু
যেন সে অসহায়, বলছে মানুষের কথা
যে প্রাণীগুলো খুড়ে খুড়ে খায় ডাস্টবিন
আর আড়ষ্ট জিহ্বায় কথা কয় ।
আমি আছি তাদের দিকে তাকিয়ে, শুনছি
হেঁষা ডাক যুদ্ধংদেহী ঘোটকের ।
তার কণ্ঠস্বর-ভীমের যুদ্ধ চেতনা,
এখন দেখি মেঘে মেঘে ঘর্ষণের তড়িৎ আর
আমার হৃদয়ের রক্তের ঝিলিক একই ।
কেহ দেখে স্বপ্ন-পৃথিবীটাকে গ্রাস করিবার
টাইফুনে আর কেহ জীর্ণ রান্না ঘরের চাল
খানি ধরে রাখতে পারে না-
সাইক্লোনের তান্ডবতায়
এ-ই তো আমার বক্ষপিঞ্জর বাঁচিয়া থাকিবার
আশা ক্ষুধার্ত প্রাণের-গ্রীষ্মের দাবদাহ
একবার শুনছিলাম বিপ্লবের বাণী
ঐ বটবৃক্ষে আত্ম গোপনরত পেঁচাটার কাছে
না-না রবে গভীর রাতে ঘুমের ব্যাঘাত দিয়ে
ঘটিয়ে ছিল বিপ্লব ।
আজ আবারও শুনছি আমার বক্ষ পিঞ্জরে
ঐ একই ডাক, শুনছি, অনাগত কালের
ঐশ্বরিক ইচ্ছে- আর আমার মায়ের হৃদয়
নিংড়ানো পবিত্র বাণী, “ছেলে ভুলে যাও আমার
কথা কেননা আজও আমি রাহুগ্রস্থ, দেখ,
মঙ্গল গ্রহে এবং ওপরে নক্ষত্র রাজ্যে বিষময়,

শানিদশা”.....

আমি মানুষ !!

তাই আমার ভুবনে সুন্দর অসুন্দরের চরম
বপনক্ষেত্র তৈরী করি-

ঈশ্বরের ইশারায়, শয়তানের ডান পাখাটা
ভেঙ্গে দিতে চাই, কিন্তু পারি না, পারি না,
হায় এখানেই বুঝি আমার দুর্বলতা-

আমার পৃথিবী আবার ঠান্ডা হবে, আবারও,
বসন্তের ঝির ঝির বাতাস বইবে- কিন্তু

আমি থাকব না, ওরে উত্তরসুরী কবি, ওরে
প্রাণ চঞ্চল্যের নিশান-তুমি শুধু ঐ অভাবগ্রস্থ-
নিরন্নকে, ঐ কথা বলিও

আর হৃদয় বীণায় পৃথিবীর যন্ত্রণার
সঙ্গীত শুনাইও.....

২০/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

জলক্রীড়া

পুকুর পাড়ে, দাঁড়াইলাম আমি আজ দ্বি প্রহর বেলা,
দেখিব বলে মনের হরষে ছেরা-ছেরিদের নানা জল খেলা।

এ-ওর গায়ে হাত রেখে ডুব দিয়ে যেন সে উঠে,
আবার পাড়ে ওঠে, কে কার পেছনে পেছনে দৌড়ে ছুটে।

উল্লাসে নাচিয়া উঠে তারা, খিলখিল করে হাসে,
ঘোলা জলে সাঁতার দিয়ে কুহুকুহ করে মরে কাশে।

উলঙ্গ ছেলে কণ্ঠির জল ক্রীড়া চলে দেখি সারাবেলা,
মায়ের শাসন মনে নেই আজ, করে ভারী অবহেলা।

বসিয়া পড়লাম আমি দুর্বাঘাসে আমার ক্ষুব্ধ মন নিয়া,
দেখা যাক পাই কিনা কিছু, আনন্দ ঐ দলে যোগ দিয়া।

ও পাড়ে দেখি গাঁয়ের বধূ-স্নান করছে ধীরে, অতি ধীরে,
ফর্সা, রবি করে মুখখানি ধুইছে, আজুধল ভরা তার নীরে।

কণ্ঠে, তার সোনার হার নাড়ছে মৃদু রোদে চিকচিক করে,
বারবার দেখছে এদিক-ওদিক লজ্জায় যেন যায় মরে।

এবার আমি নামিয়া পড়িলাম জলে ছেলেদের দলে,
প্রাণখানি স্পন্দিত হলো শব্দ শুনে জলে কলকলে।

এবার হাতের উপর হাত রাখি প্রথমে ধীরে পরে জোরে,
চাপড়াই জলে কার আঁখি মুখে জল দিলাম ছুঁড়ে।
হররে হু হররে হু ডাক ছেড়ে উঠিয়া আমি এই পাড়ে,
এক এক করে ছেলে দূর হতে দিয়ে দৌড় লাফ মারে।
প্রতিযোগীতা চলে ডুব দিয়ে কে কতক্ষণ ডুবে থাকে,
তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কেহ দেখে চোখ টিপে ঘাড় বাঁকে।
আঁঠাল মাটি মুঠি মুঠি তুলে তলা হতে ছুঁড়ে মারে মাথায়,
কেহ আবার নতুন জলক্রীড়ার, কৌশল বাতলায়।
ওখানে দেখি বুড়ো দাদু গামছা পড়ে ধীরে জলে নামে,
হোঁচটা খেয়ে হাঁটু জলে, দাদু যায় কখনও পড়ে থামে।
নিরবে দিয়ে গুটি কয়েক ডুব, জল হতে উঠে যায় ধীরে,
মনে তার বাজছে বাড়ির ঝামেলা এসে শত কাজ ভীড়ে।
নির্মল আনন্দে ছেলে দল থাকে সুখে পড়ে আত্মহারা,
একে একে যায় ওঠে কে যেন দিলে তাদের হঠাৎ তাড়া।
ছিলাম আমি এই সময় টুকুন, বড় শান্তি বলো তাই,
দুঃখ লাগিল আমার মনে হরষোৎফুল্ল এদের হারাই।
আমার গোসল শেষে আসিলাম ঘরে কাঁধে রেখে কাপড়,
ও পাড়ার দুষ্ট মেয়ে মনে ঘোরে দিল বুকে এক দুষ্ট থাপড়।
একটু পড়েই যুবদল আসবে ছুটে করবে বসে কোলাহল,
নানা কথা কইবে তারা হাসবে, করবে তারা কত ছল।
কেহ ধরবে গান কেহ বাজাবে বাঁশী করুণ মধুর সুরে,
ভুলাইবে শত জ্বালা আর প্রিয়া যে আঘাত দিলে মোরে।
আমার সম্মুখেই আমার রান্ধুসী প্রিয়া অপরকে দিল মালা,
হায় কথায় আর সুরে বাড়ে আরও কত যে জ্বালা।
দেখে কবি আনন্দে দুঃখে পাগল হয়ে হাসে যে অলক্ষ্যে,
আর শোক পাথর তোলাপাড় করে পড়ে আছে বক্ষে।
তবও মনে পাড়ে সেই ছেলেদের হাসিময় মধুর মুখগুলি
বড় ইচ্ছে করে সারাবেলা জলক্রীড়া করি হৃদয় দ্বার খুলি।

২১/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ভয়

হে আমার প্রিয় ভাতিজা,
বলো বলো কত দিন আর আছি,
তোমার হে ডোর বন্ধনে,
আমার পায়ের নিচে মাটি নেই,
আকাশে উঠছে শুকতারা
মলয়ে ছড়াইছে করুণ রাগিনী
বলো বলো আর কত দিন আছি?
সন্ধ্যা মালতী ঝরে পড়ে
সূর্যের আলোক মলিন
প্রখরতা নেই, নেই তার বীর্য চেতনা
হায় আমি সংশয় সংকল্পহীন
বিটপে জড়ানো তরুণতা
দেখ দেখ ঐ যেন কে আসছে মারতে,
আমার ভীষণ ভয় করছে, আমাকে গ্রাস করবে,
সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো
আমি রাহুগ্রস্থ
শনি দশা, আমার ললাটে আঁকা,
অসচেতন মনে তবুও আশার বীজ বুনছি
বাঁচতে কিছুদিন কংকালসার পৃথিবীটায়।

২৩/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

চিৎকার

বুলবুলি তুই নাচিস কেন প্রেম রাঙা স্বপ্ন নিয়ে,
যা যা তুই সরে যা বহু দূরে, তেপান্তরের দেশে
অজান্তে—
গানের সুরে মন ভরে না, মোহনীয় সুধা খানিক
পরে ফেলে রেখে যায় আমাকে বেকার যন্ত্রণার মহাসাগরে—
কান্নাকাতর কণ্ঠে শুনতে পাই, স্ত্রীপুত্র কন্যার
রোনাজারি, ভেসে আসে লক্ষ যুবকের বিপ্লবী
গানের সমবেত সুর।
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়, বুভুক্ষের আতঁচিৎকার
ভাত চাই, ভাত চাই গলিতে গলিতে রাজপথে।
সবুজ প্রান্তরে মলিন চোখ মেলে দেখি

তামাটে বিতৃষ্ণ রঙ ।

শিক্ষার আলো বিষাক্ত তীর হয়ে শরীরে বিঁধে
রক্তাক্ত করে ।

ছাতকীরা আকাশ পানে চেয়ে থাকে

চৈত্রে শান্তি বৃষ্টির প্রত্যাশায়

সুরম্য অট্টালিকা আর রাক্ষুসী গাড়ী ।

মনে বিষ ছড়ায় আর কান ঝালাপালা করে ।

মুষ্টিবদ্ধ হাত সটান করে দীপ্ত কঠে ঘোষণা

করে যুবক, সিংহ গর্জনে, গ্রাস করব পৃথিবীটা

পিশাচগুলো দশতলার জানালা দিয়ে কটাক্ষে চায়,

মুচকি হাসে....

অরুণদহিত রাজপথে, যারা চাকুরীর প্রত্যাশায়

ঘুরে বেড়ায় ঘর্মাক্ত শরীরে

পায়ের ছেঁড়া সেডেলগুলো

মৃত্যুর দিন গুনে ক্ষণে ক্ষণে

কবে পৃথিবী রাহু মুক্ত হবে, কবে

দেখা পাব নুতন দিগন্তের,

সুখের দুনিয়ার একটা মাথা গোজার ঠাঁই,

দুঁবেলা অন্ন পাবার নিশ্চয়তা

বাঁচার প্রত্যাশায় ঝিলিক মারে তাদের

মনে অহরহ ।

হায় এক চোখা বিধাতার অভিশপ্ত

হাতখানি বাজের মত ছোঁ মারে অসহায়ের

মাথায়, এই তো দেখছি সংসারটা

চলছে ঘন্টার কাটায় কাটায় ঘুরে প্রতিনিয়ত

কিন্তু আমার পা টা তো চলে না

সম্মুখে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগেও ।

দেখে সরষে ফুল, যুদ্ধ কাতর পৃথিবীটা

আরো রক্তাক্ত রণাঙ্গন ।

আমি দেখতে চাই আমার পাশের গরুগুলো

সুখের পায়রাগুলো

অনিমেষ অগ্নি নেত্রে.... আর

রাগতঃ স্বরে আকাশের দিকে মুখ তুলে

দেই চিৎকার ।

২৭/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

যখন আমি

জ্যৈষ্ঠের খর রোদ্দুরে বিধাতার করুণা
সমাজে কম্পিত কর বুলিয়ে জুড়ায় প্রাণ,
প্রিয়া- আমার ঐ শান্ত সমীরণ ধীরে ধীরে ।
দোয়েল পাখিটা এ ডাল হতে ও ডালে চড়ে
আমার নয়নে নাচন দিয়ে গেল স্বর্গীয়-আনন্দের
মাঠ জোড়া সবুজ পল্লব, আমার হৃদয়ের
আঙ্গিনায় সৌখিন চাদর বিছিয়ে ঘুমুতে দিলে
সযত্নে সোহাগে ।

ঐ দিগন্তে নুয়ে পড়া আকাশটা আর তার
বুকে উড়ে বেড়ানো শাদা মেঘগুলো
শান্তি কপোত হয়ে ডাকে....

আধো রোদ আধো শিমূল ছায়ায় শাদা-কাল
লাল-হলুদ রঙের প্রজাপতি
শিহরণ তোলে মনের ভেতর অকৃত্রিম প্রেমের ।
কৃষ্ণ চূড়ার শরীরে জড়ানো লাল ফুলগুলো
রাঙিয়ে দিলে স্বপ্নীল আমেজে আমার পর্যদুস্থ
মনটা....যখন ঘর্মাক্ত শরীরে বিষয়,
অনলে দহিত, সোহাগ তাড়িত হয়ে ক্ষুধার
জ্বালায় বসেছিলাম, দ্বি প্রহরে আম্রবিটপের তলে ।

২৭/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ মোহনপুর, আগলা, ঢাকা ।

সবুজ ক্ষেতগুলো যেন মা

বহুদিন পরে ফিরে এলাম মায়ের কাছে গাঁয়ে ।
মায়ের স্নেহ ভরা সবুজ মাঠে ।
যেন যুগ যুগান্তরের হারানো রত্ন খুঁজে
হঠাৎ কোন দিন ।
ঐ বাগানের বুড়ো আম গাছটি আজ নেই,
আছে তার স্মৃতি, ঐ ভিটে বাড়ির জঙ্গল
চির পরিচিত- কোন কবির ধ্যানের উৎস ।
আর দেখনা চেয়ে মুখগুলো,
আজন্না যাদের কণ্ঠস্বর শুনেছি,

কখনও অবহেলা করেছি কখনও শ্রদ্ধাবনত
হয়ে কাছেই রয়েছে ।

বহুদিন পরে ফিরে এলাম মার কাছে, গাঁয়ে
ও মায়ের স্নেহ ভরা সবুজ মাঠে ।

গ্রীষ্মকাল

শুনছি একটানা সুর আম পাকানো
পোকাকার বহুক্ষণ ধরে ।

তবুও বিরক্তি নেই এর মাঝে,

আছে যেন প্রেম সুর সুধা ।

ভগবানের তুষ্টির নিমিত্ত, উপোস করা

রাখাল ও কৃষাণ, বাধা ধরা উৎসবান্তে

ফের যারা চলবে আপন কর্মস্থলে

সেই হে বুভুক্ষ-আপিস কর্তাও

বিস্বল আজিকার বিকেলে,

গুমোট গরম-হাওয়া বইছে না,

কালো সাঁঝগুলো, সূর্য কে ঢাকছে

বলয়াকারে সাজানো সুন্দর করে

উত্তর, কুশাকান্দা-বাহরাম-সুখিয়া-গ্রামগুলো

যেন মায়ের স্নেহ পরশে আটকে রাখছে তারা

বিদেশ ফেরৎ সন্তানকে তার মা যেমন

কোলে তুলে নেয় তেমনি আমি পেয়েছি ঐ

ক্ষেতগুলো, যেন জড়িয়ে ধরেছে আমাকে ।

তারই সন্তান গাঁ বাসিন্দারাও ।

আমার মানস দেবতা এবার ছুটছুটি

করে না, নির্মল গোখুলি, লগ্ন

দেখে, ঘুমিয়ে যায় শীতল কুয়াশার

চাদর গায়ে দিয়ে মায়ের কোলে ।

২৮/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

আজকের পল্লী গ্রাম

প্রখর রবি করে দহিত মজুর বাতাস করে,
শিমূল তলে মাথায় মাতলা উঁচু করে ধরে।
আধমরা সন্তানটি তার করুণ চাহনি সে চাহে,
পর্বত হতে খসে পড়া পাথরখন্ড-গলা হিমবাহে।
কেহ আছে সুখে-গোলা ভরা ধান তার, ঘুমিয়ে আছে,
নিম্নবিত্ত কৃষাণ-টানা হেঁচড়ার ক্ষুদ্র মানুষ তার কাছে।
ধার চাহে বলে, সামনেই জমি বুনেছি সব দেখ আধা,
ধনী বলে হয় পারিলাম না রাখি কার জমি সাধা।
জমি রাখিব না, ভারী বিপদ আজ সলিম চাচার,
বড় প্রয়োজন আমার এ বেলা সাধ নাই তার বাঁচার।

তামাক সাজে না কেহ, কেহ নাহি আর গল্পে মাতে,
যার যার ঘরে ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যার সাথে সাথে।
আলস্য ভরে দু'চার জন হয়তো বা হাঁটু তার গাড়ি,
বসিয়া ঝিমায় কখনও, কিছু অভাব বর্ণনা করে তারি।
নিচু মুখী কৃষাণ কত কষ্ট করে ধান তোলে তার ছোট ঘরে,
শোধিতে ঋণ সেই ধান বেচিতে যায় আজ যত কম দরে।
গৃহিণীরা শোককাতর, দিতে পারে না সন্তানের মুখে গ্রাস,
মেয়ে মেয়ে সন্তানে রে মনের ভয়, সৃষ্টি করে মরণ ত্রাস।
পাওয়া দায়-সেই কনে বর বাসর ঘরের মত সুখে,
দশ বছর পর একটি খোকা নিয়ে আছে তার বুকে।
বিধাতার হাতে গড়া গায়ের মানুষের সন্দিক্ত মনে,
সুখ দিতে কেন পারে না রূপ তার আজ পল্লী দুঃখী জনে।

২৯/০৫/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

কারো সুখ কারো...

সদ্য শয্যা উথিত কোন কবি'র বর্ষণ মুখর সকাল বেলা,
জাগিল মনে তার প্রিয়ার অবহেলা।
দুঃখ পেয়ে কবি ভাবিল মনে মনে কেন আমি হয়,
অযাচিত কেন অপমান করিলাম আমায়।
রিক্ত হস্ত কল্পনাপ্রবল কবি'র সাথে আজকের দিন
কথা বলে যায়, বাজিয়ে যায় তার সুরেলা বীণ।

সবুজ বৃক্ষলতা দুলছে মৃদু শিহরণে দক্ষিণা সমীরে,
হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নেচে উঠে মন আচমকা ধীরে ।
জীর্ণ পর্ণ কুটির চীর হতে পড়ে ঘরে ফোটা ফোটা পানি,
স্যাৎ স্যাৎ শশধর বাবুর ঘরখানি ।
নাই কাজ আজ, ঘরে নাই খাবার দারা-পুত্র-কন্যাসহ,
কেমনে কাটিবে বেলা, আজ দেহ হবে দহ ।
বসে পিঁড়িতে দোর মুখে চেয়ে আছে দূর অপলক চোখে
যেন কোন বিরহী কবি'র বেদনা বাজিল বুকে ।
কই সময় তো যায় না, কেহ নিবে না তো তারে কাজে,
ভীড় করে শত ভাবনা মনে সব আজো বাজে ।
কেহ ঘুমাইছে সুখে গোলা ভরা ধান কলে ছাটা চাল,
দুধ আছে গাভীর ঝিয়েরা মাজছে থাল ।
কি বিচিত্র এই জগৎ কত খেলা চলে কত ছলে,
আবার কত মানুষ হাবুড়বু খায় পড়ে অভাব জলে ।
কি মূল্য আছে এই রজনী গন্ধা ফোটার, তুলসী পূজার,
যখন দেখি সব ফাঁকি অসার ব্যর্থ বোঝার ।
কালের চাকায় ধীরে ঘুরে আসে এই অশান্তি ভরা কাল
মনের ঘরে ফেলে কারো সুখ কারো দুঃখ জাল ।

০৩/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

নপুংশক ইচ্ছেরা

জ্যৈষ্ঠ মাসের উষা ।
কিশোর কিশোরীদের কল কোলাহলে মুখরিত
কৃষ্ণ চূড়ঙ্গন- যেন আনন্দ মেলা বসেছে ।
চঞ্চল দোয়েলের মতোন
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করছে হিমেল পবন
খেলে লুকোচুরি খেলা প্রাণ ভরে,
কি সুন্দর কেটেছে অন্ধকার
তাই বুঝি রক্তের মত তমাল ফুলগুলো
কলি মুখে নিয়ে জানাচ্ছে অভিবাদন ।
ঐ দূরে হাটে-
চাপর বন্ধ লম্বা কাটি করে ।
মাছ ধরা উনি সাথে করে পরম আগ্রহে ।

শতপাখির কূজনে, কাকের কর্কশ রবে, সুর
বেসুরা হয়, মনে হয়, এ অভাবের
ইংগিত মৃত্যুর ডাক।
মুহূর্তেই খেলা ছেড়ে রবি না উঠা অদ্য
উষার মতোন গম্ভীর হই।
যেমন কাটছে বেলা তেমনি কাটুক,
সতেজ হিল্লোলিত পল্লবের মতোন
সোৎসাহে শিশুর খেজুর কুড়ানোর মতোন
যেন মনে না আসে
দুপুরের খর রোদ্দুরে কথা বা কাল বৈশাখীর,
দুঃখ ও অর্থ কষ্ট হতে মুক্তি পেতে চায়
আমার নপুংশক ইচ্ছেরা।

০৬/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কেন

ভালবাসা? কিসের ভালবাসা কার
ভালবাসা—ঐ পঙ্গু বিবর্ণ সমাজটা তো
বহুদিন আগেই, আমাকে তাড়িয়ে দিলে সমাজ
রক্ষক পাষাণী হতে—
আজ আমি কোটি যোজন দূরে অপেক্ষা করছি আর
শুনছি, একটানা, অর্ধমৃতের ঘোংরানী- ফুটপাতেরা
সঁয়াত সঁয়াত আবর্জনায় পড়ে থাকা— দেখছি রূপ বিভীষিকার
অত্যাচারের। গুমরিয়ে কেঁদে যারা অব্যক্ত সাগর
ভাসায়। ঐ দেখ নিরন্নর হাহাকার—খালি হাড়ি পাতিল
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে ডাষ্টবিনের অনতিদূরে।
দু'টা দশ পয়সা পাঁচ পয়সার ছড়াছড়ি—
ছিন্ন মলিন বস্ত্রাবৃত রক্ষ চুল বিকট চেহারার মানবেতর
রোদবৃষ্টি ঝরে পড়ে থাকা মানুষটিকে
শুনছি আতঁচিৎকার যখন ঠেলাগাড়ী আটকে যায়
নর্দমায়, আদম জানোয়ার টেনে তুলে ঘর্মাক্ত শরীরে।
দেখছি উদ্বাস্ত শিবিরে জটলা পাকানো সহাস্য মানুষের
বিষাদ কালো মুখ—
প্রাণ কেঁদে ওঠে ব্যথায় যখন দেখি অর্ধনগ্ন তনু
গুঁজো হয়ে নবোতিপর ভিক্ষুক হাঁপাতে থাকে

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে
মানুষ তারাও যারা দেখি নিরুপায় হয়ে,
পিশাচের উচ্ছিষ্ট পঁচা খাদ্য খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে
পোষা কুকুরের মতোন।
যাদের নেই মাথা গুঁজার ঠাঁই বিশাল পৃথিবীতে
মালিকানা স্বত্বের ছড়াছড়ি রাঘব বোয়ালের।
অভুক্ত, অনিদ্রায় দোলতে থাকে কী নিদারুণ দৃশ্যে-
সময় এলো,
কেন, কেন, কেন, কেন
নিরব বিধাতা?

০৬/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

একটি নুতন ধারাপাত

অদূরে সবুজ আঁখ ক্ষেত,
চিকন লম্বা পাতা গুলো দোলছে
সন্ধ্যার মৃদু সমীরণে, মনে হয় যেন,
এ এক ক্লান্তি ভরা দিবাবসানে পরশ বুলাইছে
মানুষকে, গোধূলী লগ্নে, পরম আদরে,
এখনি নামবে আঁধার ঘুচাবে দিবসের সব যন্ত্রণা।
উর্ধ্ব গগনে টুকরো মেঘ গুলো-
আর ওই দেখা যায় শুদ্ধ পক্ষের অর্ধ
বাঁকা চাঁদ- আঁধার গ্রাসবার আঁধার।
সংশয় ভরা মনে কে গো তুমি যাও
আসব না কন্টক হয়ে তোমার পিছে
কারণ মুয়াজ্জিন আজান ফুৎকারে
বেলা শেষ- রবির মত চলে যাই,
কারণ চলে যাওয়াই তো কাজ
সময় চলে যায়
পাখি চলে যায়
পানি চলে যায়
সবাই চলে যায়, থাকে শুধু
একটি নুতন ধারাপাত-
যাতে আরাম্ভ করি আবার নুতন চলা।

০৮/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

পাপবীজ

মুক্ত গগনের বিশালতা বাজায় বাঁশি
আমার প্রাণে শতরূপে শতবার,
সাথী আমার হাজার বিহঙ্গ
সুর তুলে গেল, গাই আরবার।
ভুবনের ছায়া মায়া কায়া কেন
এত প্রিয় আমার কাছে আপন গৌরবে,
হাত বাড়িয়ে আসে বলে ওগো বন্ধু
জানাই সংগ্রামী ছালাম আমরা সবে।
প্রাণখানি আমার ঘুরে বেড়ায় ওগো
আম্রকানন অরণ্য ঘিরে স্বচ্ছন্দে,
তাই বুঝি দুঃখ বেদনা কাতর ভুবন
সব কিছু ভুলে থাকি সদা আনন্দে।
রুখতে কষ্ট হয় আমার মন এখন
যখন দেখি পৃথিবীর উৎস সব পাপ,
দুঃস্থ মানবতা কাঁদে, হৃদয় ধূলায় গড়ায়
গুমরিয়া মরে, হাজার আত্মার শাপ।
পাষণ সীমার সম ধারাল অস্ত্র নিয়া
কে তুমি উঁচু করে ভয় দেখাও দুনিয়া,
পবিত্র মাটিতে পাপের জন্মদাতা যাও,
হিংসুটে অর্থবহ পাপবীজ বুনিয়া।

০৯/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

জয়

জলন্ত মহা অগ্নি কুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত আমরা
একদল নির্ভীক অভিযাত্রী,
দারিদ্র্যের কশাঘাতে মৃত্যুর দিনগুলো,
সম্মুখে আমাদের তিমির রাত্রী।
আজ কণ্ঠ রুদ্ধ, অসুরের করা ঘাতে,
লক্ষ্য কোটি জনতা বিশ্বের,
চুষে খায় রক্ত মানুষের পাষন্ড দলে
ক্ষুধার অন্ন এতিম নিঃশ্বের।

বল কোথা আছে অবিচারের ভগবান,
কোথা জ্বলুমবাজ স্বার্থপর,
রুখিতে কুকুরের আফালন, হাতে,
তোল্ লাটি, উর্ধ্বে মুষ্টি ধর্।
ভেঙ্গে ফেল, সৈরাচারের কারাগার
দেখ ওরে দেখ সম্মুখে তোর
আছে সোনালি উষা ভাগ্য দেবতা
অধিকার দান লয়ে নত মুখ করজোড়।
এত সাধের সবুজতা আজ দেখায়,
নিষ্টির এক চাপা পাথর রূপে,
রে নির্ঘাতিত যত ভাগ্যহীন সীমাহীন
দুর্দশাগ্রস্থ পতিত কেন এই মৃত্যুকূপে।
বাধ ভেঙ্গে ফেল্ সংশয় সংকোচের
হৃদয় হতে মুছে ফেল চির তরে ভয়,
ভেঙ্গে ফেল্ ঐ সুরম্য অট্টালিকা যত
হীনতা, যত হবেই তোর জয়।

১১/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদীর পথে।

সুখেই আছে, থাকবেও

গোধূলি লগ্নে কাকের একটানা কর্কশ ডাক শুনি
শুনি, মনোরম সজ্জিত কিংবা ভাঙ্গা ট্যাক্সির
কান বালা পালা করা ঘোঁ ঘোঁ শব্দ অনেকক্ষণ,
নিঃশ্ব আঁতুরের অসহায় ক্রন্দন শুনি রাজপথে
দয়াদ্রু কোন পথিক হয়ত বা পাঁচ পয়সা দেয়
কেহ বা চলে যায় ঘৃণা ভরে, সমালোচনা মুখর
মহানগরীর জটিল জীবন শান্ত হওয়ার
পথে, একটু পরেই ঘন সন্ধ্যা নেমে আসবে।
আযানের সুর ধ্বনিত হয়ে মানুষ কে
ঘর মুখো করেছে।

পশ্চিমের আকাশটা এখন লালভ
সারা দিনের কর্মক্লান্তি বিষিয়ে তুলে মন
মগজ, কাহারো হৃদয়াকাশ কখনও থাকে
সুনীল সুন্দর-

কেন না সুখের কোকিল তাদের ঘরেই
অনবরত কুহুকুহু করে, ভিডিও, টিভি
আর বিরিয়ানীর গন্ধে
আর কারও সারাদিন হাত পেতে যা পায়
তাই খেয়ে সন্ধ্যার পরে সুখে ঘুমায়
ফুটপাতে তারাও সুখেই আছে হয়ত থাকবেও ।
১২/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ ফুল বাড়িয়া গুলিছান, বাস স্ট্যান্ড ।

বেদনাময় অনুভব

ভয় করি না আমি জীবন যুদ্ধে;
কেননা আমি অসংখ্য জীবন যোদ্ধার নিরবিচ্ছিন্ন
অনাড়ম্বর স্বতঃস্ফূর্ত একজন প্রতিনিধি ।
জীবন মহা নদীর ওপর চোখের এক ফোঁটা
উষ্ণ অশ্রু ফেলে লাভ কী !
মিথ্যে সন্ত্রাস প্রশংসা আর হাততালি কুড়িয়ে লাভ কী ।
আমি শান্তনা পাই পাখির ডাকে ছোট্ট শিশুর
অমলিন হাসিতে কখনও গাঁয়ের ডোবা জলে
হাঁসের মত সাঁতড়িয়ে কিংবা ডুব দিয়ে
পাই অমৃতের স্বাদ
মুক্তার মত চিক্‌চিক্‌ করে আমার বুক
কাঁদা জলও সরোবরের মত ।
তাই আমি থাকতে চাই আত্মার
পাশে পাশে, ও কখন কি চায় তাই হয়ে
দুঃখ ও জর্জরিত বেদনাময় অনুভব হয়ে ।
১৪/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে ।

আমার স্বভাব

মনগড়া পুঁতি গন্ধময় ফাইলের ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসে স্বচ্ছন্দে বিষাক্ত কাল সাপ,
ছোবল মেরে জনতায় মেটায় পিয়াস ।
পবিত্র রক্ত- লেপা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উদাত্ত আহ্বান
জানান তড়িৎ স্বপ্নপুরী করার, বাসনায়,
হাতে আলাদিনের আশ্চর্য পিদিম ।

বাহবা বাহবা বাহবা আসছে ঈশ্বর দূত;
বহুমত নিয়ে, হিতৈষী, সৎসন্তানের
সাবধান বাগিয়ো না কিন্তু বলে দিচ্ছি
কাকের স্বভাব কা কা করা
কুকুরের স্বভাব কামড় দেয়া, চাটা,
আর আমি দূত বিকট হাসি দিয়ে
তামাসা দেখাই আমার স্বভাব।

১৬/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

সংবাদটা পৌঁছে দাও

ধামাধরা যন্ত্রের বাণী শোন কান পেতে, আর
এক মুঠো অন্নের জন্য হন্যে হয়ে যারা ছুটে বেড়ায়
দুর্ভাবনায় দ্বারে দ্বারে বর্ণাঢ্য নৈশ ভোজের
সংবাদটা পৌঁছে দাও।

প্রাণের উষ্ম ভালবাসা আর রক্ত রসে রঞ্জিত নদীজল
মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-বন-বনানী যাদের
সেই জলে, মাঝি মজুর আর কৃষাণের ঘরে
সদ্যজাত, প্রেমিকের
সংবাদটা পৌঁছে দাও।

চির দুঃখী, নতমুখী অন্ধ নেত্র সম্মুখে সোল্লাসে
বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচিয়ে নীতিমালা ঐশী বাণীর
ক্রোড়পত্র রঙ ধণুর সাতরঙে ছাপা
সংবাদটা পৌঁছে দাও।

অর্ধ ভগ্ন বাড়িটার বাসিন্দা, চেয়ে আছো, নদী শিকস্থির
শিকার ভাগ্যহীনের দিকে নিরবে, ফাঁকা বুলি
আর বুটের আওয়াজ একদিন উত্তাল ঢেউয়ের
বন্যায় সব করবে সয়লাব সেই
সংবাদটা পৌঁছে দাও।

১৭/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

কে আছো অডিথিউস এন্নার

নিবিষ্ট চিন্তে চার প্রহর নিপুণ হস্তে শ্রমিক
মাল তৈরী করার পর—
যখন শরীর এলিয়ে ঘুমিয়েছিল খোলাকাশের
নিচে, কারো ছাদে, কুটির বিবরে অথবা চটের ওপর
চক বাজারের ঐ মোড়ে অতি প্রত্যুষে
ঠেলাগাড়ী- রিক্সা- ট্যাক্সী- ট্রাক পথচারী
পথের নীরবতা ভেঙ্গে—
কূপ ছাড়া হংস দলের মত বাঁদ বাঁদ করে
চলছে মোল্লাদের সাথে গন্তব্যে
কে আছো অডিথিউস এন্নার—
আমার মনটা তুমি কেড়ে নাও
উর্বর হৃদয়ের অধিকারীণি এক নারীর কাছে
যখন কানে ভেসে আসে আলীমের সুর
ভীত হরিণের মত সন্ত্রস্ত হয়ে
কে আছো অডিথিউস এন্নার জ্বালাও
হৃদয় আর প্রতারক মন ভগবানের কুপুত্র ।

১৮/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ চক বাজার ।

কবিকে মনে পড়ে

বিষাক্ত গ্যাসের অদৃশ্য কামড়ে মগজে ওঠে ব্যথা,
মনে পড়ে তবু কবিকে মনে পড়ে বেশি যেতে হবে সেথা ।
কোনদিন ভাবতে তুমি অমনি করে মনে মনে হেথা শত,
তব লেখনী আঁচড়ে উচ্ছল মনোরম প্রকৃতি হতো প্রাণবন্ত ।
মনে মনে তুমি ভাবতে কি তব প্রাণ চড়বে আহলাদে বায়,
দিকে দিকে শত রূপে, শতবার অনন্ত কাল থাকে তথায় ।
শত প্রাণ ডাকিবে ধারে এসো প্রিয় এসো তোমার স্মরি,
করি একাকার প্রাণ, শ্রদ্ধা ভালবাসায় ফুটন্ত পদ্ব ধরি ।
বিজন গায়ে দেব মালা- বাতাসে পৌঁছে দেব ভালবাসা,
প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে- বসাব প্রাণের বাংলায় মহাজলসা ।
এই উদ্যানের পাশে বসা আহা কি শান্তি পথিক জানে,
জীবন পথের মনোরম হাওয়া বইছে তার প্রাণের টানে ।

চেয়ো না কোন বেশ্যার পানে, বেশ্যা জেনে তারে,
কত বর্ণচোরা বেশ্যা, ভদ্র সন্তান ভাল জানো যারে।
ধরেছ কি তারে ব্যভিচারী ভেবে তারে দিয়েছ কি গাল,
জানি বলিবে না তারে কিছু, দেবে তার সাথে তুমি তাল।
মানুষের হাতে লাগানো, কেতকী কেয়া তারা ফুল,
ব্যস্ততম শহরে জুড়ায় প্রাণের জ্বালা, মন করে আকুল।
ইচ্ছে করে বসে থাকি এখানে রাত্রি দিন কর্তব্য ছাড়ি,
কিছু না পাওয়ার চেয়ে একটু পাওয়া বড় ভাল মনোহারী।
ঘুচাবে মনের ক্ষুধা ক্ষনিক আর কিছু আমি না চাই,
কবির মনের কথা বলিতে আজ আমি কি বলে যাই-
যুগের মায়া এমন করেই ধরা দেয় মানুষের মনে,
কাগজ টোকানো টুকাই যুগের সাক্ষী হয়ে থাকে ক্ষণে।

২১/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ সোহরাওদী উদ্যান।
(কবি কায়কোবাদের মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে)

মা দুর্গার আগমন

মা দুর্গার আগমনে দুহিতা
ভূবন হবে ধন্যা,
ফুরাবে প্রাণের আর্তি এনে দিলে
যা মহাত্মাস বন্যা।
স্মৃতির পটে জ্বলে আশার পিদিম স্মরি
শরতের উদাসী দুপুর বেলা,
আত্মার আত্মীয়, হে ধরাময়
বসুক পূজায় পূজায় আনন্দ মেলা।

২১/০৯/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

রূপসী মা

দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরে গোধূলি লগ্ন
চেয়ে আছি নিরবে বিস্তৃত চিত্ত মগ্ন।
ওই দূরে দেখি ক্ষুদ্র শাদা পালখানি ধীর বেগে,
যেন বলে যায় কত কথা মানুষকে মৃদু বায় লেগে।
শীতের আগমনী বার্তা বলছে লক্ষ্মী পূজার সানাই সুর,
পাখিদের কূজন, কলরব শুনি চারিদিক নিকট দূর।

ধানের ক্ষেতে চাষী সন্ধ্যা বেলায় শুধু ঘুরে একা,
মনের কাছাকাছি গিয়ে বলে, পেলাম কল্পনার দেখা।
অর্ধান্দ্রকারে উঁকি মারে সাঁঝের নিচে বলে ছাড়ি,
বলয়াকারে গ্রাম গুলো সেজে আছে সে ভারী-
কোসা নিয়া সাথে রাখাল ছেলে চলে নালা পথে,
লালচে রঙের ধপ্পে বন- রবির মতই চায় হতে।
রূপসী মায়ের এই সুন্দর রূপ দেখি আ মরি,
বসে আল্লুত ভক্তি ভরে- হেন কালে স্মরি।

১৯/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

কে এলে

আমি এক প্রেমিক ভ্রমর ফুল হতে ফুলে
গুঞ্জরিয়া বেড়াই ছায়া ফেলি মায়ার ছায়া,
পান করি মধু রস ভালবাসার সুখে মরি
গুনগুন করি ফুল বনে দৃষ্টি কটু বেহায়া।
কে আমাকে পারো না চিনিতে
আমি যে বেড়াই সবার হয়ে,
ক্ষণে ক্ষণে আঁকি প্রেম কল্পনা, লতা
মরি একাই, প্রেম লাজে ভয়ে।
হৃদয় হতে হৃদয়ে ছুঁয়ে যাওয়া কে
তুমি ষোড়শী ফুল সুবাসে,
ভ্রমর দল আসে গুন গুন করে
তোমাকে সে গভীর ভালবাসে।
চপলা, চঞ্চলা, এই মেয়ে মায়াহরিনী
চোখ দু'টো করে রাখে ডাগর,
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সে সিদ্ধ সমীরণ
হাত বুলিয়ে দেয়া প্রিয়তম নাগর।
নিশীত ঘুম ঘোরে দেখি
ভালবাসার অমৃত সাকী নিয়া,
কে এলে হৃদয় দুয়ারে আমার উষায়
জীবন হয়ে গেল তোর-আমি নাছোড় মুক্ত পিয়া।

২৬/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

হৃদয়চাৰী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবৰ্ধিত) পৃষ্ঠা-২৬৫

অরুণ

গাহিয়া যায় যাত্রী জীবনের গান,
কভু করুণ কভু রুদ্র কভু মধুময় তান।
কল্পনায় আজি হেরি অতীতের সব,
কবিতার ছত্রে ছত্রে কথা নিস্তদ্ধ কলরব।
অরুণ সেই বেলা হেরিল খুলে আঁখি,
রচিল কবিতা পল্লবে ক্ষিতি যে রাখি।
পড়িল আপন মনে আর সেই বেলা,
গুঁজিয়া রাখিল- হেরিতে গেল সন্ধ্যা খেলা।
ফের আসি পাইল না কিছুকে যেন
অবিচারে আঘাতে ছিড়ল তা সে কেন।
অরুণ অরুণ বলে তার মন পাখি,
ছুটে গেল অদূরে প্রান্তরে সে থাকি।
হেরিল কত কি বন-জঙ্গল যত,
সবার সাথে হলো সে কখন মগ্নরত।
সন্ধ্যা হলো ঘোর অরুণ আসে না ফিরে,
চারিপাশে তার ভীষণ আঁধার রইল ঘিরে।
কড়া শাসনের ভয়ে বিধাতার, হয়,
অরুণ আসে ফিরে, মেঘ বরিষায়।
ক্রণেই অরুণের সে মায়া গাঁথা খানি ভুলে,
অযত্ন অবহেলায় কোথা, কে রাখিল তুলে।
বহু যত্নে তা কুড়াই বুকে রাখি ফের,
আবৃত্তি করিলে কবিতা সুরে মনে বালকের।
পারে না কেহ, রাখে ধরে সেই ছোট্ট অরুণ,
কেবল তার মন, বাঁশিতে বেজে ওঠে সুর করুণ।
চলে সে ভক্তি ভরে, গ্রহ-গ্রহান্তরে হয়
কভু খুঁজিয়া সে নাহি পায় অরুণ বিধাতায়।
ক্লান্ত অরুণ ছুটিয়া যায় মরু পাহাড়ে,
হৃদ দিয়া সে হয়রান, খুঁজে, পায় না কাহারে।
সুখ ত্যাজি, ত্যাজি সকল আসা তার,
পাড়ি জমাল ময়ূরপংখী তার তেপান্তর-পাড়।
খুঁজে আনবে সে মনি মুক্তো হীরক, রতন,
আত্ম প্রসাদে রচিবে সে বুকে রাখি করি যতন।

ভীড়িল না তরী রহস্য সাগরে কভু হয়,
ঘুরে ঘুরে তরী আসিল ফিরে ধূলির ধরায় ।
ফের ছাড়িল সে তরী উদ্যাম স্রোত টানে,
বহু দূর চলিল সে মহা সাগর পানে ।
কৃচ্ছ সাধনায় ভাসিয়ে রূপক তরী তার,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ভীড়ায় তটে বার বার ।
ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত অরুণ মেঘপানে চাহি,
দেখিল সাথে তার তারা একটিও নাহি ।
সহসা আসিল এক অপসরি তার কাছে,
বলে উঠিল, অরুণ, বলো, কি প্রয়োজন আছে ।
হাসিয়া উঠে অপসরী বলে,আহা,হায়,
ঘুরিলে তো বহুদেশ দিলে কী তব বিধাতায়?
মায়ার আঁখি করিল সে, সহসা বাহির আর,
হাসিয়া কাঁদিয়া মরে, ছলনায় বারবার ।
রূপের ছায়ায় ঘিরিল সে অরুণের চারিপাশ,
বলে, আচমকা, মায়া মন্ত্রপড়ে,পাগল কোথা যাস্?
দেখো কেমন অপসরী আমি ফুল কাননে,
এসো কাছে বলি কথা তোমার সনে—
বুঝিল না অরুণ কিছু অনুভব করে হয়,
ভ্রষ্ট হইবে ভেবে শূন্যে চেয়ে সে চলে যায় ।
অরুণ, অরুণ, অরুণ বলে অপসরী ডাকে,
পিছু হতে ফুল মালা দিয়া সে বেঁধে রাখে ।
পরিয়ে দেয় মালা, আর বলে,অরুণোদয়ে,
এ ফুল বালা করে চুম্বন, তারে মুগ্ধ হয়ে ।
আসিল না কেহ, কহিল না কথা তবু হয়,
অরুণের প্রাণ,পশ্চাদ দিকেই, ছুটে,ছুটে যায় ।
ডাকিল অপসরী ওগো অরুণ ভুল পথচারী,
ভুবনে বাসিলে ভাল, ঈশ্বর হবে তোমারী ।
এসো, বুক, বলি ওগো বন্ধু যে মোর,
তোমার বিরহে কাঁদিছে, জুলেখা অঘোর ।
তোমার বিহনে বলো আমি কোথা যাই,
তব বিহনে প্রিয় বলো,জীবনের দাম কী ভাই?
সজল নয়নে দাঁড়িয়ে রাধা রূপ ফুল বালা,
হাসছে হাতে রাখি পরাতে অরুণেরে পুষ্পমালা ।
০২/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

আত্মবিশ্বাসী প্রেমিক

একি কভু হয়, নারীর সাথে পরাজয়,
 থাকিতে পৌরুষ শক্তি,
নিজকে হারিয়ে আমি, দেখি যার স্বপন দিবাযামী,
 বরি প্রতি অটুট প্রেম ভক্তি।
ত্যাগীয়া কি কভু পারে, আমাকে ছাড়া অন্য দ্বারে,
 দিয়া শেষ রক্ত বিন্দু,
বাজী রাখি জীবন মোর, যাব আমি বহুদূর,
 পাড়ি দিয়া অকুল সিন্ধু।
নারীকে করিতে জয়, নাহি করি কভু ভয়,
 রণে জিতিব আমার বিশ্বাস,
নাহি আসে নিদ্রা মম, হৃদয় দহে অঙ্গার সম,
 আগুন ভরে প্রতি নিঃশ্বাস।
সবচে' কঠিন কাজ বাকী, মন জয় করা নাকি,
 কেন আমি একা দহি,
দেখি তার কাছে যাই, প্রেমের বাণী নিরবে শুধাই,
 কত ভার প্রেম-বোঝা বহি।
আজ বসন্ত মোর দেখ- সুগন্ধ মলয় বইছে মনে রেখ,
 ভ্রমর উড়ছে পক্ষ মেলি,
পুষ্প পরাগ মাখি অঙ্গে, পাপড়ির শোভার সঙ্গে,
 মিশি একাকার প্রেম খেলা খেলি।
ওগো প্রেয়সী কভু তুমি, দেখ চেয়ে মোর মনোভূমি,
 কত উর্বর শস্য ফলাই কত,
আমার জীবন সংগ্রামে তাই, তোমাকে সাথী করিতে চাই,
 ভুলিয়া হৃদয় আঘাত যত।
এসো প্রিয়া এসো গোপনে, দুটি হৃদয় মিলনের ক্ষণে,
 কাঁপিয়া উঠুক গুহু ধরা,
আমরা যত দিন বাঁচি, মানুষে মানুষে প্রেম যাচি,
 যুদ্ধ পালাবে করে ত্বর।

১৪/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

ফাঁকি

ধরিতেছে মাথা শরীর গরম, সহ্যবাঁধ উঠেছে উদগ্রীব চরম,
আশা নিরাশার দ্বন্দে ক্লান্ত আমি,
সম্মুখে চেয়ে আছি অপলকে, কখন প্রিয়া উঠিবে হেথা নয়ন বলকে,
আমি আজ শান্তি-মুক্তি কামী।
এমন জটিল প্রেম অভিলাষ, পথ পানে চেয়ে থাকা উর্ধ্বশ্বাস,
সময় কাটে না মস্তিষ্ক বিকার,
নাহি শাসনের ভয় কিছু, শির করি অতি নিচু,
শোভা দেখি ঘাস আর মৃত্তিকার।
মাঝে মাঝে চোখ উকি মারে, দেখি পাই কিনা তারে,
দ্বন্দ উদিত চঞ্চল প্রাণে,
বসি দোকানীর চৌকি মাঝে, আনমনা অর্থহীন কাজে,
কাশিতেছি মরিচ ভাজার ঘানে।
জানি, এই হলো প্রেমের অভিযান, কপালে লেখা আছে বিধান,
জানি, প্রিয়া দিয়াছে আজ ফাঁকি,
ক্ষোভে দুঃখে অবশেষে আর, কাঁদিয়া উঠিল মনটি আমার,
ধ্যাৎ ছাই প্রেম, রইল কি আর বাকী।

১৪/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

ভালবাসা

এতদিনে আমার পৌরুষের হলো জয় কহি,
ভালবাসি তব,
মনে মনে কত কহিয়াছি, মুখে কখনও
বের হয় নি রব।
ছন্দে গানে আবার পেল জীবন তাই রচিব কবিতা
প্রেমের আজ ভাই,
প্রিয়া যে ভাবে চাহিল আড় চোখে কত
মধুর তাকানি তাকাই।
সে চোখে কত কি ভাষা আছে, কে জানে
প্রাণ শিহরিয়া উঠে,
সদাই তোমার পানে ছুটে যাই, আমার হৃদয়ে
তোমার ফুল ফুটে।

ভালবাসি, ভালবাসি হৃদয়ে তুফান উঠে,
প্রতি ক্ষণে মোর,
গাহি গান, শোন তুমি ধ্যানে মনে প্রিয়তমা
কণ্ঠ কত মধুর।
গোধূলি লগ্নে ডুবিল বেলা, একটু পরেই
তিমির গ্রাসিবে নাই সময়,
এসো প্রিয় কাছে এসো বলি তোমায়
যৌবন করো না ক্ষয়।

২৩/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

উদ্বেল মন

জগৎ মাঝে দেখিব আমি প্রাণ ভরে,
দু'নয়নে বিচিত্র ধরলী আহা প্রাণের 'পরে'।
কে যেন আসে, জোয়ারে প্লাবনে,
আমি ডুবে যাই স্বপ্নের মত বৃষ্টি ভেজা শ্রাবনে।
আকাশ যেমন মেঘ গর্জনে হু হুংকার ডাকে,
তেমনি মোর চঞ্চল মন তার দিকে তাকিয়ে থাকে।
হে রুঢ় শক্তি, দুর্বলতা-কেন গ্রাস কর বারবার,
হে অসুন্দর, হে মিথ্যা, সব আমার অলংকার।
হে পশু, হে নিন্দা, হে দ্বেষ আমার অহংকার,
তোমায় ঘৃণা করি, ঘৃণা করি হও ছারখার।
আকাশ নামছে পৃথিবীতে-ধূ ধূ সম ধোঁয়া,
ভাবছে কি শিশু কবি, তাহা সবি যে ভুঁয়া।
কর্কশ স্বর কাকের বিরজ্ঞ আনে তবু
তাহে নাহি দূরে সরে যায়, মানুষ হতে কভু।
কোকিল সে মধুর তানে বিভোর হয়,
তবু তাকে মানুষ সময়ে অসময়ে খুঁজে নাহি পায়।
সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে আছি, হাতছানি দিয়ে,
ডাকছে ভবিতব্য দেখছি নূতন চোখ নিয়ে।
জগৎটা কত আনন্দময় আহা আমি,
লাভ করেছে মন-মুক্তি হে অন্তর্যামী।

নানা ভাবনা আজ ভীড় করে মনে,
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আহা তোমার সনে-
হে প্রকৃতি, হে প্রভু, হে মানুষ আজ,
দাও বিদায়, দাও বিদায়, দাও কফিন সাজ।

২৩/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

আজকে

আজকে বেঁচে থাকার কঠিন জীবন সংগ্রামে,
লিপ্ত প্রাণিগুলো ভাসমান জঞ্জালের মতন
নদী স্রোতে ভাসছে-
আজকে কল্পনার ফানুস উধাও হয়েছে
মহা শূন্যে যেন হাসির মাঝে কান্না,
আজকে কোথা জীবনের বিলাস, কোথা আরাম
খাট, দুর্বা বিছানা যাদের নিত্যসাথী।
এই কালের কবির বহু জনমের অদেখা
বিকট, কংকাল সম ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
ঝলসে গেছে হৃদয়ের রঙ।
জ্যেষ্ঠের খর রোদ্দুরে-
বসন্ত আমাদের নয়
আজ ভেঙ্গে খান খান সুখ স্বপ্ন গুলো,
কঠিন ভালবাসার রুঢ় আচরণে
আজকে
দুঃসহ বাস্তবতা আর যান্ত্রিকতার
যুগে কেড়ে নিয়েছে হাত দিয়ে বাগানের
সুকুমার ফুলগুলো।

১২/০৬/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

আরশিতে রূপসী

আরশির উপর দেখি কায়া সুলোচনা,
পুলকিত আনমনা কত যে কামনা,
আঁখি তারায় ফোটে, কত যে সুর বেদনা,
কপোলে গোলাপী আভা-সুরভী সাধনা ।
কণ্ঠহারে কত যে শোভা তার পায়,
নিজে দেখে নিজের পায়-কল্লনা লতা ধায় ।
আনন্দ ধারা বারে কত স্পন্দিত তার হিয়া,
আরশি যেন যায় সদা তার উপমা দিয়া ।
বুলছে, হাতে কিছু কাঁধে কালো এলোচুল,
আরশিতে রূপসী দেখে তারে দেখে যেন ভুল ।

০৭/০৬/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

দেবে জীবন

প্রভাতের কাঁচা মধুর স্নিগ্ধ রক্তিম রবিকর,
নিম্বেজ রজনীর সাধনায় ভেসে ওঠা, মহিমা বর ।
বহি শিখায় ছুটে যায় পতঙ্গ দল আপন সুখে,
অনাবিল আকর্ষণে কি আশা পুষি যেন বুকে ।
কিসের প্রত্যাশায় কতকাল প্রাণীকুল কাঁদে,
অন্যায় সহে অসহায় জ্বালায় বুক বাঁধে ।

সে বেদনায় সাগরে জোয়ার তুলে মহাশক্তির ভাই,
নিঃশ্ব আজ আপন ঘরে নিয়াছি যে, নিয়াছি ঠাই ।
বধু আমি করে রাখি দীপ শিখা জ্বালি, জ্বালি
পিশাচ অদূরে দাঁড়িয়ে দেয় পাপের হাত তালি ।
টল্ছে পা কাঁপছে গা দীপ আমার আজ নিভুনিভু,
দাও সারা দাও, বাঁচাও মান ওগো দয়াময় বিভু ।

উষা তাজা রক্তের বীর্যের শত প্রাণ, জীবন দানি,
অসূরের ভেঙ্গে হাড় টানি জিহ্বা দিলে হারমানি ।
উদিল শশী মোলায়েম করে ধরাতল দেয় ভরে,
কোটি তারকা উচ্ছল ছল্ ছল্ কী সুখ প্রাণে ধরে-
চেয়ে আছি আমার কোটি সন্তান তারকা হয়ে,
আমার মুখ পানে চেয়ে রবে-গৌরব নেবে বয়ে ।

০৭/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

প্রচণ্ড পবনে নাড়িয়ে,
দোলায় অনিচ্ছায় কত,
থাকিতে পারিনা স্থির,
শক্তিশীনের আফালন যত ।
আমার কিশলয় গুলি,
নতশিরে নিরব বুলি,
ঝাড়ে শুনে না গুড়ি বৃষ্টি,
আসে সে বার বার,
এড়াতে পারি না তার দৃষ্টি ।
ক্ষণিকে উড়াতে চায়,
মূল শুদ্ধ ঝড়ো বায়,
ধরি সজোড়ে হতে মর্ত্যভূমি,
হায় প্রিয়জন মোর কেহ,
বাহির হয় না হতে গেহ,
কে সে স্বার্থপর আপন তুমি?
নানা ভাবে নানামতে,
বার করে ঘর হতে
কত সুন্দর ধরাতল,
ফুটাই মন পুষ্পদল,
আঁকি কল্পনার বিচিত্র ছবি ।
ঝাড়ে তাড়িত-বিটপের মত,
মাঝে মাঝে হই আশাহত,
বুঝি জীবনটা গেল যে চলে,
বিষয় চাপ দেয় ভীষণ ভাবে,
জীবনটা কেমনে যাবে,
ভেবে গেলে হায় রসাতলে ।
কেহ কি কখনও জানে মোর,
কোন্ বেদনায় রেখেছে দূর,
স্থির থাকিতে পারি না কেন,
এমন, কল্পনার মুক্তি,
মানে না বিষয় যুক্তি,

এমন ঝড়ে পড়া বিহঙ্গ যেন ।
শবদেহ যখন ফেলি, চির তরে চলি গেলি,
নেই দায়, একাকার হলে বায়-
সহিব না খুটার আঘাত, নিত্যদিন হাভাত হাভাত,
আঁচলে মুছি অশ্রু নেব বিদায় ।

০৯/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ- বেনামী সত্তার মুখে

বেনামী সত্তার মুখে

জীবনের তিরিশ বছরের ফলাফল
রাত সাড়ে দশটায় বেরিয়ে আসে
নির্ধুম রাতে মন ও মস্তিষ্ক খেচর-

এখানে দুঃখ কাতর নিস্তর্র ঘর
এখানে রোগ শোকে ভরা নিথর চৌদিক
এখানে নিষ্ফল সময় সাড়ে দশটা
ঘোরাফেরা করে রোষের বন-বনান্তরে ।

আর কত দিন এভাবে, এভাবে চলবে?
বেতারে শ্রুত রাগ বসন্তিকার মত
দূরাশায় আঁধারের চোখ চেয়ে আছে
একটি কলমের মলিন মুখে-
সেখানে আমি দেখি,
একটি উলঙ্গ মানুষ
ছানাবড়া চোখে চেয়ে আছে ।

দুঃখ জমবে কাতারে কাতারে
রাগ জমবে কুন্ডলী পাকিয়ে
বিষন্ন ছায়ায় খালি সইবে
এসব রাতের প্রথম প্রহর ।
মারি ও মড়কের উর্ধ্বে
আয়ু ও অর্থের উর্ধ্বে
সু নাম ও বিদ্রূপের উর্ধ্বে
শুধু একটি অবিরত রক্ত ঝরা কলম
টুঁশ খায় বটগাছের ।
দুঃখ ও ক্লান্তিতে
ঘর্মাক্ত দুশ্চিন্তা উপদ্রুত
একটি মানবের অস্তিত্বে কল্লনার পিয়াসে
আছাড় খায় একগ্লাস জল ।

বেনামী সত্তার মুখে

বিষাদ জীবনের মায়ায়

আর কত দূর এ যাত্রার শেষ দেখব আমি?

আগাগোড়া পর্যদন্ত

সেই রক্ত মাংশের মানুষ

হন্যে হয়ে শুধু চুলকায়

মিথ্যে সভ্যতার চুল ।

বিকট শব্দ শুনছি পেটের সমুদ্রে

নিরন্তর সে ফেটে পড়ে ঢেউয়ের বিক্ষোভে-

ভাত দে, ভাত দে, ভাত দে !

কতকাল হিমেল হাওয়ায় খুঁজেছিল

উদ্বাস্তর বসন্ত-

সে পৃথিবীর কোথাও নেই ।

হাজার বছরের বাতাস

বিনয়ে, বিদ্রোহে ব্যক্ত করে

হৃদয়ের কথা, উচ্চারণ করে

বিশাল ক্ষুধার পাথারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে

বাণীর জরায়ু থেকে-আমার বসত ঘরে

বেনামী সত্তার মুখে ।

০৯/০৩/১৯৯১ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা ।

বেঁচে আছি নরসুন্দর

চাপার তোড়জোড়ে হাঁটি আমি তেলাপোকা,

খেয়াল-টেয়াল খুব একটা নেই, দুর্গন্ধ গায়ে

কচ্ছপের কংকাল নেতৃত্বে কাঁপে তরঙ্গায়িত

জনগণের কাদা মাটি । কিংবা হাঁটু জলের

ঘাসেরা ঐশী বাণী আওড়াই ।

প্রেতাত্মার মুখোশ পরে আর সামান্য

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-২৭৬

বেনামী সত্তার মুখে

কারণেই গা জ্বলে আমার ।

আমার বাতায়নে শিকেরা ঠায় দাঁড়িয়ে,
সারি সারি দরমুজ দৃষ্টির রক্ষ ইচ্ছে-
গুলো প্রতিজ্ঞা করে, বেরিয়ে যাব নির্ঘাত
নিরন্তর ঘরে, খাব শামুকের খোল-খুদ
কুড়া হাঁসের গলায়-

সর্বদা নেশাশ্রু মাতাল, মাথায় মাথাল
ইজমের-শাসন যন্ত্রের সিঁড়িয়ারিং আমার
হাতেই ।

টাকার কুমির বিড়ালটি আমার মিঁউ মিঁউ
করে -

সহসা চুরি করে দুধ খায়,
জৈবিক পুষ্টি রসাতলে গ্যাছে-
তন্দ্রাচ্ছন্ন যুগের হাত পা বাঁধা কৌশলের
দড়ি দিয়ে-

অস্পষ্ট অথচ করাতের পৌঁচে উদর-
আর মনের তন্ত্রগুলো কাটল,
অথচ বেঁচে আছি নরসুন্দর যদি
বেমানান দেখায়, সাহেবের চুলগুলোও
কাটি না ভয়ে ।

১৩/০৩/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

আর এক শতাব্দীর লেজে ধরে

আমি এক খন্ড মেঘ;

আমার চোখে বৃষ্টি অশ্রু বারে অবুরে-
বেদুঈন কোন ছোকরার মত পশুর জীবিকা নিয়ে
ধরি সমাজের গলি থেকে রাজপথের চারণ ভূমিতে
ছিনতাইকারীর দ্রষ্ট হাতে আমি ছিঁড়ে ফেলি
পথচারী রূপসীর কানের দুল ।

যন্ত্রের অত্যাচারে বিবেক হয়েছে অধীন ।

কালো ধোঁয়া, আমাকে দেখে নাকে রুমাল
দেয় সভ্য লোকেরা,

সৌভাগ্য কি দূর্ভাগ্য যে অবিরত শিক্ষার
লোনা জলে ডুব দিয়েছিলুম একদিন-

বেনামী সত্তার মুখে

তারপর হতে এখন আমার চেতনার গা
কেবল চুলকায়; আমি জানি আমাকে
পাড়ি জমাতে হবে, অন্ধকার কারার কোষে,
কারণ কাদা ছুঁড়ে শাদা জামা বাদ করে দিয়েছি
জানোয়ারের ত্যাজ্যপুত্র আর জারজ সন্তানের
সুরা পান করেছি। সুতরাং কৌলিন আমি
এ বোঝার ভাব নেই ঘাড়ে।
আমার ইচ্ছের মুখ দিয়ে খেয়েছি মুদি-
দোকান থেকে ক্ষুধার্তের উদগত চোখ
দিয়ে দ্যাখে, তিন টেকার বিস্কুট-
ক্লান্ত অবশ দেহে এখন চলছে, বহু যুগের
শোবার আয়োজন,
তারপর, তারপর আর এক শতাব্দির
লেজে ধরে ঘুম থেকে জেগে উঠব,
তখন ক্লান্তি থাকবে না
তখন একা থাকব না
তখন ভয় থাকবে না
নির্ঘাত আমার ধারাল দাঁতের আক্রোশ
চিবোবে আভিজাত্য, দূরাচারের কলিজা।

২৪/০৪/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

অবিনাশী সূত্র

আবেগ দিয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়,
কিন্তু তা হয়ে ওঠে না বরাবরই,
যা হয় তা হলো :
একছোপ কণ্ঠ নির্গত যক্ষ্মার রক্ত, ক্যান্সারের
মোহর দেয়া ফুসফুস, মনে হয়, শান্তির, সপ্তাকাশ
থেকে, ঐশ্বরিক গালি খেতে খেতে
নির্জন অন্ধকারের জীবটা, গড়াতে গড়াতে
নিঃসহায় এসে পড়েছি।
মাটি আর গাছ গাছালির

বেনামী সত্তার মুখে

পেলবিত দেহে
শান্তি নেই, ঘুম নেই,
ওদের বুক থেকে
থেকে থেকে
ডেকে ওঠে, কেঁদে ওঠে
নিশাচর বিহঙ্গরা ।
শিয়াল আর ভয়ার্ত কুকুরেরা-
দুশ্চিন্তা অভিযোগের মর্টার দেগে কে যেন,
ওদের উত্তপ্ত, অরক্ষিত দেহে, রক্তের মত
কী জানি পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে হৃদয়ের
ক্ষতস্থানের, ভাঙ থেকে; দিশেহারা
হেঁটে হেঁটে যাই ফ্যাসিবাদের কম্বল জড়িয়ে
গায়ে জ্বর, অসম্বোধের, ক্ষুধার অগ্নি দৃষ্টির
শর বিধে গেল-
একটা ন্যাংটা মানুষের ওপর
একটা জানোয়ারের ওপর
আর একটা লাল শাড়ী পড়া নারীর ওপর ।
ইচ্ছের মুষ্টি তুড়ি মারি, ঠুকি বায়ু আর নিরব টেবিল
সটান সিনা
ক্ষেপে ওঠে ক্ষুধা চেতনা
এখনই গিলে ফেলবে
সাপ হয়ে ব্যাঙ
বোয়াল হয়ে ডানকিনা
পিশাচ হয়ে নারী দেহ
ডাকু হয়ে মালদার
হাইজাকার হয়ে বিলাসের বিমান-
আরও কত কি ।
আমার সুন্দরের পোষ্টার মাথা নুইয়ে
থুবরে পড়ে গ্যাছে, কোথাও অলক্ষ্যে
অযতনে, অন্ধকার প্রায় নির্জন কারাগারে-
কোথাও, এইতো দেখতে পাচ্ছি,

বেনামী সত্তার মুখে

একগুচ্ছ সুন্দর স্বপ্নেরা, অসুন্দর দেয়ালে পিঠ
রেখে ক্রমাগত দিন গুনছে মৃত্যুর, খসে পড়ছে
যৌবন, জীবনের খোসা, মুখে পুরছে মালিকের
রান্সুসে দৃষ্টির অবহেলার বৃদ্ধাঙ্গুল, সভ্যতার
বিষাক্ত খসখসে জ্বালার ছাই।
তারপর, তারপর কি হবে? নিশ্চিত নির্ঘাত
অসমপূক্ত দ্রবণ পৃথকীকরণ- অবিনাশী সূত্রঃ
বালি ফিরে যাবে মুক্ত নির্মল জীবনে স্বচ্ছন্দে,
লবণ, তোমরা যাও মহাসমুদ্রে অভিশপ্ত গ্রাস হয়ে,
যাও, কোন অধিকার নেই সমতলে, সূর্যের শপথ
শপথ, তোমার হুঁসেলের চুলার,
আমার আগুন জ্বলে উঠবে,
আমার হাড় পুড়িয়ে পুড়িয়ে কয়লা করে দেব
আমার রক্ত মাংশ চর্বি দিয়ে সিক্ত করব-
পৃথিবীর মাটি, রান্না ঘর।

২৬/০৪/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

অতঃপর গঠন করব

মন চায়, একটি শুয়োর হৃদয় আমি ছিঁড়ে ফেঁড়ে তছ-
নছ করে দিই। আমার কলিজার তন্ত্রগুলো
যে পশু-আত্মা খাইয়ে ফেলেছে সেই কিনা অক্ষত
অবস্থায় আমারই সামনে ঘুরে ফিরে দিয়ে যায়,
পাপীয়সী ছলনার হাসি আমাকে একেবারে
হজম করে। আমার পৃথিবীটা আজ উষ্ম মনের
আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ করছে উত্তপ্ত লাভা,
ইচ্ছেগুলো হত্যা করতে চাই, হত্যা করতে চাই।
মন চায়, পাপের আকাশটা আমার পৃথিবীর
উপর থেকে সরিয়ে ফেলি। আলাদীনের দৈত্য
হয়ে পাথর করে ফেলি গাছ তরুণতা বৃক্ষসমেত
সর্বসম্বন্ধকে, ইচ্ছে করে, গোপন আঁতাত আর
স্বার্থের নিচাশয় রাজনীতির মিস্রটিকে,

টুকরো টুকরো করে ফেলি আমার রাগের মাইন
পুঁতে- আমি দেখছি আমার বুকের ওপর
দিয়ে রাস্তা করছে একটা পেত্নী। একটু পরে
পরে, মনের ঘাড় মুষড়ে দিয়ে চুষে খাবে রক্ত।
ওগো বিশ্ববিরেক তোমরা কি কেউ ধরে দিতে
পারবে যাদুর এ পিশাচীকে- রক্ত মাদুর বিছিয়ে
শুয়ে আছ যারা- কুচক্রের ষড়যন্ত্রে। পৃথিবীর
মেরুর দুই প্রান্ত জুড়ে যে পরাশক্তির ফুসফুস
তা তোমার ভেতরই আছে- শ্বাস প্রশ্বাস
নিচ্ছে- তোমার ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ জীবনের নাসিকা
ও মুখের ভেতর দিয়ে। তাই আগামীকালের
ক্রণ যারা এখনও আকাশের রহস্য চোখে-
দেখছে পৃথিবীর মনের বিশ্রী রূপ
তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা
আসিবার আগে, পৃথিবীর মাটিকে পরখ
করে নিও, এখনও আছে কিনা দুর্ধন্দ।
আমার শ্বাসের বিষবাপ্প ছড়িয়ে দিলুম,
মরুত, অবক্ষয়, ধূরন্দর মনের লাণ্য রূপ,
পুড়ে থাক হযে যাক আমার মনের উষ্ণ অরণ্যের
উষ্ণ অভিশাপে, বিনষ্ট আকাশের নিচে
অতঃপর গঠন করব, এক অনাবিল বিবেক
যে ফুলে-ফলে-শস্য সুষমায় আমার মনের
চোখে ভরে তুলবে এক মনোরম পৃথিবী।

০২/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

ফলাফল

ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ চৈতন্যর আকাশে উড্ডীয়মান
আহত ঈগল। হঠাৎ এক দমকা হাওয়া পথ
রোধ করে দাঁড়াল। আমি স্থির ঠায় দাঁড়িয়ে।
কলম কাঁপছে। নারী পুরষ-গাড়ী রিক্সা,

রক্তাক্ত পিছ ঢালা পথ দিয়ে, ক্রমাগত, যাচ্ছে
যাচ্ছে, যাচ্ছে, রেজিষ্টার বিল্ডিং এর পার্শ্বে-
দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, বজ্র বিদ্যুৎ কলিজায়
খেলে যায়, ফাগুনের উদাস দুপুরে,
একটা চেনা মুখ সামনে, কল্পনার
কাকেরা যে ক্ষুধার বাগাড়ে ঠাই নিতে চাইছিল, অনুক্ষণ
গেল না সেখানেও। জীবনের বিশেষ দেবদারুর পরীক্ষার
শাখায় শাখায় বসে কা কা করছে, আশা-নিরা-
শার মৃদু হাওয়ায়, দোলছে, দোলছে আর দোলছে, কবিতার
যুগল হৃদয়ের ছন্দময় শাড়ীর আঁচলে আমাকে ডাক দিল,
এসো, অরণ্যের আঁচ খেয়ে হাঁটি কিংবা বসি দুবার গালিচায়
আর সময়ের গায় ভেসে ভেসে যাই রেজাল্টের বায়ে,
সমুদ্রে দেখি পাই কি-না একটা সুখের মন মত বাহন। কিংবা
কাকের উষ্ম হাওয়ায় শুষ্ক বিদগ্ধ ফলাফল শূন্য কাগজ।

১৫/০২/১৯৮৮-ঢাঃবিঃ রেজিঃ বিল্ডিং চত্বর।

বাঁচতে চাই

ফাগুনের পূর্বাঙ্ক স্তম্ভিত মন, নানা বিহঙ্গের
কূজন শিল্পীর ললিত কণ্ঠ আর নিদাঘ নতুন পল্লবের
মৃদু দোল যেন উদাস এক স্বপ্নময় জগৎ-
ইচ্ছের প্রজাপতিরা ফুল হতে ফুলে বসে-উড়ে,
মৌমাছির আন্দের বোলে করে সহবাস, প্রকৃতির
সবুজ বসন্তরা শুয়ে পড়ছে মাঠে, ঘাটে, প্রান্তরে-
পথে, গায়ে মেখে আঁচহীন রোদোরের হলুদ।
বসন্ত রাণী শিমুল-পলাশ খোঁপায় পড়েছে লাল
ফুল। বসন্তরাজ হাওয়ায় গায়ে দোল দিয়ে
ভেঙ্গে দেয় লাজ, গা ঝাড়া দিয়ে রাণী আঁচল
ফেলে পাতায় পাতায় হাসে সুড় সুড় হাসি,
নৃত্য চপল কিশোরী 'সুড়ে' যায় মনের শুকনো
পাতা। গড়ায় বেলা, ধূলিমলিন কিশোরীরা,
শীর্ণকায় প্রৌঢ়া ভরে দেয় মনের খাঁচা-‘হাছুন’
হাতে চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে,

কখনও ঝোপঝাড় কিংবা আগন্তকের দিকে,
আকাধ লালচে চুল নিয়ে দুষ্ট বাতাস খেলে
লুকোচুরি খেলা,
জীবনের গাছেরা চিন্তার শিকড় গেড়ে আর্দ্র-
মাটিতে- ওরা ঠাসা-ঠাসি করে গুতা-গুতি
করে আলোর পৃথিবীতে বুক তুলে দাঁড়ানোর
ইচ্ছায়। গরীব গুল্লারা মরে গেছে- মজে-
গেছে অনাদরে আবছায়,
তবু আমার দৃষ্টি ফুল আর বোলের দিকে,
বাঁচতে চাই বসন্তের মত নির্ভয়ে নিঃসংকোচে।
মানুষের মত আত্মত্যাগী বীর বা শহীদের মত,
খোলা আকাশের নিচে স্বাধীন সত্তার বীজ বুনে বুনে
মনের মই দিয়া ক্ষেতে। অর্থের বিরহ কিংবা
অত্যাচারে আমার রঙ তুলির রঙের আঁকে
চিত্রিব, চিত্রিব, মানব সত্তার জগৎ।

২১/০২/১৯৮৮ টিকরপুর।

নায়ক যখন দয়া চায়

বায়ুর সমুদ্রে ভাসমান শরীর বেতারে কথা
কইতে গিয়ে মুর্ছা যায় চেতনার ঈশ্বর।
এলোমেলো চিন্তার ঝোপঝাড় গড়ে উঠবে কী বনে ?
চৈত্রের খাঁ খাঁ রোদেদর ক্ষুধার আবেগ, কে
গ্রাস করতে চায়, মানুষ পড়ছে ষড়যন্ত্রের
রাত্রিবাস, এক কবি নিরবে বসে উদ্ভাস্তর
শিবিরে অনর্গল গিলছে পৈশাচিক শব্দ,
আকাশের চিত্ত বিশালতায়, ভীষণ
ঝড় উঠছে আগুনের হতাশা আশার।
প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতায় বীর্যেরা ঝরে
ধুলায়। ভয়ে ভয়ে ছোঁয়া খায় বারবণিতার
কোমল হাতের। মোহাবিষ্ট শতাব্দীর নায়ক
দয়া চায় তক্ষরের। সিংহ চাটে বিড়ালের গা।

কামের নেশায় খুঁজি মনুষ্যত্বের স্বাদ ।
গা ধোয় কাদা-জলে,
নিতম্ব যোনীদ্বার স্বর্গ, তৈরী করে স্বর্গ তোরণ উরুর ।
স্বাগত জানায়ঃ আঘাত করো, আঘাত, সন্ত্রস্ত
বঞ্চিত ক্ষুধার্তের আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করো
নরকঙ্কাল জানোয়ারের দেহ, দেশের আকাশে উড়াল
দিবে শান্তি কপোত, বসবে আত্মার শাখায়,
গাইবে, প্রেমের ভালবাসার কুলুগান ।

২৬/০২/১৯৮৮ টিকরপুর, ঢাকা ।

শুভক্ষণ

অভিনেতা আমি জীবনের পথে এগুতে এগুতে করি
অভিনয়, বায়ুর শরীর আমার একদম হালকা,
টাইফুন তছনছ করে ক্ষুধার অনু প্রত্যাশা,
তবুও ভালবাসার গান শুনাই আমি আজকের প্রতারিত
দোয়েল ।

জীর্ণ কেদারায় বসে ছারপোকাকার জ্বালার কামড়
খাই, যখন 'দু' চোখে দেখি অন্ধকার, দেখি বাঁচার
পথে আলো নাই তখন অন্ধের যষ্ঠি বিদ্রোহী
অথচ ক্ষত বিক্ষত প্রাণ আমার আবদ্ধ হয়ে
যায় আব্ধা অন্ধকার এক দুঃখ দীর্ঘ শ্বাসের
ঘরের নির্জন ফাঁকে, সেখানে তুখোড় বিবেকের
আগুনে পুড়াই, তাবৎ মনের ভালবাসায় মেঝের
চাটাই ।

সেখানে স্বপ্নের চতুর পাখিটি চিন্তা করে
আত্মসাতের ধনীর ব্যাংক লুটের, আলু থালু
চুলের বিলি কেটে কখনও সচকিত আমি
বিদ্যুতের মত আচমকা ঝিলিক দিয়ে উঠি
বেকারের দ্রুত পায়ে পার হই জনাকীর্ণ রাজপথ
জেব্রাক্রশ ।

গাত্রোতান করি নিঃশব্দের ঘরে, আওয়াজ

শুনি ভ্যাপসা গরমের যন্ত্রণাবিদ্ধ কানে-
কোথা পাই হাতিয়ার সাহসী তরুণ যে বেরিয়ে
আসবে অন্ধকার ঘরের মেঝে হতে গড়াতে
গড়াতে পৃথিবীর উপযুক্ত দিবালোকে-
চিবোবে শুষ্ক জীহ্বায় সুবিধাবাদের দেহ
কামড়িয়ে কামড়িয়ে ছিঁড়বে দুধাভ ইঞ্জি ভাঁজ
করা ইজ্জতের বস্ত্র, এক বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
সমস্ত জগৎ করবে ধোঁয়াটে তারপর পাবে,
মুক্ত জীবন যুগের, নিঃসঙ্গ বন্দিরা
আমার বিমর্ষ মন চোখ, উদ্বেগে উদ্বেগে আপ্ত
হয়ে নিঃশব্দে চেয়ে আছে দুর্দিনের ঘাগি
টেনে টেনে সেই শুভক্ষণের প্রত্যাশায়।

১৩/০৪/১৯৮৮ টিকরপুর।

আর নয়-

জীবন থেকে রোগা পাড়ুর অবয়ব জারজ
আমার দেহখানি,
নিঁক না বিদায়, আসুক না মড়ক - মারি
অস্তিত্বের ইতি টানি।
দেখলুম সূর্যটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে
এক রকম প্রস্তুতি ছাড়াই,
দেখলুম বয়সের রথে উঠে এই আমি
কেবল দু'হাতে তাড়াই-
জীবন শত্রু- চেতনার বাঘ কেবল খেতে
চায় বুভুক্ষার নাড়ি সব,
চির অচেনা জন্মদাতা -মানুষ আত্মাহীন
কর্ণে তুলি নি কান্না রব।
পাগলা গারদে আমার থাকা দরকার
তা আমি বেশ বুঝি,
পৃথিবীর ভৌগলিক রাজনীতি, হোলি খেলে

বাঁচবে না মরবে খুঁজি ।
জন্মে, জীবনেও দেখি নি সুখ, পাই নি সুখ,
আমার মানুষ পরিচয়,
আমার আত্মার আক্ষেপ চিৎকার শুনি
বহু সয়েছি আর নয় ।

১৭/০৪/১৯৮৮, টিকরপুর, ঢাকা ।

নির্ভীক আমি

আমার পৃথিবী আজ ঝড় ঝাঞ্জা মুখরঃ
শাঁ শন শন, শন, শৌঁ শৌঁ বজ্র বিদ্যুৎ
তুফান বইছে আমার কলিজায় কাল বৈশাখীর
আমন্ত্রণে।

ছিঁড়ে ফেঁড়ে থাকে আমার মাংশ, গাছ পালা
তরুলতা, কুঁড়েঘর উঠিয়ে নিয়ে যাবে আপন
করতলে আকাশে, আকাশে আপন ইচ্ছায়।

আমি স্থির, ঝাঁকড়া চুল উড়ছে, লড়ছে
পাবনের মহাধাক্কায়- প্রচণ্ড আক্রোশে আমার
হাড়ে হাড়ে স্বাদ পায় টক্কর দিয়ে-

নেতিয়ে পড়ি আমি, অবশ দুর্বল দেহ ছালাম
টুকে মাটিকে। কই, কেউ তো এলো না?

এ জীবন সংগ্রামে আমার দুর্দিনে শক্ত প্রাচীর
হয়ে? তোমরা ঘুমাও. আরও ঘুমাও আরামে

নির্বাঞ্জাট আপাদমস্তক লেপ মুড়িয়ে,

আমি অভ্যস্থ বিষ গলাধকরণে, আলোকের তপ্ত

আঁচ খেয়ে, আমি অভ্যস্থ মৃদু মধুর হাওয়া

গায়ে মেখে, আমি অভ্যস্থ কন কনে শীতে

বৈরাগী জেলে, আমি অভ্যস্থ বাদলের

রক্ত দিয়ে গোসল করে, যখন বৃষ্টির

এক একটি তীর আমার গায়ে বিদ্ধ হয়

তখন আমি আনন্দে নেচে উঠি কিংবা

বড়ো স্বাদে উপভোগ করি তোমাদের দেয়া

জীবন যন্ত্রণা। কই, কেউ তো আমাকে

কাঁদতে দেখলে না। কান্না আবার

কি - ভগবান নেমে আসে নানা রূপে,

গুদ্বি অভিযান নাকি? আমি বেজার

নই আমি ক্লান্ত হই না, আমি দীর্ঘশ্বাস

ও ফেলি না, কেবল আকর্ষণ পান করি

অন্যায় ঝড়ো হাওয়ার মদ বারি, ভীম
বেগে আসা দীর্ঘশ্বাস তোমার আমার নয়,
তোমার তান্ডব নৃত্য আমার শৃঙ্খলিত
বেকারের পায়ে নুপুর বেঁধে ঘেন্নায় ঘেন্নায়
পৈশাচিক আনন্দেই মাতে, ওগো পৃথিবী শুধু
এক টুকরো শান্তি খাইয়ে দিও যখন তুমি কোমল
চাঁদ বক্ষে ধরে আকাশের নীল পেয়ায় তারা
ফুল খোঁপায় বেঁধে মধ্যরাতের কোমল জোৎস্নায় স্নান
সেরে শুঁতে আস প্রিয়তমা চাঁদ ।

২১/০৪/১৯৮৮, টিকরপুর ।

অতএব

দেয়ালের চেতনা কান্না কান্নায় মুহ্যমান
ওর মুখ বন্ধ বোবার তৈলচিত্র এঁকেছে গায়ে
অজস্র শিশু-স্বামী-স্ত্রীর জীবন প্রদীপ সকালের
সোনালি রোদ্দোরে, দুঃখের বৈঠক ঘরে মাথা
খুঁচে, জীবন পেতে চায় ফুটতে চায় কুড়ি,
কাকেরা এখন ভীষণ ক্রোধান্বিত,
ওরা আজ খাইবে ফুটপাতের কলিজা মাংশ
হাড়ি, আর কালো চশমাও চায় উধাও হোক
সুরেলা কোকিল । জীর্ণ কুটির ! ভালবাসার
সাইন বোর্ড ! অতএব, ক্ষুধারত রক্তের রং
দেয়া বাঁশ কোথায়, কোথায়, কোথায় তোমার
উত্তেজনা, উন্মাদনার নিজস্ব লাঠি, কোথায়
চক্ষু কামানের তীব্র গুলি দৃষ্টি, হামলা
করো পঙ্গ পাল, হামলা করো বিদ্যুতের বাল্ব
ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে মাটি, পুড়েছ আরামের শরীর
কংক্রিট হয়েছ চূর্ণ, সবুজ রাবার হয়েছ জ্বতোর
মুড়ো, অতএব, দোহাই তোমার দেবতা ডাষ্ট
বিন ছাড়ো, ঝড়ুক রক্তের বৃষ্টি, কৃষ্ণপক্ষের অমাবশ্যা

রাত আজ, আগুনের চোখে পথ দেখো, পথ দেখো
শতাব্দীর সন্ধানী ইন্দ্রনাথ।

০১/০৬/১৯৮৮, বিজয় নগর, ঢাকা।

সত্যি বলছি

পৃথিবীটা চায় কী আমার নিকট?
হাতে লাগা ধুলির মত, উড়িয়ে দিতে?
কারো ইচ্ছের একটি ফুঁ-ই-স-ব?
সায়াহের একটি পিপাসা আর কোনদিন
মিটবে না?
আগুনের মা বাপ নেই, নেই বাড়ি ঘর, নেই
সময়ের যতনের গন্ডিও, কুত্তার রক্ত
জ্বালাবে, জ্বলবে—
মধ্যাহ্নের ফুল চেয়েছিল জীবন, তাপ-বৃষ্টি-
ঝড়ের খেয়ালি তাবিজ কনুইয়ে বাঁধা কি
সুন্দরের জীবন?
কচ্ছপের কাঁথা পুড়ে
ফেল শান্তি পাবে, সত্যিই বলছি
শান্তি পাবে।

০২/০৬/১৯৮৮, বিজয় নগর, ঢাকা।

সীমারেখা

কোমল মুখশ্রী উদ্যত চেতনায় হয়েছে
চঞ্চল বর্ণাঃ
পাঁকের জলেরা উপোস করেছে বহুদিন,
বহুদিন,
শব্দের বালিয়াড়ি পায় নি শূনার অধিকার
শোষিতের গ্যাস চুলী ভীষণ তপ্ত আজ
জ্বালাবেই, আমলার সিঙ্গারা
অনুভূতির রিক্সারা নব বধূর মত লজ্জায়
মাথা নত করে স্থির দাঁড়িয়ে
অকপট প্রতিজ্ঞা করেছে,ঃ
মানবে না, মানবে না,

ভাংগা পথের আইনগত বাঁধা,
তার নরম যোণীর এবার ভাঙ্গবেই তালা
সহ্যের সীমা রেখা খেয়ে মজুরের ভেজা
ছাতা ফেলে শিকের চোখে ফেলে অশ্রু ফোঁটা ।

২৩/০৬/১৯৮৮, বিজয় নগর, ঢাকা ।

আছাড়ি খত

বন্ধু বলে কী লিখব কী যে কবিতা,
দারিদ্র্য কেড়ে নিল আমার 'সবিতা' ।
সারাদিন মোর পেটে ছিল না ভাত,
ভাবছি নির্ধুম ক্ষুধায় কাটে না রাত ।
নিত্যদিন শুনি অত্যাচারীর হাঁক ডাক
পিষে মারতে চাহে-ভীষণ উঁচু যার নাক ।
ছিন্নমূল আমি পথে ঘাটে চড়িয়া খাই,
না আছে বংশ সম্মান পদ মর্যাদা, ছাই ।
দেশ ছাড়িয়া অধিকার, যাই কোথা বল,
এত বড় দুনিয়ায় নাই স্থান ফেলি অশ্রুজল ।
যত শক্তি আছে যত শোষিতের গায়ে,
যত মুষ্টিবদ্ধ হাত আছে ছুঁড়ে দে বায়ে ।
বল ছাড়িব না, যত পাই দেনা, দায় দেনা
ভাত -কাপড় কাজ চায় কে- না কে না?
কাঁপিয়ে দে, গদীতে আসীন শয়তান যত,
অষ্টপ্রহর যারা নৃ অধিকার গ্রাসের চিন্তারত ।
মনে জ্বলে দে আগুন, ছিঁড়ে দে চক্রান্তজাল,
থু-দে মুখে, লাথি মার বুকে, দেয় যারা তার তাল-
যত আমলা কামলা, হটকারী যত স্বৈর সাথী,
পশু এরা চির শত্রু মোসাহেব চিহ্নিত জ্ঞাতি ।
চিনেছি পথ ভয় করি না কারো আর কারো,
হিন্মত কর দন্দ সংসয়, ছাড়ো বুক দম ছাড়ো
ফুঁ দে আগুনে মেঘে বায়, বর্জ ডংকা বাজায়
দেখ তুই না চাইলে কে তারে চায় আর কে চায় ।
দুর্জয় শপথ আজ, ঐ শুনি ডাক আত্মার ডাক,
এক টিল মারি তাড়াব যত, মরা খাওয়া কাক ।
দৈত্য নয়, হাতে আছে নব যুগ তার ধারাল বাণী,

নেকাব খুলে ওরে হীন দেখ অগ্নি দৃষ্টি হানি-
সামনে পাথার মাথাল মাথায় কৃষ্ণাণ রোদে,
নাবিক হতবাক, দুঃখের ঋণ জনম ভরে শোখে।
সুখের মানিক কে লয় কুড়িয়ে, কে চেয়ে থাকে,
আশা-শাবল হাতে আছাড়ি খত দিব তার নাকে।
চাহিবে যে বেশি- লুটিবে যে মনের অব্যক্ত কথা,
বাগাড়ে স্থান তার -দেখি মৃত্যু ছায়ায়, তাকে তথা।

২৩/০৬/১৯৮৮, বাঘমারা, ঢাকা।

এক মুঠো ভাত

এবার প্রাণের দুর্দান্ত বাতাস
শন শন শন উড়িয়ে দেয় সম্ভার
দুশ্চিন্তার এলোমেলো চুল,
যাও, ছুটে যাও, সঞ্চয়ের আমেজে,
জীবনের ভরা নদীর গা ছুঁয়ে।
আসুক বান শুষ্ক হৃদয় পাথারে
অস্ত্রের তট হোক উশ্জ্বল
বেঈমান দূরত্বের হোক অবসান
সামনে দেখি এক মুঠো ভাতের
দীপালী উৎসব মেলা।

২৬/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ বাঘমারা, ঢাকা।

আমার ভূগোল পড়া গোল হয়ে

আমার ভূগোল পড়া গোল হয়ে এখন দেখে
আমার পরীক্ষার মর্যাদিক দৃশ্য; ভালবাসার
শাদা দেয়ালে প্রিয়তমার বেদনার্ত তপ্ত হাত
চালনায় চাবুক মারে, কাঁপিয়ে গোটা পাঠাগার
কোষ। দৃষ্টির সিলিং ফ্যান যেন তার জীবন
জিঞ্জরার অক্লান্ত চরকা, মনের দুর্বায়ু কেবল
ঘুরছে ঘুরছে অনবরত, বর্ণমালার মনোযোগ
উধাও আহত কলম হয় বর্ণচোরা কোন বিধবস্ত
কবির দুঃখ স্বপ্ন, দীর্ঘশ্বাসের স্নেহরস

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-২৯১

ভালবাসা আছাড় খায়, মূর্ছা যায় সমাজ
আর টেবিল কেদারার সম্মানিত অর্থের পদ
যুগলে-

তোমায় ভাবিয়া লাভ কি? বিরাগ আক্ৰোশে
ফাটিয়া পড়ে কাঁদিয়া যায় চেতনার শাট-

পারিলাম না বর্ণমালার বুক চিরে কারো

হাত ধরে অঙ্গীকার রাখিতে, মহাযুগ

ফিরে যাবে, ফিরে যাবে, কাঁদিয়া বইয়ের

শেলফে-তোমার আমার আছে প্রয়োজন

মিলনের, আত্মশক্তির সফেন

তরঙ্গ আনমনা, তবুও তবুও দুটো

হৃদয় টেখিস সাগরে ভাসে হিমালয়

পাষাণ গিরি,

ইতিহাস কথা কয়, দুজনেই আজ একটি বৃত্তে

দুটি ফুল নির্মল হাওয়ায় ফুটবো স্বপ্নের বিটপে

কিংবা নিলীমায় হব উধাও, কালো মেঘ সূর্যতাপ

পিঠে রেখে বুকে নেব উপগ্রহ চন্দ্রতাপ।

কলিজার রক্ত খয়েরী রঙ মাখানো

ইট কখনও প্রচন্ড-ঝড় ভাঙতে চায়-

গিরিশৃঙ্গ-

তাই আমার ভূগোল পড়া গোল হয়ে

এখন দেখে মর্যাদিক দৃশ্য ভালবাসার

শাদা দেয়ালে।

৩০/০৮/১৯৮৮, শাহবাগ, কেন্দ্রীয়পাঠাগার, ঢাকা।

অস্তির পৃথিবীর জীব

পৌষের মিষ্টি সকাল, ছুঁয়ে যায়, মিশে যায়

টাকার উদ্ভিগ্ন কলিজায়,

রোদ ঘুমায় আরামে পেলবিত সরস

মাটির শীতল জিহ্বায়-

একটু আগে যে চরকা ভীমগুলো ছিল

নিরব নিষ্কাম ব্যথাতুর,

দিনের আলোকে পেয়েছে প্রাণ, চিন্তিত
ভালে ভর করে বুভুক্ষা চোর।
মাছ রাঙা ধ্যান মগ্ন একাকী, বদলানো
পৃথিবীর নানা রঙ গায়ে তার দেখি-
সম্মিত দুঃখ, অর্জিত সুখ, প্রতিযোগী বিটপ যেন
বিধ্বস্ত সবুজতাকে আঁকে তাই লেখি-
এ যুগ আমার ডানপিঠে কিশোর ঘুড়ি নয়,
সে নিজেই অনন্ত গগনে, উড়ে
চটপটে তরুণ, সতেজ অরুণ, দৈব শক্তি তারই
ভয়ে, যুগ ভয় যায় বহু দূরে।
বিস্মল চেতনা মগজে চায়, আর-
যক্ষ্মা সম্মানের বীজ হয়,
গতিশীল মিগ বন্ধুর ভূতলে ফেলে তাই
বিষবোমা সেই তারে খুঁজে পায়।
সরল পৃথিবী কেঁদেছে বহু দিন, এবার জটিল
হলো আপন ইচ্ছায় কাঁদাতে মানবে-
হাল মাস্কুল ছাড়া, ফ্যান ইঞ্জিন ধরো, মৃত্যু
উর্মি করিবে জয় যুদ্ধ কাতর জ্ঞান দানবে।
পালাতে চাই পারি না তাই চেয়ে থাকি ভাই,
কেমনে করিব আমাকে আর জয়,
কালের গ্রাসে মানুষের গ্রাসে শুভ চেতনা কি
আর হবে না কোন দিন উদয়?

২৩/১১/১৯৮৮, দিঘীরপাড়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

বিচারের তলোয়ার হাতে

ছিন্নমূল বটের ইশারা, ঐ দিগন্তে তেপান্তরে
পড়ে আছে যেমন তার ইতিহাস কে রাখে ?
যেখানে সীতার গাত্রদাহ হয়েছিল কোথায়
সেই শ্মশান ?
বেলাশেষে সূর্যটা পথভ্রষ্ট, চাঁদনি
রাত নাকি এখন হয়েছে দিবার কলিজা
সেই নাকি গ্রাস করবে এখন সমগ্র জগৎ।

স্বৈরাচারিণী পসারিণী নারীকে রুখতে হবে
সময়ের রঞ্জু দ্বারা, যে আজ দিশেহারা
আপন ভুলে সে দেখছে ধ্বংসের একবিংশ
শতাব্দী দস্যু সেনাপতির পথ, তার পথ
হিমাংকের নিচে, অলসতা তা তারই।
আজ মনে পড়ে সেই বেদনার কালরাত
যেখানে তারা দুজন ছিল, নূতন ইতিহাস
সৃষ্টি করতে সেই নিচতায় যে দু'পায়ে
দলবে জীবন; হবে পিশাচী
হে পৌরুষ, হে সূর্য, রক্ষ স্বাধীনতা
রক্ষা করো, আজ চাঁদনী রাত
ছান্দসিক কবির হোক দীর্ঘজীবী
সয়লাব হোক পৃথিবী, মৃত্যুঞ্জয়ী
প্রেমের মহিমা ধারায়।
আজ আমি, প্রতীক্ষারত, প্রতীক্ষারত
কোমল চাঁদের-নবীন কুঁড়ির প্রত্যাশায়-
অঘুম চোখে, বিচারের তলোয়ার হাতে।

১৩/০৪/১৯৮৯, দক্ষিণ ধনিয়া, ঢাকা।

এ ভাষায়

প্রভাত ফেরী, প্রভাত ফেরী, করি গেয়ে গেয়ে মন্দ্রগীত,
প্রাণের শপথ! গড়িব ভাষার স্মৃতিসৌধ ভিত,
বীর জাত বাঁধ ভাঙ্গা বান মোরা পঙ্গপাল,
মাতৃভাষায় মিটাই মনের ঝাল,
সুধাই প্রিয়জনে বুলি,
হৃদয়ের দুয়ার খুলি,
এভাষায়,
মমতায়।

২৭/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ

(টিকরপুর, শহীদ দিবস উপলক্ষে আনোয়ারা ইয়াসমিন।)

দূর্যোগ তিমিরে

শাদা দিগন্ত যান্ত্রিক শব্দাবলী অজ্ঞাত এক
কবির আয়ু নির্ঘাত খেয়ে ফেলেছে।
সে এক দুশ্চিন্তার জলযানে হামাগুড়ি
দিচ্ছে, চির সঙ্গিনী, চির সঙ্গিনী,
ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দৈন্যতার বাড়, এখন
রক্তাক্ত হৃদয় আগ্নেয়ায় দাঁড়িয়ে।
কবি তার দুর্দিনে সংসারের কীটগুলো
মস্তিস্ক খুড়ে খাচ্ছেঃ
আজও ব্যস্ত রাত্রির পিঞ্জরে
স্বপ্ন দেখেঃ
পরাজিত সম্রাট হুমায়ূনের মতন,
নদী শিকস্থির শিকার !
সামন্ত প্রজা !
নিঃসঙ্গ পথিক
উঠে পথ রুখে দাঁড়াও !
অগ্নি, মশাল হাতে বুভুক্ষা শ্রমিক মিছিল !
দূর্যোগ তিমিরে আচ্ছন্ন টাকার কৌশল আজ।

১৮/০৫/১৯৮৯ খ্রিঃ দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা।

কবিতার লাশ

আমার কবিতার বাক রুদ্ধ প্রায়
অর্থের শাপ কারাগারে,
আমার চিন্তার স্রোত গতিহীন
দূর্মতি নদীর অত্যাচারে।
ঘর সামরিক অস্ত্রাগার হয়ে,
ঘৃণীরাড় বেদনার শৃঙ্খল পায়।
অসংখ্য লাশ প্রতিভার, কবিতার
দুর্দিন-অন্ধকারে লেখা,
ইচ্ছার অধিকার সৈনিক বেশে ঐ
কপালে দৈন্যের তিলক রেখা।

আবাস স্নানাহার হারিয়ে,
দেখ দেখ কাকে, কে হারিয়ে-
আমার সুন্দর সন্তান ঐ ধরনী,
পেঁচামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে,
বলছে কবিতা কেন আসলে হে,
লাশের দরজা মাড়িয়ে।

১৮/০৫/১৯৮৯ খ্রিঃ দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা।

আগুন জ্বলবে, জ্বলবে জ্বলবেই

আগুন জ্বলবে, জ্বলবে জ্বলবেই,
জীবনের ঘরে, যে ঘরে বাস করে
রোগ শোক অর্থহীন ভাবনা
আর আফ্রিক গতিতে যে সময়ের বাতাস
দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে না
যেখানে আদম বাঁচে না, সেখানেই আমার
বসবাস। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্ডার
সেই আমি-
আগুন জ্বলবে, জ্বলবে জ্বলবেই, নারীর
কোমল দেহ পুড়ে, নিয়ে আসবে নির্মল
ভালবাসা, সেই আমি শাহজাহান
আমার মানসপটে, চিরায়ত তাজমহলের
রঙ আছে-নিরস আরাধনা,
পরাজয়ের স্রোতহীন নদী
আমি নই, আমার সে কানে
আজ পৃথিবীর তাবৎ অজগর বসবাস করে
মনও বাহুর শক্তি দিয়ে সেখানে আনব
দুর্জয় চেস্টিস খা,
আগুন জ্বলবে, জ্বলবে, জ্বলবেই
মৃত্যুর নিশানঃ যে গোরস্থান হাত-
ছানি দেয়- সেখানে আমি নেই, সময়
যেখানে মটেম হয়, বিজ্ঞানের যাদুঘর
সেখানে আমি নেই,

আমি আছি
সময় ও দূরত্ব অতিক্রম কারী
আয়ুর জগতে । আমার মরদেহ
মৃত্যুঞ্জয়ী পৃথিবী-সেই অনাগত
তত্ত্বের আদিবাস আমার হৃদয়,
আগুন জ্বলবে, আগুন জ্বলবে, জ্বলবেই,
যেখানে আমি আছি,
সেখানে আর কেউ নেই,
সেখানে আর কেউ নেই,
সেখানে আমার দাস্তিক জীবনের
উচ্চারণ
আগুন জ্বলবে, জ্বলবে, জ্বলবেই ।

২৪/০৪/১৯৮৯ খ্রিঃ দক্ষিণ ধনিয়া, ঢাকা ।

আমাকেই চায়

অতিন্দ্রীয় কল্পনার দিগন্তে অঁথে
জলে কম্পমান এই জীবন, কবিতার
অনুপম হরিণ আমিইঃ নৈমিত্তিক
যে বিষ পান করে দুশ্চিন্তার জীবন
বন্ধন শাদা অম্বরে পিক ফেলে করে
খয়েরী আর বিস্তার করে ক্ষুধার জাল
স্পষ্ট দিবালোকে অমাবশ্যা রজনীর ইতিহাস ।
পৃথিবীর বিভ্রান্তি কোণে এসেছিলুম
এই আমি, যার তুলনা চলে নর্দমার
জলের সাথে, জ্ঞানের সমুদ্রে
যার মেলামেশা, যার আশা নেই
অর্থের ডামা-ডোল বাজানো
যার ক্ষমতা নেই, আমি সেই অজ্ঞাত
গাঁ- ছুটাছুটি করি, বর্ষা-বন্যায়-খরায়
জীবিকার পা ধরে, ইচ্ছে করে কেড়ে খাই
এই প্রান্তরের তাবৎ ফসল আমিই, হায়,
আমাকে ধরে রাখে পুরনো ইতিহাস, শতাব্দীর
লেজ ধরে কোটি প্রাণের চক্র,
যদ্যপি আমাকেই চায় কেন ?

২৪/০৭/১৯৮৯ খ্রিঃ দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা ।

সুখ দাও প্রাণে

মৃদু মন্দ সমীরণ কানের ধারে গেয়ে যাও সুর-
সুর গান- ধীরে ধীরে উপযুক্ত প্রান্তর খোলা
আকাশের নিচে- দাও শান্তি,
আমাকে বঞ্চিত করো না তোমার অকৃত্রিম
আদর হতে, দাও প্রাণের উষ্ণ সর্ষধনা
উড়ন্ত বলাকা রাখা পাখা নেড়ে নেড়ে ক্লান্তি ভরা
গোধূলী লগ্নে, আমার এ ভাংগা বুকো ।
শুধু এ সময়টায় আমাকে ডাকতে দাও ঝাঁঝের
মত স্বাধীন ভাবে, আমার প্রাণের সবুজ
শ্যামল মাকে বড়ো আরামে- দুঃশাসনের দেশে ।
আয়, আয় ওরে আমার বুকো আয়, দু'চোখ
যত দূরে যায় সব নিয়ে আয় বুকো,
ভুলে যাই শিশু হস্তার কথা-যখন
ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির । হয়ত
ওরা ভাবে প্রকৃতির এ শিশুটি বুঝি
প্রবঞ্চনার জগৎ হতে আশ্রয় নিতে চায়
অনন্তধামে ধীরে, দৃষ্টি সীমা থেকে
হারিয়ে যাওয়া পথিকের মতন ।

২২/০৬/১৯৮৭, টিকরপুর, ঢাকা ।

নদী ও সাহেব

দূরন্ত দুর্দর্শম ঢেউ রাশি রাশি অজানা গন্তব্যে চলে ভয়াল
সাপের মতন ফণা তুলে বেঁকে- যুগযুগের বাসিন্দা-
কৃষাণের সবুজ ঘেরাবাড়ী আর আশার ফসল মাঠ ভেঙ্গে,
উধাও চোখের মনি ভরে সফেন ঘোলাটে নদীর জল ।
তারপর নদী শিকস্থির শিকার- কৃষাণ ভিড় জমায়,
পথে ভিক্ষুক বেশে, ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে উঠে রহিমার
কোলের শিশুটি আচমকা চাপে-
ক্ষুদ্র নৌকো থরো থরো বিক্ষুব্ধ তটিনীর উপর অনুকম্পায়

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খণ্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-২৯৯

স্থির। জলরাশির বুক ধড়ফর করে, সাহেবের রাগ-
প্রসূত গর্জনের দাপোটে, শরীর মন নেতিয়ে পড়ে, কলমের
খোঁচায়, জীবন নৌকো ডুবে যায় কখন কুলহারা,
আষাঢ়ে নদীর গর্ভে। বাঁধে নদী অচঞ্চল স্রোতহীন
শান্ত হয়, সাহেবও বাগে আসে
রাঘব বোয়ালের সতর্ক টেলিফোনে।

২৩/০৬/১৯৮৭, সৈয়দপুর, ঢাকা।

দ্বীপ জেলে যাই

স্বপ্ন জীবনের সন্ধিক্ষণে রেখে যাই কিছু স্মৃতি,
আজীবনের স্বপ্ন মোর রয়ে যাবে স্বকীয় কীর্তি।
ওরে, প্রাণের আবেগ, বিচিত্র ধরণীতলে তোর,
কত রূপে দেখেছি তোমায়, হয়েছি কত বিভোর।
কত রূপ শোভা তোমার, তুমি কি যে মনোহরী,
মরে যাব আশা নাই, সবাইকে আমি পরিহরি।
সময় সময় তুমি শুধু থাক সবার হয়ে।
তাই আমি রেখে যেতে চাই, কবিতা মোর,
আগত সকল সৃষ্টি রূপে, করি বেদনা বিধূর।
এই যে হৃদয়ের শতরূপ, তার অমৃতধারা,
চিরকাল কথা বলে যায়, যার সনে আছে প্রবতারা।
স্মৃতি হয়ে থাকব, নচেৎ বিলীন হব, কালের গর্ভে,
এই আমি, সেই আমি নব জন্ম নেব, হয়ে মানব-গর্বে।
এসেছিলাম চলে যাব, নেই ডর কালক্ষয়ে।
আমি মানুষ, অনুভব করেছিলাম মানুষের দুঃখ ব্যথা,
জীবন শেষে বলে যাব, দিয়ে যাব উপহার স্মৃতি কথা।
আমার মনের মত সৃষ্টি দেখে ছিলাম যাদের,
তাদের মাঝে রইব আমি, হয়ে আমি তাদের।
যে মানুষ দেখিনি, দেখিয়াছি, দেখিব, হয় তবু
সোহাগ ভরা আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরিব, ভুলিব না কভু।
এই আমি, সেই আমি চিরকালের আমি-

হৃদয়ের বিচিত্র রূপ প্রকাশে হয়েছি কি আমি সফল ?
জানিনা- জানি, ওরে জানি, শুধু আছে বুকে মোর বল ।
মনের সতেজ সহজ সত্য রূপ দিয়ে, এঁকেছি এ জীবন,
কল্পনা নয়-মূর্ত বাস্তবে যা দেখেছি, করেছি তা সৃজন ।
হৃদয়ের তারে দ্যোতনা বেজেছে, আমার বার বার,
অসহায় মানুষের কাঁদনে- কেঁদে হয়েছি কত অঙ্গার ।

যুগে যুগে, নিরবে দেখেছি আমায়, দয়াময় অন্তর্যামী ।
দীপ জ্বলে যাই, আমি যুগে যুগে জ্ঞান আর শক্তির,
দীপ জ্বলে যাই, আমি যুগে যুগে পথে, মুক্তির-ভক্তির ।
যে দীপ নেভাতে চায়-মানুষের অহংকার হিংসা ঘেষ,
যে দীপ নেভাতে চায়, অসৎ-অন্যায় কান্না অশেষ ।
আমি সেই আমি, বরাবর দিগন্ত জুড়িয়া মোর,
পাখা মেলি একাকার হই, আপন করি সব সুরাসুর ।

কালের বার্তা বহিয়া আনি, বারে বারে- ।
হীনতার মাঝে আমি মগ্ন করিনা শির,
শত্রুতার মাঝে আমি সর্বদা মিত্রতার নীড় ।
অভাবের মাঝে আমি সর্বদা, মন-ধন ভান্ডার,
আত্মা আমার বিশ্বজুড়ে, বিলীন একাকার ।
যাদের আঁখি দিয়ে অশ্রু ঝরে, যন্ত্রণাকাতর যে নর,
আমার হৃদয় দীপখানি জ্বালিয়ে দেব-পাথর,
গলে যাবে মোম সম, ধরায় একেবারে ।

২৮/০১/১৯৮৬, বাহরাম খান পাড়া, রাত ১২.টা ।

হৃদয় যমুনা

হৃদয় যমুনা আমার স্বচ্ছ সলিলে ভরা,
আষাঢ়ে বারি ঢল নামছে, করে তারা ত্বরী ।
ছাওয়া তরী দিয়ে নায়রী বাপের বাড়ী যায়,
উচ্ছল ঢেউ উঠে সে যমুনা কনকনে শীতলতায় ।
লোক আসে যায়, খানিকক্ষণ, দাঁড়ায় কেহ নাহি,
দেখো, আমার রূপরস গন্ধ দিকে নাহি চাহি ।
দেখো, সকলি ধরার, চেয়েছিনু তোমায় সখা,
বুঝিতে সুখ দুঃখ, বুঝিতে আমার ভাগ্য লেখা ।
হৃদয় যমুনা কে এলো যেন, হিল্লোলিত হৃদয় ছন্দ,

ভেঙ্গে চুরে দৃষ্ট মনখানি, নিয়ে তালা দিয়ে করেছে বন্ধ-
সে কোন্ রমনী বুঝিতে পারিনা-আমার, কি হল আজ,
সরলা বালিকা পরালে মোরে, প্রেমের মহীয়ান তাজ।
নিজের অগোচরে ভালবাসি কারে, কি জানি, কি জানি,
রঙধনুর সাত রং দিয়ে এঁকেছি তার নাম, দেবী, মানি।

২৮/০১/১৯৮৬, বাহরাম খান পাড়া

বসন্ত চলে গেল

বসন্ত চলে গেল, বসন্ত চলে গেল,
নেই প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য, সেই মৃদু সমীরণ, দক্ষিণা
দুয়ার খুলে আজ পাইনা সেই প্রস্ফুটিত ফুলের সুঘ্রাণ
কোকিলের সেই মধুর কুহুতান আজ বহুদিন শুনিনি।
শ্যাম প্রান্তরের বটতলে রাখালের মন মাতানো
বাঁশির সুর পাই না, ছায়া ঘেরা বাটি, সেই
শন ঘরে গৃহ বধূটির প্রাণে সুখ নেই।

সেই পাল তোলা নায়ের মাঝি, গ্রীষ্মের প্রচন্ড
গরমে-উদাস সুরে গায় না গান।

কাল বৈশাখীর করাল গ্রাসে কেড়ে নিয়েছে
আমার ছেলেটি-
তাই বসন্ত চলে গেছে, জীবন হতে খসে,
আর দিয়ে গেছে গঙানি আর দুর্ভিক্ষের ছবি।
ধূ ধূ খরায় পোড়া প্রান্তরের মতই মনটি আমার,
বসন্ত চলে গেল,
আহা, আমার সেই প্রানের বসন্ত চলেই গেল,
বুঝি কাঁতুকুতু দিয়ে, জীবনের সূচনায়।

২৮/০৪/১৯৮৬, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

হে কবি হে বিজ্ঞানী

হে কবি, তোমার পিপাসা আমায় করেছে
বিস্মল মূঢ়; করে নি কিছুটা দৃঢ়।
হে কবি, তোমায় দেখেছি কল্পনালোকে
অচিন্তনীয় শূন্য জগতে, তোমার প্রিয় স্নিগ্ধ তরুলতায়,
সুন্দরম তুমি সরলতায়,
বিমূর্ত মূর্তির মত শূন্য চেয়ে থাকি
বহুদূর নিয়ে যাও,
কালে কালান্তরে-

হে বিজ্ঞানী, সকল বাধা তুড়ে তোমায় দেখি
সত্যে-সত্যের জগতে ।
তুমি রুঢ় বাস্তবতা; তুমি প্রাণ শূন্য;
পরীক্ষা- নিরীক্ষা তোমার নেশা,
তোমার বাসনা প্রচুর জগতের ঠিকানায়
তুমি থামনি কখনও
তাই দেখি চন্দ্রলোকে- অসীম বিশ্ব ভ্রম্যন্ডে
চূড়ান্ত বাস্তবতায়, সভ্যতা, তোমার সন্তান
শত চেষ্টায় তিলে তিলে গড়েছ তুমি
অধুনা বিশ্ব ।

০৮/০৪/১৯৮৬, ৫১ পুরানাপল্টন, ঢাকা ।

শাপ

ভাবিতেছি হায়,
একটি তুচ্ছ বালুকণা সেও থেকে যায়,
একটি ক্ষুদ্র তরুলতা- জীবন ফিরে পায় ।
নীল গগন মহাকালের স্বাক্ষী যে রূপে,
সুন্দরের কথা বলিয়া যায়, সে চুপে চুপে ।
সৃষ্টিতে আমার, বিন্দু মাত্রও প্রেম নেই তাই,
রহস্য সন্ধানে বের হতে, কোনদিন মন চায় নাই ।
আত্ম প্রবঞ্চনার সায়,
গডালিকা প্রবাহের মত ঘুরেছি, বিশাল দুনিয়ায়,
ছিল না কোন স্বাদ -শান্ত্বনা, সময় শেষ হয়ে যায় ।
কে বলেছে সব সত্য, কোনদিন মনসিজে, হায় আমি,
বিশ্বাসী নই, তাই হই নি আপনার কল্যাণকামী ।
অমনি সময়ে যখন আমি, পৃথিবীর বেড়া জালে,
টনক নাড়িয়ে দিলে কে, সজোরে আঘাতে ভালে ।
এখন দেখিতেছি আশা,
মনসিজের মূল্য আছে- আছে, মরমী কবিতার,
লেখায়, দু'টো কথার মূল্য তুলনা পাওয়া ভার ।
ভাল কি, না ভাল, জানে কেবল, আমার অন্তর্যামী,
কবি আমি, যাহা ভাবি ভাল, বলি তা শুধু আমি ।
এ অধিকার দিলে কে, কবে, মানুষ করিবে বিচার,
আমার কথা, জানি সেতো, ধনিকের প্রতি অত্যাচার ।
আহা মনে করে বাসা,
কেন কর আমার আশা, হে পাষন্ড পশু,
আমাকে তোমার দিকে ভোলাতে, এত স্বাদ কেন তবু ।

কেন, মনের কথা কেড়ে নাও তুমি বার বার,
কেন, আমায় ছোট কর, দিয়ে তোমার শিষ্টাচার।
আমি ঘৃণা করি, তোমায় হে অন্যায়, পৃথিবীর পাপ,
তোমার পতন অনিবার্য, রইল আমার অন্তরের শাপ।

১২/০৫/১৯৮৬, বাহরাম খান পাড়া, ঢাকা।

নদীর মায়া

অমলিন সবুজ লতা, মৃদু সমীরণ ঢেউয়ের, দোলায়িত নাচন,
প্রশান্তময় আবহে, পালের নাও ছুটে চলেছে, শুদ্ধ, তার বাঁচন।
সারি সারি পাট ক্ষেত নদীর, দু'ধারে তার শন বন, কাশ বন
পানির বান্ বান্ বানন্ শব্দ, বোট চলে, ইঞ্জিনের শব্দ বান সন্।
দিপালী উৎসবের আনন্দ, যেমন স্বাদে ভরপুর আছে, কাছে
এরই মাঝে না পেয়ে কিছু-ভুলিয়াছি সত্য পাছে পাছে পাছে।
বিক্ষুদ্ধ তরঙ্গ আর পালের নাও সবই যে পর, নাকি আপন স্বপ্ন,
বহুদিনের জানাশুনা, মায়াময় শাপে বর। দূরন্ত ঐ দূর চরাচর।

খন্ড খন্ড মেঘগুলো ছেড়ে যাব-এই ভেবে মনে,
কিছু ভাল লাগে না, কেঁদে ওঠে মন, ক্ষণে ক্ষণে।
আর অল্পদূর, যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে, আজ তাই,
ততই বাড়ে মনের বেদনা, কেমনে, তোমায় ছেড়ে যাই।
সারি, সারি, বড়িগুলো দু'ধারে গাঁও, ঘোলাটে জল,
কথা বলিতে চায় কাছে, বাঁকিয়া শ্রোত, কল্ কল্।

ভাবনারাশি জেগে উঠে মনে, দেখিয়া সব এইসব,
খট খট ইঞ্জিন-শব্দ, কাড়ে সব-মনের সুন্দর অবয়ব।
আমি চলেছি তারই সাথে, বিক্লু হয়ে, মায়া জালে পড়ি,
স্রোতস্বতী, লয় হোক সত্তা আমার, তব অমৃত পান করি।
মায়াবিনী তুমি ঘোলাটে জলে, সাগর মোহনায় ফেলে,
ধন্য করো ধন্য, শেষে সাগর তলে-বেড়াব হেসে খেলে।

২৫/০৬/১৯৮৬, টিকরপুর।

পূর্ণিমা চাঁদ

চাঁদ, চাঁদ, চাঁদ, তুমি সুৰভি কর বিলাও মনে,
মনের আকাশে দিয়ে যাও, সাধ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার গোল সুন্দরম মুখচ্ছবি দেখি যেন ভুলে,
হৃদয় আকাশের খোলা চাঁদখানি, রাখি সদা খুলে।
পেলবিত মোলায়েম কোমল কিরণে আকুল পরাণ,
চাঁদ, হে চাঁদ, তুমি আজ আমার খুঁজে, কেবল হও হয়রান।
কেবল আমারই হয়েছ আজ, তোমায় দেখি বার বার,
যেন তোমায় দেখিবারে পাই, দু'চোখ মেলে, কিছু নাই আর।
কত সুন্দর তুমি, দেখে আমার ভরে না মন-প্রাণ,
সাঁধ জাগে সারাটা জীবন ভরে, পাই যেন মধুময় ঘ্রাণ।
তুমি রসিক শেখর, আমার প্রাণে জ্বালাও প্রভা ও সুর,
তুমি আছ চির দিন, বাসনা সাধনা হয়ে, নিয়ে প্রেমডোর।
তুমি নও এ প্রাণের শুধু- সকল প্রাণের আলো,
মনের বাসনা হয়ে, বলে যাও কথা, কত যে, ভালো।
যদি মনের আলো জ্বালিবারে পাই তোমার সমান,
আমার জাগিবে না আঁখি, মুদিলেও নাই কোন অভিমান।
মিলিয়ে যাব জগৎমাঝে, হে চাঁদ, তোমার রূপ হয়ে,
তোমার কথাই বলে যাব, আমার মৃত্যু-লয়ে।
তোমার আমার মাঝে বাধা ছিল হোক -কালো,
তুমি আমার সাধনা, সারা জীবনের শ্লিষ্ট আলো।

২৬/০৬/১৯৮৬, টিকরপুর, ঢাকা।

অন্তরে অনুসন্ধান

বয়স বেড়েছে আমার, হায় বাড়ে নি মানসিক শক্তি,
আমাকে দেখে কভু আমারই আসে না ভক্তি।
এই তো, সেদিন দেখলাম কত শস্য ফলমূল,
এসে আমার দেহে, বাড়িয়ে দিল শরীর, করিয়া ভুল।
নিজে পারি না বলিতে, করিতে কিছু কিছু সৎ কাজ,
হায়, কখনও ইচ্ছে করে পারি নাই পরতে জ্ঞানের তাজ।
কত রূপ শোভায়, কত আনন্দের খেলা খেলে হায়,
শেষে চলিয়া গেলাম পরলোকে-কাঁদে বুক শূন্যতায়।
জীবনের কত রূপ দেখে, অন্তরে জ্ঞানী গুনীজন,
মুখরা সব অন্ধকারে মুখ গুঁজে, পায় জঙ্গল বন।

দু'ফোটা অশ্রু আর শক্তি বীৰ্য সব যেন হয়,
কালের অতল গর্ভে মিলে একাকার হয়ে যায়।
দেখি কত মানুষের খেলা চলে, কত আনন্দে,
সেই মনে সাথে মিশে যায় দোলায়িত শত ছন্দে।
মানুষের মন আর প্রকৃতির সব নিরব কথা,
যত আমি বলে যাই, ততই বারে আমার ব্যথা।
কেন যে, আমার ব্যথা আর আমার সব দুঃখ,
তাদেরই যেন যে দুঃখ, যারা মৃত প্রায় অর্ধ বুভুক্ষ।
আমি থাকিব না, থাকিবে আমার কবিতা, আশা,
নিরবে করিবে চাষ অন্তরে, পাখিসম বিটপে করে বাসা।
ল্লিঙ্ক তরু ছায়া আর সুরম্য মোজাইক অটালিকায়,
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে ধনী-নিঃশ্বের হাড়ি শিকায়।
আবার রৌদ্র দহন আর বরষায় ভিজে, আহত চাষী,
ঠেলাগাড়ী ঠেলে, মুটে খায় যত অখাদ্য-বাসী।
আমার অন্তরে কখনও করিনি সন্ধান, আছে ধন,
বুঝি অপরের ব্যথা, থাকিতে হৃদয়, সত্য রনাজন।
অপরের অন্তরের কথা বুঝিব, আহা সে, সাধ্য নাই,
কেন বিনা হিসাবে অপরকে, আমাতে মাপিতে চাই।

৩০/০৬/৮৬- টিকরপুর, ঢাকা।

অন্তিম উচ্চারণ

আজ উদাস মনে বিহঙ্গের মত ঘরিয়া আকাশে,
মেঘের মত উড়িয়া প্রবল ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বাতাসে।
এক অজানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে, চলোছি যে আমি,
আমার খবর রাখি না আমি-রাখে সুদূর অন্তর্যামী।
সীমাহীন ধরণীর সাঁঝের মায়ায় জড়িয়ে দিক চক্রবাল,
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, কবে শেষ হবে আয়ুষ্কাল।

অন্ধকারের এক অশনি নিশান তুলিয়া হয়,
ধরিয়া রাখিয়াছি, আমি আজ ঈশান কোণায়।
কেবল জানি আমার জীবনের দীপ নিভে যায়,
আমার অস্তিত্ব আমি খুঁজি হয় আজ কোথায়।
আসিল না প্রিয়, দেখিলাম না তার কায়া,
বিস্ময় নেত্রে চেয়ে আছি দেখি অদ্ভুত ছায়া।
যেন সে মানব নহে-এক কালিমূর্তি নির্বিকার,

বলে চলেছে, কে ওই, শুনি কার রুদ্র চিৎকার।
অন্ধকারে যার বাসা, দুঃখে গড়া জীবন যার,
জীবনের মাঠে জাগিয়াছে, নদীর চর হাহাকার।
শূন্যে ডানা মেলে উড্ডীয়মান আমার শুকপাখি,
পানি নাই, পানি নাই, সদাই কাকে যায় যেন ডাকি।
পাই না জীবনের ছোঁয়া, পাই না কারও দেখা,
জীবনে যাকে চাইতাম, আঁকিতাম যার কল্পনা রেখা।
কোথা যাই, অস্থির কোথা ঠাই, কিসের লাগি,
কেবলি স্মরিয়া মরি, দুঃজনে করি তার ভাগাভাগি।
বাঁচার অমনি আবহে, যদি চলে জীবন সারা,
কী আছে, কী নাই, কী চাই, আমি যেন কী হারা।
এই আমার শেষ বাসনা, এই কামনা যার দেখা শেষে,
রোগে, শোকে ছায়ায় নিরাশায় যাব সব কিছু নেশে।
শান্ত্বনা শুধু তাই, দেখিলাম একটি নিস্পাপ ফুল,
ভগবান, অভিজ্ঞতা সব কি মিথ্যা, সব কি আমার ভুল?

০১/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

হয়ে যায় তার

দূর বিরহ বেদনা শরীর যাতনাকে আরো,
দুর্বল করে তুলে, করে তুলে অসহায়, গাঢ়ো।
বিষময় করে তুলে এ ক্ষুদ্র পরিসর জীবন-
কোন কাজে ভয় নেই, নেই ভয় ধৈর্য চরা মাঠে,
নির্ভয়ে খেলিব রাখাল, নাইব ইচ্ছে মত খেয়াঘাটে,
দাঁড়াইয়া থাকিব ধ্যানীর মত, দেখিব ত্রিভুবন।

সুখ চায়, দুঃখ চায়, ভাসিতে চায় জীবনের ভেলা,
ভাসিয়া চলিবে নটিনী তটিনী, হলে জল খেলা।
আমি নেয়ে খেয়ে আসিব বাড়ি হতে ফের,
দেখিব আমার জগৎ, দেখিব সংসার যাতনা বাণী
কে উদ্গীরণ করে, কোন ছুঁতায় জানি হে জানি,
পরালে আমার গলায় কে তুমি লৌহ শৃঙ্খল বেড়।

তোমাকে ধরিতে পারে দুনিয়াতে এমন আছে কে বা,
সে মরে অথচ জীবিত নরের পারে না করে সেবা,
জানি না, কি জানি পৃণ্যকে সে কি যেন ভাবে;
দিবা বিভাবরী চলিয়া যায় করে হায়, হায়,

ঈশ্বর খুঁজে আপনাকে, আপনিকে নাহি সে পায়,
তমসা ভরা, নিবিড় রজনী চোখে, বল কোথা যাবে?
অমনি সব ভুলি তুলিল আপনাকে আপনি খুলি,
ঐ যে ভাই, পথিক কি চাই, কি তোমার বুলি,
বল, দেখি পারি কিনা ভগবান খোঁজ যত জানি;
এ নহে জীবন, এ নহে মরণ নহে তোমার আর কিছু
কেবল অরুণ কর দিবসে দেয় বন্ধুর ধরায় উঁচু নিচু,
বিফল আশা মোর জাগিয়া রহে পাই অপমানি,
ধরার 'পরে পড়ে আর কি বল কিসে আর;

অসহায় সৃষ্টি কে সহায়তা যে দান করে,
মায়া কাজলের টিপ দিয়ে যে কপাল দেয় ভরে,
সেই ধন্য, সেই ধন্য সৃষ্টিকর্তা হয়ে যায় তার।

০৮/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি এখন সংসার
রঙ্গমঞ্চের বিষাক্ত আবহাওয়ায় দ্রাণ নিচ্ছিলাম আত্ম-
বিস্মৃত আমি সেই অপরাধে; বিশ্বাস আর অনুযোগের
শাপে, ঘাতক কোন হৃদয়ের বান বিক্ষত হৃদয়ের ভুল
শাল্লুনা পাওয়ার এই আমার অশুভ যাত্রা-
এখানে কেবল দেখছি আর দেখছি- পেশাদার জোচ্চোর-
দের কালো চেহারা দেখছি- পৃথিবীর আলো বাতাস
থেকে চিরতরে বিদায় দেয়ার পৈশাচিক রণ উল্লাস
মানুষকে মানুষ।

নর্তকীর কপোলের ছোঁয়া পেতে কেউ উদগ্রীব-আর
কেউ গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মারণাস্ত্র পকেটে ক্রীড়া করে।
আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শুনিছি, অনেক
আত্মার একসাথে আর্ত ক্রন্দন-শুনিছি ঘোটকের
হেঁষা ডাক- শব্দ পাচ্ছি গোপন কক্ষে দানবের
কপট হাসির অথবা অটু হাসি আঘাতের পরে
মদে মাতাল কোন চির নিন্দুক আর কাল নাগের।
কোন নিস্তরঙ্গ ডোবা সহসা পয়োধির তাবৎ
পানি খেয়ে চিনতে পাচ্ছে না নিজেকে, ভাবছে
আমি সাগর আর অর্থহীন প্লাবন বহাচ্ছে

নিরপরাধী শহরে-গ্রামে-হাটে-মাঠে আল্লাদে ।
আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শরীরের
কোথা যেন ব্যথা পাচ্ছি- সহস্র বন্দুকের গুলি
বিঁধছে কলিজায়- বিচারক বসে আছেন বাণী
শুনতে, বিচার করতে, কি বলব, কি বলব, কি,
বলব আমি । ভাবতে পাচ্ছি না, যদি বলি ফিরিয়ে দাও
দাও অক্ষত অবস্থায়- যদি বলি ফিরিয়ে দাও
আমার হে সিক্ত মানব জীবন-যদি বলি কালো
হাত-জুচোরের চির সমাধী রচিত হোক ভূগর্ভে
পারবেন-পারবেন কি-মাননীয় বিচারক বিচার
করতে, জানি, পারবেন না-
তাই এই হাতের মুষ্টিটা শক্ত করে ধরেছি
আত্ম বিস্মৃত আমি বেরিয়ে আসলাম কাঠগড়া
থেকে-আমি চাই-পশুর রক্ত খেতে, দেখতে
চাই লাশ, লাশ, আর লাশ ।

১৫/০৬/১৯৮৭ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা ।

ঠাই নাই আমার কোথাও

ঠাই নাই আমার কোথাও, পারঙ্গম
শতাব্দীর ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ মন-
একান্তই বুলন্ত থাকছে, প্রশ্ন নিগড়ে
সময় ও জীবনের শেষ কোথায়
আহা এত খেয়া পারাপার
কিন্তু শেষটি কি-
ঠাই নাই আমার কোথাও
ফিরে আসি রঙ্গমঞ্চে পৃথিবীর-
নদীর স্বৈর শাসনের বিকৃত পাড় ভাঙ্গা
মুক্তি, ধ্বংস করে আত্মার সবুজ ক্ষেত্র
আমার ডিঙ্গি নৌকো মুহূর্মুহু রৌদ্র
ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম, মনবিহীন
দেহের বাতাবন ক্লান্ত অবসন্ন,
ঠাই নাই আমার কোথাও ।

ঘূণে ধরা সমাজের শির শির বাতাসের
দাপোটে নাস্তানাবুদ হলো, আমার সার্ট
মাথার আধা পাকা লম্বা চুল-
কবিতার পুংক্তি মালা এলোমেলো
রাম কৃষ্ণাদী ঘাটে চিৎ হয়ে পড়ে
আমার দ্রোহ, আমারই থেকে যায়
রহস্যের অথই জলে, আদিগন্ত দেখাচ্ছে
তার সাহস মাঝখানে কাঁদিবার জন্য
কিংবা হারাবার জন্য আসিবে স্রোত
ভাসা কুচুরী পানা?
মরার উপর খাড়ার ঘা,
এখন ঠাই নাই আমার কোথাও।
যেখানে সীতার সতীত্বের জন্ম, যেখানে
কোনও পুরুষা উর্বশীর মিলনের
মাঝখানে এসে দাঁড়ায়- জয়সেন
সেখানেই আমার উৎপত্তি-
বজ্রপাতের কিংবা আজরাইলের
ডানহাত ঘাতক কিংবা শোষকের
দেহে রেখে আমি পালিয়ে
গেলাম সরোষে কারণ
এখানে সহজ, সরল নিশ্চিত
পীড়াহীন একটি মনের লাল দাবীঃ
ঠাই নাই আমার কোথাও।

০৭/০০৬/১৯৯০ খ্রিঃ ফতুলা, ঢাকা।

নতুন জীবন

আকাজ্জার মুলি বাঁশের বেড়া স্থির
দাঁড়িয়ে-জীবনের মধ্য বয়সে
হায় হায় কি করিলাম কি পাইলাম
আয়ুর বিছানা পেতে?
অবিরত বাহির হয় কঠে কঠের সুর
শ্রম ও চেষ্টার কলম হতে বারে নিষ্ফল
কালি- সেখানে আকাজ্জার ঘর

নেই, নেই মুক্তির সোনালী দিনের
ইংগিত- শক্তির সময় ক্রমান্বয়ে
গ্রাস করেছে আশার দুর্বিনীত অজগর
দুনিয়া ব্যাপী তার হা সূচত্র বিষদাঁত
বিষাক্ত ছোবল আমার নৈমিত্তিক সাথী ।
অসংখ্য মানুষের আকাশে চোখের
তারকা আর দেখা যায় না ।
গোল মুখ এই পৃথিবী ও তার হৃদয়
যন্ত্রণায় ছটফট করে কখনও-
কান্নায় ভীষণ আর্দ্র হয়ে ওঠে ।
কিন্তু কেন জীবনের রক্ত উষ্ণ
মন্ডলীয় অঞ্চলে আরো সজীব হয় না ।
কেন ও হিম সাগরে নোনা জলে মিশে যায়
সজারঙ্গ মহত্তম কাঁটা?
আমি ঠিক বুঝতে পারি না-
সূর্যটা কেন সূর্য গ্রহণের মত সর্বদা
আমাকে আড় করে রাখে-
এর কি শেষ নেই?
ভীষণ ইচ্ছে করে বিদ্রোহের দাবানল
জ্বালিয়ে দিই সর্বত্র ।
এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, মহাকাশ,
জ্বালিয়ে দিই অন্তরের আগুনে
বিভ্রান্তির তখত উড়িয়ে দিই বিচারের
মাইনপুতে-
আমার ঘরের সিলিং, দেয়ালের কাটা
পুঞ্জিকা, আর তাকিয়া, বালিশ ফিরে
পাক, আরাধ্য আর এক পৃথিবী-
নুতন জীবন ।

০৯/০১/১৯৯১ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা ।

ওয়াদা

সেদিন ছিল শুক্রবার।

বন্ধুর শুভাংশুর অনুরোধে বেড়াতে বেরুলেম অচিন্তপুরের দিকে যে পথটি গেছে তার কিনারা ধরে সদ্য প্লাবিত মাঠের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করার জন্য। বিকেল বেলাটা যাতে খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে সে চেষ্টার অন্ত নেই আমার। তা করব না কেন-সারাটা দিন তো কাটে এক রকম দুঃশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে। কারণ একে তো হাতে টাকা কড়ি খুব একটা নেই তদুপরি গুটি পাঁচেক বই মাতৃজটর হতে বের হয়ে আঁতুর ঘরে পড়ে মা মা করে অবিরত কেঁদে যাচ্ছে। এখন ভাগ্যবান পিতার-কি মাতার চেষ্টার অন্ত নেই স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে যে, কি করে নবজাতককে পুষ্টিকর খাদ্য কি পানীয় যোগে ক্রমশঃ শরীরটা মোটা তাজা সুদর্শন ও বৃদ্ধি করা যায়। একটু ভেঙ্গে বলি, পিতা আর মাতা যাই হবার দাবী করিনা কেন সন্তান কিন্তু অন্ধকার আঁতুর ঘরেই অপেক্ষা করছে ছাপা হরফে দিনের আলোক দেখার প্রত্যাশায়। যাক যা বলার তাই বলি, অর্থাভাব পূরণের নিমিত্তে বন্ধুর শরণাপন্ন হলেম। বলে রাখা ভাল, আমার বন্ধুটি একজন প্রাইভেট টিউটর। আমি অনুযোগ করে বললুমঃ“শুভাংশু, আমাকে একটা টিউশনি যোগাড় করে দে না ভাই”, উত্তরে শুভাংশু চেষ্টা করবে বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তারপর আরও অনেক কথা ও গাল-গল্প করতে করতে সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এলো তখন উল্টো বাড়ীর দিকে রওনা দিলুম।

স্বপ্ন আয়ের চাকুরে আমি, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে করি। কারণ বিদ্যাপীঠের উঁচু দরজায় পা রাখতে রাখতে যে সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয় তাতেই অনেক অভিভাবকের মেরুদণ্ড বেঁকে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একদম ভেঙ্গে যায়। আমার অভিভাবকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে বলতে হবে। কারণ পরপর কটি ভাই যখন একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহ তোরণে গৌতাগুতি শুরু করে দিলুম তখন অভিভাবকের আর সাধ্য কই রইল যে, নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর পয়সা-কড়ি প্রেরণ করে পিতার কর্তব্য কাজটি সমাধা করেন। যাক সে কথা, সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি একটা কিছু করি।

তাই তারই অপরিপাক্ত আয়, পর্যাপ্ত রূপেই দেখা দিত বন্ধু চক্রে মুখরোচক খাদ্য তালিকায়, যখন দোকানীর বিল প্রদানের বিল প্রদানের সময় অন্য কাউকে দামটা না দেবার দিয়ে আগে বেড়ে অপরিণামদর্শীর মতন নিজেই দিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে সবচেয়ে বের হয়ে আসতাম দোকান থেকে। বয়োজ্যেষ্ঠরা বলে কি না-“যতো উড়ে, ততো পড়ে”। উড়তে উড়তে পাখা ভেঙ্গে শরীরের রক্ত কিছুটা শীতল হয়েছে-আর অর্থনৈতিক বুদ্ধিও গজিয়েছে কিছুটা- তাই বুদ্ধির চাপে অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে পড়াশুনার ছুঁতা ধরে এক রকম পালিয়ে দোকানের পাশ কেটে চলে আসতাম।

এম.এ পরীক্ষার হয়ে গেছে। সুতরাং প্রচুর সময় হাতে সকাল-বিকেল-রাত বসে থেকে থেকে ভাল লাগছে না। কমিউনিটি সেন্টারের দরোজার কাছে একটা আরাম কদারায় বসে সাত-পাঁচ ভাবছিলুম। কি করতে পারি, কি করব এখন শুভাংশু এসে বলল, ‘পিয়ুশ শুন তোর জন্য একটা গৃহ শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এসেছি, চল আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি।’

আমিও আর কাল বিলম্ব না করে শুভাকাজী বন্ধুর পিছু পিছু ছুটলুম। হায়রে ভগবান, টিউশনি করতে ধনাত্মক তারেক মোল্লার বাড়ীতে গিয়ে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলুম-কপালে হাত ঠেকিয়ে বলব, ভগবান এরকম লজ্জায় যেন কাউকে না ফেলেন।

ঘটনাটা খুলেই বলি, তারেক মোল্ল্যা অত্র এলাকার একজন সুদখোর ধনী ব্যক্তি। আমি তাকে চিনতুমও না, জানতুমও না। তারই সুসজ্জিত বাড়ীর বারান্দায় নিয়ে গেল শুভাংশু আমায়, একটু দাঁড়িয়ে তারপর দরোজায় টোকা দিলে একজন মধ্য বয়সী লোক বেরুল ঘর থেকে। স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা করতে ভদ্রলোক যে আচরণ দেখালেন তাতে হাঁচের পায়খানা মাথায় উঠে গেল। আমার টিউটরি করার সাধ উবে গেল এখানেই। যাক তাতে কি, নিজেকে একটু আড়াল করে আমি দাঁড়ালাম পেছনে শুভাংশু শুদ্ধ মুখে হাসি টেনে এনে আস্তে করে বলে ফেলল, চাচা মিঞা আপনি যে মাষ্টারের কথা বলছিলেন আমি একদম পানি মূল্যেই ক্রয় করেছি দেখুন- বলে আমার দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল নাড়িয়ে শুভাংশু আমাকে বলল, “আসুন স্যার পরিচয় করিয়ে দিই”।

শুভাংশুর কথা শেষ হতে না হতেই গর্বিত তারেক গৌফ নেড়ে নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-‘দেখ শুভা, আমি স্কুলের মাষ্টার খুঁজছি, আচ্ছা উনি কি স্কুলের মাষ্টার’?

জবাবে শুভাংশু ইতস্তত করতে লাগল-আমি সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বললেন তিনি, ‘ও বুঝতে পারছি- স্কুলের মাস্টার হলে পড়াতে পারেন, নইলে ইয়ে, আসতে পারেন’?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম ও যারপর নেই লজ্জিত হলেম মনে মনে। তবু যতদূর সম্ভব নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললুম-‘শুভাংশু সময় হয়ে এলো চল, নাকি কোথায় যাবি’? উত্তরে শুভাংশু বলল, ‘ও ঠিকই ধরেছিস, চল তাহলে’-

‘আচ্ছা আসি, তারেক চাচা’ বললে শুভাংশু, তারেক মোল্ল্যা ততোধিক সহজভাবে অস্পষ্ট স্বরে কি যে বললেন বুঝা গেল না- তবে হাত নেড়ে নেড়ে যে চলে যেতে ইংগিত করছেন তা স্পষ্ট বুঝা গেল। আর আমারও অনুরূপ তচ্ছিল্য প্রদর্শন করে হন্ হন্ করে বাংলা ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়ে দু’জনই রাস্তায় পা রাখলাম।

হাসি-দুঃখ, ক্ষোভ লজ্জা বুকে চেপে রাখতে না পেরে একটু দূরে গিয়েই উচ্চকিত কলরোলে চতুর্দিক মুখরিত করে তুললুম এবং শুভাংশুর শরীর চাপড়াইতে চাপড়াইতে প্রচুর হাসলুম, বললুম-“শুভাংশু আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে”-শুভাংশু যে মনে মনে রেগে আছে তা কিন্তু আমি জানতুম না। একটু কড়া স্বরেই তার স্বভাব সিদ্ধ ভারী গলায় ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলে উঠল, “রাখ্ তোর গল্প- ও শালার বেটাকে শাস্তি না দিয়ে আমার নিস্তার নেই, বেঈমান আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, আমাদের যেভাবে অপমান করলে- সেইভাবে অপমান না করে ছাড়ছিনে!” “চুপ কর শুভাংশু, অনেক হয়েছে” বলে থামিয়ে দিলুম আমি। কারণ আমি জানি সে মুখে যা বলে তা না করে ছাড়ে না। ভাবী রগচটা ও একগুঁয়ে প্রকৃতির শুভাংশু। শেষে যদি কেঁচো খুড়তে সাপ বেরায় তাহলে কি হবে? পরে শুনছি এঁদের সুদের টাকা নাকি কারও মারার উপায় নেই, সাত পুরুষ পর্যন্ত লাল দালানের ভাত খাইয়ে পরে ছাড়ে। তাহাড়া এলাকার লোকজনও নাকী ভীষণ ভয় পায়- এদের এত লাঠি জোড়, এত দাপট ও শক্তিশালী এরা।

যেকোন ব্যাপারকে সহজভাবে গ্রহণ করার একটা সহজ ক্ষমতা আমার আছে। আর যেকোন ব্যাপারই একবার রপ্ত করলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আমি। অর্থাৎ আমি যেভাবে এবং যে হারে অপমান পেয়ে চলেছি তাতে এই ব্যাপারটা আমাকে তেমন আঘাত দিতে পারে নি। কারণ প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। তা না হলে- ক্রমাগত তো অপমান পেয়েই চলেছি। মনে পড়ল- অদূর অতীতের কথা। নিবিষ্ট চিন্তে দুর্বা ঘাসের দিকে তাকিয়ে থেকে দু'হাটু গেড়ে বসে ভাবছিলুম, শুধুই ভালবাসি বলে আমাকে একটি মেয়ে শুধু অপদন্ত করে চলেই যায় নি বরং যে মানসিক আঘাত দিয়েছিল তা অপরিমেয়। কারণ ছিল বিচিত্র ধরণের। যেমন আমার সেই টাকা নেই, অর্থ নেই, শিক্ষা-দীক্ষা যা-ই কিছু আছে সে রকম চলা ফেরা নেই- অত্যন্ত শাদা-সিদে সাহিত্যিক মানুষ। এমনকি সে শুধু মনে সম্পর্ক ছিন্ন করেই চলে যায় নি বরং তাদের দেয়া, আমার আবাসে বহু পুরনো উইপোকা-খাওয়া চৌকিটা নেবার হুকুম যখন তার মুখে শুনতে পেলুম তখন লজ্জায় গা শিউরে উঠেছি।

বুঝতে পারলুম এ দান ভালবাসার নয়- এ করুণার দান- আমি কিছুক্ষণ মূর্তির মত বসে রইলুম।

তারপর বার্তাবাহককে দু'চার স্পষ্ট কথা শুনিয়া এ বহুমূল্য অস্থাবর সম্পত্তিটা সরিয়ে নিতে বলে দিলুম। মনে মনে স্থির করলুম, যতদিন পালংক কিনার সাধ্য না হয় ততদিন ওই সরকারি লম্বা টেবিলেই রাত যাপন করব। তবু এই অস্পৃশ্য উই- খাওয়া চৌকিটা স্পর্শ করব না- ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পিত করে বললুম, ভগবান আমার আত্ম মর্যাদায় আঘাত দিওনা বরং এর আগেই আমাকে নিয়ে যাও ভগবান! হঠাৎ গুভাংগুর ডাক শুনে আমি সন্ধিং ফিরে পেলুম। সে বললে 'কি হে কথা নেই মুখে'!

বললুম- 'না রে ও কিছু না'- ভাবছিলুম কি! শুধাংশু ছাড়ার পাত্র নয়- সে আমার মনের ভাব বুঝে কথাটা আর মাটিতে পড়তে দিল না, বলল, 'ও কিছু না তো বুঝলুম কিন্তু কি ভাবছিলে মশায়- তা কি শুনতে পারি' ? তার প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই স্বভাব জাত হাসি দিলুম।

সে একটু ইতস্তত করে বলল, ‘আচ্ছা শুভা তুই সব ব্যাপারেই আমার সাথে গোপন করিস্, খুলে বল- নইলে কোনদিন ’ ‘আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি কোন দিন কথা বলবি না, শোন বাবা, খুলেই বলছি সম্ভ্রষ্ট হবে তো’? তাহলে শোন বলছি- মূল ঘটনা ঘুরিয়ে বললুম, ‘ভাবছিলুম তোর বউদির কথা ইয়ে’ সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘আরে বেটা তোর আবার বউ আসল কোথা থেকে রে’। আরে মায়া বউদির কথাগুলো ভাবছি’। বল, ‘বউদির কথা, তা বউদি কি বলছিল’? বলছিল, ‘তোর ভাগ্যে বিয়ে নেই’।

বললুম, ‘কেন’?

‘চুল পেকে যাচ্ছে..... তাছাড়া’

তাছাড়া কি, ‘বল বল বউদি.....’ সহ্য হচ্ছে না আমার।

বউদি তামিচ্ছল্য করে বলল, ‘বহু মেয়েকে ভালবাসিস, ঘর বাঁধিস্ না, ভবঘুরে নচ্ছার’।

“কি থামলে কেন- বলে যাওনা”-

বউদি পুনরায় বলল, ‘কি বলব ছাই, এত বয়স হল তবু তোর আক্কেল হল না। মেয়েরা কি চায়, তা কি কিছু বুঝিস্’?

বলছিলুম, ‘তা মেয়েরা কি চায়, বুঝিও না, বুঝতে চাই না, বুঝলেও তোমরা মেয়েজাত- এ জাতের নিকুচি করি আমি’!

মায়া বউদি বললে, ‘দেখা যাবে কেমন বাহাদুর আমিও তোর সাথে কোন কথা বলব না এখন থেকে দেখি কতক্ষণ পারিস চুপ থাকতে’-

‘পারব, পারব, অনেকক্ষণ, অনেক দিন সারা জীবন পারব আমি’ আমি অনুযোগ করেছিলুম।

হয়েছে, হয়েছে অনেক, -হয়েছে এবার ওঠ’ বললে, মায়া বউদি।

ফের বললাম “মেয়েদের নিয়ে আমার কি সিদ্ধান্ত জানো, বউদি জানো”?

“কি হে এক্ষনি তো তুই ওয়াদা ভঙ্গ করলি” বউদি জানাল-

“রাখ তোমার ওয়াদা- ও মেয়ে জাতির মুখে বুক- ছাই দিতে চাই” বলে ফেললাম।

বউদি বিরক্ত হয়ে বলল, “যাবি কি না বল্, হুম আমি চললুম। আমার অনেক কাজ আছে নীচে। রান্না-বান্না সবই পড়ে আছে বলে, দ্রুত পদে চলে গেল বউদি।

‘কি রে শেষ করে ফেল্‌লি শুভা বলে, বলে যা না- তারপর কি হলো’- বলল শুভাংশু।

“আর কি হবে, চলে গেলো। আমারে কিন্তু ভীষণ চিন্তা দিয়ে গেছে রে বউদি, আচ্ছা চল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে চল, বাড়ীর দিকে”, শুভাংশু বলল।

তারপর উভয়ে নিরবে পথ চলতে লাগলুম। কিছুক্ষণ নিরবতায় কাটল উভয়ের মধ্যে। আমি মনে মনে ভাবছিলুম, পর্যালোচনা করছিলুম বিগত পরীক্ষাগুলোর কথা। মনে পড়ল কত কষ্ট করেই না পরীক্ষাগুলো দিয়েছি। থাকার জায়গা নেই- খাবার সুবিধে নেই। বিদেশে বিভূঁইয়ে বিশেষ করে নগর নাটিনীর বুকে মাথা গুঁজার ঠাই নিয়ে যে কত মাথা ঘামাতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। আমার ক্লাস চলাকালীন সময়ে যা হোক একটা মেসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। চতুর্দিকে পায়খানার সৌরভ যখন নাকে অনর্গল অকুতোভয়ে ঢুকে পড়ত তখন পাকস্থলী থেকে বমি বের হয়ে পড়ত। গামছা ভাল করে নাকে বেঁধে দুর্গন্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতাম। সার কথা হল এই যে, শহরের নাম করা বড় লোকের মানে উঁচু দরের ব্যবসায়ীর ৫তলা বাড়ির যে কলোনীর জিজিরার নজর গঞ্জে ভর করছিল- সেই এলাকার ছিল এক নোংড়া ডোবা, মানে সব পায়খানা।

মল এ স্থান দিয়ে নিষ্কান্ত হয় পাইপযোগে। তাছাড়া ডোবাটার পাড়ে ২০ হাত দূরে দূরে আধা বড়লোকের আধা-কাঁচা পায়খানা তো আছেই। যাক পয়সার স্বল্পতার জন্য উক্ত মেসেই আমাকে দীর্ঘ ১টি বছর কাটাতে হয়েছে। ইতোমধ্যে মেস নিবাসী ভিন্ন ভিন্ন জেলার আমারই মতন কতিপয় যুবকের সাথে অল্প পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার ই একজনের কথা.....ইস্ এখনও মনে পড়লে লজ্জায় আমার শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে- মানুষ এমনি করেই মানুষের উপর বিনা অপরাধে দোষ চাপিয়ে দিতে পারে- মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খেতে পারে ভাবতেও পারি নি। আমারই রুমমেটের বন্ধুটির একটা ঘড়ি ছিল- রুমে। আমার অবর্তমানে আমারই বেডে ও শুঁত। এই ছেলে প্রথম যখন মেসে এসে তখন ওর সীট ছিল না। যাক আমারই সীটে থেকে তারই ঘড়ি নিজেই গোপন করে চক্ষু দানের নির্লজ্জ দৃষ্টি ফেলল- আমার ওপর।

আর আমি হতবাক- কেমন অমানুষ হলে পরে- অন্তত আমার মতন একজন লোকের নামে এমন অভিযোগ আনতে পারে সে কি না- অপরকে অপমান তো দূরের কথা একটা অশালীন উক্তি করতেও দ্বিধা করে। যাক্ মনে মনে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হলেম। ভাবলুম, এ মেসেই আমি আর থাকব না- সেই দিন যে চলে আসলুম আর কোনদিন যাই নি- আজও আমার কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সেখানে আমার জন্যে অহর্নিশি রোদন করছে।

আসল কথা হল এই যে, মানুষকে যত বেশি বিশ্বাস করা যায় মানুষ তত বিশ্বাস ভঙ্গ করে- যত বেশি ভালবাসা যায় তত আঘাত দেয়- নানা অজুহাতে ওয়াদা ভঙ্গ করে- নিশ্চিত বাঘের মুখে রেখে চলে আসতে পারে একান্ত প্রাণের বন্ধুটিও। এ, এক চিরন্তন দৈব শিক্ষা।

ইতোমধ্যে আমার গৃহে প্রায় এসে গেছি। মৌনভঙ্গ করে আমি বললুম, ‘বসবা না, শুধা’।

সে উত্তর করল, “না রে শুভা, আমার একটু কাজ আছে দোকানে যেতে হবে- বাবা বাড়ি নেই তো, সেই জন্যে তাড়া”

‘আচ্ছা ঠিক আছে’ বলে, আগামীকাল আসতে বলে, আমি অন্যদিক মুখ ঘুরিয়ে ঘরে প্রবেশের উদ্যোগ করলুম-সন্ধ্যা বাতি জ্বালিয়ে তারপর গল গল করে দু’গ্লাস পানি গিলে পড়তে বসলুম। শরৎ বাবুর উপন্যাস একটা নিয়ে বসলুম- পড়তে পড়তে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। অতএব সেদিনকার মত ক্ষুণ্ণবৃত্তি নিবারণের প্রত্যাশা আর রইল না কারণ আমার কৃত্রিম ‘মা’-টি তো আমার জন্যে রাত ১০টায়-ই যে ঘুম দেবী ভর করে দু’চোখে, সেই দেবী তাড়ানোর শক্তি রাখেন না- রাখতেন যদি ভালবাসার পরিমাণ অধিক হতো। যাক্-পড়ছিলুম উপন্যাসটি-যার নাম- “পরিণীতা” নিছক এতিমই বলা চলে এক মেয়ের করুণ জীবন কাহিনী- কালজয়ী কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব লেখনী কৌশলে মুগ্ধ হয়ে কাহিনীর মদিরা ধীরে ধীরে পান করে সম্মুখে এগুতে লাগলুম। তখন কিন্তু আদৌও সময়ের খেয়াল নেই। হঠাৎ টেবিল ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘরে দাঁড়িয়ে টিক্ টিক্ করে ঘুমের আদেশটাই করে গেল। আর কি, হাঁই উঠল চোখ দু’টো কচলাতে কচলাতে উঠে গেলুম। আমার ক্ষুধা কাতর পেটে আর দু’গ্লাস জল ছিটিয়ে বিছানায় গিয়ে শুইলুম- ঘুম কিন্তু সহজে এলো না।

যা এলো তা আবোলতাবোল কোন ভদ্রলোকের চিন্তা নয় কিংবা বাস্তববাদী কোন বিষয়ী লোক এ নিয়ে কোন ভাবনা করেন না। সুতরাং এখানেই আমি স্বতন্ত্র, আমার কল্পনার চোখে ভাসতে লাগল “হোটেল সিরাজীর” দ্বিতলে দাঁড়িয়ে যখন নিচের তাকাচ্ছিলুম ঘন ঘন তখন যা দেখছিলুম, যা ভাবছিলুম তাই। কখনও হয়ত গ্রামে গিয়েছি যেখানে দেখেছি- শরৎকাল শেষ প্রায়। পুরো শীত না পড়লেও শীতের দেবী যে নেমে এসেছেন স্বর্গ হতে এ বিষয় সুস্পষ্ট। সকালে যখন দেখি দিগন্ত বিস্তৃত সাদা কুয়াশার বিন্দু দিয়ে ঢাকা, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে ছোট বড় নানাকৃতির রাশি রাশি জলপাই, শ্যাম পাতা আধো ভেজা আধো শুকনো হতে টপাটপ এক দু'ফোটা করে কুয়াশা জমাট পানি ঝরছে তখন মন এক পুলক আনন্দে ভরে উঠে- মনে হয়, এই তো সাধের শীতকাল।

আধো ঘুম- আধো তন্ত্রাভিভূত স্বপ্ন দেখতে লাগলুম অতি প্রত্যুষে বাড়ির বাংলাঘরে বসে কাপড়টা ভাল করে গায়ে পেঁচিয়ে শীতের সকালে জড়সড় হয়ে হয়ত কাছে এসে ধীর কাঁপন যুক্ত মৃদু কণ্ঠে মা বলছে “কি রে, শুভা তোর পরীক্ষাটা শেষ হইছে না”।

উত্তর করলুম- ‘হ’ মা, শেষ অইছে’।

‘কি রে, বাছা তুই তো চাকুরী করস্, তর শরীর গতরটা এই রকম ক্যান, ’ মা বলছেন।

আমি আমার শরীরের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে সহজভাবে বললুম- ‘না মা তেমন কিছু হয় নি তো’।

মা- আরো বিষন্ন স্বরে বললেন, “শরীরটা একদম শুকিয়ে গ্যাছে তোর। আয় বাবা, শীতের পিঠা করছি খাবি না- আয়”। ধীর ভাবে কাপড়টা আর এক বার মাথায় তুলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন মা।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলুম- একটু পরেই ছোট বোন নমিতা ভেতর বাটি থেকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত পদে এসে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। বললে, দাদা- ‘পিঠা খাবি’? মা ডাকছে, চল না দাদা, পিঠা খাবি’?

আমি ঘাড় বাঁকিয়ে আড়চোখে চেয়ে মুখে স্ফীত হাসি টেনে মোলায়েম কণ্ঠে বললুম- ‘তুই খেয়েছিস নাকি- কেবল দাদাকেই ডাকছিস’?

‘না দাদা, তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে খাব, চল না দাদা, মা ডাকছে চল’ বলে হাত ধরে টানতে লাগল- আমিও তার হাত ধরে ভেতর বাটীতে গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে ক্ষুদ্র দু’টো পিঁড়ি টেনে নমি আর আমি বসলুম। শীতের কলা পিঠে- আহা কত মজাইনা লাগে- খেতে খেতে এক পর্যায়ে নমিতাকে বললুম, ‘কিরে কেমন খাচ্ছিস’?

‘দাদা ভারী মিঠা তাই না’? নমিতা অত্যন্ত ফুল্ল চিটে উত্তর দিল।

‘ঠিক ধরেছিস।’ শুভাংশু বলল তার উদগ্রীব আদুরে ছোট বোনটিকে চোখের ভাষায়।

মা বললেন “আচ্ছা খেয়ে নে, পরে কথা হবে, খাবার সময় কথা বলতে নেই”। আমরাও আর কোন কথা না বলে চপাচপ খেয়ে উঠলুম।

বাহিরে এসে রৌদ্রে দাড়ালাম আমি আর নমিতা।

সে বললে, “আচ্ছা দাদা, তুমি এমন মিথ্যে কও ক্যান, দাদা? কইছেলে না, আমার জন্য নোক পালিশ, কানের দুল আনবি, কই আন নি তো? কই কয় বার কইয়ে গেলে, শেষে আসার সময় দু’হাত খালি করেই আস! হ্যাঁ বুঝেছি, তুমি আমাকে আদর কর না তোমার সাথে আমার আঁড়ি”।

ক্ষুদ্র শিশুটির পরিপক্ব কথায় মনটা এক রকম চমকে উঠল। ক্ষণকাল কোন কথাই কইবার পারলুম না- আদরে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললুম, ‘দাদা, আমাকে মাফ কর, তোমার এ দাদার আর কোন দিনও ভুল হবে না। আগামী দুর্গাপূজার ছুটিতে যখন বাড়ীতে আসব তখন তোমার জন্য নোক পালিশ, মালা, ফিতা নিয়ে আসব’।

যদিও মেয়েটি কাছে ঘেঁষল তপাপি তার মুখ ভার করে রইল। চোখ দু’টো জলে ভরপুর- টলটল করছে। একটি হাত কপালে বুলিয়ে বললুম, ‘দাদা আর ভুল হবে না, হলো তো’? অনেকক্ষণ পরে কথা ফুটল- তার দু’হাত দিয়ে আমার দু’কাধ ধরে সজোড়ে ঝাপটি মেরে আমার কাছ থেকে কোথা যে অদৃশ্য হয়ে গেল- মেয়েটি। আমি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গত রাত্তির সব দুঃস্বপ্ন যখন মনে পড়ল ইচ্ছে হল পৈত্রিক নিবাস ঘুরে আসি। ছুটির দরখাস্ত অফিসে রেখে তলপিতলপা নিয়ে ছুটলুম বাড়ীর দিকে। গাড়ী চড়ে যখন বাড়ী রওনা দিলুম সকাল তখন ৭টা।

বাড়ী পৌছলুম রাত ১২ টায়। যাক প্রায় মধ্য রাতে ডেকে মাকে জাগালুম মা উঠল বললেন, ‘কি রে শুভা, তুই এসেছিস্’

“হ্যা” মা এসেছি- শভা বলল।

মা তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে বলল, ‘আয়, ভেতরে আয়’। তারপর উভয়ের মধ্যে অনেক হল। খাবার-দাবার শেষে বাংলাঘরেই বিছানা পাতা ছিল সেখানেই শুলাম। পরদিন ভোরে সেই পিঠা পাই নি সত্য কিন্তু বিগত রাত্রির দুঃস্বপ্নের কিশোরী আমারই বোন নমিতা যখন এসে আবদার করল তার স্নেহের অধিকার তখন আমি নিরুত্তর রইলুম। শরীরটা ঘর্মাক্ত হয়ে গেল, মনটাও বিরক্তি আর ক্ষোভে ভরে গেল। মনে হল, সংসারটা একটা ক্ষুদ্র স্বার্থের আস্তাকুড়ে। এখানে একটা জীব থেকে- সর্ববৃহৎ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই আপনাপন স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন। তাই নিছক প্রাণের অধিকার না নিয়া বাঁচা মুশকিল।

এভাবেই কাটল দু’দিন। বোনকে আর সামলাতে পারি নি। সে তার কসমেটিক না পেলে খুশী যে নয়- এ, আকাশে তারা ওঠার মত প্রব সত্য। যাক আজ যাবার পালা, তিন দিনের ছুটি শেষ হয়ে এলো। বিকেল তিনটের সময় যথারীতি মা’র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বোনের কাছে বিদায় নেবার গেলুম- সে আমাকে বিদায় দিল না- তার একই দাবী পুনরায় ব্যক্ত করে মুখ ভার করে রইল। আদরে কাছে টেনে নিতেই আমার যাবার প্রস্তুতি দেখে কেঁদে উঠল- ‘দাদা যেও না’- বলে সে কাঁদতে লাগল।

‘যাই নমি’ বলে, ধীরে ধীরে তাকে সরিয়ে চললুম বড় রাস্তার পাশ ধরে। প্রায় ১-২ মাইল পথ পরে রেলওয়ে স্টেশনে টিকেট করে সীট নিয়ে বসলুম গাড়ীতে। অনেক দূরের পথ, চোখ ফেরালাম অদূরে ছুটন্ত গাঁ বাড়ির দিকে। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লুম- গাড়ীতে হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠল, নমিতার মুখখানা ভেসে উঠল। মনে হতে লাগল নমিতার অভিযোগের কথাগুলো।

ওয়াদা খেলাপের বিষয়টি আমাকে আরও বেদনাতুর করে তুলল। পৃথিবীর সব জায়গায় অন্যায় করে আঘাত দিয়ে প্রত্যাঘাত পাই না- কিন্তু এই নিষ্পাপ কিশোরীর দেয়া সামান্য আঘাতটুকুন তার চোখের দু’ফোঁটা অশ্রুজল মহাসাগরের তাবৎ বারিরাশি হয়ে অজস্র সফেন তরঙ্গ আমাকে ডুবিয়ে দিলো অতল গর্ভে।

আমার শ্বাস রুদ্ধ করে দিলো, বুকে কোথায় ব্যথা যেন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। চোখে দেখছি সরষে ফুল, মাথা ভন ভন করে ঘুরছে, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে বললুম ভগবান, পৃথিবীর সব মানুষকে টাকার জন্য আমি হত্যা করতে পারব নির্দিধায়, এ পাষাণের বুকে এতটুকু দয়া নেই। কিন্তু সামান্য ক'টি টাকার জন্য যখন এই কিশোরী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল তখন এই অপদার্থ দাদা, বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান হয়ে দাঁড়াল, ট্যাংকের অগ্নিগুলির মতই বুকটা দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই করে দিল।

ইস্ বুকের ব্যথা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, ব্যথার স্থানে দু'হাত চেপে ধরে একটু কাঁত হয়ে হেলান দিয়ে রেলিং এ মাথা ঠেকিয়ে, চোখ বুঁজলুম, শরীর কালক্রমে দুর্বল হয়ে আসতে লাগল, নিদ্রা দেবী হরণ করল আমাকে। গাড়ি আপন গতিতে চলল তার গন্তব্যের দিকে।

তারিখ-১৫/১০/৮৭ ইং টিকরপুর, ঢাকা।

চান্দুরওয়ালা

জীবনটা চলন্ত ট্রেন ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত কোন স্টেশন থেকে উঠেছি আবার গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ অন্য একটি স্টেশনে নেমে যাব বৈকি! এ কথাটা লিখলাম কেন- কেন হঠাৎ করে এ ভাবনা এসে মাথায় ভিড় করল- তা কিন্তু তলিয়ে দেখি নি। ভাবছিলাম, একটা কবিতা লিখব। যার নাম হবে “কাক” আর সেই কাক নামক পাখিটি দিয়ে বুঝিয়ে দেব দেশের বর্তমান দূরবস্থাটা। কাক যেমন এক টুকরো মাংশের জন্য এক বাঁক মিলে টানা হেচড়া শুরু করে- আমাদের দেশে তেমনি এক অবস্থা উপস্থিত। কার খাদ্য কে কেড়ে নেবে, কে রাতারাতি বড়লোক অর্থাৎ সম্পদশালী হয়ে উঠবে, সেই চিন্তায় সবাই যেন সর্বদা ব্যস্ত থাকে। আর সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আশ্রয় নেয় অন্যায়ের, অসৎ পথের। যাকগে অবস্থা এমনি যে, তা আর কাউকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। রাজা বাদশাহ থেকে শুরু করে আমির ফকির আধুনিক ভাষায় কুলি মুজুর সবাই ঠাওর করতে জানে। তাই সে ব্যাপারে কিছু বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। তবু যখন মাঝে মাঝে মাথায় এসে উপস্থিত হয় তখন না বলে আর পারি নে।

তারও একটা কারণ আছে- কেননা ব্যাপারটা এতই সাধারণ যে- অর্থ নিয়ে গন্ডগোল, চুরি-রাহাজানি আত্মসাৎ আর খুনজখম ক্ষমতার অবৈধ লিপসা প্রভৃতিতে দেশটা একেবারে ছাইয়ে গেছে। আমি সুখে থাকি অন্যে মরুক তাতেই বা কি আসে যায়- এমনি ভাব ধারা আর তারই ফলশ্রুতিতে এই অবস্থা।

মা বোধ করি অযথা চটে গেছেন- বলতে লাগলেন ছেলেটাকে নিয়ে যে কি করি- পড়ার টেবিলে বসে আর কাজ নেই, সেই সাহিত্য গল্প, পড়াশোনা গোলায় গেছে। কখন নাস্তার সময় পেরিয়ে গেল, ভাত শুকিয়ে চাল হইয়ে গেল- খবর নেই। আর তাকে দিয়ে সংসারে কিছু হবে না- এত সব বলতে বলতে রাগে বেড়িয়ে গেলেন মা। বাস্তবিক সত্যি আমি তখন ভীষণ ব্যস্ত উপন্যাসের জটিল চরিত্রটাকে নিয়ে। কখন যে নাস্তার সময় পেরিয়ে গেল বুঝতেও পারি নি। তাই আজ আমার বকুনি খেতে হল। এমনি আজ নয় প্রায়ই খেতে হয়। আমার ভাবনার শিকড় যেখানে গেড়েছে সেখান থেকে ওঠা বড়ই মুশকিল। সংসারের

সেই অবস্থাটা আমাকে বিব্রত করে। ওই ভার্শিটির সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সেই দিনকার মত উঠলাম। গোসল করে চারটে গিলে আসলাম ভার্শিটিতে।

আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস; তাই স্যারেরা ক্লাশ নেবেন না বুঝা গেল, প্রায় আধ ঘন্টা চলে গেল। এক বন্ধু বললে- আচ্ছা বলতো রফিক- স্বাধীনতার প্রকৃত মানেরটা কি? আচ্ছা, আমরা কি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন? এইত সেদিন রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হলো- বহু ছেলে যেমনটি তথাকথিত উপনিবেশিক শাসকেরা করত। আচ্ছা, আমাদের জাতিগত উন্নতির চিন্তা ভাবনা অথবা প্রকৃতি প্রেক্ষাপট নিয়ে কেউ কতু চিন্তাভাবনা করেছে? কত লোক যে অর্ধাহারে অনাহারে ভুগছে- তার কি হিসাব আছে? স্বাধীনতা পেয়েছি- যুদ্ধ করছি- হানাদার বাহিনীর সাথে। তাদের আত্মসমর্থনে বাধ্য করে নিজেদের শাসন নিজেদের হাতে নিয়েছি। এ সময়ের কার্যকলাপ দেখে তোমার কি মনে হয়? এমনি শত প্রশ্ন করে একরকম আমায় উত্তর করে তুলল সে। আমি তার কোনটা জবাব দিলুম, অন্যটির জবাব পাশের কয়েক বন্ধু দিল। তর্ক বিতর্ক শেষে মজানু বলল- আচ্ছা চল আমরা ছাত্র রাজনীতিতে নেমে পড়ি। তার কথাটা শুনা মাত্রই সজোরে হাসতে লাগলাম। সে বাধা দিয়ে বলল কি হে হাসছ কেন? বললাম হাসব না? যে কথা বললে তাতে হাসা ছাড়া উপায় নেই হেসে উড়িয়ে দিয়ে তার কথার জবাব দিলাম।

যেমন দেয় সামরিক শাসক গোষ্টিরা। তবে সেই হাসার মধ্যে কতকটা মধুমিশ্রিত রাগও থাকে- আমার হাসিতে তা নেই। কারণ আমি তোর বন্ধু। সে সন্তুষ্ট হতে পারল না। বলল, সাহেদ তোকে বুঝতে পারি নে। কেন তুই বুঝিস না যে, আমরা বসে থাকলে উপায় নেই। দেশটা গোল্লায় যাবে- দেখ না চেয়ে চতুর্দিকে।

ঠুস-ঠুস-ঠুস ঠুস- চানাচুর- চা-না-চু-র খাবেন স্যার, মরিচ, পিয়াজ, তেল, লবণ টাটকা চানাচুর স্যার, বলতে বলতে আমাদের কাছে আসল মলিন আধেঁড়া পেট আর হাফশার্ট পড়া এক সং সাজা মধ্য বয়সী চানাচুরওয়ালা অকিল। তার মাথায় যে টুপি আছে তাতে তার নামটি সুন্দরভাবে লিখা তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কি হে অকিল মিয়া দাও তো এক টাকার চানাচুর। চার বন্ধু মিলে তা নিয়ে মুখ নাড়াচাড়া দিলাম। আমার ইচ্ছে যে, প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে দেয়া যাক- তাই

একটা অতি সাধারণ বিষয়ে নেমে আসলাম। এই যে অকিল তোমার চানাচুর তো খেলাম- এখন বল, তোমার নাম কি, তোমার দেশ কোথায় ?

অকিল ঢোক গিলে বলল, ‘সিলেটে’।

মন্টু বলল, ‘থাকো কোথায়’ ?

অকিল বলল, ‘কোথায় আর থাকুম স্যার। ও গেন্ডারিয়ার ধলা পাড়ার বস্তিতে’।

মন্টু বলল, ‘ওখানে তোমার কে আছে’ ?

অকিল বলল- ‘আমার কেউ নেই’।

মন্টু বলল, ‘মানে তোমার বাবা মা কেউ নেই’ ?

অকিল বলল, ‘না স্যার, আমার কেউ নেই’।

মন্টু বলল, ‘আচ্ছা- মা বাবা কত দিন আগে থেকে নেই’ ? বলতেই ছেলেটি ঢুকরে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলো- তাকে থামিয়ে দিলাম আমি। আমি বললাম- ‘কাঁদিস কেন ? আহা কাঁদিস কেন, খুলে বল না’।

অকিল বলল- ‘কাল স্বাধীনতা দিবস না’ ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ‘কালই’।

অকিল বলল, ‘স্যার শুনবেন, আমার কাহিনী শুনবেন স্যার’।

আমি বললাম- ‘শুনব বৈকি। অবশ্যই শুনব’।

অকিল বলে যেতে লাগল, স্যার বস্তিতে আমার একখুড়ি মা আছে। আমাকে খুব আদর করে- ছোটবেলা থেকে তার কাছে মানুষ হয়েছি। আমার নাওয়া খাওয়ার জন্য খুড়িমার চিন্তার শেষ নাই। ফেরি করে, করে ফিরতে একটু দেরী হলে ব্যস্ত হয়ে পরে। মনে হয় উনিই আমার মা। খুড়ি মা বলেছে না আমি তোর মা নই। তোর মা বাবাকে পাকবাহিনী মেরে ফেলেছে। একদিন আমাদের বস্তিতে হানাদার বাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তোর মা ছিল ঘুমিয়ে হঠাৎ দেখে ঘরে আগুন ধরেছে। চিৎকার করতে করতে বাহিরে আসে- আর কি, পাক বাহিনীর লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে গেল। জোর করে হাত পা বেঁধে নিয়ে গেল কোথা জানি না- তুই ছিলি আমার ঘরে। তখন তোর বয়স ১ বৎসর- আমি আগেই দেখে কোন মতে দৌড়ে পালালাম গলি দিয়ে। যাক তোর মাকে নিয়ে গেছে কোথায় আর হাদিস মিলে নাই। তোর বাবাও তো মায়ের খোঁজে বের হয়ে গেল আর ফিরে নি। স্যার এই আমার মা বাবা প্রতি বছর এই দিন যখন ফিরে আসে তখন আমার মা বাবার কথা মনে পড়ে তাই ছুটে যাই..... বলে কাঁদতে লাগল।

আমি, সুশীল, হোসেন, নুরু ও রফিক সবাই একযোগে শুনছিলাম সংসাজা অকিলের কাহিনী বাস্তবিক যে কি দৃশ্য! মনে হল, এই স্বাধীনতার প্রকৃত উপলব্ধি, যাকে তার অর্থ বুঝাতে হয় না। আপনাতোই বুঝে নিতে পারে- স্বাধীনতা মানে কি- কিভাবে তার অর্জন হয়েছে- আমাদের কথা মুখে, তার কথা অন্তরের।

আমার মা বাবা আছে এ যুদ্ধ চলাকালে এক বিন্দু ক্ষতি হয় নি, আমাদের। তা আর কি বুঝিব স্বাধীনতার মানে.....

মনে হচ্ছিল, এমনি করেই যদি অসংখ্য মা বাপ হারা সন্তান তাদের হৃদয় নিংড়ানো কথা দিয়ে আমাদের বুঝায়, অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বাধীনতার মানে টা বুঝায়- এমনি করেই যদি অজস্র শহীদের মা বুকের পাঁজর খুলে বুঝায়- এমনি করেই যদি শহীদের প্রেতাত্মা আমাদের ভয় দেখায়, তাদের কংকাল আমাদের সুখের বাসার একটু জায়গায় আশ্রয় নেয় তবুও কি আমরা বুঝিব না? আমরা উপরতলার মানুষ, নীচতলার যারা দেশের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রম দিয়ে আমাদের বিলাস দ্রব্য তৈরী করে, তারা আমাদের কাছে দাবী তোলে বেঁচে থাকার জন্য, মাথা গোঁজার জন্য-এমনি শত শত প্রশ্ন আমার মাথায় উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে।

রিকশা বাড়ির সামনে এসে থামল, রিকশাওয়ালাকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বাড়ী ঢুকলাম, আমরা অনেকটা কঠিন হয়ে বলতে লাগলেন, সাহেদ, তোমার ওসব অভ্যাস ছাড় তো।

আমি বললাম, কি অভ্যাস আমরা? আমার এমন কোন বদ অভ্যাস নেই যে তা ছাড়তে হবে।

আম্মা বললেন, ‘অভ্যাস জানি না- তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছোট লোকদের সাথে কথা বলা ভদ্রলোকের কাজ নয়। বুঝলে?’ আমি অবাক। এসব, বলে কি, আম্মা? একজন মানুষ, সে গরীব হলে তার সাথে কথাও বলা যাবে না। এমনি ছোট তার মন? মনটা আমার ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। সামলে রেখে বললাম, কেন?

মা বললেন, ‘তোমার কেন’র উত্তর চাও? শোন ঐ সব ছোট লোকেরা তোমার কাছে ঘেঁষতে ঘেঁষতে পরে সাহায্য চা’বে- তোমাকে উত্থাপ্ত করে তুলবে’। মনে মনে আম্মার হীন অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার কথা চিন্তা করলাম- এই যে মা-টি তিনি

মানুষ নন, তার মন নিরেট পাষাণ স্বার্থপর। তার কাছে কোন কথা বলা মানে অরণ্যে রোদন, তাই সরে গেলাম। বুঝলাম, যাদের দান যত বেশী হয়, তারা তত বেশী নিংগুহীত অবহেলিত হয়। যারা চালাক, অর্থ চিন্তায় থাকে- তারা সব যুগেই বড়লোক! তাদের নিকট দেশপ্রেম নয়, আত্মপ্রেম পুজ্য। ঘৃণায় সরে গিয়ে আমার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। অকিলের কথা বারবার মনে পড়ছিল। না খেয়েই শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি- ভার্টিটির সেই উদ্যানটি রফিক, ... বসা- মধ্য বয়সী সেই অকিল দাঁড়িয়ে, তার মা বাবা হারিয়ে গেছে, হানাদার বাহিনী তার খুড়ি মা- কত আদর করে থাকে ইত্যাকার সব কিছু স্পপ্লের ঘোরে ভেসে আসতে লাগল। বাড়ি আসলাম, আমার কথাগুলি বুকে শেলের মত বিধছে, এমন মা না থাকাই ভাল, স্বপ্ন দেখছি।

হঠাৎ ডাইনি মা'র ডাকে ঘুম থেকে হ্রমুড়িয়ে উঠলাম, তখন বেলা বেশ নেমে গেছে। আকাশ কোলাহল- হাত মুখ ধুইয়ে চারটে খেলাম। সন্ধ্যার সময় একটু খোলা ময়দানে ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস; নৈমিত্তিক অভ্যাস। তাই হাঁটতে লাগলাম, এমন সময় মনে হল, ঐ রকম একজন অকিল যদি আবার পাই কিংবা তাকেই যদি আবার এই সময় পেতাম?

১৫/১২/১৯৮৭ খ্রিঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

অনুভূতি

জীবনটা কি? অস্পষ্টভাবে ভাবছিল কায়েস। অস্তিত্বের জন্য বাঁচার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির সাথে লড়াই করতে করতে রণসাজ না করে একদিন চলে যেতে হয়। এছাড়া আর কিই বা হতে পারে কত সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা, কান্না-হাসি জড়ানো এ জীবনে।

বাতাস বইছে ধীরে। কোন লাভ নেই বাধা দিয়ে কি কাজ আছে। যে যার মতে চলুক-বলুক আপনার কথা, শুধু চেয়ে দেখি। আমার জীবনের খেলা শেষ, হবে আরো অনেকের। শেষে পৃথিবীর শুদ্ধ সবারই।

আমি কি করে এলাম এখানে? আমাকে তো আমিই বুঝাতে পারছি না। আমাকে যখন বুঝাতে চাই তখন অসংখ্য ভাবনারাশি এসে ভিড় করে, আমি তো আর ছোট, খোকাটি নই। মা'র কাছে লালিত পালিত হয়েছি। আদরে সোহাগে একটু একটু করে বড় করে তুলছেন। তারপর বিদায় করেছেন। কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তারপর কর্ম সাজ করে..... কোথা যাব ? ভাবতে ভাবতে কায়েস ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে একটানা ঝাঁ ঝাঁর শব্দে মনের অবস্থাটা যে কি হলো বলতে পারি না- একটা নিসঙ্গতা মনে বিরাজ করছে। কায়েস বই লয়ে বসল পাঠাভ্যাস করতে কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। তার মনে বার বার মনে পড়ছিল শশাংকের কথা। বেচারী কত কষ্টই না করে। সারাদিন কাঠ কেটে সন্ধ্যা বেলায় একটা বাড়ীর ধ্বংসে পড়া ছাদের নীচে সংকীর্ণ একটু জায়গায় তার সাজানো সংসার। সারাদিনে যা আয় রোজগার করে চাউল ডাউল বা আলু সিদ্ধ করে মনের আনন্দে খেয়ে শুইয়ে থাকে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে.....

তার সংসার ছিল, বউ ঝি সবই ছিল। কিন্তু প্রকৃতি এতই নিষ্ঠুর যে, কিছুই মায়াজালে বাঁধতে নেই। যাকে বাঁধবে সেই একদিন বুকে শেল দিয়ে চলে যাবে নির্ধিকায়। তাই হল। শশাংকের বউ তাকে ফেলে রেখে চলে গেল ওপাড়ে.....

মনে পড়ে, আমার অতীত জীবনের কথা, একদিন একটা মেয়েকে ভাল বাসতাম। কিন্তু সমাজ সেই মেয়েটাকে কেড়ে নিল আমার কাছ হতে। এসব অনেক কিছুই তার মনের কোণে ঘুরতে লাগল তাই এ বেলা আর পড়া হলো না।

কায়েস এম এস সি পড়ছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। পূর্বে বাড়ীর অবস্থা ভালই ছিল। মা-বাবার অহেতুক ঝগড়া ঝাটিতে কায়েসদের সংসারে যেমন এনেছে অশান্তি তেমনি দারিদ্রতাও।

কায়েসের মা ছিল বড়লোকের মেয়ে। অর্থাৎ ধনীর দুলালী। এক সময়ে খামখেয়ালীর জন্য তার বাবার চাকুরীটা চলে গেল। চারটে ভাই বোন সহ কায়েসের বাবা চলে এল দেশের বাড়ীতে। তার মা দাদুর সংগে ভাল সম্পর্ক রাখতে পারে নি। দৈনিকেই ঝগড়া করত এটা ওটা নিয়ে। আর সংসারের উন্নতির জন্য বলতে গেলে কোন চেষ্টাই করত না। এমনকি কায়েসদের পূর্ব পুরুষের পেশা গৃহস্তি করাকে তিরস্কার করত আর সেই পেশার জন্য বিরুদ্ধ কাজ যা অর্থাৎ যে কাজ করলে তাড়াতাড়ি সংসার ডুবে যায় সেই কাজই করত কায়েসের মা। কামলা মজুরদের তাড়িয়ে দিত। বাবার সংগে ঝগড়া, দাদুর সংগে চাচীর সংগে এক কথায় সকলের সংগে ঝগড়া ছিল তার নেশা। অবশ্য এ ঝগড়ায় পড়শী মহিলারা যোগান দিত অনেক। নিকটাত্মীয়রা একটা বিষয় পেলেই ঘন্টার পর ঘন্টা চলত বকাবকী। আর বাবা কিছু বললে তো অগ্নিশর্মা। যাকগে এভাবে যখন সংসারের দীপ নিভু নিভু ঠিক তখনই এক ভীষণ ব্যাপার ঘটল কায়েসের জীবনে।

কায়েস তখন বি এস সি প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে বরাবর ভাল ছাত্র ছিল। কৃতিত্বের সাথে আগের ক্লাশগুলি পেরিয়ে এসেছে। তার মানে, সব সময়ই তার মনে বৈরাগ্য অবস্থা বিরাজ করত। অর্থাৎ পরকালীন তত্ত্বে সে মশগুল থাকতে ভালবাসত। আর সেই সুযোগে এক ধর্মাত্ম লোক তার জীবনের মোড় ঘুরে দেবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে তাকে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগল। এখানে একটা কথা বলার দরকার, মানুষ যখন কোন কিছুর সন্ধান করে মনে মনে তখন সেইটে না পাওয়া পর্যন্ত তার কোন একটা অস্বস্তি ভাব থাকে। আর এমনি সময়ে যদি কোন বয়সের চাপে সুন্দরের দেখা পেয়ে যায় তখনই ক্ষেপে উঠে। কায়েসের তাই হল। একটা অসম বয়সী মেয়ের সাথে প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে প্রেম নিবেদন করল। কিন্তু মেয়ে কতটুকু বুঝতে পারছিল প্রেম জানি না-কায়েস কিন্তু প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে নাছোরবান্দা ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করবে আর কি.....। বোধ করি মেয়ে প্রত্যাখান করছিল প্রেম।

আর সেই জন্যই কায়েস যখন তার প্রেম বাস্তবায়ন অর্থাৎ বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগে তখন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের হঠাৎ গরীব হলে যা দশা হয় কায়েসের ঠিক তাই হল আর কি, সমাজ তাকে সমস্ত গ্লানি দিল এমনকি অপমান করতেও ছাড়ল না। কেন না মেয়েটি ছিল ছোট জাতের। আর সম্পর্কেও নাকি ইয়ে.....ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কায়েস যখন প্রেমে ব্যর্থ হল অর্থাৎ সমাজের দ্বারাই হোক বা অসমবয়সী মেয়ের প্রত্যাখ্যান জনিত কারণেই হোক, তখন থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। হঠাৎ সে সম্মিত ফিরে গেল। সে বুঝতে পারল তার জীবনের অনেক কাজ বাকী আছে। ছাত্র জীবনের পূর্ণ গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে, প্রচুর পড়াশোনা ভাল রেজাল্ট আর চিরস্মরণীয় হওয়ার অভিপ্রায় মনে ভেসে উঠল। সেই ভাবেই নিজেকে তৈরী করতে লাগল। আজ তাই তার জীবন সম্ভাবনাময়- জীবনের সুত্রের সাথে মিশে যাবার উপক্রম। নারী স্বাদের চেয়ে জীবনের স্বাদ অনেক মূল্যবান। এখন সে কাজ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না।

উপন্যাসের পাতা, নাটকে কিংবা চলচ্চিত্রে নায়ক যে রকম ঘটনার চক্রজালে হঠাৎ সাফল্য লাভ করে, তার জীবনে কিন্তু তা নয় বাস্তবে দন্ধ হয়ে পোড়ে খাটি সোনা যেমন প্রকাশ পেতে থাকে তাকেও তেমনি পুড়ে পুড়ে খাটি হতে হবে। তবে ২/৩ ঘটায় নয়, জীবনের পঁচিশটা বছর তার প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের সাথে সংগ্রাম করে করে শেষে বিজয়ী বেশে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে। এর মধ্যে মায়াজাল প্রেম ভালবাসা আপনা থেকেই আসবে- এই তো জীবনের ধর্ম- কাউকে কোন বিশেষ জীবকে প্রেম নিবেদন করে নয়। এ যে পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম- মায়াজাল না ফেলে পৃথিবী তো কাউকে মুক্তি দেয় না- এর জন্যে আর ভাবনার কি অবকাশ আছে?

কায়েস ভাবতে লাগল, মৃত্যু তো একদিন আসবেই। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। তাই আমাকে একটা কাজ করতে হবে। পৃথিবীর যেখানে যতটা ফুল পাব ভুল না করে তা সযতনে গুঁকে গুঁকে বুকটা এক বিঘত উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ঈশ্বরকে বলব, হে ঈশ্বর তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ এ স্বর্গীয় জিনিসের কদর করার বুদ্ধি যখন তুমি আমাকে দিয়েছে, আমার হৃদয়ের সমস্ত হৃদয়তটুকুন দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করে যাবই।

যে যাহাই বলুক না কেন- পৃথিবীটা যত যন্ত্রণা আর পাপাচারে মানুষ ভর্তি বলে মানুষ যত মন্তব্যই করুক না কেন- আমি অন্তত এমন একটি অমূল্য ধনের সন্ধান পেয়েছি আমার মনে, আর তা হলো পরশ পাথরের সংস্পর্শে গেলে, যে ভাবনায় উদ্দীপ্ত হলে, হৃদয়ের গুণগুলো সূর্য রশ্মির মতো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীতে সত্যিকারের স্বর্গীয় রাজ্য কায়েম হবে- এ পৃথিবীতেই, এই চেতনা। আমার গুণবিকাশের এই চেতনা আমাকে উদ্বেলিত এবং উজ্জীবিত করেছে ক্ষণে ক্ষণে।

হঠাৎ ঘরের শিকলটা নড়ে উঠল। কায়েস বললে, কে আগে খুলুন না মেয়া সাব কে আবার কি? কায়েস তার ভাবনা জাল হতে কোন রকমে মুক্ত হয়ে অনেকটা বিরক্তি ভরে দরজাটা খুলে দিল। এমনি সময়ে সেই ঝুলকায় অদ্ভুত চেহারার লোকটি বৃহদাকার চক্ষু দুইটি বের করে বলে উঠল, ভাড়াটা দেন। কায়েস তৎক্ষণাৎ কিছু স্থির করতে না পেরে বলল, আজ মাসের কত তারিখ? লোকটি বলল- ১ তারিখ। আচ্ছা নিন, দিচ্ছি। লোকটি বলল, ‘কত দিলেন, ৭০ টাকা না, আর ১০ টাকা কই’? কায়েস বলল, ‘কেন’? লোকটি আবার বলল, ‘গত মাসে ১৫ ও ১৬ তারিখ আপনার আত্মীয় এসে থেকে ছিল। দু’দিনের ৫ টাকা হ্যাঁ তাই দিন’।

কায়েস চমকে উঠল। ভাই দু’দিন থেকে গেছে তার ভাড়াও! কি ব্যাপার লোকটা বলে কি? কায়েস বলল, কেন- এমননিতে আত্মীয় স্বজন আসলেই ভাড়া দিতে হবে- এমন কোন কথা আছে? লোকটা কর্কশ স্বরে বলল ‘৫ টাকা না দিলে চলে যান- এখানে অতিরিক্ত লোক রাখা, যায় না’। কায়েস মনে মনে লোকটার প্রতি ঘৃণায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। তাই আর কি- ট্র্যাংক খুলে নিরুপায় হয়ে ৫ টাকা তার হাতে গুঁজে দিতেই আর একবার ভুতুরে চক্ষু নিষ্ক্ষেপ করে চলে গেল লোকটি। কায়েস মনে মনে ভাবতে লাগল- লোকটা আস্ত একটা কসাই- কায়েসের ফুলের মত মনে কসাই-আচরণের যে দাগ পড়ল তা কতই আরও পড়তে পারে বাকী জীবনে। ভাবতে ভাবতে তার কপাল ও নাকের ডগা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।

১৪/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

অসতির খন্ডচিত্র

অফিসের কাজ নিয়া ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক এমনি সময়ে জনৈকা মহিলা এসে উপস্থিত। দেখতে সাদাসিধা সবুজ রঙ্গের একখানি মোটা পাড়ের শাড়ি পরিহিতা। বয়স ৪০ উর্ধ্ব। নাম জিজ্ঞেস করলাম- বললে, অভাগী।

নাম শুনে প্রশ্নের কৌতুহল জাগল। ভাবলাম এই রকম নাম কেন। তিনি নিরুত্তর। পীড়াপীড়ি করাতে বললে, আমরাই অভাগী। তিনটে সন্তান নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। স্বামী মারা গেছে বহুদিন আগে। এখন কিভাবে যে চলি আল্লাহ জানেন। দেখুন ভাই এই চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে ঘুরছি। আমার বাড়ীর পরছার জন্য বাড়ীটা অন্যে দখল করে খায়। আমি অন্যের বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকি। ঠিক এমনি সময়ে ইউপি সদস্য সহ সেক্রেটারীর আগমন ঘটল। সেক্রেটারীর কাছে তার পরছা ছিল তাই-ই দাবী করাতে সে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল- ‘টাকা দেন’। এবং আরো কিছু ধমক দিয়ে চলে গেল।

বেচারীকে আমি ডাকলাম। সে উত্তর দিলো, ‘আইবার লাগছি’। নিকটে আসলে বসতে বললাম। তারপর তার কাছ থেকে জানলাম তার জীবনের ইতিহাস। সে এক করুণ কাহিনী। সবচেয়ে মারাত্মক দিকটা তার সতীত্ব নিয়ে। নানা জনে নানা আলাপ করে। তাকে কলঙ্কীনি বলে। সে আরও বলল, ‘দেখুন আমি আমার সতীত্ব নিয়ে আজ কটি বৎসর যে কিভাবে বেঁচে আছি। হায়রে আমার জীবনের নিরাপত্তা কোথায়, কেউ আমাকে ঠাই দেয় না- আমাকে বলে- সতীত্ব দিলে টাকা পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি’।

আমার প্রশ্ন সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের নৈতিক অবক্ষয়ের রূপ যদি এই হয় একজন অসহায় নারীর প্রতি, তাহলে বলার কিছু থাকে না- থাকে শুধু এইটুকু- এই সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। যাক

আমার সময় হয়ে এসেছে- কাজে যেতে হবে- তাই তাড়া। কিন্তু মনে বাজতে লাগল সমাজের মানুষ দু’মুঠো অল্পের জন্য এই ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করে তা আমার জানা ছিল না। আজ এই অভাগীর কাছে জেনে, ক্ষোভে দুঃখে মনটা কেঁদে উঠল। বাস্তবিক এ ব্যাপারে আমি একটু হেয়ালীই ছিলাম বরাবরই।

কারণ জানি যে, ভ্রষ্টা মেয়েরা স্বেচ্ছায় দেহ ব্যবসায় নামে কিন্তু তাদের ক্ষেত্র আলাদা, যে কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে অথচ সতীত্ব সচেতন, তাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে কেন?

হ্যাঁ তাকে যদি কষ্ট দেয়া হয় তাহলে এই অভাগী যে, তার কপালে দেখি যে রূপ আমার অভিশাপ, গোটা পৃথিবীর সৎ মানুষের অভিশাপ, এই পাষাণগুলো যে অল্পের অভাবে অভাগার মত হয়ে জানোয়ারের মত কলঙ্ক ছাপিয়ে মুখে যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

যাক, যাবার সময় সে বলে গেল, আমার যৌবন বিদায় নিয়েছে। আমি বললাম, সেই ভালো কিন্তু আপনি অভাগী কেন? অভাগী নিরন্তর রহিল। আসলে সমাজ নামক পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির অভাগী পার্শ্ব চরিত্র। অসতির খন্ড চিত্রে তার হৃদয়ের ক্ষত বিক্ষত অবস্থা, দারিদ্রতার উপলব্ধি করার কেউ নেই।

১৭/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

বেকারের ভোজতৃপ্তি

যেমনি ক্ষুধা তেমনি তেষ্ঠা পেয়েছে। মোটেই হাঁটতে পারছি না, শরীরটা কেমন যেমন ভেঙ্গে পড়ছে। মনে ভরসা করতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে, এ সময়ে কেউ যদি দু'প্লেট মুখরোচক খাবার এনে হাজির করত আর মধুময় বুলি আপ্যায়ন করত তাহলে কেমন মজা হতো। আহা এমন কপাল কি হবে- নিরস শুষ্ক মুখে হাসি টেনে বন্ধুবরকে জিঙেস করলাম, এখন কোথা যাচ্ছি? বলতো- ঘুরাঘুরি তো অনেক করলাম, সিটি কলেজ, মিউজিয়াম, নীলক্ষেত, বিশ্ববিদ্যালয় শেষে সেক্রেটারিয়েট কোন ফলোদয় হয়েছে? না, এই মহানগরীর জনস্রোতে ভেসেই বেড়াব কি বললে বন্ধু? রানা হেসে বললে, কি করতে বল? আমি বললাম, কি আর করবে চল যাই কোন মধ্যবিত্ত হোটেলে চারটে গলাধকরণ করে বাঁচি। রানা বললে, 'চলো'।

আবার হাঁটতে লাগলাম, রাজপথের পার্শ্ব দিয়ে- ফুট পথের লন্ড্রী শীতের কাপড়ের দোকান ফাঁক করে করে দেখি রানা একটু কৌতুহলী লোক। একটা নতুন জিনিস দেখলেই কিনতে একেবারে পাগল ঐ যে কাপড়টা কেমন দেখ তো।

আমি বললুম রাখতো কাপড়, এখন কিছু একটা না খেলে মরে যাব। এসো খেয়ে নিই তারপরে তো মহারাজা সাজবার পালা, হলো তো? সে বললে 'চল'। আরে চলতো কয়েক বার বলেছিস কিন্তু চলিস কোথায় একেবারে দেখছি মজে গেছিস? তাকে এক রকম টেনেই হাজির হলাম এক হোটেলে। ছোট মধ্যবিত্ত হোটেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যথেষ্ট খন্দের দু'একজন। হোটেল বয় অভ্যর্থনা দিয়ে চেয়ার দু'খান মুছে বসতে বলল। যথারীতি বসলাম। একটু পরে এক ছোকরা, 'বয়' এসে বলল, স্যার কি খাবেন?

আমি বললুম কি আছে? কই মাছ, চিতল, বোয়াল, খাসির মাংশ..... বলতে লাগল সে।

তাকে থামিয়ে বললুম, দাম কত? আবারো সে একটানা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দামের বহর বলতে লাগলো। খাবারের আদেশ দিয়ে দু'জনেই হাত মুখ ধুয়ে বসে গেলাম। এমনি সময়েই চোখে পড়লো হোটেলের নামটি। একেবারে সোনায়ে সোহাগা, বৈদ্যুতিক কানের মৃদু বায় সঞ্চালন আর একটু পরেই শুনি দোয়েল পাখির কিচির মিচির শব্দ। বাইরে, একি! এখানে আবার অযত্ন সজ্জিত গ্রামের

বৈকাল বেলায় হিজল গাছের ডালে বসা সেই দোয়েলের কুজন। আনন্দে নাচতে
ইচ্ছে হলো। চোখ দু'টো এদিক ওদিক ঘুরাতে লাগলাম। ঐ ঐ যে, একটা বাক্স,
তা উপর দু'টো দোয়েলের ছবি আঁকা, এর ভিতর থেকে শব্দগুলো বের হয়ে
আসছে। যাকগে, আসলে কোন হোটেলের যে বৈশিষ্ট্য- থাকে এ তার বিপরীত।
হোটেলের নাম শুনলেই খাবার না খেলেই থাকা যায়। এমন মানুষের হট্টগোল,
ভীষণ ধোয়া আর ইয়া বড় বুড়ী ওর চক্ষু দুটো বের করে সম্মুখের দরজায়
একখানা আজব প্রাণী বসে থাকে- দাম দিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি- আর
খাবারের তৃপ্তির তো প্রশ্নই আসে না। এখানে কিন্তু তা ছিল না সহাস্য বদনের
সাদাসিধে একটি মানুষ। আর হোটেল ছিল মধ্য বিভূ পরিবারের একটি বাড়ীর
মত। 'কি দেখছ' রানা বললে। কই কিছু না তো। বললাম আমি একটু অন্য মনস্ক
হয়ে ছিলাম- ঢাকা শহরে এমন পরিবেশে তা কোন দিনই খাইনি। কে যেন, বয়
হয়ে নির্মল পরিবেশে অদৃশ্য হাতে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। স্বপ্নের ঘোরে
ধীরে ধীরে যেতে লাগলাম। তাহলে অমন করে নামটির দিকে তাকিয়ে আছিস
কেন? রানা রসিকতা করে আমার দিকে চোখে চোখে হাসছিল, খাবার শেষ করে
বললে কেমন খেলে রে। বললুম খুব ভাল। আরে 'বিলু' খুব ভাল হবে না কেন- এ
যে দিলু হোটেল।

১১/১২/১৯৮৬ খ্রিঃ ঢাকা।

শিক্ষা গুরুর বিচ্ছেদ

বিচ্ছেদ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে আছি। চোখ দিয়ে গড়ায়ে পড়তে লাগল অশ্রু। অব্যক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সব কটি ক্লাশে ছাত্রদের হৃদয়।

‘আমার বুকটা অনেক প্রশস্থ হয়ে যায় যখন দেখতে পাই তোমরা অনেক বড় হয়েছে, দেশের কর্ণধার হয়ে আমার আন্তরিক অভিলাষের চন্দ্র হয়ে আমার সামনে বসে আছ। আমি তোমাদের চির মঙ্গলাকাজী বেঁচে থাক আমার গৌরব হয়ে, দেশের গৌরব হয়ে’.....।

আমরা ‘তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না- শিশুবৎ হয়ে আনন্দে মেতে উঠি যখনি শুনি তোমাদের সুসংবাদ.....।

রেজা স্যারের কথাগুলি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করার পর এক অজানা শ্রদ্ধায় মোহবিষ্টের মত স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি আদর্শ স্থানীয় একজন স্যারই পেয়েছিলাম যিনি পুত্র বৎসল পিতা, ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি স্নেহশীল, মহানুভব ব্যক্তিত্ব। যাকে দেখা মাত্রই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

আজ স্যার অনেক কথাই বললেন বিদায়ী শেষ ক্লাসে। দীর্ঘ একটি বৎসর যিনি সূর্যের মত তার জ্ঞানের কিরণ বিতরণ করতেন আজ আমরা সেই কিরণ হতে সরে দাঁড়ালাম। তবে তিনি যে অমূল্য সম্পদ দান করলেন- তার তুলনা নেই। তা নিয়েই এম এস সি ডিগ্রী লাভ করে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করার যে অনুপ্রেরণা পথ দেখালেন তারই পথ ধরেই মোক্ষম লাভে সমর্থ হবো।

ভাবতে ভাবতে নিখর হয়ে বসেই ছিলাম। স্যারের বিদায়ের বাণী উচ্চারণ হলে যথারীতি দাঁড়ানোর পূর্ব নিয়মে দাঁড়ালাম। আলবেদা.....স্যার হাস্যোজ্জ্বল মুখে আশির্বাদ করে অফিস রুমে ঢুকলেন।

আমরা করলাম কোলাকুলি। যার যার বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ। একটি বৎসর ভাইয়ের মত হয়ে একত্রে মিশে কাটায়ে ছিলাম। বন্ধু চিঠি দিয়ে বলে অশ্রু সজল নেত্রে একে একে বের হলো ক্লাশ রোম থেকে। কিন্তু আমি, আমি তো বের হতে পারছি না, স্যারের টেবিলের কাছে এমনি ভাবেই দাঁড়ায়ে সাদা ধবধবে সেই ক্লাশ রোমটার দিকে তাকায়ে আছি।

বন্ধু মিয়া হোসেন বললে, চল কবীর, বাসায় যাই, রাত তো অনেক হলো।

আমি যেতে পারছি না রে- ‘আমার যেমন কেমন লাগছে’।

আমাকে একটু একা থাকতে দেয়- অসুস্থ স্বরে বললাম আমি। সে আমার মনোভাব বুঝে কোন উত্তর দিল না। চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মনে পড়তে লাগল, এখানে বসে কত ঠাট্টা তামাশা করেছি। আজ কত দিন হলো- কত মুখ একত্রে একই উদ্দেশ্যে কিছু সময় কাটাতাম বিদ্যার্জনে।

এমন কি আর কখনও হবে- নিষ্ঠুর বাস্তবতা এক একজন কে এক এক কর্মক্ষেত্রে টেনে নিবে তার পরে এই ক্লাশ রোমের মত সর্বসহা ধরণী একদিন সবাইকে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে হতে বিদায় দিবে। বলবে- এখন তোমরা যাও- নূতন অপেক্ষা করছে ঐ দেখ আসছে খালি কর আমার বুক। কত নিষ্ঠুর যে এতটুকু- দাম দিলে না হৃদয়ের। আহত পাখীর মত সেদিন ডানা নিয়ে হেচড়াতে হেচড়াতে চলব এক অজানা উদ্দেশ্যে মৃত্যুর মহা সমুদ্রে পাড়ি দিতে..... নাহ আমি আর ভাবতে পারছি না।

এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম- মিয়া হোসেন সান্ত্বনার স্বরে আমাকে বললে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তার কথায় সাই দিলাম হ্যাঁ ঠিকই বলেছ।

সে বললে, ‘চল’ যাই এখন বলে আমার হাত ধরে সামনের দিকে চললাম। ধীরে ধীরে আমরা সে দিনকার মত ক্লাশ হতে বের হলাম।

রাস্তায় নেমে মনে পড়ল এক পরোহিত একদিন বলছিল হৃদয় কোন দিন ভাঙ্গে না- ইহা আঠার মত যেখানেই লাগাও লেগে যাবে- আবার তুলতে চাও- ব্যস টান দাও উঠে যাবে। কিন্তু খানিক ব্যথা পাওয়া যাবে- আবার সে সুস্থ হয়ে উঠবে-পূর্ণ সজীবতা নিয়ে আর কোথাও লাগার জন্য ব্যতিব্যস্ত হবে..... কারণ তার ধর্ম কাউকে আটকে দেয়া.....সেইটে নির্জীব সজীব দুই-ই হতে পারে।

আমার গত জীবনে কত মানুষকে ভালবেসেছি তারা আজ কোথায় আমি কোথায়..... মনেই তো পড়ে না.....।

বিশেষ কতকগুলো ঘটনা হৃদয়ে দাগ কেটে যায় সেই গুলোই বর্ষার ফলকের মত হৃদয়ে বিঁধে থাকে। শত চেষ্টা করেও সেই দাগ মুছে না।

হোটলে এসে খাবারের সময় সেই কথাই মনে পড়ল। রেজা স্যারের কথা..... এমন সোনার মানুষ হয় না- সব কিছুই ভুলা যাবে কিন্তু স্যারের কথা নয়। নদী একদিন শুকিয়ে যায়- তার গতি পরিবর্তন করে।

কিন্তু চির জীবন সে বেঁচে থাকে সেই প্রকৃতির কাছে যে এই বুড়িগঙ্গা একদিন ঐ দিক দিয়েই প্রবাহিত হতো। স্যার আমাদের হৃদয় রাজ্যের রাজা, রাজা মরে আবার নতুন রাজার তার স্ফুলাভিষিক্ত হয় কিন্তু যেই মানুষের জন্য মহৎ কিছু করে সেই অনন্তকাল হৃদয় রাজ্যে বেঁচে থাকে। স্যারও তাই.....।

অশ্রুর বন্যা নেমে আসল, খেতে পারলাম না। উঠে এলাম। কে যেন আমার পিছন দিক দিয়ে বলছে এই ছেলে মানুষ হও বেঁচে থাক আশির্বাদ করি।

এই দু'ঘন্টার মধ্যে কত কথামনে উদয় হলো- অশ্রু বিসর্জন দিলাম। এখন টেবিলে বসে আছি। ভাবছি একটা কিছু লিখব। কি লিখব গল্প না, কবিতা না, অন্য কিছু। না গল্পই লিখি। কারণ মানুষের জীবনটাই একটি হৃদয় বিদারক গল্প। এ গল্পের শুরু আছে শেষ নেই.....।

১৭/১২/১৯৮৭ খ্রিঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খবরের কাগজ

খবরটা শুনামাত্র চমকিয়া উঠিল কানন।

মানুষের ভিতরটা দেখিয়া ভাল না মন্দ সনাক্ত করিবার উপায় নাই বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত চেহারা ফুটিয়া উঠে। কাননের মনে একটা সহজতর সরলতা আছে। আর ভগবানের কৃপায় সেই জন্যই পৃথিবীর কাহাকেও সে পর ভাবিতে পারে না। মানুষ যে মানুষের জন্য এত নিষ্ঠুর, এতটা পাষন্ড হইতে পারে তাহা তাহার কল্পনাতে।

‘জীবনের সব কয়টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। শেষ পরীক্ষাটি যথারীতি উত্তীর্ণ হইতে পারি কি না, ভাবিয়া উঠিতে পারি না। খুব বেশী পড়তে ইচ্ছা হয় না। নানাবিধ চিন্তাভাবনা- জীবিকার সন্ধান, অনেক সময় অপচয় করে বিশেষ করে সকাল বিকাল সন্ধ্যা ফুরসৎ নাই। একটা না একটা কাজ আছেই। ইচ্ছা করিলেই সেগুলি উপেক্ষা করিয়া চলা যায় না। আর চলিলেও ভাল লাগে না। যাক সেই কথা। কানন আবার ভাবিতে লাগিল।

‘সমবয়সী ছেলেদের সাথে একান্ত হইয়া মিশিয়া গিয়াছিলাম। আর সেই জন্য ব্যথাটা লাগিল শরীরের কোথাও নয় একেবারে কলিজায়।’

শুনিতে পাইলাম আমার কিছু হিতৈষী (হিতৈষী?) আমার জন্য খাটিতেছেন। আর উহাকে খাটিতেছেন বলিবার উপায় রহিল কৈ? যে কলিজায় একবার আঘাত পাইয়া উচ্চ শিক্ষার দুয়ারে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিলাম, ভাগিয়া চুরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিবার অপ প্রচেষ্টায় যাহারা আমাকে ঢুকিতে বলিয়াছিল তাহারাই আবার পিছন দিক হইতে গায়ের চামড়া চিরিয়া বাহির করিয়া আনিতে চাহে।

খামার বাড়ীতে ‘মানুষ’ হইতে ছিলাম। দেখিলাম মামারা উচ্চ শিক্ষাকে বেশী পছন্দ করেন। ধনাতিশয্যে তাহাদের তাকাবরির সীমা নাই। বাবা ছিলেন গরীব। দুই দুইটা পেন্ট সার্ট কিনিয়া ছেলেকে দিয়া আনন্দ পাইবেন সে সামর্থ্য ছিল না। ভাইবোনদের সংখ্যা বেশী হওয়ার সবার মন রক্ষা করিয়া চলাও ছিল

বাবার পক্ষে এক কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক এসব ব্যাপার আমি মোটেই চাহিয়া দেখিতাম না।

ছোটবেলা হইতে আমাকে কি চিন্তায় পাইয়া বসিল। মনে পড়ে আমি যখন অষ্টম কি নবম শ্রেণীর তখনই একা একা বাটীর কাছে ‘ভিটার জঙ্গল’ নামের যে অরন্যটি ছিল তাহাতেই দাড়াইয়া দাড়াইয়া সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দিতাম। আর মনে মনে বলিতাম ‘হে প্রকৃতি হে অন্ধকার নিবিড় নির্জনতা তুমি কিসের ইংগিত। তোমাকে আমার এত ভাল লাগে কেন। তোমাকে দেখিয়া আমার অন্তরে যে শান্তি পাই আর কিছুতে তো তাহা হয় না’। ছোট একটা খাতা নিয়া বসিয়া লিখিতাম কবিতা। আজও সে কবিতাগুলি আছে। কিছু কিছু হারাইয়া গিয়াছে কালের ঘূর্ণীপাকে। ভাবনা মোড় নেওয়ায় যখন কলেজে পড়ি তখন সেই নৈর্ব্যক্তিক ভাবনা ঈশ্বর চেতনায় রূপ নেয়। মামার বাড়ী হইতে সন্ধ্যার সময় এক রকম পলাইয়া চলিয়া আসিতাম অদূরে একটা মসজিদে শুনিতাম পুরোহিতদের মুখে দেবরাণী যখন ঘরে ফিরিতাম তখন রাত দশটা কোন কোন দিন এগারটা এমনকি বারটা পর্যন্ত বাজিয়া যাইত, নানা বলিতেন কিরে কানন তুই প্রত্যেক দিন কই যাস।

মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিতাম আবার বলিতেন ‘বুঝিলাম মাথা খাইছে, তোমার দ্বারা আর লেখাপড়া হবে না..... একেবারে সেকেলে, মানুষের সাথে মিশতে পারে না কিছু, বুঝে না সমাজ জ্ঞানটা পর্যন্ত নাই ননসেন্স কোথাকার কী মৌলভী হতে চাস? আর কি করবো, যা দেখ মিচারে ভাত আছে খাইয়ে শুইয়ে থাক’.....কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতাম।

এমনি করেই দিন চলিত কেহ আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিত না আর আমিও আমাকে বুঝাইতে.....কাহারো গায়ে পড়িতাম না। তাই স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইলাম সেই দিনই যে দিন আমার ‘আত্মজ্ঞান’ পাণ্ডু হইলে প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবন যাত্রার বৈচিত্র্যতার সাথে সর্বোপরী পাখীর কাকলীর সুরে সুরে মিলিয়া গেলাম। যাক আজ অনেক কথাই মনে পড়িল। জীবনে এই প্রান্তে দাড়াইয়া মানুষ চিনিতে ভুল করিয়া ফেলি নিজের গন্ডির বাহিরে যাইতে পারিনা আমার রাজ্যের বাহিরে যেন আর কিছুই নাই। সমাজটা যে পাপ হিংসা আর মানুষকে মানুষে পিপড়ার মত পিষাইয়া মারিতে ব্যতিব্যস্ত সেই খবরই আমার নাই। এক বন্ধু বললে ‘দেখ তোমার কোন ভাবনা নাই’ তোমার মঙ্গল চিন্তা করিয়া আমি পরীক্ষার যাহাতে ব্যঘাত সৃষ্টি না হয় সেই দিক লক্ষ্য রাখিব’। মনে মনে হাসিলাম-গাছের

গোড়া কাটিয়া আগায় পানি দেওয়া আর কি'। বলিলাম বন্ধু ঠিকই বলিয়াছ- তোমার মঙ্গল করিবে না তো করিবে কে। ঘৃণায় শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল সরিয়া আসিয়া ঢুকিলাম অফিসে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে..... আমি বদলি। অথচ কি করিয়া হইল কার চক্রান্তে হইল.....বুঝিতে আর বাকী রহিল না এ যে ঐ হিতৈষী বন্ধুটির কারসাজি কিন্তু আমি তো কারও অমঙ্গল করি নাই।

ছোট বেলায় মায়ের আদর পাইয়াছিলাম। আর সেই আদরের মনের হৃষ্টপুষ্টতা আছে। যখন বড় হইলাম মানুষের সংস্পর্শে আসিলাম দেখিলাম এখানে আদর বলিতে কিছুই নাই, আঘাতের পর আঘাত আর কাহারও কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার লক্ষণ দেখিলে অন্য একটি মানুষ তাহা কাড়িয়া নিতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া মরে। কাহারও সাথে একটু আন্তরিকতা জমিয়া উঠিলেই ভগবান মানুষের রূপ নিয়া বিচ্ছেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তখন এত বড় পৃথিবীটার আর কোথাও মাথাগুজিবার ঠাই মিলে না। বস্তৃত যাহাকে হৃদয় দিয়াছি একটু পরেই সরিয়া দাড়াইতে হইয়াছে। টাকাই যেন সব। টাকাই মানুষকে মানুষের কাছে নেয় আবার টাকাই দূরে সরাইয়া দেয়। টাকা থাকিলে চিনি না থাকিলে চিনি না। সম্মান আত্মীয়তা আছে সম্মান না থাকিলে নাই। বড় লোক হইলে মানুষ আদর করে সম্মান করে ভয় পায়, ছোট লোক হইলে পিষিয়া মারে। সমাজের চৌকিদার-পিয়ন চাপরাশি যাহার তাহার কি অফিসের চোখে মানুষ রূপে বাঁচে না.....না একটা নিছক জন্তুরূপে বাঁচে তাহা সহজেই অনুমেয়।

হৃদয়ের রক্তকরণ হইতে হইতে গুলিবিদ্ধ প্রাণীরা যে রূপ মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়ে তেমনি আমারও পর্যদুস্ত প্রকৃত মানুষের কাহিনী হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া লিখিয়া একদিন যখন রক্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে, দমবন্ধ হইয়া আসিবে সেই দিন লিখা শেষ হইবে এবং বায়ুমন্ডলে, ঘূর্ণী হাওয়ায় অথবা মৃদুলয়ে প্রেতাত্মা রূপে দেখিল, পৃথিবীর লীলাখেলা। সেই দিন হয়ত বাচার জন্য এতটুকু অধিকারের জন্য কাহারো গাল মন্দ শুনিতে হইবে না প্রতিযোগিতায় লড়িয়া পরাজয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইবে না। কেননা, একটা প্রবাদ আছে প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ নয়। ধনীরা ঠাকায় নিম্নবিত্তকে, তাহারা গরীবকে, গরীব আবার নিঃস্বকে এতিমকে.....কেউ মুক্ত নয়। অপরের একটু শূন্যতা দেখিলেই দুষিত হাওয়ায় তাহা ভরিয়া দেয়। সংগে সংগে হাইড্রোজেন

বোমার মত ঘন গ্যাসের আবরণ পৃথিবীটা ছাইয়া ফেলে এক নিমিষে মৃত্যু ঘটে লক্ষ কোটি প্রাণীর। আজ আমাদের মনটাও সেই হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে মরিয়া গিয়াছে বাঁচিয়া আছে নিষ্ঠুর জৈবিক দেহ সহ সমেত একটি যান্ত্রিক বানর.....।

ভাবিতে ভাবিতে কাননের দুঃখে, ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিপদ বুঝি চতুর্দিক দিয়া একবার আসে না হইলে আর সময় ছিল না। পড়ার টেবিলে পুস্তকগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনে হয় হে পুস্তক অবাধ্য সাধক তুমি যে আমাকে মায়ের ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া দূর বিভূয়ে আশ্রম দিয়া রাখিয়াছি তোমার তপস্যায় তেমনি ভূবন ঘিরিয়া আছে যে, সুন্দর সবুজ শ্যামল গাছপালা তরলতা আর ভালমন্দের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবিত্রা সবাইকে ভালবাসতে শিখাও অন্যথায় আমার সাথে ছলনা ছাড়িয়া দাও। আমি মায়ের ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইব।

যে খবর মানুষ হইতে মানুষকে দূরে সরাইরা দেয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়রত মানবের নাটক দেখার মোহ ভঙ্গ করে সে খবর নেই খবর আমি শুনিতে চাই না।

কাননের বৃকে ফুটিল ফুল সুঘ্রাণে মঞ্জুরিয়া, বিটপে ডাকিল বুলবুল, ভ্রমর আর চোখে দেখিল, মানুষের সুখ-দুঃখের অত্যাচারের কাহিনী ভরা খবরের কাগজ।

১২/০১/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

বাসন্তী

সারাদিন হন্যে হয়ে কল্লনা রাজ্যে উড়ছিলাম। প্রত্যহ নিয়মিত সিগারেট সেবীদের আমি একজন। ও অভ্যেসটি চরিতার্থ করার জন্য যাই সাধু দাসের দোকানে। দোকান বলিতে রাস্তার ধারে সমান মাটিতে পাটখড়ি বেষ্টিত আর সারের প্লাষ্টিক কাগজ সমেত একটি গোলাকৃতি মাচা। গুটি কয়েক জাতের কম দামী বিসকিট গোটা আটেক বিচী বীচি কলা ঝুলানো এবং এক পার্শ্বে গন্ধময় তৈলাক্ত একটি বালিশ ও একটি পেচানো কাঁথা। মধ্যভাগে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আর বিড়ি।

দোকানে গেলেই সাধু চাচা আমাকে খাতির করে একটি চিকন হাসি দিয়ে গদ গদ করে মোটামুটি কচুলের কিটকাঠি রঙ্গের দাড়ি নাড়িয়ে বলেন, স্যার দামটা পরেই দিয়েন। কখনও পকেটে পয়সা থাকিলে দিয়ে আসি আর কখনও না থাকিলে বলি হিসাবটা কষে- অন্য সময় দিয়ে দেব।

বরাবরই জানতে ইচ্ছে করে ওই ছোট্ট দোকান দিয়ে বেচারার কি করে চলে। সে দিন আবার কিছু বাকী রইলো না। সবই দেখলাম ও সবই বুঝলাম। কারণ ইতিমধ্যে পরিবারটির মধ্যে আমার তা অনেক আত্মীয়তা জন্মে গেছে।

গোসল করতে গেছি নদীতে। নদীর ধারে রয়েছে ঘন কলা গাছ আর ছোট বড় ফলবিহীন গাছ গাছরা। প্রায় কোয়ার্টার মাইল ব্যাপী এ গাছগুলির যত্ন খুব একটা নেই। তার একটা কারণ আছে। এই কান্দা ছকটার মালিক হলেন নির্মল চন্দ্র সরকার তার অনেক জমি। চল্লিশ একর ছাড়িয়ে গেছে কিনা তাই আধিক্য হেতু তিনি খোঁজ খবর নিতে পারেন না। গোমস্তাদির প্রায়ই এসে ঝোপঝাড় কেটে কলাকধিটি বুঝাই করে বাটীতে নিয়ে যান। তিনি তার চোখ রাঙিয়ে গোমস্তাদের কাঁপিয়ে তুলেন হিসাবের চোটে। যাক সে কথা।

সম্বোধন বললুম ‘কি নাড়ছেন’। এক চক্ষু ভাল করে প্রসারিত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ‘নাকড়ি কাটবার লাগছি’। প্রায়ই দেখি রাস্তার ধারে তিনি মাটি কাটেন। বিনিময়ে গম পান। কিছুটা লজ্জাবশত তখন তিনি কথা বলেন না। এইবার সব বলে দিলেন। কারণ মানুষের দুঃখের বুঝা যখন ভারী হয়ে যায় তখন কিনা আপনা আপনি কারো হৃদয়ের ছোঁয়া লাগলেই সে দিকে গড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন, আমার অইলে দু’ছেলে।

বললাম, তা আপনি এত পরিশ্রম করেন যে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাবা ভাত দিবু ক্যা, গম আলতি পাই না’। বললাম, তা আপনার ছেলেদের এসব করতে বলুন। বললেন, ছোট চোখরার ঘরে ভাত নাইক্যা।

বললাম, দেখুন আপনি এসব কাটছে মালিক জানে। তিনি বলেন, ‘দাদারা এগুলি দে কী করবে লে’।

বললাম, সাধু চাচা কিছু রোজগার করে না। তিনি বললেন, ‘সিদ্ধি মেয়ে যা রোজগার করে সব পয়হা উড়ায় ক্যা’। কথায় বুঝলাম গোটা পরিবারটিই তাকে এভাবে চালাতে হয়। নাম মাত্র দোকানের আয়, রাস্তার গম আর খুড়িয়ে আনা খড় কুটা দিয়ে বাসন্তী চাচীর সংসার।

ও দিকে চাচীর চাইতে নিঃস্ব আর একজন লোক বাস করে। তারই পার্শ্বে সৎ পুত্র পরিজন সবাই তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে পশ্চিমে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর ফেরত আসে নি। এখন তিনি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিজ হাতে রান্না বান্না করে আহাৰ করেন। এ বৃদ্ধ চাচা কানে কম শুনে। যে একটা পুরান বাড়ীতে চাচীরা শশধর চাচা থাকত তা দখল করে নিলে চেয়ারম্যান। এখন রাস্তার ধারে তারা ছোট একটা তেচালা তুলে থাকে।

মধ্যরাতে যখন তারই কাহিনী লিখতে বসলাম ঠিক তখনই কানে পৌঁছল বেহুলার রূপক করুণ কণ্ঠস্বর ‘বিধির কি হইল রে’। কেইবা সুখের ঢোল পিটায় আর কেউ সুখের ঢোল পিটায়ে নিঃস্ব হয়। ঈশ্বর থাকেন অনেক দূরে। ঈশ্বর যদি গাজা খেয়ে পাওয়া যাবে তবে বাসন্তী চাচীর লাকড়ীর বোঝা টানতে হতো না। আর বর্তমান পৃথিবীর অস্বাভাবিক উন্নতি আর সেদিকে ধাবমান আমার কল্পনা যার কোন ঠিকানা নেই অকস্মাৎ নেমে আসতো না এই বাসন্তী চাচীর জীর্ণ কুঠিরে।

মানুষ মানুষকে নিয়ে যখন ঠাট্টা আরম্ভ করে তখনই বড্ড কষ্ট লাগে। নচেৎ যার দাড়াবার জায়গা নেই তাকে কেন বড় লোকেরা খেলার পুতুল সাজায়। খেলা শেষ হলে এক সময় ভেঙ্গে চুরমার করে। গরীবের সুখ স্বপ্ন থাকে বৈকি। আর সেই সুখের সহযাত্রী হয়ে এক সময় সুখের সবটুকু রস একেবারে পান করে ধনগর্বে মাতাল সুচতুর কর্তা ব্যক্তিরা ঠেলে দেয় মানুষ নামের প্রাণীগুলোকে চরম নরকের অতল গর্ভে।

আমার বিশ্বাস এই বাসন্তী চাচীর দুর্দশার শেষ এক জায়গা আছে সেইটে মরণ। বহুযুগ অতিক্রান্ত হলো সমাজের এ শ্রেণীটি যারা দুঃখ নিয়ে ঘর সংসার করে, দুঃখই থাকে চির সাথী। চক্ষু খোলেন না তারা জগৎটা কোন চাকায় ঘুরছে। কেমন করে ঠকিয়ে বড় হতে হয় এ কায়দা বুঝি জানা নেই। নইলে সাথুর কর্মশালা গাজার আস্তানা না হয়ে হতো ঈশ্বরের জমি কিংবা টাকার কোষাগার। ঈশ্বর বুঝি এ অচেতন মানুষগুলো সৃষ্টি করেছেন জগৎবাসীদের তামাসা দেখবার জন্যে নইলে মানুষ নিয়ে কেন।

হ্যাঁ একদিন জেগে উঠবেই তারা তবে ঈশ্বরের অলক্ষ্যে সেই ঈশ্বর বড় লোকের ধন কুবের পাপীর মুখ সোনার মুচড়ে থুবড়ে যাবে— ভেসে উঠবে পাপের চিত্র।

সেদিন বাসন্তী চাচীর বসন্ত দাগ সমেতে মুখখানি হবে চাঁদের মত উজ্জ্বল আভায় পূর্ণ স্বর্গীয় ছবি। হয়ত বা তার দক্ষীভূত খাটি সত্যাব্রত অন্তর হইতে ভেসে আসবে মানুষের জন্যে একটি কথা মানুষের কল্পনার আর মানুষের জন্যে ঘড়ি..... ঘুম ঘুম হাত নরম হয়ে প্রসারিত হবে ক্ষুধার্তের মুখে দু গ্রাস অন্ন তুলে দিতে।

২/২/৮৭ টিকরপুর।

ভোগান্তি

মাথাসহ কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। অপলক দৃষ্টি চেয়ে আছি জানালা দিয়ে পশ্চিম দিকে সন্ধ্যা লগ্নের রক্তিম আকাশটার দিকে। দু'চারটে, নারকেল গাছ উঁকি দিয়ে দিনের অবসান ঘোষণা করে দিল।

ক্রিং ক্রিং-ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং একটানা শব্দের চোটে বেচারা পিয়ন চমকে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে মহামান্য বসের টেবিলের একপার্শ্বে দারুণ বিনয়াবনত হয়ে দাড়িয়ে থাকে হুকুমের অপেক্ষায়। এক ঘন্টার ভেতর যখন ডজন খানেক ক্রিং ক্রিং-ক্রিং তখন হাপিয়ে গিয়ে পিয়ন বেচারার মুখখানা যে কিরূপ আকৃতির হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এ যেন হঠাৎ দুঃসংবাদ প্রাপ্ত কোন পথিক। যাক পিয়ন আর একবার আসল কেরাণীর কাছে। বললাম স্যার আপনাকে ডাকছেন? হ্র মুড়িয়ে ওঠে, গম্ভীর বিনম্র কেরাণী সাহেব তিন লাফে গিয়ে পৌছাল পাশের কামরায় স্যার, আমাকে ডাকছেন? হুঃ বুঝেছি আপনাদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। যান অর্ডারটা নুতন ফাইলে রাখুন। যান, যত্ত সব হুকুম দিলে বড় সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে শ্মশ্রু মন্ডিত নত মুখী কেরাণী সাহেব আন্তে আন্তে কামরা প্রদক্ষিণ করল।

আহারে কি বিপদ ফাইল নেই, একটাও। এখন কি করি বড় সাহেবের হুকুম একটু নড় বড় হলেই, চাকুরী যাবে আর কি। ভাবতে ভাবতে মোস্তাককে ডেকে বললে আচ্ছা এই-হ এই-হ মোস্তাক দেখতো এই আলমারীর ওপর কোন নুতন ফাইল আছে কি না। মোস্তাক পুরাতন গাদা গাদা কত ফাইল ওলট পালট করে জবাব দিল একটু পরে, নাই স্যার। যত কেরাণী সাহেব মুখে কিছু সেই জায়গায় তৎক্ষণাৎ বলতে পারলেন না। শুধু মনে মনে ভাবলেন কার পাল্লায় পড়লাম হঠাৎ বন্যায় যেমন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যায় তেমন দশা তার উপস্থিতি হল। সহকারী একজনকে ডেকে বললো দেখুন যতসব কাজে হুকুম অর্ডার পুরাতন ফাইলে রাখলেই চলতো সহকারী টেবিলে আঙ্গুল ঠুকে জবাব দিল, 'খেয়েতো আর কাজ নেই, যা বলবেন তাই করতে অইব হু'। অগত্যা দুজনই খানিক নিরবতা পালনের পর বেচারা বয়কে একটা স্লিপ লিখে পাঠালেন রাস্তার মোড়ে দোকানে ফাইল আনতে। অফিসে নুতন ফাইল যে নেই, এ অভিমানের খবরটা আর বসের কানে পৌছল না- যেখানের রাগ সেখানেই রয়ে গেল।

ওদিকে আমাদের অবস্থা আরও গুরুতর বহুদূর পল্লী গ্রাম থেকে এসেছি হেড অফিসে নথির উদ্দেশ্যে পেটের ভাতের মাটি টিকেট নিতে। যাক বহুবীর কেরানী সাহেবকে তাগাদা দেবার পর যদি বা তিনি কাগজের হাত দিলেন পরক্ষণেই আপুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই দেখেন স্যার? বলে যাচ্ছেন, আসবেন ৪টায়। আমি নোট দিলে কি হবে। স্যার না আসলে তো আর সই পাবেন না। আচ্ছা, যান একটু বেড়িয়ে আসুন।

কেরানীর সাহেবের ‘বেড়ানোর’ কথাটা শুনে শরীরটা অবশ হয়ে গেলো। ভাবলুম এত দূর থেকে আসলাম। ইচ্ছে করলে দু’মিনিটের কাজ ধরলেই হয় তাই, কিনা বলে। আচ্ছা এখন কি করি কোথা যাই- মাথা ঘুরতে লাগল রান্তিরে কোথায় থাকব? বুঝা গেল কাজ আজ আর হচ্ছে না। মনে আবার সন্দেহে হতে লাগল, কলমের দুটো খুঁচা দিতে আবার মাল পানি মানে ভাল মানসী চায় কিনা। কিন্তু কথায় তো তাও বুঝা মুশ্কিল।

অফিসের বাহিরে এসে এক ছোকরা এতিমের মত দাঁড়িয়ে চায়ের জল মুছছে। জিজ্ঞেস করলাম কি ভাই কি হলো অমন করে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন। বললে সকাল ন’টা হতে খাড়াইয়া আছি দরখাস্তটা নিয়া, কাজ অয় নাই। ট্রেন ফেল কইর্যা ফেলছি- রান্তিরে থাকমু কোথায়।

মুখ শুকে দেখে বললুম- তুমি দুপুরে খেয়েছ কিছু তার কান্না আরও বেড়ে গেল। বুঝলাম খায়নি। পকেট থেকে একখানা নোট বের করে তার হাতে দিয়ে আপাতত ধু ধু মরু ভূমির মরিচিকার মত বে খাবার তাই খেতে গেলাম।

ঘন্টা দেড়েক পরে যখন ফিরলাম, শুনি ও পাশে ‘বসের’ কামরায় নারী কণ্ঠ ও তার কল্ কল্ উচ্চ হাসি। বসও তার মোটা কণ্ঠ দিয়ে সাহেবী কাণ্ড হাসি বের করছেন। বুঝলাম তিনি এসেছেন। মফস্বলের কোন এক অফিসের একজন কেরানী মাখনের এক খানা চেয়ার দখল করে রসিকতা করে মৃদু হাসি দিয়ে বললেন ‘আপনাদের বস অনেক কাজ করেন। একেবারে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। অমন কর্মট হয় না।

সহকারী কেরানী লোকটা একটু বেয়ারা প্রকৃতির। মুখে যা আসে বলে ফেলে। ‘ই’ কথাটা খারাপ কন নাই। অফিস আওয়ারে বাসায় স্ত্রী পিয়া ঘুমাইয়া থাকিয়া বিকেল ৫টা হইতে রাত দশটা পর্যন্ত অফিস করলে মন্দ অয় না। বাসায় স্ত্রী দিয়ে মজা মিটে না। তাই সন্ধ্যা প্রকালে সুন্দরীর আগমন ঘটলে তার সঙ্গ

দেয়া কত নিরাপদ। একি আর ছাড়া যায়। এ সময়টায় তো সবুজ রঙে মোজাইক করা চক্চকে চেম্বারে বসে ঘূর্নীয়মান চেয়ারটা নাড়িয়ে মাথার চুলগুলো ঝাকিয়ে বত্রিশ দন্ত বের করে, আগন্তুক মহিলার সুউচ্চ স্তনদ্বয় দেখা ভারী মজার, ভারী আনন্দের। সময়ে দু'একটা চুম্বন দেয়ার সুযোগ পেলে তো সোনায়ে সোহাগা কাজ তো কচুড়া.....

থামবে, থাম, অত কথা কইস না শুনলে চাকুরীডা খাইবে আরকি। ও চাকুরীর ভয় আমি করি না- উচিৎ কথা কইমু দোষ কি? হু আবার কাজে মনোযোগ দিল ছোট কেরাণী। কটু পরে আবার শুরু করল।

আমাগো বাসায় আর কাজ নেই, হেদা বদমায়েশডার মর্জি রক্ষা চব্বিশ ঘন্টাই খাটতে অইব। ক্ষুধার্ত পেটটা জ্বলত্যাছে। দুপুরে এককাপ চা আর দুইডা বিস্কুট খাইছিলাম- তা না অইলে মরতাম আরকি। ততক্ষণে বিষন্নবদনে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে মফস্বলের অনেকেই চলে গেছে। হয়ত কেউ আত্মীয় বাসায় বিরক্তি সৃষ্টির জন্য কেউ হয়তো বা নিম্নবিত্ত আবাসিক হোটেলের পচা দুর্গন্ধযুক্ত ছারপোকার আশ্রয়দাতা চৌকিটার ওপর রাত্রি যাপনের জন্য। আবারও কলিংবেল পিয়ন দৌড়ালে বস বললেন, সেভেন আপসহ টিফিন নিয়ে এসো স্যারের হাসতে হাসতে, হয়তো গামা শুকিয়ে গেছে তাই এই হুকুম ডা।

এতক্ষণে শহরের সন্ধ্যা বিজলী বাতিগুলো জ্বলে জ্বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নি গোলক থেকে আলোক বিচ্ছু বন করেছে আমরা কিন্তু নাছোড় বান্দা কাজ না মেরে যাচ্ছি না। বসেই রইলাম। আমাদের ধৈর্য্য দেখে কেবাচী সাহেব ফাইল নিয়ে গিয়ে বসের সামনে ধরলেন। সাহেব এখন ক্লান্ত। তার রোমান্টিক মনে কিছুটা স্থবিরতা এসেছে তাই কেরাণীর দিকে কড়া একটা দৃষ্টি দিয়ে ফাইলের ওপরের ভারী কাগজটায় ধরে টান মারলেন দু'তিন খুঁচা দিলেন, গজ গজ করে। তেমনি বমা মহিলাটিরও টনক নড়ল। ভাবছিলাম তিনি আগন্তুক। আসলে তিনি সাহেবেরই একজন অধঃস্থান কর্মচারীনি। তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ও ভুলেই গেছি, আজকের জন্য গাহলে আসি স্যার, সাহেব একটু ক্ষুন্ন হয়ে বসলেন, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি করবেন,

ম্যাডাম,

- সন্ধ্যা হয়ে গেছে তাছাড়া বাসায় ঠিক আছে, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন।

-জী স্যার। বলে মুচকী হাসি দিয়ে কল্যাণী সূত্রধর, বুকটা সটান করে আঁচল নাড়িয়ে বের হয়ে গেল। সাহেব শুধু একবার ও দিকে তাকিয়ে, বন্ধ ঠোঁট দু'টোর ভেতর ঘুরিয়ে নাকের ভেতর দিয়ে বের করলেন, 'হু'।

একটু পরেই ট্রে ভারী করে বলল বিস্কিট সন্দেশ পরাটা সেভেন আপ, ইত্যাদি সহ বেচারা পিয়ন ফিরল। নতমুখে পিয়ন সাহেবের কামড়ায় প্রবেশ করতেই সাহেবে মুখ থেকে প্রথম শব্দ বের হলো, তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না। একটা ১ মিনিটের কাজ করতে পাঠালে একদিন দেরী করে আসবে। ওদিকে সব চুলায় থাক। যাও যন্ত সব। পিয়ন বেচারা এক পাশে রেখে হুকুম পালনে শেষে বেরবার উপক্রম করতেই- তোমার বাপু বাকী কাজটা করবে কে। একেবারে দেখছি ভদ্র লোক। সাহেবের শেষ ব্যঙ্গোক্তিটায় পিয়ন বেচ পায়ে কাটা দিনে উঠল। বাগে ক্ষোভে মনে মনে ভাবতে লাগল, ক্রিং ক্রিং দেরী না করে চব্বিশ ঘন্টা যাব হুকুমের গোলাম থাকি অথচ মর্জি পাই না- আমি অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতিতা স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবে না। শুধু একবার সাহেবের দিকে তাকিয়ে টিফিন প্রস্তুতের কাজে লেগে গেল। রাঙ্গা মাইয়াডাকে খাওয়াতে পারলেন না বলে সাহেব মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলেন।

২/২/৮৭ সেগুনবাগিচা ঢাকা।

কৃষ্ণার স্বভাব

‘কয়লার ময়লা যায় না ধূলে, ইলুত যায় না মুইলে’। গ্রামীণ প্রবাদখানি যে কতখানি সত্য- তা বর্তমান গ্রামে-গঞ্জে তাকালে সহজেই চোখে পড়ে। না হলে পরধন লোভে মত্ত হয়ে থাকে কেন মানুষগুলো। গ্রামে বা শহরে যেখানেই হোক কোন সম্পদের মালিকের যদি উপস্থিত রক্ষনাবেক্ষণকারী কেহ না থাকে তা হলেই হলো, উহা মেরে কেটে খেতে হবে। এমনই হচ্ছে বাবু সুধাংসু হালদারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে। সুধাংসু বাবু চাকুরী সূত্রে বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকেন। খুব একটা বাড়ী ঘরে আসতে পারেন না। ফলে তারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন তারই সম্পত্তি বেচে-কিনে খেয়ে এখন বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে। উল্টো ভয় দেখিয়ে বলে বেড়াচ্ছে- ‘সুধাংসু তুই যা পারিস করিস, সুধাংসু কি আর করবে সে একজন নিরীহ চাকুরে। চাকুরীতে থেকে কীই বা করা যায়!

যাক সে কথা, কান্ডটি ঘটিয়েছে সুধাংসু বাবুর সহোদরা কৃষ্ণা। কৃষ্ণা বোধ করি সুধাংসুর দু’ বছরের বড়। দেখতে শুনতে ভালই। নারীত্বের কোন অভাব তার মধ্যে নেই। যে কারণে সে নিজে হীনমন্যতায় ভোগে সে কারণ আর কিছুই নয়, তা হলো তার উপর পাটির সম্মুখস্থ দাঁত গুলো বেজায় মোটা ও লম্বাটে। ফলে হেসে উঠলে সব দাঁতগুলো দাঁত একেবারে বের হয়। সে নিজেই একবার ডাক্তার সেজে দাঁতগুলো কেটে ফেলার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিধি বাম, দাঁত কি আর বেড দিয়ে কাটা যায়? যা হোক এ হীনম্যতায় তার জীবনে স্থায়ী হয়ে আছে। বাবা মা বিয়ে দিলেও সংসার টিকে নি। জামাই বড্ড খারাপ, যৌতুক লোভী। ফলে কি আর করা যায়। কোন রকম সে যাত্রা মানুষ জন ডেকে তার ঘর ভেঙ্গে দেখা হল এবং কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি একক তার নামে উইল করে দিয়ে মা-বাবা হাফ ছেড়ে বাঁচল।

ইতোমধ্যে কৃষ্ণার ঘরে দু’টো পুত্র-সন্তান জন্মেছিল। তারা কোন রকম কায়ক্লেশে বড় হচ্ছে। তাদের কে খাওয়াচ্ছে আর কে পড়াচ্ছে তা বলা মুসকিল। কোন আয় রুজির যেখানে পথ নেই সেখানে কি ভাবে যে চলে আর কেই বা চালায় তা ভাবতে পারি না।

সুধা বাবু চাকুরে হলেও নিম্ন আয়ের বলে বাবার বৃহৎ সংসার পরিচালনায় ভূমিকা রাখতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, কৃষ্ণার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে। করার কি আছে। সারা দিন দু’মুঠো ভাত পেট পুরে খেতে পায় না, কি ভাবে আর ভাল থাকা যায়। সে তার ছোট ভাইয়ের যা কিছু বনজ সম্পদ আছে তা লুটেপুটে খাচ্ছে। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো- সে নিজে কোন কায়িক পরিশ্রম করবে না। আবার মুখে গা জ্বালা করা কথা বলবে। তার কথা শুনলে যে কোন সময় যে কেউ চটে যেতে পারে। বিশেষ করে ছোট ভাইদের বউগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক বড্ড খারাপ।

একে অপরের মুখে চুন না খসতেই ত্রুটি ধরে বসে এবং ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। অবস্থা এমন হয়েছে তাদের এক মাত্র ছোট ভাইয়ের বিয়ে কিন্তু কোন রকম ব্যবস্থা নেই। কী লজ্জার কথা! সুধার বিয়েতে কারও কোন আগ্রহ ছিল না। ফলে সুধা যেমন তেমন তার বউ একেবারেই তাদের পরিবারের সদস্যদের কথা শুনতে পারে না। কেন না তাকে অযত্ন অবহেলা করা হয়েছিল। সুধা এখন খুব কুষ্ঠা বোধ করছে কারণ সে তার বড় বোনকে বিপদের সময় সহায়তা করতে পারছে না। কৃষ্ণার স্বভাব এতটা খারাপ যে, সে যে একজন স্কুল শিক্ষকের মেয়ে এ পরিচয় দেয়ার শক্তি তার নেই।

কাউকে খাটো করে না দেখে একথা নির্ধিদ্ধায় বলা যায় যে, আসলে একটা মানুষের খাবার পরিমাণ কি? এবং যে পরিমাণই হোক খাবারটুকু সংগ্রহ করতে দৈনিক কত ঘন্টা শ্রম দিতে হয়, যতটুকু শ্রম দিতে হয় ততটা সময় কি কৃষ্ণার নেই? নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সে অকর্মণ্য। সুধাংসু পুরোহিতের মুখে বেদ বা গীতার অমূল্য বাক্য শুনতে বা নিজে পাঠ করতে খুবই আগ্রহী কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। সে জীবনকে যে ভাবে তৈরী করেছে কৃষ্ণা তো সেভাবে জীবন গঠন করে নি। যার ফলে তার মধ্যে নিছক পশু স্বভাব বিদ্যমান। পেটপুরে খাওয়া চাই আর ঘুমান চাই। অন্যের স্বার্থের দিকে না হয় মনোযোগ নাই দিলে কিন্তু যে নির্ধারিত নিয়মে ও দিনে উপোস করে এবং হালকা শ্রম করে জীবিকা অর্জন করে তার কি আর অভাব থাকে। কিন্তু এ কথা কে বুঝাবে? কিছু বলতে গেলে উল্টো ধমক, দুটাকা দেওনের নাম নেই, তিনি আইছেন উপদেশ দিতে। যাক কৃষ্ণাকে উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ বিশেষ করে পুরুষ ও মহিলারা মৌসুমী লেবার। তারা একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করে। অন্য সময় আলস্যে কাটায়। এ কথা আর বলতে চাই না যে এজন্য অন্নাভাব, সন্ত্রাস, চাতুরী, খুন-খারাবী সহ যাবতীয় সামাজিক অপরাধ গুলো সংগঠিত হচ্ছে।

সুধার অফিসের সময় গড়িয়ে এলো। কিন্তু এরই মধ্যে একটা জীবন পর্যালোচনা করে ফেলেছে সে। সে একথা ভেবেছে জীবনের লক্ষ্য কী এবং শুরুটা কি ছিল আজ যদি লক্ষ্যচ্যুত হয় কাল নিশ্চিত তার ভালে নরক। মুহূর্তের ভাবনার মধ্যে যে চল্লিশ বছরের কাহিনী কাব্য লিখা যায়, মনের আয়নায তা বুঝে ঈশ্বরকে সে ধন্যবাদ দিলো। প্রকৃতি পাঠে কেহ প্রমত্ত না হলে, সুধার মত নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তে এরকম ভেবে বেশ পুলক বোধ করে সুধা। কিন্তু কৃষ্ণা কি এ রকম হতে পারে না! আফসোস করে, ভেঙ্গে পড়ে আবার ঘুমিয়ে যায় সে।

০৪/০৯/২০১০ খ্রিঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ।

পলায়নপর ভালোবাসা

রাত দ্বি-প্রহরের পর হইতে এই কাজ শুরু করিতে হয়। কি কাজ শুরু করিতে হয় তাহা বলিবার আগে বলিতে হইতেছে যে, এই যে বিপিন সে খুব বদ মেজাজি। কাজে কাহারো গাফিলতি দেখিলে সে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে এবং রাগে গদগদ করিতে করিতে সহকর্মীকে কোদালের আছাড়ি উচাইয়া মারিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ফেলে। চোখ রাঙ্গাইয়া গৌফ নাড়াইয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে থাকে চৌদ্দ পুরুষের কীর্তি কাহিনী তাহার কথা কেহ শুনুক বা না শুনুক। কিন্তু তাহার ভিতরটা একেবারে ধবধবে শাদা। একটু পরেই সহকর্মী নরেনকে ডাকিয়া বলেন, নে নরেন বিড়ি ধরা। বিড়ি খাইয়া 'ল'। হামারা মাইনেষের গো-মুত পরিষ্কার করিয়া খাই। হামারা কামের বাও না বুঝলে চল্‌বো ক্যামন কইরা। নরেন কোন পত্ন্যন্তর না পাইয়া নিজেই বিড়ি ধরাইয়া সজোরে দুই টান দিয়া কর্মক্লান্ত নরেনের হাতে বিড়ি হস্তান্তর করিয়া কোদাল লইয়া কাজে লাগিয়া যায়। নরেন খাইয়া শেষ করিল কিন্তু নেশা যখন পরিসমাপ্তির দিকে পা বাড়াইল না তখন তার জ্যাটার পূর্বানুমতি লইয়া নিষিদ্ধ পানীয় খাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল যে কাজটি মানুষ গোপনে আড়ালে আবডালে করে সেই গোপন কাজের ময়লা আবর্জনা গভীর রাতে গুরু করিয়া সকাল অবধি গোপনেই চাচা ভাতিজা মিলিয়া সমাধা করিয়া ফেলিল।

কিন্তু বিপত্তি ঘটিল অন্য জায়গায়। সকালে যখন ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীর দোলাইতে দোলাইতে ফুলবানুর প্রত্যন্তর শুনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবে না কি করিবে তাহা বিপিন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার স্ত্রী ফুলবানু বলিয়াছিল, হামি ভাত দিব কইথনে- যে চাউল ছিল তা গত কালই শেষ- হামার কথা হুনে কে-ছাওয়া দুইডা কানতে কানতে ঘুমাইছে রাইতে বলিয়াই সে উচ্চ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন যা আয় রোজগার করে তাহা নিষিদ্ধ পানীয় খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে। উচ্চিষ্ট যাহা থাকে তাহা দিয়া সংসার চলে না। সন্তানের দিকে চাহিয়া ফুলবানু কাজের সন্ধানে বাহির হইল। অফিস আদালত কিংবা রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিবার কাজ যদি পাওয়া যায় মন্দ কি। দেখিতে দেখিতে সে কাজ পাইয়া গেল। এক অফিসের ঝাড়ুদারের কাজ। সংসার ভালই চলিতেছিল। বিপিন আর ফুলবানু যুগলে কাজ করিয়া। সরকারী বস্তিতে ফুলবানুরা থাকে। বস্তির সামনেই আছে পৌরসভার পুকুর। পুকুর পাড় দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। নর্দমাবিহীন রাস্তার ধারে যে খালি জায়গা পড়িয়া থাকে তাহাকেই উপযুক্ত মনে করিয়া দুই শ্যোরের বাচ্চা কিনিয়া দিল তদীয় কন্যা গীতাকে। গীতার বয়স পনের পূর্ণ হইয়াছে। নিত্যদিন শ্যোরের খাবার যোগাড় করিতে ফেনা আর চাল ধোয়া পানির জন্য গীতার প্রতিবেশি এ ঘরে ও ঘরে যায়। নাদুস নুদুস চেহারার আর সুঠাম দেহের অধিকারিণী গীতা। ফুলবানু মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকে তাহার সুশ্রী মেয়ের পানে চাহিয়া।

তাহার ঘরে এমন মেয়ের জন্য হইবে সে আর ভাবিতে পারে না। তাহার মনে আশা দোলা দিতে থাকে সে যদি মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিত! মেয়েকে যদি বড় কোন কুলীন বংশে বিয়ে দিতে পারিত! আরও কত কি? হায়রে বিধি। তাহার এই ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়িল মেয়ের ডাকেই। মেয়ে বলিল, “মা বাবা বলিয়াছে আমার শ্যার বেচিয়া দিবে বলিয়াই সে শ্যারের গায়ে জড়াইয়া ধরিল। মেয়ে গীতার কথা শুনিয়া সে শুধু চাহিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

ফুলবানু ভাবিতে লাগিল, শ্যার বেচিয়া ফেলিবে না তো কি করিবে। পরেশের টাকার সুদ হইতে হইতে পাহাড় হইয়াছে। সুদ গুনিতে গুনিতেই শ্যার বিক্রির টাকা শেষে হইয়া যাইবে। আসল টাকা থাকিয়াই যাইবে। এ দিকে ঘরের চালের টিন কিনিতে হইবে। গত কাল সে তাহার অফিসের মাঝারি গোছের এক কর্মকর্তার নিকট কোন এন.জি.ও অফিস হইতে খন গ্রহন করার বিষয়ে সুপারিস করার জন্য আবেদন পেশ করিয়াছিল। কর্মকর্তার সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া ঋণ মঞ্জুর হইল কি হইল না বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কোন কাজ থাকুক আর না থাকুক বিপিন অনেক রাত করিয়া বাড়ী ফিরে। ভাঙ্গা দরজা জানালা, ভাঙ্গা বেড়া দিয়া কখন কি ঢুকে, অনেক রাত অবধি ফুলবানু ঘুমাইতে পারে না। মেয়ে বড় হইয়াছে ইহা যেন তাহার জ্বালার কারণ হইয়াছে। সকাল সন্ধ্যা ভগবানের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া ভগবানের দয়া প্রার্থনা করে ফুলবানু শান্তনা পায় ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চায় সেই প্রত্যাশায় মাথা নত করিয়া ঘরে রক্ষিত ঠাকুরের বেদীমূলে পূজার্চনা করে। তাহার মনের মনিকোঠায় ভাসিয়া বেড়ায় তাহার শৈশব কালের কথা। তখন যে ভাবে বেড়াইয়া খেলাইয়া চলা যাইত এখন তাহা করা যায় না। এক শ্রেণীর বখাটে যুবক যাহাদের কোন কাজ নাই তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা পাকাইয়া দাড়াইয়া থাকে। উঠতি বয়সের কোন যুবতি দেখিলেই চোখ রগরাইয়া চাহিয়া থাকে- মনে ধরিলে শিস দেয়। তখন ঐ মেয়েটির নিরাপত্তা শিকেয় উঠে। বাপ মায়ের অবস্থা দুর্বল দেখিলে তো আর কথাই নাই। রাত্রিতে ঘরের চালে অদূরে থাকিয়া ঢিল মারে। তাহার গীতাকে নিয়া এই ভয়ে সে কম্পমান। পরেশ মোদীর ছেলে আনন্দ অল্প লেখাপড়া করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। লম্বা চুল রাখিয়া বিভিন্ন রকম তালি দেয়া চটক দার লাল রঙের সার্ট পড়িয়া ডান হাতে চুড়ি পরিয়া মুঠোফোনে গান বাজাইয়া কতক সঙ্গী জুটাইয়া প্রতি দিন গীতাকে উত্সাহ করে। উহা তাহার বাবাকে জানাইয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। বিপিন কয়েক দিন ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার সাহস পায় নাই। পাইবে বা কি করে পরেশ যে ধনী ব্যক্তি। তাহার কথায় মেথর পট্টির সকলেই উঠে বসে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তাহার যুবক বয়সের কথা মনে পড়িয়া গেলে কেবল দাঁতে খটমট করিতে থাকে। যৌবনে কোন মেয়ের ক্ষতি সে করে নাই। ইহা ভাবিয়া সে গৌরব বোধ করে।

এ ব্যাপারে তাহার গুণাম ছিল। গায়ে প্রচুর শক্তি ছিল। লোকে তাহাকে ভয় না পাইলেও মানানসই দেহ কলেবর ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার জন্য সে যথেষ্ট সম্মান পাইত। তাহার শ্বশুর নিতাই মেথর তাহাকে পছন্দ করিয়াই ফুলবানুকে তাহার সঙ্গে বিয়ে দিয়াছিল। ফুলবানু ও তাহাতে সায় দিয়াছিল। তাহার প্রতি কোন রূপ ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল না। বিয়ের আগে একদিন তাহাদের মধ্যে ফুল বিনিময় হইয়াছিল। বিপিন আর ফুলবানু সে দিন রোমাঞ্চিতও হইয়াছিল। আরও কত কি কথা আজ তাহার মনে হইতেছে। কুপির বাতিতে হঠাৎ তাহার মেয়ের মুখের দিকে তাহার চোখ পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার মেয়ে গীতারও কি কোন পছন্দ আছে? নাহ্ সে ভাবিতে পারে না। তাহার বুদ্ধিমতি মেয়ের সঙ্গে মেথর পট্টির কোন ছেলের সম্পর্ক হইতে পারে না। ইহা সে মানিয়া নিতেও পারিতেছে না। কিন্তু বয়ঃসন্ধি কালে বাবা মায়ের কথামত সংসারে থাকিয়াও যে, মেয়ে কি ছেলে গোপনে গোপনে মন দেওয়া- নেওয়া করে উহা বুঝি তাহার জানা ছিল না। জানা থাকিলেও মনে মনে তাহা পাত্তা দিতে রাজী নয়। ইহা ভাবিয়া অযথা সময় নষ্ট না করিয়া প্রবীণ ব্যক্তির মত নিজেকে তাহার গীতার পথপ্রদর্শক ভাবিয়া বসে। এই আসন থেকে কে তাহাকে সরাইবে। কারণ সে-ই তো গীতার মা। তাহার চেয়ে কে আর বেশি মেয়ের কল্যাণ চিন্তা করিবে। ইহা ভাবিয়া নিজে নিজে তৃপ্তি লাভ করে। এ দিকে গীতা মন দিয়া বসিয়া আছে নরেনকে। নরেন দের বাড়ী গৌরিপুরে তাহার বাবা নাই মা আছে। মা তাহার বৃদ্ধা পিতাকে নিয়া অর্থাৎ নরেনের নানাকে নিয়া গৌরিপুর রেল স্টেশনের মেথর কলোনীতে থাকে। সেখানে বংশ পরম্পরায় তাহারা মেথরের কাজ করে। ফুলবানুর বাবা তাহাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। সেই পরিবেশ মন্দ ভাবিয়া নরেনের মা নরেনকে ফুলবানুদের বাটীতে পাঠাইয়াছে। যাহাতে নরেন কিছুদূর লেখা পড়া শিখে এবং ভাল মানুষ হইয়া তাহার নিকট ফেরত যায়। নরেন তাহার জ্ঞাতি চাচা বিপিনকে কাজে কর্মে সাহায্য করে। নরেন এখন ভাল করিয়া কাজ করিবার পারে। নেশা গ্রহন করিয়া লইলে তাহার সাথে কাজ করিয়া উঠা দুষ্কর। সে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়িয়াছে এখন আর স্কুলে যাইতে চাহে না, কেন স্কুলে যাইতে চাহে না তাহার মন কেন আনমনা এ বিষয়ে কি ফুলবানু একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ কারণও নাই। এতটুকু ছেলে যে এত বড় কান্ড করিয়া ফেলিবে তাহা ফুলবানু কেন, বড় বড় হৃদয়বান পণ্ডিত ব্যক্তিরও বোধ করি বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। কারণ এ যে হৃদয়ে হৃদয়ে খেলা। এ খেলা কোন জাত ধর্ম মানে না- মানে না কোন শাদা কালো রঙ। সহায় সম্পদ তো কিছুই না এই হৃদয়ের খেলায় বিপরীত লিঙ্গের যুবক যুবতীরা যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকে তখন ছেলেটির চরিত্র যদি এতটুকু ভাল হয় তবে আর কথা নাই ভালবাসার গুলিটি গিয়া একেবারে লাগে বিপরীত লিঙ্গের কলিজায়। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল গতবারের দুর্গা পূজায়, জাত জনিত কারণে গীতা আর নরেন মূল পূজা মন্ডপের বেদীমূলে যাইতে পারে নাই।

অদূরে থাকিয়া কৃষ্ণলীলার পালা দেখিয়াছিল রাধা কৃষ্ণ মজিয়া যখন পালা দলের অভিনেতা অভিনেত্রীর পালা গাহিয়া ছিল তখন তাহা দেখিয়া প্রেমের লীলার বীজ উগ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহাদের অন্তরের একেবারে গভীরে। পালা শুনিবার সময় এ-ওর পানে চাওয়া চাওয়া করিয়াছিল। কখনও কখনও চার চোখ এক রেখায় মিলিয়া গিয়াছিল কখনও কখনও মন ও শরীরে উভয়ই রোমাঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। পালাগান শেষ হইলেও তাহার রেশ যাইতেছিল না উভয়ের মন থেকে। এক অদৃশ্য আকর্ষণের রস বারিতেছিল উভয়ের হৃদয়ের সরোবর থেকে। সে রস অপূর্ব, অনুভব করা যায় বুঝানো দায়। ক্ষুদ্র বালক বালিকা তাহার গভীরে প্রবেশ করিল না- দুয়ারে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া ছিল মাত্র। গীতা নরেনকে পালা শেষে শুধু বলিল নরেন দা আমার ভাল লাগিতেছে না চল বাড়ী যাই। কেন ভাল লাগিতেছে না বুঝাইয়া বলিতে পারে নাই। নরেন কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া শুধু বলিল হুঁ, চল যাই। পুরুষ মানুষ এই রকমই সুস্বপ্ন কথা মেয়েরা যত দ্রুত বুঝিতে পারে পুরুষরা তত দেরীতে বুঝিতে সক্ষম হয়। তাই আর দ্বিধা না করিয়া উভয়েই পাশাপাশি হন হন করিয়া চলিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া যে যাহার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু মনের অলক্ষ্যে উভয়েই অবচেতন মনে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল এই রাধা কৃষ্ণের লীলা। গীতা নরেনকে কৃষ্ণরূপে আর কৃষ্ণ গীতাকে রাধা রূপে স্বপ্নে দেখিয়া রাত পার করিয়া ফেলিল। সকালে দুই জনেই দুই জনের কাছাকাছি আসিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু বলিল না।

ইহার পর হইতে নরেন যাহাই রোজী রোজগার করিত তাহার কিয়দংশ গোপন রাখিয়া বাকী অংশ তাহার জ্ঞাতি চাচাকে বুঝাইতো এবং গীতার চাহিদা মত একটু আচার পানের খিলি ইত্যাদি ঘরে আনিয়া রাখিত। গীতা বুঝিত ইহা কে আনিয়াছে। কিন্তু মাকে বুঝাইত না চঞ্চলা চপলা হরিণীর মত তাহা চিবাইয়া চাটিয়া খাইত আর নরেনকে দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বেড়াইত। এই অবস্থা স্নেহ প্রেম ক্রমে বাড়িয়া এমন হইয়া গেল যে গীতার অস্থাবর অনেক সম্পত্তিই সে আনিয়া দেয়। ইহা যেন তাহার কর্তব্য হইয়া গিয়াছে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রাণী দুইটি পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও অসহায় হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বিধি বাম! নিজেরা নিজেদের গোছাইবার পূর্বেই বিধি একজনকে গোছাইয়া নিয়া যাইবার উপক্রম করিল। বেশি বেশি খাটুনি আর নিষিদ্ধ পানীয় খাওয়ার ফলে নরেনের মারাত্মক রোগ দেখা দিল। তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। উপযুক্ত চিকিৎসা আর মানসিক চাপের দরুণ এখন তাহার বেহাল দশা। সে তাহার নিজ মায়ের কাছে নীত হইল। তাহার মা অনেক কষ্ট সাধ্য করিয়া তাহাকে ভাল করিয়া তুলিল। এ দিকে পরেশ মোদির ছেলে আনন্দ তাহার পিতার মাধ্যমে বিপিনকে প্রস্তাব দিয়া বসিল যে, আনন্দ গীতাকে বিয়ে করিতে চায়। এখন গীতা কি করিবে? গীতা কিছুই ভাবিতে পারে না।

নরেনের তো কিছুই নাই। আনন্দের অনেক কিছুই আছে কিন্তু নাই একটাই আর তা হচ্ছে চরিত্র। মায়ের সাথে সকাল সন্ধ্যা পূজায় অংশ গ্রহন করিয়া এই চরিত্র বিষয়টি সে ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছে। যাহার ফলে আনন্দকে এত ধন দৌলতের মধ্যে দেখিয়াও তাহার কাছে টানিতে পারিতেছে না। গীতার অমত দেখিয়া বিপিন নিরুত্তর। সে কি জবাব দিবে তাহার কথিত শুভাকাংখি পরেশ মোদিকে কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাহা হোক ঢোক গিয়া সে একবার পরেশ মোদীকে শুনাইয়া আসিয়াছে। তাহার মেয়েকে এখন ও বিয়া দিবার চিন্তা করিতেছে না। তাহার কথা পরেশ মোদী চোখ কপালে তুলিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিয়া উঠিল বলে কিরে বিপিন্যা, আই বুড়ি মেয়ে এখনও বিয়ার কথা ভাবছিস না তো ভাববি কবে। বিপিন কোন উত্তর দিল না নীরবে বাড়ীর দিকে রওনা দিয়া আসিল। পরেশ মোদী নাক সিটকাইয়া মনে মনে কি সব ভিড় ভিড় করিয়া বলিয়া টাস টাস করিয়া দোকানের ডালা বন্ধ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে সে যেন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সে যেন বিপিনের সংসারটি তাহার ধনের অস্ত্র দিয়া উলটাইয়া ফেলিয়া দিবে। যাক বিপিন বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে কাছে ডাকিয়া পরেশ মোদীকে যাহা বলিয়াছে তাহা সংগীরবে বলিয়া যাইতে লাগিল। ফুলবানু ঞ্চকুচকে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়িল পরেশ মোদীকে তাহার ভাল করিয়া চিনে। সে কুট বুদ্ধিতে সেরা এবং মেথর পণ্ডিতে ধনবান হিসেবে তাহার প্রভাব অনেক সে দিনকে রাত করিয়া বর্ণনা করিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে। ফুলবানুর অবচেতন মনে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহার মেয়ের কপালে কোন অমঙ্গল জানি সৃষ্টি হয়। তাহার মেয়েকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া বিপিনকে খাইবার আহ্বান জানাইয়া হেঁসেলের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। ওদিকে বেড়ার আড়ালে থাকিয়া গীতা তাহার পিতা মাতার সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শংকিত হইয়া পড়িল।

গীতার বিয়ের বিষয়ে যখন গুমেট পরিস্থিতির উদ্ভব হইল সেই পরিস্থিতি হইতে বাহির হইয়া কি করা যায় তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। পরেশ মোদী জোড় করিয়া হইলেও তাহার ছেলে আনন্দের সাথে গীতার বিয়ের ব্যবস্থা করিবে উহা প্রায় নিশ্চিত। ইহাতে গীতার মতামত তো দূরের কথা বিপিনের মতামতও প্রকৃত পক্ষে অনাবশ্যক।

বিপিন তাহার মেয়েকে আপাতত আনন্দের সাথে বিয়ে দিবে না ইহা যে সে জানাইতে পারিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। এই যে বিপিনের পরিবারকে মাঙ্গল্য গুণিতে হইবে তাহাও বিপিন ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছে। সমাজপতিদের ইচ্ছা অনিচ্ছাই যে মেয়েদের জীবন ও বিয়ের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাহা এই কচি বালিকার বোধ করি জানা ছিল। তাই গীতা উদ্ধৃত অবস্থা হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য চিন্তা করিল সে আর এ বাড়িতে থাকিবে না। সে লেখা পড়া যাহাই শিখিয়াছে তাহাই কাজে লাগাইয়া চাকুরী করিবে। সে ঢাকায় চলিয়া যাইবে। বর্তমানে গার্মেন্টেস কোম্পানীতে চাকুরী পাওয়া যায়। তাহাই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। যদি একটা চাকুরী জুটাইয়া বাঁচিয়া থাকা যায়। তবু সে আনন্দকে বিবাহ করিবে না। একদিন গীতা নরেনকে গৌরীপুর হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহার সহিত আলোচনা করিয়া গভীর রাতে জীবিকার উদ্দেশ্যে তাহার জীবন সঙ্গীকে লইয়া অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাইল। সে তাহার পিতা মাতাকে রাখিয়া গেল সুদের চাপ আর সামাজিক দুর্গামের বাগাড়ে। এই বাগাড় কে আর পরিস্কার করিবে। নরেন গীতার স্বর্গীয় মনের বাগান পরিস্কার করিয়া গোলাপের চারা বুনিয়াছে তাহাই চাষ করিবে, ফুল ফুটিবে। এই যুগল বালক বালিকার ভালবাসার সুঘ্রাণে কি মেথরপট্টি আর ময়লা আর্বজনা মল মুত্রের দুর্গন্ধ টুটিবে ?

১১/০৯/২০০৯ খ্রিঃ শোলমারা, কিশোরগঞ্জ।

কাব্যগ্রন্থ- স্বদেশে রামেরা এখন (১৯৮৫-১৯৯৫)

মুজিব তোমারই পথ চেয়ে

আনন্দ আর ধরে না, মন হারালাম, হারালাম মন একি !
খুঁজে ফিরি সবুজে সবুজে শতাব্দীর বিশাল বঙ্গবন্ধু,
আত্মহারা দেশপ্রেম আমার ! বুকে শূন্যতা দেখি,
সরোষে চলা নদী মরে গেছে, জাগে বালুচর ধূ ধূ ।

মাফিয়া চক্র জাতীয় অহং বিনাশে মত্ত সর্বদা সদা,
কোন রকমে বেঁচে থাকা মানুষ ভাবে না এ বিষয় নিয়ে ।
মিথ্যে বা বদনামে ঢেকে যাবে সূর্যসেন মাষ্টার দা !
মুজিববিহীন স্বাধীন দেশে বিরহে কাঁদিছে দেশের হিয়ে ।

এবার ফিরে আসো উনসত্তর ৭ই মার্চ ভাষণ একাত্তর,
ছিঁড়ে যাক ধূর্মজাল হারানো আবেগ ফিরে পেয়ে ।
দেশ গড়ি গর্ব করি সোনার ছেলে ওহে প্রিয় মুজিবুর,
তুমি নেই, আছে দেশ মা, তবু থাকে তোমারই পথ চেয়ে ।

১১/১১/৯৫ বাহরাম খান পাড়া ।

স্বদেশে রামেরা এখন

আজকের দ্বি প্রহর হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত চাপ দুশ্চিন্তা আর
বাস্তবতার অন্ধকারে
প্রতিক্রিয়াশীল রুদ্ধ বাতাস আবার বইতে শুরু করেছে
ফাগুনের রক্তাক্ত বুকে-স্বদেশ প্রীতির সুমধুর কণ্ঠে
ক্রন্দনরত কোকিল ফি বছর আসে যায়, কান্নার সা-রে-গা
-মা-সা-ধা আর শেষ হয় না ।

স্বদেশে সুরের আমিগুলো নিত্য আছাড় খাচ্ছে অসুরের
শৈবালে ঘাটে ঘাটে-নিয়মিত জীবন যাপন করি কনকনে
শীতে, অভ্যস্ত হচ্ছি ক্লান্তির কাঁকড়ার গর্তে ঢুকতে-
কিন্তু সোনালী আমার সূর্য তো আজও নিভে নি-ফুরায় নি
তেজোদীপ্ত বায়ুর নিঃশ্বাস ।

আমি শুনতে চাই, বুকের ভেতর ফাণ্ডনের ঝোপঝাড় শুকনো
পাতায় কিশোরীর পায়ে দলা মর্মর শব্দ ।

আজকের দ্বি প্রহর হারিয়ে যাচ্ছে-যাক, আমি ভাবতে চাই
অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আর অনাসৃষ্টির ভেতর একটি সবুজ
মাঠ দেখার মূর্ত্ত-শোকাকার্ত মন্দ্রগীত, বুলেটের মুখে
এক ফোঁটা অশ্রু রচনা করে, একটি কবিতা-হতে চাই
আমি তার পাঠক, একদিন তৈরী হলো আমার জন্ম
আমি জন্মের ভেতর দিয়ে এলাম শুধু জানতে-সীতার
হরণ-স্বদেশে রাম ভাবতে পারে নি বলে, বুলেট ঝাঁঝড়া
করলো তার সাহসী বুক-

এরপর কোথায় রইলো আমার ঘুম?

বিছানায়, জায়নামাজ রেখে, নামাজের ওয়াক্ত দেখি, কেহ পূজা
দেই মন্দিরে, দেখি, মুরগীর ঘরে ঢোকা-এখন কেবলই তাকিয়ে থাকি-
কুয়াশার চোখ দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ।

২৩/০২/৯১ নবাবগঞ্জ, ঢাকা ।

ওরা

খুকী তোমার ডান হাতে কি
বাম হাতে কি,
খুকী তোমার আগে পিছে কি
নয়ন পাতে কি?
আ-হা-হা কি কি করো না তো
দেখতে পাও না,
রাজাকার আর বিশ্বাসঘাতকরা
মহামান্য কর্ণধার তাও না!
খুকী তোমার রাগ করে না মনে
ওসব দেখতে হবে!
পাকা বুড়ীর মত লাঠি উঁচিয়ে দৌড়
মার রাজাকার তবে ।
কেউবা দেখ বাঁদড়, বনে দাঁত খিচিয়ে
দেখায় এখন ডর,

খুকী অছুৎ হলে বুঝি, মুক্তিযোদ্ধা
এখন তোমার জ্বর ?
সবার আদর কুড়িয়ে তুমি,
কর্ম চাওয়ার দায়ে,
বাবাকে মেরে, ওরা তোমায় দিল
ডাল্ডাবেড়ী পায়ে ।

২৮/১১/৯৫ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

কাকতালীয়

ভাবি কত কি সারাদিন কি ভাবিতে হইবে জানি না,
মাঠে না গিয়ে ফসল তুলি, শ্রমের বাঁধা মানি না ।
মুদ্রাদোষ যার কথার ফুলঝুরি, ভাবি তারে কত সৎ,
গর্বিত চোর যে, রাত শেষে নাকে কি না দিই খত !
খাকি পোষাকে হয় না পুলিশ না থাকিলে খাস নম্বর,
ডুবিয়া ডুবিয়া চক্ষু হইবে লাল পানির নিচে কি পাবে অম্বর ?
দরবেশ হইবে না রাত কেহ যদি নাহি জাগে
শহীদ কি কেউ হয়, ধর্ম যুদ্ধে মরার আগে ?
এমনি কত কথা ঘুরিয়া বেড়ায় চৈত্রেয় বায়ুর মরমে,
সময়ের পাতা সব ঝরিলেও খরায় লজ্জাবতী ঝরে না শরমে ।
বিনা যুদ্ধে ‘গাজী হইয়া’ বংশের দাম কি বাড়ানো যায়?
কে বলিল ধামাধরা মানিলেও মানিবে সচেতন গণরায় ।
কাজের সাথে আছে ফলের মিল ফলের সাথে কাজের মিল,
কাকতালীয়, জন্ম-মৃত্যু, মৃত্যুর আগে ‘কাজই’ মৃত্যুহীন দিল ।

১১/০৩/৯১- নবাবগঞ্জ ।

একটি কংকাল দেশ

চৈত্রে, বৈশাখী ঝড় গুরু গুরু গুরু মেঘের ডাক-শুনছি এ যেন
চল্লিশোর্থ কোন প্রৌড়ের ক্ষুধার্ত গগন বিদারী চিৎকার :
গত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম, আমি সুন্দর সকালে বসে আছি
দাওয়ায়, কিন্তু এখানে যার অস্তিত্ব সে হলো নিশ্চল ভবিতব্য
ক্রোধ আর সন্ত্রাস ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৩৬০

আমি সময় করে উঠতে পারি না, কখন লিখব একটি কবিতা
যেখানে ঘাস ফুলের গন্ধে থাকবে যুবকের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বটের
সুদৃশ্য পাতার থাকবে, মৃদু বাতাসে স্বাধীন সত্তার অভিবাদন,
বিকেল গড়িয়ে এল, পৃথিবী ঢুকতে যাচ্ছে সন্ধ্যার মুরগীর খুয়ারে
তারপর ক্রমাগত আসতে লাগল ভয় আর অশান্তির ষ্টেনগানের
গুলির আঁধার-ঘুম নেই, ঘুম নেই, আর কারো ঘুম নেই,
শান্তি ও সমাজতন্ত্রের পিপঁড়ে দল ভাসছে থৈ থৈ মেঘনায় ভীড়বে
নৌকা ঘাটে?

শেষ মেশ ভাবলাম কোনও একাত্তরের শহুরে ডোম ডেকে,
গুনে নিই শরীরের হাড়গুলো, সময়ের চিল ও শকুনেরা
ইজ্জত, নাড়ি-ভুড়ি সব খেয়ে দেয়ে ফেলেছে, এখন শুধুই,
বিকেলের নীল আকাশের দিকে, নির্জন প্রান্তর থেকে চেয়ে
আছি, দেখে যাচ্ছি একটি কংকাল দেশ।

১৪/০৩/৯১ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ।

জীবনের দিনগুলো

ঘরে শান্তি নাহি মেলে চৈত্রের দাবদাহে,
মনের ছুটাছুটি, দেহের ক্লান্তিতে আমি লীন,
অপারগ যত কাজ ভীড় করে নদী তীরে তাহে,
আরে লাভ কী হয় আসি যে এখন নিঃশ্বদীন।
অভাবের মুখ দেখেছি শুধু দেখি নি কিছু আর,
কষ্টের বীজে হয়েছি গাছ গাছ-সুদৃশ্য সবুজ ঘেরা,
জীবনের পথে চাই শুধু মানুষ হয়ে বাঁচার,
কুশলী কেড়ে নেয় টাকা আমাকে দিয়ে বেড়া।
যত দিন যায় তত বোঝা চাপে কি করি
বলিতে চাহিয়া মনের কথা কেন পারি না আমি,
চেপে ধরে গলা যেন কে, হয় ডুবে যায় তরী,
শক্তি আর টাকার শাসনে নিঃশ্বাস যায় থামি।
মা হলো ক্ষীণ শরীর, পরিজন খেতে পায় না ভাত,
জঞ্জালসম ভাসছি সমাজে শিক্ষিত কর্মহীন,
কি করি কোথা যাই, ভীষণ ভার ঠেকে দিনরাত,
সত্তা আমার অপাংক্ত্যে আজ পশুর অধীন।

যুবা কিশোর গরু ধোয়ায় নদী জলে আর সব,
শিশু মহিলা বৃদ্ধ গোসলে অভাবের ধ্যান করে।
নদী ডাকে কলকল, গরু ডাকে হাম্বা আর নৃ কলরব,
ছেদ করে ঘুরে ফিরে খাবার নাই ঘরে মনে পড়ে।
ভাল্লাগে না বটতলে বসে আকাশে চাহিয়া থাকা,
রোজায় পূজায় মন নাহি ধরে বাড়ি ঘর ছেড়ে একা।
উড়ি চিল স্বাধীন, অশান্তি থাক না আকাশ-পেয়ালায় ঢাকা,
মুক্তির সমুদ্র খুঁজি বয়ে চলেছি জীবনের মাটিতে নদী রেখা।
নই কোন বড় কবি, আমলা, মন্ত্রী, বাদশাহ প্রবল,
ছল চাতুরী ধর্ম বর্ম পরে ভান করি নি কোন দিন তাই,
বয়সের ভারে নত হই পাই না জীবন তৃষ্ণার একটু জল,
মৃত্যুর পরে ভাবছি এসব চাই শুধু এইটুকু থাকাটাই।

১১/০৪/৯১-নবাবগঞ্জ।

দাসত্ব

আমার দেহে ছড়াচ্ছে খবরদারি দৃষ্টি বলছে সিলিং, এজন্যই
তোমার জন্ম! আকাশের পিঠে দুঃশাসনের সূর্যঃ বুকে
সরলতার মেঘ, গুরু গুরু কান্নায় ঝরে অশ্রু বৃষ্টি। আদিকাল
হতে অদ্যাবধি চাঁদের কলংক মুছে নি, বায়ুস্তর সবটাই রোগক্লিষ্ট
চাতকীয় উষ্ম নিঃশ্বাস।

ধৈর্যের যুগ-যুগান্তর পায়ের নিচে হুমড়ি খায়, ভোলার 'মা'-
তোমরা পৃথিবীর মধ্যে আর একটি জখম পৃথিবী; তোমাদের
জটর কালোপযোগী জন্ম দেয় জীবন্ত নতশির পাদুকা।
ডুব দিয়ে ভেসে হঠাৎ দেখা চতুর্দিক, ঈষৎ কম্পিত জল অথবা
স্নান সেরে ভেজা কাপড় ছাড়া ও পরার কৌশল, ভেজা শরীর
লজ্জাশীলা রমনীর মনই- আলবৎ বন্যার স্রোতের হুকুমে
ঘোলা হয়ে যায়।

আজকাল ক্লাবে অফিসে আদালতে আমাকে খুব একটা দেখা
যায় না কারণ ওখানে আমাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন, জনতার
মাঠ, রাজপথ, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র আমার ভাবনা

প্রসারিত, আমাকে ঘিরে কেউ কেউ রাজনৈতিক বক্তৃতা করে:

উপড়ে ফেলবে আমার মূল! চেষ্টাও হয়! কিন্তু সবই
গুড়ে বালি, বছর চল্লিশেক আগে আমার একটা পাহাড়
গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীর কোথাও কোথাও আর ধর্মের আল-
খেল্লায় তো আমি মহান।

এরপরও তো আমার মৃত্যু নেই, শুনলাম বেহেশতে আমার
প্রভাব আছে, আমি “সুরাবান তহুর বহনকারী গেলমান।

অতএব, আর যায় কোথায়, দৃষ্টি নত করে ফিরে যাও
পুরাতন পথে আবার নূতন হয়ে ফিরে আসো—

চন্দনার বটফল খাওয়ায় আমার আপত্তি নেই।

কিন্তু বড়ই কষ্ট হয়, কাকের কা কা রাও শুনে
এখানে কোথায় পাবে সে ডাষ্টবিন?

১২/০৪/৯২- নবাবগঞ্জ।

প্রস্তাব

ইস্ আকাশের নীল পেয়ালা বিস্তর দূরে, উপুড় করে রোদ্র পোলাও
সবুজের স্তম্ভ হাতে খায়নি মাটি কোনদিন, সরলতার এডালে—

ওডালে পিউ কাঁহা ডাক পাখির কোন দিন শুনেনি মেঘ—

শুনছি তার গর্জন সেই আদিকাল হতে আগাছার বুক উজাড়
করে নির্মাণ করি জীবন উর্বরতার মাটি।

আর এখানেই শিখর নাড়ে দেবদারু শ্রেণী, বায়ুর গায়ে এখন

ভীষণ জ্বর-ধর্মীয় শকুনের মুখে শুনছি সে ক্ষুধা রোগে

মারা যাবে না কোন দিন—মৌসুমের চাদর বদলাবে শুধু;

কষ্টের অন্ধকারে ঘুমুচ্ছি অথচ দিনের তন্দ্রা নিয়ে অসংখ্য

কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে—

শব্দের মাইক্রোফোনে ভাঙছে ঘুমের পাঁজর।

রঙধনুর সাত রং প্রাসাদকে করুণক আরও বর্ণাঢ্য- প্রতি

বিপ্লবের শাদা কবুতর আপত্তি করবে না— শুধু হিংসার

ক্রশবিদ্ধ মসীহ যে ভাবে সপ্তাকাশ পাড়ি জমিয়ে ছিলেন

যে কারণে হযরত হিজরত করেছিলেন, গৌতম বুদ্ধ হলেন

ঠিক সে কারণেই পিঁপড়ে দলের প্রস্তাবঃ শ্রেণীর চাকায়
পিষ্ট না হয়ে বরং আর কোন গর্তে শান্তির মিছিল করে ঢুকে পড়ি
সেখানেই দেখবে জীবনের আয়নায়, ডেকে ডেকে ডাহক কত
রক্তই না ঝরাইছে যুগে যুগে।

১৭/০৪/৯১- পানালিয়া, নবাবগঞ্জ।

চড়ই বাতি

যুগ-কাল-শতাব্দী যায় চড়ই বাতি আর শেষ হয় না
সবুজ মেলা ক্রমশ ধূসর হয়ে ফের সবুজ হচ্ছে
চড়ই বাতির শেষ নেই,
এখন কোথা যায় চোরাবালি মেঘ ?
চড়ই বাতিই দাদা-নাতিন চক্র কিংবা এই রূপ একটি
বর্ণচোরা জীবাশ্ম উপাদান-
তিনটে কুড়ানো উদাহরণ একটা থলে, ছোট পাখির
নাচানাচি, উদাস মনে কিছুক্ষণ হাঁটা.....
নান্টু ঘোষ, বালুর বাঁধে আঘাত পাওয়া
চুন খাওয়া মুখে, বউ এনে, সংসার পেতে
আটকে গ্যাছে-
চড়ই বাতির নদীচরে.....

১৩/১১/৯১- নবাবগঞ্জ।

গুরু গুরু গুরু অহংকার

শাদার উপর কোপ কোপ খয়েরী চেক শার্ট, সানগ্লাস
টাই, বেল্ট, প্যান্ট, বাটা সুদৃশ্য জুতো, ক্লীন শেভ করা
সুটোল মুখ, সুঘ্রান তেলে মাখানো চুল, পিছন
ফিরে তাকানো সোজা সিঁথে, সব কিছু মিলে একটি জ্যান্তজীব:
তাকে দেখে বুক ভূমিকম্প হয়, মুখ থেকে নির্গত হয় উত্তপ্ত
গলিত লাভা, পুড়ে যায় সবুজ প্রান্তর, দুনিয়া সয়লাব
হয়ে গেলেও গোর্কিতে তার বুক উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণঃ প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৩৬৪

চৈতালী হাওয়া যেন চিতা হতে আসা, কান্না ভেজা নিঃশ্বাস
বস্তি কুঁড়েঘর নদী শিকস্থির শিকার, নিরাশ্রয় মানুষ ঢুকে
যায় উঁচু খাড়া নাকের ছিদ্র দিয়ে, চোখে পুড়ে যাওয়া
কোন বাজারের অর্ধভঙ্গ, খুঁটি দ্রব্যাদি, টিন ভাসে, গুলনো
সব খয়েরী শরীর, মন্দির বা মসজিদ অর্থহীন অবয়ব
নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, বাগান বাড়িতে কিংবা নরম পিপ্রং এর
বিছানায় গড়াগড়ি যায়, ঈশ্বর মরে থাক হয়ে যায়.....
নৈশ ভোজের ঘ্রাণে অথবা আরও পাঁচ বছর ক্ষমতার
পিঁড়িতে। আমার জুতো যুগল যেন অসংখ্য আজকের গাড়ী পিঁপড়ের
মত মানুষ মরে যাক কি আসে যায়, আমার প্যান্টের চেইন
খুলে ঢুকে বারবণিতা, বিয়ের দরি নিম্নাঙ্গের পশম হয়ে
সেই কবে থেকে হাসছে। দুর্গামের রাতটা আমার পকেটেই
রাত কাটায়-কাকের সাবান লুকানোর মতন।
কপালের ভাঁজে হাঁটাহাটি করে নিয়মিত অর্থনীতির
শ্রেণীরা। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত প্রবল হলে
হাই ব্লাড প্রেসারে, নারকীয় খেলায় আয়ু শেষ হয়
হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে, তখন ঠিক দেখো থলে বদলিয়ে
উড়ে যাই আকাশের পাঁজরে
জনশূন্য এই দেশে
চিরকাল ডাকতে থাকি, আসছি আবার, গুরু গুরু অহংকার।

২৭/০৫/৯১- নবাবগঞ্জ।

বিষয় নির্ধারণ

লেখার বিষয় নির্ধারণ নিয়ে আমার মনে একটা খটকার
ঘর হয়েছে, কেবল উথাল পাথাল করে খটকায় নটরাজ
ভীমতাড়িত ঢেউয়ের মত গ্রাসোদ্যত আমার স্বভাববিক
অসিতীপর ভাবনার নিশ্চিদ্র কূপের সমাজ ব্যবস্থা।
সারাদিন জসিম উদ্দিনের ‘হাসির রাজার’ মতই
আলস্য সম্রাটের মতই
অবস্থা, আজকাল বিষয় নির্ধারণ একটা কঠিন কাজ কেন না
ছলনার রাজনীতি এতই ঝুল ও সুক্ষ যে পক্ষ নেয়া মুঞ্চিল

তারপর নদীর ঘাটে রোদ্দ পোহাই, ভাবি তুষার সাদা
বিবেকের আকাশে, শুধু উড়ে উড়ে উড়ে হয়রান হই।
তার ঘরেই ঢুকে পড়ি স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতা
বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্দীপিত মানুষের ঢল এই এখন ভাসিয়ে নিলে
আমার বাংলার প্লাবন ভূমি, কি বলতে কি বলতে ফেলি, ক্ষুধার তীব্রতা
এখন এত বেশি যে, মানসিক ভারসাম্য আর শারিরীক ভারসাম্য রক্ষা
খুব কঠিন, মনের বাগানে ফুল ফুটে ঝরে ফুটে হরেক রকম, এগুলো
সব সময় ভাল্লাগে না, কেননা ঠোঁটের ফুঁপানো কান্না আমাকে
উতাক্ত করে, কাজেই বিষয় নির্ধারণে বড় বেশি কষ্ট হয়
সেদিন রূপসী বাংলার প্রান্তরে গিয়ে দেখলাম, আহাজারি
যতই হোক না কেন ভূইমালীর ভালবাসা আমার জন্য নয়
ওটা বেনিয়া মার্কিনীদের জন্য, তার দেশীয় জোতদারদের জন্য
শুধু আমার পাওনা হল, ফেব্রুয়ারী- মার্চ আর ডিসেম্বরে
স্মৃতিচারণ প্রতি বছর আমি ঘেমে গিয়েছি ভাবতে ভাবতে,
হায় নিরাসায় আমার সঙ্গি হলো- ভাঙ্গা থালা
বাসন নৈমিত্তিক দুষ্টিত্তা, কপর্দকহীন ছেড়া পকেট এসব
আমার মুক্তিযুদ্ধ ও তার রাইফেল। কবিতার ফাগুনে বিষয় নির্ধারনে
আজকে আমি দ্বিধাবিভক্ত আত্ম মুকুলে গন্ধ আসছে কাল টাকায় স্বজন,
প্রীতির বিশী গন্ধে। আর আঁতাত রাজনীতির মৃদু হাওয়া নয়, চাই ঝড়-
ঝাপটা কাল বৈশাখীর-
কাজেই এ অবস্থায় কি করে বসন্তের বিষয় নির্ধারণ করি ?

১৯/০২/৯১- নবাবগঞ্জ।

ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি

আমি ক্রমাগত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি- যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি।
নিরালোক মরণের শ্রীঘরে-যে নাবিক চৈতালী হাওয়ায় পাল উড়িয়ে
স্বস্থি পেতো, এক টুকরো মাছ- একটু ঝুল আর এক বাসন ভাত
মনে হতো জান্নাতুল ফেরদাউস, বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে চোখ হতো
দিকবলয়, বাউড়ী বাতাসে, মুছে নিত সুখ নিত্য অফিসের ভ্যাপসা
গরমের ঝগড়া, এসবই ক্রমাগত এখন যন্ত্রণার সৈকত।
ফিরে যাচ্ছি আমি হেঁটে, রাশি রাশি চিন্তার বালুকণা মগজ মনের

পায়ে মেখে- পূর্ব-উত্তর পুরুষ যেন টিকটিকির লেজখসে পড়ে,
নিত্য স্বৈদমেখে বুকে হচ্ছি লাশ। শুধু দেয়াল টিকটিকি আর ডাক-টিকিট
বেঁচে থাকে-মিথ্যে বুলি আউড়িয়ে। খেলা ঘরের সবগুলো খেলনা আমি
পুরনো শাড়াসী, দা, বটি-পারমাণবিক অস্ত্র-।

এখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি

মরণের শ্রীগরে, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভৈবব-দীনতা-সহযাত্রীর মত
প্রাসঙ্গিক আলোচনা করছে।

ফিরে দেখি যাত্রা শেষ, হাজার ভাবনা সাথে নেই, আছে

ব্যাগ, ছাতা, এক হালি আনারস আর এক মাসের মাইনে পনেরশ টাকা
পুরো মাস জ্বলে পুড়ে ছারখার করে, ওরা, প্লাট ফরমে ওপাশে কি করে
ডাকাত, ফেরেঙ্গা নাকি কেউ অভ্যর্থনাকারী-

ভারাক্রান্ত, গতিহীন ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছি। ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি।

১৬/০৮/৯১- নবাবগঞ্জ।

১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত

আদিম সংহার চেতনায় বয়ে যায় ইথারে - ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত
সাক্ষাৎ যমদূত হ্যারিকেন আসছে ধেয়ে, ইচ্ছে মত ছিঁড়ে খাবে
প্রাণ সত্তা - খেয়ালি প্রকৃতি শিখিয়েছে মানুষকে ধ্বংস ধ্বংস খেলায়
কিভাবে মেতে উঠতে হয়। নিমিষে নির্বিচারে গিলে খায় তাজা প্রাণ
জলোচ্ছাস, কল্পনার সমুদ্রে নিশাচাপ জল আর হাওয়ার ক্ষেপনাস্ত্র
নিষ্ক্ষেপ করে। লোকালয়ে রক্তহীন হলদে পশুর নিখর দেহ
ভাসমান থৈ থৈ জলে

রাক্ষুসী জলপরী নৃত্যরতা ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোঁ সোঁ ক্রোর হাসি
দিয়ে গত রাতে সে মেতে উঠেছিল- ভান্ডবের যৌন উন্মাদনায়, কার
পেটে ঢুকিয়ে দেয়া ডেগারধারী, বায়ু জল আর দেবতার কান্ড দেখে
সেই আদিকাল থেকে চাঁদ হাসতে পারে নি- মুখে কলংকের দাগ
নিয়ে আকাশের বুক বিদীর্ণ হয়েছে মেঘের আহাজারী শুনে, ইজ্জত
লুটে নিয়েছে সূর্য, এখনও সেই আদিকাল পরিহাস করে অট্টালিকাকে,
'দেও' এর শিং গুতামারে সভ্যতার চাষাকে-
বাড়ী ঘর লোকালয়, অজস্র প্রাণ ঢুকে যায় মাকড়সার পেটে সে আজও

জাল বুনে স্বপ্নে দেখে ফুল নাকি বিষের থলে, সুপ্রসন্ন ভাগ্যের মধুকর
ভুবন বাগানে নেই - ছিল না কোন কালে, তাহলে এত রক্ত মাংশ, দীর্ঘশ্বাস
আহাজারি করে চুলোর মুখে ভাতের হাড়ি - জীবনের ভিত ধ্বসে যায়
কেন ? কেন ?

ছটিকে পড়ে বাত দূর শতাব্দীর, আগুনের স্বর্গে, ডাকাত-
গোর্কি আজও হানা দেয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের কোকিল হরণ করে-
সুরে লাগান, পৃথিবীর কোলাহল থেমে যায়, আমার ঘরের
নির্জন কোণে, কিছুক্ষণ, মৃত থেকে ফের কথা কয় স্বতঃস্ফূর্ত
আমার নিশাচর দিনকাল, এভাবেই যায়, এভাবেই টিনের
চালা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য মূর্ছনা জাগায় আমার ঘরময় চৌবাচ্চায় ।

২৯/০৪/৯১-নবাবগঞ্জ ।

কেউ নেই

ব্যর্থ জলরাশি হুড়োহুড়ি করে তীরের সাথে অক্ষম আক্রোশে, তার বুকের ওপর
দিয়ে চলে যায় যান্ত্রিক জলযানের নির্দয় চাকা; গতকাল জোয়ার ভয়
দেখাতে সক্ষম হয়েছিল চলমান জগতের কুটিল জীবন গুলোকে, আজকে
ভাটার টানে সে নিজেই চলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, কালের অসীম সমুদ্রে ।
গোসলরত কিশোর যুবা খাচ্ছে রৌদ্র ছায়া নদীর সোল্লাসে
জলেরা ভেগে যাচ্ছে, যদি কোন বীর কেশর ফিরে আসে আবার মর্তে
এইখানে তবে হয়ত নৈতিক চাবি কোমরে বেঁধে লড়বে দৈনিক অভাব
তাড়িত অনেক মানুষের সাথে যারা খাওয়ার আশায়, এখনই
আত্মসমর্পণ করবে হেঁসেলে, ঘেমে নাইয়ে যাওয়া স্ত্রীর মুখরা
মুখের সাথে, এসিড অস্ত্রগুলো খেয়ে দেয়ে জন্ম দিয়েছে
বিষের যে শিশু- পাশেই নেই কন্যা-মা, নির্ধুম নেত্রে চেয়ে আছে
দু'চালের দিকে বাঁশের চাটাইয়ে গুয়ে; মা'র ডাকে পুত্র ফিরে
যায় মায়ার আকাশে, পক্ষাঘাত গ্রস্থ মনের এক লহমা বাতাস হয়ে
ফিসে আসে আবারও মর্তে উঠোনে সেখানে সে ছাড়া কেউ নেই
কেউ নেই ভাববার ।

সে ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছে, কাজ নামক আর এক গ্রহে আশা নিয়ে
আসবে শান্তি, উন্নতির ঔষধ, কিন্তু ওটা সে ছাড়া ভাববার কেউ নেউ,

কেউ নেই কে কার, কে শুনবে আহাজারি সবাই ঝাঞ্জা মুখর সংসারে সংগ্রামরত
নতুন কুড়ি ফুটাতে অথচ সবাই দেখে, কেউ নেই, আর কেউ নেই,
ব্যর্থ কিংবা সার্থক দু'টো শব্দে দাঁড়িয়ে, সম্পদের হিমালয়
বা জীর্ণ কুটির গড়িবার দৃশ্য - গ্রহেলিকায়।

১৯/০৯/৯২-নবাবগঞ্জ।

কি করি

স্মৃতির টেবিল নির্লিপ্ত, ধূসর বইয়ের ভার বইতে বইতে ন্যূজ পিঠ দিশে হারা
কোন এক কবির কি করি, কি করি কলমটি পাথর চোখ দুটি সম্বল করে
লিখে যাচ্ছে, রক্ত লেখা- ওখানে কলিজার খাতা রক্তাক্ত দীনহীন তক্তাপোষে
শুয়ে বেঁগমানরা যে চালে মাকড়সার বাসা জাল বেঁধেছে তাই দেখে-

এক-দুই-তিন করে মূর্ত্ততগুলি ফিরে যাচ্ছে অতীতের গর্ভে হায়
কিছুই দিয়ে গেলে না একরাশ দুষ্টিত্তা ছাড়া।

কি করি এখন শিশুর চিৎকারে

অসহায় পথিক সন্ত্রাসীর কজায় যেন ঘটি বাটি বিক্রি করে,

উদর পূর্ত্তি আর জান রক্ষার আদিম প্রয়াস সর্বত্রই।

মাথা ঘূর্ণিবারের কবলে, কখন উড়িয়ে নিয়ে যায় ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন করে সংসার বউ-ঝি।

টাকার ভূত চাকরীর সোনার হরিণ এরা ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে যায় আমার

বাসনে, হারিকেনের আলো- বউয়ের বিড় বিড় একাকার হয়ে আচ্ছা

মাৎ করে ঘরের হাওয়া আর এখানেই বসবাস করে জীবনের চিল

যে উড়তে উড়তে হয়রান- আকাশের সীমানা খুঁজে পায় না কখনও

আশার চোরাবালি, হাতছানি দিয়ে যায় মেঘেরা, এইত এইত আমি

এসো কোলে তুলে নেব, আকাজ্জার পাপিয়া সবুজ বনে পিঁউ পিঁউ গাহে

অথচ বিষধর সাপ এ গাছেই বাঁধ সাধে, 'উহ' শব্দটাও কেড়ে নেয়-

নিশ্চেষ্ট করে দেয় দেহটা। তারপর কি করি পাহাড় ঘরের দেয়াল

অতিক্রম করার সাহস হয় না অথচ অনতিদূরে জল কোলাহল,

মনে হয় বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপবাসিনীর কান্ডজ্ঞানহীন অবৈধ মিলন

পিপাসা-নিতম্ব তোরণ স্বাগতম জানায় সেখানে আমার

শাদা পৌরুষটা হয়ত হারিয়ে যাবে নর্দমায়ে, ইচ্ছে ছিল অবগাহন

করব সাগবে, সাঁতার কাটব ইচ্ছে মত তাবৎ জল মিশে যাবে শরীরের
রক্তে রক্তে কিন্তু কই কি হলো এখন দেখি এক লহমা হাঁটাহাঁটি
করলেই বেশি প্রয়োজন টাকা নামক পায়ের তার ওপর ভর দিয়ে
পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে আমি তো ছার!

যাক এভাবেই যাক আমার সময়, আমার অশ্রু গড়ায়ে
ওঠা দেখা-নেয়ার জন্যই এসেছিলাম আর কি করি বেলা গড়িয়ে
এখন দুপুর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই প্রাণ-পণ শক্তি দিয়ে শেষ
ডাক দিয়ে যাব, পাড়াবাসীকে “আমাকে ওরা ধরে নিয়ে
গেল” হয়ত নিয়ে যাবে তবু ডাক দিয়ে যাব, চিরতরে।

২৫/০৯/৯২- নবাবগঞ্জ।

ফিরে যাই

আছে আত্মবিশ্বাস, নাই কারো
ওপর বিশ্বাস আর-
সময়ে মুখ চেনা যায়, ধরার বুকে
আছে যত মানুষ সবার।
বিশ্বাস করি হারিয়েছি সব ছিল
যতগুণ-এখন আছে দোষ,
এত নিচে নামে মানুষ, জানিতাম না
জেনে, জাগে বুকে দ্বন্দরোষ।
উতড়ে ওঠে কান্না-সমুদ্র, সয়লাব
হবে বুঝি জীবনের মাঠ,
আঁধারে একা সভ্যতা আড়ালে দেখি
ডান-বায় বেয়নেট, বন্দুক বাট।
কুট আচরণ, লোভ হরণ ‘করে’ সব
সংসারে ভাল নামের চাঁদ,
পোষাকী বিনয় করে ছারখার মানবতা
জাগে চর ভাঙ্গে বালির বাঁধ।
ইচ্ছে সরে দাঁড়াই ভূবন হতে এবার
ফিরি পূর্ণঃ আদিম সমাজে,
তবু সয় না মিথ্যাচার ভাষার আড়ালে
সভ্যকারুকাজ, ফাঁকা নমাজে।

২৬/০৯/৯২-নবাবগঞ্জ।

সংসার বুকে নিয়ে

মুক্ত বিহঙ্গ যেমন দু'ডানা মেলে আকাশ বুকে নিয়ে উড়ে উড়ে
সারাদিন গিলে ফেলে- ঠিক তেমন আমি হব কারণ সংসার
মা-বাবা-স্ট্রী-পুত্র-আত্মীয় এরা সবাই এক রকম জোক-রক্ত
চুষতে চুষতে সারা শরীর এরা করেছে আমার শাদা, রক্তহীন
দু'টো চোখ নিখর, মরণের অপেক্ষায় নদী তীরে বসে বসে
এ রকম একটি কবিতা লিখে চলেছে:

মরণ অত্যাসন্ন; মরলে পরে যে নতুন জীবন খুঁজে পাব, যেখানে আর
একটি উইপোকা জন্ম নিলে, সেই জীবনে চলে যাব, যেখানে
আমি ছাড়া আর কেউ নেই, ভাবনাটা জাল বুনবে শুধু আমাকে
ঘিরেই, আমার রাজত্বে -

এই যে গরুটা এক ঢোক পানি গিলে ফেলল, নদীতে মুখ
রেখে, তারপর ঘুরাফেরা করেছে আপন মনে আহা যদি
তাই হতাম! মান্বাতার আমলে যেভাবে দিন চলত, সূর্য পূর্ব
দিকে উদিত হত-এখন তা হয় না, ক্রমশঃ জটিলতর হতে হতে
পশ্চিমে উদয় হচ্ছে-এখনকার যান্ত্রিক যন্ত্রণা আমার
শরীরে আঁচড় কাটতে শুরু করেছে। ন্যূনতম শান্তির জলাশয়
করেছে ঘোলাটে, খাবো কি? কাদা আর কাদা নদী জল ভর্তি জঞ্জাল
দিয়ে, এভাবে দিন চলছে চলুক, এ ভাবনাগুলিও ফেলে দেব তথায়।
এখন কি যে ইচ্ছে হয় নিজেই বলতে পারিনে, আচ্ছা এ রকম
কি এক হাজার বছর আগেকার কোন কবি'র মন ছিল? সে
যুগের বাস্তব ও সত্য যাহা আজ তাহা অবাস্তব ও অসত্য
আবার আজকে যাহা সত্য ও বাস্তব আগামী এক
হাজার বছর পর তাহাই অসত্য, কাল্পনিক, অবাস্তব, শুধু ঘৃণা না
হয় অনুকম্পা নিয়ে বাঁচবে কিছুই করার থাকবে না- পাঠাগারে শুয়ে থাকা
ছাড়া, আচ্ছা ভাবনাগুলির এই যে, ঘোরাফেরা কখনও ফুল ফোটে কখনও
ঝরে যায়, বটবৃক্ষের ছায়ায় গোস্বা হয়ে বসা একজন কবি'র সব অস্তিত্ব গো
গ্রাসে খাচ্ছে, নাড়ির সাথে মিশে যাচ্ছে বৃক্ষমূল- যে হয়েছে অন্তরঙ্গ
বন্ধু কেবল সে-ই সব জানে ও বুঝে সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি, রাগ-
যন্ত্রনা-বিদ্বেষ-হানাহানি সবই আশ্রয় নিচ্ছে এই সবুজ ঘেরা গ্রামে,
বসত বাটির স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় কিংবা যৌন মিলনের সুখে আবার

পরদিন জেগে উঠেছে, পূর্ণরাবৃত্তি হচ্ছে আমার খাতার পাতা
উল্টানোর মত ।

আদি যুগের বালমীকি এ রকম কিছু ভাবছিলেন- মেঘেরা কি
শুধু ভাব গম্ভীর হয়ে ঘুরত , ছিল না কি বিদ্যুৎ চমকানো , আকাশের
বুক ফাটা গর্জন-কান্না দুঃখীর আহাজারি-

এ যুগে লাশ হওয়া কোন ব্যাপার নয় এটা হাতের কাছে পাওয়া
গেলাসের মত , ইচ্ছা হলেই খেতে পারি লাশের এক গেলাস জল ।
চিল্লাচিল্লি চলছে শান্তির জন্য আর শান্তি চেঁচামেচির সাথে
উড়ে যাচ্ছে কর্পূরের মত । ছাতা দিয়ে কি হবে-বাজার দরের রৌদ্র
কষবে না-ছাতার নিচের ভ্যাপসা গরম ঘামিয়ে দেবেই উপার্জনের
উদ্বিগ্ন শরীর । এই বিষফোঁড়ার পুঁজ-রক্ত ঝরবেই শুক্রবার
হতে শনিবার , শনিবার হতে শুক্রবার সারা জীবন অনন্ত কাল
অতএব , আমি মুক্ত হতে চাই আপাততঃ মুক্ত হবার চিন্তায় , মুক্ত
ভাবনাগুলিও একত্রে মোট অংক কষে হিসাব নিকাশ কষলাম
কতদিন কত রাত অংক আর মিলে না , মিলবে যে কোন দিন তাও জানি
না-এই হিসাব কেউ মেলাতে পেরেছেন কি? আমাকে জানাবেন ।
সংসারের যাদুর কাটির সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি এখনও গোলক
ধাঁ ধাঁ যে আমাকে ছাড়বে না আমি নিশ্চিত ।
আচ্ছা এই বুকে এত কিছুর আশ্রয়? আগুন পানি একত্রে আছে
তো আছেই , কখনও আগুন বেরোয় কখনও পানি-আজকাল
এভাবেই বিহ্বল সময় পার হচ্ছে । পার হচ্ছে বলাটা ঠিক হবে না
আমি সংসারে চড়ে যাচ্ছি সামনে , শতাব্দীর ওপর পা রেখে
কোন এক মুক্ত শতাব্দীর উদ্দেশ্যে কোথায়-আমার এ আশা
কি কোন দিন পূরণ হবে? জানি না জানার ইচ্ছেও নেই ,
কেবল , যাচ্ছি , যাচ্ছি , যাচ্ছি ।

০৯/১০/৯২ নবাবগঞ্জ ।

উদ্বিগ্ন শরীর

দুশ্চিন্তা রাশি ক্রমাগত ভীড় করছে আমার খাতায়, হারিকেনের আলোয় 'থ' মেরে ছিটকে পড়ছে চতুর্দিকে, ওরা ঘর শুদ্ধ হাতড়ে, রিষিক খুঁজে সম্মানের সাথে বাঁচতে চায়, কিন্তু কি কঠিন এ পথ!

আধমরা একজনের ভাগ্য লীলা বই পুষ্টকের মাঝখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পথ চলে, হোঁচট খায় নিপীড়িত হয়, রক্তাক্ত বুকের মধ্যে ফুটে আশার পদ্ম-কে যেন তাও তুলে নেয় অবলীলায়, এখন কি নিয়ে বাঁচবে গানের সেতারা, এই সব পদক্ষেপের আলনা যে পুরনো দু'চারটে কাপড় গায়ে জড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে জনমঙ্গলের তা হয়ত নব বধূয়ার সাধ পূরণ করবে না।

কত যুগ পরে কে জানে আমার উন্নতির বিয়ে হবে, আর সেই বাসর রাতের কল্পনা করে করে এই ঘুনে খাওয়া ভাড়াটে চৌকিটা ভাস্কর উপক্রম হয়ে গেছে। কানগুলো ক্রমাগত বমি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুখেরা স্ত্রীর। তবু সময়ের গাড়ী চলে না। প্রতীক্ষার প্রতিটি মূর্তত সূচের মত বিধছে একজনের গায়ে সে কিনা পরাজিত, চতুর অফিস ফাইলে বন্দী, বিশ্বাসঘাতক পদবীগুলো এই টেবিলে কাঁদতে কাঁদতে মুর্ছা যায়, মিছে সে আশা পদোন্নতি মরে গেছে যেমন আমার পিশাচ জুতোর নিচে অলক্ষ্যে চাপা পড়ে নিরীহ পিপীলিকা।

আগামী দু'টো তিনটে যুগ এখন আমার কাঁধে সওয়ার হয়ে আছে পিল-পিল করছে মাথায় বৃকে, ওদের উৎপাতে বাঁচা দায় ঐ নদীটারও, এত জল বৃকে ধরেও তৃষ্ণা মেটে না চিন্তার, খালি খালি বৃষ্টি ঝড়ায়, চাতকের মত অভ্যাস মত উর্ধ্ব দিকে চেয়ে থাকে। আসলে ধৈর্য্যের খেয়া নৌকো আর বেদের দল দু'চার টাকা হাতে লয়ে স্বপ্ন দেখছে সাগর পাড়ি জমাবার, উদ্দেশ্য গুলো চিরঞ্জিব হবার বাসনা নিয়ে, মুরগীর মত ঠোকরায় আপন গায়ে-সীমাবদ্ধতা দেখে হাসি পায়। বাজার করে ফেরা মানুষের ঢল কিংবা বেড়া নির্মাণকারীর দায়ের কোপে টুকরা হয়ে যাওয়া বাঁশ তো এগুলো, পাষাণ ইমারতের কাছে এরা কি দাম পাবে? কুষ্ঠ রোগীর মত বিছানায় লেটে যায়-সমগ্র পরিবেশে ছুটাছুটি করে, চিন্তা ও আশার উদ্বিগ্ন শরীর।

১৬/১০/৯২-নবাবগঞ্জ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৩৭৩

বুকের ভেতর

জীবিত পেঁচানো শিকড় বটবৃক্ষ সাম্প্রদায়িকতার যেন মাটিতে মুখ খুবড়ে
পড়ে আছে শত বর্ষ ধরে- পিঁপড়া কামড়ায় চামড়ায় অষ্টপ্রহর! ছোট
পাখিটার স্বাধীন ঠোকরানো, ধীর পায়ে হাঁটা-হঠাৎ উড়ে যাওয়া, নির্বিঘ্নে
আত্মসাৎ করে ওরা। ভগবান উড়ে যায় সুদূর নীলিমায়, শয়তান বাসা বাঁধে
শান্তির কুটিরে, বেদনাহত রোদ ঘামে ঘামে নিষিক্ত করে সাম্প্রদায়িকতার
বীজ, নিষ্প্রাণ বাঁশের পালা লাশ গুলো দিবালােকে মধ্যরাতের পিনপতন
নিস্তরুতায় ঘুমে অচেতন, সবুজ সজীব পাতাগুলো হলদে হয়ে ওঠে হঠাৎ
অতএব, কুলাঙ্গার মাছরাঙা, আর নীতির মাছ ধরা নয় চাই শাদা ধবধবে
আকাশের ছিমিয়ানা চাই রাখালের বাঁশি, যতদিন হোক মুক্তি পেতে
হবে; মুক্তি পেতে হবে, দিগন্ত চরাচরে, শান্তির দৃষ্টি
নিষ্ফেপ করবেন যারা অবলীলায় সবুজেরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতিয়ে
তুলবে প্রেমের মাঠ, নিমতলায় আহলাদে, গাভী চাটবে বাছুরের গাল
পেট, বুক। কাকের শাসন পরিত্যাজ্য, শৃগালের প্যারেড দেখিতে চাই না
আর সিংহকে বেরিয়ে আসতে হবে প্রেমের গুহা থেকে। পৃথিবীর হাত
পা-নাক-চুল কেটে বানাতে চাই নতুন আর একটি মানুষ আর একটি বুক
প্লাষ্টিক সার্জারী করে বানাতে চাই আর একটি যান্ত্রিক অথচ সুশীল মস্তিষ্ক
যেখান থেকে বেরিয়ে আসবে চিন্তার ফেনিল স্রোত, বইয়ে দেবে সুপেয় পানির
প্লাবন, গড়াগড়ি যাবে মাঠে কমল, কান্নারা ক্রমশঃ উঠে যাবে,
ধ্যানি বক ধার্মিকের অস্তিত্ব থাকবে না অন্ততঃ আমার সুবিশাল
নদী বিল ঝিলের বুক। আহা কি সুন্দর শরতের সোনালি
সূর্যালোক, রূপালি ইলিশের গায়ে চকচক করবে সকাল নটায়
বুকের ভেতর।

১০/১১/৯২- নবাবগঞ্জ।

বীথির বায়না

ভাত খাবে না চকলেট খাবে
মস্ত ভাবান্তর,
ছুটাছুটি ভোর হতেই তাই এখন
ক্লান্ত গতি মন্তর।
ভুল খাবে না শুদ্ধ খাবে
দিশেহারা মানুষ,
বাংলা চাইবে না পাক চাইবে
দালাল ফানুস।
বীথি হাসে আপন মনে
কখন কি চায়,
কোলে ওঠে দুধ খায় মায়ের
পিঠে চাপড়ায়।
এমন করেই সময় কাটে
চার বছরের বীথির,
বলো, কি হচ্ছে ইতিহাস
৭১ এর স্মৃতির।
বীথি মাটিতে পানি দিয়ে
দু'পায়ে ঘষে,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ
দালালের বশে।
বাবা নেই খুকীর,
আর আদর পায় না,
শুকিয়ে গেছে মনের দুগুখে
আর ধরে না বায়না।

৩০/১১/৯৫- বাহরাম খান পাড়া।

সংবাদ

ডেরেক ওয়ালকট, সাহিত্যে বিশ্ববিজয়ী ৯২, ক্যারিবিয়ান জাতিপুঞ্জের ঐতিহ্য গায়ে মেখে, হোমারের ভাবসাথী হয়ে, ওঠে এসেছেন প্রচার মাধ্যমের মাঠে সকাল বেলার নদী তীরে এখানে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চপল বালকের মত খেয়া মাঝির স্বাভাবিক জীবনে এসেছেন সমস্যা সংকুল বিশ্ব ব্যবস্থার জটিল স্রোতাবর্তে, কবিতা সুড়সুড়ি দিয়ে যায় নারকেল গাছের পাতায় মাথা নেড়ে বাতাস, স্বর্ণলতা দুলিয়ে বাতাস ছন্দ ছড়ায় গায়ের পোষাকে। ডেরেক সাহেব, কোনদিন হয়ত শুনবেন না, বটবৃক্ষের সবুজ আবেদন, তার ছায়ায় বসা-একজন মানুষ তাকে নিয়ে ভাবছিল, ভাবছিল, মুক্তগৌরবে গলা ফাটিয়ে, মাথা উঁচু করে বলে যাওয়া জাতীয় গৌরব গাঁথা। আমার সাধুবাদে বা নিন্দাবাদে কিছু আসবে যাবে না। শুধু আমার অনুভূতিটা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে দিলুম, সবুজের নকশী কাঁথা গায়ে জড়ানো আমার মায়ের কানে কানে, সানন্দে, চুপি চুপি বুঝিয়ে দিলাম, দু'বেলা ভাই বোন স্ত্রী-কন্যার না-খাওয়া আত্মিক কথা।

আজ অসংখ্য মিথ্যাচারের কাক কলের গান, যখন নিত্য দিন যাওয়া আসা করে, এই ঘাটে লুঙ্গি গেঞ্জি ছেড়ে, কল্লনার উর্দি পরে বিশ্বয় নিঃশ্বাসে অসংখ্য পরদেশী, কবুতর, চিল উড়ে যায় দ্রুত, শংকা জাগে কখন জানি মরে যাই সময়ের মত। তবু মনে হয় দৈনিক সকাল সন্ধ্যা কলকোলাহলে মুখরিত হবে এই জনবসতি। ফিরবে বাজার হইতে বাড়ী কৃষাণ মজুর। সদ্য বিদেশ ফেরৎ কাঁচা টাকার মালিক, বুকে টাকার গর্ব নিয়ে বড় সওদা করে ফিরবে যুবক।

এভাবে গোলামীর জিঞ্জিরে বাঁধা স্বজাতীয় গরু-যত আফালন করুক, সময়তো দিয়েই চলেছে ডংকা বাজিয়ে বড় বড় হেড লাইনে, পত্র-পত্রিকায় সংবাদ-নৌকার পাল ছিঁড়বে ছিঁড়ুক, ইঞ্জিন লাগাবে লাগাক গরুর গাড়ীতে চড়ে যাবে না, মোটর গাড়ীতে যাবে যাক-আমার চোখ তাকাবে মনে, মন তাকাবে মাটিতে, আর মাটি সব সন্তান বুকে নিয়ে টুটি চেপে ধরবে, আত্মাসীদের, বলবে, আহা দাও না, সংবাদটা, বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক কে।

২৪/১০/৯২- বটতলা, নবাবগঞ্জ।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৩৭৬

বোধ

শিকড় রাজির মধ্যে, রক্ত-রক্তাক্ত দুপুর
খেদ-শান্তির, কিশোরীর পায়ে খুশীর নুপুর।
বয়ে যায় সময় বয়ে যায় ধীরে নদী জল,
শরীর খুঁটে হাঁস ঠোঁটে অভাব খুঁজে সুখের ঢল।
শব্দ শোনা যায় দূরে দিন যায় বড় কষ্টে,
ফুল ফোটে শব্দের নীতির মিনার ভরেছে নষ্টে।
সবুজ আবেগ, মৃত্যু ডেকে আনে সোনালি রোদ,
রাজপথে, মাঠে ঘাটে মুর্ছা যায় সুন্দর বোধ।
বিমান উড়ছে সব সম্বল পেটে ভরে মীনাঙ্কীর,
হয়ে আসবে পাকাবাড়ি প্রাচ্য-প্রতিচ্যের ক্ষীর।
আশার কাশফুল, দুলছে দুলছে বড় একা লাগে,
ফিরে যাবে দুঃখরা সব বিমুখ আত্মীয় আসিবে বাগে।
নিত্যদিন যায় আসে সশব্দে জলযান নদীর বুকে,
শুনিয়ে কাহিনী দুনিয়ার-ঘটছে যা লোকে লোকে।
বাতাসেরা এখন ভারী সুখী দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে,
দাঁড় টানে সুখে মাঝি, কন্যার বিনা পণে স্বামী পেয়ে।
দুঃখে কাঁদে গাভী রাখাল কি বুঝে ভাষা তার,
চোখ বুজে দেখিলাম দুনিয়া মিটিল সাধ কবিতার।

২৯/১০/৯২-কাশিমপুর, নবাবগঞ্জ।

বন্ধ্যাত্ম

বালখিল্যপনা দৃষ্টির সীমানায় চুমু দিয়ে যায় মনে-জলে,
আজ মনটা খারাপ উন্নতির পিপাসায় বুক ভাঙ্গে, চিন্তায় পড়ে ঢলে।
লতারার রয়েছে নূয়ে আল্লাদে, পারে নাকি আঘাত দিয়ে ভাঙ্গে ঘাড়,
ছুঁয়ে আকাশ মেঘেরা হাভাতে ক্ষীণ শরীর সময়ের নদী করে পারাপার।
বন্ধ্য কল্পনাগুলো জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ঘুরে ঘুরে বলো কি যে পায়,
হয়রানি বেগুনার ফকির করে ভিক্ষে যক্ষ্মা ভরা অর্থনীতির কলিজায়।
বেবলিন খুঁজে তবু অস্থির আশার বোরাক আনন্দ, লজ্জার ঘরে মুখ লুকায়,
গরীব সুরকী বড়লোক দালানের খোরাক ফুলে বাস করে অসাধু পোকায়।
বামন হয়ে আকাশ ধরা হয় বুঝাতে চায় মোড়ল কৌশলী ভাষায়,
মনে দৃশ্যতঃ বন্ধ্য বীজে ব্রহ্ম গজায়, কভু জ্ঞানের দ্বার যখন খুলে যায়।

২০/১১/৯২-নবাবগঞ্জ।

সরলতা

পড়ন্ত বিকেল সূর্যের রশ্মিগুলো যেন চিত্তার রশ্মি, ছড়াচ্ছে দুর্বল জীবনী শক্তির আলোক। ওরা ক্রমাগত সন্ধ্যার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে- প্রতারণার গোধূলি লগ্ন এখন। যৌবন সায়াহ্নে কোলাহল শেষে বাড়ী ফেরার পালা, ততক্ষণে সরলতার সাথে কুস্তি খেলায় সত্যিই হারিয়েছ- মর্মস্তুদ পরাজয় স্বীকার করে ক্ষীণ শরীর মজুর সরলতা বিদ্রান্তির ছায়াজালে আবদ্ধ।

বলাকারা উড়ে উড়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে- তাসের আড্ডায় লীন যুবা প্রৌঢ় খোশ গল্পে বিভোর, সিগারেট ফুরিয়ে ধূর্মজাল কলকের মত মূহুর্তেই মিলাইছে, অদৃশ্য বাতাসে, সবকিছুর মধ্যে সরলতার আত্মার শ্বাস মিলিয়ে যাচ্ছে, ভীষণ হয়রানীর মধ্যে কালাতিপাত করে শব্দগুলো বিদায় নিচ্ছে হাতুড়ির পিঠ থেকে, শরীর থেকে উত্তাপ সরে যাচ্ছে, কখনই বুঝি আসবে না আর সরলতার বাস, যাত্রী নামিয়ে সেই কবে উধাও হয়েছে ভালবাসা, নিঃশ্ব রিক্ত গাছ গাছড়া হেমন্তের বরার অপেক্ষায় এখন বাসষ্ট্যান্ড।

মতবাদের ধারালো ছুরিকাঘাতে আহত সরলতাকে ডিঙ্গিয়ে তীব্র গতিতে ঘুরছে হইল-প্রতারণার ইঞ্জিন। রক্তাক্ত দেহ অবয়ব দেখে ভারী লজ্জা করে এখন, কখনও ইচ্ছে করে, ঘৃষি মারি যুগ যন্ত্রণাকে ঠোট মুখ তেথলে দিই অবিশ্বাসের ধূর্মজাল।

স্বোপার্জিত, মার্জিত দুর্বাঘাস হোক আমার সবুজ জাজিম এখানে শুয়ে থিক্কার দিই শাদা আকাশ টুপিকে চোখ ধাধানো বিশালতা নিয়ে সেই দিয়েছে ছড়ায়ে বৃষ্টির মতলব ফোটা পৃথিবী উর্কর হয়ে উঠেছে, বিষাক্ত, প্রতারণার শৈবালে, আছাড় খেয়ে, ভেঙ্গেছে আমার কোমর- বাত রসে দাঁড়াতে পারি না; ঘুমে কাতর দু'চোখ কখন ঘুমিয়ে পড়ি ইচ্ছে করে ঘুমাতে শতাব্দী পেরিয়ে আর এক সময় জেগে উঠে আচমকা আঘাত হানব নরঘাতক প্রতারণার চোরাবালিকে ভেঙ্গে চুরে আমার নৌকো হৃদয়ে দেব আলকাতরা কোনদিন যেন প্রতারণার পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে না ঢুকে।

অবশেষে সময়ের নদীতে পাল তুলে চালাইব জীবন
নৌকো; গাইব সুখের ভাটিয়ালী, আশা রাখি দু'চোখ
মেলে দিগন্তে খুঁজে পাব ভবিষ্যৎ পরিজনের ঠিকানা ।

১১/১১/৯২-নবাবগঞ্জ ।

কলিজা ও কল্পনা

বাবরী মসজিদ যেখানে লোকায়িত আত্মা, অনুভূতি সেখানে
আমি ধ্বংস হলাম । মন্দিরের দেবতা-দেবী যেখানে দন্ডায়মান
সেখানে আমি ধ্বংস হলাম । সত্য সুন্দরের নজরুল
কই তুমি? প্রাগৈতিহাসিক এক দৈত্য আজ ঘাড়ে নির্দিধায়
সওয়ার- পাঁচ আগুনে নেড়ে নেড়ে দোলাই করছে, সে
ভুলুপ্তিত সত্যের শবদেহে, কিলবিল করছে শয়তান,
সাম্প্রদায়িকতা, আজ বিধ্বস্ত অবসন্ন নীতির টেবিল
অতিনীতি বা অনীতির লাঠিয়াল বেশ অনায়াসে
আঘাত হানছে আমার কবিতায়-
রক্তাক্ত খাতা এখন আহাজারি করছে শাদা সত্য সুন্দরে পায় নি
ঠাই প্রেমের সৃষ্টিকর্তার অক্ষর, এখন কি করি?
ক্রমবিদ্ধ মসীহ স্ত্রী হারানো রাম, মক্কা বিতাড়িত মোহাম্মদ
তোমরা কি শুধু ইতিহাসের বই, শুধু, ঘুমাবে টেবিলে, শেলফে
আর কখনও কল্পনার সোনার ময়না হয়ে উড়াল দেবে
আকাশে, শতাব্দীর আকাশ এখন কাল মেঘে আচ্ছন্ন
হিংসার বিদ্যুৎ-বজ্র-রোষ তুফান চলছে, কখন ও কি আর ফিরে
আসবে না, আমার ডানা হয়ে, ডানা ভাঙ্গা আহত পাখি
পড়ে আছি কাদার গায়ে শুধু কাঁপছি কাঁপছি
সময়োত্তীর্ণ তোমরা, জানি আজ না হোক কাল, আসবেই আসতে
হবে, দরিদ্রতম কূটিরে, যেখানে ওরা এখনও সন্ধ্যা প্রদীপ
জ্বেলে পূজা দেয় এখনও প্রার্থনা করে, নামাজ পড়ে,
বিদ্বন্ধ কলিজা ও কল্পনারা, আউলিয়া, ঋষি, পাদ্রীরা
ফোটায় স্ব স্ব বাগানে বিচিত্র ফুল, সিদ্ধির;
দুর্গন্ধ ডাস্টবিন, গোশালা, বাগাচ আর কত কাল রাজত্ব

করবে নাকের ডগায়, বলি, আর কত কাল বিধবা মা
ও মেয়েরা, ষাটোত্তীর্ণ পিতা ও পুত্রেরা শুধু গা চুলকাবে
অসহায় ভন্ড ব্যাধির বলি হয়ে, অবশেষে শুধু মাটি কিংবা
ছাই হয়ে, ‘কাল ও পৃথিবীর’ চলে যাবে-
এদের নেই কোন পাওনা, সত্য সুন্দর চর্চার নেই
অধিকার, বলব আছে, থাকতে হবে।
সময়ের আকাশ ভরে তারা ফুটলে; চাঁদের নির্মল
আলোয় যেমন শোভা ছড়ায় নক্ষত্ররা, যেমন যুগ যুগ
দিক নির্দেশনা দেয়, আহা সেরকম চাই,
এক, একটি কলিজা ও কল্পনা।

০৭/১২/৯২-নবাবগঞ্জ।

চেতনার ঘোরাফেরা

আমার চিন্তার পানি যাবে নাতো গড়িয়ে কারো খাদে-আমার ভালবাসার
বৃষ্টি কণা বরবেই তো স্মৃতির পাতায় অষ্টপ্রহর নির্মম বেদনা অশ্রুর
ফোটা ঝরে অবিরত, আমার চেতনার টাকা ভিজে যাবে নিরাশার তন্দ্রায়
ঘাসে নিরিবিলা, তবু কি মন-আমার, সময়ের জখম ক্লিষ্ট পিষ্ট
হৃদয়, ডাকবে না, অশান্ত মেঘের, অশান্ত গুরু গুরু ডাকে, চেতনার
বিদ্রোহী হিমেল হাওয়াকে?
দৃষ্টির দরোজা খোলা-চেয়ে আছি, চেয়ে আছি তরলতার সবুজতায়
নিবিড়, সে গো গ্রাসে খেতে চায় রক্ষনশীল অভিজাত্যের মরা, ছাল
বাকল। কালের নির্মল জলে গা ধুয়ে গড়াবেই সে ভাবনা আর
বিদ্বন্ধ কৃষক, মাথাল পরে লাঙ্গল কাঁধে, ফিরে তাকাবে, অমরত্বের
বারান্দায়, যেখানে তার ঘোমটা পরা বউ, চোখের তারায়, শব্দ আর ভাষার
বির্বতন এনে, দাঁড়িয়ে আছে, অনাচারের মোটা কাপড় পরে। ইচ্ছার
স্বতস্কুর্ত জলস্রোত, বাঁশ আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরা আকারহীন
আমার কবি সত্তার, সচল ক্ষুর হাওয়া, জীবিকার গায়ে লাথি দিয়ে
বেদনার গায়ে দোলা দিয়ে, এখনকার স্পৃশ্য, ভবিতব্যের অস্পৃশ্য না খেয়ে
পোড়া, শৈবালে ধরা লাল ইট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবেই তো নতুন কোন কানে
সশব্দে নিঃশব্দে চেতনা; অনায়াসে পিপীলিকা স্বাধীন,
চলছে চলবেই, মাইন পুঁতে, ভেঙ্গে সম্পদের পাহাড়-চিবিয় কলিজা
দাঁতে, মানবতার মহাকাশে, গুরু করে তারকা যুদ্ধ, কালে, কালে।

২০/০৫/৮৮- বাহারাম খান পাড়া।

শাশ্বত বাংলার দিনকাল

মুহূর্তের চিরসঙ্গী বৃষ্টির কণা যেন বর্ষায় মমতার ধারা ,
মনে হয় বাংলার মাটি ও মানুষ সর্বকালের স্বজন হারা ।
ঋতুর আবর্তন বয়ে আনে আমল শাশ্বত চিত্ত সুখ ,
কল্পলোকের উৎসারিত ঘন মেঘের চির ভাস্বর বুক ।
সুখে দিন যায় কারু , কারু মনে জাগে বিষাদের ছায়া ,
নিত্য নতুন আমেজে প্রকৃতি আসে নিয়ে নব নব কায়া ।
আমি আসি যাই এদেশে , মুনির বেশে , ব্যাকুল চিত্তে
নাই যুগের কোন রূপ আছে ভর্তি প্রাণ রসের মধুর বিত্তে ।
আমার নয়ন লিপ্ত মায়াবী রূপে মুগ্ধ বর্ষন ক্লান্ত দিনে ,
মুক্তি পেতে চায় হৃদয় যে আবদ্ধ জীবন সংগ্রাম , ঋণে
এ বাড়ী নির্মম অর্থ সাপের কামড়ে মুর্ছা যায় ,
অস্ত্র দাপট সর্বত্র কে-মারে , কে-মরে , মনুষ্যত্ব কোথায় ?
শান্তি বিরল বনজঙ্গল-উঠান-জমিন-লোকালয় ,
বাটপার পিশাচের উল্লাস নিয়া হয় দুর্গন্ধ বায়ু বয় ।
এখন সময়ের যুদ্ধ বিমান-মনের রাডারে ধরা পড়ে ,
শাশ্বত বাংলায় বসবাস করি আশা হতাশার আশ্বিনে ঝড়ে ।

০৮/১০/৯০- কাশিমপুর, নবাবগঞ্জ ।

আমার খোসাটা

কষ্টের এক গুচ্ছ ফুল দাঁড়িয়ে ওখানে-
জানাচ্ছে স্বাগতম :
আমলা-মামলাবাজ - জনগণ- শাসক-দ্রাস !
আধুনিকার পরিচ্ছন্ন অবয়ব , কাটিং চুল , সুরম্য ভবনরাজি
তোমার নাসিকা ভাবি উঁচু
কখনও নেড়ি কুকুরের দৌড় অপূর্ব দেখায়- আর একটি
সুবিধা হলো- অযথা সে কামড়ায় না , লালাময় জিহ্বা
দিয়ে চেটে সাফ করে , ভবিষ্যৎ বর্তমান ,
কখনও আধ ছায়া- আধ রোদে , নকল প্রতিমার বুক পিঠে
জারি করে ফাঁসির ফরমানঃ যে বহু আগেই কুলাউড়া
রোগে মারা গেছে ।

হৃদয় নিংড়ানো এক গুচ্ছ, রাগ, ব্যথা ও ক্ষোভ,
ঝেঁড়ে ফেলে, আমিও দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি,
অবশেষে তমাল ডালে, ঘোর অন্ধকারে হারিয়ে গেছি
এখানে, আমার খোসাটা রেখে এসেছি- নাগরিক
জীবনে, আরও ত্রিশ বছর, প্রাত্যহিক জীবনে অভ্যস্থ
হওয়ার জন্যে।

২৮/০৮/৮৮- কাশিমপুর

তালপাতার সেপাই

কোন এক দৈনিক পত্রিকার নাকের ডগায় লেখা : নির্বাচনের
কফিনে গণতন্ত্রের লাশ। ব্যস নিশ্চিত হলাম। বিংশ শতাব্দীর
চানাচুর আমার ঘরের তাকের কৌটায় অন্তরীন স্বাদ উবে গেছে
পালাক্রমে অসুর আসে গতকালও এসেছিল, নিয়ামত আলী
বেধড়ক মার খেয়ে কেঁদেই ফেলল, আর কত! এর নাম দেয়া
যায় মোটামুটি এরকম : অত্যাধুনিক মধ্যযুগ।
প্রত্যুষে কাকেরা চিৎকার দিয়ে উঠে - কা-কা যেন চাপাবাজ
রাজনীতিক, মানুষের ফরাসে বসিয়া নির্ঘাত খায় স্বার্থের
মুরগী রোষ্ট। বেহুশ বাতাস মনসিজ - আমার এ রকম
নাগরিকতা বাদ দিলেও মেডেলো তার নাম ফলকে ভাস্বর।
আবার আমিই ফিরে যাই অবলীলায় আমার ঘরে, দেখি
স্ত্রী শুয়েই আছে-পেটি কোট-ব্লাউজ, আধা ঢাকা অবয়ব
তৈলাক্ত ঘামের ছাপ মুখে-চুমু খেতে গিয়ে নূন খেলায়
বিড়ালের নখর বাঘের আবরণে ঢেকে দিয়ে আজকে কে যেন
ফেরি করে গেল, ইচ্ছে করে, আস্ত হিমালয়টা উপড়ে
ফেলে দিই। তারপর শান্ত হই, কারণ
তালপাতার সেপাই- কি-না করে।

০২/১০/৯০-কাশিমপুর

মনের রাজা

লক্ষ্য করো
শাশ্বৎ ভরা মুখ তারা
হাতে একতারা,
শুভ্র বসন মাথায় জুটি
মানুষ ছন্নছাড়া ।
ভাবের গানে মত্ত থাকে
নাওয়া খাওয়া নাই,
গাছের তলা বাড়ী তার
হঠাৎ হঠাৎ পাই ।
হরদম স্মরন করে
ঈশ্বরে বুঝি তাই,
মন ভুবনে স্বর্গ ঢালে
কে বুঝিবে ভাই ।
পাঠশালের পাঠ চুকে
পড়তে যেয়ো স্বভাবে
হবেই হবে সমাজ বিবেক,
থাকবে না আর অভাবে ।
লালন শাহ মলং শাহ
উঁচুমানের মানুষ ভবে,
মনের রাজা তারা হলে
কেমন মজা হবে?

শোলমারা, কিশোরগঞ্জ ।

সবুজ প্রেমে আগুন (১৯৮৬-১৯৮৮)

হৃদয়ার্থ্য

শরতের মধুর সন্ধ্যা লগ্নে, মহানন্দে ভাবের গগণে,
বিহার করি আমি আজি,
আরতি ধ্যান নাচন, ধীরে গাহে মন্ত্র বাঁধন,
কে গো দেবতা, মানুষ, সাজি।
গন্ধ বহিয়া আনে, ধর্ম দূর্গা কাননে,
আজ একি সুর পাই,
কোথা আমি যাই, ভাবি কভু নাহি পাই,
প্রভু, তোমায় শুধু চাই।
দোলে আত্মা কিসের লাগি, আজি আমি মুক্তি মাগি,
দেবী নাও, পুষ্প মালা মম,
রাগ রাগিনী বাজে, হৃদয়ের তারে লাজে,
দুলি আমি তরু সম।
অন্তর যাহা চায়, কভু নাহি পায়,
ভুলে যাই ভুবনের সবি,
খেলা চলে মম, ছন্দ দ্যোতনা সম,
বাজেরে বাজেরে হৃদয়, কবি।
আকুল ক্রন্দনে মোরে, হৃদয় নিয়া যায় দূরে,
সানাই বাঁশির সুর।
ভেদি গগণ ভেদি মর্তপুরী, চলে কোথা প্রেম ডুঁরি,
চিঙে আসে দেবী-হর।
হৃদয় মম দোলে দোলে, রক্তে টগবগ তোলে,
সেই রাগিনী আরতি নাচি,
পবনের সাথে চলি, অম্বরের সাথে বলি,
দেবতা, দেবতা বলে যাচি।
কোন্ সুরে কাকে বলি, ভরেছে ভাবের থলি,
অন্তরে করুণা মায়া জাগি,
হৃদয়ে খুশির ঢেউ তোলে, সংসার ধর্ম ভুলে,
মিশে একাকার অসীমের লাগি।

ধর্ম ছায়ায় হেরি, আর কত দেৱী, কত দেৱী-
 মিশে যাক তালে তালে সুরে সুরে সব,
 শারদীয়া দুৰ্গা বিচিত্র খেলিয়া, নাচিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া,
 রঙিন স্বপ্ন মাঝে ঈশ্বরের বাসরোত্সব ।
 বার বার ফিরে আসে, মম হিয়া অসীমে ভাসে,
 নাহি কোন কিনারা কুল,
 মানস জগতে বেড়াই, মানব নাহি চাই,
 স্রষ্টা পাওয়ার সাধনা কি ভুল ?
 হৃদয়ে তন্দ্রা লাগে, মায়া মুক্তি জাগে,
 কি চাই, কি নাই কি আশা,
 রাখি মম বহুদূরে, বিভাবরী গেল ভোরে,
 পাব কোথা জীবনের ভালবাসা ।
 পারে নি কেহ চিনে, সুর বাজিল মম বীণে,
 একি দশা, দুৰ্গা- সৰ্বনাশা ।
 নামিয়া করুণা মায়া, ধরায় ফেলি তার কায়া,
 শৰ্বরী সম সব একাকার করে,
 হৃদয়ে হৃদয় টানি, চলে আসে অরুণ খানি,
 যদি বাজে সুর হৃদয় ভরে-
 কেহ যায় কেহ আসে, সময়, অসময়ে নাশে,
 শেষ নাই যার কোন দিন,
 মহাকাশে কাকে খুঁজি, কভু নাহি আমার বুঝি,
 হৃদয় পূজা হয়নি সৰ্বাঙ্গীণ ।
 প্রেমধারা চলে বহিয়া, কাঁদে যবে রহিয়া রহিয়া,
 সেই ক্ষণে সেই আকুলতায়,
 সে দিন আমি আসি, ঝরা ফুল সম হব বাসী,
 নির্বাক হেরিবে শুধু অন্তরাত্মায় ।
 সৰ্বসংসার প্রতিটি কণা, করে মোরে সংবেদনশীল-মনা,
 করে চাই, করে হারাই,
 বিরহ-বেদনা ভয়ে, আপনায় সরায়ে লয়ে,
 অসীমে হাত বাড়াই ।
 ঈশ্বর কহে হাসিয়া, তোমাকে তুমি নাশিয়া,
 মানব হৃদয় থেকে বহু দূরে;

অর্ঘ্য দিও না মোরে, মিলন বাঁশি সুরে,
আসিব না কভু আমি ওরে ।
হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া, প্রেমের সুর তুলিয়া,
পাই ‘হৃদয়’- অন্তর্যামী,
পদ্ম ছাণ ছড়ায় যেমন, বিহঙ্গ কুজন তেমন,
সমীরে ভাসে অনন্ত দিবাযামী ।

১২/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

দুর্গা বিসর্জন

শরতের হিমেল মলয়ে,
শান্তি প্রশস্থির স্বর্ণ বলয়ে,
কে এলো গো, কে ধরায় ত্রাস রোধিতে ।
অন্যায় পাপাচারে ভরা,
দানবের রাহু যেন ধরা,
আবেগে করি মোরা ত্বরা,
তব কোলে উঠি, ভক্তি ঋণ শোধিতে ।
তাই মোরা সূরের তালে,
অর্ঘ্য দিয়া নমিঃ শুভভালে,
এসো গো এসো সর্বকালে,
আশার প্রদীপ জ্বালিয়া এসো, প্রভু হৃদয়ে ।
জলে যাও চলে, বিজয় বেষে,
প্রশান্তি-মগ্ন মন্ত্র সাধন শেষে,
অসুর দুনিয়ার সব তুমি নেশে,
ভুবনের সত্য বিজয় আসে, রবি উদয়ে ।
মানুষ কাঁদিবে না আর,
তবু ভক্তি রাখি তার,
জীবন করিব সার সার,
দেবীর প্রতিমা আঁকি আমার মানস পটে ।
জয় ঢংকা বাজে, ঐ দেখো,
পুজায় আমায় রত রেখো,

তুমি সুন্দর ভাগ্যলেখা লেখো,
দশপাণির ধনুকে যেন অসৎ হটে ।
মানব আমি, মনোভূমি চষি,
দম্ভের রাজত্ব পড়িবে খসি,
হৃদয়সম স্নিগ্ধ উদার শশী,
রচিব এ জগৎ, মায়া লোক-স্বর্গপুরী ।
যাও, তবে যাও জলদি কোলে,
এমন চাঁদনি নিশীতে জগৎ ভূলে,
জপি ভগবান নাম মন্ত্র তুলে,
আসিও আরবার সাথে নৃ উত্তরসুরী ।
শুষ্ক বদন ডাল নিরামিষ খাই,
তব সম্মানে আত্মসুখ ভূলে যাই,
অপর দুঃখে মোরা দুঃখ পাই,
চাই দেবী, তোমায় ভালবেসে শেষে ।
ঘটাব প্রমাদ যত অসুরে,
পালাবে রাত্রি শেষে ভোরে,
তব আগমনে পিশাচ যাবে দূরে,
আরতি নাচে ধনুক হাতে যুদ্ধ বেশে ।

১৩/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

উজাড়ি আবেগ, হে স্বভাব তব হেরি

কি সুন্দর আহা মরি প্রাণের আবেগে কতো,
জল করে ছল্ ছল্ শাদা ঘোলাটে-মন মতো
হেরিনু তব আমি । এত জল বুকে রাখি
ওরে প্রাণের নদী কি করে বাঁচো । ডাকি
তব মনোহারিনী, ওগো হৃদয় স্পর্শ কাতর
ভাসি তব 'পরে, কত কথা বলে যাও-পাথর,
সম তব 'পরে চড়ে অপলক্ নেত্রে হেরি তব
ওগো বিপুল জলরাশি । দু'ধারে হেরি নব,
নব গাও যেন চির নতুন । বলে কথা

জুড়ায় প্রাণের শত দুঃখ যাতনা ব্যথা,
ওগো সীমাহীন আকুলতা, ওগো মায়াময়,
ধোঁয়াময় দৃশ্য, অদূরে দূরে পালের নাও, লয়
নেই, তব নেই ক্ষয়, জাগাও প্রাণে সদা ভয়।

স্নিগ্ধ কাতর মম পুলকে ভরা আঁখি,
যায় কত দূরে। মিশে যায় রাখি
সব কর্ম কোলাহলে দ্বন্দ্ব সংশয় সংসার
ভুলি মান অভিমান অনুপম জগতের অভিসার।
জীবন 'পরে যেন তুমি শান্তির দূত তাই,
তব বিশালতায় রাখি প্রাণ নিমিষে জুড়াই,
ভাবি এমনি করে যদি চলে সারা জীবন মান
এ-ই স্বর্গ, হৃদয়ে শান্তি, বিশ্ব দাতার অনুপম দান।
শোলা পাটি আঁটি আঁটি, মাঝি ধরে হাল,
দুঃসাহসী নদীবাসী দামাল ছেলে নির্ভেজাল-
ঘুরে বেড়ায় সাঁতার কাটে অথৈ জলে নাই,
তার ভয়-কখন শীশু ধরে পায়, কোথা তার ঠাঁই?
ঘাটে, ঘাটে ভীড়ে তরী যাত্রী নামে কত, কত,
প্রিয় জনের কাছে চলি, বলি আবেগে কথা শত।
ছোট খাল গেছে চলে অদূরে গ্রামে গঞ্জে,
হাটে চলে গৈয়ো চাষা ডিঙ্গি করে মৃদু মন্দে।
ফেরি করে, ফিরে সুন্দর করি খেলনা সাজাই,
তা হেরি মানব শিশু চকিত চাহনি-বাজখাই।
জল খাবার নিয়ে আসে চাষী আর দৈনিক মেলি
আঁখি, দেশ বিদেশে নিমিষে যায় খেলি।
কলসি কাঁখে চলে গৃহবধূ জল ভরি, মনে ভীতি,
সিঁথিতে সিঁদুর-স্বামীসমেত গ্রামে চলিছে নিতি।
ঐ দূরে হেরি ষোড়শী রূপের ঢেউ তুলি,
পাগল করা হৃদ আবেদন সে- আমি রূপে ভুলি।
অভিসারে আসে রাখাল ছেলে, বাজায় বাঁশের বাঁশি,
মনে গোপন মিতালী, চলে দু'জনায়ে ভালবাসাবাসি।
ওগো তটিনী, যত হেরি তত মোর আগ্রহ বাড়ে,
সুর মূর্ছনা-শান্তি আমার জাগো, হৃদয়ের তারে।
ইউলিশিসের মতো চিরদিন ঘুরিয়া তব 'পরে,

বিদেশিণী সাথী করে-হৃদয়ে তারে রাখি ধরে,
কত কি হেরি, বলি ছাই আনন্দ আর ধরে না মম,
সামীয়ানা সম উদার গগণ, মেঘে ভরা আছে স্বপ্ন সম।
দিগন্ত রেখা হাতছানি দিয়ে বলে এসো মোর কাছে,
দিব কি ধরা, তাহলে তারুণ্য কাঁদিবে যে, পাছে।

কত কাল তব 'পরে মানবে যাতনা দিয়া হয়,
চলি কত দেশ দিয়ে অবিরাম, সে চলে যায়
কভু তো মেটে নি তার আশা, যাত্রা হয় নি শেষ,
সেই একই দশা, মনোহরা রূপ-তার ভূষণ-বেশ।
মানব কত আসে, কত যায়, তবু সেই হৃদয়
মানবে মানব ধরে, হলো রবিকর উদয়-
নেই ক্ষয় নেই লয়-এখনো যায় নি তারে চেনা,
যন্ত্র সঙ্গ করে চলে আজ মানুষ, করে বেচা কেনা,
কত হাটে গঞ্জে। সেই আদি যুগে, যুগে
মনু হৃদ বলিত যা-সেই কান্না সেই হাসি,ভোগে
মত্ত আজও। আমার এ প্রাণ তো কোন দিন
সাক্ষাৎ পায় নি কোন ভাবকের, কোন রঙিন
চেতনার মহা মানব তো বলে নি কিছু মোরে,
তবু তার হৃদয়ের কথা কেন মোর মনে ঘোরে।
সকল হৃদয় একই, তা স্থান কালের তফাৎ,
যত যাও চলি-কত দূরে, কতকাল, অকস্মাৎ
তব হেরি, চির নূতন-পুরাতন মানব সাথী,
নিয়ে চল মোরে, স্নেহ কাতরে আনন্দে মাতি।

০৫/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

ফিরে আসে আত্মা

তটিনীর জোয়ার ভাটার মত মানব রাজি,
কত চলে যায়, কত বার ফিরে, সাজি
পুতুল, শিশু খেলা সম, হুকুমে বিশ্ব বিধাতার।
হৃদয় কেমনে সৃজিলে, প্রভু, দেহ খুলি বারবার
চলে যায় আবার ফিরে মানব রূপে। তাই
বলি আমি মরিব না, মরিব না, দাও ঠাঁই
মানব হৃদয়ে, নেব ঠাঁই চির দিন।

দুঃখ আমার, শুধু আমি চলে যাই
কেঁদো না কেহ, কোন দিন-এই তো নিয়ম ভাই।
বিধির বিধান নাহি করা যায় খন্ডন, দীর্ঘশ্বাস,
দু'দিনের তরে বিশ্ব চরাচরে, মানব বসবাস,
খেলা ফুরালে যাব যবে চলে আমি,
আমার আয়ুর খবর রাখে শুধু অন্তর্যামী।
কিসের বিষয়, কিসের সম্মান, কিসের আশা,
আমার মনের কথা বলে, পৃথিবী আজ সর্বনাশা।
হেরি নিজেকে বিভোর, স্বপ্নে রঙিন।

পূবালী হাওয়ায়, বসন্তে আজ 'কালবৈশাখী ঝড়',
শীতের আমেজ-ছিন্ন কাঁথায় মানব কাঁপে থরথর।
সকল মানব মনেই-চিরন্তন মানব মনের কথা,
কেবল এপাশ ওপাশ করে, করে হৃদয়ে বলাবলী যথা-
কাতরে বলা দম্ভ স্মরণীয় মতে।

আসিনি কোন দিন আর আসিব না আমি,
শুধু বলে যাই মানবেরে সর্ব দিবস যামী,
বর্ষার মুষল ধারে বৃষ্টি রূপে যেই
কথা, সেই আশা- আমি নহি সেই।
আবার আসিব ফিরে চড়ি জয় রথে।

ওরে প্রাণের আবেগ, ওরে সান্ত্বনা তুমি
কেন আস চিরদিন-কেন কবির মনোভূমি
করি রঙিন দোলা দাও শত বার বল,
তোমারে পাই না পাই, চলা আমার হল।

ওরে পৃথিবী শতবার বিদায় মোরে দিয়ে,
কি বাসনা তব, মম স্নেহ স্পর্শ কাতর হিয়ে
আবার আসিবে যে ফিরে ।
আমি মানব, জানি জানি তোর চির ক্ষয় হবে,
মানবাত্মা কোন দিন ফিরে আসিল না যবে,
সৃষ্টি সকলে আপনার করি সেই মানব বলে,
রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ যাবে যে চির বিফলে ।
মানব মন ফিরে আসে, নিমেষে তাই খুঁজি
আমাকে পাই সর্বকালে । কোথা কে কি বলে-বুঝি,
আমি শুধু আসিব ফিরে ধরণী নীড়ে ।

০৫/০৯/১৯৮৬ আগলা, ঢাকা ।

সন্ধান

জমিনের নয়ন জুড়ানো সবুজের ঢেউ অপূর্ব লাগে,
ক্লান্ত মাঝির সাথে টানিতে গুন, মনে সাধ জাগে ।
নদী শিকস্থির ফলে ওই হেরি চাষীর সোনালি ফসল,
ভাসছে তার 'পরে, তবু সাহসী সে, অটল মনোবল ।
ধনচে ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে গেলো ঘাস কাটা যুবা,
চলে নির্দিধায় ওপারে, করে ডিঙ্গি হেরি তার শোভা ।
শাদামাটা গগন 'পরে উড়িয়া চলা বলাকার দল,
বধূর কলসী কাঁখে করে চলা, অদূরে ছলা ছলছল ।
স্নিগ্ধ মায়াময় কান্তি যতবার হেরি ওরে প্রিয় নদী,
ততই বাড়ে মোর মোহ- প্রাণের আবেগ নিরবধি ।
কতজল বুকে রাখি, নয়ন শোভা, হয়েছ বিশাল,
ইচ্ছে তব ছেড়ে যাব না আমি, থাকিব বুকে চিরকাল ।
বুকে ধরি রাখি আমি তোমায় মনের জ্বালা মিটাই,
ওরে প্রাণ হরা, তোরে ছাড়া জীবনে কিছু নাহি চাই ।
কি যাদু মায়া বলে ধরে রাখো নাবিক-অভিযান কালে
তোমার সীমাহীন জলরাশি বাঁধে মায়া জালে ।
থোকা, থোকা কচুরি ধরি তোমার সরল বুকে,
ওগো জল, কোথা যাও কোন অজানা লোকে ।

শান্ত তুমি, তবু হেরি জাগে বুকে ভীষণ ভয়,
কত মানবে-হায়না রূপে অসময়ে করো তুমি ক্ষয়।
বড় বড় যান্ত্রিক যান রেখে বুকে তোমাকে বাগে আনি,
করি তোমার বুকে বাসা- যাই তোমায় জ্ঞান দানি।
আজ বুদ্ধি বলে তোমার করাল গ্রাসে না পড়ি,
তোমার দেয়া অকল্যাণ সব ছুঁড়িব উর্ধ্বে তুলে ধরি।
প্রকৃতির অনন্য সুন্দর, কাঁপা গগন হেরি তব তলে,
হেরি হৃদয় মাঝে তব, রাখি সর্বকালে, মনোবলে।
কাতরে বলি মোর কথা খানি রাখো ওগো তব বলি,
তোমার মতই জীবনের গতি নিয়ে যেন মোরা চলি।
আজ আছি কাল নেই, হে নদী শুধু ক্ষণিকের দেখা,
তব জোয়ার ভাটা সম ভাসি-তারপর একান্ত একা।
ভেসে না হৃদয় মোর, ওগো নদী মিনতি মোর,
তব বুকে পাষণ চর-তুমি অভিশপ্ত জীবন চোর।
অপরে মেরে নিজে মর, এ যে ক্ষণিকের জোয়ার টান,
ফোটা-ঝরা জীবন ফুল, তোমাতে খুঁজি, আমার সন্ধান।

০৭/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পাথে।

বিরহ-মিলন

ওহে প্রিয়তম, আত্মার আত্মীয় চির সাথী মোর,
কাঁদিয়ে চলেছে মোরে কত কাল, রইছ দূর বহু দূর।
তোমার প্রেম ভালবাসা আমি, প্রিয়তম, ভুলিতে না পারি
বিরহ তাপিত প্রাণে ঝরে রক্ত, নয়নে ঝরে বারি।
নেবে এ ক্ষুদ্র উপহার, হে প্রিয় দেখিব না মনে হয় তব,
শুধু থাকিবে মোর কল্পনায় মরতি লয়ে তোমার, চির নব।
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম মোর, সদ্য ফোটা গোলাপ স্নিগ্ধ ফুল,
ভালবাসার হীরা পুড়ে খাঁটি হয়-বাস্তবে ভাঙ্গে মনের ভুল।
শতবার বলা কথা, শত আদর আনন্দ ঢেউ তুলে,
সন্ধ্যা তারার মত বুঝি জ্বলছে মিটমিট, হৃদয় খানি দোলে।
কাঁদিব না আর তোমারে স্মরি আমি, আত্মা জাগরুক,
তুমি নাই বিরহ-কাতর স্বরে বলে, ইশারায় ঐ মূক।

এ প্রেম তুমি, শুধু ক্ষণিকের আশা, চিরকাল
বলে যাও মোরে-‘আর আসিব না’-কল্পনা জাল
ফেলে, শত মানুষে বসে ধরায়, বল কত তুমি আর-
বিরহ মিলন ব্যথায় কাঁদাবে হাসাবে, হৃদ আমার ।

২৩/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা ।

বাদলে আবেগ ঝরে

আজিকার এ নিঃসঙ্গ মনে, পুলক আনন্দ জাগে,
ঝর ঝর ঝর আশ্বিনে বাদল, কত মধুরই না লাগে ।
নয়ন ‘পরে মোর বিস্ময় নব,
হৃদয়ে আছে শান্তি প্রলেপ তব,
ওহে, দূর-বহু দূর অথবা নিকটের বিন্দু বিন্দু বারি,
কথা বলে সাথে মোর, ছাড়ি, বিশ্বের সকলে ছাড়ি’ ।
গাছের ‘পরে বসি কাক পাখি,
ধ্যান মগ্ন হয়ে চলেছে ডাকি,
কত সুন্দর মোলায়েম শিহরণ তুলে শীতল বায়,
এমন দিনে অভাবী মানব কী, খাদ্যাশ্বষণে বাইরে যায় ?
চেয়ে আছি অপলক চোখে,
আসিছে বাহিরে, যাহা ছিল বুকে,
আর নাহি থাকিতে চায় নিরবে, এ মধুর ক্ষণে, শতবার
বলে যায়, অব্যক্ত ভাষায়, বিরহ ব্যথা, পরে কণ্ঠহার ।
রুধিতে নারি, তন্দ্রালস দেহ,
লুটিয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ মোর গেহ,
কতকাল যেন আসি নি আমি, এ মধুর ভুবনে,
কোথা যেন ছিলাম, কখন আমি, বিষয়ান্দোলনে ।
সুরাসুর জলক্ৰীড়া যৌবন জোয়ার,
যেন খুলে দিয়েছে, আমার মনের দুয়ার,
কভু হেরি কোথা, ছাতা মাথায় পথিক চলেছে নিরবে,
কি খুঁজে যেন নাহি পায়, কাহারে হারালো কবে ।
অতি সহজ কথা, হৃদয়, ভালবাসা,
কর্মহীন-যুবকের প্রথম প্রণয়, আশা,

ধুয়ে মুছে করেছে সাফ পৃথিবীর পাপ, বিষয় ক্লান্তি,
মানব সন্তান-আজ বসেছে গুণিতে, বিগত জীবনের ভ্রান্তি।

সবুজ শ্যামলিমা স্পর্শ কাতর বলা,
নব বধূয়ার ভিজে ভিজে ধীর পদে চলা,
কেহ চায় মরিতে, কেহ চায় বাঁচিতে আর ধরার কেহ
কন্যা-দায়গ্রস্থ, হু হু করে নির্গত করে বিষবাস্প, হতে গেহ।

বলে, ওগো দয়াময় প্রভু মোরে,
কেন রাখিলে তোমা হতে দূরে,
প্রতিদিনের যত গঞ্জনা-যত যাতনা সব, বাহিরের সব,
আজি মোরে দিতেছে বেদনা-মনে, করে কলরব।

কৃষ্ণচূড়ায় ধরেছে ফুল, সময়ে তার,
বাঁচিবার যন্ত্রণায়, কাতর নর আর,
ভাবে না যে কিছুই, সেও নিরুন্ম নিরালায় বসে,
ঘোষিছে পৃথিবীর গোপন কথা মনটিকে চষে।
হৃদয়ের টানে চলে আসে তাই, কেহ তাই,
দূরের মানব অতি কাছে, চাই কাছে পাই,
এমন দিনে বাদল ঝরার মত, হৃদয় ঝরা কথাগুলি,
অপেক্ষায় রয়েছে বসে বিষয় ভুলি, আজ ভুলি।
চলেছি কোথা ক্ষণ ক্ষণ সময় ছাড়ি,
বলিব কথা, অতীত মনে পড়ে, আছাড়ি-
আমায় চলে যায়, চলে যায়, বলে শতবার, দাঁড়াও,
এমন দিনে, বলে আমায় এসো, মিতালীর হাত বাড়াও।
বৃষ্টি কণা হয়ে সাগরে যাব ভেসে,
বলিব, চল নিয়ে স্বর্গীয় দেশে,
কোথা আছো, নাথ, কোথা ভগবান, যন্ত্রণাবীণ আমি,
তোমায় চাই, শুধু চাই-হব প্রিয় তোমার, হে অর্ন্তযামী।

২৬/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকর পুর।

নানা আমি'র কান্না

অতি ভোরে নর্দমার দুর্গন্ধ নিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করি
সারা জীবন আমি মেথর;
রান্নার ঘটকালি করে, করতলের হলদে রং,
নখ খসে গেল, আমি মাতারী;
হতাশার দাবদাহে ভঞ্জীভূত, অনিশ্চিত, জীবন তরী
ডুবো ডুবো আমি ছাত্র;
কোমরে ঠেলা গাড়ির রশি আটকানো ঘর্মাক্ত গায়ে
আটার ছাপ, আমি শ্রেষ্ঠ মহিষ মানুষ;
শুধু মুখের গ্রাসের জন্য স্বগোত্রীয়দের সাথে
মারামারি করি, আমি মল্লযোদ্ধা;
শ্রমিকের হাতের কৌশলে, ধ্যানীর মগজে পাওয়া
বিজ্ঞান, আমি সভ্যতা;
দুনিয়ার পুঞ্জীভূত ব্যথা আর কান্না নিয়ে
বেঁচে আছি, আমি কবি;
কেবল আশ্রয় খুঁজি, ভোগের শেষে আত্মার নরকে,
নানা আমি'র কান্না, জানি একদিন টনক,
নড়াবে ঈশ্বরের ।

২০/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ চক বাজার, ঢাকা ।

মিছিল এবং তারপর-----

মুক্ত পুত শান্ত দক্ষিণা পবন গা- ছুঁইয়ে
চঞ্চলা কিশোরীর, দ্রুত পালায় অজানায়-
আকাশের কোলে, মাথা রেখে, গা ভাসিয়ে,
ঝাঁক্ ঝাঁক্ বলাকা উড়াল দিবে, অভিপ্রায়
মনে, বিল- বিলান্তরে ।

না হয়, না দেখলাম, শীতল মাটির উপর নানা
শস্য শ্যামলতার নকশী চাদর, লৌহ-পাথর
পোড়া কাদায় গড়া ইমারতে ।

অঙ্কুত দেখলাম, নগর নটিনীর চূড়ায়
দাঁড়িয়ে আজ, সাতাশতম ঘন্টা হরতালের।
শোনা যাচ্ছে, স্বৈর যন্ত্র-নব্য স্বৈর যন্ত্রের নাড়িভুড়ি
ছিড়বার আওয়াজ-
মনে, পথ সভায়, পথে, অলিতে গলিতে
রাজপথে।
সাধারণের আত্মা কম্পমান ঘরে থেকেই
থম্‌থমে, নির্জন রাস্তায় যাবে মরতে ?
হয় তো কেউ, সঙ্গেপনে অদৃশ্য হাতে ছুঁড়ে দেবে
ককটেল, এসিড, বোমা কিংবা.....

কোনও পুলিশ দল মিছিলের মুখে পাকা-
হাতে স্ব শব্দে এগিয়ে দিলে.....
পানি কামান.....
ছত্র ভঙ্গ মিছিল, এলোপাথারি রাস্তায়
কোণাকোণি দৌড়ে যাওয়া যুবকের পাঁজর ভেদ করে,
সহসা রাবার বুলেট।

লাঠি চার্জ-সুরকি বৃষ্টি, মাথায়-গায়ে-পায়ে
রক্তারক্তি-জখম-খুন শেষে, হাসপিটাইজড,
পোস্টমোর্টেম।
সেখানে প্রাণবন্ত সুকণ্ঠ বিহঙ্গ নেই
বিদ্যুতের তারে, ছাদে, ডাষ্টবিনে, কাঠের ছড়াছড়ি
ডাকাডাকি ভাঙ্গা গলায়, খেতে না দেয়ায় কিংবা
খেতে না পারায়,

ধ্রুপদ, ধ্রুপদ, ধ্রুপদ বিকট শব্দ ভেসে এলো কানে
মোড়ে মোড়ে কালো ধূম বেগী পাকিয়ে উঠছে,
উপর দিকে সদ্য পঙ্গুর প্রাণের আর্তনাদ হয়ে।

নেতার তুখোড় ভাষণ এক দিকে-
স্বৈরযন্ত্র গাড়ীর সম্মুখে-পশ্চাতে জ্বলন্ত লাল
বাতি হুশিয়ারী সংকেত, দেখছি রক্ত চক্ষু
চালকের নইলে-

নইলে অজস্র জনতার চক্ষু স্থিরঃ
বিবেক বলে বিদ্ধ না হলে দাও গুলি বুকে
পঙ্গপাল জনতার জুড়ানো শান্ত উত্তর,
ভোগে মত্ত স্বদেশী বর্গী -ডাকু-প্রাচ্যে ছুটন্তরা
রাজনীতির নামে ভন্ডামী করে।
ক্ষুর কোটি হৃদয়ের একই উচ্ছ্বাস, একই বাণী
একই প্রেরণা, অতীতের শহীদ প্রেতাআরাও
আসছে ধেয়ে, এই বাণী মুখে,
তোমার দৈন্য দশা কেন মা ?
বৃথাই মারামারি করে ভাইয়ে, ভাইয়ে
সৌভাগ্য পালায় উর্ধ্বে তুঙ্গ হিমালয়ে।
প্রত্যুষে বিষিয়ে উঠা মন দুলাছে দুরূ দুরূ
নদীর সাথে সহস্র চিন্তা ভীড় করে মগজে।
কাজ নেই হাতে, খাব কি রাতে ?
সহসা হয়ে উঠে মন বিদ্রোহী- না-না
আমরা খাব, গুয়ের-রক্ত- আগে এবং
মিথ্যেবাদীর গায়ের মাংশ,
শোষকের দালান ভাঙতে ভাঙতে যখন
একাকার হবে সারা দেশ
দিগন্ত বিস্তৃত দেশটা দেখব আদ্যোপান্ত
মুক্ত-সবুজ-সবুজ-আর সবুজ
ওপরে রক্তিম গোল সূর্য.....
তখন রাহু মুক্ত হবে, হাতে নেবে, লাঙ্গলের ফলা
লোহার হাতুড়ি, নৌকার বৈঠা,
অফিসের কলম
নব চেতনায় দিবসের কর্ম সাঙ্গ করে
শান্ত দেহ এলিয়ে দেব প্রিয়ার উচ্ছ্বকিত
স্তন যুগলে তারপর যাব ঘুমের স্বপ্নময়
দেশে আরামে।

২৩/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ চক বাজার, ঢাকা।

কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম

কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম, গৈরিক স্তব্ধতার
ভেতর দিয়ে বন্ধুর পথে, রহস্য নিকেতনে
আজও শুকনো কলাপাতার মত স্পন্দন তুলি মনে
বায়ুর সাথে সমবেত স্বরে গাইতে মন্দ্রগীত।
আজও দূর্বোধ্য নারীর মনের দুয়ার খুলতে পারি নি
সরস প্রেমিকের মত-

নারীর রূপের ছটায় মুষড়ে যাওয়া কেঁচো আমি
সূর্যের আঁচে, মৃত্যুর অপেক্ষায় এপাশ ওপাশ করি
পথে, ঘাটে।

মনে সবুজ সফেদা মেখে মন্ত্র মুগ্ধ আমি তাকাই
মনের গোপন ঘরে, সে হলুদ পাখির বাসা আজও
তারে মানতে পারি নি পোষ।

মুক্ত বিহঙ্গ বিয়ের করে ডালে, ডালে
কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম স্বাস্থ্যময়
নৈনিতালে, কিংবা, কাঙ্ক্ষীর স্বর্গ ভ্রমণ করে।

কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম, জৈবিক ক্ষুধা-
কাতর শীর্ণ কপোত খুঁজে সুখের ঠিকানা মরু প্রান্তরে
রমণী ও মানুষের অগোচরে এঁকেছি নানা
রঙের রূপ, আর মানবতার বিশাল খন্ড চিত্র।

আজ সবই বিরস অর্থহীন, অস্থির আনমনা
আমি ধরা শায়ী, রূপের শরাঘাতে।

কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম, এখন কাটছে
রাতের আঁধার, উষার অভ্যর্থনায় কূজনে মত্ত দোয়েল;
সদ্য জহৃত কৃষান-কৃষানী মজুর ছেলে পিলে
হাস-মোরগ অসংখ্য প্রাণের কোলাহলে প্রমত্ত,
মুখরিত নিকোনো উঠোন।

এখন আমার প্রাণ-পাখি নাচবে গাইবে
করবে মিতালী সবার সাথে, প্রাণে, প্রাণে
ধ্যানে কল্পনায়।

কল্পনার এক যুগ পেরিয়ে এলাম,

আমার উৎকর্ষিত মন-পাখি সন্ধান পেল
একটি মুক্ত স্বাধীন বিকেলের, সুনীল
অনন্ত আকাশ
অধুনা আর এক যুগে পা রেখে।

১২/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

ভাসমান ভাবনা

বহু ভাবনা ভারে নুইয়ে পড়েছে আমার
তরঙ্গ দোলায়িত মন নৌকার মাঙ্গুল;
রসিক পাল আর বাতাস লতকা লতকি
করে চৌদিকে, জলেরা চিমটি কাটে
কৃষাণের ভাগ্য ললাটে,
টাকার দৈত্যরা তাড়া করে মানুষের বিবেক-
মানবতার লাল পিঁপড়ের মতো পিষ্ট শৃগালের
পদতলে।

কেবল জল, জল, আর জল, আত্মসী,
সৈনিকের মত অধিকার করে, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর
কৃষাণের বাড়ির ভিটে, খাবি খায় জলের নিচে।
ভাসমান জঞ্জাল, জটলা পাকায় কাঁপে
থরো থরো।

মানুষ আশ্রয় খুঁজে পূরনো পড়োবাড়ির
সঁয়াত সঁয়াতে মেঝেতে, বাঁক বাঁক মশা
চুষে রক্ত আল্লাদে, গুন গুন গান শোনায়।
গৈরিক শ্বাপদ কামড়ায় এখন সমতল-
কোথাও সবুজের প্রলেপ নেই, বাতাসে
দোল খায় অসহায় শাপলা লতার।
ছাগল-ভেড়া-মুরগী-সাপ-মানুষ এক সাথে
রাত কাটায়, মাচায় রৌদ্র পোহায় কিংবা
জলে ডোবা কোন কাঁঠাল গাছ স্বপ্ন দেখে
বাঁচিবার।

ডায়রিয়া রোগী-বন্যা উপদ্ৰুত মানুষ
আর আমিও নামহীন, ভিত্তিহীন, স্নেহহীন
নিরাকার-সাকার ঘুরি আগের মতন
আকাশে, কখনও বা আর্ত চিৎকারে
কিংবা অন্যায় দ্রোহে মেঘেরা ডেকে যায়
বজ্রকণ্ঠে আমাকে ।

ক্ষোভের রোষানলে ক্ষিপ্ত পাহাড়ী ঢল
সফেন উর্মি ডাক দেয়, অস্থির, উদ্ভাদ
উল্লাস মুখর নদীর অথৈই জলকে-
'আয়' ।
প্রতিচ্ছবি-সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার রোগ ছড়ানো
ছিটানো মেঘে, তপ্ত অরণ্যের আলিঙ্গনে,
জ্বলে যাই কখনো না খেয়ে ।
লাল প্রজ্বলিত লোহায় হাতুড়ি পিটায়
বুকে-কল্পনা প্রসূত প্রিয়ার দুর্বিনীত
ব্যবহারে ।

আবার হয়তো ফিরে আসি, প্রাণ চঞ্চল জলের
গায়ে সাদা সফেদা মেখে নরম গায়ে উদ্যত
বিতর্কিত শান্তি-

মনের চোখে নিশানা করি অন্ধ ফারুকের
মলিন দোতার, প্রাণের সুখ খুঁজি,
ভাবনার দুর্বাঘাসে, সুখ পায় কল্লিত
তারের সুর মূর্ছনায়- লালন গীতির দেহে ।

৩০/ ০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ নদীপথ, কোমরগঞ্জ, ঢাকা ।

বউ বকছে

চিকচিক করা রূপালী প্রলেপ দুরন্ত জল
তরঙ্গের গায়ে জড়াজড়ি করে মধ্যাহ্নের-
শাদা তরুণের ইশারায় ।

আধুলী সিকি-নানা পয়সারা পকেটে
গুতাগুতি করে আর সামান্য কারণেই
তোলে মৃদু শব্দ ।
ঈষদুচ্চ বুক- নাসা রক্তের ফাঁকে ক্রমশঃ
ঝাড়ে আত্মগর্ব ।

গর্বিত মানুষের চিন্তায় দেখি-কোন
বাধা না দিলেই দানব লঞ্চটা নির্বিঘ্নে
চলে রূপসী ললনা তটিনীর গা মুচড়ে
আর ঢেউয়েরা সুখে গদগদ করে ।
প্রেমিকার মনের গোপন কথাগুলো
ঝরে মৃদু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কাঁপা কাঁপা
মৃদু তরঙ্গে ।

ফেরিওয়ালা অকারণ অনর্গল কথা
বলে যায় আর আমার মনের চাহিদাগুলো
কতকটা টাকার, কতকটা আনন্দের,
কতকটা নিছক উদ্দেশ্যহীন ভাবনার সাথে
বিকি-কিনি জমে ওঠে না মানুষের প্রবঞ্চনার
বাজারে অথবা যাত্রী সমৃদ্ধ নৌ-যানে
বাতাসের সাথে ক্রীড়া করে আমার
অবাধ্য চুলগুলো, আমার মাথায়
থেকেই আর আমি কেবলই স্বপ্ন দেখি
চঞ্চলা কিশোরীর চপলতার মাঝে
অতীতকে । হত চকিত হয়ে ওঠে গম্ভীর
উদাসীন বিষয়ী মন ক্ষণিক অবসাদের ফাঁকে
আর পরাবাস্তবের কণ্ঠিপাথরে ঢেলে
সাজাই কর্ম-মন-বপুর সহিংস বিবিধ চেতনা ।
পরকল্যাণের হোতারা ব্যাপ্ত ছারপোকার
মত রক্ত শোষণে ।

ভালবাসা বঞ্চিত বিদেশীর মন স্বদেশীয়
অত্যাচারে বিলীন প্রায় দূর দিগন্তের-
আবছায়ায় ।

তন্দ্রাভিভূত চোখের পাতারা সন্তর্পণে
দূর্বল করে স্নায়ুগুলো, ঘুমিয়ে যাই ।

স্বপ্ন দেখিঃ সুদখোরেরা অট্টহাসিতে
ভেঙ্গে পড়েছে সুদের অংক কষতে কষতে
চকচক মোজাইক করা বাড়ির আঙ্গিনায়
বসে পান চিবায়, ডাকে বউকে ।

স্বপ্নে দেখি, দম নিতে পারছি না,
শাট-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে, পুলিশ আমাকে দৌড়াচ্ছে,
দৌড়াচ্ছে-শেষে আকাশে বায়ুতে
সাঁতার কাটছি ।

ওখানে ভেসে ওঠে আমার মায়ের শুষ্ক বদন
গত দু'দিন খায় নি-বউ চৈচামেচি করছে
বাচ্চারা কাঁদছে
এসব দেখে আমি ঢুকে পড়েছি রাষ্ট্রীয়
কোষাগারে, কাঁচা টাকার গন্ধ গুঁকছি
বুক সটান করে, পালিয়ে এসেছি টাকার
তোড়া নিয়ে- পিছন থেকে বউয়ের চোখ
দুটো আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে বলছি
দেখবে টাকা !

হঠাৎ শুনি হাড়ি নাড়ার কড়া
শব্দে জেগে দেখি
বউ বকছে-
চাউল নাই ।

১৪/০৯/১৯৮৭ খ্রিঃ কোমরগঞ্জ, ঢাকা ।

মনের সোনালি খাতায় লেখা আছে

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে, কবি শামছুর রাহমানের
পরবাস্তবের পংক্তিমালা পড়তে পড়তে
তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ঝক্ ঝক্ চক্চকে মসৃণ
মোজাইক করা দেয়ালে বুলছে ত্রিফলা ফ্যান
এক স্বর্গীয় আবেশে আমেজে অদৃশ্য প্রিয়ার,
অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া ঘুম পাড়ায়।
এক পর্যায়ে অর্থের আগুনে দক্ষীভূত মন-
শরীর বিকৃত উষ্ণ মাথায় তালগোল পাকানো
স্বপ্ন দ্যাখে শৈশব স্মৃতি।

হঠাৎ টুং শব্দে ভাঙ্গে শেয়ালি ঘুম, ঐ
স্মৃতির সাথে রসদ যোগায় তথাহু সুন্দরীরা।
মনে পড়ে, সেই ছোটুকালে দৈবক্রমে চোখে
পড়া-ছোটু কিশোরীকে।

মনের, সোনালি খাতায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে
সেই কিশোরীর নাম।
বিষকাটালি ঘেরা আম্রকাননের ধারে ক্ষুদ্র
ডোবায় কুড়াইত সে কলমি লতা
মনে পড়ে, সেই মধুময় বিন্মৃত স্মৃতি।
শুধু সে আর আমি আর কেউ নেই,
চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ছিলুম অনেকক্ষণ
তারপর সরলা সুন্দরীর আঁখি কোণে জমা
ভালবাসার আনন্দাশ্রু মুছে দিয়েছিলুম।
তারই কালো ফণের আঁচল দিয়ে।
বলেছিলুম 'সত্যিই সুন্দরী তুমি'।

মন্ত্র মুন্দের মত আমি প্রাণ ভরে উপভোগ
করেছিলুম কম্পিত মনে মুক্তা ছড়ানো
এক ঝলক হাসি।
ফেলে এসেছি অনেক দিন রাত,
অনেক সময়ের ভুলে যাওয়া গাড়িকে।

তাকে পাশ কাটিয়ে আমার যান্ত্রিক মনের
বর্তমান রকেট পাড়ি জমায় মহাকাশে
নতুন কোন গ্রহ আবিষ্কারের নেশায় ।

মুখরা নগরী-নাগরিক জীবন, যৌবন কেবল
কথা কয় টাকার সাথে, মুগ্ধ হয়, ফ্যাশনে
আর কৃত্রিমতায়, আর স্বপ্ন দেখে,
গাড়ি, বাড়ি, সুন্দর ভবিষ্যতের কিংবা নেহাৎ
বাঁচার আন্তানা খুঁজে ।

ইদানিং গাঁয়ে গিয়ে দেখি সেই কিশোরী
হয়েছে অনেক বড়ো । সুটোল তনু তার রসে
ঢল ঢল করে, সুউচ্চ স্তন যুগল যেন পাকা ডালিম
প্রিন্টের শাড়ী আর, লাল ব্লাউজ, অপূর্ব
মানিয়েছে তাকে ।

হায়, রূপের আগুনে পুড়ে যাওয়া আমার সাম্প্রতিক
মন, গোয়ালে মুখ পোড়া গরু সিঁথিরে সিঁদূর
দেখিলে ভয় পায়- পারি নি আজও রূপসীর
মনের কিংবা দেহের খোড়াক যোগাতে
কারণ আমি একজন উদাসী বাউল, তরুণ কবি ।
আমার কবিতার পংক্তির এ কালের পর্যুদস্ত
এক, একটি মন- আর সেই মন মুখ খুবড়ে
কেবলি আশ্রয় খুঁজে
মনের সোনালি খাতায়,
ইচ্ছে করে, আঁতুর ঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলি
আমার কবিতার জারজ সন্তানকে,

বেশ্যার পেটে জন্ম নেয়া পিতৃ পরিচয়হীন
নব জাতক-তিল্ তিল্ করে বড় হয়
ফুটপাতে- ডাস্টবিনের কুখাদ্য আহার করে,
আমার কবিতারা পথে প্রান্তরে ঘুরে
উদ্দেশ্যহীন বাউলুলের মতন ।

পুরস্কার, তিরস্কার, সমালোচনা বেআইনী
সন্তানের জন্মদাতা পিতার করুণ কাহিনী
লেখা হয়নি কোন দিন পত্রিকার কলামে-

আমার দুঃখ আমিই ঘাড়ে চেপে একাকী
রাজত্ব করি মনের প্রসবনে।

বিকেলে সানন্দে ফুটাই দুঃখ-হাসি-কান্না-দন্দ
সংঘাতের জ্বালা যন্ত্রণার গোলাপ,
গাঁথি নিত্য শব্দের বকুল ফুলের মালা।

যা মনের সোনালি খাতায় লেখা আছে।
কখনো সখনো সকলের অজান্তে সাঁঝের বেলায়
ঝরে যাই বাগানের তমাল নিকুঞ্জে।

এই হোক, জন্ম-জন্মান্তরের কবিতার আরাধনা
রাশি রাশি তারায় শোভা পাক,
ঝলমল করুক, নিরিবিলি বিলি কাটুক
শ্রেয়সীর মতন আমারই মনে,
মহুয়া বনে, কবিতার ময়ূর-মুখে সঙ্গমের স্বাদ
পাক, আবৃত্তি করুক,
আমার এখন ইচ্ছে হয় সকলকে দেখাই
প্রাণ খুলে ডেকে
ছাতির পাঁজর ভেঙ্গে-
ঐ রিক্ত কলিজা,
অভাব-দুঃখের কবিতাদের নাম-যা
মনের সোনালি খাতায় লেখা আছে।

১৬/০৯/১৯৮৭ খ্রিঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা।

প্রশ্ন জাগে

দিগন্ত ছড়িয়ে বিস্তৃত অতি সহজ নিত্যকার দেখা,
বিপুল জীবন ‘পরে তারই খেলো তরণীর নাম লেখা।
কোথা যাই, দেখি কত, অদেখা দৃশ্য, বাড়ি ঘর,
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া, সবুজ প্রান্তর মাঝির উদাস কণ্ঠস্বর।
ছোট্ট ছেলে চলে নিয়ে ডিঙ্গি তরী, ওই খালের ধারে,
ইঞ্জিনের এক গুঁয়েমী শব্দ, আনে দুঃখ, বিরক্তি, বারে বারে।
খেয়া ঘাট প্রতিদিন শূন্য হয়, আবার ভরে নতুন যাত্রীশত,
হৃদয়হীনা পিশাচীর মত, খল্খল্ হেসে ভাগে যত
বাড়িঘর-আশার স্থল, ওই সহজ ভালবাসা বসবাস-
সর্বগ্রাসী, নাকি মঙ্গলদাত্রী নাকি নদী শুধু দুর্বলের সর্বনাশ
করো, ওই বুঝেছি দাও তুমি আমায়, শান্ত্বনা মিছে সুখে,
চড়ে ‘পরে তব, আমি পুলকে মাতি আহা যন্ত্রণাদগ্ধ বুক।
ওই দেখ, শশী ভরেছে মেঘে, করেছে টুকরো শতবার-
মৃদু বাতাস ধীরে বহে, করে মিতালী, জাগে সুখ তার।
ধপে ভরা মাঠ, শালিক উড়া আর ধবল চড়া মাঠ,
শ্রাশত চাষী গামছা কোমরে, নদীতে ধোয়া ধোয়া শোলা পাট,
জেলে যখন ফেলে জাল, ওই বাঁকে সতেজ মাছ ধরি,
মনের অজান্তে ছুটি সেথায়, বলি বন্ধু এসো, নেব বরি।

তপন করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে হে নদী, তোমার উপরে,
কি দেখি, কিসের এতো সাধ, এতো আনন্দ মনে ধরে।
হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই, গগনচারী আবেগে আমি,
নদী শিকস্থীর শিকার যারা, মন বুঝে তাদের, অন্তর্যামী।
কত সুধাই, প্রভু, দাও না এ অবিচারের জবাব কেন, এসব
সাধনায়, পাই না এর উত্তর, বুক শুনি আমার, হাহাকার রব।
শুধু মায়া একবার জাগে, ব্যথিত হৃদয় মোর,
একদিন দুনিয়া ফেলি, যাব আমি দেহ ত্যাগী দূর-বহুদূর।
বিষাদের ছায়া দেখি তোমার মুখে, আমার যাত্রা বিরতি,
হে দূর-বহুদূর, সবুজ শ্যামলিমা, শোন, আমার মিনতি!
হৃদয়ের তারে তারে বাজে ব্যথা- সুখের ঘোর ছায়া,
অথবা স্বর্গীয় পুলক আমেজ, উদাস করা নেত্র মায়া-
এই আমি, এই আমি সাথী, শুধু সুন্দর তরঙ্গ নদী-
কচুরীপানা সম চিরকাল চলি এ প্রশ্ন জাগে, নিরবধি।

১৯/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ আগলা, ঢাকা।

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৪০৬

মায়াতরঙ্গী মনোহরনী

নদী জুড়ে মধ্যাহ্ন বেলার প্রশান্ত ধূ ধূ পানি মরু,
দেখি সবুজ প্রান্তরে, স্নিগ্ধ মায়াময় তরু বিথীকা সরু।
মোহময় দৃষ্টি মম চলে,
পালের সাথে মৃদু স্বরে বলে-
বহু দিন পুরাতন যত ধ্যান, যত কথা, কল্পনা সব,
বলয়াকারে বের হচ্ছে-যন্ত্রণায়-শান্তিনায় করে হু হু রব।
কত করি দেৱী নিকুঞ্জ বনে,
মলয়ে চরে তার মেঘ সনে,
আমি বেড়াই হেসে-খেলে, আজি মুক্ত আমি,
কৃষাণ আর মাঝির মতোই ভাসছি মাঠে দিবাযামী।
যত কলরব, যত শো শো শব্দ,
যেন চির চেনা, শোনা অভিজ্ঞতালব্ধ,
আমি বলি ফিরাইও না মোরে, ও, আমার নয়,
আমাকে তো কভু পারে না, ও ধরে নিশ্চয়।
কালের শূকপাখি আনে সময়ে,
দ্বিধাকণ্ঠ নিয়ে বলি কিছু অভয়ে,
বাতাসের তানে মনের আবেগে হৃদয় নেড়ে,
কে বলে কি, কার প্রত্যাশায় আজ মন কেড়ে-
নিয়ে যাও, ওগো, বলো-
আমাকে কোথা, তুমি নিয়ে চলো।
এখনো পারি না করি কাজ জীবনের, সময় নাই
কোন স্পন্দন-মনের আবেগ, রোমাঞ্চ নিয়েছে ঠাঁই।
কোথা চায় কারে, একান্ত করে
ধরে নেয়, ওগো, প্রেম মরে,
আমাকে কেহ বলে নি কিছুই, কোন দিন
মনে জাগে কারে নিয়ে, এত স্বপ্ন রঙিন।
ওরে, বেকুব, ওরে রাধা তুই
মরিচীকায়-চষেছিস্ ভুঁই,
নিশিত স্বপন সম অগোচরে থাকি, শুধু বলি,
একান্ত করি হৃদয়ের কাছে চাও কারে, যাও কোথা চলি।

তমাল তরু অরণ্যে ভরা সব,
কুর্জন-কাকলী-কেয়া মনোরম কলরব,
সবই বিরাট গগন মাঝে হঠাৎ উড়ে যাওয়া, বাঁক বলাকার,
স্নিগ্ধ তারকা-অরুণ সকল দীপের আলো তথাকার-
কোন ঘ্রাণ- কোন সুরে তুমি,
চম্বে যাও একান্ত আপন মনোভূমি।
রূপ মোহে আবদ্ধ হয়ে চলো কোথা জানি,
স্নিগ্ধ তরঙ্গায়িত তটিনীর পানে চেয়ে ভুলো ধরাখানি।
বড়ই শান্ত আশা বড়ই করুণা ভরা,
জীবনের পথ ভুলি কোথা গেলি করি ত্বরা,
এখনো পোহায়নি যামিনী, আঁধারের খেলা দূরে,
বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে, ছাড়ো না, মোরে।
ভুলে যাত্রা পথ, কলরব প্রাণের,
কস্তুরি-পুষ্পের মধুর ঘ্রাণের,
নিলে না স্বাদ, চলেছ কোথা, বলো হে নর,
অমানিশা শেষে আসিবে উষা, জাগিবে আশার চর।
পণ করি জিজ্ঞাসি আপনায়, চাহি
অভিযান শেষে ফিরিব যবে, মাষ্টুল পালবাহী,
ওই দ্বারে আসিও, মোরে করি সম্বর্ধনা মায়াতরণী,
তোমার মাঝে তুলে নিও- ফিরিব না, মনোহরণী।

২৮/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ আগলা, ঢাকা।

জেলে জীবনের সাধ

জীবন নদীর তটে দাঁড়িয়ে হেরি নির্মল গগন,
চলন্ত সবুজ বন আর শশীর আবর, মৃদু পবন।
কোথা জানি না, জীবনের ঠিকানা, মানব লড়াই তরী-
টলমল জীবনের সাথে আমি কী, শুধু উপমা ধরি।
সূর্য সূর্য বাতাসে, এক শীতল আমেজ পাই, মাষ্টুল পাল
কে যেন নিয়ে যায় মোরে, প্রশান্তিময় জগতে, ধরি হাল।
আর নয়, এবার চলি, কেননা জীবনের বিচিত্র রং কত-
বারিধির মতই চলে সর্বসহায় তালে তালে তত।

এই সুর, এই হাসি, নানা মনের কত সংলাপ কল্পনা,
রবির কিরণে উদ্ভাসিত, ছল্ ছল্ জলে আঁকে আল্পনা।
বলি বাঁচার তাগিদে, শক্তি যত, কৌশল যত সব,
নিয়াছে মানবে, সময় কোথা চলে, ছাড়ি কলরব।
এই ক্রন্দনে, যন্ত্রণার মানব কিলবিল করে তরীতে বসি,
উঁকি ঝুঁকি দেয়, মন-খোলা প্রান্তরে, যেন ভূতলে শশী পড়ে খসি।
তটিনীর দু'ধারে শাদা ফুল শনের আর দেখি ডাটা বন,
অদূরে ছোট্ট কুটির বাস করে জেলে শান্তিতে, আছে তার মন।
এমন হতে, মনে সাধ জাগে, ওখানে নির্মাণ করি বাসঘর,
জেলের সাথে মিশে যাই, অনুকরণ করি তার মধুর কণ্ঠস্বর।

০৩/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ আগলা, ঢাকা।

স্বপ্নের গাঁও

রোমান্টিক আবিষ্কৃত চিত্র ব্যাকুল, প্রকৃতির হাতছানি,
নাহ্ ও কিসের, সে যে স্বর্গীয় ডাক, যায় মোরে দানি,
ভয় ক্ষণিক বাধা তবু মন নাহি মানে কল্পনালোকে,
দেখে যাবে তাই চিরদিন-রহে যাবে তাই মোর বুকে।
অসীম গগন পানে চাহি, শরমে নিজেকে ঢাকি,
অসীম তারার সাথে সখ্যতা করি, প্রাণে ধরে রাখি।
প্রেম-মুকুট পরে, ওগো কোথা যাও, কারে চাও বলি,
সলিল-বাসরে তুমি বসে, করো প্রেম নিবেদন, ধীরে চলি।
হংসরা দলে দলে করে কেলি, ধুমধামে, মধুর লাগে,
উদ্যোমী শিশুরা কাটে সাঁতার, এ কে অপরে আনে বাগে।
ধঞ্চো বন ছোট্ট কুটির, মৃদু সমীরণ-ঢেউ প্রতি ক্ষণে
মধুর লাগে, যখন দেখি শান্তি আনে, আমার ব্যস্ত মনে।
বধূ গড়িয়াছে তার সন্তান, অসমসাহসী, নদীর সাথে ঘর করে,
এরাই বুক চিরে মাটির-সবল হাতে, লাঙ্গলের খুটি চেপে ধরে।
এদেশ আমার, তোমার-ভাবিতে ভাবিতে ঘুমিয়ে যাই-
স্বপনে দেখি গাঁওখানি আরও রঙিন, তুলনা যার নাই।

০৫/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ ঢাকা।

হৃদয়ের ধন

শরতের আর্দ্র মৃদু বায়ে চলে,
আমার তরণী, সে কি! করুণ কথা বলে,
আমায় রেখে যাও, এই সুশীতল ছায়া,
উদাসী করা সুররাশির অদৃশ্য কায়া,
সেই হৃদয়ের রাগিনী, সেই রূপ,
শ্বশত বাঙ্গালীর-বাংলা, নিচুপ,
নির্বাক চেয়ে আছে, এ যে ইশারায় বলে
যায়, অভিমानी অব্যক্ত কথা, ছলে
ছলনায়, সদ্য স্নানোখিতা, মাধুরী মায়া
আমার শস্য শ্যামল প্রান্তর, বধূর ছায়া
হয়ে জেগে আছে, সদাই। বিশালতা তার
সরল শান্ত চাহনি, নির্মল হাসি চাষার
বড় ভাল লাগে, মজে যাই নিমিষে আমি
আমার সাথে মজে, গেদু চক্ৰাদার পাড়ার ভূস্বামী।
ইচ্ছে হয় রাখি প্রাণ, খান্ খান্ করি
মিশে যাই একান্ত হয়ে, ওই দলে সবায় ধরি।
যত হেরি রূপ, তত বাড়ে আসক্তি মম,
ছুটে যাই প্রকৃতি প্রাণে, জানাই স্বাগতম।
কত জন, কত মন, নিবিষ্ট চিত্তে যাহা করে,
আমার মন তাহা নিয়া লড়ে- তাহা বরে।
ওহে বিশালতা, সুন্দর গগণ, মৃদু পবন,
কথা বল আমার সাথে, হৃদয়ের ধন।

০৫/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ নবাব গঞ্জ, ঢাকা।

নিসর্গ প্রীতি

নয়ন জুড়ায় যবে, হেরি আমি সবে,
আমার শান্ত নীড়ে,
থাকি সদাই ভয়ে, আমাকে শুধু ক্ষয়ে
চেউগুলি, আনন্দে ভীড়ে।

কি জানি কোথা যাই, নিজেকে নিজে হারাই,
রবি উজ্জ্বল কিরণ যবে,
বলাকা গগনে উড়ে, কাশবনে পায়নি মোরে,
সুখ, কাড়াকাড়ি করে সবে ।
দু'ধারে শ্যামল সবুজ, বলায়াকৃতি আকাশ অবুঝ,
আমাকে নিরবে বলে যায়,
শাদা শাদা মেঘগুলি, নীল শশী তুলি,
মিতালী করে, মিলে সবায় ।
আমি লুকিয়ে থাকি, আমাকে হারিয়ে নাকি,
ওই দূরে, সুন্দর সাঁঝে,
ধেণু চরে মাঠে, কৃষ্ণাণ কচুরী কাটে,
বধূর স্নানে, নদী মরে লাজে ।
কি জানি কি হবে, যাত্রীর যাত্রা শেষ কবে,
ভাঙ্গা, নদীর কাজ তাই,
হৃদয়ে মিশানো মাটি, গরীবের শীতল পাটি,
সাথে নিয়ে আসি, যাই ।
ওই হেরি দূরে, পাটকাঠি আঁটি পুরে,
সযতনে সাজিয়ে রাখে,
গরুর পাল সাথে নিয়ে, রাখাল চলে ইক্ষু চিবিয়ে,
ঘুরি, চরের বাঁকে বাঁকে ।
জীবন জোয়ারের শেষে, প্রকৃতির ভরা যৌবন বেশে,
দেখিলাম আজ যারে,
কখনও চৈত্রের খর রবি, গ্রাসিবে নির্মল ছবি,
আমার জীবন পাথারে ।
বিপুল উপরে অম্বর, সাদা কালো মেঘে তপন,
মিতালী করে, নদীর সাথে,
আমার কথা হলো, আমাকে নিয়ে চলো,
গভীর আঁধার রাতে ।
সেদিন বেলা শেষে, এলো পাথারি কেশে,
হৃদয়ের অব্যক্ত কথা,
বুঝিলাম, তোমার পানে চাহি, আর কিছু বাকি নাহি,
ঘোচাও যত আমার কান্না-ব্যথা ।

আর সহিতে নাহি পারি, নিয়েছে আমাকে কাড়ি,
ভুলিলাম এ জগতের সব,
নীলকণ্ঠ অথবা দোয়েল, সারসী, চন্দনা কোয়েল,
মধুর কূজনে মত্ত সরব ।
আমাকে ভুলি দানি সব, আমার আছে যত বিভব,
কাঙ্গাল সাজি দেখ,
আমি সেই বন্ধু তোমার, প্রকৃতি আমি চিরকুমার,
ক্র-পল্লবে এ কথা লেখ ।
পাইবে মোরে সেই খানে, হৃদয়ের প্লাবিত বানে,
ডুবিল নিসর্গ মোর,
বহু সাধি পাই নি যারে, আজি সে হৃদয়ের দ্বারে,
বলে যায় কথা, থাকি সুদূর ।
এই প্রীতি মোর চিরদিন, পাপড়ি সম উজ্জ্বল রঙ্গিন,
মানব-মানবী যখন হেরে,
আমি তোমার, তুমি চলে গেলে, যাও নিঃপ্রাণ হলে,
তোমার প্রীতিতে মাথা নেড়ে-
আর নাহি গাইব গান, পাখির কাকলী ছন্দ তান,
ষোড়শীর রূপ দেখা, করি নিঃশেষ,
তোমাকে রাখিব বাঁধিয়া, বিরহে মরিব কাঁদিয়া,
নিসর্গ প্রীতি নিয়ে, আছি আমি বেশ ।

০৮/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পাথে ।

সোরগোল

যাত্রীরা উঠে আর নামে
চিৎকারে সারাটা বেলা,
চাই, চাই, চাই ভীষণ
কঠিন কণ্ঠস্বর নেই হেলা ।
সোরগোলে প্রাণে বিরক্তি আনে
দূরে শুধু পালাতে চায়,
গুঁ-গুঁ-গুঁ কর্কশ রব
একটানা তার ঐ যন্ত্রটায় ।

গালি আসে মন হতে
ধ্যাত্ আর কত সয়,
শব্দ না এলে, না চলে লঞ্চ-
মনে আছে শুধু ঐ ভয় ।
যেতে হবে ঢাকা
সারিতে হইবে অনেক কাজ,
তবু পালাতে চায় মৃদু বায়ুতে মন
পেয়েছে সে ভীষণ লাজ ।
নদীর নিচে দেখি কাঁপছে
বিজলী বাতি থরথর,
সময় বেশি হলে যে মোর
কল্পনায় আসে স্যারের বাগতঃ স্বর ।
মাঝির গানের মধুর কণ্ঠস্বর
আর নিরস মন্ত্রে শব্দ,
ধীরে চলা, প্রাণের শান্তি আনে
যন্ত্র দিলে তা করে জন্ম ।
যন্ত্র দানব এসো না কাছে
করিব গ্রাস সুযোগ পেলে,
চতুর মানুষ সে হয়নায়
ধরে- ছলনার খেলা খেলে ।

০৮/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ ফতুল্লা, ঢাকা ।

বিশ্বমানবতা

আবেগ স্পন্দন অদহিত তাপে,
ঘন নিঃস্বাসের দোলায়িত চাপে,
জল তরঙ্গের কলকল মৃদু ধাপে,
দেখিলাম আমি, তোমারই রূপ ছায়া কৃষ্ণকায়-
কী জানি কী প্রাণের ক্রন্দনে মরি,
বার বার তোমায় বলিতে শুধু ডরি,
আপনার সাথে আপনি শুধু লড়ি,
কে এমন রূপসী দাঁড়িয়ে রইলে, নদী অববাহিকায় ।

কেহ জানিল না মোর কথা,
কেহ বুঝিল না মোর ব্যথা,
কেহ চিনিল না মোরে হেতা,
আমি সেই মানুষ, রহস্যময় আমার আচরণ,
মরি আমি জলে ভাসি,
একা একা আমি হাসি,
কারে যেন গোপনে ভালবাসি,
নিবেদন করিতে প্রেম জগতে করিলে কে বারণ।
কলসী লয়ে কোমরে কাঁপে,
ভরি আর খালি করি জল মাপে,
মরেছ তুমি হরষে আর তাপে,
চাহি না আমি ভাসি, তোমার মধুর খেলা,
সারাদিন যাবে চলি,
হৃদয়ের ভাব রস থলি-
আনন্দ ঘন হলো-বলি,
মানব আমি দাঁড়িয়ে-যায় শুধু সারা বেলা।
পর্বত সমান বাধা হেরি,
ক্ষুদ্র মানব সহে না দেৱী,
পরি প্রেম শৃঙ্খল ভেৱী,
কীভাবে উঠি হৃদয়ের উপর, হিম্মত নাহি পাই,
চাহি আমি শুধু তার 'পরে,
মেঘের সাথে উড়ি প্রাণ ভরে,
চাহিয়া থাকি শুধু বালু চরে,
সবুজ লাল রোমাঞ্চ কল্পনায় কী যেন ভাবিয়া যাই।
মৃদু সমীরণ ঈষৎ শীতের,
দূরে শুনি আনন্দ কিসের,
জয়, প্রেমজয়, শিসের,
সর্বসহায় মিশে যাই, ঐ আমি, একাকার হয়ে,
তোমায় হেরি সব সৃষ্টি মাঝে,
উষা মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ন সাঁঝে,
হেরি তব রূপ আমি বিচিত্র কাজে,
সেই তুমি এলোকেশী মানবী, এলে প্রেম সুখে ভয়ে।

যদি মরিচীকা হও,
মনের কথা নাহি কও,
কাঁটার বেদনা নাহি সও,
সেই বেলা কী করে বলো, আমায় স্থির রাখি-
সাপের বিষ থলি ফেলি,
অযথা শুধু আঁখি মেলি,
দেখি ভুলে জুই, চামেলী,
আছাড় খেয়ে মহীতলে লুটিয়ে পড়ি, উর্ধ্বে চেয়ে থাকি।
এমন করে আমি চাই,
তুমি নাই, আমিও নাই,
তুমি আছ আমি আছি তাই,
অনুভব করে বলি অনাগত কালের মানুষ ধরি,
ক্লান্ত পাখির মত বসিয়া,
চাঁদ গগন হতে খসিয়া,
সুখ চাই নারী হৃদয় চষিয়া,
শেষে মিশে একাকার হই, বিশ্বমানবতা বরি।

১৮/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

আত্মসুখ

প্রশান্তির একি রূপ দেখি মানুষের মাঝে,
সে সুরের মর্ম ধ্বনি আমারই হৃদয়ে বাজে।
সেই আগন্তুক এ মহীতলের মহা ক্রন্দনে,
সর্বসহায় ভরে প্রেম, চির বন্ধনে।
আমি কবি ঘুরিয়া বেড়াই মধুর ধরায়,
নদীতটে পর্বত চূড়ায়-মৃদু মলয়ে-ভুরায়।
আমার আচরণ শিশুর মতন অবুঝ বাঁধনে,
ধরণীকে ধরে রাখি ক্রোড়ে মন্ত্রের সাধনে।
যাহা হেরি সবই মন-মানসে জাগায় সাড়া-
মানব-জন্তু শ্যামল প্রান্তরে, আমি ঘর ছাড়া
রবি শশী ভুবন আমাকে ভাবায় চিরদিন,
শত দুঃখ মাঝে বাঁচি লয়ে স্বপ্ন সুখ রঙ্গিন।

শুকপাখি উড়ে গেল শুধু বলিতে বলিতে,
শবদেহ মোর কবরে-হৃদয় শুধু টলিতে টলিতে-
আপন সুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, আত্মার মুক্তি-
বন্ধন হারা নীড় ত্যাগী- বিহঙ্গ সনে করে চুক্তি।
জগৎ মাঝে বলিয়ে মম, আত্মার সুখ যাচি,
মরিয়াও অমর, এই জগতে যেন আমি বাঁচি।

১৯/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ জিঞ্জিরা, ঢাকা।

অরুণোদয়

আপনি ত্যাজিয়া জ্বলিয়া উঠে গন্ধক বায়ে,
কাল অঙ্গার চেনে না কেউ, ঢাকা থাকে ছায়ে।
নদী গর্ভে বালিগুলি জমিয়া ভাসে চর হয়ে,
প্রবল বায়ু তাড়নে কাঁকড়গুলি আনে বয়ে।
সাধনার বারি বিন্দু একে একে সবে মিলে,
সিদ্ধির মোক্ষমে পৌঁছায় তিলে তিলে।

আমি আসিলাম সবে জগতে কিছু জানি না,
কে কোথা, জগতের শৃঙ্খলা তো মানি না।
এর মাঝে ভেঙ্গে চুরে সব, উঠি পর্বত চূড়ায়,
যৌবন তেজে-মনের শক্তি দিয়ে তোড়ে মারি বুড়া-
আসিলাম এমন জগতে, হেরি নি কোনদিন,
বহু জনমের স্বপ্ন হলো- রক্তিম রঙ্গিন।

সাধনার পথে এগিয়ে যেতে যেতে,
কাজের আনন্দে সর্বদা মেতে মেতে,
সুখ ছাড়ি সব, মন কামনায় আমি সর্বক্ষণ-
ভাবিতে ভাবিতে পেলাম ঈশ্বর-মনের ধন।
এমনি করে পেয়ে যায় যদি শত হৃদয়,
যার দয়ায় হবে, হৃদয়ে, রোমাঞ্চ উদয়,
করিব এমন ফসল, কৃষক তার ঘরে-
আর কোন দিন অভাব হেরিবে না চিরতরে।
সম্ভোগে, সাধে কাটিবে তার বেলা,
ধরণীতে হেরি স্বর্গ, দেবতা ভাসিবে তার খেলা।

মানব এমন হয়-না-না সে ভুল ভুল,
এ হৃদয়ে যে, আছে সুখ স্বর্গ, অতুল।
আজকের ধ্বংস, বিনাশ, ঈর্ষা কাতর বলা,
জাতে জাতে, ধন গর্বে শির উঁচু করে চলা,
অভাবে তারে গ্রাসে, সে তো কভু, মানব নয়,
তাকে আরো নিচে-পশু বানাতে কারা ব্যস্ত রয়
পদাঘাতে মারি? চাহি দূর-চিরন্তন সত্যের বাণী-
অলস, প্রবঞ্চকের শুধু- হৃদয় যাবে দানি।
গাহিব সাম্যের গান যুগে যুগে, এই কথা
মানবে তাই বুঝি, মানবের কোথা আছে, ব্যথা।

আমি সেই মানব হৃদয় দিয়া তাকাই,
যেন কোথা কারে যবে হেরিবারে চাই।
কে আমার আপন, কে আমার পর সব ভুলি-
সময়ে অসময়ে সবাইকে আপন করে তুলি।
খোল মোর বন্ধ দুয়ার, ওগো প্রিয়তম,
যৌবনে তব, কর ছাড়া, খুলিবে দ্বার পুষ্প সম?

তারপরে বিশাল হৃদয় নিয়া বলি
আদর্শ সংঘাত, অন্যায় সব পদদলি,
টাইফুন ঝড় হতে মুক্ত করে বিশ্ববাসী,
যত বাগাড় দহি, অনলে, যতসব বাসী।
তুমি দিবে মোরে ভালবাসার ছোঁয়া স্নেহ কলি,
জগত বিটপে-কমল ফুটি, মধুপ-মধু থলি।
খুঁজিয়া ফিরি সদাই, শান্তির মহিমাময় সুর,
তিমির বিদূরিয়া আনিব ছিনিয়া রক্তিম ভাস্কর ভোর।
পাখির কলগানে মুখরি উঠিবে মানবগণ-
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ যথা পুষ্প লতার বন,
কেহ কারে ছাড়ি বাঁচিবে না শুধু তাই,
হৃদয় খুলিয়া সকলের মাঝে আমাকে চাই, চাই।

২১/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ জিজিরা, ঢাকা।

বলে যায়

ঘোলা ঘোলা নদী জল কত সুন্দর দেখা যায়,
প্রাণ ভরে দেখে, চোখ, তাকে কি বলিতে চায় ইশারায়।
শত উপমায় বেঁধে আবেগে মরিয়া যায় রে শেষে,
বিস্তৃত দিগন্ত জোড়া মাঠ শুয়ে আছে হেমন্তে সন্ধ্যাসী বেশে।
বাদামী সবুজ ধান গাছ ও পাড়ের খালি মাঠে-
তরণী বহিয়া চলে জলে, দেখি সন্ধ্যাকাশ, নদীঘাটে।
শীতের হোঁয়া লেগে গেছে প্রকৃতির সবুজ পাতায়।
এ যেন, আই বুড়ি শুয়ে আছে গরম ছেঁড়া কাঁথায়।
মাঠ হতে নেমেছে পানি খালগুলি শুষ্ক প্রায়,
বকগুলি উড়িছে সন্ধ্যায়, শীতল কনকনে বায়।
এঁকে দু'য়ে মাঠে কিসে গন্ধ শুঁকে যেন কৃষাণ চলে,
হেমন্তের ধানের আশায় সে মনে মনে কত কথা বলে।
শুষ্ক কচুরিধাম টেনে কৃষাণের ছোট্ট ছেলে,
কোথা যায়, সে জানে সারাদিন সে খেলা খেলে।
যত দূর হেরি তত- হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়ে,
নানা ছলে, বাদামী ধানে, মন কাড়ে প্রাণ কাড়ে।
যত মানুষ দেখি মনে হয় সবাই জীবনে সুখী
জীবনে সুখ যা আছে তা ভোগে ছোট্ট খোকাখুকি।
কাঁদিলে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে, খুশি হাসিলে,
নদী মামা তেমন নহেন, বেজার থাকে ভাল না বাসিলে।
সহসা ভেঙ্গে দেয় বুক-সব কিছু নিয়ে কত দূর চলে,
আমাদের ভুলিয়া যায়, সব নিয়ে ডুবিয়ে দুঃখ অনলে।
তবু জল-এত জল জীবন সাথী নানা ইশারায়,
হৃদয়ের কথাগুলি বলে যায় উত্তরের শীতল বায়।

২২/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

ভ্রমর ও ফুল

ভ্রমর গুঞ্জরি ফুলবনে, যায় মধু আহরণে,
উড়িয়া কমল দলে পাশে,
দেখি তার ডানে বামে, যবে মধুপ নেশায় নামে,
সুন্দর পুষ্প তায় ভালবাসে ।
সে কি কভু হয়, ফুল রূপে সে সৃষ্টি নয়,
ভান করে কেবল তার,
প্রসারিয়া হৃদয় তার, চেয়ে আছি আশে কার,
ভুল করে আমি বার বার ।
ফুল ভ্রমর দু'জাতি, ফুল চায় হৃদয় সাথী,
ভাবি তাকে মহা ভুল,
ভ্রমর একা দূরে পরে, ফুল দেখি ভয় করে,
কল্পনায় দেখে সুন্দর অতুল ।
আমি সেই ভ্রমর হই, হৃদয়ের ব্যর্থতা বই,
দীর্ঘ শ্বাসে গুমরিয়া মরি,
জীবন করি ছন্ন ছাড়া, মোরে করি পথ হারা-
হাল ছাড়া মোর জীবন তরী ।
সে আছে হৃদয় মেলি, তাকে শুধুই অবহেলি,
ওরে বোকা মধুপ তোর,
কি হলো আজ, রাখি প্রেম তাজ,
তুলে নিস্ পর হস্ত চোর ।
গিয়ে ফুলের কাছে, গান করি পাছে পাছে,
পাগল করো তারে,
শুনিয়াও যে না শুনে, পড়িয়া ঘরের কোণে,
আঘাত হানো বারে বারে ।
হেরিবে সহসা তার, মন কণ্ঠহার,
খুলে দিল গলে,
পান করি মধু ফুল হতে, প্রেম নেশায় মেতে,
হইবে অমর ধরা তলে ।
সে কি প্রেম সুখ, ভরে আছে দু'বুক,
সে সেই সুখ নাহি জানে,

অপরে বলে হায়, প্রেমে পড়ে অযথায়,
মান-নাশ-কেন হানে ।
ফুল যত দূরে যায়, ভ্রমর তত কাছে পায়,
ভুবনে সুখ তার অতুল,
সে যদিকে চায়, প্রেমের গান গায়-
জগৎ বৃক্ষে, প্রেমই মূল ।
সে হৃদয় সুখ তারি, করে ঘর সংসারি,
সহস্র বছর ধরে মানব,
হিংসা ঘেষ ভয় ত্রাস, যুদ্ধ হুমকী করে গ্রাস,
অন্তরে সে মানব রূপী দানব ।
নাহি ভাবি নারীর কথা, মন দাও জ্ঞান বীর্য যথা,
ভালবেসে ফুটন্ত কমল,
জ্ঞান ও বীর্য দিয়া, উন্নত শির নিয়া-
জীবন যুদ্ধে হও সফল ।
তব যৌবন পুষ্পবনে, নারীর হৃদয়াসনে,
বসি প্রেম সুধা পান করি,
এমনি দু'জনে কহে, ধরায় স্বর্গীয় মলয় বহে,
প্রেম মহাসাগরে চলে প্রেমতরী ।

২২/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

বধুয়া

বাদামী ধান্য পল্লবগুলো চেয়ে আছে আশার প্রদীপ নিয়া,
ধীর প্রবাহমান টল্-টল্ জল স্রোতস্বতীর অমৃত রস হিয়া ।
গগন ঘোমটা পড়া শাদা আঁচলে ঢাকি লজ্জানবত মুখ,
কৃষাণের যেন প্রাণ প্রিয় বধূ তার শিউরে ওঠে বুক ।
শাদা বকগুলি উড়ে পবনে মাঠে চরে ধবল ধেণু-
সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে গাঁ বলে, চেনো, আমাকে চেনো ।
আমি তোমারই বধূ কালের, জুড়াই সব তৃষ্ণার্ত হিয়া-
আদরে আদরে ভরে দিই বুক-তার মরমী প্রিয়া ।
সহসা রেগে উঠি রবি করে-মাঠ দহনে দূর থেকে হাসি,
শান্ত ছায়ার কুটিরে রাখি, স্নানীরে ভালবাসি, বড় ভালবাসি ।

ছোট ছোট, তরীগুলো অলংকার রূপে মুগ্ধ করে তব,
তার পরে চাঁদনি রাতে হাসিয়া ওঠে ওই দূরে নভ।
দূর শাদা মেঘের আবে হাত বুলাই তন্দ্রায়, রাতে ঘুমে,
দিকচক্রবাল আসে নিচে নেমে, সোহাগে ঠোট দেয় চুমে।
সোহাগ শেষে ক্লান্ত মাঝির মত আমিও সুখ রাগে,
জলক্রীড়া করি, জল গায়ে ল্যাংটা ছোড়া, বড় ভাল লাগে।
এভাবেই চলিতেছে দিন, এই দেশে, এই বেশে, দেখো,
চির বধূয়া, রূপ মুগ্ধ কবির, তার ‘পরে পারো যত, লেখো।

২৮/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ ধলেশ্বরী নদী পথে।

সাগরি

সাগরি, সাগরি, সাগরি, ডেকে ওঠে
ঝাঁঝি নিভতে ঝোপ ঝাড়ে,
স্বশানের ভঙ্গ বায়ুর তাড়নে উড়ে ঐ
দূরে দেখি কংকালে হাড়ে-
সাগরি, সাগরি, সাগরি বলে, কাঁদে
পুকুর ঘাট, মেঠোপথ আর,
বাড়ির আগুনা, নিকোনো উঠোন
ডালিম, কদম, কেতকীর ওঠে হাহাকার।
শুকনো ছেড়া পাতা আর আবছা ছায়া
হাঁটার শব্দ শুনে গরু দলে,
পেছনে, রশি হাতে হাতে সাগরি,
কভু নিয়ে সবে নামিছে জলে।
গ্রাসিল প্রান্তর ভরা মখমল সবুজ
কোথা হতে আসি নিকষাধার,
দিবস রজনী মিলিবার পালা বুঝি
যেন শান্ত আলিঙ্গন কৃষ্ণ-রাধার।
ছেলেরা সান্ধ্যগল্পে মাতিছে
বস্তির ‘পরে কিংবা দাওয়ায় বসে,
বুড়োরা টানিছে তামাক কি, বিড়ি
অগ্নি কল্কে হাত, ছাই দেয় খসে।

নাসা দিয়ে আসে ধূম পাকিয়ে
কাশিছে কুহু কুহু কথার ফাঁকে,
তারই মাঝে বলে ওঠে সাগরি
আধো সুখে, আধো গলায় রাখে।
খেলিয়া যাইত সে মায়া অষ্ট প্রহর
কোন পাষণ্ড তারে নিলে হরে,
হায় নিয়তির খেলা বুঝা বড় দায়
কে জানে সে, যাবে সকল ছেড়ে।
এখনও দেখি সে কায়া, চোখে জল আসে
সাগরি পান্ডা যে ঘরে,
কখন এলিয়ে চুল পোহাইছে রোদ সকালে,
বসে ঐ আম্রমূল 'পরে।
উচ্চারি নাম তপসী ধরিল গান
জন্ম-মৃত্যু রহস্য তানপুরা সুরে,
রাতে নির্জনে ভেসে বেড়ায় কথা মালা
কূজনে মাতে পাখিরা ভোরে।
অরুণ কিরণ পড়ে মানুষের 'পরে
বাঁচার আলোক সে যে,
ঐ-ঐ মত আসিল রে, গেল রে
ছায়া নাই, কায়া নাই, কাছে-সে।
ভাঙ্গিল ধ্যান নিসর্গের বোঁ বোঁ রবে,
কোথাকার মোটরগাড়ী এসে,
ভূত রূপে ভাঙ্গিল ঘাড় কার হয়,
কেবল বিকট, হাসি, হেসে।
সাগরি, সাগরি, সাগরি, ডেকে ওঠে-
শোকাকুল পাখিরা গলা ধরে
এখনও শোনায়, ডাক তার, গলা তার
হাজার, সৃষ্টির ব্যক্ত কণ্ঠ স্বরে।
জানি আসিবে না ফিরে শুধুই
ভুবনের দু' বাড়ি ঘুরিয়া চলে গেলে,
ভুবন রহিল পড়ে অনন্ত কাল,
তার চির রঙ্গিন পাখা মেলে।

ধরিতে তারে হলে পেরেশান ওরে
অবুঝ মানব একি আর হয় ?
মরাই যার স্বভাব সেই মরা দেখি
সকল মরা নিয়া কথা কয় ।
বাঁচিতে যে চাহে না সেই বাঁচে আর
বাঁচিতে চাহিলে মরে সবার আগে,
মহাশক্তির বিধান করো না অভিমান
তোমার প্রিয় না তবু অনুরাগে- ,
ধরিলে চেপে বৃকে ওগো কে
সৃষ্টি বিধাতার বলো মোরে,
সাগরি সব, সব সাগরি, বলে
অরুণ থাকি সে বহু বহু দূরে ।
ক্ষণিকের সোহাগ, প্রেম, জ্বালা, আর
সে অন্ধ হৃদয়ের টান দিতে-
এসেছিল জগতে, গেল ফিরে সে হয়
অরুণ কে সে তার হাতে নিতে ।
গাইয়ে থামাল গান, নিরব ঘরখানি
বনের পশুরা ঘুমাইছে রাতে,
এমনি সময়ে সাগরি এসে,
তপস্বীর গায়ে ছোঁয়া দিল হাতে ।
চাহিয়া দেখে নিরব কেহ নাই
দূরে শুনে তার প্রেতাঙ্গার হাসি,
ভয়ে শিউরে ওঠে সাধক, নির্বাক,
ভুবন ছেড়ে যায় না কেউ, আসি-
বলে, কী, কী, কী, দেখিছ তুমি-
ফ্যাল্ ফ্যাল্ ঐ শ্বশানে চেয়ে,
আছি, থাকিব চিরদিন, সর্বত্র,
ছড়িয়ে, তুমি যাও সাধু গান গেয়ে ।।

২৯/০৭/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।(সাগরি স্মরণে)

কবে আসবে দেবতা

মস্তিষ্ক বিকার, আধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকে বলব পাগল,
আর সে মানুষ টাকার পাগল, পাগলহীন চেতনায় পরিচর্যায়
সর্বদা সে মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে, বধ করে।

কোন রূপসীর রূপ দেখে, কণ্ঠহার কানের দুল
হাতে খেলে লটপট, সব কেড়ে নেয় কালো
আর কালো পাথরের মতন সত্তায়।

আমি এক উদাসীন বাউল, বুঝি না বিষয়ের মর্যাদা
বুঝি না কোন পথে আসে সাত রাজার ধন,
শুধু কোন সকালে উঠে ঘুম থেকে হাই তুলে বাঁচতে
চাই, হাফ ছেড়ে বন্ধুর পথে
পাথেয় যা আছে, তা রক্তের জন্য নয়, প্রেম রসের পাওনা
যুগে যুগে কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা, আমি মাষ্টার, ভিক্ষুক
আমি প্রহরী, আমি মাঝি, আমি কৃষাণ, পল্লী বধু আমি।

বাঁচি শুধু অর্থহীন পিপাসা লয়ে কী ?
প্রাচুর্যের সংসারে, সভ্য সংসারে, বিজ্ঞান ময় সংসারে,
বর্ণচোরা সংসারে, মূখরা রমণীর সংসারে,
পালিয়ে বেড়াই আমি শান্তি কপোত, আকাশে
আকাশে, অনন্ত লোকে-

গভীর রাতের জমাট অন্ধকারে ফিরে আসি,
পৃথিবীর পাওনা মিটিয়ে, কবে বসবে মানবতার
সভা, বিশ্বের খোলা মাঠে, পাখি গাইবে গান
সাম্যের, মৈত্রের, কবির সুখ ও শান্তির আরাধ্য
দেবতা আসবে, আছি সেই সোনালি,
রোদময় বিকেলের কাংখায়।

০৩/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া, কিশোরগঞ্জ।

আঁকি চিত্র

মুখর রমণী অনর্গল কথার গুলি ছাড়ে শূন্যে,
শান্ত শ্রাবনে বিরঝির বাতাস বহে;
থরো থরো কাঁপে নেবু পাতা, হলুদ আর
সারি সারি চারা কচুর-

ভালবাসি, আর ভালবাসি বলে হৃদয়ে ফুটে,
গোলাপ দেখে- সরলা রূপসী গাঁয়ের ললনার মুখ,
মনের চৌদিকে স্পন্দন জাগে, আমি চিল্ সতর্ক
লাল মোড়ক হাত টানা রুয়ার কলের ছায়া ঘন পাড়ে
মদে মাতাল আর নেশায় কাটে সময়, পুরনো শ্রেম রোমছন
আর ঝালাইয়ে, ফেরাতে পারি না চোখ, চুম্বক
যেন ধরেছে রূপসীর তনু লোহায়, হৃদয় রাজ্যের
সম্রাজ্ঞী যেন ভুলুগ্ঠিত কায়িক শ্রম করতে করতে
যেন রাজ্য হারা রাজা স্বপন দেখে, দিনে দুপুরে তন্দ্রা
নিমগ্ন আলস্য ভরা দ্রুত বেগে ফিরে যায় মন, রাজত্ব
অধিকারে, বিমুখ ভাগ্য দেবতা।
কে সে রমণী অধিকার করে মস্তের ইন্দ্রজাল,
আমার বিশৃঙ্খল পংক্তিমালা একেবারেই অর্থহীন,
জানি তা হবে না কারো সুপাচ্য,
ছুঁড়ে ফেলার মত তা হয়ে উঠবে রসহীন;
ধীর পদে ঘুরি উদাসহীন মনে, ডুবাব ধারে,
নরম তুলতুলে কাঁচা বালু মাটির গন্ধে
দেখি ব্যাঙ আর কচুরীর শোভা,
কিংবা আধো পাকা ধান, সম্মুখের
হলদে ক্ষেতে। আমার প্রিয়ার আনত নয়ন
সুটোল খাড়া যুগল স্তন, কাঁচা হলুদাভ ত্বক,
মন মোহাক্ষ করে রাখে, ফিরে আসি পথিকের
ভয়ে, দু নয়ন ভরে দেখি- বাঁশ ঝাড়ের পাতাগুলো
হেলে দুলে নৃত্যরতা লিচু গাছের নিচে বাঁধা গরু
টানে দড়ি চাষার অনুরাগে।
আমিও ফের ফিরে তাকাই প্রিয়ার ব্যস্ত হাতে,

তাকাই কৃষাণের খরকুটো বোঝার চূড়ায়,
জীবনের ভালবাসায় কান্তে কোদাল, জোয়াল
গরু- সবুজাভ মাঠ-মাটি, আয়ু বাড়া শ্বাসে,
তাই দেখি আমার ভালবাসার সতরঞ্চি বিছিয়ে
মধ্যাহ্নে দাওয়ায়-
আঁকি চিত্র পেলবিত ঘাসের ডগা কাগজে,
পেন্সিলে, পত্র পুষ্প নিকুঞ্জ মানসী রোয়ার কোলে
পরিচিতের হাঁটায়।

০৪/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ রাহরাম খান পাড়া।

মুগ্ধ, মন না রূপে

প্রায় অর্ধ যুগ কল্পনাশ্রয়ী কবির কল্পনার ঈগলের
নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত রূপসীর নরোম তুলতুলে তনু।
মরুচারিণী- তৃষিতা, ভালবাসার অমিয় জল পানে উদ্যত
সামনেই জমজম কূপ কিংবা মরুদ্যানের জয়তুন গাছের
সুশীতল পত্র পল্লবের ছায়া-

মরুর ফণ বায়ুরা হু হু করে ধূলি উড়িয়ে কেঁদে যায়
সাহারায় তবু বারে না এক ফোটা অতপ্ত অশ্রু,
আদিগন্ত ধূ ধূ বালি আর বালি, শাদা আগুনের
তপ্ত তরঙ্গ জ্বালায় ত্বক বিশুদ্ধ করে অন্তর।

জলের মাছ উঠেছে ডাঙ্গায়- প্রেম জলের ফাঁদে-
জেলে সুখে হাসে- মাছের জীবন কী আর আছে ?

গোপনে লজ্জাভরণে ঠোঁট কাঁপে, আরক্ত কপোল
ইশারায়, আরো কাছে টানে প্রেমিকের চুম্বনে চুম্বনে
অধর পিষ্ট করে, উচ্চকিত স্তনেরা মধুময় আঁজলের
চাপে খুলে দেয় সুধার স্বর্গীয় ধারা, উরুর তোরণে
সহজ সরল অনুভূতি, আত্মার সন্ধি খুঁজে ভালবাসার
ফুটন্ত গোলাপ- হায় পদ্মশ্রম, কথা কয় বিশুদ্ধ
হাসি দিয়ে সে পায় নি মহুয়া বনে
কোকিলের মনের খবর।

১৩/০৮/১৯৮৭ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

এক তরফা

নিস্তরঙ্গ জল রাশির ভেতর গুমরে কাঁদে সারিবদ্ধ বিটপগুচ্ছ
অনাদরে অবহেলায়-প্রাণের ব্যাথায় পাথর বিছানো জলে,
শৈবাল ধামে-ঈষদ কালো, রক্তের দাগ হিমশীতল সন্ধ্যায়
নিবিড় নির্জনে জীবন সায়াহ্নে, নিরাশারা কথা কয়।
গায়ের ওঝা সবুজ বাগানে হাটে, নিঃশব্দে যুগের সাক্ষী-
প্রজাপতিরা মনের আনন্দে পাখনা মেলে উড়ে, যুবতিরা
হাসে, পিশাচের মত, ওরা কি জানে-বিদায়োদ্যত
কোন অচেনা বিহঙ্গের মনের আজন্ম দুঃখের কথা ?
জানি হয়ত বা রাগ করবে ভাসমান মেঘেরা, বন্ধু আমাকে
গিরি চূড়ায় সাথী করো না, আমি হারিয়ে গেলুম,
ঝরে গেলুম হলুদাভ নিষ্প্রাণ পাতার মত জীবন-
বৃক্ষের নিচে অকালে। কেউ বলেনি, ওহে প্রেমিক-
প্রেম গোলাপের ভ্রূণ গজে ওঠো, ফুটাও কলি গোলাপের।
কেনই বা উড়ে উড়ে হয়রান হই, মালির রক্তচোখের রোষে-
কেন নিজেকে জড়াবো ? এখানে জাল পাতা আছে চঞ্চল
বুলবুলির তাই আমার অকাল মৃত্যুর কথার
তৈলচিত্র দেখছি, মানস নয়নে এক তরফা।

১৬/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

আক্কেল

সময়ের পহেলা বৈশাখ সামনেই ধেয়ে আসছে গভারের দুই শিং নামের
আনন্দ নিয়ে অথচ পূজা পার্বন মেলা সুখের বাসর ঘর আনন্দ, গাঁথা কর্পূর
উড়ে গেছে কষ্টের বাষ্প হয়ে। চৈত্রের খরতাপ, অভাব কুষ্ঠ কাঠিন্যের
অশীতিপর বৃদ্ধ খেয়ে ফেলেছে আমার উর্বর সৃজনশীল মগজঃ
কালোহীরার পীচের মানবতার রাস্তায় এখন দেখি চোখে সর্ষেফুল
বন্ধুর যমের খাদে; তাই গাধার স্বভাবে পানি খাই ঘুমের কাদা
মিশিয়ে, ভাবি এই বুঝি স্বর্গের আপেল, চাকুরী প্রার্থী কুলের
ফজলি আম এসেছে, সাথে ভগবানের বিশেষ চাকর,

মৌলভী নৈমদ্দিন ছেলের সুখ প্রত্যাশী, ভগবানের মাথা
খেতে এসেছে তজবিহ, অভিশাপের মালা গলাতেই দুলছে।
আবেগের র়েত দিয়ে ঘষি বিবাহিতা স্ত্রীর মন,
দেখি পাই কিনা ভালবাসা অমৃত সাকীর খোঁজ সমুদ্রগর্ভে
অথচ এতো বহু আগেই ফুরিয়ে গেছে ঘরের হাস্য
পোলাপানের উদরে-

তারপর জঙ্গলের গাছপালা উর্বর হয়েছে অথচ
মানিক পায় নি শাদা বলদের আক্কেল।

২০/০৫/১৯৮৮ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

যুগলে

আজ যৌবনের সোনালি দিন তারিখগুলো
করছে আহ্বান,
ওরে, ও প্রাণের অসীম শক্তি শোনাও, শোনাও
তারুণ্যের গান।
আমার পৌরুষ নারী হৃদয়ে জ্বালে ভালবাসার
স্বর্গীয় আগুন,
আমার বীর্য তলোয়ার করে পৃথিবী তাবৎ
অন্যায় খুন।
নারী তোমার ভালবাসা, আমার পৌরুষ যুগলে
ভুবন করিবে জয়,
এসো, করতলে চাঁদ, চিররত্ন রুম্ম অরুণ ডাকে
যৌবন চির অক্ষয়।

০১/০১/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর।

আর এক জগতের সন্ধানে

আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে জন্ডিস জ্বরের ইয়াসমীন,
তার, অদৃশ্য উষ্ম আলিঙ্গনে আমার শরীর হয়েছে বিবশ,
লেগেছে কাঁপন তার হৃদয়ের হলুদ রং লাগিয়েছে আমার
প্রেমের আঁখি যুগলে, আমার চিন্তার মুদ্রনালী দিয়ে বেরুচ্ছে
জীবনী শক্তি ক্ষয়ে যাওয়া হলদে শরবত।

মাটি আমার মা, ডগ্‌ডগ্‌ পান করছে যেন সে আমাকেই
সবচেয়ে ভালবাসে।

অভাবের কোকিলটি নিকটেই উড়ছে শোনাচ্ছে আমাকে
অভাবের সুমিষ্ট সুর। উদ্বেল আমার পাংশু স্বভা ইচ্ছে,
দুঃহাত জড়িয়ে ধরি, শূন্যে মেলি ইচ্ছের হাত,
আ-হা-হা এ যেন মিতসার্টের পিয়ানোর রাগ
যেন কানন বালার কণ্ঠে মোহনীয় পল্লীগীতির সুর।
আমাকে ভালবাসে সিগারেটের দুশ্চিন্তার ধোঁয়ারা,
অনিচ্ছার আগুনে পুড়িয়া ধুমায়িত হয়ে
তোলপাড় করে আমার কলিজা, ভরে দেয়
ভালবাসার যক্ষ্মা কীট-

কাশের ঘূর্ণিঝড় বক্ষ পিঞ্জর মহাসাগরে কখনো
নিষ্ক্ষেপ করি, শীতের সকালে বুঝি চৈত্রের
খরতাপে, কান-মাথা-কণ্ঠনালী হয়েছে চৌচির
ঘরের বারান্দায় আবর্জনা ফেলি সর্বশক্তি নিয়োগ
করে কণ্ঠের বীর্ঘ কফ থু থু।

কল্লনার নীল কণ্ঠ পাখিটা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে
আমাকে, সে ঘুরে ফিরে উড়ে বসে রোমাঞ্চকর যৌবনের
ডালিম গাছটায়, আমার রক্ত কণিকার পেটের ভেতর বেঁধেছে
লাউয়ের ডগা, বিকেলের রোগ আর শুকনো পাতা দিয়ে
ওমের বাসা।

আমার বেদনাপূত মনের নাসিকা খুলে ফেলে উষ্ম নিঃশ্বাস
অনুক্ষণ, কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার জাল যেন আমার হৃদয়ের
শিরা উপশিরা, বইছে বিষের কালো জমাট রক্ত অন্ধকার।

ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে মনের শাদা আকাশে আশার
ষোল কলা রূপালী চাঁদ, দেখিঃ ধেয়ে আসছে টাকার
অন্ধকার, রাত্রের তমসা, হাসছে ফ্রোড় হাসি, বাপটে
ধরবে আমার সর্বাঙ্গ, নাড়ীভূড়ী জ্বলবে, গ্যাসট্রিকের
এসিড দিয়ে।

তারপর আমার ধী শক্তির লাশ বয়ে নিয়ে যাবে
শ্বশানে, আর আমিও ওঁৎ পেতে আছি, হজম করব
অমঙ্গলের তাবৎ ভালবাসা, দুমড়ে মুষড়ে দু'পায়ে দলে
আমি জয় করব পৃথিবীর তাবৎ কান্না-
নিশ্চয় তারপর আমার তারুণ্য যৌবন সিংহ
বেরুবে গুহা থেকে- আর এক জগতের সন্ধানে।

০৫/০১/১৯৮৮ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

মাতৃত্ব

টাকা আর সংসারের আব ছায়ায় ঢাকা পড়েছে
আজকের মাতৃত্ব, হেয়ালী চেতনার শিকড় গেড়েছে
তামাটে রঙ্গের পাষাণী হৃদয়ে-
যুগ যুগের চিন্তার ঝাঁটাগুলো এখন ঝাড়ু দেয়
রাগে প্রজ্জ্বলিত বিবশ চেহারা-
যেন কোন ভূত দেখতে পেল আমার সন্তা,
দেখতে পেল, আমি যদি মানুষ আর সন্তানের
ঝামেলা না হয়ে এক তোড়া টাকার
ভোগের থলি হতাম ?
দেখলাম, ভগ্নীর বিরক্তি চক্ষু ঠোকর দিচ্ছে
আমার রোগের ভালবাসায় বিলীয়মান দেহাবয়বকে,
আমার কল্পনার পক্ষরা এখনও বাঁধা পড়তে চায় না
সমাজ স্বাস্থ্য আকাশের ঠিকানায়,
এখনও সে অবজ্ঞার পাতাল ফুঁড়ে মানব মনের
উত্তর দক্ষিণ মেরুর সুখ-দুঃখ-কান্না-হাসি-চপলতার

রং মাখায় শব্দের চৈতন্য আদরে,
কাঠের গুঁড়ায় ঘুনের বিষয় পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেয়।
কিন্তু মাতৃত্ব কেটে বাঁঝরা করেছে যে পোলাপান
ঘুণেরা, এখন মাতৃত্ব নিশ্চেষ্ট নির্বাক দু'চোখে
আমারই মত সর্ষে ফুল দেখে-
বাড়ি ঘর হাড়ি উঠোনের সমাবেশে, ঘোলাটে
জল রক্তের গৌর বর্ণ হারিয়েছে,
সামাজিক ব্যাধির ইন্দ্রজালে।
মাতৃত্বের এখনও বাকি আছে, শুধু আধুলি-সিকির
প্যাঁচাল পারা-বান্ধনানি শব্দের গাত্র দাহে-
তারকা যুদ্ধের সমরাস্ত্র আমার আত্মা আজ
দৃষ্ট কর্তে বলছে-
ঘুমাও, ঘুমাও, ঘুমাও মাতৃত্ব !
আরও ভাল করে ঘুমাও, তোমার গর্বকে জয়
করে আমিই খাব হিংসা বিদ্বেষের তাবৎ অস্ত্র
বারুদ, আমি হব মানব স্বত্ত্বার চির বিজয়ী
যুগসেতু।

০৯/০১/১৯৮৮ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া।

সবুজ প্রেমে আগুন

আমার ন্যাড়ার বাংলা ঘরের চারটে পুরো পুরো বেড়া-ই
রাগে স্ফোভে ফসকে যাচ্ছে, ক্রমশঃ ভিতের স্নেহ থেকে,
ছাউনিবিহীন খাটের সহিষ্ণুতা আর বেঁচে নেই,
ওর পেটের গর্তে আমার চেতনার পা আছাড় খায়-
নয়তো এক ঝটকা ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দেয় মেঝের
পিঠে আর ওখানেই গড়াগড়ি যায় সুখ স্বপ্নের ইচ্ছেরা-

আর দু'হাত ফাঁক ভাঙ্গা অংশটা হাতছানি দিয়ে
ডাকে ঘামের শীত-কাতর ব্যাকুল উত্তরের বাতাসকে,
নির্দিধায় সে টেনে বের করে পয়সা কড়ি-

সামনেই লিচু গাছ ছির-মায়া শিকড় খাচ্ছে অভাবের
শুষ্ক মাটি- জীবন পণ লড়াই করে চুষে নেয় স্নেহ রস
পুষ্টি, মাথার উপর বেকারত্বের সূর্যের আঁচ দ্রুত মলিন
করে সৃজনী শক্তির সবুজ পাতা দ্বি-প্রহরে।
আর যুগের চৈত্র মাস তো বহু আগেই কল্লনার
অপাংক্তেয় পাতা বারিয়েছে, সংকল্পের ফুল।
একদিন ফুটেছিল বকুল শাখে, বাতাসের নাকে
সৌরভ না ছিটিয়ে এরা তো এখন সাথী
বাগাড়ের টাকার একগুঁয়ে হিংসা কাতর
শুয়োরের, সেখানে খুঁজে সভ্যতার কচু গোড়া,
আমার চিন্তা আর আক্রোশের প্রমেথিউস্
বন্দী অর্থ আর মানবিক অবক্ষয়ের কৌশলগত
অস্ত্রের কারাগারে-
সাইমুম ঝড়ের তাণ্ডবের তোড়ে হৃদয়
কপাটিকা খুলে গেছে- মানবতা আহত পাখি
ধড়ফর করছে বিশ্বমানবতার কোলে বসে-
অথচ টিয়ারিং গ্যাস খেয়েছে অধিকার পিপাসু
দৃষ্টি এবং তারপর আমার আত্মার দিব্যদৃষ্টি
পলাশ ফুটল ঐ দূর বনানীর ভেতর, দেখছি,
সবুজ প্রেমে আগুন, তমসার ভেতর থেকে,
যে অসভ্য কুকুটাকে হত্যা করে, যাবে
ফুলটাকে ছুঁতে।

৭ মাঘ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, বাহরাম খান পাড়া।

জীবনের পথে

টাকার অন্ধকারে ডুবে আছি,
বিবেকের ক্ষুধা কাতর হাত পা ছুঁড়ছি,
অন্ধকারের নাকে মুখে, অস্থির চঞ্চল আমার
মানবাত্মা মুক্তি চায়, জিহ্বার তলোয়ার ধরতে চায়,
প্রাণপণ লড়াই চলছে আলোর দিগন্তে,
সে ওখানে উড়ে যেতে চায়, আত্ম হারা, ছন্নছাড়া

অতৃপ্ত বিদ্রোহী সত্তা বলাকারা, জানি না
জীবন পরীক্ষার ফলাফল, জানি না গ্রহান্তরে
ছিটকে পড়তে হয় কিনা, উল্কা পিণ্ড-
নাকি যুগ যুগ ধরে অবহেলিত মানবতা
কঙ্কালসার খড়ি কাঠ, পাব অন্তরাত্মার
ভাষা, গ্রীষ্মবার্গের হাওলের মতো
উচ্চ স্বরে চিৎকার করব, অধিকার আদায়ের
বিপ্লবী কণ্ঠ ধূ ধূ মরুভূমির রক্ত
পিপাসু রক্তাক্ত কলিজার দৃদর্শ বেদুঈন-
আর এক মুহূর্তও নয়, স্থির দাঁড়িয়ে
কোন এক রমণীর প্রতিভার বুকো পাথর চাপা
দিতে আসছে ধেয়ে-
উড়াল দাও নীলকণ্ঠ, মুক্ত নীল আকাশে,
সাধনার সূর্য জ্বলুক আলো ছড়িয়ে,
জীবনের পথে ।

১১/০২/১৯৮৮ খ্রিঃ বাহরাম খান পাড়া ।

হাঁসের মত

আজ সন্ধ্যা হতে মনের অম্বরে সাজে,
শুকতারা কি এক অশনী দশায় বাজে,
এসে কহে, বলো, আমি কি কাজে,
তুলিয়া আনি ফুল সযতনে হিমাংশু হতে ।
হিম শীতল বাতাসে কেবলি জমিয়া ওঠে,
শূন্য হিয়া তলে কল্পনা রাশি টুটে,
নিয়া যায় মাটির পৃথিবী ওই অনন্দ রথে ।
সীমাহীন ভাবাবেগ, দুঃখ ঘোচানো কথা,
শির উঁচু করে যতদিন পারি বাঁচিব তথা,
প্রাণ আছে, আছে, সিদ্ধি লাভের ব্যথা,
নাই কোন প্রার্থিব ইচ্ছে, পাইব না কারো আদর ।
রবি শশী তারা হতে-ফুলের সুরভী লয়ে,

বাঁচিব, দেখিব যখন মৃদু ঝড়ো সমীরণে বয়ে,
ওই নীলিমার মেঘ পুঞ্জ নিয়ে যায় ক্ষয়ে, ক্ষয়ে,
গিলে খায় বৃষ্টির ছইক্ষি, সবুজ নকশী মাঠ চাদর।
চাই না কারো বন্ধন, চাই না একটু সম্মান,
চাই না আমাকে করুক এতটুকু অপমান,
যেমন আছি তেমনি থাকিতে চাহি- নহি ম্রিয়মান,
আমার সরলতায় অটল থাকিব থাকিবই জীবনে।
সকল বাধারাশি দলি পদতলে,
উঠিব আমি উর্ধ্ব গগণ বগলে,
সীমাহীন আকাজ্জার পায়রা বলে,
ঋষি হাঁস, শুকনো পালকে পানিতে থাকে কেমনে।

০৯/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাক।

প্রেম বাঁধানো ঘর সংসার

ঝাঁঝিঁ একটানা সুর আর নিস্তব্ধ তমাল ঘেরা যামিনী,
সিক্ত মায়াময় পল্লীর মাটিতে যখন ফুটে ওঠে কামিনী।
আমি একাকার বিলীন হই তার মাঝে-
কিছু নাহি আসে মনে, মানস সরোবরে ঝরে নির্ঝর বারি,
কোথা পাব এমন বিরহ-কাতর রজনী, যা প্রাণ নিল কাড়ি,
এক অজানা সুরের স্পন্দন হৃদয়ে বাজে।
কিছুতেই চাহে না আমার মন, ছেড়ে যাই আজ আমি,
শ্যামল প্রান্তর ক্ষণিকের তরে, এমন মধুর দিবস যামী,
মানব-মানবীর এমন প্রফুল্ল হাসি,
প্রাণের এমন সতেজ আবহ কোথা পাই রে, বলো মরি,
কোথা হতে এমন সোনার ফসল তুলে নেব হৃদয় ভরি,
কাদা-মাটি, আর হাঁটু জল, রাখালের বাঁশি।
মনের গহীন রহস্য আর পল্লী বধূর সলাজ আঁখি,
চির দিবসের কঙ্কন সুর, আর বাহুতে বাঁধা যার রাখী,
শ্বাস্ত প্রকৃতির অযত্ন সজ্জিত সাজ !
যদিও পাই সংসারে আঘাত-প্রাণে লাগে মধুর মত,
আমি ডুবে যাই আনন্দ সাগরে- স্বরে স্মৃতি কতশত,

বাঁচার তাগিদে শুধু বাঁচি না- জানি শুধু কাজ ।
সারি সারি বৃক্ষ রাজি আর সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ,
ধেণু চরে আনন্দে, কতই না সুন্দর ধবল গাভীর বাট,
পাল তুলে নৌকা চলে মৃদু তালে ।
আকাশের তারকারাজি হাতছানি দেয়, দেয় গোল চাঁদ,
স্বাধীন মনের পল্লী বালিকা গেয়ে যায় সরল সুর নিনাদ,
গৃহকোণে বাঁধে বলদযুগল হালে ।
মার্বেল পাথর আর ইটে বাঁধানো ঘর বাড়ি পথ যত,
যান্ত্রিক জীবনের নেই ছোঁয়া, আছি আমি আজও অক্ষত,
অনাড়ম্বর জীবনের সুর পাই বনে ।
প্রশান্তি আর উদাস আমেজে আজ আমার মন,
তোলে কত ফুল আর গন্ধ ভাসে নাকে সমীরণ,
প্রেমে বাঁধনে ঘর সংসার বর কনে ।

১১/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, আগলা, ঢাকা ।

ঝরা পাতার মত

ভ্যাপসা গরম, ঘর্মাক্ত শরীর আর অসহ্য বাসনায়
চির সবুজের বদলে একগুচ্ছ হলদে ঝরা পাতা
উপহার দিল, যৌবন বসন্ত-
কেমন জানি সহাস্য বদনে জীবন যুদ্ধের সৈনিক
বেশে- পৃথিবীর অধিবাসী আমি ।
নদী শিকস্থীর বহু দূরে ধেনু চরা মাঠে
রাখী পরা একদল প্রজাপতির মত মেয়ে
মনের আকাশ দিয়ে যায় এক দারিদ্র্য পীড়িত
জীবনের আগ্নিমা আর উঠোনে ।
আজকের দুপুরের খর রোদ্রে আষাঢ়ের গগণ
যেন বিকৃত জীবনের এক করুণ প্রতিচ্ছবি ।
সুখে, দুঃখে, বেদনায়, হাহাকারে বিপর্যস্ত
জীবন সংগ্রামের কপোলে আঁকি
মায়াময় অথচ দহনের বিকট কঙ্কাল হাসি ।

সবুজ ঘেরা বনে ও মনে
বিরাজ করে আর্ত পীড়িতের করুণ ক্রন্দন;
মূল্যহীন জীবনের ব্যর্থ হাহাকার অথবা
ঝরে পড়া হলদে পাতার মত ।

১৭/০৭/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা ।

ঝড়ে পড়া পাখি

মুক্ত বিহঙ্গ কল্পনা বিলাসে সুখ স্বপ্ন নিয়ে উড়ে,
চঞ্চল পবনে, নীলিমার রূপে,
পাখা মেলে সাধক বুলবুল চুপে,
কত অরণ্য কত সাগর হয়ে পার, উড়ে জুড়ে আরো জুড়ে ।
সাধ তার প্রেমের মালা পরে,
আনন্দে আত্ম হারা হবে মধু জীবন স্মরে,
কণ্ঠে তাহার মায়ার সুর, হৃদয়ে বাজে মধুর বীণার আশা ।
সেই বেলা পাখিরা মেলে পাখা,
বিচিত্র সাজের, বিচিত্রতার রং মাখা,
মৃদু মলয়ের সাথে মিশে একাকার করে তার ভালবাসা ।
উজ্জ্বল রবিকর বসন্ত হাওয়া,
হৃদয়ের সুরে মগ্ন-নাহি চাওয়া,
সেই উড়ন্ত পাখি যখন সে মনের অভিলাষে-
পাখা মেলে গেল বারিধির 'পরে,
প্রবল ঝঞ্ঝা হাওয়া আসে ত্বরাকরে,
সোনার ডানা দু'টো ভেঙ্গে দেয় কে, অনায়াসে ।
ছন্দ হারিয়ে গেল তার,
উড়িবার জোর রইল না আর ।
নিশীথ তিমির নয়নে বাজে, ভুবনে নাই-কিছু নাই ।
হৃদয়ের ধন যা হাতে ধরি,
কে যেন নিয়ে গেল সরি,
মরি, মরি বহে ঝড়, ময়না পাখির আছে কোথা ঠাঁই ।

কেহ বলিল না কথা তবু,
হৃদয়ের সাথে কথা থামে না কভু,
নীড় ভেঙ্গে সহসা বিটপ মূলসহ আজ ঝড়ে উড়ে।
বহু দূরে নীত হয়ে ভাসে,
কমল দল পদদলে নাশে,
কাদায় লেপন-সেই পুত মন, মুর্ছিত আজ ভোরে।
হৃদয়ে বহিয়া যায় ভীষণ ঝড়,
মনে মনে, কে যেন হল পর,
সেই বুঝে না আমায়-আমি তার ঝড়ে পড়া পাখি,
নির্মল নীল গগণে কালো মেঘ,
বসন্তে আসে, কাল বৈশাখী ঝড়ো বেগ,
নিঃস্রাণ পড়ে আছি কে যেন নিয়েছে হৃদয় অমৃত সাকী।

০৪/১১/১৯৮৬ খ্রিঃ টিকরপুর, ঢাকা।

সঙ্গিন (১৯৮৬-১৯৯০)

সেই নক্ষত্র

গ্রীষ্মের দাবদাহ সে ও চায়
শান্তির দাহ-
ওই ভ্যাপসা গরমের সাদা মেঘ
দ্বি প্রহরের থম থমে শহরতলি
সেখানে উদ্বেগ হীন একটি নির্মল মন-
চায়, শুধুই চায় দিবা লোকের মত
একটি আত্মা
শরীরহীন শরীরে যে-
সময়কে করবে অতিক্রম।
পৃথিবী সয়লাব হোক, ঘৃণা রাহু অন্যায়
হোক বিভাড়িত,
যেমন আছে এই চৌকাঠ
দু'টো সংবাদ পত্র
আর প্রশান্তির ঠাণ্ডা মেঝে
ঝাপটা মারি উড়তে চাই
শান্তির কপোত
স্বাধীন হেঁটে বেড়ানো মোরগ
আপন শক্তি নিয়ে
ধ্বংস করব অপঘাত, অপমৃত্যো॥
কিংবা অর্থহীন মৃত্যু।
কি আছে ললাটে?
কি? কি? কি?
না, জানার ইচ্ছে নেই,
ইচ্ছে নেই শুধরাবার,
কে তুমি-মানবতার শত্রু?
অন্তত আর যাই হোক
সবুজ এই লতাটার জীবন
কাড়িয়া নিবে বিনামূলে?

অবাস্তব-

সময়কে না ধরে ও
শ্রমকে ধরব,
বিশালকে না ধরে ক্ষুদ্রকে ধরব,
যে পঁচিয়া গেল সে না-
আমি উপমাবিহীন
পাশ কেটে যাওয়া এক লহমা বাতাস।
চিনি সব কিছু- কিন্তু বুঝি না
প্রয়োজন নেই-
নিরবে নিশীথে
গড়িয়া যাব সেই নক্ষত্র,
যার অবস্থান এই ব্রহ্মাহীন
ব্রহ্ম কুটিরে।

তাঃ-১১/০৫/৯০ই

দঃ দনিয়া (পাটের বাগ) ঢাকা।

হতাশা সাবধান

উড়ে যাওয়া কাক যেন
ক্ষুধার্ত আমিই
নির্মম দৈন্যতার ছবি
নিরেট বসে থাকা ঘর,
প্রতিদিন দেখি অর্থের
টানা পোড়েন দিক-বিদিক
নিমজ্জিত অসহায় জলে,

যেখানে আমাকে ঝরাতে চাই-
যেখানে স্বচ্ছ চাই-
সেখানেই এক গাদা
বই, চিরুনি, আয়না, ঘটিবাটি

আমাকেই, অটুহাস্যে-
তিরস্কার করে ।
ভেতর থেকে কে একজন
বলে “সংগ্রামী হও”
বস্তুতঃ শব্দটাই সম্বল,
একরাশ, দুশ্চিন্তা ধূলা
বালির মতই, চৈত্রের
ঘূর্ণী হাওয়া উড়ে যায় ।

যাহা পরে থাকে তা
“হতাশার আমি”
সব শেষে রঙ মাখি
অসীম, দেহ, মন ও মস্তিষ্কে
এরা কী করে?
বল্‌ব না ঃ
এরা “তথা কথিত আমিই” ।
এইবার গোটা আমার পৃথিবী
উল্টে গিয়ে পড়ল,
কোন এক সময়ের পিঠে,
বদলে গেলঃ
এদের রঙ,
এদের দেহ,
এদের মন,
এদের স্বস্থি, শান্তির ধরন
আমার কবিতার মুখে এখন আঙুন-
পুড়ে দেবই ‘সোনার কলম
কেননা তার ভেতরে-
আমি ও আমার নেই,
নিদাঘের আদিগন্ত ভাষণ ময়ূর
মঞ্চঃ হতাশা ! সাবধান !

তাং-১৪/১২/৮৯ ই
দঃ দরিয়া (পাটের বাগ) ঢাকা ।

দৃষ্ট সোনালি আলোক

অসংখ্য আলোর ভীড়ে-এই জীবনের
মাঠ ভরেছে ঘন হলদে আশার
সরিষা ফুলে,
অন্তর্নিহিত ভ্রান্তির সুখের ঢেউ হোচটা
খায় গরীব তটে ।
এই 'উহ্য আত্মার প্রকান্ড জানোয়ারটা'
বিস্তৃত আছে দিগন্ত জুড়ে ।
এ যেন অকথিত অথচ অনুভূতিযোগ্য
নিরাশার হিমেল বায়ু ।
উচ্চ শিক্ষিত অথচ যথাযথ কর্মহীন
একটা লাজুক বিড়াল চাটিয়া গেল
আমার দৃশ্যাহত সবুজ গাঁটা ।
স্বপ্নের পৌষের নদী আজীবন
দুঃখ আর দারিদ্র্যের জল
বুকে করে বয়ে যায়
অথচ শেষমেশ খুঁজে পায়
দারিদ্র্য সমুদ্র জীবনান্তে ।
তারপরও কী হতে পারি না?
একটি ঘাসের বীজ?
কে এই কায়েমী স্বার্থপর প্রশাসক
মাটির বুক চিরে নির্ঘাত বেরিয়ে আসে
আর অরুণোপম ফোটায় তেজস্বী শান্তি ফুল ।
তারপরও কী হতে পারি না-
একটি মোরগ ছানা?
যে ডিমের খোলস পাল্টে বেরিয়ে আসে
আর মাথা উঁচু কণ্ঠে আহ্বান করে
ভেঙ্গে ফেল এই নিচাশয় সমাজ
কুককুরু কুক প্রত্যুষে কিংবা সন্ধ্যায় ।
কে যেন কল্পনার আকাশ থেকে তাড়ালো
পরাজিত চেতনার মেঘ,
এই উড়ন্ত শকুনটা ভীষণ ক্ষধার্ত

পরে জ্যন্ত পশুগুলো খেয়ে সাফ করে
ইচ্ছের দুর্জয় নেপোলিয়ন।
পথিক সহগামী জলযান সোঁ সোঁ কাঁদতে
কাঁদতে ছানি পড়া চোখে
দেখছে জীবন সায়াহে, মধ্যাহ্নের
দৃষ্ট সোনালি আলোক।

২০/১২/৮৯, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

দুষিত বাতাস

ঝাঁটার দিব্যচক্ষু বলছে জুতার পেট থেকে
একবিংশ শতাব্দীর পিঠে উঠবো
বিতর্কিত সভ্যতার বিতর্কিত মানুষরা।
ঝাঁঝালো শব্দাবলীর আহত সভায়
এখন ভাষণ দেবেন, বিনষ্ট একটি কলিজা-

আর তারপর-

অজস্র মিথ্যাচারের একটি আরকলিপি
তেলাপোকার সৈনিক পাখায়
বিনষ্ট মস্তকে প্রদান করবেন,
অর্ধাঙ্গদুষ্ট মানুষরা

সুতালটার মা'র অবস্থা
এখন খুবই খারাপ
নৌকোর ছাতির মতই বুক আর
ঈলের হঠাৎ বাতাস থেমে যাবার
মতই দীর্ঘশ্বাস।

পরশুদিন আমার শু'বার ঘর থেকে
বর্ষণমুখর সারারাত শুনেছি,
খেটে খাওয়া বিড়াল ছানার অবিরত
ক্রন্দন, কিছুই করার ছিল না।
কারণ বড় ঘুম পেয়েছিল আমার
সকালে দাঁত মাজতে মাজতে যদিবা

উহার দূরবস্থা দেখতে পেলাম,
এরই মধ্যে সপ্তবর্ষীয় নীরু ও তার
সঙ্গীরা গলায় রশি দিয়ে খেলছে
তারপরও নিন্দা জ্ঞাপন ছাড়া
আমার করার কিছুই ছিল না
কারণ আমি বুদ্ধিজীবী
জ্ঞান গর্বিত, নব্বই এর কুশপুত্তলিকা
দাহ করেছে ধর্ষিতা নাবালিকার
রক্তাক্ত যোনিদ্বার----
আমার বিবেক বিধাতা এখন
জড়োসরো কোণঠাসা----
জাতিসংঘ সনদ কথিত বিতর্কিত
এানুষ আমরা---
এবং তারপর দেখুনঃ
শতাব্দীর চালক এখন
অত্যাধুনিক শকুন।

তারপর কী হবে?
রাশির জগতে শনির খেলা শেষে
কান্নার আকাশ ফটো হবে-
কোথাও উধাও হবে দূষিত বাতাস
গ্রহান্তরে গজবে
স্পর্ধিত মনুজে ফুল।

৫/৩/৯০, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

কালে কালান্তরেও গাইব

অশ্লীল চিন্তার মেঘলা দিনে
আবহাওয়ার গুরুতর অপরাধ হলোঃ
টুকরো টুকরো মেঘের দৌড়ঝাঁপ
করা আকাশের মাঠে
ডবদ্যুতের ঝলসে যাওয়া
কান্না কেন সে শুনতে পায়
সেখানে জৈষ্ঠ্যের খর রোদদ্বারে
চৌচির জমিন দাঁড়িয়ে অসহায়,
অবিরাম ঝরছে টাকার বৃষ্টি।
কখনও সংসার গাছপালা বাড়িঘর
থুবড়ে পড়ছে
চুরমার হয়ে ধ্বংসের দর্পণে ভাসছে
সে কী করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ!
অনাহার ক্লীষ্টের শানকী আর
আমার বৃদ্ধা মা বট গাছ
দুই-ই অর্থ আর ক্ষমতার
টর্নেডোতে নিশ্চিহ্ন।
কবিতার পত্নী গতরাতে ভীষণ
ঝগড়া করেছে।
আদর্শবাদী কবি'র পাভুলিপিতে শুয়ে
ছেঁড়া ছেঁড়া খাতার বিদগ্ধ
সাংসারিক পাতায় যে নিষ্ঠুর
অর্থনৈতিক অক্ষরগুলো বসবাস করে
তার ঘেঁষে একবেলা খাবারও নেই।
অথচ কবিতার একবার স্বপ্ন দেখেছিল
জীবনের মাঠে পরিধান করবে
আশার বেনারশী শাড়ী।
একবিংশ শতাব্দীর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে
দেখছি আর দেখছিঃ
পৃথিবীশুদ্ধ একটি ফুলেও সুবাস নেই।

সময়ের উষ্ণীয় পরে বল্ বল্ হতচ্ছাড়া-
নদী-আর কত ভাঙবে মানবতার কুল?
নদী শিকস্থীর শিকার
শহুরে উদ্বাস্তরা-
জলরাশির মতে, একমত,
তারা নামবে সাগরের জীবন সমুদ্রে
কুড়িয়ে আনবে মণি মুক্তা দানা
উষর মরু ভূমিতে বুনবে-সংগ্রামী বীজ।
হে তরুণ, জীবনের এভারেষ্ট শৃঙ্গে
উড্ডীয়মান, বিজয় নিশান,
কালে, কালান্তরেও গাইব, জয়গান।

১৭/৫/৮৯

ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ

হৃদয়

স্বার্থপর একটা জীব ঘুমুচ্ছে অঘোরে শিয়রে
ইচ্ছে করে, রাগের চটিজুতো মেখে দিই কপোলে,
নিঃসঙ্গ কবির কবিতার খাতা রক্তাক্ত,
গোটা ঘরটা বিশ্বাসঘাতকতা করছে
অনবরত, অনবরত-
অসহ্য, অসহ্য ইটের হৃদয়হীন ঘরে
অনুভূতির রক্ত জবায় ভরছে বালিশ।
বেহায়া লিঙ্গ গোঁতা মাখে বর্জোয়া যোনীদ্বারে,
অথচ নিজে সে সমাজতন্ত্রের মশারি
হিরন্ময় হাতিয়ার যে কলম
ক্রমাগত নিষ্পেষিত যে দেহ
ক্ষুধার্ত উদখে যে নিরলস সৈনিক
সেই আজ ঘখে বাইরে
শৃঙ্খলিত, ব্যথার্ত
অবশেষে সংগ্রামী কফিনে-
লাশের ব্যভিচার

দ'চোখে দেখব সূর্যের কড়া দুর্যোগ,

দেখব ক্রমাগত অগ্নির কান্না বলসানি
পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করছে আমার
চিন্তার কাঠ?

আমার আবদ্ধ ঘণ্ডে যে মূক বিদ্যুৎ
সেও একদিন কইবে কথা,
খুলে যাবে ভুতের মুখ
প্রচন্ড মার খেয়ে ছায়া হবে জীবাত্মা
ধূলিধূসর গায়ে আসবে স্বচ্ছ আয়না
নিমেষে পাবো অসহ্যের
শত্রু হত্যা করে হৃদয়।

১৯/২/৮৯

দঃ দনিয়া ঢাকা।

বিস্মল চেতনার ইচ্ছে

বাণীকির দেহে জন্মেছে
আলোকময় একটি উদগ্রীব ঘর,
মলিন শাদা দেয়ালের বুক চিরে
বেরিয়ে আসে বিশ্বাসের শব্দ,
আত্মচেতনা ঢিল মারে
বারবার দরোজার মুখে।
স্থির পাথর দ'চোখ দেখে নেয়
টাকার গলির দু'পাশে শত্রু সেনার
ছাউনী, কখনও মন চায় আহত করি
আমাকে, আমার পাঙ্কলিপি।
কেন জিদেও বালিশ শুয়ে থাকে
কিংবদন্তী যে কলম, নিমেষে যে
ফিণ্ডে পায় যৌবন, সেই যুগ পুরুষ
কোথা আজ?
আমার কণ্ঠের সুর পাপোষ

ধারণ কওে যায় বেদনা
যেন সে নিদঘের নীলকণ্ঠ-
আর ইচ্ছেই হয় না বেরিয়ে আসি ।
লুকাতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে
বুকে কী যে, একটা অনর্গল
বকে যাচ্ছে, তার অনুকরণে পা রাখি ।
ক্লান্তির সময়ে একটি জায়গায়
ঘুমকাতুরে ছুটাছুটিহীন
জীবনের বারান্দায়,
থু থু দিয়ে যাই ফিওে,
ফিরে, লোভ মুয়োরের নাকে মুখে ।

১৫/১/৮৯ দঃ দনিয়া, ঢাকা ।

চোখে যা দেখি

ক্লান্তির ধূম উড্ডীয়মান, কুন্ডলিত নাড়িভুড়ির
ক্ষুধার আগুনে পুড়ে পুড়ে
বিশ্বস্ত্র চেতনার নিদাঘ আকাশে,
চিত্তার নদীর সফেন অর্থ তরঙ্গ
আঘাত হানে জীবনের লক্ষ্য গহ্বরে,
যে জলের আদিবাস কষ্টের পর্বত চূড়ায়,
রক্তাক্ত সূর্যের সোনালি আলোর পিষ্টতায়
সে জল প্রতিভার গায়ে দিয়ে যায়
ক্রমাগত পরিহাসের ছোঁয়া,
মায়ের বুকে নিত্য বহমান
কোটি কোটি শুয়োরের রক্ত বুড়িগঙ্গা-
সেখানে আমার ভাষা হারিয়ে যায়
যান্ত্রিক জটিল শ্লায়ুদ্বে ।
কোনদিন কী আর পাবই না খুঁজে সেই
আদিম ফুল, যে আজ প্রভাতে ফুটেছিল
নয়নাভিরাম বাগানে ।
সেই চোখে কী দেখব না ফুল-হাসি

নাকি দুর্ভিক্ষের ভূত আড়াল করবে
নিবিচারে আমার চোখ ।
আজকাল দেখি আমার আবাসে বাস করে
অর্থের দু'মুখো সাপ, শ্মশান বাংলার শুকনো
ডাটা বমি করে আমার চুল্লী, দু'পাশে ইটের
শাদা স্তম্ভ, বিরক্তি আনে মগজের মেডুলায়,
নিত্য ক্রন্দনরত দুর্দিনের আকাঠ চোঁকি
বেগানা নারী ।
চরের বালিরা ভীষণ ক্ষুর,
উদ্বাস্তর কপালে ঘর করে
কারুণ্যের ধন ।
তারপরও অনেক আশা, শালিকের
কিচিরমিচির সময়ের দূরত্ব পেরিয়ে
করবে জয় দূরন্ত ইচ্ছার
উর্বর ভূমি ।

৫/১/৮৯

নবাবগঞ্জ ঢাকা ।

শব্দাবলীর বিচরণ

জল তুমি সেই জল
অবিনশ্বর জলহস্তী
ইঞ্জিন সোঁ সোঁ-ওঁ ওঁ নাকি ময়ূরপংকী
তোমার বক্ষে করে চির বিচরণ ।
গোটা ভাবনার সত্তাটা, একরাশ
শব্দের পেটে আর আকাশ ও জমিনের
পায়ের নিচে ইটখোলায় চোঙে ভর
করে একটা প্রবল ঘুষি মারে দূর
অতীতের নদী তত্ত্বের কল্পনার ধোঁয়া

সবুজ মাঠে, বাড়িঘর আর
জলযানের স্বেদ গন্ধ ভরা মলিন পাটাতনে ।
নিশ্চিত পরিহাসে, মেতে ওঠে কোন মেয়ের
অস্তিত্বের সুটোল নাক, সিঁথির সিঁদুরে
অথবা কোন কবি পত্নীর অধিকার
চেপে ধরে মনের জ্বু ।
উপমার জড়াজড়ি, ঘোরাফেরা লেপ্টে যায়
শব্দহীন শব্দের শরীরে,
যেখানে একটা জীবন,
একটা আশা,
একটা সুখ,
একটা উদ্দিগ্ন,
একটা সম্মান ও পদমর্যাদার ঘুঘু উড়ে,
নিত্য খেলাধুলা করে চরের পিঠে
রাজহংস ।

ভাবনার বায়ু প্রবাহ আর শাদা সূর্যালোক
ভিক্ষুকের হাঁক, ছেঁড়া, ছেঁড়া কর্তব্যের
রশি বাঁধে, ধাক্কা খায়, বিবেকের পাথরে
লোকজন যখন একটি শব্দ আর একটি
ক্ষুধার চিন্তায় মিলে যায়, মিলে যায় সময়ের
গর্তে, তখন কবিতার পঙক্তিমাল্য গা ভাসিয়ে
বাঁচতে প্রয়াস পায়, কৃষাণের উঠোনে
হাঁটার পথে যায়, যায় আর এক কালের

জগতে----

নদীতট, লাঙ্গল, বলদ, জোয়াল, চাষা অথবা
শব্দের ভেতর প্রতীক্ষমান যাত্রী, এরা সবাই
আকণ্ঠ পান করে দূর ভবিষ্যতের একটি
কবিতার নির্যাস ।
আর তখন আমি নিশ্চিত হাফ ছেড়ে
বেঁচে যাই-কর্তব্যের সাইরেন
ঘন্টার কথা ভুলে দায় মুক্ত জীবনে ।

অথচ আজিকার কবিতারা বুলছে যে
দেনার ফাঁসিতে শতকোটি বলয় পেঁচিয়ে
তা ঘেঁটে ঘেঁটে অবশেষে
একদিন আমিও হব কী?
শব্দাবলীর বিচরণে স্মৃতির সন্ধ্যা ধূপ?

১৮/১/০৮ নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

দূরত্বের বিদ্রোহী কাক

দূষিত বায়ুতে পৃথিবী ভরেছে-একটা
প্রতিবাদের, একটা নির্যাতনের, একটা
অস্বস্তি বিব্রতকর ভাবনা গোল পেকে
করেছে রক্তের স্মৃতিসৌধ।
সামাজিক আভিজাত্য বর্জ্যাবাদের
সে ইট কংক্রিট জনহীন অরণ্যের ভেতর
বৈকালিক পথের একমুঠো ভালবাসার
নিঃশ্বাস।

সে গ্রাস করতে চায় মুহূর্মুহু অভাব
আকাঙ্ক্ষা আর আত্মগত যুদ্ধে বিধ্বস্ত
সাহসী সৈনিককে।

যার নিদাঘ নিদারুণ কামান দাগা,
যার মানব সত্তার চৌকাঠ বিলীন,
পরের দখলে যার প্রিয়া, সে-ই
এখন দিন গুনে, রোগাক্রান্ত
মাঘের পিঁড়িতে বসে ফাঙনের
আনন্দঘন হাওয়ায় অথচ কী
দুর্মুখ চড়াই জীবিকা ও বাসার
সন্ধানের আমরণ, আমরণ খাটলো।
মধ্যবিত্ত ষাঁড় ছিঁড়েছি কী দড়ি?
তগু শাদা আলোকে, বক্ষপিঞ্জর
কাঁবাড়া হলো

সজীব মাঠ শুকিয়ে চৈত্রের দাবদাহে,

এখন খান্ খান্ ।

যদি আর এক গ্রহে যাই বুঝি

সেখানে, যন্ত্র আর যুক্তির দেবতারা

বসবাস করে না ।

সেখানেই বুভুক্ষারা খুঁজে পাবে

দুর্বলতার পেঁপে, কচু, কাঁচকলা

সামন্ত শ্রেনির উদ্ভিদ এক পোচে

সাবাড় করেছে আমার আদিম

রক্তাক্ত জিহ্বার তলোয়ার ।

আর তখনই পিঁপড়ারা বুঝে উঠবে

গ্যাসট্রিক খাদ্য গোদাম হতে

আস্তানার দূরত্ব, আজীবন সমগ্র

সভায় গেড়ে থাকে সেই ঘর্মাক্ত দূরত্ব ।

লহুহীন চোখে দেখব

কবিতার কাক-

কাঁ-আঁ আঁ-কাঁ আঁ-

ডাস্টবিনে গিয়ে গিলবে নিশান গাড়ী

জানি, বেতমিজ রাজপথে চ্যপ্টা

হয়ে শুঁবে কিনা শেষমেশ

সেই দূরত্বের বিদ্রোহী কাক ।

৮/২/৮৯ দঃ দনিয়া ঢাকা ।

মুখোমুখি

জ্যাম আর ঘূর্ণায়মান নগরীর ক্লান্ত শরীর

বুদ্ধির নিকাশ শেষে চেতনার পা টিপে হাঁটছে ক্রমাগতঃ

ঘর্মাক্ত ত্বক আর হাড়ির মজ্জা পুড়ে খাচ্ছে

জৌলুস দৈন্যতার কথিত ঘাতক সূর্যঃ

আত্মার স্বধীন পতাকা, লাল গাঢ় নীল

কোলাকুলি করে শিহরিত কলেবর

চিরবিপ্লবী শান্ত বাতাসের সাথে,
যুগবৃক্ষ-শতাব্দীর নবোতিপর বট
বাণী ছুঁড়ে কানেঃ
ওগো অন্ন পেশা আর পসারিণীর মথিত নরোম স্তন
চাই সরোষ গর্জন, চাই দুঃসাহসী ভৈরুর
হুশিয়ারী উচ্চারণ।
ওগো বিদগ্ধ ক্ষতান্ত কর্ণিয়া দেখো-
ক্ষমতার পথচারী আজকাল রাজপথ মাড়ায়
জেব্রাক্রশ ছাড়াই।
রক্তাক্ত জবা ক্রন্দনরতা, আশার মঞ্জুরিত
কানন স্তব্ধ, নির্লিপ্ত, অটালিকার গায়ে মাথা খুটে
ভয়াব্র প্রিয়তম কৃষ্ণচূড়া বাউল সেজেছে,
দাঁড়ি এলোমেলো চূরের ফুলগুচ্ছ
অবশ চোখে দেখে-
ব্যথার্ত গোধূলিলগ্ন, দেখে এক পাষণ রাজপথ
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, উড়ে যায়, উড়ে যায়
ক্ষুধার্ত কাকের ঝাঁক, শূনি কর্কশ শব্দের তরঙ্গ,
সন্ধ্যা মালতী আজ ক্ষুধা জীবনের মুখোমুখি।

২৮/৫/৮৮, জাতীয় লাইব্রেরী।

মানুষ হারিয়েছে

এই কাজ ঐ কাজ ফাঁকফোকর তার
একটু যদি পাওয়া যায় ব্যস্,
ফের ফিরে আসি এ জীবনেই পাছে
ঘিরে ফেলে হৃদে কল্পরেশ।
সব কাজে সুখ নেই বিষয় গুরুভার
বাতাসে চুল নাড়ে চোখ'পর,
পীড়া দেয় কলমে কী চাস তুই এই
হেতু ঐ হেতু তুল্ কাগজে ঝড়।
চোখ দেখিল কী, মন বুঝিল কী যে

বুঝি নাই প্রত্যেক জীবনটা আর,
কোথা কার সাথে কার অভিন্ন মিল
কতবার বলিয়া বলিতেছি আবার।
এমন হবে না যা এ দশকে চলে না
প্রগতির নামে ভন্ডামী যত গোল,
পেটে নেই ভাত যার সে-ই অভাগা
কিনা বাজায় পেট ভুলানো ঢোল।
হায়ানার চিবুক আমার এই উচ্চাশা
নিঃসীম ব্যস্ততম অন্ধকারের ঘাটে,
অগ্রীম প্রেমের বিচ্যুতি, বিস্মৃতি হলে
বেতমিজ ক্ষ্যাপা হয় সন্ত্রাসী হাটে।
বিরান জীবন মাঠে সবুজ উবু হয়ে
দেখছে চৌকুস ধুরন্দর তরুণ
জীব বয়েস দ্রুত পালায় এই গাঁয়
যবে যাত্রা আমার গিলছে অরুণ।
কী লাভ তরঙ্গের ফঁসিয়ে ওঠে,
শান্তির বদলে শান্তি ডেকে আনে,
ভাবছি কি আহা, চাই না আমি তবু
আশা হতাশা মগজে ঘাত হানে।
কে বলেছে সুন্দর এই পৃথিবী হায়,
তার কিছু ভুলেও আমি দেখি নাই,
অজস্র চাওয়া আর চাওয়া ছাড়া
মানুষ হারিয়েছে গুণ তার সবটাই।

৫/৬/৯২ নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

পথ চলা

কেন অর্থের চড়াই খুঁজে চিরদিন, চিরদিনই
ভুত ইমারতের ভেন্টিলেটর?
আশার দুর্বাঘাসের বুকে এখন পীচঢালা রাজপথ
রোদের মান্তান ঝাঁকড়া চুল নেড়ে ঘুমি থোড়ে
বেছুরত?

জীপের পিঠে দে কর্ম দে, দে অধিকার
আমার পঙ্গু বাম পা টা ইচ্ছের পথে এগুচ্ছে
কভু যাত্রী ছাউনীর নিচে দেখ ভালবাসার চুম্বন,
চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় পৌষের শিশির, ভেজা
দুর্ব্বার ডগা-

এর ভেতরেই পথ পেরুতে হয়,
পিয়াসী ভ্রমর, জীবনের ফুলে ফোটায়
ছল-চুষে অর্থের মধু।
বসন্তের সোনালি সকাল
গ্রীষ্মের মরণ দুপুর,
বুকে চেপে পথ চলবেই,
আমার অতৃপ্তির তৈমুর লং।

১০/১১/৮৮ জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকা।

সময় নেই

প্রাণের আবেগ রাশি চলে পড়ে বারবার

রুখিয়া রাখিতে পারি না-

শত কথা শত ব্যথা শত রূপের সমাহার দেখছি

অবনীর বুকে-

একি আত্মপ্রবঞ্চনা! একি অনুযোগ!

সময় নেই, সময় নেই ব্যস্ততা গ্রাস করে সময়

আমার কোমল হৃদয়বৃত্তি প্রকাশে, অর্বাচীন

মত বাধা এসে উপস্থিত, একি দশা! আমার

মাঝে নিরবে বিরাজ করছে।

হরেক রকম কাজ আছে-সময় নেই,

তাই কখনও পারি না জ্বালের আলো জ্বালাতে,

পারি না কভু অমৃত পান করে অমর হতে!

আমার কাজ আমাকেই বিহ্বল করে, সচেতন

মন অবচেতন মনে আটকে যায়!

আমার সাধনা বিফল হতেছে---

সাহিত্য রস বিষ রসের মত মনে হয়,

এক অদ্ভুত সময়ের অভাব গ্রাস করে

আমাকে---

শুনছি আজান, উন্মুখ হয়ে ভাবছি জীবনটা--

সময় তো চলেই যাচ্ছে অথচ আসল

কাজটাই সময় করতে দিচ্ছে না।

যন্ত্র দানবের মত কাজ করছি জৈবিক

তাগিদে অথচ আত্মার

বিকাশ স্বাস্থ্য কতটুকু আমার

কাছে মূল্য পেয়েছে?

তাই সময় নেই কথাটা

আমাকে না শুনিয়ে মনকে বলছি

মোটর গাড়ীকে বলো সে এর

উত্তর দেবে সুন্দর করে।

২৩/৩/৮৫ কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ।

মেঘনা মোহনায়

জীবন নাটক আমোদ দিতে পারে না
ও পারে শুধু কাষ্ট হাসি দিতে ।
নীল গগনে সাঁঝের বেলায় যখন
সূর্য অস্ত যায়-
প্রাণের কথা, মানুষের যত কাজ
সবই বুঝি বেরিয়ে পড়ে অথৈই জলে
এই জীবিকার ঝাঁ ঝাঁ নদীর মত
জীবনী শক্তি ক্ষয় করে ।
প্রচন্ড ঢেউ, ডাটা বনের তোলপাড়
করার মত বিষন্ন করে তোলে ।
তবুও আমাকে হারাতে চাই না,
কষ্ট নিস্তক্ক হয়ে আসার পরও
আমি বাঁচতে চাই ।
হ্যাঁ এ-ই তো মনের প্রাপ্যতা,
কারণ রোধ করাই তো স্বভাব-ধর্ম ।
বর্ষণ শেষ হয়েছে আকাশটা অনেক শাদা
কিন্তু জীবনটা মানে প্রতিদিনের
চলাটা তো শাদা হয় না !
উত্তর নেই-জানি এর উত্তর মিশে গেছে
জল হয়ে মেঘনা মোহনায় ।

৭/১০/৮৬ নবাবগঞ্জ ঢাকা ।

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষা সহে যে না আর কে ওই দাঁড়ালে এসে,
মন-দ্বারে আসো বারবার মম কবিতা হয়ে হেসে।
বলিনি প্রেম-বারতা তবু ফুটে জুঁই চামেলী চম্পা,
একদন্ড ভুলিনি তব কভু চাহি তব প্রেম-অনুকম্পা।

ওই হেরিছি তব চুল,
মন হয়েছে আকুল।
কেমনে বিরহ সহি,
আবেগ তাড়নে দহি।

শুদ্ধ প্রেমানুভূতি মোর বাঁকা হাসি কেলি যাও,
রেখো না মম বহুদূর রসে আপ্ত কেরে দাও।
দ্বিপ্রহরে হেরি শেষে এ যেন চিরচেনা দেখা,
প্রিয়ার স্নানোত্তর বেশে আঁকে মনে কল্পনা রেখা।

কী হেরিলাম তব মাঝে
এ মন মরে প্রেম লাজে
আঁখি দুটি মোর পোড়া,
মন যেন পানাসক্ত সুরা।

যত হেরি তত দেহ অসাড় হিয়া মম তারুণ্য চঞ্চল,
কভু তুমি বিনে কেহ আর, ধরে রেখেছি তব অঞ্চল।
না আসে না কিছু মম মনে কী জানি কী অশরীরী সুরে,
পিঁয়া পিঁয়া জপি ক্ষণে ক্ষণে নাও প্রাণ রেখে দেহ দূরে।

কবে আসিবে দাও বলে,
প্রতীক্ষায় আমি তা হলে,
খুলিয়া রব মম হৃদদ্বার,
সে দিন গুনিব আরবার।

১৩/১০/৮৬ টিকরপুর আগলা।

বারেক আসিও ফিরে

এমন সুরে বলিনু কথা,
এমনভাবে বাজিল ব্যথা,
এমন অনুরাগ তাপসে কে তুমি এলে?
ত্যাজিয়া মম হৃদ-ভার,
করে যে দিলাম সবার,
মহাকালের নৃ আত্মার,
আজি কে তুমি মোর হিয়া ছুঁয়ে গেলে!
সাক্ষ্য আরতি সানাই,
ভক্তিপুষ্পমাল্য বানাই,
ঈষ্ট হৃদয়ার্ঘ্য জানাই,
জীবন সৈনিকের এই সাধ একান্ত সাধ।
স্বচ্ছ বারি ভিজে ঝরে,
হিয়া মোর পুতে ভরে,
চুম্বকাবেশ কুসুম তরে,
সাদা কুয়াশার আগমনে ঘটালো প্রমাদ।
মম হৃদয় কোথা রাখি,
এখনও বহু কর্ম বাকী,
ভরা মন মদিরা সাকী,
গোলমাল বেঁধে গেল আচম্বিত শোণিতে,
বলিতে পারি না কথা,
কণ্ঠ রোধ হয়েছে যথা,
দোলিছে মনপুষ্প লতা,
আজিকার হিমেল মলয় চাই রোধিতে।
ওই কমল কিশলয় নড়ে,
ভাসে জীবন তরী 'পরে,
জলদ উর্মি কলকল স্বরে-
সবুজ রঙতুলি দিয়ে আঁকে জীব মাঠ,
দোয়েল পাপিয়ার তানে,
শক্তিমত্ত যৌবনের গানে,
সরল স্বভাব সহজ দানে,
বারেক আসিও ফিরে হৃদে রাগিনীঠাট।

১৫/১০/৮৬ টিকরপুর ঢাকা।

আর পারি না আমি- এবার রুখো

মায়া আর ছলনার পিছনে দৌড়াতে-
দৌড়াতে ভেঙ্গে গেছে বক্ষপিঞ্জর-
রূপক মোহে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে
সাজিয়েছি ফুলের মালা-
আর কত, আর কত এমন করে ঘুরব আমি
কেউ বুঝে না আমায়।
জীবনের দীর্ঘনিঃশ্বাসে আকাশ
বাতাস মাটি প্রকম্পিত?
ঝড় ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ করালগ্রাসে নিবিড়
তিমিওে কিছুই দেখতে পাই না।
ভালবাসার আশায় হৃদয় ক্ষত বিক্ষত
পৃথিবীর কেউ আমায় আবিষ্কার করে না।

তাই ভাঙতে হবে শনি দশা, গড়তে হবে
নবতর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
বিরহ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সাজাতে হবে
হৃদয়-সুন্দরের মালা
অপেক্ষা করছে শতকোটি মন,
অনাগত কালের প্রজন্মকে
জানাতে হবে অনেককিছু-
সৈকতে আর দাঁড়িয়ে নয়,
ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে
সাধনা-কর্মে, মহাসমুদ্রে।

১৬/১০/৮৬, টিকরপুর।

কবির ভুল

এই মনটি নিয়া কাড়াকাড়ি,
কখন কারে ধরি আর ছাড়ি,
আমি নারী ।
পুরুষেরা মোরে বুঝে না,
মম মায়া কণ্ঠ খোঁজে না,
আমি তারি ।
কখন যে মোর প্রেমে পড়ে,
আমি নিই তার প্রাণ হরে,
আমি ছায়া ।
কেন যে সবাই চায় মোরে,
থাকি আমি ধরা হতে দূরে,
আমি জায়া ।
যে আমায় যে, সে বোকা,
কেননা আমি দিই ধোকা,
আমার রূপ,
কেহ পায় না মোটেই স্বষ্টি,
মোর চোখে পুরুষ যে হস্টি,
কবির চুপ-
রহস্যে হেরে আনত নয়নে,
আঁকে যে চিত্র স্বপ্নে শয়নে,
আমি বরি,
আমার সর্বজনে ভালবাসা,
ক্ষণিকের তরে দিই আশা,
আমি তরী,
ভীড়ে সবখানে যখন যারে পাই,
ক্ষণিকের তরে নিজে হারাই,
কবির ভুল,
মিছে চিত্র আঁকে মোর অতুল ।

১৭/১০/৮৬, টিকরপুর ।

মনের পবিত্রতা হারিয়ে না

সুখের বাসর ঘর বিনির্মাণে ব্যস্ত মানুষগুলি
লালটুকটুকে ইটে অট্টালিকা কিংবা সুদৃশ্য
লৌহ পিঞ্জরের জাহাজ-

তারই স্বাক্ষর বহন করে ।
অথচ কী নিষ্ঠুর নিয়তি এত সাধনা শ্রমে

আহরি যাকে পাওয়া-সে-ই ক্ষণিক পরে
মিলাইছে শূন্যে-
আমি কী তার ব্যতিক্রম না কিংকর্তব্যবিমূঢ়
আমি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে
এই লৌহ কঠিন বাস্তবের ফাঁক দিয়ে,
সুগন্ধী মলয়ে চড়ে একটু শান্তির আনন্দ
দিতে চাই
ঘর্মাক্ত শরীরে খাটতে খাটতে যাদেও ভেঙ্গে
গেছে জীবনের সুখ স্বপ্ন, শুধু বাঁচার প্রত্যাশা
নিয়ে সময়টা গুনে,
কিংবা যারা সন্তোষের বিমানে চড়ে আকাশ
পাতাল ভাবছে, সবাইকে ডেকে বলি,
মনের পবিত্রতা হারিও না ।
কেননা আমার আশা সংকীর্ণ হচ্ছে
ভোগীদেও প্রতি, এরা অমৃত সাকী ছেড়ে
বিষসাকী ধরে অবিরত গলাধকরণ করছে ।

সদরঘাট-ফতুল্লা, ২৮/১০/৮৬

ধন্য হে

মানুষের ব্যস্ততম কোলাহল যেন
ইঞ্জিনের সশব্দ একগেঁয়েমী চিৎকার
ফেরিওয়ালার অযাচিত ক্ষুণ্ণবৃত্তির
আহ্বান, বিরক্তিকর স্বার্থপ্রীতির
কানাদ্বুষা, মানুষের সরিয়া যাওয়া
মন কেবল যাই যাই করে
তারমাঝে আমি কবি ভাবি জীবনের
মিল কতিপয় মুহূর্তগুলি।
রুঢ় কর্তব্যের মাঝে খুঁজি মুক্তির
আস্বাদন কেননা এখন বইছে মৃদু
হাওয়া, হাঁ এই তো মানব চরিত্র,
মন দিগন্তে ছুটাছুটি করে,কিসের
এত আনন্দ পাই?
আমারই মত মানুষ পথচারী পথে
গ্লানিময় জীবন রোজ আস্বাদন করে-
হতাশা, জীবিকার অনিশ্চয়তা আর
পঁচা উদর পুর্তি চিজ নিত্য সাথী
যাদের, তাদের শহুরে কৃত্তিম সুখ কী?
ধন্য হে মানব সমাজ তোমরাই ধন্য !
সুখের হিসসা-সবটুকু দিয়েছ
সম্ভোগপ্রিয় নরাধমগুলোকে।

২৮/১০/৮৬, সদরঘাট ঢাকা।

নাটক

মনিরের সংগ্রাম

[গোলাকৃতি উন্মুক্ত খালি জায়গা। ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত মাথার চুল এলোমেলো এবং জটলা পাকানো একজন ফকির ধীরে ধীরে একপাশ দিয়ে খালি জায়গায় প্রবেশ করবে। তার হাতে একটি সিঙ্গা বা একতারা থাকতে পারে। তার পিছন ধরে দু'জন শিষ্য সেখানে যাবে। পূর্বেই যেখানে দু'টি তবলা রাখতে হবে। মৃদু পদচারণায় ফকির মারফতী স্বরে নিম্নোক্ত গান ধরবে। গানের শেষের দিকে তিনজনই ধীরে ধীরে তবলার পাশে বসে পড়বে।]

মেহের ফকির : (দাড়াইয়া উচ্চস্বরে) : হক মাওলা, হক মাওলা, হক মাওলা।

তারপর গাইবে :

গরীব আসল তারাই ওরে
মেরে খায় অন্যরে,
একদিন তার বিচার হবে
রইবে তারা অন্ধকারে।
সাধু, সাধু বইল্যা তারা
অহংকারে বাঁচে না,
মানুষ নামে জন্ম নিয়াও
সত্যরে ত্ যাচে না।
সুখ চাহিয়অ দুঃখ তারা
লইবে দেখিস বরে
অত্যাচার প্রাণের জ্বালায়
কেঁদে কেঁদে হয়,
কেমন করে মানুষগুলো
পরপারে চলে যায়।
বলি ওরে শুন পাঁজি
তোমার নাহি, মুক্তি,
ঈশ্বরেরই রুদ্র হাসি
কঠিন তার প্রতিবাদী যুক্তি।

ওই মানুষ হয়ে আসবেন
তিন ধরবেন গলা টিপে,
দন্ত তোমার চূর্ণ হবে
আলো জ্বলবে নিঃশ্বের দীপে।
আলো জ্বলবে নিঃশ্বের দীপে।

শিষ্য : গুরু, জন্ম-মৃত্যোর রহস্য কি?

ফকির : দুনিয়ার সবই ফাঁকি। কেবল মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ কিছুদিন
বেঁচে থাকে। এ-ত মহাশক্তির লীলা খেলা।

২য় শিষ্য : গুরু, যদি তাই হবে তবে কেন মানুষ তার সমস্তপ্রাণ শক্তি দিয়ে বাচার
চেষ্টা করে, অপরকে সিংসা করে বধ করে। অন্যকে ঠকিয়ে ধনী
হওয়ার চেষ্টা করে।

ফকির : ওরে বাছা, তুই কি জানিস, মানুষ তখনই বোকা হয় যখন নিজের
চিন্তা না করে, নিজেকে না চিনে অন্যের চিন্তায় লিপ্ত হয়। হায়রে
এইখানেই তো মানুষের শোচনীয় পরাজয়।

১ম ও ২য় শিষ্য : (সমস্বরে)- বুঝেছি, বুঝেছি গুরু আমরা বুঝেছি আ নয়, এবার
মুক্তির স্বাদ নিতে অইব আত্মাকে অনেক উপরে তুলে দিতে অইব। আর সেই
আত্মা নয় মহাশক্তির দরবারে হাজির অইব। জন্ম আমাদের সার্থক অইবে।

ফকির : এই-ত আমার উপযুক্ত শিষ্য-এস.জন্ম মৃত্যোর রহস্য গান গাই-

জন্ম ফাঁকা মৃত্যো ফাঁকা, ফাঁকা এ জীবন
সবই মিথ্যা, মিথ্যা এ ভূমন্ডল।
মরিয়া গেলে সবই শেষ
আপনারে চিন রে বন্ধু
আপনারে চিন।

(গাইতে গাইতে প্রস্তান)

[তিন বন্ধু পায়চারী করবে এ-স্তর দিকে তাকাতে হাত ঘুরাবে ইত্যাদি ভঙ্গিসহ
কারে মতামত ব্যক্ত করবে]

সুরেন : দেখ, মনির তুই যা ভেবে ছিস তা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়। পৃথিবীটা
হলো ভোগের স্থান। যত পারিস অপরকে টকিয়ে প্রতারণা করে খা।
কালো বাজারী, আত্মসাৎ অধিক মুনাফা, মজুতদারী....যত পারিস কর।
সাপদের পাহাড় কর। পোস পাসে চল। হাইজাক, নারী অপহরণ,
ধোকাবাজী.....

মনির : থামবে থাম। বুঝেছি, বুঝেছি তোর ধান ধারণা। তুই পাপিষ্ঠ, তুই নরাধম। তোর জন্ম বৃথা। পৃথিবীতে তোর বাচান কোন অধিকার নেই। যেখানে মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকবে যেখানে মানুষ শোষিত নিপীড়িত হবে- মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত যে সম্পদ সে সবই তোদের মত নাধমরা ছিনিয়ে নিয়ে গর্বে বেঁচে থাকতে পারে। বেশি দিন নেই তোদের এ সমাজ ভাঙবে-তোরা হবে সর্বহারা সেই দিন বুঝবে কত বড় ভুলই না করেছিলি।

সুবোধ : শুনলাম তোদের বাক বিতণ্ডা। এবার শুন আমার অভিমত, আমার বিশ্বাস পৃথিবীটা হচ্ছে একটা যুগল পাপ-পুণ্যের স্থান। এখানে মানুষ পাপ করে পী হয় আর পুণ্য করে পুণ্যবান হয়। এ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও কর্মের ফল। এর নামই ধর্ম। তবে ধর্মে অধর্মে মিল করেই জগৎটা চলছে। একে অপরকে উড়িয়ে দিতে পারে না আর এ সামর্থ্যও কারো নেই। তবে একটা বিষয় কি সত্যের জয় সব সময়েই। দু'দিন আগে আর পরে আর মিথ্যার জয় নেহায়েত সাময়িক। অতিসত্ত্ব তার মুখোশ খুলে যায়। পরক্ষণেই সে নিজে কে তৈরী করে নেয়- নুতন ভাজে নুতন সাজে আবার ধোকা দিতে শুরু করে তাইত দেখি জগতে অত্যাচারীর মৃত্যোর নেই- মৃত্যো নেই বিশ্বাস ঘাতকের ও। তারা সব যুগেই আছে ও থাকবে মানুষকে কষ্ট দিবার জন। এইত দেখনা আগে বৃটিশ, জমিদার, সামন্তবাদীরা মানুষকে কষ্ট দিত, অত্যাচার নির্যাতন করত। আর এখন গণতন্ত্রের সিল দিয়ে শোষণ আর ফ্যাসিবাদী রাজ্য কায়েম করে। কেউ কেউ আবার গণতন্ত্রের নামে, কুকুরের মত ভেউ ভেউ করে....। মানুষকে মিথ্যা বুলি দিয়ে আদর করে। বিড়ালের মত কোলে উঠে আবার ধারার নখে সেই স্বৈরাচারী আচড় বসায়। মানুষের কল্যাণ করার রং দিয়ে নিজের সুখ-সম্পদ বাড়াইয়া, সেই জমিদার সামন্তের মত মাথা উঁচু করে দম্ব প্রকাশ করে বলল, এই পোশাক পাল্টানো ছাড়া আর কি। আমি

মনির : ওই যে ক্লাসের ঘণ্টা বাজছে, চল চল এখন আমিন স্যারের ক্লাস

সুরেন ও সুবোধ : চল চল ক্লাসে যাই। (চলিয়া আসিবে)

(ধীরে ধীরে হরিবল রায়, চেয়ারম্যান ও মার্চেন্ট প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত চেয়ারে উপবেশন করবেন। পাশে মেম্বর ও চাটুকার লাটু একটা হাফ চেয়ারে বসবে)

হরিবল রায় : এখন পাচার ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছে বুঝলে লাটু। পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে। গত মাসে মরিচ পাচারে লাভ হয়েছে দু'লাখ টেকা। শহরের বাড়ীটার তলা আরো তিনটা বাড়াইতে হয়।

কি করি বাড়িটা একদম পুরনো হয়ে গেছে। মনে হয় মোজাইক করাইতে হবে। অনেক কাজ। ও মনে পড়ছে ম্যানেজার ধানের আকাল হবে, প্রচন্ড খরায় ধান পুড়ে গ্যাছে। যতপার ধান কেনার ব্যবস্থা কর। ধান গুদামজাত করে আকালে চড়া দামে বিক্রি করব।

ম্যানেজার প্রবেশ : সব ব্যবস্থা করছি। বাবু। আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না।

হরিবল রায় : ইস্ ইদানীং পিঠের ব্যাথাটা বেড়ে গ্যাছে উহু—

ম্যানেজার ও লাটু : একযোগে কি হলো আপনার বাবু?

হরিবল রায় : না তেমন কিছু নয়। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না মোটেই।

লাটু : কে যেন আসছে মনে হয়।

হরিবল রায় : ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ রামদেব নাকি কি ব্যাপার অনেক দিন পরে দেখলাম যে, বহো বহো, এই কে আছিস একটা পিড়ি দে বহু।

(প্রবেশ)

রামদেব : বইবার আর জায়গা রাখলেন কই বাবু গরীবের বাড়ীডা ত আপনার নামে রেকোড করা ইয়া নিছেন।

হরিবল রায় : এঁা আরে কয় কি বোকা। এই জরীপটা কিছু না। তা ছাড়া সেটেলম্যান্ট অফিসার তুগো বাড়ী থেগো নামেই ত লেখখ্যা নিছে বুঝলে নাহ্। এঁা

রামদেব : বাইড়তেথনে পরমু দিন পুজেলা অফিসে গেতাম দলিল পত্তর লইয়া। কইলাম আমার পরচা দিতে। দাগ দেইখা কইল বাড়ীডা নাকি আপনার নামেই আছে। বাবু আমরা গরীব বইল্যা আমাগো আপনে তাড়াইয়া দিবার ছান।

হরিবল রায় : এইহ এইহ্ তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করত্যাছ কইলাম। তোমার মাথায় মগজ আছে! কে কোথাথনে কি কইয়া দিল হেইডা লইয়া নাচত্যাছ। আমি তোমাগো মঙ্গল চাই আর তোমরা কিনা ভাব তোমাগো মাইরা খাই। যাও তাগো লইয়া খাও সমাজ কর তোমার পীড়িতের সেটেলম্যান বন্ধুরে লইয়া আমার কাজ আছে আমি যাই। দেখি কোন দিন কাজে লাগি কিনা। চলবে লাটু....(প্রস্থান)

লাটু : বাবুর মত মানুষ অয় না তারে কিনা খারাপ ভাবত্যাছ। হুঁ। আফসোস। সৎ লোকের ভাত নাই।

(চলিয়া যায়)

রামদেব : শয়তানের বাচ্চা আমার বাড়ীডা কাইরা নিল, দু'দিন পরে গণে কইবে, বাড়ী ছাড় এ বাড়ী তোমার না। আচ্ছা দেখি বিচার পাই কিনা দেশে ভগবান, সেইখো তুমি ভগবান বিচার কইরো।

(টলিতে টলিতে চলিয়া আসে)

(প্রবেশ)

মিলন কান্তিদাস : (পেপার উল্টাইতে উল্টাইতে প্রবেশ)। (বসিয়া)

ব্যাপারটা ভার করেই উঠেছে ‘পশু ডাক্তারের পশু রোগের ঔষধ বিক্রি’। যে যত বেশি ঘুম দেয় তত বেশি ঔষধ যরব রাহ’। (মুচকি হাসি) (গম্ভীর কণ্ঠে) আমার এ কলম চবেই। কেউ আটকাতে পারবো না। মানুষ যখন ভুল করে তখন ক্ষমা করা যায় কিন্তু যখন জেনে শুনে অন্যায় করে তখন কিভাবে ক্ষমা করা যায়?

(পিছনে প্রবেশ)

সুবোধ : বাবা, তুমি খুব বেশি পরিশ্রম করো। এ বয়সে এত বেশি পরিশ্রমে....

মিলন দাস : জীবনটাই তো পরিশ্রমের জন্য খোকা। মানুষের ভালমন্দ, বস্তু নিরপেক্ষ সংবাদ যখন পাই। তখন শরীরে না কুলালেও যেতে ইচ্ছে হয় বাবা। দেখ বাবা, আমাদের দেশে, সত্য কথা বলিলে ঘাড় মুচরে দিতে চাইবে তাই বলে সত্য সংবাদ প্রচারে বিরত হইও না। আমি যারা অন্যায়ের সাথে আপোষহীন সংগ্রাম করেছি। আমার যাবার সময় হলো। তুমি প্রস্তুত হও ‘সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা হবে তোমার পেশা’। (উকল্ উকল্, উকল্) আমার পেশাটা তুমি শক্ত করে ধরো। তোমার শিক্ষা কাজে লাগাও বাবা।

সুবোধ : বাবা, একটু শান্ত হও বাবা.....ইস্ মাথায় রক্ত উঠেছে।

মিলন দাস : স্কুলের মাইনে যা পেতাম সংসার চলত না। তাই আমি বাধ্য হয়ে টিউশনি করতাম আর এর তেকেই সংসার চলত কোন রকমে। আজ এ বয়সেই যক্ষায় আক্রান্ত হলো।..... বাবা, তোমার লেখা বন্ধু করো না বাবা। এতো মার সত্যিকার সম্পদ। জ্ঞান বিতরন মনের খোরাকের জন্য এ চির সম্পদ তুমি নষ্ট করো না। এ দিয়ে চির দিন তুমি মানব মনে বেঁচে থাকবে। উকল্ উকল্ উকল্

সুবোধ : বাবা, চুপ কর বাবা চুপ কর। তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে। চল বাবা শুইতে যাবে। (ধরিয়া ধরিয়া প্রস্থান)

(প্রবেশ)

লাটু : দেখ পান্নু মিয়া কাশেমের আর উপায় নাইকা আমাগো টেকা দিতেই অইব। পথ বন্ধ করে আনবার লাগছি। উপজিলাগণে আমাগো হাতেই।

পিছনে প্রবেশ :

পান্নু মিয়া : দেখ তবু একটু অসুবিধা আছে। নবনি শিক্ষিত কান্তির পো আমাগো কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে- পাজিটার একটা অভ্যাস পত্রিকায় উঠিয়ে দেয়। তাছাড়া কতকগুলো কেউটে সাপ নিয়ে দল গঠন করার নাগছে।

লাটু : রাখ তো ওসব ছোকরা আমাগো বুদ্ধিতে মোটে হাত দিবার পারবো না । এমনভাবে কাসেম রে হাত করমু যে, যদি বাঁচতে চায় আমাগো সমাজে থাকবার চায় তো আমাগো কথা শুনতেই হবে । কান্তির পো সমাজের কেডা । আরে পাগল আমরাই তো সামাজের মাথা যা কইমু তাই হবে । কে আছে এমন বাপের বেটা আমাগো সামনে শালিস কতা কয় । শুন বেটা, বকা করবার লাগছি, কাসু, ৫০০০ টেকা দিবে । এক হাজার আমার, এক হাজার তোর আর উপজেলা অফিসের মেরা কোটে সেলামী । আর দুই হাজার আমাগো বড় মাদবর, হরিকল রায়ের বুঝলে ।

লাটু : রাখ তোর বাট বটো যারা । আমার এখন নেমা ধরেছে । আচ্ছা, কাসুর নাকি বড়ো মেয়ে আছে?

পান্নু : মেয়েডা ভারী ডাঙ্গা, খালি খেলে বেড়ায় ।

লাটু : পাকড়াও করতে হবে ।

পানউ : তোকে নিয়ে আর পারলাম না । কাসুর মেয়ে ধরলে এখন দোষ হবে দোষ বুঝলে? বুঝ তো কচুটা । যা গেদু মাঝির ছুড়িটার কাছে গণে । গত রাহীত গিয়ে ছিলাম না, বেশ লাগছে ।

লাটু : ঠিক কইছ দোস্তু থয় এখনই যাব—

উভয়ই : চল চল মজা করে আসি ।

(প্রবেশ)

মফিজ : মনির, তুমি যা খুশী কইরা বেড়াইত্যাছ । আমার মান ইজ্জত আর রাখলা নাহ । তোমার লাইগা আর মুখ দেখাইবার পারুম না । এর লাগি বুঝি লেখাপড়া—শিখছিলি । বাপের মুখে চুনকালি দেওয়ার লাগি ।

(প্রবেশ)

মনির : বাবা, আমি তো কোন অন্যায় করিনি । সত্য কথা বরি এতে যদি মাদবর নামের পাজিরা রাগ করে করুক আর কি । আমি বলেই যাব

মফিজ : এমন ছেলে জন্ম না দিলেই হতো আর কি বাপের মুকের উপরে কথা—ইস তোমার মুখ দেখবার চাই না— যাও যাও— সুমুখ থেকে ।

মনির : কি হলো বাবা উত্তেজিত হচ্ছে কেন । এমনকি অপরাধ করলাম যে মুখ দেখতে চাও না আচ্ছা ঠিক আছে আমি চললুম । আর কোন দিন বাড়ী ফিরব না—যত দিন এ সমাজ ভাঙতে না পারি যত দিন তোমার আদুরে হরিবল বন্ধুরে খতম করতে না পারি । যাও তমি তাদের সাথে সমাজ কর আমি চললাম (দ্রুত পদে প্রস্থান)

মফিজ : যাক । এমন ছেলেরর আমার দরকার নেই মরুকগে..... (বিষন্ন মুখে অধোবদনে বলে)

(প্রবেশ)

রামদেব : চাচা, কি করত্যাছ—

মফিজ : কি আর করুম । গোলাপানে কথা না হুনলে

রামদেব : কি করবো যুবক বয়সে অমন করেই থাকে । এর লাইগ্যা কি আর মন খারাপ করলে চলে?

মফিজ : হ্যাঁ কথাটা খারাপ কওনাই । তা তোমার কি ব্যাপার ।

রামদেব : চাচা তুমি জীবন ভইরা ন্যায় বিচার করতে করতে এহন বুড়া হইছ । আর আমার দিন ও ঘনাই আইছে । শুধু ভাবী নাতিনডার লাইগ্যা । এর কি অইব । হরি চেয়ারম্যান, আমাগো বাড়ীডা তার নামে লেখাইয়া নিলো জরীপে এর বিচার কইরা দিবা না ।.....

মফিজ : ঠিক আছে দেহুম নে ।

রামদেব : তোমার কাছে কথা কইয়া শান্তি পাই । বর্গা জমির ফসলডা নস্ট হইয়া গের । কি খাইয়া বাচুম । আর চ্যারম্যানের গমতো ছেনু বেপারীর লাইগ্যা পাইখার লাইগা ।

মফিজ : ১০শের ধান নিয়া যাও । নাতীর ইয়া খাও গে । আহো অন্তমহলে, আহো ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(প্রবেশ)

রাণী : আরে এই দিগে দুগা এই দিগে বেশী লুকনা পাতা পইরা রইছে— বাকী ভইরা লই । দাদু আইতে দেরী অইব—পুইরা লই । (পাতা কুড়াইতে থাকে)

প্রবেশ লাটু : কেডারে রাণী— আইজকে তোরে সুন্দর লাগত্যাছেরে । ভারী সুন্দর লাগত্যাছে । (রাণীর কড়া দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ)

লাটু : (পুনরায়) তোরে দাদুরে অনেক দিন ধইরা দেহিনারে রাণী বাইড়তে আছে নিরে ।

রাণী : দাদু বাইড়তে নাইকা । কি দরকার আপনে গো

লাটু : দরকার আছেরে অনেক দরকার । আমি তগো কত ভালবাসি । তাইত নইলে কি আর সময়ে অসময়ে খোজ নেই ।

রাণী : খোজ নে আর কাম কি— তোমাগো গম তোমরাই খাও আমাগো দরকার কি । যাও কইথনে আইছ হেইখানে যাও— দাদু বাইডতে নাই— আমার কাম আছে) (কুড়াইতে থাকে)

লাটু : অমন করছ কেন্ রে রাণী তোরে ভালবাসি বইল্যাই তো আসি
নইলে....(কাছে যায়)

রাণী : দূর হয়ে যা শয়তান। আমি লোক ডাকব জুতার বাড়ি খাওয়াইয়া ছাড়ব।

লাটু : তবে রে হারামজাদী আমার নাম লাটু না খাইয়া ছাড়িলে।

রাণী : থু থু নিক্ষেপ (সরিয়া গিয়া)

(চিৎকার) কে আছ শয়তান ডা আমার ইজ্জত কাড়তে চায়। রক্ষা কর ভগবান
(কাঁপতে থাকে)

(প্রবেশ) : একপার্শ্বে দাড়িয়ে

মনির : ঐ তো ঐ দিকে মেয়ে কণ্ঠস্বরে। যাইয়া দেখিনা কি অইলে। এইত এই
দেকা যায়। এই শয়তান লাটু। (কাছাকাছি এসে)। কি তোমাদের কি হলো

রাণী : বাবু এই শয়তান ডা আমার.....।

মনির : তোমার কি.....খুলে বল।

রাণী : দাদু বাইড়তে নাইকো। বাবু আমরা গরীব আমাগো কেউ নাইকা
বলে.....।

মনির : হয়েছে আস্তে বল, শুন.....।

রাণী : আমার....আমি কইতে পারুম না বাবু.... (কাঁদিয়া ফেলে)

মনির : উত্তেজিত হয়ে.....বুঝেছি। তা আপনার এখানে কি প্রয়োজন লাটু
সাহেব।

লাটু : আপনার কাছে বলতে হবে নাকি। আপনি আবার কোথাকার মাদব্বর
আমার বিচার করতে আইছেন। আমার নাম লাটু.....(কাপড় ঝাড়ামারে)

মনির : আমি যে কেউ হতে পারি। কিন্তু আমি জানতে চাই মেয়েডার সাথে
আপনার কি সম্পর্ক।

লাটু : আরে ঐ ঐ তো আমার ভাতিজী দেখতে আইছিলুম। বুঝলেন?

মনির : আপনি কথা ডা পাল্টাইয়া নিয়াছেন। তবুও বলছি শুনুন, এর পরে আপনি
কোন দিন এ বাড়ীতে আসবেন না। আপনাকে চেনার বাকী নেই আমার।
আপনার মনে এক রঙ আর মুখে আর এক রঙ।

লাটু : আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করত্যাছেন।

মনির : যান বলছি এখান থেকে নাইলে

লাটু : নইলে কি করবেন।

মনির : মুখে বলব না, কাজে দেখিয়ে দিব যে কি করতে চাই। (ঘৃষি মারিতে
উদ্যোগ)

লাটু : হুঁ আমার নাম লাটু- আমি ও দেখিয়া দিব আপনি কত বড় পাহলো যান ।
হুঁ

(দ্রুত বেগে প্রস্থান)

রাণী : বাবু.....

মণির : সত্যিকরে বলো তো ঐ লোকটা তোমার কি হয় ।

রাণী : আমার কেউ না- লোকটা প্রায়ই মিথ্যে মিথ্যে দাদুর খোঁজ নিতে আসে আর আমার ইজ্জতের ভয় দেখায় । আজ আপনি সময়মত ইইছেন ভগবানের ইচ্ছায়- নইরে যে কি অইত ভগবানই জানেন । ভগবান বাবুর মঙ্গল করুক (হাত উঁচু করে নমস্কার)

মণির : তুমি ও তোমাদের মত নিপীড়িতারা দোয়া কর যে, ভগবান এই দুটি হাত ন্যায়ের জন্যে সত্যের জন্যে আরো শক্তিশালী করে । আচ্ছা আসি রাণী- খোদা হাফেজ ।

রাণী : মাথা নাড়াইয়া অস্ফুট স্বরে ও হাত উঁচু করে বিদায় দর্শকের দিকে চাহিয়া চমৎকার ব্যবহার ।

(ধীরে ধীর প্রস্থান)

প্রবেশ : হেড মাষ্টার ও হরিবল রায় [চেয়ারে বসবেন উভয়ে]

হরিবল রায় : (আসনে উপবিষ্ট হয়ে) আমার উপর কথা বলে এমন কে আছে । আমি যা সিদ্ধান্ত নেব বুঝেই নেব । ইঙ্কুলের ভারমন্দ আমারই হাতে আমি হলাম গিয়ে ইঙ্কুলের গার্জেন । মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি । যাও সব ।

হেড মাষ্টার : ও কথা বলছি না বাবু । বলছিলাম কি ফলস লিটা করে পরে যদি.....

হরিবল : বুঝতে পারছি ভয় পাচ্ছেন..... । আমি যা বলছি, শুনুন, আপনার চাকরীটা যাবে না । আমি যখন আছি বুঝলেন তো..... ।

হেড মাষ্টার : বুঝেছি বাবু । আর একটা কথা আজকাল কিছু ডান পিটে ছোকরা মফিজ মাদব্বের ছেলে মনিরকে নিয়া ইঙ্কুলের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করছে । সেই সাথে আছে সাংবাদিক সুবোধ । আমরা নাকি ইঙ্কুলে দ্বন্দ লাগিয়ে পড়াই না আর টেকা আত্ম সাতের পায়তারা করি ।

হরিবল : থামুন ‘কান্তির পো’ আর মফিজ মাদব্বের ছেলের সাহস বেড়ে গেছে । সমাজের মাথা সুক্ত হলাম আমরা । বেয়াদপ ছেরো কি করবে । যত্নসব ।

হেড মাষ্টার : (কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে) U.N.O এর সিগনে চারটা বাকী আছে। এখন কিয়ে করি। আবার সুবোধ যদি পোরে উঠায় নাহ কিছু বুঝতে পারত্যাছিনা। ও মেমবার সাব এসে গেছেন।

(প্রবেশ) আসসামালাইকুম।

পান্না : ওয়ালাইকুম ছেলাম। ভাল আছেন, মাষ্টার সাহেব।

হেড মাও : ভাল আছি। তা আপনি কি মনে করে।

পান্না : আইছিরাম আপনার কাছেই। ইঙ্কুলের নাকি একটা বিল আছে। রায় বাবু কইলেন আপনাকে নিয়া বিলটা করে আনতে। বলছিলাম কি। উপজেলা অফিসে আবার আমার হাত আছে কিনা তার মানসিক খুব একটা লাগবে না।

হেড মা : নানা আপনি কষ্ট পরবেন কেন। আমিই সব গুছিয়ে নেব।

পান্না : হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনি একজন বিষজ্ঞ হেড মাষ্টার। আপনার কি কোন কাজ অজানা আছে? আচ্ছা, সাহেব কত টেকার বিল?

হেড মাও : ১০ হাজার টেকার Development Bill.

পান্না : ঠিক আছে Project commettec তৈরী করতে হবে তো.....। আর শুন্তন ব্যাপারটা যেন বেশি দূর না গড়ায়। বুড়ো পাঁজি মানে ঐ মিলন কান্তি যেন জানতে না পারে। ওই অইলে ইঙ্কুল কমিটির জীবন সদস। পাঞ্জীটা তার ছেলে দিয়ে দিবে পত্রিকায়। সব গোলঠায় যাবে। যাক সব কৌশল তো আমার হাতেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা মাষ্টার উঠি। আগামীকাল রায় বাবুর- বাড়ী দেখা ইবেন-ওখানেই আমি থাকব।

হেড মাও : ঠিক আছে চলুন আমিও এইদিকে যাব। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রবেশ :

মনির : আমিও যে কোন উপায় দেখছি না। কি করতে পারি, লেখাপড়া শেষ করে এলাম অথচ কাম খুঁজে পাচ্ছি না, বাড়িতেও স্থান নাই। কি করি চাকরি পাইতে ঘুষ লাগে। অথচ এই দিকে কত অন্যায় অত্যাচার। গরীবের গম আত্মস্যাৎ করছে চেয়ারম্যান মেম্বার। অকালে মানুষ ধুকে ধুকে মরছে। ঋণের নামে বিদেশী সংস্থাগুলোর কর্মচারীর অবৈধ উপার্জন করছে। আর ঋণের ভারে মধ্যবিত্ত কৃষককুল জর্জরিত হচ্ছে। ইস্ এমন অবস্থা আর সহ্য হয় না। দেশবাসীকে এ অবস্থা থেকে বাচাইতে হইবে। এ কি তুমি?

রাণী : বাবু তুমি মহান দয়ালু। দাদুকে রক্ষা করুন। দাদু আজ দু'দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বাবু দাদু বাঁচবে না।

মনির : কেন কি হয়েছে তোমার দাদুর।

রীনা : দাদু আজ তিন দিন না খেয়ে। কি করব। ঘরে চাল নেই, ডাল নেই। বাবু
..... তাই বাবু।

মনির : আচ্ছা চলো দেখি তোমাদের বাড়ি। চল

রীনা : বা.....বু

মনির : এসো এসো

(লাটু ও পান্নুর প্রবেশ)

পান্নু : কিরে লাটু পরিবার পরিকল্পনা অফিসে মায়াগো লাইগেশন করাইতে যায়।
মলাই মাকে কাল দেখছিলিরে বেশ সুন্দর লাগছিল। একেবারে তাজা রসাল
কমলার মত।

লাটু : মায়ের কাছে আমার বাড়ির গল্প। মলাই মা তো আমার রেগুলার মক্কেল।
সময়ে অসময়ে মলাইয়ের মতো চুষে চুষে খাই। আমার তৃষ্ণা মেটাই। বাধা শুধু
বুড়ো জামাইটা, বেচারি ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। দেখলে কেমন মায়া হয়। আচ্ছা
বল দোষ কি আমার। ইম সোহাগ করি টেকা দেই, আলতা, বড়াউজ,
পেটিকোট।

পান্নু : থামরে থাম, আমি কম দেই নাইকা, ও কথা কইসনে, যা খোস গল্প করে
একেবারে পরানডা কাইর্যা নেয়। ধ্যাৎ শালা ইদানিং তার মক্কেল বেড়ে গ্যাছে।
শুনছি পরিকল্পনার অফিসের কোন অফিসার জানি তার দেহের প্রেমে পড়েছে। তা
পড়বই না কেন? মলাইয়ে মিষ্টি যোগ করে যখন কারো মুখে দেয় তো কে না খায়
বল। আর কি তামাশাই না মলাই করে।

লাটু : রাখ তোমর পরিকল্পনা অফিসার। আমাদের উপজেলায় থাকলে ওসব
বদমায়েশী চলবে না। প্রয়োজনে মানহানী কেইস করে দেব।

পান্নু : আর তুমি শালা কি কর। মানহানি কর না রসগোলড়া খাও? কী ফ্যাল
ফ্যাল করে অমন তাকিয়ে আছো যে?

লাটু : যা বেটা ওসব বুঝি না। আমার কাছ থেকে কেউ ছিয়ে নেবে মল্ আর
আমি শুন্য বাসন হাতে বসে থাকব এ হবে না। আমার নাম লাটু।
লাঠির আঘাতে আঘাতে পরিকল্পনা সাবের মাথা ভেঙ্গে ফিনকি রক্ত বের
করে তবে ছাড়ব।

পান্নু : আর মাতা বাঙ্গার কাজ নেই। বিড়ি দে। মাথা ঠান্ডা কর। (দু'জনেই বিড়ি
ধরায়)

(প্রবেশ)

হেনু মিয়া : কেডা আরে এসে দেখবার লাগছি পান্নু ভাই। লাটু মেয়াও তো আছে দেহি।

পান্নু : হ চাচা আমরা। আমরা কে জায়গায় যাব বলে বলা বলি করছিলাম। আজ কাল রাস্তার গম উঠানোর ব্রাপারে খুব ব্যস্ত থাকি কিনা। তা আপনার কি ব্যাপার।

হেনু : চাচা, তোমাগো আজ দুই দিন ধইরা খুজতাছি একটা কথা বলুম বইল্যা। ছোট খাট ব্যাপার মেয়ারা রায় বাবুর কাছে যাইয়া লাভ নাই। তাছাড়া তোমাগো দ্বারা তো জীবন ভইরাই উপকার পাইয়া আইত্যাছি। গম ডা আইলেইতো আমাগো আগে দেও। তোমাগো প্রশংসা মানুষের সাথে কই। আচ্ছা কি কও উচিৎ কইলাম নি।

পান্নু : হ চাচা ঠিকই তো কইছ। আমাগো ব্যাপার যদি আমরা ফয়সালা করবার পারি থয় আর পানা বাজনা কইরা লাভ কি? কি কইলে লাটু।

লাটু : আরে তাই। আচ্ছা চাচা কি তোমার কথা খুইল্যা কও।

হেনু : শোন থ কথা অইলে আমাগো ছোট্ট মাইয়ারা ইঙ্কুলে যায়। থয় ও পাড়ার ঝোলা গো ছোরারা মাইয়াডারে রাস্তাঘাটে উৎপাত কর। মাইয়াডা আমার শরমে এখন থোরি ঝুলে যাইবার চায় না। আচ্ছা কও ঝোলা গো সমাজকে আমরা কৃষাণ কুল কোন দিন পাতে লইছি নি। তাগো আবার বাহাদুরী কইথনে আইছে। তোমাগো উপরে ভার যদি পার তয় ঝোলাগো পোলাদের শামালাও নইলে কেইস কইরা দিমু কইলাম্

লাটু : না কাকা কেইস করবার লাগবো না তোমাগো মাইয়া আর আমাগো মাইয়া তফাৎ কি? হাঁ দেখনা কেমন বিচার করি। একেবারে ঝোলাগো এইখান থনে তাড়াইয়া দিমু না। কইছি কি নইলে আমার নাম লাটু মিয়া।

পান্নু : তোমাগো মাইয়ার কাছে একবার যাইবার লাগছিল। ছোকরাদের নাম গুলি দরকার। কি কও লাটু।

হেনু : থয় খুবই ভাল অয়। চল যাই আমাগো গরীবের বাইড়তে। পান থামাক আর কি। তোমারা অইলে খান্দানী গেরস্থের ছেলে। তোমাগো বাপ দাদার কি নাম ছিল? খান্দু কৃষাণের নাম হুনলে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খাইত বিয়াশাদরি কথা অইলে আমরা তোমাগো বাপ দাদার কথাই কইতাম।

আহা কথায় আছে কি নুন খাই যার গুণ গাই তার । আহো চাচারা—

পান্ন : আয়রে লাটু আয় যাই ।

চাচাগো বাইড়তে (সকলের প্রস্থান)

(রামদেব ওপরে মনির প্রবেশ)

রামদেব : কাম করতে করতে এহন আর খাড়াইতে পারি না । ইস কোমরে ব্যথা পাইতাছি । গত বৎসর ঘরের ভাত হইছিল আর এইবার ভগবানই জানে । উহ বথাডা বাইড়্যা গ্যাছে ।

মনির : দাদু ও দাদু কি করত্যাছ । হুন্ছ নি ও দাদু

রামদেব : রাম রাম বাবু আপনে এইহানে কি মনেকইব্যা (কাছা কাছি আসবে ও দেখবে)

মনির : দাদু আমায় বাবু বইল ন দাদু । বলো ভাই ইস শরীর ডা শুকাইয়া গ্যাছে । আজ কত দিন অইলে তোমায় দেখি না দাদু ।

রামদেব : তুমি ছাড়া আমাগো দেহনের এখন আর কেডা আছে বাই আর যারা দেখবার ছিল হেগো থুইল্যা নিছে ভগবান ।

মনির : কি অইলে দাদু খুইল্যা বর ।

রামদেব : কি আর অইব । গত বছর ফসল অইলে না রাণীর মায়ে মইরা গেলে তারে পুড়াইতে সমাজ রক্ষা করতে কত পয়সা খরচা অইলে এখন ক্ষুদের টেকা দিয়া আর কুলাইতে পারি না ।

মনির : কার কাছ থনে টেকা আনছিল। দেহি কইয়া মাফ করাইতে পারুম কিনা ।

রামদেব : আনছিলুম পইথার কাছথনে । কি করি ভাই ।

মনির : বল কি পইথা, আরে পইথা তো তোমার থনে গরীব । ওডা আবার টেকা দিব কইথনে—

রামদেব : বুঝ বা না ভাই বুঝ বা না । এডডা অইলে হরি বেপারীর পোলিসি । নিজের নাম গোপন রাইখ্যা পইথাগণে টেকা সুদ দেঅ । তার নাম ভাঙ্গলে মানুষ খারাপ কইব । সুদখোর কইব এইডার লাইগ্যা ।

বুঝলানি ভই—

মনির : ও বুঝছি তাই কও দাদু । কোথাকার জল কোথা গিয়ে গড়ায় । (উপরের দিকে অন্য মনস্ক হয়ে)

রামদেব : কইওনা ভাই আমার নাম থয় আমাকে যে এক ঘরে কইরা দিবু । পূজা করতে দিবু না আচ্ছা তাই গরুডারে ঘাস দিতে অইব ।

মনির : ঠিক আছে দাদু ঠিক আছে। আমি তোমার কথা কারো কাছে কইব না-
রামদেব : আহি দাদু ভাই আমাগো বাড়ী সময় অইলে যাইও-
(প্রস্থানধীর পদে)

মনির : (একা একা) সেই সামন্তবাদী প্রথা, সুদের ব্যবসা আজও চলছে- নূতন
ধাচে, নূতন স্টাইলে, অর্ন্তদ্বন্দ্বে আজও মানুষ গুমরে মরছে এক ঘরে
হওয়ার ভয়ে। এখনও মাথায় উপর লাঠি ঘুড়ায় সমাজপতি গগ্যান্য
নামধারী জমি দার রা। আর তা লাঠি দিয়ে নয়, মাথার পুলিশি দিয়া,
ব্রেইন দিয়া।

(প্রবেশ)

সুবোধ : আরে আরে এষে দেকছি মনির। তা একানে তুই কি করছিস। দাড়ায়ে
দাড়ায়ে কি ভাবছিস।

মনির : বল, বল দোস্ত, এ তুমের আগুনের মত অত্যাচারে আর চলতে দেয়া যায়
না- যায় না কোন মতেই।

সুবোধ : কি চতে দেয়া যায় না খুলে বল দোস্ত। আমি তো কিছুই বুঝতে পারত্রাছি
না।

মনির : দেখ এই সমাজ ডার দিকে। রাঘব বোয়ালরা দিন দিন বড় হচ্ছে
সম্পদের পাহাড় গড়ছে না কায়দায় কৌশলে। শোষণ নিপীড়নে গরিবি-
দুঃখীদের পাজরের হাড় ভেঙ্গে চুমার করে দিচ্ছে। আম সহ্য করতে
পারি না। সুবোধ এদের দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি না। ছাত্র জীবন
শুধু পড়াশুনা করেই কাটিয়েছি। সাধারণ মানুষের সাথে ঘেষতে দিত না
বাবা বতো এরা চোট লোক এদের সাথে মিশলে জীবন বাদ হইয়া
যাইবে। মানুষ হও। আজ দেখছি মানুষ হয়েছি ঠিকই মানুষ জন্মে
দেয়ার অধিকার নেই। যারা সমাজপতি সুদ খোর ব্যবাসায়ী ভন্ড পুলিশি
বাজ তারাই সমাজের বিচারক। এর কি কোন শেষ নেই সুবোধ?

সুবোধ : আমিও বড় বিপদে আছিরাে দোস্ত। বাবা যাবার সময় সে শপথ করিয়ে
গেলেন জীবন গেলেও আমাকে তাই করে যেহে হবে। মানুষের কতা,
সমাজের দুর্নীতি, পাচাটা পত্রিকা গুলোর সমালোচনা এসব আমাকে
করেই যেতে হবে। আজ দেখ আমার শুত্র সমাজপতি বা ভয় দেখায়।
বাড়ী হতে বেরুবার আগে চিন্তা করতে হয় কোন রাস্তা নিরাপদ।

মনির : আমিও ভাবছি এখন কি করি ।

সুবোধ : চল আমরা একটা কাজ কির না কেন । আমরা নিষ্পেশিত সাধারণ মানুষদের নিয়ে সংগঠন করি । সুশৃঙ্খল উপায়ে তাদের বুঝিয়ে দেই ‘আজ আমাদের প্রয়োজন ধন কুবেরদের বিরুদ্ধে অগ্নি মিছিল বের করা ।’ তাতে ঘণ্য পশুদের পতন আসবেই ।

মনির : ঠিক আছে এসো দোস্ত তাই করি । আজ থেকে আমরা দুই বন্ধু ি অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম মানুষের আত্মচেতনা জাগাইতে আমরা বদ্ধ পরিকর । আমরা জীবন বাজী রাখব অন্যায়ের বিরুদ্ধে । সোনার স্বাধীন বাংলা সত্যিই সোনার দেশ হবে ।

(প্রস্থান)

(প্রবেশ)

হরিবল রায় : লাটু মিয়া , ব্যবস্থাপনা ঠিকমত হয়েছে কিনা পরখ কতো । আর শুন সবাইকে নেয়াতগে করা হয়েছে কিনা তাও দেখ । বিশেষ করে— চেয়ারম্যানগণ , উপজেলা অফিসার বর্গ এবং বন্ধু বর মফিজ থাকে ।

(প্রবেশ)

লাটু : জী মশায় , সবাইকে নেমতন্ন করার ব্যবস্থা করেছি এখনি হয়ত সবাই আসবেন । আরে ঐ যে , মফিজ খাঁ এসে গেছেন ।

হরিবল : তাই নাকি । ও তাইত Welcome Welcome বন্ধু । হ্যাঁ , হ্যাঁ , হ্যাঁ । এসো এসো ভিতরে এসো ।

মফিজ : ভাল আছ তো তোমরা ।

হরিবল : ভাল থাকব না মানে? আজ আমার ছেলের জন্ম দিন । এই কে আছিস সুরেন কে আসতে বল । তার চাচার পদধূলী নিয়ে যাক ।

মফিজ : আসছি যখন থয় তাড়া ছড়োর কি আছে বসো বসো , ব্যস্ত হলো না বসো খোশ গল্প করি ।

(একটু পরেই সুবেনের প্রবেশ ছালাম প্রদান)

হরিবল : বাবা নে পদধূলি নে , ছালাম কর ।

মফিজ : নানা ঠিক আছে , আশীবাদ করি , বড় হও বাবা তোমারাই তো একদিন হবে দেশের কর্ণধার আমরা বড়ো আজ । হয়ত চলেই যামু ।

হরিবল : ওরকম লক্ষ্মী ছেলে আর হয় না রে মজি যা বলি তাই শুনে, আমার দোকান জমি বাড়ী সব কিছুই বিচক্ষণতার সাথে ও দেখাশুনা করে। কন্ট্রাকটরী করে প্রচুর টুই টুন্সর কামায় ভগবান কে শুকরিয়া অমর ছেলে কয়জনের হয়।

মফিজ : ভাল, ভাল বহো বাবা বহো।

হরিবল : তা তোমার ছেলে কোথায় মফিজ। সুরেন আর তোমার ছেলে মনি তো এক সাথেই পড়ত। নিয় আসলে না যে।

মফিজ : ও কথা কইও না বন্ধু। ছেলে চীয়ে কি হয়ে গেল। আমার কোন কথাই সে আর শুনে না এখন যা ভাবে তাই করে বেড়ায়। সমাজে নাকি সে বিপ্লব আনতে চায় পুরনো জঞ্জাল সাফ করতে চায় ইত্যাদি।

হরিবল : ও তাই নাকি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি ঐ সাংবাদিকটার সাথী হয়েছে। সুরেন তুমি একটু ভিতরে যাও আমরা দু বন্ধুতে কথা কই।

মফিজ : সাংবাদিক? তা তুমি কি কইতে চাও।

হরিবল : বুঝলে না? এ হলো কান্তি দাসের পো।

মফিজ : শুনছি কান্তি নাকি মারা গ্যাছে। তার ছোরা আবার সাংবাদিক হয়েছে না কি। এক পাজি মরে আর এক পাজির জন্ম হলো যে।

হরিবল : ছেলেডা যেন গোখো সাপের বাচ্চা। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় ওকে ফন্দি আটাইয় জেলে পাঠিয়ে দেই। তুই কি বলছিস।

মফিজ : তারি সাথে আমার ছেলে? হয় রে পোড়া কপাল। মান ইজ্জত সবই গেল। অমন ছেলে গলা টিপে মারি না কেন? কি লাভ হলো লেখাপড়া শিখিয়ে। সে শত্রুর সাথে হাত মিলায় অমর ছেলের প্রয়োজন কি— আমি চাই না অমর ছেলে। (যেতে উদ্যত)

হরিবল : যাসনে মফিজ, যাসনে। এত পাগল হচ্ছিস কেন। যা করবার থয় আমিই করমু। তোকে কিছুই ভাবতে অইব না। তুই আমার আমি যখন এক তখন আর চিন্তা কিসের। দেখ আজকাল কিছু পিতামাতার অবাধ্য ছেলেরা ওসব করে বেড়ায়। তাদের কৌশলে হাত করে নিতে হয় বুঝলি। আর যদি আমাগো মুরকি হিসাবে মানতে না চায় প্রশাসন তো আচেই আমাদের জন্য। লাল দালানের ভাত খাইয়া আবার শান্ত ছেলের মত ঘরে ফিরে আসবে পিতার বাধ্য সন্তান হয়ে।

মফিজ : আমার কিছুই ভাল লাগছে নারে। আমি চলে যাই।

হরিবল : বলে কিরে পাগল। ছেলের জন্ম দিনে তোকে না খাইয়ে ছাড়ব তুই ভাবছিস। তাই না? চল ভিতরে দেখি খাওয়ার আয়োজন কত দূর।

(মনির, সুবোধ, তিনটি ছেলসহকারে প্রবেশ)

মনির : (দর্শক ও ছেলে তিনডার দিকে লক্ষ্য করে) : বন্ধুগণ আপনারা যাদের নেতৃত্বে আজ পরিচালিত হচ্ছে তারা ভদ্র জোছেহার ফাকিবাজ; আপনাদের জীবনে শান্তি আসুক করণ আসুক এ তারা চায় না তাই আজ তাদের সম্পদের পাহাড় দেখুন-আর-আপনারা দেখুন আপনাদের স্ত্রী কন্যার ক্ষুধার জ্বালা দেখুন অত্যাচার, দেখুন সুদখোর মহাজনের ফন্দি আটা চশমা। চিন্তা কর।

পিছন হইতে রব উঠে- অন্ন চাই, বাঁচতে চাই, অধিকার চাই.....ইত্যাদি।

কারো অনুগত না হয়ে কারো কাছে হাত না পেতে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন সংগঠিত হয়ে দুঃশাসনের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করুন। (দাদা-বাবু, আমার সর্বনাশ করতে আইছে- লাইটেয়া....আর্ত মেয়ে কণ্ঠ ও চিৎকার।

(প্রবেশ)

রামদেব : বাবু আমাগো রীনাকে কেডা জানি ধইর্যা নিতাছে। আমি করে বাচুম বাবু কি করে বাচুম হায়রে কপাল আমার নয়নের পুত্তলি আজ ধইরা নিল হরিবলের চেলারা- ভগবান আমি কি করব ভগবান।

মনির : আপনি অস্থির হবেন না দাদু অস্থির হবেন না। আমরা দেখছি। চল সুবোধ চল, এদরে ধরতে পারি কিনা- (প্রস্থান)

রামদেব : আমা তুইল্যা নও ভগবান আমায় তুইল্যা নেও আমি আর বাঁচতে চাই না- চোখের সমুখে নাতিন ডারে ধইর্যা নিল কিছু করবার পালাম না আহ আহ আহ (কান্না)

(ধীর পদে প্রস্থান)

(প্রবেশ)

সুরেন : বাবা গত রাতে কারো যেন ওপাড়ায় দাঙ্গা করেছ কি ব্যাপার নিয়ে। যাক এ মাসের ৫ তারিখ আমার বিদেশে যাবার ফ্লাইট হয়েছে। আজকেই হয়ত চলে যাব। স্বর্ণ সিঙ্গাপুর থেকে এনে ভারতে চালান। লাভ নিয় বাংলাদেশে ফেরত।

লাটু : চাচা ও চাচা বজ্জাতটাকে পুলিশে....

হরিবল : শোন শোন এ দিকে আয় (কানে কানে বলে দেয়)

লাটু : হ্যা, হ্যা, হ্যা সব ঠিক আছে চাচা। আর ঐ সাংবাদিকটা না আচ্চা করে দিয়েছি। পিঠনী একে বারে পাজরটা ভেঙ্গে ফেলেছি। বদমায়েমের দল এবার দেখ মজা..... (প্রস্থান)

ফেরিওয়াল্লা : পেপার রাখবে নি কেউ পোর পোর।

হরিবল : ও বেটা, দে দেখি পোর হ্যা তাইত দেখি 'দুর্বৃত্ত' দ্বারা মেয়ে অপহরণ সাংবাদিক প্রহৃত।

এঁয়া আবার কোন সময় লেইখ্যা ফেলল শাল কেউটে সাপ- সন্তসব।
(রাগ দাত কটমট)

হরিবল : চল সুরেন চর।

সুরেন : চল ববাবা, বাড়ী চল। (প্রস্থান)

(প্রবেশ)

পাল্লু : এইবার খেলা দেকা যাইব রে।

লাটু : জমিয়া উঠ উঠছেরে ভারী মজার খেলা।

পাল্লু : ঐ শুন শুন....কানা কানি।

পাল্লু : পুলিশ আসত্যাছে.....দুঘন্টা পরেই

(প্রবেশ)

হরিবল : আরে তোমরা যে দেখছি এখানে তা কি খবর

পাল্লু ও লাটু : সব ঠিক আছে একটু পরেই আসত্যাছে পুলিশ।

(মনিবের প্রবেশ)

মনির : দেখুন আপনাদের অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি আর নয়। সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

রামদেবের নাতনী ফিরিয়ে দিন নইলে আপনার মত জোচ্ছোর- ফন্দিবাজ কে....

হরিবল : খামোশ আমার সামনে?

মনির : থামুন, তাদের মত শৃগাল কুকুরকে পিষিয়ে মারতে ইচ্ছে হয়।
(পুলিশের প্রবেশ)

পুলিশ : হ্যান্ডস আপ, মিঃ মনির ইউ আর আন্ডার পুলিশ কাষ্টুডি।

মনির : বেঈমানের বাচ্চারা, আমি চলে গেলেও হাজার হাজার মনির একদিন জন্ম নেবে-সেইদিন, সেইদিন তারা তোদের টুটি চেপে ধরবে-অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে।

হরিবল : যাও বাবা যাও। আবার ফিরে এসো। একটু দোষ করেছো তাই। নইলে অমন কণ্ঠে বেঁধে নিতো না।

(পুলিশের প্রস্থান)

লাটু : হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ-----

পান্নু : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ-----

হরিবল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ মজা কত ধানে কত চাল।

(একযোগে তিনজন হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ অউহাসি)

(রামদেবের প্রবেশ)

রামদেব : দাদু কই, দাদু ও দাদু-----

লাটু : তোমাগো আদরের জামাই পুলিশের বাইড়তে গ্যাছে----- একটু বসো আইবোনে-----হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

পান্নু : আমাগো সাথে বাহাদুরী!

হরিবল : কেডারে রামদেব নাকি-----

ওমদেব : ভগবান আমি কি করুম, যেখানেই খাড়াই পায়েও তলার মাটি তুলে নেও, আমি কোথায় যাব ভগবান, এ দুষ্ট সমাজে আমাগো আর দাঁড়াইবার জায়গা নাই। এক এক কইরা সবাইকে নিয়া গেলে----আমি কি নিয়া বাঁচুম আমি কই যামু ----ভগবান আহ্ আহ্ আ----হ্ (কান্নাজড়িত কণ্ঠে ধীরপদে প্রস্থান)

১০/০১/১৯৮৭ টিকরপুর নবাবগঞ্জ ঢাকা।

সামাজিক নাটক

বউ-শ্বশুরী / চরিত্র পরিচিতি

- ১। আইজউদ্দিন-----মফিজের বাবা
- ২। মফিজ-----আইজ উদ্দিনের ছেলে
- ৩। শিরিন-----মফিজের বউ
- ৪। খাদিজা-----আইজউদ্দিনের স্ত্রী
- ৫। মনির-----মফিজের ছেলে
- ৬। ফালু-----চাকর/কমিডিয়ান
- ৭। প্রবেশন অফিসার
- ৮। স্ক্যাপ কর্মী/সক
- ৯। পুলিশ
- ১০। ফেরিওয়ালা
- ১১। সমীর মাষ্টার
- ১২। রইছউদ্দিন ফকির

নাটক-বউ-শ্বশুরী

(প্রথম দৃশ্য)

ফেরিওয়ালা : কই, কই, পোলাপুড়ি, পোলাপুড়ি কই খাইলে

আইস, দাদার লাঠি, চিড়ার মোয়া আরও বাদামী, কই গো
পুড়ি

পোলাপুড়ি কই।

মনির : দাদা ও দাদা আইও না আইও-দেহ দাদার লাঠি
আমি খাইয়াম, আমাওে কিন্যা দেও (দাদাকে টানতে টানতে
মঞ্চে নিয়ে আসবে ছোট মনির)

আইজউদ্দিন : এই বেড়া, তুমি কি আনছ দেহাও দেহাও
নাতিডারে নিয়া আর ফারলাম না দেও দেহি কি আনছ।

ফেরিওয়ালা : এই দাদার লাঠি, চিড়ার মোয়া আর এই
বাদামী, খাবে নাকি। মনির খুব মজা নাও খাও।
(মনির হাতে লয়ে দাদাকে দেখাবে এবং খাওয়ার কথা
বলবে)।

আইজউদ্দিন : দাম কত, এই বেড়া দাদার লাঠির দাম
কত, কও।

ফেরিওয়ালা : দুই টেহা একটার দাম, দুই টেহা, তিনডা
নিলে পাঁচ টেহা।

আইজউদ্দিন : দেও তিনডাই দেও, নেও টেহা
(ফেরিওয়ালার নিকট ৫ টাকা গুঁজে দিবে) রাখবেন
দাদার লাঠি, চিড়ার মোয়া, বাদামী (ফেরিওয়ালার
ডাকতে ডাকতে প্রস্থান) চল, আইও দাদা আইও
উড়ি যাই (নাতীকে হাতে ধরে প্রস্থানের উদ্যোগ)

শিরিন : (কলসি কাঁখে কোমর গুঁজে দ্রুত মঞ্চে প্রবেশ)
(শ্বশুরকে লক্ষ্য করে)

আদর দেআ, দেআ ছেড়াডারে মাথায় তুলছো, ডাক্তরে না হরছে
এইতা কাইবার লাইগ্যা, আরও বেশি হইরা কিইন্যা কাওয়ায়!
(কলসি জোও মাটিতে রেখে দাদার লাঠি মনিরের হাত থেকে

ছুঁড়ে ফেলে দিবে । মনির কাঁদতে থাকবে ।)

আইজউদ্দিন : কিগো বউ এইডা কি করলা ।

ভালা হরছি, দরদ দেহাইতো আইছে (মনিরকে টেনে নিয়েযায়)
(প্রস্থান) ।

আইজউদ্দিন : মাইনষে কয় না, ভালা মাছের ফানি ভালা
কাফরের কানি । (ফ্যাল ফ্যাল কণ্ঠে চেয়ে থাকে) (প্রবেশ) ।
ফালু : শাহজী, কই শাহজী আছুইন । ছগিরেয়ার গুরু কেতে
লাগাইয়া দেআ কারইয়া রইছে । মনে হরছে আমি দেকছি না ।
আমারে দেইকা টান মারছে । ছগিরেয়ারে গুরু শুদ্ধা দৌড়াইয়া
দিঘিনালা ফার হইরা থইয়া আইছি । আমারে অহনঅ ছিনছে না
হালার পুতে ।

আইজউদ্দিন : আওে কি অইছে একটু ভালা হইরা কঅ হনি ।

ফালু : অক্কাবাবে বাইরাইয়া ফুড়াইয়া ফালছি ।

আইজউদ্দিন : কোন্ আকাম জানি কইরা আইছছ হারামজাদা

ফালু : কেরে আমার কেত কাওয়াইলু হে ।

আইজউদ্দিন : আর রা হরিছ না সয়তান । এল্লা বাইতযা (রাগে
কটমট করে)

প্রস্থান পেছনে পেছনে ফালু চলে যাবে ।

প্রবেশ :

খাদিজা : ইস্ কাতের ব্যথায় লড়তাম ফারি না-তেও আমারই
কাম করন লাগে । আগের হেই যোআনহি নাই । হেই সময় কাম
করতে শইল্লো লাগছে না । বাড়িঘর ধবধবা হইরা
রাকতাম । অহন আর ফারি না, ইন্নাড়িঘর ছাতা ফইরা
রইছে ।

(প্রবেশ)

শিরিন : কি কতা কইতাছুইন আম্মাজান ।

না কি কইয়াম । বও খাড়াও,তোমার লগে আমার দুইহান
কতা আছে ।

শিরিন : কি কতা?

খাদিজা : তুমি বলে মইনার আততে কাউন ফালাইয়া
তোমার হউরের হমনে অইতে লাড়া মাইরা টাইন্যা লইয়া
গেছ । হউরের লগে মাইনষে এইতা হও জেরে ।

শিরিন : কি অইছে এর লাগি ! ভালা কাম করলেও আমার দোষ
না করলেও আমার দোষ । বিয়ার ফর থাইকা দেকত্যাছি এই
বাড়ির কেউ আমারে ভালা চোহে দেহে না ।

খাদিজা : অইছে বুঝছি । তোমার কতা মাডিতে ফরে না । আমার
দেষই দেহব । বুইড়া মানুষে দাম নাই । তোমরার লগে কতা কইয়া
ফারতাম না । ইমার ফুতের কফালই খারাব না অইলে অমন বউ
ঘেও আনছে যে হউর হউরি মাইন্যা চলে না

শিরিন : আযওক আইজ্যা মইন্যার বাপ জিগাইয়া দেহি অয়
আমাওে রাকব না অইলে ছাইড়া দিবো আমি হের ঘর আর
করতাম না ।

খাদিজা : কফালের মধ্যে মনডা কয় মুইড়া হাছুন দেআ
বাইড়াইতাম । ফুথ ফেডে লইয়া বড় হরছি অহন ফরের বাড়িরর
ছেড়ি কাডা ঘায়ে নুনের ছিডা দেয় । আল্লাহ তুই বিহার হরিছ ।

(প্রস্থান)

শিরিন : হ আমি ত ফরের বাড়ির ছেড়ি আমাওে কইতে মজা
লাগে । আল্লাহ তরে দেহে না---এর বিহারও আল্লাহ হরবো--- ।

মফিজ : কিরে কি কইতাছস কি অইছে ।

শিরিন : কি আর অনব, আমাওে মন লইলে রাহ না অইলে
ছাইড়া দেও । আমি তর ঘর আর হরতাম না---(কাঁদতে থাকে)

শফিজ : আরে কি অইছে কইবে ত ।

শিরিনঃ তোমার মাওে গিয়া জিগাও, আমাওে জিগাইয়া কি
অইবো

মফিজ ঃ মায়া হির্যাবার কি হরল ।

শিরিন ঃ তোমার টেন কইয়া কি লাভ, তুমি তোমার মায়ের টান
টানবা ।

মফিজ ঃ কোসাইন্যা কতা বাদ দে । কি অইছে হেইডা ক ।

শিরিন ঃ হ' আমিত কোসাইন্যা কতাই কই । আমার কফালে এই
আছিল (আবার কাঁদতে থাকে) ।

মফিজ ঃ মায়া এই মায়া কি অইছে, কান্দাকাডি কের লাগি । মায়া
কই গেলা । মায়া বাইতে নাই, বুঝি মা তোমাওে গাইল্যাইছে ।
এহন কান্দন লাগত না ল-----যাই ঘওে আয় (হাত ধওে প্রস্থান) ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মফিজ : বা'জান, বা'জান কই বা'জান ।

আইজউদ্দিন : কিও মফিজ কিছু কইতাছস । ক' দেহি
উপ কি কইবে ।

মফিজ : সা-----জান-- । আমি কইড়ু-----

আইজউদ্দিন : যু-----কিতা ভাল হইরা ক' ।

মফিজ : তোমার ভাল না লাগলে আমরাও যুদা হইরা
দেও, হেইডাই ভাল, কইজা বিবাদেও দরহার নাই ।

আইজউদ্দিন : ও হেই কতা----ভালা মফিজ্যা ভাল
উউয়ের কতায় যুদা অইবার চাস্ হঅ । দুইন্যা থাহনের আর
দরহার নাই । আমাও আল্লায় যেবায় দিন নেয় হেই বায়
থাকতার বাম-----হেই রায় থাকতার বাম ।

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ধীর পদে প্রস্থান) ।

মফিজ : বা'জান বা'---জা---ন-----

প্রবেশ :

খাদিজা : কিরে ফুত তর বাপ কান্দে হেরে । কি কইছস তর
বা'জানরে । যুদা কইলে কা বউ লইয়া কা-----

এমন ফুত কেউ যেন ফেড়ে না লয়, ফেড়ে না লয় ।

মফিজ : মায়া-----

খাদিজা : আর আমাও ডাহিস না, না খাইয়া মইরা গেলেও
তর টেন আর তর বাফের অসুখ বিসুখ আর খাওনের কতা

কইতাম না ।

মফিজ : তোমার কাইজার লাগি আমার মাথা ঠিক আছিন না
মায়া ।

খাদিজা : নারে বাফ না আমারে বুঝাইছ না । বউয়ের লগে
সরলা হইরা লইছরে বাফ-যুদা কাইবে-কাঁ কিতা লাগবো
তর বউয়েরে কইছ আমি দিয়া দেম নে, বাফ আমি দিয়া দেমনে ।

আগে ফুনতাম মাইনষে শিলুক কয়, দিনরে দিন ডাইকা ডুইকা
ঘর লঅ, আমার ফুত ঘরে যাউক । হেই বেডিরে ফুতে ফালছিল
জঙ্গলে----পুতরে ফুত আমারে, আমারে ফাললে সায়রে,
সায়রে (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

মফিজ : মায়া-----মায়া-----প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রবেশ :

কালচান ফকির (পল্লীসুরে গান ধরবে)

ওরে-----ও

বুকের মানিক দাগা দিয়া গেলি চইল্যা দূরে,
সুখের পাখি উইড়্যা গেলো, ফাঁকি দিয়া মোরে ।

জীবন রথের সারথী নাই,
ফিরে মধ্য গগনে সূর্য চাই,
শ্রহণকালে জীবন মাঝে আসে আঁধার ঘুরে ।

শোকের পাথর বুকে লয়ে,
যাচ্ছি আমি জীবন বয়ে,
পরশ পাথর চাইছি বলে,
ফেললে কে গো ঈর্ষাকলে,
দক্ষীভূত হইয়া আমি কাঁদছি বসে অন্তঃপুরে ।

প্রবেশ :

সমীর মাষ্টার : কালচান ফকির না ! তোমার গান খুব মনে লাগে
আর একটা গান গাও ।

কালচান : মাষ্টার তোমার লগে একটা কথঅ কইতাম !

সমীর মাষ্টার : কও কালচান কি কইবা ।

কালচান : আমার দুই চোখ নাই, বাইটাল বয়েস । ছেড়িডারে
বেয়া দিলাম । হের সুখ নাই জামাইর বাড়ি । কামাই রুজি নাই । না
খাইয়া থাহন লাগে । মাষ্টার ছনছি সমাজ সেবা অফিসে প্রতিবন্ধি

ঐদি ব্যবস্থা কইরা দিতা ।

গমীর মাষ্টার ঃ আচ্ছা দেহি তোমার লাগি কি করা যায় । চেষ্টা কইরা দেহি । স্কুলের সময় অইছে অহন যাই । আবার আমার যাওন লাগবো সমাজ কল্যাণ সংস্থা স্ক্যাপ অফিসে দেহি তারা কি কয়

কালাচান দা গেলাম আসালামুআলাইকুম (প্রস্থান) ।

কালাচান ঃ ওয়ালাইকুম ছালাম । আমব যাইয়াম গা-একটু উত্তব ঙ্গাড়া যাওন লাগব ছেড়িডারে দেইখ্যা আসি ।

(প্রস্থান)

প্রবেশ ঃ (ফালু ও আইজউদ্দিন)

আইজউদ্দিন ঃ কিরে ফালু তুই এমন হেম্মে চাইয়া থাহস হেরে ।

বাজারতে সহাল সহাল আইয়া ফরবাম দুইটেহার চেপা লইয়া ।

একটু তাড়তাড়ি আইচ । হাইঞ্জা অইয়া যাইতেছে ।

ফালু ঃ হেই দেহ মফিজ ভায়া বুইতামারা বোয়াল মাছ কিনছে ।

আইজউদ্দিন ঃ এইতা দেইখ্যা কি অনব । এইতা দেহিস না ।

তরে যেডা কইছি হেইডা হুন । আমি চেপা মল যাইতাতম না মাইনষের যাতাযাতি । তুই গেআ দুইটেহার চেপা লইয়া আ' ।

আমি এইহানে খাড়ই ।

ফালু ঃ দেও টেহা দেও । আমি ভীড় ঠেইল্যা লইয়া আই । অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে (প্রস্থান) ।

(মফিজ মঞ্চে একটি মাছ নিয়া ঘোরাফেরা করবে । দুই তিন বার মঞ্চে মহড়া দিয়ে ফালুসহ চলে যাবে ।)

একটু পরেই(প্রবেশ)

ফালু ঃ চেপা কিনছি শাহাজী লও যাই গা ।

আইজউদ্দিন ঃ চেপা আনছস ।

ফালু ঃ আনছি লও যাই (দুজনের প্রস্থান)

(দুটো চেয়ার মধ্যে রাখা হবে)

প্রবেশ :

সমীর মাষ্টার : (চেয়ারে বসে) আমি আইসা বসে রইলাম ।
স্ক্যাপ কর্মী কই । কইলো দশটার সময় আইবো । আইত্যাছে না
কেন । আচ্ছা দেহি ফোন কনরা (মুঠোফোন কানে নিয়ে) আমি
সমীর মাষ্টার আপনে কই?ও আসতাছেন আসেন ।

আচ্ছা রাখি ।

প্রবেশ :

স্ক্যাপ কর্মী : আমার একটু দেরী হইয়া গেলো দুঃখিত ।

সমীর মাষ্টার : কি কের লাগি ডাকছেন বলেন । সবাই বইসা
রইছে আপনার কথা শুনবার জন্য ।

স্ক্যাপ কর্মী : (চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে) বলছি শুনুন আসসালামু
আলাইকুম সম্মানিত উপস্থিতি আমার পরিচয় আমি স্ক্যাপ সমাজ
কল্যাণ সংস্থার একজন কর্মী । আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে ।

বউ-শ্বাশুড়ী বান্ধব প্রজেক্ট । আপনারা শুনে হয়তো ভাবছেন-এ
আবার কি বলছি । শুনুন আপনাদেও গ্রামে সার্ভে করে আমরা
দেখেছি একানে তিন বছর আগে খানা ছিল ৫০টি, বর্তমানে
চারগুন বেড়ে হয়েছে ২০০টি তার কারণ কি? কারণ লোক সংখ্যা

-তা যেমন সত্য তেমনি সত্য যৌথ পরিবার ভেঙ্গে সিঙ্গেল
পরিবার গঠনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি । ইহা যেমন আমাদের
সুখ এনে দিয়েছে তেমনি দুঃখও বাড়িয়ে দিচ্ছে । সেটা কেমন

করে হয়েছে তাই বলছি, পারিবারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে
ঐক্যমতে পৌঁছতে না পেও এক সময় ঝগড়া বিবাদ লেগে যায় ।

ফলে একানুবর্তী পরিবার ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে সিঙ্গেল পরিবার
তৈরী হয় । এতে বিবাদ স্থায়ী হয় এবং জ্বালানী সহ অন্যান্য খাদ্য
উপকরণ বেশী লাগে । উহা মুখ্য বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে ছেলে

মেয়ে, মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, শ্বাশুড়ী-বউয়ের মধ্যে সম্পর্কেও
টানা পোড়েনসহ অনাবশ্যক মনোমালিন্য লেগেই থাকে। ইহার
বিষবাস্প ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে পরিবার থেকে সমাজে,
সমাজ থেকে গোটা এলাকায়, এলাকা থেকে সম্প্রসারিত হয়ে
গোটা জাতিতে। কারণ একটা অপরাধ বহু অপরাধের জন্ম দেয়।
সম্মানিত উপস্থিতি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ, এখন কথা
বলবেন হাতিছড়ি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সমীর মাস্টার
সাহেব।

সমীর মাস্টার : আসসালামু আলাইকুম-আপনারা শুনছেন।
ধৈর্য্য ধরে অত্যন্ত গুরুত্ববহ আবহমান কাল ধরে বাংলার ঐতিহ্য
রূপে লালিত একান্নবর্তী পরিবার এবং উহার রক্ষার বিষয়ে।
আপনারা আরও শুনছেন, কিভাবে এবং কেন পরিবার ভেঙ্গে
চুরমার হয়ে যায়। এই পরিবার ভাঙ্গা গড়ার ক্ষেত্রে সব চেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কওে বউ-শ্বাশুড়ী। বউ-শ্বাশুড়ী আন্তঃ
সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত
সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।
স্ক্র্যাপ কর্মী : চলুন।

সমীর মাস্টার : চলুন (উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রবেশ :

আইজউদ্দিন : ফালু কই গেলে রে ফালু এই ছেড়াডারে লইয়া
আমি আর ফারি না । যদি এইমে যাইতো যায় হেমমে । মাষ্টার
সাব কইছিল কি বলে কমিটি বানাইব বউ-শাশুড়ি কমিটি ।
আমারে কইছিল যাওনের লাগি আমি ত আর হো করতাম ফারলাম
নাড়বায় যাইয়াম এই ছেড়াডারে খুঁইজা পাই না-কই
রে ফালু ।

প্রবেশ :

ফালু : শাহজী ও শাহজী আমারে বাদশা কয় হের লগে যাতাযাতী
হইরা আমি ফারতাম না । ফরে উইরা দুইরা লাড়া মাইরাই
ফালাইয়া দিলাম ঠ্যাংগে কাউর মাইরা ফরে বুহের উফরে বইয়া
কইলাম কিরে তর লগে বইয়া কইনাহি ফারতাম না ।--অহন দেক
ঘা হা হা ।

আইজউদ্দিন : আর কতা কইছ না হারামজাদা । ডাহলে তরে ফাই
না-যেহানে মন কয় ঘুইরা বেড়াছ ।

উলু : কেরে কি অইছে ।

আইজউদ্দিন : হেই কতা তর টেন কওন লাগব---তুই যেডা কই
হেইডা করিছ । হুন গরুডারে বেড় থাইকা নিয়া বাড়ির সামনে
বিছরায় লাইড়া দিছ আর দুইফর বেলা ফানি খাওয়াইছ বুঝছ নি ।

উলু : হ' ববাছি শাহাজী ।

আইজউদ্দিন : আনতাজি কোনহানে যাইছ না হঈল আমি ঘেলাম ।

(প্রস্থান)

প্রবেশ :

খাদিজা : তর শাহাজী কইরে ফালু ।

ফালু : কি জানি কই গেছে কইতারতামনা । কইয়া গেছে কি বলে ,
বউ-হউরী কমুট করত গেছে । হউরী-বউ আর কাজ্জা-কাজ্জী
করতাতো না । চাহী তোমার লগে মইন্যার মা যে বায় কাইজ্জা
লাগে হেইতা আর ফার তো না । অক্করে ধইরা টিক কইরালব
দেইখ্য । তোমরা না কইয়া থাহ আর হেরা তজে নজে কায় । আর
ফারত না আমারে কয় হের কাম হইরা দিতাম । আমি তোমার
কাম তইয়া হের কাম করতাম যাইয়াম না-হি-যে দজ্জাল বেডি ।

খাদিজা : এইতা আর কইলে কি অনব এইডাই আমার কফাল না
অইলে আর বউয়ের গাইল খাওয়ান লাগে ।

উলু : চাহী ফেডের বুক লাগজে কিছু রানছ । কাইতাম না
(প্রস্থানের উদ্যোগ) ।

খাদিজা : হ' রানছি আয় ।

প্রবেশ :

মনির : দাদু ও দাদু ফেডের ক্ষুধা লাগছে, দুইলা ভাত দিবা ।

খাদিজা : কে ওে তর মা রানচে না ।

মনির : রান্নুক গা তোম ছাউন মজা লাগে, তোমার লগে খাইয়াম ।

খাদিজা : তর মা দেহলে কাইজ্যা হরব ।

মনির : কাইজ্যা হরতু না ভাত দেও, ফেডের বুহ লাগজে ।

খাদিজা : আয় দাদু বাই, মজা লাগজে যহন দুইলা কাইছ্ আয় ।

ফালু : হ' চাচীর ছাইন যে মজা লাগে, আ' যাই কাই 'গা ।

(তিনজনের প্রস্থান)

পুনঃপ্রবেশ :

মনির : ধনুক গুলিসহ মঞ্চে প্রবেশ করে দৌড়াতে দৌড়াতে বলবে
তাইরে নাইরে না, তাইরে নাইরে না ধনুক তাক করে বলবে ঐ
ডুফি ঐডুফি (মঞ্চে হাঁটবে আর ধনুক ছাড়বে) ।

প্রবেশ :

শিরিন : কাইয়া যা মইন্যা ।

মনির : আমি কাইছি দাদুরার ঘরঅ ।

শিরিন : কি কইলে, শয়তান বেড়ির ঘরে কাইছস তরে না,না
হরছি । আমার কত ছনছস না (বলেই হাতে, নাকে, মুখে মারবে
ও তাড়িয়ে দেবে পিছনে পিছনে মনিরের মাও চলে যাবে) ।

(মনিরের পুনঃপ্রবেশ : বিষন্ন মুখ । সন্ধ্যার দৃশ্য, হাঁটতে থাকবে
এমন সময়

তিনজন মুখোশধারী ঢুকে মনিরকে অচেতন করে নিয়ে যাবে) ।

(প্রবেশ : শিরিন ও মফিজ)

শিরিন : কিগো মনিরের বাফ রাইত-হ-অইয়া আইলো অহনঅ ত
মইন্যা আইলো না । ছেড়াডা কই একটু বাইর অইয়া দেহ ।

মফিজ : আচ্ছা দেহি ফাই নি । যাই উত্তব ফাড়ার মাডের ফাইল ।

(প্রস্থান)

শিরিন : সহাল তাইকা এই ফন্ত ছেড়াডার দেহা নাই । ছেড়াডা কই
নাই গ্যাছে আল্লাই জানে ।

মফিজ : সারা দুইন্যাই বিছরাইলাম, ফাইলাম না । অহন কি করি !
আমারও অহন ডরই হরত্যাছে ।

শিরিন : কি কইলা গো !! (কাঁদতে শুরু করবে)

প্রবেশ : ফালু---মফিজ বায়া ও মফিজ বায়া আমি হাইঞ্জা সময়

দেহলাম মনি বড় রাস্তার ধাওে খাড়া। এই সময় এইহানে দেহলাম একটা সাদা মডর গাড়ি খাড়ইয়া রইছে আর তিনডা বেডা। আমি বদনা লইয়া বইছি জঙ্গলে। হেইহান তাইকা দেহছি। ফানি করছ কইরা আইয়া আর মনিরওে দেহলাম না। বাবলাম কোনহানে বুজি লুহি দেআ রইছে। আমার মনে কয়----?

শিরিন : তর মনে কি কয়! দেহি ফালু ফালুরে- ক'দেহি।
(পাগলের মত মফিজকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়)। তুমি, তুমি কি কইবা! জানি তোমরা কিচু কইতা না! আমি মা আমার মন কইতাছে মনি আমার মনি আরাইয়া গ্যাছে। অহন আমার কি অনব কের লাগি ছেড়াডারে বহছিলাম। বহনের লাগি আইজ্জা আমার ছেড়া আরাইলাম।

মফিজ : কেরে বহছিলে কঅ! কঅ!!

শিরিন : বহছিলাম! কে রে হে' তোমার মায়ের ঘর গেআ বাত কাইছিন দেইক্যা আমি ছেড়াডাওে ধইরা বইক্যা মারছিলাম।
(কাঁদতে থাকবে)।

মফিজ : তুই কাইজার হনি। তর লাগি আউজ্জা এই কতিডা অইছে। এই ছেড়া রাগে বাইত্তে বাইর অইয়া রইছে আর মাইনষে ধইর্যা লইয়া গেছে। অহন রাস্তা গাট ভাল না।

ফালু : ভায়া কাইজ্যা হইরা কুন লাব নাই। আও যাই আরও বিছরাইয়া দেহি ফাই নি। বাবী কান্দুইন না জেন্ দেহি বিছরাইয়া ফাই নি। জাওফাইন গওে জাওফাইন। গওে গেআ আল্লা আল্লা করহাইন। আমরাও জাই। (তিন জনের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

প্রবেশ : (প্রবেশন অফিসার ও ওসি চেয়ারে বসা থাকবেন)

পুলিশ : স্যার, গতকাল রাত প্রায় ৩.৩০মিঃ পেট্রোল দল একটি মাইক্রোর অস্বাভাবিক গতি দেখে থামানো সিগন্যাল প্রদান করে মাইক্রোট্রির গতিরোধ করার চেষ্টা করলে একপর্যায়ে মাইক্রো ফেলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। মাইক্রোট্রির ভিতর অজ্ঞান অবস্থায় ছেলেটি পাওয়া যায়। সে থানা হাজতে অবস্থান করছে, স্যার।

প্রবেশন অফিসার : ঠিক আছে ছেলেটি নিয়ে আসুন, সাক্ষাৎকার নেব।

পুলিশ : জী, স্যার নিয়ে আসছি (প্রস্থান)।

পুলিশসহ মনিরের প্রবেশ : পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে এসে, ‘এই বাবু কাছে এসো’, মাথায় হাত বুলিয়ে, ‘আমি তোমার বন্ধু, আমাকে কি বলে জানো? প্রবেশন অফিসার’ আচ্ছা বাবু বলত দেখি তোমার নাম কি?

মনির, বলল

এসো এসো আমার পাশে বসো, আচ্ছা কিছু খেয়েছ কি?

মনির হাঁ সূচক জবাব দিলো।

আচ্ছা বলো এখানে কি করে এলে?

মনির কইল : জানি না। আমরা মারছিন হের ফরে বড় রাস্তার ধারে খাড়াইয়া আছলাম। তিনটা বেড়া আমাদের ধইরা কি ফুঙ্গাইছে হের ফরে কিছু জানি না।

প্র অ : আচ্ছা বাবা তোমার কি মা-বাবা আছে?

মনির : আছে। আব্বার নাম মফিজ।

প্র অ : আচ্ছা বাবা বাড়িটা কই বলতে পারবা?

মনির : চিনহিরচর ।

প্র অ : থানার নাম বলতে পারবে?

মনির : জানি না ।

প্র অ : আচ্ছা বাড়ির লগে কি আছে?

মনির : একটা স্কুল আছে ।

প্র অ : আচ্ছা তোমাও কে বেশি আদও করে?

মনির : দাদু । আম্মা খালি মারে ।

প্র অ : তোমাদেও স্কুলের মাষ্টারের নাম কি?

মনির : সমীর ম্‌ষ্টার ।

প্র অ : ঠিক আছে বাবা (পুলিশকে ইশারা মনির নিয়ে চলে
যাওয়ার জন্য) (পুলিশের মনিরসহ প্রস্থান)

প্র অ : ওসি সাহেব, ছেলেটির সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হল ।

ছেলেটি সঠিকভাবে তার ঠিকানা বলতে পারছে না । ছেলেটিকে
শিশু আইন ১৯৭৪ এর ৪৯/২ ধারা অনুযায়ী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র
টংগী গাজীপুরে পুলিশ স্কট দিয়ে প্রেরণের সদয় আদেশ দানের
জন্য বিজ্ঞ আদালত বরাবর আমি আবেদন জানাব । আইন
মোতাবেক শিশুটি কে আদালতে উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিন । বিজ্ঞ
আদালতেই বিষয়টির সুরাহা হবে । চলুন (উভয়ের প্রস্থান) ।

(নেপথ্যে কান্নার শব্দ)

(প্রবেশ)

মফিজ : অহন কান্দে । মারছিন যহন মনে আছিন না ।

হের লাইগ্যা আউজ্জআ ছেড়াডা(আঃ কান্না) ।

খাদিজা : কিরে মফিজ ফাইছস আমার নাতিডারে-----

মফিজ : না মায়া কইতে ফাইতাম ! ছেড়া কিআর আছে ! কোন দেশ থাইকা কোন দেশে গেছে । আল্লাহই ভালা জানে । নাকি আবার পোলাডারে কেউ মাই-----রা (আবার কান্না)

খাদিজা : বাজান কান্দিস না , একদিন না একদিন তর ফোলা ফাইবে , বাজান আল্লাহর রহম অইলে । বাজান অহন এল্যা দেক তর বউ কিহানি ফারে । আমার কাওন ত দেকতারে না আমি নাতিডারে কাওয়াই হেইডার দেকতারে না । আল্লায় তর বিছার হরব । আয় বাজান দুইলা কাইবে ।

মফিজ : না মায়া আমার ফেডের বুক নাই ।

খাদিজা : তুই মুহে কইলে অনব , মুক দেইখা বুঝি ফেডে বাত নাই ।

মফিজ : মায়া (কাঁদতে কাঁদতে উভয়ের প্রস্থান) ।

প্রবেশ :

ফালু : শাহজী ও শাহজী কই গেলা

আইজউদ্দন : কেরে ডাহস । কি অইছে । আমার মনডা কারাফ যাইতাছি ইমাম সাবের ধারে একটু দোয়ার লাগি নাতিডারে যাতে ফাই ।

ফালু : হেইডাত যাইবাই । হুন তোমারে একটু আগে ঐ ঐ যে কি জানি ক্যাড না ইসক্যাড আফিসার কুজজিলাইন ।

আইজউদ্দিন : জানি না ।

(স্ক্যাপ কর্মী নেপথ্যে ডাকবেন)

স্ক্যাপ কর্মী : আইজউদ্দিন ভাই আছেন , বাড়িতে আইজউদ্দিন ।

আইজউদ্দিন : কেডা ডাহি দেক না , যা ।

ফালু : দেকতাছি (উঁকিঝুঁকি মারে) ।

প্রবেশ :

স্ক্যাপ কর্মী : ও এইতো, আইজউদ্দিন চাচা আপনাকে খুঁজছিলাম, পেয়েও গেছি ভালই হল, আচ্ছা বলুন তো, আপনার নাকি নাতি হারিয়ে গেছে, সেটা কিভাবে।

আইজউদ্দিন : হেই কথা কইয়া আর কি অনব।

সক/স্ক্যাপ কর্মী : আমরা দেখি কিছু করতে পারি কি না।

আইজউদ্দিন : চাচা আমরা গরীব মানুষ।

স্ক্যাপ কর্মী : প্রয়োজন হলে পত্রিকায় দিয়ে সম্ভব সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নেব। আর আগে বলুন তো কিভাবে এটা হলো।

আইজউদ্দিন : আমি বাইত আছিলাম না, কেন্দ্রে আরাইছে কি কইয়াম।

ফালু : আমি জানি।

আইজউদ্দিন : তুই কি জানস হারামজাদা, বেশি কতা কয়।

স ক : আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কে বলতে পারবে।

আইজউদ্দিন : হেরা পারবো।

(খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা : মফিজ আর হের বউ হেরা ফারবো।

সক : আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ওনাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি, দেখছি এ রকম বিপর্যয়ের নেপথ্য কারণটি কি? আপনি ওনাদের ডেকে দিন। আমি কথা বলছি।

আইজউদ্দিন : এই ফালু হেরারে ডাক দে। কথা কউক। কিবায় কি অইছে, (স্ক্যাপ কর্মীকে লক্ষ্য করে) আমি একটু ইমাম সাবের ধার যাই।

সক : আচ্ছা ঠিক আছে যান।

আইজউদ্দিন : এই ফালু আয়।

ফালু : লও শাহজী।

ঘোমটা দিয়ে শিরিনের প্রবেশ) মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে ।
সক : আচ্ছা বলুন তো চাচী কিভাবে মনিরের হারানোর ঘটনাটি
ঘটল এবং কেন ঘটল ।

খাদিজা : বাবা আমি কিতা কইয়াম হেরটেন জিগাইন । হে
কইতার ব ক্যান নাতিডারে আরাইলাম(কাঁদবে) ।

সক : চাচী আপনি আরও কিছু জানেন?

খাদিজা : না বাবা আমি আর কিছু জানি না ।

সক : ঠিক আছে আপনি যান (খাদিজার প্রস্থান) । আচ্ছা বলুন
তো আপনার ছেলে কিভাবে হারিয়েছে (শিরিনকে লক্ষ্য করে) ।

শিরিন : ভাইজান হাঁছা অইল, আমার ছেড়া আমার লগে রাগ
কইরা বাইরইয়া গেছে (কাঁনা করবে)

সক : কাঁনা করবেন না । বলুন কেন রাগ করলো ।

শিরিন : আমি তারে মারছিলাম ।

সক : কেন মারছিলেন ।

শিরিন : হে তার দাদীর গর কাইছিন এর লাগি ।

সক : ও বুঝেছি দাদীর ঘরে খেয়েছে । তাতে কি হইল । ওটা তো
কোন ব্যাপার নয় । এ জন্য ছেলেকে মারা আপনার ঠিক হয় নাই ।

এটা আপনার ভুল । একি আপনি স্বীকার করেন?

শিরিন : অ' আমার বুল অইছে সীহার হরছি ।

সক : আচ্ছা ঠিক আছে যান আপনার স্বামীকে পাঠান ।

শিরিন : আচ্ছা---(প্রস্থান) ।

প্রবেশ :

মফিজ : আসসালামুআলাইকুম ।

সক : ওয়ালাইকুম ছালাম । আপনি কি মফিজ ভাই?

মফিজ : জে ।

সক : মনিরের হারানোর বিয়য়ে বলুন তো ।

মফিজ : কে রে কি হরবাইন?

সক : দেখি কি করা যায় । আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা নেয়া হবে । কিভাবে ছেরেটিকে পাওয়া যায় । এ জন্য তথ্য, ছবি ইত্যাদি । পত্রিকায় দেয়া, সমাজ সেবা অফিসে যোগাযোগ করা প্রভৃতি বিষয়ে নজর দেয়া হবে, যাক চলুন ।

মফিজ : আমার ছেড়া বাড়ির বাইরে যাইতো না । হেরা কাইজা কইরা ছেড়াডারে বাইততে বাইর হরছে ।

সক : তারা কারা ?

মফিজ : আমার বউ আর আমার মা ।

সক : আপনার মা আবার কি করল?

মফিজ : মায়ে কিছু হরছে না । মায়ের গরে কাইছিন । এর লাগি বউয়ে মারছিন । রাগে ছেড়া ফলাইছিন । এর ফরে লোডারে আর ফাইলাম না (কাঁদবে) ।

সক : ধৈর্য্য ধরুন । আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন । (প্রস্থান)
(রইছ ফকিরের প্রবেশ)

রইছ ফকির : হামি হইয়া হুকুম করে -----পুলিশ হইয়া ধরে ।
(গানটি শেষ করবে)

ফালু : ও ফহির শাহজী হুনছি মইন্যারে ফাওয়া গেছে । লইয়া আইতাছে লও যাই ।

রইছ ফকির : কেডা ফালু? তুই কইত্বে হুনছস ।

ফালু : আমি হুনছি শাহজী কইছে ।

রইছ ফকির : হাছাই?

ফালু : আইও দেহি ।

রইছ ফকির : রাহছ না । আস্তে আ, জানছ না আমি দেহি না ।

ফালু : আন্ধার গরে আন্ধা, আইও তাড়াতাড়ি । (প্রস্থান)

(সক/ক্ষ্যাপ কর্মীসহ মনিরের প্রবেশ)

মনির : আব্বা আব্বা, দাদা-দাদু কই, চাচা। (একযোগে সকলে মনি মনি চিৎকার করতে করতে প্রবেশ)

মনিরের মা মনিরকে ধরে চুমে দেবে আদর করতে থাকবে।

শিরিন : সোনা মানিক আমার, বুকে আয় বাবা।

মনির : তুমি আর দাদু কাইজা হরবা না, কও।

শিরিন : না বাবাআমি আর কাইজা হরব না। আর যুদাও কাইব না আল্লাহর শোকর বাবা তরে ফাইছি। অহন থেহে তর দাদু যে বায় চায় হইবায় ছলব। বাবা তুই আর রাগ হরিছ না বাবা।

খাদিজা : না মা দোষ সুদু তোমার না, দোষ আমারও আছে।

আইও মা অহনআমিও বুঝছি আর তুমিও বুঝছ আমরা মিল্যা যাই। অহন তেহে আমরা এককান কাইয়াম। আমার বাইয়েরে বুহে লইয়া সুহে তাকবাম।

প্রবেশ :

ফালু : (রইছউদ্দিন ফকিরের হাত ধরে)

শাহজী কই ও শাহজী ফহির শাহজীরে লইয়া আইছি। এঁয়া এইহান দেহি বেহই আছে।

রইছ ফকির : মনিরে ফাওয়া গেছেরে।

ফালু ঃ হ কেরে তুমি দেহ না, তুমি কইতে দেহবা তুমি ত আন্ধা ।
অহন আর রাও হইরো না, গান হর ।
রইছ ফকির ঃ সুহের দিন গানই মজা । তরাও লগে ধর ।
ফালু ঃ আমি দরতাম !
রইছ ফকির ঃ তুই ফারতে না । তর গলা বালা না । মনিরে আমার
ধার আন, হেরে লইয়া গাই । ফালু মনিরকে কাছে এনে দেবে ।
(যুগল কণ্ঠে গান---মিলন হবে কত দিনে-----

২৪/৪/২০০৯, কিশোরগঞ্জ সদর ।

গীতি আলেখ্য মে দিবস

হেইওরে, হেই হেইও
মারো জোরে হেইও
হেইওরে হেইও হেইও
হেইও, হেইও
ও মাঝি চরা হইল পার
গান ধরো এবার-----

ওরা স্বাধীণ, হস্ত চলে বেদম জানি,
উদর মোটা পেলে খুশি পাত্তা পানি।
ক্ষেত খামারে স্টলে কলে,
লাগে কামে মন মত চলে।
নিবিড় একাত্রে যাচ্ছে তারা আত্মদানি।
ছেঁড়া বসন অল্প চাওয়া, যুধিষ্ঠির,
শ্রম পিপাসু কর্মপাগল ঐ ভগ্ননীড়,
চোখে দেখে না চোখে অক্ষর সব,
সুখে শুনে অক্ষরের অটুহাসির রব,
কিসের ভয় কিসের, ও হুমায়ুন মানহানি।

মালা :

মাঝি, তরী ভীড়লো তীরে,
চালাও, চালাও হাল ধীরে,
নাড়াতে হবে বোঝা,
সিঁড়ি ফেলো সোজা,

ও বেপারী তালে তালে রাখছি তোমার ধন,
একটু ক্ষতি হইবো নাকো থাকতে মোরা, পণ ।

বেপারী :

জানি, জানি ও মাল্লাগণ জানি তোরা সাচ্ছা,
পেট পুরে খাইলে পরে, কামটি করো আচ্ছা ।

মাল্লা :

ও বেপারী ঠিক বলেছ ঠিক, নাড়া হলো শেষ,
বেপারী :

সাব্বাস মাল্লারা সাব্বাস, বেশ করেছে বেশ ।

এবার আসি আবার কালকি হবি নে রে দেখা,

মাল্লা :

এঁা বল কি গো উপুস থাকা, ভাগ্যে ছিল লেখা ।

(মাঝিরে লক্ষ্য করে)

ও মাঝি ভাই জানি নাকো তুমি দিবে মজুরি টেকা,

ও বেপারী যাক চলে যাক, সে দেখবে নাকি ঠেকা ।

বদের হাড়ি ওবেটা যে, জানি আগে থেকেই জানি,

লইলে না কেন্, আগাম তুমি, দোষ তোমারি মানি ।

ওদীপু ওছলিম ওকেষ্টা বলোনা হবে কি ঝি পুতের,

অনর্থকই খেটে গেলাম হয়, ভুতের বেগার ভুতের ।

মাঝি :

থামবি তোরা থামবি, ওবেটারা, ঝগড়া করিস বৃথা,

ওবেপারী নাও-মালিক, জনদরদী তোর মোর মিতা ।

এাল্লা :

কথা শুনছ, শুনছ কথা,

এঁা বুঝলে না যে ব্যথা ।

মাঝি :

ইচ্ছা না হয় করবি না কাম,
কামলার আকাল নাকি, দাম ।
বেটা বাড়িস যদি হবি ছাঁটাই,
কাম পাবি না, পাবি কই ঠাই ।

মাঝা :

না, না, না, না, শুনব না,
না, না, না, না, শুনব না,
না, মানবো না, শুনবো না,
মাঝির কথা শুনবো না, না,
কামের দামে ফাঁকি দিলে,
শ্রম-ন্যায্যতাকে ছুঁড়ে টিলে,
প্রভু-দালাল পার পাবি না,
তোরা কেউ আর যাবি না,
হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক,
অধিকার বুঝে নিক,
অধিকার বুঝে নিক । (ফিজ)

২৬/৪/২০০৯, কিশোরগঞ্জ সদর ।

গীতি নাট্য

শুভ নববর্ষ

ময়নার বাপ : (ধীরে ধীরে প্রবেশ)

ময়না কইরে, এই ময়না, ময়-নাহ্

কই তুই মেলায় গেলে আয় দেহি। ছেড়িডারে লইয়া আর ফারি
না। সহালে প্যাট প্যাট হরছে মেলায়, মেলায় যাইবো, অহন আর
চঁচাইয়াও দেহি না। কইরে ময়না আয় দেহি।

প্রবেশ :

ময়না :

বাজান ও বাজান লও যাই মেলায়।

ময়নার বাপ :

আয় ছেঁড়ি আয় ল' যাই পোড়াবাড়িয়া মেলায়। (দু'জনেই হাত
ধরে প্রস্থানের উদ্যোগ)

পেছন থেকে ডাকতে ডাকতে হাবুর প্রবেশ।

ঘাবু :

যাও গা কই আমারে থুইয়া, এঁয়া হ্যাঁ হ্যাঁ।

ময়নার বাপ : আরে বেআক্কেলডা, সাট-টা ঠিক কইরা ফর (হাবু
ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকবে, জামা ঠিক ঠাক করতে থাকবে এবং
বোকার মত উক্তি করতে থাকবে)। (অতঃপর তিন জনই মেলার
দিকে রওনা দিবে এবং মঞ্চে হাঁটতে থাকবে এমন সময় ঝড়
তুফান উঠবে আর ঐয়ে তুফান আইতাছে তুফান, তুফান, বাঁচাও
বাঁচাও, তিনজনেই সমস্বরে চিৎকার করতে করতে মঞ্চ হতে
প্রস্থান।)

প্রবেশ :

হৃদয়চারী কবি হুমায়ন আহমেদ কবীর ভূঞার কাব্যগ্রন্থ ‘মুক্তির যুগ পুরুষ’ হতে ‘ঝড়’ কবিতাটির আবৃত্তি নৃত্যসহ ।

নৃত্যশেষে প্রবেশ :

ময়নার বাপ ও ময়না-----

ময়নার বাপ :

এমুন তুফান আর দেহি না । বৈশাখ মায়া দিন, দিনের বিশ্বাস নাই । এই মেঘ ঝড় তুফান এই ভাল দিন । (ময়নারে লক্ষ্য করে)
এই ময়না, হাবুরে দেহি না, হাবু কইরে ।

ময়না :

বাজান হাবু ফুতুরে ডাক দেও বাজান ।

ময়নার বাপ :

হাবু, হাবু, ও ও হাউব্যা (হাবু একটা ঝাঁকা মাথায় কণ্ঠে বসে থাকবে মঞ্চার কোণায় । ময়নার বাপের ডাক শুনে চিৎকার দিয়ে বলবে) ।

হাবু : ভায়া আমি এইহান ভায়া ।

তিনজনেই আবার মেলার দিকে রওনা দিবে ।

ময়না :

বাজান, বাজান এই বাজান এহানঅ গান অইতাছে । লও যাই দেহি-বাজান ।

ময়নার বাপ :

এইতা কিতা দেকবি । কইতাছস যহন আয় দেহি ।

হাবু :

মানু ভায়া, হির্যাবার তুফান ছুটবো । এইতা দেহনের কাম নাই, লও যাই গা ।

ময়নার বাপ :

আর রাও হরিছ না বেকল । তর লাগি ছেড়িডা কিছতা দেকতো
ফারে না । ছাগল কোন্ হানের । (অঙ্গভঙ্গি করে ঘাড় চেপে
ধরবে ।) হাবু বোকার মত হাসবে এবং তিনজনের প্রস্থান ।

প্রবেশ :

নৃত্য ও গীত ‘এসো হে বৈশাখ এসো’

নৃত্যদলের প্রস্থান

প্রবেশ :

ময়না :

বাজান লাল ফিতা চুড়ি পুতুল কিনছি বাজান । আমারে চরহায়
উঠায়লা না বাজান ।

ময়নার বাপ :

পোড়াবাড়িয়া মেলা তিন দিন অইবো । কাইল উটবেনে কাইল ।
এ-ই হাউব্যা তুই দেহি পথই খাওয়াত লাইগ্যা ফরছস । কি
কইয়াম ফোলাপানের সামনে । তর আছে ফেটটা আর -----
(হাবু বোকার মত কই খাইতে থাকবে আর হাসতে থাকবে) । এ-
ই রইছ ফহির না ! ভায়া কই যাইতেছ, খাড়াও ।

রইছ ফকির :

মানু কই আর যাইয়াম । যাইতাছি বয়স্ক ভাতার আপিসে । সমাজ
সেবায় নাই বয়স্ক ভাতা দেয় । দেহি আপিসে নাম লেহাইয়া
আহি ।

ময়নার বাপ :

অহন মেলায় গান গাও না ভায়া? ছোড বেলাঅইতে তোমার ফহিরি
গান ফুনতাছি । তোমার গান ফুনলে ঘুমাইয়া ফরতাম ।

রইছ ফকির :

আরে মানু না। অহন আর হেইদিন নাই। অহন আমারে আর কেউ ডাহে না। অহন ডাহাততে বড় বড় নগর বাউল আনে। হেরা নাইছা নাইছা গায়। যুবক ছেড়াইন লইয়া নাছে। গানের ছেয়ে নাইছ অয় বেশি। হেই কতা কইয়া আর লাভ নাই। ভায়া আমরার কদর নাই।

ময়নার বাপ :

আহারে কি দিন গেল। এই দিন আর ফিইরা আইবো না। আহা অহন দিনডা কেমন যাইতেছে।

রইছ ফকির :

হেই কতা আর কইয়া কি আইবো। তর বাবি মারা গেছে ক্যানসারে। ছেড়া দুইডা যুদা কায়। আমারে ছাইয়াও দেহে না। যারা আমারে ছিনে তারা দয়া হইরা কিছু দিলে কাই। না কাইয়া তাহলেও মাগবার ফারি না। (ফকির কাঁতে থাকবে)।

হাবু :

আও যাই মেগ আইবো (ময়নার বাপকে খোচা দিয়া)।

ময়নার বাপ :

হাউব্যা (ঘাড়ে চাপ দেয়, হাবু ঐ্যা বলে অঙ্গভঙ্গি করে) ফকির ভায়া (ফকিরকে লক্ষ্য করে) লও যাই আমরার বাড়ি দুইলা কাইয়া যাইবা। আইজ ফইলা বৈশাক মাইনষে কয় শুভ নববর্ষ।

রইছ ফকির :

কূভ নববর্ষ। হ্যাঁ মানু ঠিকই কইছ শুভ নববর্ষ। আজি চিৎকার দিয়ে বলতে হচ্ছে, গাছ ফল দিয়ে যৌবনকালে নিজেকে উজাড় করে দেয়। গাছ শুকিয়ে গেলে কাঠ হয় আরও যত্ন আছে আরও কদর আছে। আমি মানুষ আমার কি আছে। সারা জীবন আমার গান আমার সুর করে শুনাইলাম। আজ অনাহারে জীবন দীপ

নিভে যাচ্ছে কেউ চেয়ে দেখে না। আঁ আঁ (বুক চেপে ধরে) হে
আল্লাহ তুমিই দেখো। তুমি বিচার করো-----এই মানু ঐ ঐ
দেখো আন্ধার নেমে আসছে। ঐ আন্ধারে আমি ডুবে যাচ্ছি। ঐ ঐ
আন্ধারে আছে শুধু চাল-ডাল-তেল-নুনের হিসাব। সেখানে সুর
নেই, নেই সুরের যাদুকরী প্রভাব। মানু আমারে ধর, আমি শেষ
গান ধরি-----

বিধিরে ও বিধিরে,
তোমার লীলা বুঝা দায়, হায়রে লীলা বুঝা দায়,
কারে দিয়া কি করাওরে কে জানিতে পায়।
আমি কষ্ট পাইলে খুশি হই
বিপদে হই সুখি,
আরাম আয়েস নরক আমার
ভাল লাগে ঝুঁকি।
আল্লাহ তোমার ইচ্ছা জড়িয়ে ধরুক আমার গায়।
চাওয়া পাওয়ার নাই কিছু যে
বিধি গলার হার,
বুকের মানিক তোমায় দিলাম
কাঁদিব না আর।
হুকুম খোদা থাকলে তোমার, সব বাধা সরে যায়।
আঁ আঁ আঁ ----- ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

চরিত্র লিপি :

মানু----- ময়নার বাপ

হাবু-----কমিডিয়ান মানুর ভাই

ময়না-----মানুর মেয়ে

রইছ ফকির-----বাউল শিল্পী

১০/৪/২০০৯ ,কিশোরগঞ্জ সদর

পরিবর্ধিত পুনঃপ্রকাশ

১৯/৭/২০২৪ মিরপুর ঢাকা ।

সমাপ্ত

কাব্য নাটক শূ--ক---তা---রা

শুকতারা

চরিত্র পরিচয়

- ১। সোহেল.....কবি, জুয়েলের বন্ধু।
- ২। রাণী.....শিল্পী জুয়েলের বান্ধবী।
- ৩। বাদশাহ মিয়া.....চেয়ারম্যান।
- ৪। কাঞ্চন.....চেয়ারম্যান পুত্র।
- ৫। রফিক....কাঞ্চনের বন্ধু।
- ৬। সমীর...রোগাক্রান্ত ভূমিহীন চাষী।
- ৭। খাদেম ব্যাপারী...জনৈক ব্যবসায়ী।
- ৮। কাশেম চৌধুরী....সম্ভ্রান্ত বংশীয় মাতব্বর।
- ৯। কলিমুল্লা.....ইমাম।
- ১০। দারোগা....দারোগা।
- ১১। জুয়েল...কমরেড।
- ১২। লতা....সমীরের মেয়ে।
- ১৩। অঞ্জনা, ওসমান মাতু।
- ঠান্ডু পানু ও পটুয়া...দিনমঞ্জুর।
- ১৪। বিপিন...কবিরাজ।
- ১৫। ডাক্তার....ডাক্তার।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

সোহেল : (বিকেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আবৃত্তি)

আহা কী শান্তি, আহা কত মজা,
ডুবে গেছি মৃদু সমীরের আলিঙ্গন সোহাগে
কী মধুর হলদে রোদ্দুর পড়ছে আমার
সর্বান্তে, মাখছে স্বর্গের সুখের মলম,
আরাম শিহরণ পাইছি আমি
শিরায় শিরায়।

নয়ন জুড়ায় হেরি সুন্দর সরিষা ক্ষেত কত !

হলুদ গায়ে বসেছে যেন বাসর ঘরে,
গোধূলির গগন লালাভ মেহেদী মেঘে
বুলাইছে পরশ বধূর গায়ে অদৃশ্য করে—
হেলে দোলে নরোম তনু লাজে জড় সড়,
কভু চুম্বনে চুম্বনে নিয়ে যায় স্বর্গ রাজ্যে
মধুকর ফুটায় ছল, খিল খিল হাসে বধূফুল,
গুন গুন গায় গান, পিয়াসী ভোমরা
যায় উড়ে প্রেমের গভীর অরণ্যে
ওদিকে দিঘীর জলে হাসছে শাপলা
কিশোরী প্রণয়ের ছবি আঁকে মনে মনে
মুক্তো দাঁত ফুল দল নেয় কেড়ে মন,
জগৎ ভুলায় অমন হাসি আর কে হাসে?
অভিমানিণী প্রণয় বাসনায় সুসজ্জিতা।

কেটে পরে রাগে সহিংস বেদনায়

ডেকে বলে বিটপ তরুলতায়,

ওগো তোমরা ঘিরে দাঁড়াও বেহায়া

কিশোরী দিঘীরে,

যেন ও চিরকালের সতীন মোর

অসহায়া রমণী সরিষার কান্নায়

ছেয়ে ফেলেছে তমসায়;

তাই বুঝি জল এত কালো,

আবছা সাদা শাপলা গ্যাচে হারিয়ে
তমসার আরামের কোলে ক্রমে-
এখনও প্রকৃতির আদূরে দুহিত-দুহিতা
খোকা খুকু খেলছে নানান খেলা,
নিকোনো উঠোনে-
হৈ হৈ রৈ রৈ হৈ হৈ সমবেত রব
নবোতিপর ন্যুজ বুড়ো শ্বাসে শ্বাসে
হয়রান, কুহু হু কেশে ফেলছে
কষ্টের থু থু!

দেয় ঢেলে ওয়ুর পানি পায়ে পায়ে
নাতনী তার হাতে পুরনো বদনী
খোঁজো ময়লাময়;
হাঁপানী গলায় সে একই কথা
আল্লাহ সুবাহানালা, আল্লাহ
বৌ-বিরি পাশাপাশি বসে দেখছে
মাথা এ-ওর; বিলি কাটে, উকুন ধরে
টপাটপ জীবন বিনাশে তৎপর,
ষোড়শী ননদী কাঁকই বুলায়ে চুলে
হাসে অকারণে কভু লাল ফিতা ধরে,
মাথার বেণী ছুঁয়ে দিয়ে বলে, এভাবে
পরালে, বুঝি ভাইজান ভালবাসে বেশি!
যা ছুড়ি বলে, ভাবী চিম্টি কাটে ষোড়শীর
গায়ে, মধুর চিম্টি বেদনায় উহ্ উহ্ করে ওঠে;
ধূলি মলিন গায়ে শিশুর ক্লান্তি ভেসে ওঠে
নববধূর অন্তরে-
তড়িৎ ওঠে যায় ধরিতে ছোঁড়ায়!
আচমকা দু' হাতে ধরে চেপে, করে
আত্মগোপন দেউড়ির আড়ালে
দৃশ্যাতীত কোন জানোয়ার দিচ্ছে তাড়া তারে
যদি কেউ দেখে ফেলে!
খুকু, খুকু আমার বলে চুমিয়ে চুমিয়ে
লাল করে গন্ডদয় শিশুর,

আধখোলা ডম্বর স্তনের পাহাড়
ধরে শিশু ডুবে যায় অমৃত সাগরে
ঐড়েবাছুর যেন চুষে গাভীর বাঁট ।

আ-হা-হা মেখেছিস কী গায়ে তোর
খুকু-ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে যায় বধূ ঘরে
হয়ত কাপড় জড়িয়ে দিবে তার গায় ।
সারা দিন শেষে বিহঙ্গরা ফিরিছে
আপনাপন নীড়ে, সাঁঝের বেলায়
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ।

প্রবেশ :

জুয়েল : (দ্রুত পদে) আরে, আরে, এ সোহেল
দেখছি নাকি?
দেখছি অমাবশ্যার চাঁদ !
বলি, ওহে, ধ্যানমগ্ন কবিবর
তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?
ওদিকে, অভাগায় খুঁজিতে কুঁজিতে তব
আকাশ পাতাল একাকার করিনু যেন ।
প্রাণ যায়—

সোহেল : থাক, থাক, প্রাণ যেতে হবে না
এত তুমি খুঁজে ছিলে যারে
এখন চোখের সম্মুখে সে যে
ধরিয়া ফেলিলে একেবারে ।
তা পুলিশে দেবে নাকি?

জুয়েল : ছি, ছি, ও পুলিশ কথায় ঘৃণার
শ্লেষা বেরোয় নাসিকা দিয়ে,
ইচ্ছে করে থোড়ে মারি, ষ্টিলের মুষ্টি
জিদে, জিদে দাঁত মুখ খিচিয়ে ।

সোহেল : এইত বন্ধু আমার, ন্যায়বাদী
তা তুমি তড়িঘড়ি বল, কখন এলে?
জুয়েলঃ এইত যখন তুমি মোরে দু'নয়নে দেখলে ।
(দু'জনে উচ্চ হাসি)

সোহেল : তা শুনে ছিলুম তুই নাকি—
 জুয়েল : ঢাকা গিয়ে ছিলুম তাই,
 সোহেল : ও কথাই তোর, বাপের মুখে শুনতে পাই।
 তা পরীক্ষার রেজাল্টের কী খবর।
 জুয়েল : এ জবাব দেবো পরে,
 তার আগে বল, হাতে ওটা কী করিবর?
 সোহেল : ওতো দেখি শাদা কাগজ ক'টি
 না রে না, পরশ পাথর মুখে কহিলে
 তা বন্ধু না দিল হাতে রাগে যাবে চটি।
 সোহেল : দে, না বন্ধু দে-না তা আমারে তাড়াতাড়ি।
 জুয়েল : ও যদি দেই তবে আমাকে দিবে কী,?
 বল বল চট পট তবে করিব না বাড়াবাড়ি।
 সোহেল : আমাকে দেবো' তোমায় বর পানি,
 জুয়েল : এবার তবে নে বন্ধু, চেয়ে চেয়ে দেখ্,
 ডুবে যা সুখে, হাত লয়ে সুখ পরশখানি।
 (হাতে কাগজ দিল)
 সোহেল : (উল্টিয়ে কাগজ)
 সোহেল : এম, এ শেষ পর্ব পরীক্ষায়
 প্রথম শ্রেণীতে প্রথম জুয়েল দ্বিতীয়,
 চতুর্থ রাণী, সাহেরা খাতুন লতা তৃতীয়,
 সমর্থিত সিডিকেট-৮৭ বর্ষ, শিক্ষায়।
 (বন্ধু, বলে উভয়ে কোলাকুলি করল)
 জুয়েল : এবার তা হলে পৌঁছে দিই এ সংবাদটি
 লতা আর রাণীর কর্ণ কুহরে।
 সোহেল : বন্ধু বলেছিস ঠিক তার পরে মোরা,
 আনন্দ উৎসব করিব বুক জোড়া।
 জুয়েল : তাই হবে এখন তাহলে চল।
 সোহেল : দেরি নয়, চল, এক সাথে যাই চল।
 (উভয়ের প্রস্থান)

প্রবেশ :

সমীর : কোথা গেলি বাছা মোর, মা ধন
দে তো পানি গেলাস এক,
তেষ্টা পেয়েছে দারুণ,
কই গো, মা লতা, মা!

লতা : আসছি বাবা! এই নাও পানি।
শুনছো বাবা শুনছো আ-আমি
করেছি এম-এ পাশ, পেয়েছি
প্রথম ক্লাশ।

(ছলাম করতে গেল)

সমীর : বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক মা আমার।
আজ আমার পূরণ হলো আশা
কে আছো, শুন, কে আছো,
আ-আমার লতা, দিয়েছে এম এ পাশ
মা-এত আনন্দ, আমি রাখব কোথা
এত সুখ, কোথা রাখব মা।
(হাসি কান্না মিশ্রিত আবেগ জড়িত কণ্ঠ, দ্রুত পায়চারী)

লতা : বাবা! তুমি অসুস্থ বাবা!
(তাকে চেপে ধরবে)

সমীর : কেডা, কেডা, কেডা কইছে অসুস্থ আমি না-না আমি সুস্থ দিব্যি সুস্থ
এক পাহলোয়ানের শক্তি গায়ে।

লতা : বাবা!

সমীর : মা, তুই এম এ পাশ করলি মা।
শিক্ষিতা হলি মা,!! (কাঁদতে,কাঁদতে)
তোর এই গরীব বাবা টা
জীবনের সব কিছু হারিয়ে সুখি আজ
সার্থক এর জীবন।
মা-আমি মূর্খ-অন্ধ-কানা
মানুষ আমায় ঠকিয়েছে কত!
সর্বহারা আমি আজ!
টিপসহি করে জাল
দলিলের মারপ্যাঁচে

গ্যাছে নিয়ে সব বাদশাহ
বুঝতে পারি নি মা, এ জানোয়ার
বুঝতে পারে নি,
কী করে বলি,
আমার শেষ যা, নিয়েছে তাও
মা নিয়েছে তাও....।
কউহ্ কউহ্ কউহ্
(কাশতে লাগল)

লতাঃ বাবা, অসুখ যাবে বেড়ে আরো,
চল বাবা, ঘরে চল,
(চেপে ধরে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রবেশ : (জুয়েল ও সোহেল)

জুয়েল : কেমন লাগিছে আজিকার এ বেলা
বল, বন্ধু কবির প্রাণের ভাষায়,
সহে না দেবী করো না হেলাফেলা
এ প্রাণ চেয়ে আছে তোমার আশায়।
সোহেল : বসন্ত আজি ফুটেছে নানা ফুল
বিটপে, বিটপে নানা রঙের সমাহার অতুল।
হাসিয়া হাসিয়া করে অভিবাদন বসন্ত
হৃদয়ে উঠে প্রেমের জোয়ার প্রকৃতি অনন্ত
সাজে সজ্জিতা, মোবা হব তাদের সহচর,
মোদের এ মালা পরিয়ে দেব হব, হব কুলবন।
সমীর শরীরে দোল খায় মধুর শিহরণ তোলে,
মধুর মিলনে উৎসবে হারাব আজি পথ ভুলে।
শ্যামল চাদর গায়ে রূপসী পল্লী বালা,
বসে আছে আনমনা বাড়ায়ে অভিমান জ্বালা।

জুয়েল : না গো কবি তুমি কর মোরে আশাহত
লতা রাণী স্বর্ণলতা সহে না আর আসে না তো।

সোহেল : ছলনাময়ী দেৱী কৰে পায় অভিসাৰে সুখ,
পাতাৰ আড়ালে থাকিব গো লুকায়ে ভোমৰাউডুক ।
এমনি ছলনায় আড়ে আড়ে চাহে আৰ স্মিত হাসে,
সৱায়ে লাজেৰ পাতা ফুটন্ত ফুল পাওয়া যায় পাশে ।

জুয়েল : এবাৰ যদি না আসে তবে বলি কবি,
ঠিক আমি চলে যাব দেখিও ফেলি সবি ।

সোহেল : অভিমানে বন্ধু আমাৰ উঠেছে ফোলে,
হায়, হায়, কী কৰে এখন বসন্তেৰ বুলবুলি ।
(রাণী ও লতা যুগপৎ- হাসতে হাসতে
এক তোড়া মালা নিয়ে মঞ্চে আসে)
(কোৱাস সুৰে গৈয়, মন্দৰগীত ৰাগ বিলাবল)

লতা ও ৰাণীঃ নমস্তে, নমস্তে দেবতা প্ৰবৰ,
লহো লহো বসন্ত উপহাৰ,
বসন্ত যৌবন ৰাগে সুখে মৰ মৰ
এনছি পুষ্প তোড়া কৰি হৃদয় বাগান উজাড় ।

সোহেল ও জুয়েল : নমস্তে, নমস্তে ঋতু ৰাজদেবী
লহো লহো বসন্ত কোকিলেৰ অভিবাদন,
হৃদয়ে বেতাৰে মোৱা সুৰ লহৰী সেবি,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধি প্ৰেমেৰ মধুৰ বাঁধন ।

লতা ও ৰাণী : সখা গো, মোৱা পৰি বাঁধন
কৰি নাকো ঘৰ,
পবনে ছড়াতে সৌৰভ
ফুল বালা ফুটি মনোহৰ ইমন ।

সোহেল ও জুয়েলঃ সখী গো,
কৃষ্ণ মোৱা বাঁশি ও সুৰে পৰি বাঁধা পাগল পৰা,
পবনে মোৱা ধৰাতলে ফুল সুৰভি এসো কৰি তুৱা ।

লতা ও ৰাণীঃ সখা গো কোমল কৰে ভাসাই ধৰা মোৱা চন্দ্ৰ তাৱা
মৰুৰ দেশে মিটাই তুষা মোৱা মীতল ধাৱা ।

জুয়েল ও সোহেলঃ সখি গো, চন্দ্ৰ বুকো ফেলি আলোক এ জগতে অৰুণ,
দিক বিজয়ী মৰু পথিক তুষা নাহি পাই বেদুঈন তৰুণ ।

লতা ও রাণী : বটে তাই যদি হয় এবার চলি মোরা

ও সখি গো

ফেলে দে ফেলে দে এ ফুল তোড়া ।

সোহেল-জুয়েল : তাই তো বটে, তাই তো বটে দিব না আর মালা,

ও সখারে

ছিঁড়ে ফেলি, ছিঁড়ে ফেলি, রে ভাই প্রেমের জ্বালা ।

লতা : সখি লো,

অভিমান ভরে কুশলী পুরুষ ফেলে যায় রে চলে,

নাহি বুঝে হৃদয় বেদনা বাসি প্রতিমা ছুঁড়ে অথৈ জলে ।।

বাঁচিব কেমনে সখি বাঁচিব কেমনে বলো

এ বাঁধন ছাড়া,

শুকিয়ে যাব লতা রাণী অরুণ দাহনে হায়

ভাসিবে অশ্রু জলে ।

(করুণ পল্লীগীতি সুরে)

সোহেল ও জুয়েল : সখা হে নারীর মায়ায় পড়িয়া যায়

বুঝি নি ছলনা কারে কয়,

প্রেমের মালা রহিল হাতে এ কেমন নারী

গলায় নাহি লয়,

জুয়েল সোহেল হারায় পথ বৃথা খুঁজি

হরিণী বনে বনে,

বিনয়ে নাহি গলে রাগে যায় বেঁকে

হায় কথা নাহি সয় ।

(করুণ পল্লীগীতি সুরে)

লতা ও রাণী : হুম দুষ্ট শালা ।

জোয়েল ও সোহেল : লাগিল ভালো ফুলবালা ।

লতা ও রাণী : তবে নে তবে নে, সখা ফুল তোড়া ।

সোহেল ও জোয়েল : তবে নে তবে নে, মালা জোড়া ।

(মালা বদল তোড়া বিনিময়)

চার জনে- হার মেনেছি, হার মেনেছি, হার মেনেছি

ধন্য মোদের জীবন,

এ বাঁধন রহিবে চিরদিন আজ হতে

করিনু পণ ওগো করিনু পণ ।

(কোরাস গাইত গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক :

প্রথম দৃশ্য

(চা-ষ্টল)

প্রবেশ :

কাশেম চৌধুরীঃ আসছে পড়ে বেলা, চা পানের দরকার।

কলিমঃ আঃ চা, চলুন চায়ের বড়ো পিয়াসী আঁই।

সবি আল্লাহর ইচ্ছে নইলে কী আর

আঁই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি বারবার,

দোয়া করি আল্লাহ শান্তি দেন জীবনে,

আইজ কাইল মানুষ ঈমান রাখে মনে।

কাশেমঃ বলেছেন ঠিক মৌলভী সা'ব দেখুন।

বংশটা মোদের চৌধুরী।

কলিমঃ হুনছি মানুষের মুখে, চৌধুরী বংশের

গুন কীর্তন- আপনারা মানুষ গুণি

মানি, মন দিল উদার, আঁই জানি

বহুর দশেক এখানে জানি ব্যবহার,

কথা আপনাদের মধুর কত।

কাশেমঃ এই ছোকরা দে, তো দু'কাপ চা দেখি

লিকার দিস বেশি, চিনি একটু কম মাখি।

কলিমঃ চিনি আঁই বেশি খাই ন বহুমুত্রের ভয়,

ভুঁড়ি বেড়ে আছে এখন কোমরের পর।

কাশেমঃ হি হি হি (চা খেতে খেতে)

এই, কে, বিপিন না! এসো এসো

খেয়ে যাও চা।

(বিপিনের প্রবেশ)

বিপিনঃ (চৌধুরী সাব এখন সময় নেই যে,

হাতে মোটে চা খামু কেমনে বলুন জে।

কাশেমঃ আহা! চা'ই তো খাও না দু'কাপ,

ও খেতে জান তো জিভের নেই মাপ!

বিপিনঃ তা চৌধুরী সা'ব কি মনে ধরে,

ডাক দিলেন মোরে অমন করে।

কাশেম : তা তেমন কিছু না পুরনো বাতটা দিলে দেখা

শেষ বয়সে হবে খুড়াতে এই ছিল ভালে লেখা,

তা তুমি বিপিন আছো কেমন তবে বল,

হয় এর ঔষধ দাও নইলে রাস্তা মেপে চল ।

হি, হি, হি, বুঝলে হে ।

বিপিন : আরে এতো ভাড়ি সোজা ঔষধ বলি শোনেন,

ঐ রাস্তার ধারে নিশিন্দা গুটি কম তুলেন,

ব্যস বিছানায় দেবেন পেতে আর কি,

পালাবে বাত বেটা, বনস্পতির আর হার কি?

নইলে বলি, তাও শুনন রসুন আর গরম তেল নিয়া

ভাল করে মালিশ দিবেন মন মত ছিঁচিয়া,

রৌদ্রে বসে বসে জল চৌকির ওপর চিবিয়া

ঘন্টা তিনেক পরে উঠিবেন

বাত সেরে হবে খান্ খান্ ।

কলিম : সবি আল্লাহর ইচ্ছে মানুষের 'ন' হাত

দিলেন সেবার লাগি, আঠার হাজার মাখলুকাত ।

কাশেম : আরে এ যে, দেখছি বাদশাহ মিয়া

এসো, এসো কথা আছে এসা গিয়া

বাদশাহঃ হাঁ-হাঁ-হাঁ, কথা আছে এসো গিয়া ।

বাদশাহঃ হাঁ-হাঁ-হাঁ কথা তো থাকবেই,

সারা জীবন তুই তো মোরে জ্বালাতে রাখবেই ।

কাশেম : জ্বালা কী রে বসতে বললুম তাই ।

বাদশাহ : বল্ তোরে ছাড়া কোন কামড়া করবার চাই,

৪০ মন গম, ৫০ মন চাউল রিলিফ এবার পাই,

৫ মন আর ১০ মন দিয়া সবারে বলেছি আর নাই,

কেমন হলো রে !

কলিম : উঠি তাহলে চৌধুরী সা'ব আমি ।

কাশেম : যাবেন কই, নামাজের সময় তো আসে নি নামি ।

কলিমঃ আঃ, চৌধুরী ।

বাদশাহ : সমির নাকি, তা শুনি তোমার মেয়ে নাকি,

পাস দিয়াছে এম এ সত্য মিথ্যা জানি না বাকী ।

সমীর : আপনাগো দোয়ায় মেয়ে দিয়াছে এম এ পাস

জীবনে আর কিছু নাহি চাই, মিটিয়াছে মোর আশ ।

বাদশাহ : সমির সে তোমার একার আশা নয়,
আমার দিলে সর্বদা এই মন হয়,
তোমার মেয়ে আমার মেয়ে তফাৎ কী আর,
যেন পাশ হয় এই দোয়া চেয়েছি কাছে সবার
কি বলো কাশেম?

কাশেম: হাঁ সমির তো খান বংশের লোক,
এখন গরীব হয়েছে তাই কী উদার তার বুক।
বাদশাহ : গরীব বলে ফেলে দিই নি তো তারে,
দিতেছি টাকা যত অভাবে অনাহারে,
মেয়ের পড়ার খরচ যুগাই নি বলুক এ,
আমি ছাড়া শুভাকাঙ্ক্ষী সমিরের জীবনে আর কে?
সমীর : হ্যাঁ বাদশাহ আমার মেয়ের ব্যাপারে তোমার কাছে ঋণী
তোমাকে ও আমি মন থেকে অনেক অনেক বেশি চিনি।
ইস্ বুকের ব্যথা, গায়ের জ্বর শরীর দুর্বল তাই,
কফে কফে রক্ত বেরোয় শ্বাস নাহি পাই।
বাদশাহ : বিপিন, ওর চিকিৎসা ঠিক মত নিতেছ কী?
বিপিন : প্রতি রোজ ঔষধ দিতেছি, চেয়ারম্যান জ্বী।
বাদশাহ : ঠিক আছে এবার তবে যাও

(জোর করে টাকা দেয়)

বিপিন : আদাব মশায়! (প্রস্থান)

বাদশাহ : সমির শোন, টাকা লাগিবে কি না বল,
নাও এই টাকা, এবার বাড়িতে চল।
(ধীর পদে সমীরের প্রস্থান)

বাদশাহ : (কানে কানে)

মেয়েটি কেমন হবে কাঞ্চনের লাগি তাই,
দিয়াছি বহু টাকা সেই আশায় হিসাব ছাড়াই,
তাছাড়া আমাগো কাঞ্চন পাগল করিতে বিয়া তারে,
তোমার ভাবীও মন্দ কয় না সমির পরিবারে একে বারে।
কাশেম : তোমার কপালে রূপ গুনে ও মেয়ের তুলনা নাই,
তারপরে শিক্ষিতা সোনায় সোহাগা যাকে বলে ভাই।
বাদশাহ : দেখবে না এক বার বুদ্ধি শুধুই বাদশা মিয়া
ফাঁদ পেতে ধরে আনে বনের টিয়া।
হা হা হা।

কাশেম : হা হা হা ,
ও তাই , নামাজ পরি নি চল কানে আজানের সুর বাজে ,
চল চল মসজিদে পরে যেয়ো তোমার কাজে ।
বাদশাহ : চল , চল ।
কাশেম : চল ।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য : প্রবেশ :

জুয়েল : লেখাপড়া তো শেষ হলো এখন কী করা যায়?
সোহেল : এ ব্যাপারে তুই কি ভাবছিস বল না আমায়?
জুয়েল : একটা কিছু তো করতেই হবে নইলে ঘর বাধা দায় ,
তাছাড়া জাতির প্রতি দায়িত্বও থেকে যায় ।
সোহেল : শুধুই বেকার অবস্থায় কি দিন যেতে চায়?
জুয়েল : ভাবছিলাম একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?
সোহেল : আমার মনে সন্দেহ যেন খালি কথা কয় ।
জুয়েল : সে কীরে এছাড়া উপায় কী আর রয় ।
সোহেল : দশটা পোস্ট দশ লাখ আবেদন ,
ভালো ফল করলেই কি কর্তা বুঝবে অভাব বেদন?
তাছাড়া মামু ভাগিনা তো রয়েছে তাদের ,
তুই জুতোর মুড়ো খোয়াবে পথে-
চাকরি হবে যাদের টাকা আছে প্রচুর , দিতে পারে সাহেবকে ঘুষ ,
নানা ছিদ্র খুঁজে তিনি চাকরি দিতে হন বেহুঁশ ।
জুয়েল : এই যে আসছে লতা রাণী সখিদ্বয় ,
এখন মনে ভেবো আলাপ জমিবে নিশ্চয় ।
(লতা ও রাণীর প্রবেশ)
লতা : তা তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?
রাণী : বুঝলে না , প্রকৃতি দেখছেন , আড্ডা মারছেন ।
জুয়েল : আরে না , না নাটাই হাতে ভালে ,
মোরা আছি দাঁড়িয়ে সূতো ছাড়ার ছলে ,
ঘুড়িরা যে এসে গেল মৃদু তালে ,
চমকে যাব বলে , ওহে চমকে যাব বলে ।
লতা : ন্যাকামো রাখ তো , কি নিয়ে ভাবছিলে তাই বলো ।
সোহেল : উদ্দেশ্য ও কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল ।
লতা : ও তাই বুঝি ,

এরই মধ্যে গেলি ভুলে

প্রিয় কমরেড;

প্রগতিশীল ছাত্র দলের

সমাজ উত্তরণ অভিযান?

জুয়েল : এ যে কঠিন কাজ- লতা !

লতা : কমরেড জুয়েল ! কমরেড !! কমরেড !!!

তুমি পাও ভয়?

বলো, স্পষ্ট করে, কমরেড !

যে শিক্ষা নিয়েছ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে

প্রিয়তম হারিয়ো না সাহস !

জুয়েল : লতা !

লতা : হ্যা, মোরা দিতে পারি জীবন

পরি না দিতে আদর্শ জলাঞ্জলি,

দূর করি ক্ষুধা, অন্যায় শাসন পায়ে দলি,

আত্মা অধিকার রক্ষায় করব মরণ, বরণ !

রাণী : নিজেরা কাজ বেছে না নিলে কি আর

আসমানের ফেরেশতা সমাধান দিবে সমস্যার?

সোহেল : দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছি বিপ্লবের অগ্নদূত

যে করেই পারি, শোষিতের ঘাড় হতে তাড়াব যত ভূত

জুয়েল : তোমরা বলেছ এবার ঠিক

তবে আমার মনে হয় কার মনে আছে কি বলে নিক

সোহেল : তবে তাই হোক !

লতা : আমার উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার করা

রাণী : আমার সাধ মানুষের সুমনে সুখা ঢালা,

জুয়েল : আমার কাজ সংগঠনের মাধ্যমে অন্যায়ের মুখে দিব তালা

সোহেল : আমার মুখ্য হৃদয়ের শ্বাস্থত অনুভূতি প্রকৃতিতে ধরা

লতা : তাহলে সবার উদ্দেশ্য মানুষ ।

সোহেল : বলেছ ঠিক ।

রাণী : কোথাকার মানুষ

জুয়েল : সোনার দেশের সবুজ গায়ের দরিদ্র মানুষ

রাণী : তাহলে এ মানুষ দিয়ে যাত্রা শুরু হতে পারে

লতা : পারে ! জুয়েল : পারে !! সোহেল : পারে !!!

রাণী : তাহলে এ গ্রামেই মোদের কাজ ।
লতা : তাই ! জুয়েল : তাই !! সোহেল : !!!
লতা : আজ তাহলে হোক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন
সোহেল : কাজের প্রথমে তার বিশেষ হেব যে প্রয়োজন
জুয়েল : সব ঠিক হলো , এবার ব্যবস্থা করিগে এই মাঠে
সোহেল : ওখানেই ভালো হবে
লতা : ওটা গাঁয়ের মধ্যখানে রবে
রাণী : সময় গড়িয়ে যায় , চল এবার
লতা : চল
জুয়েল : চল
সোহেল : চল
(সবার প্রস্থান)
প্রবেশ :
জুয়েল : (টলতে টলতে গাইতে থাকবে)
ওরে দয়াল বেকার আমি জীবন কোথায় পাই
জীবন পথে অবশেষে পথ হারিয়ে যাই
শিক্ষা তরে বয়স আধেক গেল
কর্ম খুঁজে পেলাম না শুধু হেলা ফেলা
আমলা বেশে জীবন নেশে প্রতিভাটি খাই ।।
কেমনে জীবন রাখব আমি
যন্ত্রণা পাই দিবায়ামী
হুজুর হুকুম তামিলকারী পেটের খোরাক চাই ।
(লতা সোহেল ও রাণীর প্রবেশ)
লতা : হা হা হা (কলহাস্য)
গাহে কীরে
সোহেল ও রাণী : গাহে কীরে (সমস্বরে)
লতা : না-না-না-না (বাজনার তালে তালে)
সোহেল : না-না-না-না (বাজনার তালে তালে)
লতা , রাণী , সোহেল : ওরে মরা নদী তোল জোয়ার
ওরে বাংলাদেশী যোদ্ধা
ও নাকিব হাল ধর হাল ধর শক্ত করে
সুখের তরী ছাড়া ছাড় , সাম্যবাদের ঝাণ্ডা ধরে

ওই যে দেখ কামার, কুমার, সুতার তাতী চাষী ভাই
তাদের প্রাণে প্রাণ রাখিব মোরা বাচি তাই
(একজন করে) আমি নেতা আমি কবি আমি শিল্পী হতে চাই
ওগো এই মাঠে, এই ঘাটে কুঁড়েঘরে নেবো এবার ঠাঁই।
আমার গায়ের মাটির কোলে
সোনার শিশু ফসল দোলে
ভাবনা নহি আর
ওগো খোলা বাঁচার দ্বার।
এমন জীবন, এমন মরন ওগো তুলনা যার নাই
ছিন্ন করি জরাজীর্ণ সুখের বীন
বর্জ্যোদের খুনী মোরা গরীব নিষ্বদীন
শপথ নিলাম জীবন দিলাম গায়ের পথে ঠাঁই
(তিন লাইনে জুয়েল অংশ গ্রহণ করিবে)
(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
(কাঞ্চন ও রফিকের প্রবেশঃ)
কাঞ্চনঃ দেখ রফিক জুয়েল টুয়েল ওসব
ফকিরগীর পোদের
শিক্ষা না দিয়ে ছাড় ছিনে।
রফিক : শালারা আমাগো উপর দিয়ে চায় করতে মাতাকরী
কাঞ্চন : থাম, থাম ওদের চৌদ্দ গোষ্ঠি
ও শেখে নি নামটিই।
রফিক : এই যে কে আসছে যায় দেখা।
কাঞ্চনঃ ভুল দেখিনি ও তাইতো ও জুয়েল সাহেব নাকি।
জুয়েল : নয় সাহেব, বল জুয়েল।
কাঞ্চন : হাঁ হাঁ ও, ওটা তোমার
লাগে না ভাল বুঝি? তাই নয়
তাহলে আর একটা টাইটেল জুড়ে নাকি?
মিঃ জুয়ের
কেমন হলো, বলো, বলো।
জুয়েল : কী বলতে তুমি চাও?

কাঞ্চন : না রে না, তেমন কিছ না তবে
কাল রাতে যে, এই মাঠে ফাংশন
ফাংশন নাকি রে।
রফিক : ভেংচিয়ে ফাংকটন!
কাঞ্চন : তা আবার সমাজ বিরোধী কথা!
দাও মানুষের কানে সুড় সুরি।
কার হুকুমে এ মাঠে নাচাও
ধিঙ্গি মেয়ে, মিঃ জুয়েল।
জুয়েল : সাবধান, আর একবার বলে ছোতো,
টুটি দেবো উল্টিয়ে,
আর শুন আমার কাজ হলো
বেঙ্গে ফেলা ঘুনে ধরা সমাজ।
কাঞ্চন : আহা ক্ষেগে উঠলে কেন
মিঃ জুয়েল।
অভিযোগ মালা মোর হয় নি,
নিঃশেষে বলা।
তা কার মাঠে করেছ মহানুষ্ঠান
জানকী তুমি এ মাঠ আমার হাতে
সরকারী গমে করা এমাঠ
মহামতি চেয়ারম্যান সাব দিয়েছেন নির্দেশ
জুয়েল : বল, শ্যার, সরকারী গম তোমার
বাপের গম নাকি
এতে কি কারও অধিকার নেই
আর তুমি শাহজাদা ছাড়া
ওরে দুরাচার,
কবর এখানে যা খুশি
এবার পথ মাপ, শালা,
কাঞ্চনঃ তুমি করছ বেশি বাড়ি বাড়ি
কাঞ্চনকে চেন তুমি?
সোজা আঙ্গুলে যদি না ওঠে ঘি
তবে, এই, এই, কাঞ্চন,
কেমনে উঠাতে হয়
তা তার আছে জানা
আয়, রফিক, আয় (প্রস্থান রফিকসহ)

জুয়েলঃ যা, যা, বদমায়েশ পার্জিঁ যা, যা,
নেই চিনতে বাকী তোরে
হুম।

প্রবেশঃ

লতাঃ জুয়েল, জুয়েল, হচ্ছিল কথা
কার সঙ্গে তোমার।

জুয়েলঃ চেলা এক চেয়ারমানের আর তার
জুচোর ছেলে কাঞ্চনের সাথে
লতাঃ কী বিষয়ে
জুয়েলঃ গত রাতে মোরা করেছি যে অনুষ্ঠান
তার প্রতিবাদ।

লতাঃ তা তুমি করলে কী?
জুয়েলঃ দিলাম শাসিয়ে
লতাঃ তা করেছ বেশ। এই দনি
পথ দিয়ে যেতে যেতে মোরে
বলে কী না জানো, এই লাম্পটে!
ভাল বাসি!

জুয়েলঃ তা তুমি করলে কী।
লতাঃ আমি করেছি কী? শোন,
একলোকমা সুতু ঐ উড্ডট
নাকে মুখে নিষ্ক্ষেপ করে
বলেছি নে, এই নে তোর
প্রতিদান ভালবাসার।

হাঁ হাঁ হাঁ

জুয়েলঃ বেশ করেছো বেশ।
লতাঃ জুয়েল, চল বাড়ি যাই
জুয়েলঃ চল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

খাদেম বেপারীঃ জমে উঠেছে বেশ,
চেয়ারম্যান, পাচার ব্যবসা
হলো, এবারের দাবায়
দু'লাখ টাকার হাতি বাজিমাৎ!
বাদশাহঃ হবে না কেন খাদেম,
এত বাদশাহ মিয়ার বুদ্ধি। হাঁ হাঁ হাঁ
খাদেমঃ না করে কী আর পারি
বুদ্ধির প্রশংসা তোমার
কটু বুদ্ধি থাকেনা যার
সে কী আর পারে
চেয়ারম্যান
বল, ঠিক বলেছি কী না।
বাদশাহঃ বহুত আচ্ছা, একদম ঠিক বলে গিয়া
তা এবার ভাগ টা দাও চায় বাদশাহ মিয়া।
খাদেশঃ এই, এই নাও এক লাখ
দুঃস্থ বিধবা শিরোনামে যে
গম আছে গুদামে ৩০০০০ টাকা,
এই বাবদ নাও যদি নেবে
হিসেব আমার পাকা
বাদশাহঃ হিসাবে যদি না হবে পাকা
খাদেম ব্যপারি তবে হলেঅ
নাম কেন,
খাদেমঃ হয়েছ এবার যাক উঠা
ফের যদি কেউ দ্যাখেক্যাশ
হাঁ হাঁ হাঁ বাই (প্রস্থান)
প্রবেশঃ
কাঞ্চনঃ বাবা, আমি
বাদশাহঃ ও তাই বল তা সাথে কে?
কাঞ্চনঃ রফিক

রফিক : আসসালামু আলাইকুম ।
কাঞ্চন : ও পাড়ার জুয়েলকে ছাড়ছিনে
শিক্ষা না দিয়ে ।
বাদশাহ : কেন কি হলো , আবার?
আসলে নাকি আর এক কান্ট বাঁধিয়ে
কাঞ্চনঃ বাবা , তুমি বরাবরই আমার
কথায় বিশ্বাস হারা ,
দাওনা কান ,
রফিকই বরবে হয়েছে কী?
রফিকঃ চাচা জান , জুয়েল , নামের মাষ্টারের
ছেলে মোদের মাঠে কথা ছাড়াই
করছে যা ইচ্ছে ,
গতকাল বলতে গেলে
সে যা খুশি বলে দিলে
এমন কি আপনাকে পর্যন্ত
বাদশাহঃ কী কী , আমাকে পর্যন্ত
কেন থামলে কেন বল
রফিকঃ করছে গালি গালাজ
বাদশাহঃ তাই নাকি , ছেঁচড়া মাষ্টার গোষ্টি
করছে শুরু বাড়া বাড়ি
শালাকে ছাড়ব জুতাপিটা করে তবে
(প্রবেশ)
কলিমঃ সবি ইচ্ছে আল্লার
আসসালামুআলাইকুম চেয়ারম্যান সাহেব ।
বাদশাহঃ ওয়ালাইকুম সালাম ইমাম সাহেব ,
বসুন , বসুন ।
কলিম : কইছিন বেলাল্লাপনা
জাহান্নামের আগুন ছড়াইয়া গ্যাছে
দুনিয়াডায় কইছি ন
শরাহ বিরুদী কাম করত্যাছে
যে হারে , কইছি ন কেরামত আর
দূরেন বেশি-
কেয়ামত আর দূরে ন বেশি ।

বাদশাহঃ মায়া রা মানে কার কার মায়া
কারা তারা?

কলিমঃ শুনতাছি, ওপাড়ার সমীরের
মায়ার সাথে আর কে জানি
নিত্য নিত্য নাচে গাঁয়ে গায় গান
লোক করে জড়, পর জানি
কী কী বলে, উপদেশ
দাম ঈমান ঠিক রাখাই
সবি ইচ্ছে আল্লার।

রফিকঃ মৌলভী হুজুর কইছে ঠিকই
চাচা, গতকাল জুয়েলরা করছে
ফাংশন, এতে সমীরের মায়া
নেচেছে—

বাদশাহঃ স-মী-র! আমার শরীরটা
আগুনে যাইতেছে জ্বলে খাদেম!
করতে যদি না পারি প্রতিকার
তার বাদশাই নয় আমার নাম—
তোরা যা-যা এখানে থেকে
কাপ্তানঃ ঠিক আছে বাবা
আয় রফিক আয়

(প্রস্থান)

বাদশাহঃ সমীর চেনে নি আমাকে, খাদেম
পানির নিচ দিয়া জ্বালাতে পারে
যে বাদমাহ চেনে নি তাকে
আর তাই দিয়েছে মেয়েকে এখন
নাচের মঞ্চে

মৌলভী সাহেব আসতে পারেন
কলিমঃ আস্লামুআলাইকুম
সবি ইচ্ছে আল্লার
সবি ইচ্ছে আল্লার
সবি ইচ্ছে আল্লার

বাদশাহঃ খাদেম এই সমীর খেয়েছে
আমার কাছ থেকে মেয়ের শিক্ষা

বাবদ হাজার, হাজার টাকা
আজ আমার সাথেই করতে
বসেছে বেঈমানী
কিন্তু বোধ করি সমীর
জানে না উঠিয়ে আনতে পারে
ওর লাশ টা কবর থেকে বাদশাহ
খাদেমঃ কেন আপনি অযত্ন হচ্ছেন
উত্তেজিত। এই মেয়েটিকে আনবেন
ঘরের বউ করে এই তো ইচ্ছে
এ যদি চান করতে তা হলে
উত্তেজনা প্রশমনের আছে প্রয়োজন
এবং হোন শান্ত।
বাদশাহঃ কী করতে বলেন আপনি।
খাদেমঃ শোনেন বলছি
ওর নাচের পর্ব টা কেবল শুরু;
হয় নি তো এখনও নষ্ট বটে,
অতএব, আপনার কাঞ্চনের সঙ্গে
ও মেয়ের শুভ পরিণয় শিখ্রী
দরকার
বাদশাহঃ তাই করতে বলেন আপনি
খাদেমঃ হাঁ তাই নয়তো কী।
বাদশাহঃ ঠিক আছে তাই হবে, চলুন।
খাদেমঃ চলুন
(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য
প্রবেশ, (রফিক ও কাঞ্চন)
কাঞ্চনঃ (মদের বোতল হাতে টলতে টলতে)
রফিক, এ পট ডিয়েই লটা
আনটে, ডায় পানি নিট্য নিট্য।
এখানেই হবে ডাঁরাতে। আর শুন,
লটা আর আমি যখন বলব কটা
টুই টখন টাখবে আডালে

বুঝা লি
রফিক ঃ বুঝেছি, বুঝেছি ওহে ডোস্ট
টোমাগো মধুর পূর্ণিমায়
আমি আধার আড়ালেই টো
টাখবো
আমি এসে পড়লে যে
হৌঁ হাঁ, হাঁ, হ্যাঁ হাঁ
কাঞ্চন ঃ হৌঁ হা হা, হো হাঁ হাঁ আ
টা রফিক বড্ড নেমা ডরেছে বে
বড্ড নেমা ডরেছে কই মড ডে মড ডে
ফুরিয়ে গ্যাচে শালা
বোটল ডে, হারাম ডাজা
ব্লাস্টার্ড
এখনও, এখনও আসেনা
কেন রে মাগী
রফিকঃ অমিটুর হ-য়ো-না ডোস্ট
সার্বের বেলা এলো
পানি না নিলে রাটে
টেমার শ্বশুর মশায় আর
ভা বী বউ ডে
শুকিয়ে মরবে চৈটের খরায়
হো হাঁ হাঁ হাঁ
কাঞ্চন ঃ নেশা ডরছে না রে, নেমা ডরছে না
ঐ ঐ কে, কে ডেন আসছে
অ্যা, অ্যা- টাইটো ডোস্ট
সিউর, অভার সিউর ঠিক
এ,এ, আমার প্রেয়সী
পালা পালা ডোস্ট, পালা
রফিক ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, ডোস্ট চলি, বাই
(টলতে টলতে রফিক মঞ্চের বাইরে
চলে যাবে)
লতার প্রবেশ ঃ (কলসি কাখেঁ)
কাঞ্চন ঃ প্রেয়সি এসেছো,

আসো, আসো,
আরো কাছে আসো।
লতা : (সরতে সরতে) আমার কাছে ঘেষবে
না দিলুম বলে।
দূর থেকে বরা কথা
কাঞ্চন : এই, এইহ্ টো প্রেসিসর
রাগ ভাঙ্গলে
হাসি মাখা চাদনী মুখ,
আচ্ছা, আচ্ছা ডুরেই আছি
বল প্রিয়টমা আমায়
টুমি ভালবাস না?
টোমাকে আ-আমি
আহা-হাঁ হাঁ
লতা : তোর ভাল বাসার প্রদান পেয়েদিস
সে দিনইতো
তা মনে নেই লম্পট!
কাঞ্চন : কী, কী- লাম্পট, বললি আমাকে
লতা : তুই শুধু লম্পট, জুচোর
বদমায়েশ, টাউট বাটপার
মানুষের শত্রু, কালোবাজারী।
কাঞ্চন : থাম, থাম, বুঝেছি,
টমি করেছ রাগ,
লতা : আবার কাছে ঘেষতে করেছিস গুরু
শুয়ারের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিস
কী আছে পায়ে
কাঞ্চন : ডেখবো না কেন পাচ্ছি টো
ঠিকই ডেকতে টা টোমাকে
ছাড়ু ছিনে লটা
আমার অতৃষ্ট নেশা
টোমাকে ডিয়েই করব তৃষ্ট
(ধরতে যাবে)
লতা : তবে রে, তবে রে, লম্পট
(জুতা কশে দিল গালে)

কাঞ্চন : অউহ্ অউহ্ অউহ্ (দু হাতে চেপে
ধরবে কলসি পড়ে বেঙ্গে যাবে)

লতা : কে আছো বাঁচাও-বাঁচাও
(চিৎকার)

প্রবেশ :

জুয়েল : কুত্তার বাচ্চা, দেখাছি মজা (মার পিট
আরাম্ভ হবে প্রচন্ড মার খেয়ে কাঞ্চন পালিয়ে
যাবে)

জুয়েল : ও কুত্তার দল, তোমার করেছে কোন
ক্ষতি লতা?

লতা : না পারেনি ক্ষতি করতে। এমুহ্ তে
যদি তুমি না আসতে আমার কী সর্বনাশই না
হতো জুয়েল।

জুয়েল : লতা।

লতা : জুয়েল! আমাদের ভাল বাসা স্বর্গীয়

জুয়ে! স্বর্গীয়! স্বয়ং ভগবান

পাঠিয়ে দিলে দেবতাকে,

রক্ষিতে তার দেবি

দুরাচার রাক্ষসের হাত থেকে

জুয়েল : সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, লতা, চল

তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি

(দু জনে হাতে ধরে প্রস্থান)

লতা : চল, চল

(প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

লতা ও সমীরের প্রবেশ : (ধীরে ধীরে লতা সমীরকে নিয়ে মঞ্চে উঠবে এবং
আগেই বিছানা রাখা থাকবে)

লতা : বাবা, ঔষধটা খাবে এখন,

সমীর : না, মা রেখে দে, সাঁঝের বেলায় দিবিনে,

লতা : তাহলে বাবা খাবে, বার্লি?

সমীর : দে মা, একটু দে, (বার্লি খাওয়াতে থাকবে) ক্রমাগত।

বাদশা, খাদেম ও কাশেমের প্রবেশ :

বাদশাহ : সমীর, বাড়ি আছো গো, সমীর ?

(গলা ঝাড়তে ঝাড়তে)

সমীর : কে ডাকে মা, দেখতো,-

লতা : (দেখিয়া) বাবা, বাদশা মিয়া, সাথে দুজন লোক, চিনি না-

সমীর : আইতে ক'মা, আইতে ক'।

লতা : আসেন, আপনারা

বাদশাহ : কিগো, সমীর কেমন আছো, অ্যা (ঝাঁকিয়া বসিল)?

সমীর : গতরটা খারাপ-

বাদশাহ : তাইতো, শরীরে জ্বর (ধরে)

সমীর : বহেন, কাশেম, খাদেম, ভাইজান।

কাশেম : হ, বয়েস শেষ অইলে কী আর ছাড়ে অসুখে-

আমাদের চৌধুরাণী-

খাদেম : অসুখটা বেশি একটু চেয়ারম্যান।

বাদশাহ : সমীর তোমার লাগি,

গোলোকোজ বিসকিট আর-

এই, এই একটা আনারস

আনলুম চাইছিলুম- আপুর বেদেনা

সিজন চাড়া কি আর কুয়ামে খায়-

পাওয়া?

নে মা নে, তুই ভেতরে গিয়ে-

ওসব কেটে দে, তোর বাবাকে

যা মা, ভেতরে যা-

লতা : বা' বা, বাবা

সমীর : নে মা, তোর চাচ দিয়েছে যখন

(হাতে রয়ে লতার প্রস্থান)

খাদেম : আচ্ছা সমীর, বয়েস হয়েছে

তোমার মেয়ের

তোমর' দিনতো গেলই

দিবে না, মেয়ের বিয়ে-

কাশেম : তা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে

করতেই হবে বিয়ের ব্যবস্থা।

নইলে-

বাদশাহ : তা সমীর তোমাকে সারা জীবনই

তো দেখে এলাম । এখন,
অঁ্যা তোমার মেয়ে আমিই নেবে,
কাঞ্চনের লাগি, বর দেখতে
হবে না-

কাশেম ঃ আরে এতো, ভাল আরও
সমরি মিয়া তো গরীব মানুষ
এখন বিয়ের কাজটি যদি
আপনি নেন- তাহলে-

বংশ রক্ষা হবে যে
খাদেম ঃ তা বৈ কি?

বাদশাহ ঃ আরে কামে, তুমি হয়ত-
জান না, আজ থেকে বছর তিনেক
আগে, এ আলাপ হয়েছিল
সমরি আর আমার মধ্যে
নতুন কিছু নয় । হি, হি, হি,
নাকি সমীর, হি, হি, হি
সমীর ঃ আমার কথা কইতে হয় বড্ড কষ্ট
বাদশা, আপনারা যা ভার বুঝেন
করে ।

আ- মার দিন শেষ অইয়া
আইছে ।

বাদশাহ ঃ এখন আর বসে থাকা ঠিক নয়
দরকার ডাক্তারের । কই, লতা
মা, তোমার বাবাকে দেখো,
আসুন আপনারা ।

খাদেম ঃ চলুন ।

কাশেম ঃ চলুন ।

(প্রস্থান)

লতার প্রবেশ

লতা ঃ বাবা, বাবা,

(হাতে ফলারের ট্রয়)

সমীর ঃ অঙ্কুট স্বর) মা

লতা ঃ বাবা, বাবা

ওরা, কী বলে গেছে বাবা,
সমীর : অতি নিকটে মা, আমার যাবার সময়
দুটো কথা, তোকে বলা কর্তব্য
মা, আজ থেকে বছর তিনেক আগে
বদশার সাথে চিল কথা—
তার পোলার সাথে বিয়ে দিমু তোর
আর সেই থেকে তোর লেখাপড়ার
যুগিয়েছে খরচ— বাদ—শা—হ
মা—আ, তো—উ—কে খুব কঅ—ষ্ট
দিয়েছি মা—আ
আ—আ—মাকে মাফ করে দিস মা
লা—ইলাহা—ইল্লালালাহু ।
লতা : বাবা, বাবা, বাবা
(ঝাঁকি দিয়ে ক্রমাগত উচ্চ স্বরে চিৎকার)
বা....বা (রোদন)
(একটু পরে জুয়েল ও হোসেল টুপি পরিহত হয়ে আমারে এবং
লাশের ওপর ফকিন জড়াবে)
লতা : (জুয়েলের জড়িয়ে) আমার সব শেষ হয়ে গেলো জুয়েল,
শেষ হয়ে গেলো সব আমার.....(কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে)
জুয়েল : কে—দো—না লতা, লতা
(কেঁদোনা (অশ্রু বিজড়িত হয়ে অস্ফুট করুন কণ্ঠ)
[তারপর ধীরে ধীরে লাশ নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করবে— রোদন করতে করতে জুয়েলকে
জড়িয়ে লতাও মঞ্চ ত্যাগ করবে]
(মধ্যবর্তী সময় করণ সুরে বাঁশের বাঁশি বাজতে পারে০
একটু পরে তলতার
পুনঃ প্রবেশ : (এলোমেলো কেশ পাগলিনী বেশে লতা গাইবে)
দয়ালরে এই কী তোর বিচার
এই কি তোর বিচার
অভাগারে বিনাদোষে মর্মে তীর
করলে জীবন নিঃসাড় ।
নারী কুলে জনম লইয়া হইলাম
আমি পুড়িয়া ছারখার ।
এ জগতে কাড়িয়া নিরে মা-বাপ আমার

আপন যেজন ছিল হায়রে রইল না যে আর—
(রোদন করতে করতে বসে পড়বে)

প্রবেশ :

জুয়েল : লতা ! লতা !

লতা : বাবা, বাবা, আমায় বিক্রি করে গেছে।

জুয়েল, আমি আর বাঁচতে চাইনা, জুয়েল।

চাই না, বাঁচতে আর

বাঁচতে চাই না আর, জুয়েল।

(কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

জুয়েল : লতা ! লতা !! লতা !!!

ঈশ্বর হে নিষ্ঠুর ঈশ্বর এর নাম

দিয়েছ জীবন— ঈশ্বর এরই নাম

দিয়েছ জীবন—

আরও দাও

অমন কঠোর দন্ড দাও, তুমি

করবে— করবে

নিতে নিতে পারতে না।

শাশানে তো মন থাকে না

ওখানে থাকে দেহের এই

রক্ত মাংশের পোড়া ছাই পোড়া ছাই।

তুই, তুই, সাজাটা ওখানে পারতি,

না দিতে ভগবান

পারতি না দিতে!!

হা হা হা হা

তা, তা দিবে কেন

হ্যাঁ তা দিবে কেন হ্যাঁ

তা দিবে কেন, কড়াইয়ে

বাজা মাচের মত

জ্বালাও জ্বালাও আরো

দাও আঘাত, বুকে আরো

দাও, আরো দাও, আরো দাও—

(কান্না বিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রস্থান)

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

(বিয়ের দূজন, ছেলে ও মেয়ে বিয়ের গান গাইবে। লতা
কাঁদতে থাকবে)

বিয়ার বাদ্য বাজে কন্যা, বিয়ার বাদ্য বাজে
মেহেন্দী হাতে, হলুদ গায়ে, গয়না পড়ে কন্যা বিয়ের সাজেরে
বন্যা বিয়ের সাজে, সাজে

বিয়ের বাদ্য বাজে বিয়ের বাদ্য বাজে।
বিয়ের টুপি, মাথায় করে, ঝিলিমিলি হার—
গলায় পরে বরে

বিয়ের সাজে সাজেরে, বিয়ের সাজে
ঐ.....ঐ.....ঐ.

দোয়া করি সবাই মোরা গো মোরা সবাই
দোয়াকরি সুখি হও জীবন মাঝে
(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুয়েল ও সোহেলের প্রবেশ : (ধীর পদে)
সোহেল : সমস্ত পৃথিবীটা খেয়েচে আঁধারে
সাপ-বাঘ-শ্বাপদে পূর্ণ এ ধরাতল
সমুকে খাদ, পিছনে পাহাড়, ডানে
বামে জ্বলছে আগুন নীল নকশার
বিবেক যাবে কোথা? নাহ্ তবে
কী অমর করে পৃথিবীর স্বাদ নিয়ে
যেতে হবে চলে? না, না, না,
ঐ ঐযে পশ্চিমাকাশে আলোর
নিভু, নিবু আমার তারা একটা,
হয়ত জীবনের মধ্য তিমিরে ফুটবে
চাঁদ, লসিরা লক্ষ ছায়াপথ!
সামনে অনেক অনেক পথ হবে যেতে

অনেকদূর, বনজঙ্গল পর্বত পেরিয়ে

অভীষ্টের পথে ঝল্‌ঝল্‌ লখ। থ

ঘীথে ঞ্ঠে। অঘাত কাঁটার

জীবনের কোমল হৃদয়ে।

তারপর রক্তের চিহ্নায় ভারবাসার

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়েকে হবে বানাতে

কঠিন কঠোর তলোয়ার কাটতে

অন্যায়ের আগাছা বুনতে হবে,

হবে, সংগ্রামের উর্বর বীজ।

জুয়েল! জীবনের বসন্তের গান শেষ

এসেছে, কাল বৈশেষীর ঝড়, গুরু

হলো গ্রীষ্মের তোলপাড়!

হবে ফেলতে বিপ্লবের কচি ধানের

চারা

এখন শক্ত করে হবে ধরতে

জীবন নৌকা! চলবে না, বর্ষার

অশ্রুবৃষ্টিতে ভাসলে,

ভরাভাদরে উথাল পাখাল নদী

কখন যে যাবে তলিয়ে অথৈজলে—

যৌবন শরতে সত্যের মালঞ্চ

বিলাইবে, কৃষ্ণ পক্ষের রাতে!

জুয়েল! জুয়েল! জুয়েল!

রক্তের ক্ষেতে—

হেমন্তে আসবে সংগ্রামের অধিকারের

প্রতিশোধের এক সোনালী ফসল—

জুয়েল : (সোহলের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল)

সোহেল : কেঁদো না বন্ধু তোমার পাশেতো

আছি আমি, আজীবন আমরণ

তোমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণে আমার

পৃথিবীও কাঁপছে, প্রবল ভূমিকম্পে

ধ্বসে পড়ছে বিবেকহ্রু উপত্যকা।

প্রিয়বন্ধু আমার হারাব জীবন দুঃখ

নাই, ধরিনী মা ডেকে এনেছে—

অভাব অনটনের ঘরে,-
প্রিয়জন গ্যাচে হারিয়ে-
তারপর করতে করতে মানবতার
যুদ্ধ ফেলবে জীবন পুষ্প ঝরিয়ে-
আসতে চাইনিতো মোরা
অশনির দেখতে মুখ-
ধূমকেতু হযে অশনির মুখ
করব পুড়ে ছাই!
ওরে চঞ্চল, দাড়িয়ে কেন,
দাও! জবাব দাও! জবাব দাও!!!
জুয়েল ঃ বন্ধু, আজ রক্ত মাংসের হাত-
গাঁ ছুয়ে, করচে প্রতিজ্ঞা
যতদিন না হবে মানবতার
মুক্তি, অন্যায় জুলুম, অভিজাত্রেল
শিকড়, দরিদ্র নিঃশ্ব এতিমের
জীবন থেকে, উৎখাত, উপড়ে
না ফেলব ততদিন পর্যন্ত
বিদ্রোহ করেই যাব-
আমার বুকের শেষ রক্ত বিন্দু
দিয়ে হলেও বর্জোয়া
রক্ষণশীলতার যাতাকলে
পিস্ট অসহায় মুগ কলাই
নারী পুরুষকে মুক্তি দিয়ে
ছাড়ব তবে।
সোহেল আমার খন্ড-বিখন্ড
কলিজার ইচ্ছের মুষ্টি
প্রতিশোধের বারুদ দাউ দাউ
জ্বলছে- বড়ই তৃষ্ণার্ত সে-
রক্তাক্ত কলিজা, রক্ত পিয়াসী
-অপদেবতার ভ্রু
খেতেই হবে, আমাকে খেতেই
হবে, খেতেই হবে।
(দ্রুত প্রস্থান)

সোহেল জুয়েল! জুয়েল! জুয়েল!!! শুন!!!

না, সে চলেই গেল।

(মনেমনে) তা বিপ্লবের খসড়াটা আজ রাতেই করতে হবে।

সময় নেই বেশি!

সেই সময় বেশি।

(প্রস্থান)

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন : শেষ পর্যন্ত জমিটা হারাইতে

অইব, বগবান মালুম। এই একটা

ধানি জমি যদিদিনিয়া যায় ঘোষেল পো

বউ-ছেলে পোলা লয়ে নাখেয়ে

মরতে অইব।

না, যেভাবেই অক চৌধুরী বাবু

ধইর্যা জমিডা আমার পেতেই অইব,

যাই দেহি উনি কী কয়

যদি কিছু লাগে তা লাগুক,

জমিডাত পাইলাম,

যাই, যাইয়া দেহি

এই- এইহ্ তো চৌধুরী বাবু

এই দিনেই আইত্যাছে-

অহন, কইমু

(দেখিয়া) আদাব, চৌধুরী বাবু আদাব-

প্রবেশ :

কাশেম চৌধুরী : আদাব,

নরেন : কই যাইত্যাছেন,

চৌধুরী : তোরা রাস্তা ঘাটে করস কেন বিরক্ত! এই জন্য যে কয়

ভালা মাচের পানি, ভালা কাপড়ের

কানি, নইলে কী আর চৌধুরী-

নরেন : (হার কচলাইতে কচলাইতে) তা বাবু

কাশেম চৌধুরী : যাইত্যাছি উপজেরা কোটে

আছে কেইস। তাতোর কী

আছে প্রয়োজন বল-

তাড়াতাড়ি কর, দশটা গ্যাছে

বাইজ্য- সময় নাই
ক, তাড়া তাড়ি কইয়্যালা-
নরেন : কইছলাম কী চৌধুরী বাবু
পশ্চিম বন্দের জমিডা লইয়া
ঘোষের পোর লগে আমার
ঝগড়া অইত্যাছে-
যদি এর একটা বিহিত মিমাংসা
কইর্যা দেন তা অইলে
গোলাপান লইয়া বাঁচি-
আর কইছলাম কী,
বিচারটা যদি আমার পক্ষে
কইর্যা দেন- তয়
কিছ বখশিশ-
কাশেম : অঁয়া হামজাদ ক'সকী
ন্যায়-অন্যায় আছে না?
তাবে তুই যহন জোড় ধরত্যাছস
তবে কামডা কইর্যা দিবার পানি
টেকা-লাগবো দুই হাজার
সম্পত্তিডা থাকবে তোরই বুঝলি?
নরেন : গোলাপান লইয়া না খাইয়া
আছি অত টাকা পামু কই?
কইছিলুম কী কম-টম-
কাশেম : মাছের বাজারের দর আরাম্ভ
করছস, না? এই জন্যই কই
তোরা ছোটলোক,- নইলে
আমি কাশেম চৌধুরী-
যারে দশ গোরামের মানুষে চিনে
বিচারে, আচারে, আমার ওপর
দিয়া আরকে আছে বল,
আ, ১০টা বাইজ্যাই গেলে
এই আমি গেলাম
টেকা লইয়া গোপনে বাড়ি-
দেকা করিস, আর

বিচারের তারিখ লইয়া—

আইস, যাওসব—

(প্রস্থান)

নরেন : অহন টেকা রাও করি কেমনে?

সম্বলতো পাইত্রাছিলা কিছু

একটা ষাড় বাছুর আছে মাত্র

বেইচ্ছা দিয়া দিমু?

বউয়ের লগে বুইব্যা দেহি,

রাম, রাম, জান তুমি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রবেশ :

ইয়েল : মহাজন গেলো কই, বেলা যাইত্যাছেগা

তা মাপ দিমু কোন সময় ? ধুতুরি,

ক্ষুধাও লাইগ্যা আইছে, যদি বাজি

রুটি কিছু খাইয়া আহি !

এই হানে ও তাওক ছালাডা কেউ

নিবু না,— নাহ নিইয়া যাইলগে

কেউ লইয়া গেলে ফেরে পরবাম।

(প্রস্থান)

খাদেম : কই, কই কয়ের, কটটুয়া

কুত্তার বাইচা কামের সময়

অইলে পালায়—

কটটুয়া : মাজন, আইত্যাছি মাজন

ফেডের ভুক লাগজিন

গেছলাম খাইবার।

খাদেম : আরে কুত্তার বাইচা আর

ফেট্টা আর স্টেট টাইসার।

এই হুন, আমি যাইত্যাছি মাল আনতে

এনো আয় আরও ভিন্তে আয়না

এঁয়া ডরাস নাহি—

হুন, এই দশ মণ চাউলের লগে

তিন মণ কাঁকর আর বালু মিয়াইয়া

দিস্- ভাল কইয়া মিকহার করবি
বুঝহুস্? বস্তু দুই একটা লাগলে
এই হান থনে লইছ।

আর কাঞ্চন আইলে কইছ
দেহা করে যেন আমার লগে।
আমাগো টাক্ আটক পড়ছে
করিমগঞ্জ, টেক দিয়া ছুড়াইয়া
আনতে অইব- ভেজাল খালি
লাইগ্যাই আছে।

(প্রস্থান)

মাতু ও টান্ডুর প্রবেশঃ
মাতুঃ ঠান্ডু চাচা, কি জানি কইব,
জুয়েল চাচা আইত্যাছে না কেন।
আমরা অইলাম গেয়া কামের মানুষ
পরে মুজুরী করি, বউ-বেড়া লইয়া বাঁচি।
ঠান্ডুঃ তাই কই, একটু বেরা অইলেই তো কামলার
দাম যায় অইম্যা

মাতু যা-ই কও জুয়েরের মতন
স্বভাবে চরিত্রে অমন ছেলে হয় না আর
শিক্ষিত, অলি কী অইবো তার
ভিত্তে নাই হিংসা গৌরব
চাচার মত এক্কেবারে সরল ছেলে।
মাতুঃ কইছ ঠিহেই বাইচা, অমন ছেলে অয়না
কেডা আইত্যাছে যেন, ও, পানু আর ওসমান,
ওসমানের প্রবেশঃ

পানুঃ মাতু চাচা, ঠান্ডু দাদা
এহানে তোমরা করত্যাছ কী?
মাতুঃ করমু আর কি? আমাগো করার
আছে কী? কাইল সহালে কইছিন
জুয়েল, আইবার, আইলাম তাই।
ওসমানঃ আমাগোও তো আইবার কইছিন জুয়েল ভাই
ঠান্ডুঃ তোমরাও কও যা-ই
আমার মন কইত্যাছে, মতলব কোন,

জুয়েলের, জুয়েলের, না অইলে—

প্রবেশ :

মাতু : ঠাণ্ডু পানু : এতিো জুয়েল ভাই আইছে (একযোগে)

জুয়েল : হয়ে গেল একটু দেরী। বলব পরে

কারণটা অবশ্যই। তার আগে বলুন

আপনারা আছেন কে কেমন? (সহাস্যমুখে)

মাতু-ঠাণ্ডু-পানু

ওসমান : আমাগো আর কেমনে তাহা

দেখত্যাছ যা তাই? (একযোগে)

জুয়েল : আচ্ছা, আচ্ছা, শুনুন তাহলে—

দেরি হওয়ার কারণটা আমার!

গেছিলাম বেনিয়ার দোকানে,

ঘড়ির দোকানে আর কাপড়ের দোকানে—

ঠাণ্ডু : কে-র লাগি, গেছিলা, বাবা?

জুয়েল : জানবেন, তাও। এখন বলুন

আপনারা কনে, কে করেন কী কাজ?

সবাই : আমরা সবাই খাটি কামলা?

জুয়েল : এ-তে কচিলে সংসার?

টাণ্ডু : কোন রহমে। কাম না পাইলে

উপোস করতে অয়।

জুয়েল : যদি বলি, আজ থেকে অন্যের বাড়িতে

করতে অইব না কাম। করতে না,

হবে বউ বাচ্চা নিয়ে উপোস—

নিজর মুজুরী করবেন নিজে আছেন বাজি?

সবাই : কও কী জুয়েল?

জুয়েল : বলেছি ঠিকই— নিন এই দু'হাজার

টাকা, ঠাণ্ডু চাচা। আর আপনারা আপনাদের পছন্দমত একটা পেশা নি বেছে।

সবাই : জুয়েল!!!

জুয়েল : অবাক হবার নেই কিছু। এ টাকা

আপনাদের প্রতি আমার ভালবাসার

ক্ষুদ্র উপহার মাত্র।

সবাই : জুয়েল!!!

জুয়েল : আপনারা আবেগে তাড়িত না হয়ে ভাবুন করবেন কী?

পানু : জুয়ের ভাই জানি বাঁশির কাজ আমি কুলা-চাটাই-টুপরি পানি বুনতে ।

মাতু : পারি আমিও ।

ঠাডু : জানি এইতো আমিও । করতে হয়

ইচ্ছে, পারি না, টাকার অভাবে ।

ওসমান : আমি কিছুই পানি করতে জুয়েল ভাই ।

জুয়েল : আছে ঠিক । স্বভাব জানা হবে থাকতে নেই এর কোন মানে । আপনি না হয় এসব করবেন বিক্রী বাজারে । বলেন কী?

ওসমান : পারব তা !

জুয়েল : আজ তেকে হল ঠিক ও কাজটি

দ্বারা আপনারা করবেন জীবিকা নির্বাহ ।

আর সমান রেকে ব্যয়ের পরিমাণ

বিলাসিতা করে পরিহার, নতুন

শ্রমিক করবেন নিয়োগ,

সমান ভাগে, এই পূজির বাড়তি

আয়ে বুঝলেন?

জুয়েল : নষ্ট না করে সময় বাঁশ কেনার

কাজে পড়ুন বেরিয়ে । কেমন?

সবাই : ‘হ’ জুয়েল লাভ নেই কইর্যা

সময় নষ্ট, যাই আমরা ।

(প্রস্থান)

জুয়েল : আচ্ছা, আসুন—

(মনেমনে)

এমনি করেই হবে মজুর শ্রেণী

স্বাবলম্বি ! ভাগ্যের আকাশে

ফুটবে তারা-সুখের কিশলয়

আর ফুলে ফুলে ওঠবে ভরে

শেফালির সোনালি বিটব....জীবন ।

যৌথ ক্ষুদ্র শিল্পের ক্রমোন্নতি

গড়বে সম্পদের হিমালয় আর

নির্দয় বৈষম্যের লোনা টাইগ্রীসে

জাগবে শান্তির চর !

বাধবে বাড়িঘর গণজোয়ারের

প্রশান্ত উষ্ম প্রবাহে—

সোহেলের প্রবেশ : তলিয়ে যাবে টাইগ্রীস অমানবতা
আরবংশ গৌরবের বিষাক্তজল
যাবে হারিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে—
সোহেল : জুয়েল, জুয়েল বাবহিস কী,
জুয়েল : বন্ধু (কাধ ধরে) কাজ একটা ফেলেছি করে।
সোহেল : সে কীরে বল তাড়াতাড়ি বল
হচ্ছে না সহ্য মোটে—
জুয়েল : শুন তুইতো জানিস বৃদ্ধ বাবা আমার—
পেনশন ভোগী মানুষ। তাছাড়া
মরহুম দাদা রেখেগেছেন যে স্বল্প
পরিমান জমি— তার আয় খেয়ে
থাকে উদ্বৃত্ত আমাদর সংসারে—
বাবা নিশ্চিত সুখি সর্বদা করেন—
আল্লার নাম জপ।
তার তুস্টি এই যে, আমি হয়েছি শিক্ষিত।
ব্যেস মানুষের ভারবাসায় মন প্রাণ করি উজাড়
চান তিনি অন্তরে—
যাক, মা-মারা যাবার সময় গেছেন রেখে
কিছু গহনাগটি। উদ্দেশ্য, দিবেন আমার কল্পিত বউকে
আচ্ছা এখন, আমার বউয়ের কথা
অবিদিত নয় তোমার। তবে তোমার উদ্দেশ্য লতার
লক্ষ্য, আমার ইচ্ছা রাণীর সাধ একই। সুতরাং
মা যদি থাকতেন বেঁচে এবং লতা যদি হত ঘরনী
আমার তাহলে এ গহনা পেত নির্গাত লতা
এবং আমি করেছি যা লতা ও করিত তা
তাই আমি, গনা সব, হাতের কড়ি লতা
প্রদত্ত আংটি এবং বাবা প্রদত্ত শীতের শাল
তারাকান্দি বাজারে করেছি বিক্রয়।
পেলাম সর্ব সাকুর্যে দু'হাজার টাকা
আর সেই টাকা পাচু, ঠাণ্ডু মাতৃ আর—
ওসমানক দিয়ে দিলেম লাগিয়ে
ক্ষুদ্র শিল্প বাঁশ বেতের কাজে।
কাজ তো এটাই। স্বপনের গোলাম শাখা

হলো পোঁতা সর্বসহায়—

ফুল ফুটবেই বন্ধু ফুটবেই

(চুমু দিল)

জুয়েল : আচ্ছা সোহেল আর কি করা যায় ।

সোহেল : আর কি যায় করা , আর কি যায় করা

হ্যাঁ মনে পড়েছে ঠিক ।

এদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনন্দের

হবে প্রয়োজন । নইলে কাজে আসবে

একঘেয়েমী ক্রমশ; হবে অলস

এবং শেষে উৎপাদন যাবেকমে ।

এতে নাও হতে উদ্দেশ্য সফল ।

অতএব , আমাদের সাংস্কৃতিক জোয়ার

আনতে হবে , দেশজ উপাদান নিয়ে

যেমন জারি , গান , সারি গান নাচ—

কোরাশ । এগুলো যুগারে মনে

রস— পাবে নূতন জীবন । উৎপাদন হবে দ্বিগুন ।

জুয়েল : এ কাজটি রাণীকে দিয়ে যায় করা ।

সোহেল : বলেছ ঠিকই— রাণীর ওপর

এ দায়িত্ব দিতে হবে ছেড়ে ।

জুয়েল : এখন গ্রামে গিয়ে মিনিমাম গরীবের

করি তৈরী তালিকা । চল সোহেল চল

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রবেশ :

বাদশাহ : মৌলভী সাব কেয়ার বুঝলেন কেয়ার বিদেশী সংস্থা একটি দিয়া থাকে সাহায্য

আমাদের; তবে সাহায্য টা যে ব্যবস্থায়

দিয়ে থাকে তা আমার মনপুত নয় তেমন

এই যে , গ্রামের দুশ্চরিত্রা , তালাকপ্রাপ্তা

মেয়েরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

করে লাভ । এতে তারা বেপরোয়া মাঠে ঘাটে

করে যা খুশি তা আপনি মনে করেন কী?

কলিম : নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক— মাঠে

ঘাটে কেটে বেড়াবে মাটি মেয়েরা
এত গর্হিত কাজ, বেপর্দায় সমাজে
অনাচার করে, সমাজকে করবে কলুষিত
এতজানা কতা, সবি আল্লার ইচ্ছা
দুনিয়াডা অইল কী?

প্রবেশ :

অঞ্জনা : (টুপরিহাতে) চেয়ারম্যান, পেটের দায়ে
আমি মাটি কাটি করি কাজ। তাই বলে
করতে চাইনা বিনিময় ইজ্জত।

গরবি নিঃশ্ব বলে আমার ওপর—

বাদশাহ : কেন হলো কী তোর?

অঞ্জনা : আপনার ছেলে কাঞ্চন আমার—

বাদশাহ : (দাঁতখিচিয়ে) আমার করেছে কী—

কইয়া ফেল লজ্জা পাইত্যাছস্ কেন? অ্যা

অঞ্জনা : আমার ই-ই-ইজ্জত লুটেছে।

বাদশাহ : দূরহ হারামজাদী। মুখনয়

যতবড় কথা তার চেয়ে বড়। আমার

ছেলে সম্পর্কে করতে এ রকম উক্তি

সাহস পেলি কোথা। এখনও

আছে দাঁড়িয়ে— সরে যা সামনে

থেকে নইলে—

অঞ্জনা : নইলে করবেন কী করুন

করুন, করুন যা ইচ্ছে করুন—

গরীবের ইজ্জত এমনি করই

হোক ভুলুষ্ঠিত, এই— এই

কী তুমি চাও,। হে ঈশ্বর,

পেলাম না বিচার, পেলামনা

হে ঈশ্বর। কান্না শুন, আমার

আত্মার, শুন, আমার ফরিয়াদ

তোমার কাছেই রইল বিচার।

বাদশাহ : বিচার! হাঁ হাঁ হাঁ

বিচার!

আল্লাহ নয় পাগল যে,

তোরমত চরিত্রহীনার কথা

শুনে!! যা কুমিরের কান্নায়

গলিবেনা মন আমার

আমার ছেলের ওপর দেয়ার জন্যে

মিথ্যে অপবাদ নাই

চাকরী তোর আজ থেকে—

যা—

অঞ্জনা : দোহাই আপনার আমার পেটে দেবেন না লাথি, দোহাই—আপনার ।

আ— আমার ইজ্জতের বিচার

আ— মি তুইল্যা নিলাম! তুইল্যা নিলাম!!

তুইল্যানিলাম!!!

(কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

বাদশাহ : দেখলে হে মৌলভী, পার্জিঁ

কেমন এরা?

কলিম : তওবা; তওবা, আছে হাদিছে,

নামী দামী মানুষের নামে কুৎসা

অপবাদ দিতে নেই অকারণে—

সবি আল্লার ইচ্ছা মেয়েডা

কামাইল গুনাহ; আহারে—

দুনিয়াডা অইল কী, সবি ইচ্ছা

আল্লার, উটি চেয়ারম্যান সাব

সময় অইয়া গেল জহুরের নামাজের ।

আস, সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

সবি আল্লাহর ইচ্ছা.... ।

(যাইতে, যাইতে)

বাদশাহ : আসেন! বেতমিজ মেয়েদের জ্বালায় বাঁচিনে আর ।

(দাড়াইবে)

কাশেম : করত্যাচেন কী চেয়ারম্যান সাব হুকুহ কুহুহ,কহুহ—

বাদশাহ : কে, ও চৌধুরী সাব?

আসেন, আসেন

অ্যা বসুন, বসুন, এইখানে

খুজিতেছিলুম আপনাকে মনে মনে

কাশেম : আরে, এ চৌধুরীকে সবাই

মনে, মনে, খুজে আদরে, ভালবাসায়
তা আচে কেমন?
বাদশাহ ঃ না ভাই শরীরটা ভাল নয় তেমন
না না চিন্তায় হাই প্রেসারটা
যাচ্ছে বেড়ে ক্রমশ—
কাশেম ঃ হ্ চিন্তায় হাই প্রেসারটা যাচ্ছে বেড়ে ক্রমশ—
কাশেম ঃ ধরুন, এই এই দলিল টা দস্তখত আছে দেয়া,
সাব রেজিঃ গিয়া আনিবেন
দলিল পাকা করাইয়া আর
দিবেন অফিসারকে আমার ছালাম
বলবেন, তিনি অসুস্থ বুঝলেন,
টেকা আগেই আছে দেয়া—
কাশেম ঃ আরে চৌধুরী, দলিল সম্পর্কিত
জ্ঞানে একেবারে লোক পাকা
দেখবেন ঠিকই কাজ আনছে গুছিয়ে
অঁ্যা, এ দেখি আপনার মৃত বেহাইয়ের বাড়ির দলিল—
বাদশাহ ঃ বাড়িটা নিজের নামে করাইয়া নিতে চাই—
হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা—
কাশেম ঃ তা মেয়ে যখন আপনার ঘরে—
তখন সম্পত্তি আপনারই—
তাছাড়া সমীরের নেই কোন ওয়ারিশান!!
এই— ই তো সুযোগ হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা—
দলিল জাল করার হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা
বাদশাহ ঃ হবে না তো কোন অসুবিধা?
কাশেম ঃ আরে না, না
বাদশাহ ঃ চলুন, তাহলে
কাশেম ঃ চলুন আমার উপজেলা হবে যেতে?
(প্রস্থান উভয়ের)

পঞ্চম দৃশ্য
ওসমান ও পানুর প্রবেশ ঃ
ওসমান ঃ বেশ সুখে কাটত্যাছে দিনডা
এখন পানু। দুবেলা বউ ছেলে

লয়ে চারটি পারি খেতে ।

পানু : আসলে জুয়েল ভাইয়ের মত হয় না

মানুষ । আমি বেঁচে গেছি ওসমান ,

ঠান্ডু ও মাতুর প্রবেশ :

ঠান্ডু : ভাতিজারা আছস্ নিরে ।

পানু : হা চাচা কাটাইতেছি কাজের ফাঁক অবসর ।

মাতু : হ' অবসর কাটাইবা নাহ্ !

খোদার ফজলে আমাগো জুয়েল ভাই

আমাগো দিন দিছে ফিরাইয়া—

ঠান্ডু : রাতের শেষে সখের বেশে আইল সুখের দিন

কাজ করি , ভাত খাই , বৌঝি লয়ে আছি ভাবনাহীণ ।

মাতু-পানু-ওসমান : ঠান্ডু চাচা , সুখে কাটতে করেছে শুরু দিন ।

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ)– (একযোগে)

ওসমান : তা হলে আমরাও কাটি ছড়া

জুয়েল ভাইয়ের মহা ইচ্ছা হয় যেনগো পূরণ

(হাসি) মুঞ্জুর শ্রেণী সুখী হবে খোলবে জীবন তোরণ ।

রাণীর প্রবেশ :

রাণী : কী ব্যাপার আপনারা হাসছেন যে

খুব লাগছে ভাল বুঝি?

সবাই : লাগবে না কেন? ভাল ওগো মোদের রাণী

আইলেন যখন অবসর ক্ষণে গান গাইবেন জানি

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—

রাণী : আমাকেও আপনাদের ভেতর

নিয়েছেন টেনে দেখছি । ভাল আসলে

অবসর সময়টা আনন্দে কাটলে

কাজের স্পৃহা যায় বেড়ে । তাই না?

সবাই : হ আপা কইছেন ঠিকই ।

ওসমান : আপা আমরা শুনতে চাই গান

রাণী : হ্যাঁ গাইব গান । তবে সে কোন গান বলুন তো?

ওসমান : কাজের গান !!

রাণী : হ্যাঁ বলেছেন ঠিক চলতি জীবনে কাজের সাথে যে গানের কথা ও সুরের

আছে মির সেইগান যেন শুনতে লাগে ভাল তেমনি মনেও সুখ কিংবা দুঃখ

অনুভূতির হয় সঞ্চর । আসুন এই ধরনের একটি গাই গান । গানটি সমবেত স্বরে—

সবাইকে হবে গাইতে । আমি যেমন করে গাই আপনারাও তেমনি গাইবেন
কেমন?

তাহলে আরাভ হোক

রেডিও ওয়ান টুথ

ওয়ান টু

ওয়ান টু

আরে ও মানুষ ভাই, মোদের সুখের সীমা নাই ।

মনদিয়া কাজ করিয়া স্বাধীন অবসর যখন পাই ।

ওরে আয় আয় তোরা

কিশোর যুবক বুড়া

সুখের জীবন করতে মোরা জুলুমবাজের পথ রুখিয়া দাড়াই

নাইরে মোদের দুঃখ নাই নাই নাই ।

গাইরে সুকের জারি গাই গাই গাই ।

মুনাফা পুঁজি সবই সবার আছি আছি চিন্তাই না ।

পাই সুনাম জগৎ জোড়া ।

তাই হাতের কাজে মোরা ।

অলসতা ঘৃণা করে যাই দূরে থাকে রোগ শোক বালাই ।

রাণী : গানটি লাগল কেমন?

সবাই : ভাল

রাণী : তা হলে রোজ রোজ এমনি কাজের গান

গাইব সবাই । তা ছাড়া ছড়া কাঁটা

ধাঁ ধাঁ বস কৌতুক ইত্যাদিও থাকবে

অবসর যাপনের আনন্দ তালিকায়, কেমন?

সবাই : জী আপা

রাণী : আজ তা হলে আসর ভঙ্গ হলো ।

সবাই : চল ।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

প্রবেশ :

বাদশাহ : চৌধুরী সাহেব ফিররে কখন?

কাশেম : আপনার কামড়া করতে একটু রাইত অইছে ।

বাদশাহ : দেখি দলিল টা-

কাশেম : অ্যাঁ, এই এই দিন ।

বাদশাহ : (পড়তে পড়তে) এ-কে বারে পাকা কাম।

কাশেম : দেখতে হবেনা কামড়া করছে কে?

আহা-হা এষে কাশেম চৌধুরী

বাদশাহ : (অন্য দিকে ফিরে) আরে একি দারোগা সাব তা কী ব্যাপার, এই ই নরেন? তোর এই দশা? তা দারোগা সব এতো ভাল মানুষ, যতদূর জানি হিরীহও বটে।

দারোগা : তা জানিনে। এই নরেন চক্রবর্তীর নামে সার্টিফিকেট কেইস আছে। একশ, কোটি টাকার বিদেশী সংস্থার দেয়, সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে যে ঋণটা দেয়া হয় বিশেষ করে ইরি, বোরো, আউমের ঋণ- তিনি ঐ- স্কীমের আওতায় নারিন্দা শাখা হতে ৪০০০ টাকা ঋণ করেছিলেন গ্রহণ। ১০% চক্রবৃদ্ধিহার সুদে ৫ বছরে সেই টাকা দাড়িয়েছে ১০০০ টাকায়। বর্তমানে ঋণের সমুদয় টাকা ফেরত দানে অক্ষম বিধায় সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ঋণ স্বত্ব বিধিমোতাবেক থানায় করেছেন সার্টিফিকেট কেইস। আমরা ওয়রেন্ট ইস্যুর মাধ্যমে তাকে সরকারী হেফাজতে অর্থাৎ এরেস্ট করতে হয়েছি বাধ্য।

বাদশাহ : সে যা-ই হোক তার এণর টাকাটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

নরেন : দাদা-দাদা-দা-দা (হাউ মাউ কেঁদে দিল)

ওকে করবেন না মারধর।

আরেকটা করা দারোগার মার

নরেন : দা-দা

বাদশাহ : কাদিসনে নরেন, আমরা কালই তোকে নিয়ে আসব জামিনে (ধরে)

দারোগা : ঠিক আছে চেয়ারম্যান সাহেব, আমি তাহলে

খোদাহাফেজ।

বাদশাহ : খোদা হাফেজ।

কাশেম : চেয়ারম্যান এই কাজ করলেন একটা

কাম জানাইলেন-

বাদশাহ : নরেনের কি আর আছে সামর্থ্য এই যে টাকা ফেরৎ দেয়? অতএব

জমিটা স্বল্পমূল্যে কিনে নেব কিনে।

কাশেম : সেই কথাইতো বলেছিলুম আমি

বাদশাহ : আচ্ছা তাহলে উঠি কেমন

কাশেম : হ্যাঁ তাই উঠি

(প্রস্থান)

জুয়েল : শোন সোহেল, যে একশ জন মুজুর পেলাম যারা অন্যের আয়ের ওপর করে নির্ভর

অনুকম্প দয়ার উপর

বেঁচে থাকে- আর ৩০ জনে ভিক্ষুক

বললাম মোট ১৩০ জন

এদেরকে- কিভাবে সুষ্ঠুকর্ম

সংস্থান যায় করা।

জুয়েল : এদের কাজের দক্ষতার উপর

নির্ভর করবে আয়ের পথ।

এখানে দক্ষ ও অদক্ষ কারিগর দুইই সমান থাকে যদি তবে পুজির

হবে- না অভাব।

জুয়েল : কিভাবে- সেটা।

সোহেল : বুঝলে না- ওরা যে কাজ করে

অর্থাৎ যে জিনিস বানায় তার বড় একটা অর্ডার নিয়া অর্ডার মারফৎ ৫০% ভাগ

টাকা নিয়া জিনিস তৈরী করব

ব্যস। চালান দিয়ে আবার সেই হারে আনব। এতে- ব্যবসায়ে বিশ্বাস জান্নাবে।

এক সময়ে পুজি চাড়াই উপকরণ পাওয়া যাবে। যাক লভ্যাংশটা তিন ভাগ করতে হবে।

দুভাগ এদের সবাইকে

হবে দিতে। এক ভাগের অর্ধেক

পুজি বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হবে।

জুয়েল : বেশ তা ঠিক

জিন্তু জায়গা পাব কোথা-

সোহেল : কেন- এই মাঠটা আমরা লিজের

ব্যবস্থা করব। -এটা

জনগণের সাধে

জুয়েল : তাহলে মাঠটা দখল করার

দরকার। চল

দেবী না করে এখনই চল।

সোহেল : চল, চল

জুয়েল : চল

(প্রস্থান)

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চন : মদ খাইতে খাইতে মাগটি বেশ মজার

রফিক : একেবারে অপসরী

কাঞ্চন : দোস্ত নেশা ডরছে—

জুয়েল : এই শুয়োরের বাচ্ছা একানে

চলবে না এই মাতলামী

আর যদি কোন দিন দেখি

তবে...টুটি চেপে ধরে।

কাঞ্চন : এই সাঠটা আমার তুই কে

জুয়েল : মাঠটা জনগণের। আর আমি তোর যম....

কাঞ্চন : বেশী বাড়াবাড়ি করলে—

জুয়েল : গেলে দেবে তাই না....?

কাঞ্চন : জানিস আমি চেয়ারম্যানের ছেলে?

জুয়েল : জানি জানি তোর চেয়ারম্যান

বাবাকে বলে দিস— এ মাঠ কারও

ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়— জনগণের।

অতএব, যদি কেউ পোদ্দারী করতে

যদি চেয়ারম্যান বংশ

তার অর্থের সিল দিয়ে পোদ্দারী

করতে আসে তবে রক্ষে নেই

মানুষ ঘাড় ভেঙ্গে দেবে— ধূলির

সাথে মিশিয়ে দেবে— প্রয়োজনে—

কাঞ্চন : কী এত বড় কথা— রাখ

দেখাচ্ছি মজা— আয়—

রফিক— দেখে নেবো কত ধানে

কত চাল

(প্রস্থান)

জুয়েল : হুম—

সোহেল : জুয়েল জুয়েল এই যে দেখ

দ্রব্যাদির অর্ডার নিয়ে এসেছি

X and Y ট্রেড কোম্পানী ৫০% দিয়েছে অগ্রিম টাকা এখন জিনিস দেবার পারলেই হয়

লোকতো আছে কিন্তু স্থানের দরকার।

জুয়েল : কালই আমরা মাঠটা দখল করে নেবো। এখন চল মানুষের মাঝে

জিনিসের তালিকা বুঝিয়ে আসি এবং প্রয়োজনীয় বাঁশ সংগ্রহ করতে বলি কেমন?

সোহেল : হ্যা তাই চল

(উভয়ের প্রস্থান)

বাদশাহ : কী এত বড় কথা নাসের মাস্টারের ছেলে। আমার সহ্য হচ্ছে না খাদেম।

কাশেম : আমার শতাধিক বৎসর পুরনো বংশের উপর বিদ্রূপ বাণী। উপহাস।
অসহ্য চেয়ারম্যান অসহ্য।

খাদেম : নাসের মাস্টারের ছেলে হয় তো জানে না টাকা হলে বাঘের দুধ যায় কেনা। আর তার ঔদ্ধত্যের জন্য যে আমার টাকা দিয়ে কী শাস্তি দিতে পারি এর পরিণাম কী করেছে চিন্তা হতভাগা।

বাদশাহ : শুধু তাই নয় কাঞ্চনের মুখে শুনলাম নাকি আবোলতাবোল সাম্যবাদের শিক্ষা বিপ্লব আরম্ভ করেছে।

কাশেম : আরে চিন্তা করো না- বিপ্লব সমেত একেবারে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো

খাদেম : হা হা হা তাই তো এ যে একটা মশা।

বাদশাহ তাহলে এ বেয়াদপকে শাস্তি করতে কাল আমাদের কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে।

কাশেম : চল চল

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

স্লোগান : কাজ চাই, কাজ চাই, কাজ করার স্থান, সুযোগ চাই ইত্যাদি

জুয়েল : প্রিয় বন্ধু ও ভাইয়েরা স্বাধীন সত্তা নিয়া বাঁচতে হলে সংগ্রাম করতে হয় লড়তে হয়। তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায়ের শিকড় গেড়েছে এমনি যে আপনারা যারা মজুর শ্রমিক নামে পরিচিত তারা তাদের ভোগের উচ্ছিষ্ট খান-করুণা করে তারা ভাগ্যের দোষে। আমাদের দোষী করে। অথচ- মোদের কর্মশক্তির দ্বারা অর্জিত সম্পদ তারা দ্বিতল দশতলায় বসে বসে ভোগ করে কিছু বলতে গেলেই টুটি চেপে ধরে। ন্যায্য অধিকার থেকে হই বঞ্চিত। আজ

আপনারা ১৩০ জন শ্রমিক মজুর নিজস্ব শিল্প দক্ষতা দিয়ে যে সম্পদ উপার্জন করছেন তা নিজেরাই সমানভাবে ভাগ করবেন। এখানে কারো একক নেই অধিকার, নেই কোন বিদেশী সংস্থা শক্তির যে সাহায্যের হাত আমাদের পঙ্গু করে পরনির্ভরশীল করে আজ সেই হাত কেটে দেয়া হলো আমাদের গ্রাম আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর- ক্রমাগত উন্নত আধুনিক প্রকৌশল ব্যবহার করে একদিন বিশ্বের বুকের মানবতাবাদী সম্পদশালী বাঙালি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবো- আজকে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমরা যে কর্মশালা তৈরি করেছি তা নষ্ট ধ্বংস করার জন্য আছে অনেক অশুভ শক্তি চক্রান্ত। আমাদের উপর আঘাত আসলে প্রতিঘাতে থাকতে হবে অটল। চাই সে চিন্তায়, কর্মে এবং দৈহিক বলেই হোক। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি কিন্তু আপনারা সম্মিলিতভাবে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন অকুতোভয়ে দৃঢ় প্রত্যাশা মনে পোষণ করি আমি নির্ভয় নির্ভিক পৃথিবীর কোন অন্যায় শক্তিকেই করি না ভয়। অতএব আমাদের নায্য অধিকার স্বপ্ন, আশা পেটের ভাতও উন্নতির চাবিকাঠি এই মাঠ- যা আজ আমরা দখল করলুম রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি- ছাড়তে নই প্রস্তুত।

(স্লোগান)

বাদশাহ : কী ব্যাপার মাথায় উন্নতির কীড়া ঢুকেছে নাকি তাই আমলা-কামলা নিয়ে লাফালাফি

গাঁতা ব্যাঙের মত ডাঙ্গায় জলে গাল ফুলিয়ে মেঘহ মেঘহ গালাগালি দেখি মুখটা কত চওড়া।

জুয়েল : সাবধান কুত্তার বাচ্চা আর একটা কথা বলছি তো-

বাদশাহ : মেরে ফেলবি না। বেশ তাহলে পালাই আমরা কিও খাদেম-কাশেম

কাশেম : তাই পালাতে হবে আর কি

বাদশাহ : জুয়েল তোমার বাঁদরামী চরম সীমায় পৌঁছেছে, এ সমাজে তুমি যা খুশি তা করবে পারবে না, এ সমাজের স্বীকৃত মাতব্বর আমরা- যা করি তাই সেই টু শব্দ কেউ করবে তো মরবে- বুঝলে? ভালো হয়ে যাও, লক্ষী ছেলের মত ঘরে ফিরে যাও।

আর শোন, মাঠ করেছে খেলাধুলার জন্য, মেয়ে নাচানো আর উন্নতির পাগলামোর জন্যে নয়।

খাদেম : চেয়ারম্যান সাবে কি কইছে শুনছ? তোমার হবে ভাল মেনে নাও-

জুয়েল : শুনলাম দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা- একেবারে প্রাণ ভরে গেল- আ- এত ভালবাসা সহ্য করতে পারছি না, শুনেন, এবার আপনারা আসতে পারেন- আর যাবার সময় শুনে যান, আমার কথা, কাজ ও নির্দেশের ওপর কারো কোনো কর্তৃত্ব অচল- আর মাঠ- যে পবিত্র মাঠ আমি দখল করেছি- তার উপর এই মুহূর্তে

ছুটি অপবিত্র পা ঢুকে পড়েছে অনধিকার চর্চা করতে আর তাই সেগুলোকে সরিয়ে দিই-

(চেয়ারম্যানকে চপেটাঘাত)

খাদেম : কী চেয়ারম্যানের গায়ে হাত তুলেছিস বদম্যেশ-

জুয়েল : হাত তুলিনি সরিয়ে দিলাম- আর তুমি এই নাও-

(দু'গালে দুটো আঘাত)

খাদেম : জুয়েল !

জুয়েল : কিছু বলতে চাও বোধ করি। বলতে পারছে না- রাগে পা কাপছে বুক কাপছে ঠোট কাঁপছে দাঁতি লেগেছে না- হ। আর একটু খোল এই ব্যস

তোমার সম্ভ্রান্ত চৌধুরী বংশে চুন দিয়া দিই অ্যা বেশ

এবার তোমরা যাও, যাও বলছি আমার পবিত্র মানুষের মাঠ থেকে যাও

বাদশাহ : এত অপমান! আয় খাদেম-কাশেম- আয়- এই গুয়ার গুয়ারটাকে জেলে ভাত না খাইয়ে ছাড়ছিনে-

(দ্রুত পদে প্রস্থান)

জুয়েল : যা- এখান থেকে কোন বাপের ছেলে যাবে- যা-

সোহেল : জুয়েল কি করছিস

জুয়েল : কুচক্রীড়া এসেছিল একটা ঠাণ্ডা সাজা দিলাম

সোহেল : বেশ করেছিস

জুয়েল : একটু পরেই হয়তো পুলিশ আসবে ধরতে আমাকে। আমি জেলে থাকলে তুই প্রোথাম ঠিকমত চালাবি বন্ধু।

সোহেল : ঠিক আছে, মানুষ আমাদের পাশে আছে ন্যায়ের জয় হবেই বন্ধু।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রবেশ :

ওসমান : জুয়েল ভাই, ও জুয়েল ভাই শুনছেন-

জুয়েল : ওসমান, ডাকছ আমাকে?

ওসমান : জুয়েল ভাই, একদফা মাল তৈরি শেষ হয়েছে- ডেলিভারী করতে হবে না?

জুয়েল : তা করতে হবে বৈকি, অবশ্যই করবে। লক্ষ রেখ যেন তোমার কস্টার্জিত মাল নষ্ট না হয়।

(পুশিলের বাঁশির শব্দ শোনা যাবে দুজন দারোগা ও দুজন কনস্টেবল প্রবেশ করবে মঞ্চে)

দারোগা : মিঃ জুয়েল You are in under custody- মানহানী এবং গ্রামে
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অপরাধে আপনি অভিযুক্ত থানায় চলুন-

জুয়েল : দারোগা- দারোগা আমি অপরাধী- সত্য কথা বলছি তাই অপরাধী। কিন্তু
মনে রেখো পারবে না- তোমরা বঞ্চিত মানুষের ন্যায়ের স্রোতকে রুখতে। বাধ
যখন ভেঙ্গেছে এ স্রোত সাগর সঙ্গমে যাবেই যাবে।

ওসমান : জু-য়ে-ল ভাই। (কেঁদে ফেলল)

জুয়েল : কেঁদো না ওসমান- আজ কাঁদার দিন নয়। ওসমান কাঁদার দিন নয়।

বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রামের দিন, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার দিন

তোমাদের মাঝে ফিরে আসব সাহস হারিয়ে না ওসমান, তোমরা সাহস হারিয়ে
না। (দ্রুত পদে প্রস্থান)

ওসমান : জুয়েল ভাই-

জুয়েল ভাই- কি বলে গেলো না না না

অন্যায়ের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে প্রয়োজনে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দেবো তবুও
লাঞ্ছনার জীবন মেনে নেবো না। আর মাছ যেমন পানিতে ডুবে থেকে প্রাণ পায়-
ডাঙ্গায় উঠলে মরে যায়- তেমনি আমরা কাজে ডুবে থেকে প্রাণ পাবো- জীবন
পাবো। কাজহীন লাথি খেয়ে অমানুষ হয়ে মরতে চাই না, মরতে চাই না-

(প্রস্থান)

পঞ্চম
অংক
প্রথম দৃশ্য

বাদশাহ : জুয়েল জোচ্চরটাকে জেলে দিয়েছি পাঠিয়ে এবার গ্রামটা শান্ত হবে- হারামজাদা পাজির একশেষ। একটা কাজ হলো বটে। তা বাবা কাঞ্চন একবার বৌমাকে ডাক দে তো-

লতা : ডাকতে হবে না, আসছি। এই আমার শেষ আসা। আজ দু'বছর পূর্ণ হলো।

বাদশাহ : এসব কি বলছ মা-

লতা : ঠিকই বলেছি। চাতুরী করে বাবার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েই শুধু আপনি ক্ষান্ত হননি। আমার জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলেছেন আপনি।

বাদশাহ : আমি!

লতা : হ্যা আপনি, আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন জীবনের কারাগারে, যেখানে আমি পঙ্গু পর্যুদস্ত, হারিয়েছি জীবনের সুখ স্বপ্ন সাধ। এমএ পড়ার সময় স্বাবলম্বি না হয়ে ভুল করে বাবার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, আমার গরীব বাবা উপায়ন্তর না দেখে আপনার কলুষিত মনের আশ্রয় গ্রহণ করে নিছক অর্থের তাগিদে- আপনি কৌশলে বাবার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়েছেন। কিন্তু আপনার হয়ত জানা নেই, দু'টাকা দিয়ে জীবন কেনা যায় না। অতএব, সে দু'বছর আমার বাঁদী কাটা শেষ হয়ে গেছে, আজ কয়েদ মুক্তি পেয়েছি আমাকে বিদায় দিন। আমি ফিরে যাব স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গের জীবনে খোলা আকাশে।

বাদশাহ : লতা!

লতা : আর শুনুন, যাবার সময় বলে যাই, আপনার এই কুখ্যাত লুচা, বদমাইশ মদখোর লম্পট ছেলের সঙ্গে আমার কোনোদিন মনের বিয়ে হয়নি হবেও না কোনোদিন।

আর সামাজিক কাঁথার বাসবে- বসে যে বিয়ের অর্থহীন মন্ত্র পড়ানো হয়েছিল যে বাদী কেনার মুক্তিপণ পত্র মাত্র। আজ তা ছিঁড়ে ফেললুম।

কাঞ্চন : লতা! তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে পৌঁছেছে- তোমার অবাধ্য আচরণ- বিষবান সহ্যের কথা সীমা করেছে অতিক্রম- জান কি শাস্তি তোমার প্রাপ্য।

লতা : শোন কাঞ্চন, আমি কোনোদিন কারো বাধ্য ছিলাম না আজও নেই যা বলেছি অন্তরে কথাই অকপটে বলছি। আর শোন তোমার সঙ্গে আপযাচক হয়ে

কোনোদিন কথা বলিনি অন্তরে আমার ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। তোমার পারে দৃষ্টিতে
ভূমিকম্প আসুক আসুক বর প্রকৃতিকে ডাক দিয়ে বলব-

এক তালুক, দুই তালুক, তিন তালুক, বাইন তালুক- যা তোমার পছন্দ কর-
(প্রস্থান)

বাদশাহ : (অশান্ত পায়চারী করতে করতে)

যা হারামজাদা হতভাগা! যা আমার সম্মুখ থেকে চলে যা, এখনও এখনও দাঁড়িয়ে
আছিস, নির্লজ্জ বেহায়া তোর মত হতভাগা ছেলের বাবা বাবা আমি- কপাল হারে
কপাল- যা- যা- যা- এখান থেকে

কাঞ্চন : বাবা আমি

বাদশাহ : যা শুয়োরের বাচ্চা

কাঞ্চন : যাচ্ছি বাবা

(প্রস্থান)

বাদশাহ : আমি- আমি ঠিক- বুঝতে পারছি না- ব্যপারটা

তাহলে কি জুয়েলের সাথে কোন সম্পর্ক.....নাহ অসম্ভব

ও ছেলের সাথে নাহ মেয়েটিই পাজি

ও মেয়েটি চেনে নি বাদশাহ মিয়াকে-

তার শিক্ষার দেমাগ মিটিয়ে দিতে পারি এক মুহূর্তে-

না মশা মেরে হাত করব না কালো....

দেখি কোথাকার জল কোথ গিয়ে- গড়ায়।

২য় দৃশ্য

সোহেল ও রাণীর প্রবেশ

সোহেল : রাণী, এখন আমাদের শত্রু যেমন বেড়েছে হেমন্তের শেষে প্রকট
কনকনে শীতের বায়ুর মতন তেমনি বেড়েছে বাচার প্রতিরোধ শক্তি-

জনবল শীতের সামগ্রী জীবনের ক্ষুধার অনু আমাদের শক্ত করে ধরতে হবে হার,
যেন তীরে এসে জীবন নৌকা প্রচুর মাল বুঝাই সহ ডুবে না যায়-

রাণী : বুদ্ধি কৌশল আর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক মান উন্নীত জীবনের

আমরা অভিযাত্রী ভয় কেন পাব বল- এইতো জীবনের ব্রত।

সোহেল : তাই রাণী তাই জীবন পথে আমরা নিভীক সৈনিক পরাজয়ের আগে
করব মৃত্যুবরণ তবু আত্মসমর্পণ করব না-

লতার প্রবেশ

লতা : রাণী রাণী আমি ফিরে এসেছি রাণী- দাসত্বের কারাগার হতে- মুক্তি পেয়েছি রাণী ।

সোহেলও রাণী লতা, লতা

(রাণী লতাকে জড়িয়ে ধরবে)

লতা : দীর্ঘ দুটি বছর তোমাদের সাথে পারিনি থাকতে মনের আগুনে যেমন জ্বলেছি

রাণী : লতা

লতা : জুয়েল কোথায় সোহেল? কী তোমরা অমন নিরব কেন? বল বল নিরব কেন? বল আমার জুয়েল কোথায়? কথা বলছ না কেন?

(একবার লতা রাণীকে একবার সোহেলকে ঝাকি দিবে)

সোহেল : জেলে

লতা : ও উহ

(বুকে আঘাত পেয়ে নুইয়ে পড়বে এবং রাণী তাকে ধরবে)

সোহেল : ভেঙ্গে পড়োনা লতা, নিশ্চয়ই জুয়েল ফিরে আসবে- কদিন পরেই ফিরে আসবে ।

লতা : (অনেক পরে । সোহেল)

সোহেল : হ্যাঁ লতা জুয়েল ফিরে আসবে তোমার কাছে

লতা : আমার ব্যথা বাড়ছে রাণী আমি আর সহ্য করতে পারছি না

সোহেল : রাণী, লতাকে ধরে নিয়ে ঔষধ দাও

রাণী : চলো লতা

(ধীরে ধীরে রাণী লতাকে নিয়ে প্রস্থান)

সোহেল : লতার বাবা টাকার অভাবে লতাকে বিক্রি করেছিল মানুষ হয়েও জীবন ফিরে পায়নি, আজও মনে বিষের সাগরে তার জীবনী শক্তি প্রতি মুহূর্তে কুড়ে কুড়ে যাচ্ছে- অশান্তির কীটেরা এমন লতার জীবন যেন অজস্র রাণী জীবনে ফিরে না আসে সেহেতু করতে হবে এমন এক বিদ্যালয় যেখানে ছেলেরা লেখাপড়ার সাথে সাথে বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের পড়া ও জীবিকা ব্যয় ভার নিজেই করতে পারে- অভিভাবকের বোঝা না হয়- দিশেহারা মা বাপ

যেন ছুটে না যায় বুর্জোয়া শক্তির কাছে অর্থের প্রয়োজনে যেন মন ও মগজ বিক্রি না হয় কুচক্রের কাছে আর সেই পবিত্র দায়িত্বটি পালন করবে-লতা-তবে তবেই পুনরুজ্জীবিত হবে তার মন পাবে পরম সুখ- মিটবে আত্মার প্রতিশোধ স্পৃহা (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কাশেম : কী মুশ্কিল, এ দিকে যায় ফুরায়ে সময় জমি নিরানি দিতে হবে, মজুর পাওয়া যাচ্ছে না, যাকেই বলি আসে না কথা কয় না ব্যাপার কী, আরে কী চেয়ারম্যান অসময়ে কী ব্যাপার।

বাদশাহ : ব্যাপার আছে চৌধুরী ব্যাপার আছে। এত বছর চেয়ারম্যানী করে আসলাম এমনটি তো আর হয় না সমস্ত গ্রামটিই যেন ওলট পালট হয়ে গেছে—

কাশেম : তাইতো বলি— এখন কি যায় করা অরে কী খাদেম আরে আসুন আসুন খাদেম : এক আপদে পড়লুম নাকিরে মাল পাঠাইতে পারছি না কয়েল নাই কয়েল

বাদশাহ ও কাশেম : হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

খাদেম : কী ব্যাপার হাসছেন যে মিথ্যে বললুম নাকি। এই পেটুয়া যে সেদিন বলছে কী জান আমি আর কয়েলগিরি করব না বললাম— কীরে কি হলো দাম বেড়েছে তোর নে দুটাকা বাড়িয়ে দিলুম। সে উত্তর দিলে কি জান? না টাকা চাই না চাই অধিকার কী ব্যাপার আবার হাসছে

বাদশাহ ও খাদেম : হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

খাদেম : আমার মাথা ঘুরাচ্ছে আর তোমরা হাসছ।

কাশেম : আরে মাথা ব্যথাটা আমাগো নাকি। আমরাতো সেই একই সমস্যা।

বাদশাহ : হাস্য রসিকতা চুলোয় যাক। এখন আসল কথায় আসি—কী করা যায়।

কাশেম : তাইতো ভাবছি

খাদেম : আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়। ওরা অধিকার নিয়ে মেতেছে— খুব মেতে থাক আমাদের প্রয়োজনটা অন্য গ্রাম থেকে ম্যানেজ করি।

বাদশাহ : সে প্রয়োজন ফুরানো যায় কিন্তু আমাদের মাদবরীটা থাকলো কই।

কাশেম : ঠিক এও একটা কথা।

বাদশাহ : কথা নয় ওটাই আসল কথা— আগামী ইলেকশান নির্ধাত আমি ফেল তোমরা হয়ত—

খাদেম : কী ব্যাপার আমাদের যুদ্ধ করে দিলে নাকি—

বাদশাহ : তাইতো হবে— শেষটায় যার যার ঘরে মুখ খুবড়ে বসে থাকা ছাড়া উপয় কী রবে?

খাদেম ও কাশেম : না তা হতে দেয়া যায় না

বাদশাহ : তাহলে আসো যে কো উপায়ে আমরা এ ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করি।

কাশেম : কিভাবে?

বাদশাহ : আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে প্রথমে

খাদেম : তারপর

বাদশাহ : না, না কুট কৌশলে এদের ভেতরে ফাটল ধরাতে হবে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে- অবশেষে এদের একটা দল আমাদের ভেতর ঢুকবে

খাদেম : তারপর

বাদশাহ : তারপর এদের দিয়েই এদেরকে মারব ধরি মাছ না ছুই পানি হয়ে।

খাদেম : ঠিক তাই করতে হবে- এবং প্রয়োজন হলে যত টাকা লাগে আমি দেব

কাশেম : আর আমার পাকা মাথাটিতো দিয়েই রেখেছি।

বাদশাহ : তাহলে উঠি- চল

খাদেম : চল

কাশেম : চল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

ওসমান : 'সবাই মালিক'

ক্ষুদ্র শিল্প কেন্দ্রের সদস্যদের বলা হচ্ছে যে, একটু পরে আমাদের আমার নির্ধারিত সাপ্তাহিক অধিবেশনে আত্মসমালোচনা ও উন্নতি- বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রিয় সোহেল ভাই, আপনার স্থির হয়ে

বসুন, তিনি আসছেন-

সোহেলের প্রবেশ :

সোহেল : প্রিয় বন্ধুগণ সাপ্তাহিক অধিবেশনটি মূলত আমাদের পথ নির্দেশক আজকের বিষয়, আত্মসমালোচনা ও উন্নতি।

প্রশ্ন আসে আত্ম সমালোচনা কী? আত্মসমালোচনা হচ্ছে নিজের কাজের ব্যবহারের ভালমন্দ নিজেই করা বিচার।

কোন কাজ করার পূর্বে ভেবে করতে হবে কাজটা কতটুকু ঠিক।

কোন ভাইয়ের সাথে ব্যবহার খারাপ করলে- পরে উত্তেজনা সরে গেলে চলে

চিন্তা করতে হবে- কাজটা ভুল করেছি

সবচেয়ে হল বড় কথা- কারো কান কথা শুনেই ভালমন্দ বিচার না করে অপরকে আঘাত দেয়া মহাপাপ। আমরা মানবতার দিশারী সীমাহীন দুঃখ দুর্দশায় আমাদের বিগত জীবন- কেটেছে আজ জীবনের যার লেগেছে শান্তির ছোঁয়া- কুচক্র শক্তি চেষ্টা করবে এ ঘর ধ্বংস করতে আশীনে বাড় আসবে অভিনব পথে সাবধান-

কখনও যেন নিজেদের ভেতর সৃষ্টি না হয় ভুল বুঝাবুঝির কুয়াশা- আর আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন ১৩০টি পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন। সেজন্য- বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ বিদ্যার্জনের প্রয়োজন। অবৈতনিক এ বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করবে ‘সবাই মালিক’ প্রতিষ্ঠান- আগামী সপ্তাহে এ বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হবে। ঠিক আছে আপনারা কাজে লেগে যান।

রাণী : চলো লতা একটু নদীর পাড় দিয়ে বেরিয়ে আসি-

লতা : না সখি আমার কিছুই ভালো লাগছে না- শরীরটা দুর্বল, মন জ্বলছে তুষের আগুনে

রাণী : একটু খোলা আবহাওয়ায় ঘুরলে মনে একটু শান্তি....

লতা : না সখী আমার জীবনের শান্তি বোধহয় হয় গেছে

রাণী : তবু

লতা : অতীতের স্মৃতি মনে ভড়ি করছে সেই শৈশব সেই কৈশোর সেই বসন্ত- বসন্ত আর ফিরে আসবে না সখী আর ফিরে আসবে না আমার মন বলছে-

(রাণীকে ধরে কাঁদতে লাগল)

রাণী : লতা

লতা : আ-মি বোধহয় সখি বাঁচবো না

রাণী : অমন অলুক্ষণে কথা যে মুখে আনতে নেই সখি- চল বাড়ী যাই- সন্ধ্যা হল।

প্রস্থান

৫ম দৃশ্য

স্বাবলম্বন বিদ্যালয় লতা ও রাণীর প্রবেশ

ওসমান : এখন ‘সবাই মালিক’ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন জনাব সাহেবা
খাতুন লতা

গান গাইবে দুইজন ফুটফুটা মেয়ে লহো লহো মালা

বেদনা মালা দেবো গো তোমায় বেদনার মালা দেবো

তোমার ব্যথার সাগর হতে সুখের মানিক কুড়িয়ে নেবো

ওগো তোমার মলিন সমাধি রঙ্গিন করা

ওগো তোমায় করিল যারা জীবন হারা,

ঝরা ফুলের এ মালা ওগো সেই প্রতিশোধ ভেবো।

চাহিনা আর তেমার মত হতে

আছাড় খাবনা জীবনের পথে

ওগো পথের দিশারী তারা মোদের যাচনা মনে রেখো ।
এই কুড়িরা পেয়ে গো তোমরা সকলে
ফুটিতে হবে চাহেনা গো অকালে ।

পরগাছা লতা কহে গো কথা মোরা কোনপথে যাবো
(মাল্যদান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য
বাদশাহ : কিছুতেই যে কিছু হচ্ছে না
এখন কি কথা যায় খাদেম
খাদেম : আমিও ঠিক ভেবে পাচ্ছিনা
কাশেম : ছিলাম আক্কেল আলি হলেম
আক্কেল মুখ্ নইলে আমি
এই কাশেম চৌধুরী নরেনের
মত কুত্তার বাচচার মন সরাতে
পালুম না- যে দুদিন
আগে হুমড়ি
খেয়ে পড়তে পায়ের ওপর ।
বাদশাহ : যাক হোক- আমাদের-
প্রথম প্লেন ব্যর্থ হয়েছে
খাদেম : তাহলে এখন
বাদশাহ : দ্বিতীয় প্লান করব
কাশেম : কী
বাদশাহ : আমার মনে এদের জীবনের
হুমকী দিয়ে প্রতিরোধ করা ।
কাশেম : আমার আক্কেলে না
ধরে । কারণ এরা মৌমাছি
মৌচাকে আঘাত দিলে যেমন
সব মৌমাছি কামড়াতে
আসে ওরা তেমনি
শেষে এক সংগে অনেক হুল
ফুটিয়ে দিলে প্রান বাচানোই
দায়-

বাদশাহ : তা হলে কি করতে বল
কাশেম : চুরি ডাকাতি করানো যায়-
খাদেম : তাতে কী হবে?
কাশেম : অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড
ভেঙ্গে যাবে। পরে হাতাশ
তারপর আবার পূর্বের
পথে ফিরে আসা।
বাদশাহ : তাতে কিছুই হবে না।
এরা এক সঙ্গে এতলোক
যখন কাজ করেছে তখন
নিশ্চয়ই পাহাড়ার ব্যবস্থা করছে
অতএব, যখন ডাকাতি করতে উপায়
ডাকাত ধরা পড়বে তখন
ফাঁস করে আমাদের নাম বলে
দিবে- আর তাহলে বুঝই
সম্মানতো দূরের কথা ডাকাতি
কেসের আসামী কিংবা
পালনকর্তা- সবাই থুতু দেবে
খাদেম : তা অবশ্য ঠিক
কাশেম : আচ্ছা- ওরাতো মজুর শ্রেণীকে
এক করেছে সংগঠিত হয়েছে
মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা মধ্যখানে
আছে- তাদেরকে আমাদের
পক্ষে এনে আমাদের দল
ভারী করা যায় না
বাদশাহ : এইবার ঠিক বলেছ
মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা আমাদের
দলে ভীড়িয়ে এদের বিরুদ্ধে
নানা কুৎসা রটনা করতে
হবে।
এতে কিছু কাজ হবে। অবশেষে
আমাদের দল আর তারা-
এক সংঘর্ষে লিপ্ত হলে

তারা সংখ্যায় কম পরাজিত
হবে- তাহলেই তাহাদের
জিৎ হবে- আর সেইজন্যেই
এখন থেকে হুমকী দিতে হবে।
কোন অবস্থাতেই আমাদের
নবম দেখালে চলবে না
খাদেম : এটাই কাম্য
কাশেম : অনেক রাত হল চল
বাদশাহ : চল
খাদেম : চল

(প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

সোহেলের প্রবেশ
সোহেল : ইদানীং রাণীর কাজে
একটু ব্যঘাত সৃষ্টি হচ্ছে
রাণী : সেজন্য তো তুমি ইদায়ী

লতা : আমারতো একই অভিযোগ
তুমি সখীকে মন করলে
কেন-

সোহেল : তার কাছেই জিজ্ঞেস
করে দেখ না-

রাণী : যা

সোহেল : টিক আছে যখন লজ্জা

পাও তখন চলে যাই

লতা : সোহেল, দাড়াও

রাণী : চলে যাক

লতা : আমাকেও মা হতে ইচ্ছে করে রে

লতা

রাণী : এইতো জুয়েল আসলেই

(দুজনেই হাসি)

হাসতে হাসতে বুকে আঘাত লাগে এবং কফবেরোয়- কফে রক্ত)

একি রক্ত

লতা : আমি হয়ত বাঁচবনা

রাণি আমি বাঁচবনা

রাণী আমি বাঁচব না ।

(সমানে রক্ত পড়ছে)

রাণী : মাগো- চিৎকার দিয়ে

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

প্রবেশ

সোহেল : আরো তিন বছর পূর্ণ হলো জানিনা

জুয়েল কেমন আছে- হয়ত শুকিয়ে গেছে

লা- ভাবতে পারিনা

অথচ কাজের এমন চাঁপা এত চক্রান্ত

একদম সরবার উপায় নাই- এ প্রকল্প

তো জুয়েলের স্বপ্ন এর ক্ষতি হলে

জুয়েলের আত্মা পরলোকে গিয়েও

শান্তি পাবে না- অতছ কি করি

বুঝতে পারি না- মনটা মোটেই

ভাল লাগছে না- লতার শরীর

ভীষণ খারাপ- সংগ্রামের রক্তাক্ত

পথে দুটি জীবন কাঁতরাচ্ছে-

চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার দেখাচ্ছে

আজ অমাবশ্যার রাত ভীষণ অন্ধকার

দুচোখে কেবলি অন্ধকার দেখাচ্ছে

আজ অমাবশ্যার রাত ভীষণ অন্ধকার

দুচোখে কেবলি অন্ধকার দেখছি

ইস মনটা এমন লাগছে কেন-

হয়ত-

ওসমান ও ঠান্ডুর প্রবেশ :

ওসমান : জুয়েল ভাই, জুয়েল ভাই- চক্রান্ত

জুয়েল ভাই, চক্রান্ত শুনে আসছি

বাদশা, কাশেম মাদবর ও খাদেম

বেপারী সলা পরামর্শ করতাকে

আজ রাত আমাদের কারখানায়

আক্রমণ করবে

সোহেল : কী বলছ, ওসমান/

ঠান্ডু : হ জুয়েল ভাই, আমরা নিজ কানে

আড়ালে দাড়িয়ে শুনে আসছি

সোহেল : তাহলে এখন কি করা যায়-

জুয়েলের প্রবেশ : সোহেল সোহেল

সোহেল : জুয়েল- বন্ধু (ঝাপটে ধরে)

সোহেল : বন্ধু ঠিক সময়ে এসেছিস

জুয়েল : কেন কি হলো-

ঠান্ডু ও ওসমান : ভীষণ বিপদ-

সোহেল : আজ রাত নাকি বাদশাহ চেয়ারম্যান

গুন্ডা নিয়া আমাদের কারখানা

আক্রমণ করবে।

জুয়েল : সোহেল। (ঝাকি দিয়ে)

(পায়চারী করতে করতে)

বাদশাহ : তাহলে, এখনো তোমার

মেটেনি সাধ, ভেবেছ জুয়েল

মরে গেছে। আজ তোমাদের চুচক্র

শক্তি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো

সোহেল জেল খাটতে শিখেছি

আর একবার খাটব জীবনের শেষ

কাটা-

ওসমান ঠান্ডু তোমরা তৈরী হও

ওরা আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদের বাড়ি ঘর আগুন জ্বালিয়ে পুড়ে

ছারখার করে দেবো-

ওদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করব

কুকরের মত চুলের মুঠি ধরে

সারাজীবনের পাপের উসল তুলব।

সোহেল ওসমান ঠান্ডু এসো এসো ।
(বিকট আওয়াজ হবে- প্রায় আধঘন্টা)
মধ্বে আড়ালে মারামারির পর-
বাদশাহ, খাদেম কাশেম
কাঞ্চন ও রফিক কে বেদে নিয়ে আসবে
ওসমান । সামনে সামনে আসবে-
জুয়েল ও সোহেল
জুয়েল ঃ শুয়োরের বাচ্চারা তোদের রক্ত পান
করলেও আমার তৃষণা মিটবে না
এ রক্ত অপবিত্র তাই পান করতে
চাই না- বোস কুত্তার-
বাচ্চারা
সারাজীবন যত সম্পত্তির জাল
দলিল করছিস সবগুলো
ফেরৎ দেয় কুত্তার বাচ্চা
সারাজীবন মালে ভেজাল দিয়া
বিক্রয় করার মাশুল দেয়
কুত্তার বাচ্চা-
সারাজীবন গম চুরি করার জবাব
দেয় হারামীর বাচ্চা
একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি
খেলার জবাবদে বদমায়েশ
আর তোর মত অন্যায়েব সহযোগীর
শান্তি কি জানিস
মানুসের সম্পত্তি মানবতা নিয়ে
দাবাখেলায় নিঘাত পরাজিত হলি
এইবার তোদের সমস্ত সম্পত্তি
দখল করল এ থারেম মানুষ
ফিরিয়ে দিতে হবে সব
সব ফিরিয়ে দন্ড সোহেল
আয় আয় এদেরকে এখন কুকুরের
মতগুলি করে মারব ।
না না কারাগারের অন্ধকার

প্রকোষ্ঠে হুঁদুরের মত চুবিয়ে
চুবিয়ে মারব
যা এদের বন্ধুর এদের মানুষের
আদালতে নিয়ে যান-
যা এদের বন্ধু এদের মানুষের
আদালতে নিয়ে যান-
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখুন
কাল লক্ষ মানুষের সামনে ওদের
কুকুরের মত গুলি করে করা হবে হত্যা
জগৎ বাসী দেখবে- অত্যাচারীর মৃত্যু হয় কেমনে ।
(ধীরে ধীরে প্রশ্নান)

৯ম দৃশ্য

জুয়েল : সোহেল, আজ আমাদের জীবন
সার্থক- অন্যায়ে শক্তিকে গলাটিপে
মেরে ন্যায় আর মানুষের সমাজ
কায়েম করেছে

রাণী : লতা যে কী করছে

জুয়েল : লতা- লতা- লতা
(দ্রুত প্রশ্নান)

রাণী : সোহের ডাক্তার নিয়া আস যাও
সোহেলঃ যাচ্ছি

জুয়েল ও লতা :

জুয়ের : লতা- লতা- কথা কও কথা
(মৃত প্রায় লতাকে ধরে ধরে)

লতা : জুয়ে-ল- হাতটা দাও দাও

জুয়েল : লতা

লতাঃ তোমার কোলে নাও তোমার কোলে মরার বড় ইচ্ছা ছিল মনে-

জুয়েল : লতা-

ডাক্তার সহ সোহেলের প্রবেশঃ

ডাক্তার : একটু সরে দাড়ানতো অ্যা

দেখি হাতটা একটু নরান

দেখি- দেখি- অ্যাঁ

Ungfortune

জুয়েল : কি হলো ডাক্তার কথা বলছেন

না কেন- ডাক্তার আমার

লতা কি ভাল হবে ডাক্তার

কথা বলন ডাক্তার কথা

বলুন- ডাক্তার

ডাক্তার : I am sorry পেসেনে

চটর

হৃদক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে

আমি পারলাম না- মি. জুয়েল

জুয়েল : ডাক্তার

জুয়েল : লতা

লতা : জগলা ইলাহ উল্লাল্লাহ

জুয়েল : লতা, লতা, লতা

(অস্ফুটস্বরে জুয়েল লতার হাত ধরে মুখের কাছে মুখ নেবে ওকোলে ধরবে)

রাণী : লতা

(উচ্চস্বরে সবার ক্রন্দন)

(ক্রন্দন শেষে- লাশকে সামনে রেখে

শহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে

উঠিয়ে সমস্বরে মন্দ্রীগীত)

ঐ শাদা আকাশ অসংখ্যা তারা ফুটছে মাঝখানে চাঁদ

নিশিতে ভেঙ্গেছে বিমল কোমল আলোর বাঁধ॥

উর্মিরা চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে,

অশ্রু ফোঁটায় আগুনের ফুলকি ঝড়ছে,

থুবড়ে পড়েছে মানবতা, শুনি তার করুণ নিনাদ ।

আর গাইবে না গান, কইবে না ব্যথা,

মেঘমুক্ত আকাশে শুকতারার জাগিবে না সাধ ।

রচনাকাল ১২/২/৮৮ থেকে ১৩/০৩/১৯৮৮ খ্রিঃ

বাহরাম খান পাড়া, কিশোরগঞ্জ ।

কাব্যগ্রন্থ- ক্ষুধার মিছিল

ক্ষুধার মিছিল (১৯৮৬-১৯৯২)

আমি

আমি বিপ্লবী চঞ্চল অশান্ত উন্মাদ,
আমি রাহু শনিদশা অমাবশ্যার চাঁদ,
কে, আছে আজ আমার পথ রুখে,
হল ফুটাবই আমি আজ মিথ্যেকের বুকে,
আজ প্রতি লোমকূপ আমার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ।
এক পা আমার মহাস্থিরের চোখে,
এক পা আমার দোজকের আগুন ঠুকে,
আমি ধ্বংসের চির বুলন্ত কালপুরুষ,
ধনিকের আমি রক্ত চোষক কাঙ্গাল আগুনের জোঁক ।
ক্ষেপণাস্ত্রের আমি করি না ভয়,
হস্তা আমি অমানুষের চির অক্ষয়,
আমাকে দেখি হাজার সৃষ্টি মাঝে,
মানুষ, এক থাকি কথা ও কাজে,
ভাঙ্গি ভাঙ্গিবই ঘাড় আমি বর্জোয়া কুত্তার যুগ যুগ ধরে,
আমার দাঁত চিবায় আঁধারের দেহ,
আমার ধমনী আজ আগুনের গেহ,
হিংসুক, ক্ষুধা আমি চাই সভ্যতার ধ্বংস,
নির্মূল করিবই আমি সম্রাজ্যবাদের বংশ,
আছে কার হিম্মত আসুক আজ আমার সাথে লড়ে ।
আমি রক্ষ অজগর আমি হালাকুখান,
আমি ছুঁড়ে মরি লোভীচোখে বিষবাণ,
আমার সম্পদ যে পাষণ করে গ্রাস,
আমি ডাকু আমি সৈনিক আমি ত্রাস,
জোনাকীর কোমলকরে দেখি বারচদের স্ফুলিঙ্গ জলন্ত উল্কা ।
আমি রাক্ষস আমি দৈত্যদানব এ যুগে,

পৃথিবী করিব গ্রাস তাপস আমি ভোগে
ফুলের ভেতরে পাই আমি বিষবাস্পের গন্ধ,
আগ্রাসনের পথ চিরতরে কবিরই বন্ধ,
অশান্ত মাটির শরীরে টগবগ করে রক্ত, জ্বলে আগুনের ফুস্কা ।
আমি ছিন্ন করি ভালবাসার বন্ধন,
রক্ত হাতে মুছি বধূর কপালের চন্দন,
পৌরুষ আমার অজেয় মহাশক্তিমান,
মনের তলোয়ারে দিয়াছি বীর্যের শান,
অধিকার আদায়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত কোন দিন করি না শির নত ।
জুলুমবাজ টাউট, হীনচেতার গোশত খাই,
যেখানে পাই যারে, খুন করি আক্ষেপ নাই,
আমার রাগের কুড়ালে কুপাই বদগদি ।
আমি জলোচ্ছ্বাস ভাঙ্গি অট্টালিকা নিরবধি-
দু'পায়ে পিষিয়া মারি আমি দুনিয়ার পাপী অমানুষ যত ।
আমি বেয়াদব মানিনা তাবেদার শাসন,
পেটকের মুখে লাথি মারি ঠেলি শূন্যবাসন,
আমি চিরস্থির হিমালয় সমুদ্রে প্রবাল প্রাচীর,
বিশ্বাসঘাতকের রক্ত পিপাসু গর্বিত বীর,
কোটিপতির হৃদক্రిয়াবন্ধ করি আমি আজব্রাইল মৃত্যুদূত ।
স্কাইলাভ টুকরো করি আমি দ্রুতসীসার,
মহাশূন্যের যুদ্ধাশ্রু আমি অধুনা মীসার,
আমি রাডার আমি জীবন আমি মরণ,
আভিজাত্যের মস্তিষ্কে করি আমি রক্তক্ষরণ,
আমার ভয়ে সভ্যতা কাঁপে থরথর আমি শ্মশানের ভূত ।
আমি ব্যাধ আমি পশুরাজ নিঃশ্ব জাত,
চিরক্ষুধার্ত আমি খাই বিশ্বের তাবৎ ভাত,
আমি অধার্মিক আমি গুণ্ডা আমি চোর,
পকেটমারি নিত্য দেখি যত সুদ ঘুষখোর,

চিরযোদ্ধা আমি মানবতা, কান্না আমার পিসতুত ভাই-
মেরেছি কান্না উঠুক উল্লাসের অট্টরোল,
স্তব্ধ করিব শুনি যত ভেদাভেদ ঘৃণ্য বোল,
মুক্তি দাতা আমি ভাঙ্গিব শ্রেণী সমাজ এবার,
রক্তগঙ্গায় স্নান করি উত্তরে খুলিব বিজয় দ্বার,
আমি মহামুণী, মহাপাতকী আমি বিশ্বের বঞ্চিত মজুর মুক্তি চাই।

টিকর পুর
৩০.১২.৮৭

একান্তরের শানিত চেতনা

কুচক্রী ইবলিশ কবন্ধ সম্রাটের প্রথা সিদ্ধ
ভুতুরে খেলায় নূতন প্রাণের স্পন্দন
শিশু কিশোর কিশোরী যুব যুবারা
মেতে ওঠে
শারিরীক কসরত কৌশল মওতায়,
সম্মুখে বসা পিশাচের দলনেতা জগদলপাথর
অথচ আমার চৈতন্য আত্মার সিংহ বেজায়
গর্জে ওঠে, ইচ্ছে করে ক্রোধের কামান
দেগে রক্তাক্ত করি আবারও
আমার প্রোথিত যশা বীর অসিডিউস-
এছারদের লীলাভূমি দেশ মাতৃকার
সহবাস আলিঙ্গন থেকে উৎখাত করি
সভ্যতার পা চাটা কঙ্কুরদের এই মুহূর্তেই।
সামরিক জাভা পৌরাণিক আলাদীনের
দৈত্যরা যখন আমার মায়ের উর্বর ভূমি
বুকের ওপর দু'পা দু'লিয়ে মার্চকরে
আহ্লাদে
থেক শিয়ালের হুঙ্কাহুয়া কুচকাওয়াজ

করে তখন মায়ের সাধারণ মানুষের-
কান হয় বধির,
আর যখন থাকিপোষাকের পুলিশ
দৈত্যরা রাইফেলের লিংগ উঁচিয়ে
গুতামারে মায়ের যোনিদ্বার
সরস মাটি উহ্ আহ্ কেঁদে ওঠে
দুঃখে, ক্ষোভে ঘেমে যায়
সারাদেশের সুস্থ শরীর
গুলি নিক্ষেপে
এক, একবার দম বন্ধ হয়ে যায়
মা বুঝি মরেই গ্যাছে নাকি অজ্ঞান?
সামরিক জান্তার ক্রোর ধর্ষণাঘাতে !
অর্থনীতির কয়েদীরা মুক্তি পায় নি যুগ
যুগ দৈন্যের হাতির ওপর চড়েছে নির্বিবাদে
কখনও সংগ্রামের সূড় দিয়ে খেয়েছে
দুর্ভিক্ষের কলাগাছ
মাঝে সাজে সুদূর প্রাচ্যের উন্নতির জঙ্গী
বিমান ছলনার রাজিবাস পড়ে হানা
দিয়েছে আমার ঘরে নিরীহ নির্দোষ
স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে লুটোপুটি খেলেছে
আর আমি
কিম্বদন্তের মতন টিনের চালে আক্রেমশে
মাথা খুঁটেছি
দাইয়ুছ বিভ্রান্ত নির্বোধ খাই
মাগী ভাড়া দিয়ে বর্জোয়া পলিসির-
প্রকল্প ।
আমার শরীর যখন সম্পদ রক্ত শূন্যতায়
পান্ডুর হয়, হাহাকার করে ওঠে ছাল
ওঠে যায় চৈতন্যের তখন র্যামো করি
এক বোঝা শিশুতোষ খেলনা
যন্ত্রপাতি যার নাম ও শিখায় নি
বাপের বাবা মার্কিন ।
মনের ঘরে ঘা হয়েছে পঁচে গলে

পুঁজে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের-
গন্ধ বেরুচ্ছে ।

আমার অহং প্রাণের দেবতা মুজিবকে
বধ করেছে প্রাচ্যের খান্নাছ গোয়েন্দা
আব্রাহাম লিংকনের আততায়ী
ফারুক বদ্ধ পাগল ।

ছলনার রাজনীতি আমাদের দেখিয়েছে
সাহারার মরচ মরিচীকা মোক্ষ
শান্তি পানির সাগর-

ছুটে গিয়ে পঙ্গপাল সুখ প্রত্যাশীরা
ঝাঁপ দিয়েছি দাউ দাউ প্রজ্জ্বলিত
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুরাশার শাদা বালুর ওপর ।
আর কত কাল আরাধ্য বিজয় দিবস
মাতবে মুকররমের কমান্ডে, করতালি শুনে
অপমান করবে ফেরেছা মানুষকে?

লক্ষ শহীদের রক্ত, খেয়ে ঘুমাব
অশান্তির নকশীকাঁথা শীতল চাটাইয়ে
নিজীব সিংহ শাবক বীরজাত?

তিলার্থ খালি জায়গা নেই সহ্যের-
মাতৃভূমির হৃদয়ে দুর্ভাগ্যের গগন
বিদারী কোটি কোটি মানুষের মুখে
শুনতে চাই, একটি শব্দ, অধিকার,
একাত্তরের শানিত চেতনায়
ধন-মান-আত্মশক্তির সামাজিক বিপ্লব
ইনশাল্লাহ । জয় বাংলা ।

বাহরাম খান পাড়া
বিজয় দিবস ১৯৮৭

পরাজিত জীবন সৈনিক

রক্তিম লেলিহান অনলের ভেতরে ডুবে আছি

আমরা কারা?

তুষের অনির্বাণ ভষেন অর্ন্তজ্বালায়

গুমড়ে গুমড়ে মরছি অমানবতার নীল নকশার

কারাগারে-

আদিগন্ত জীবনের পুষ্পিত দিনগুলো চলে গেল

কারারুদ্ধ আমরা কারা?

শৃগালের সামন্ত শাসনের লেজে শৃঙ্খলিত

মধ্য বিত্ত হিমাদ্রি শ্রেণীর তুষার সীমায়

কাঁপছে, ধ্বসে পড়ছে, ভয় সংকোচ কাতর সরল

শাদা তুষার বিবেক।

নীচতলার একধাপ ওপরের পৈঠায় বসা

এবং মাথার ওপর নাচে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোষে

সভ্যতায়, ফ্যাশনদুরন্ত নর্তক-নর্তকী।

জানি না, চিনি না, আমাদেরকেই

গতাসু প্রেতাআদেরও;

যারা কালের নিরপেক্ষ চোখে পরাবাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যকে দ্যাখে

সমিরের বিধবা স্ত্রীর হাতের নরোম আবরণে দাগ

পড়েছে হাতুড়ির আঘাতে ছিটকে পড়া সুড়কির;

সীমাহীন অভাব দুঃখ দুর্দশায় কংকালসার

শরীর তরী ডুবো ডুবো সংসার নদীতে।

কম্পমান অঙ্গুলি গিটায় গোনা দিনের ঘন্টাগুলো

লুকিয়ে পালায় আর পিছু ফিরে হাতছানি দেয়,

ক্ষীণ কণ্ঠে কাতড়াতে কাতড়াতে ডাকে অন্তরাগকে

‘এসো রাতের আঁধারের সাথে সহবাস করি’-

হায় অন-দা বুঝি আগামী কালও আসবে না-

কোন দিনও রক্তাক্ত তলোয়ার জিহ্বায়-

পাইনি গুটকী মাছের আঁষটে গন্ধ আর

বিরিয়ানী সোনার হরিণ ছলনায়

ভুলিয়ে রাখে তেলাপোকায় যুগ যুগ।

পৃথিবীর নেমনতন্নে জীবনের চিরদুঃখের ফরাসে

বসে আছি, শাকান্নের প্রত্যাশায়;
শকুনের ক্ষুধার্ত চোখে দেখছি ডাইনিং টেবিলে
কাঁচ বাটির ভেতরে হাবুডুবু খাচ্ছে
অসংখ্য মরা, সিদ্ধ করা সবুজ প্রান্তরে কাটা
তামাতে রঙের কুটি কুটি শরীরে ডাটা;
মাংসাশী প্রাণীর রোষ্ট চিবায়- ভুড়িওয়ালাকসাই;
ভগবানের কৃপায় নাকি জীবনের কঠোর তপস্যায়
রত নিমাই সন্নাসী ডাষ্টবিনে পড়ে
থাকা- অচেতন মানবেতর মানব।
আমরা দুঃখী বেকার কালিদাস; ভাবের পুকুরে-
অবগাহন করি-নিশীথে।
নিশাচর বাদুড় আমরা সন্তপর্ণে চুষি চিবাই
জোতদার ছক্কু মিয়ার সখের কলাবাগান,
কলা কাদির বিশ্বাদ মধু আর-কাঁচকলা।
দিনের আলোকে জনতার চোখে
দ্যাখে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণি
আমরা অভিশপ্ত-আবহমান কালধরে
ঝুলছি ঝুলছি আর ঝুলছি তেঁতুল গাছে।
নির্দয় ইদুর মারার কলে বিষমাখা
ভাগ্যের ভাত খাচ্ছি।
লোভাতুর জোতদারের ধানের গোলা ঘরে
কথিত দুষ্ট ইঁদুর গরীব আমরা-
বুদ্ধির কুরুক্ষেত্রে পরাজিত জীবন সৈনিক।

বাহরাম খান পাড়া
১৬.৭.৮৬

কবিতার অবয়ব

অজস্র ভাবনা কর্মশ্রোত মহাকালের সাক্ষী
আমার কবিতা
সুন্দরের স্বপ্ন
আমার কণ্ঠের স্বর
আমার কান্নাহাসি
ভালবাসা...
আমি গতিহীন জীবন তরী নই, নই-স্থবির স্থাণু ।
অসংখ্য বন্ধনের মাঝে বন্ধনমুক্ত
আমি সীমাহীনের
শ্যামল সবুজের
দীপালি উৎসবের
আমি আনন্দ-
দিগন্ত প্রান্তরের ছোঁয়ায় সুখ কাতর
বৃষ্টি ভেজা দাঁড় টানা মাঝির সহযাত্রী-
ঘোলাটে জলে
আমি ভাসমান
ইঞ্জিন-ছন্দহীন
নিরস আবেগে লঞ্চার ছাদে
দেখি কখনও দাঁড়িয়ে স্বপ্নীল শান্তির কপোত
পাখা মেলি উড়ছে উদাসীন অনন্ত আকাশে ।
বন্ধনহীন বলাকারা
মেঘের নিচে নিচে
সুখ নিদ্রায়, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন....
দ্যাখেঃ ক্লান্ত ধরাতল যন্ত্রণায় বেদনায়
বুভুক্ষা আর জয়নালের দুর্ভিক্ষের কাক, ছবি ।
এলোমেলো জগতের
আমি কালের পথিক
আশার ভেলায় চড়ি-
দূর 'মহাসমুদ্রের নাবিক প্রকম্পিত মন
বিষয়-তাড়নার শিকার-পালের নৌকো
ভাসে চোখে

অর্থহীন জঞ্জাল সব
কারো মনের শত্রু
ভাবুক, কবি, অস্থির ঠাণ্ডা লড়াইয়ে
মগ্ন পৃথিবীর বিলাসী পুতুল ।
মানুষের সাথেই চলি
মানুষের কথাই বলি
আমি উলঙ্গ কালপুরুষ
আমাকে কেউ দেখেও না চিনেও না বুঝেও না-
অরূপের রূপ, স্বরূপ মন্দ-বাণী পরাবাস্তবের ।
আমি যন্ত্রের
আমি মন্ত্রের
আমি হৃদয়তন্ত্রের
মহাসৃষ্টির আমি মহারহস্য মহাযুগ
শুনে সম্মুখে পিছনে পদধ্বনি আমার ।
আমি গ্রাস করি
চন্দের মত সূর্য
সূর্যের মত চন্দ্র
অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার কোন কবির ধ্যানাসনে
ভিড় জমায় ছন্দের বেড়াজালে আবদ্ধের বাসনায় ।
কিছু বলা কিছু না বলা
কিছু দুঃখ কিছু সুখ
কিছু অবিনশ্বর কিছু নশ্বর
আসে আনন্দে বিরাগে ইচ্ছা-অনিচ্ছায়,
কবি তাই কবিতার অদৃশ্য আলোয় নিজেকে হারায় ।

ধলেশ্বরী নদী পথে

ঢাকা- কোমরগঞ্জ

২৯.৭.৮৭

আকাশের মতই কম্পমান

চিকন চিকন সবুজ পাতার বাওয়া ধান ক্ষেত
ডুবো ডুবো ঘর-বাড়ি হাওড়ে
মাঝি-কৃষাণ বসে আছে নৌকায়-দাওয়ায়
বন্যা শংকায় দ্বিধা গ্রস্থ মন ।
শাপলা ফুল আর ঢেউ খেলানো প্রায় গোল
পাতার থরো থরো কাঁপন
হিমেল বায়ু উড়ে যায় অদৃশ্যে-
শিহরণ তুলে প্রাণে সুখের স্বচ্ছন্দের
দিক চক্রবাল শুয়ে পড়েছে
অথৈ জলের নিচে
যুদ্ধ ডাক শুনি কাকের অহরহ
ক্ষুধার রাজত্ব কায়েম করে জেলে বাড়িতে
দোয়েল-কোয়েল-পাপিয়া-শ্যামার
কূজন ভেসে যায় শূন্যে
অথবা ক্ষুদ্র ইছামতি নদীটার স্বচ্ছন্দ ঢেউয়ের
সাথে কোথায় কোন ঠিকানায় ।
মায়ার ছড়াছড়ি মাটি-পানি-ঘাসে-লতায়
গন্ধে-স্বাদে- দেখি,
দুঃখের কালো নিশান উড়ে-
হাডিসার মাঝির ঘামে, সন্তানের কান্নায়
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শ্রোতের গুতায় তীরের কিনারায় শুনি
আকাশটা ঝলমল টলটল করে
জলের ভেতর অবিরাম
আমার মনেও সবুজ গাঁ কচুরী ভরা ডোবা
ডাঁটাবন-মানুষের মনের অব্যক্ত কথা
সাড়া জাগায় দুঃখানন্দের ঢেউ তুলে মৃদু
অথবা বিলে হৃদয় জলের ভেতর
ওসব অকারণে আকাশের মতই কম্পমান ।

(কবি কায়কোবাদের জন্মস্থান) আগলা-পূর্বপাড়া

২.৮.৮৭

মানবতা, দেবতার বধ

ছোপ, ছোপ লাল জমাট রক্ত, একটু আগে
মানবতা, দেবতা বলি হলো-মানবের পদতলে
গ্রাস নালী ব্যামো করে অনেক উষ্ম রক্ত
ডাগর কালো চোখ দুটো ফ্যাকাসে এখন
নিস্তেজ জিহ্বা মাটি আঁচড়ায় কাত হয়ে
কুকুরের উল্লাস মুখর দুপুর ।
হাত-পা ছুড়াছুড়ি প্রাণপণ ঘুংড়ানো
ঘায়েল করে না ফুল্ল জল্লাদের মন
সবেগে ছুরি বসায় গলায়-সটান অবশ
দেহ দেবতার ।

টুকরো টুকরো মাংশ খিচুড়ি পাকায়
থলথল করে সদ্য কাটা সতেজ কলাপাতে
পাষণ্ড পায়ে ঠেলে পূণ্যাসন বহুদূরে জড়তায়
আমার বদলে দেবতাকে বধ করে
পশুত্বকে ঢেকে রাখি দেবতার রক্ত দিয়ে
রক্ত-স্নাত দেবতার আত্মা লুকায় বাতাসে
স্নান করে হালকা হলুদাভ আলোয় দিনের ।
তত্ত্বের তালগোল পাকায় মৌলভী মিনারে বসে
কয়লা দিয়ে কিনে সোনা পরশ পাথর
ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের কৌতুক অভিনেতা
বুলি ঝাড়ে- পাপের আবেগ রসে
প্লাবিত বন্যায় উপদ্রুত হৃদয় ।
দর্শক আলোক সজ্জায় চিনতে ভুলকরে
নিজেকে পশু- নাকি মানুষ ।
অর্থহীন কান্নায় ভেঙে পরে পৃথিবীর
পাগলরা
দেবতাহীন জগতে উড়াল দেয়, খুঁজে
মানবতা দেবততার সুখ নীড় ।
যৌতুক দেনাগ্রস্থ জীবস্মৃতা মা দ্যাখেঃ
মেয়ে নিজ হাতে কপাল ফাটায় চলিকাঠে
পান চিবিয়ে লাল করে ঠোঁট ছেলের বাপ,

পেটের ওজনে বৈঠকখানার জলটৌকি মচমচ করে
কায় ক্রেশে দিন কাটে নিম্ন বিভূর
শীর্ণ দূর্বল সমাজের প্রহরীর গায়ে
আঁচড় দেয় কুসংস্কারের বাজপাখি ।
বাঁশের ফলি আঁটিয়া পায়ে, নাচে
কাল দৈত্য থাকি পোষাকে,
নিম্ন বিভূর ঘাড়ে সুখের বিছারা
কামড়ায়-কচলাতে গিয়ে জ্বালা বাড়ায়
কিম্বদন্তের অভিযান কড়ই গাছের ডালে
ঝাঁকিয়ে বসে মুচড়ায় ঘাড়
রাতে অসহায় পথিকের ।
বিবেকের শরীর কাটে ধারাল অস্ত্রে
সমাজের সুউচ্চ চূড়ারা
মানবতা দেবতা হারিয়ে গ্যাছে উপত্যকা
ছেড়ে নির্জন গুহায় অন্তরালে অলক্ষ্যে-
আমি খুঁজেছি অনেক দিন অনেক রাত
বন জংগল, পুকুর ডোবা নদী-সাগর
ঘরবাড়ি, উদবাস্তু শিবির পেরিয়ে মাড়িয়ে
হাঁটতে হাঁটতে আজ ক্লান্ত-দ্বিধাগ্রস্থ
চৈতন্যহারা আমি-
চিরদিন খুঁজব কি সংস্কারের কাঁটা ভরা
প্রাচীরে আটকা পড়ে
আমার মানবতা দেবতাকে বধ করে, করে ।

বাহরাম খান পাড়া

৭.৮.৮৭

মানবতা, দেবতার বধ

ছোপ, ছোপ লাল জমাট রক্ত, একটু আগে
মানবতা, দেবতা বলি হলো-মানবের পদতলে
গ্রাসনালী ব্যামো করে অনেক উষ্ণ রক্ত
ডাগর কালো চোখ দু'টো ফ্যাকাসে এখন
নিস্তেজ জিহ্বা মাটি আঁচড়ায় কাত হয়ে
কুকুরের উল্লাস মুখর দুপুর।
হাত-পা ছোড়া ছুড়ি প্রাণ পন ঘোংড়ানো
ঘায়েল করে না ফুল্ল জল্লাদের মন
সবেগে ছুরি বসায় গলায়-সটান অবশ
দেহ দেবতার।

টুকরো টুকরো মাংশ খিচুড়ি পাকায়
থলথল করে সদ্য কাটা সতেজ কলাপাতে
পাষণ্ড পায়ে ঠেলে পৃণ্যাসন বহুদূরে জড়তায়
আমার বদলে দেবতাকে বধ করে
পশুত্বকে ঢেকে রাখি দেবতার রক্ত দিয়ে
রক্ত-স্নাত দেবতার আত্মা লুকায়ে বাতাসে
স্নান করে হালকা হলুদাভ আলোয় দিনের।
তত্ত্বের তালগোল পাকায় মৌলভী মিনারে বসে
কয়লা দিয়ে কিনে সোনা পরশ পাথর
ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের কৌতুক অভিনেতা
বুলি ঝারে- পাপের আবেগ রসে
পঠাবিত বন্যায় উপদ্রুত হৃদয়।
দর্শক আলোক সজ্জায় চিনতে ভুলকরে
নিজেকে পশু- নাকি মানুষ।
অর্থহীন কান্নায় ভেঙে পরে পৃথিবীর
পাগলরা
দেবতাহীন জগতে উড়াল দেয়, খুঁজে
মানবতা দেবততার সুখ নীড়।
মৌতুক দেণাগ্রস্থা জীবস্মৃতা মা দ্যাখেঃ
মেয়ে নিজ হাতে কপাল ফাটায় চলিকাঠে
পান চিবিয়ে লাল করে ঠোঁট ছেলের বাপ,

পেটের ওজনে বৈঠক খানার জল চৌকি মচমচ্ করে
কায় ক্রেশে দিন কাটে নিম্ন বিভূর
শীর্ণ দূর্বল সমাজের প্রহরীর গায়ে
আঁচড় দেয় কুসংস্কারের বাজ পাখি ।
বাঁশের ফলি আঁটিয়া পায়ে, নাচে
কাল দৈত্য থাকি পোষাকে,
নিম্ন বিভূর ঘাড়ে সুখের বিছারা
কামড়ায়-কচলাতে গিয়ে জ্বালা বাড়ায়
কিম্বদন্তের অভিযান কড়ই গাছের ডালে
বাঁকিয়ে বসে মুচড়ায় ঘাড়
রাতে অসহায় পথিকের ।
বিবেকের শরীর কাটে ধারাল অস্ত্রে
সমাজের সুউচ্চ চূড়ারা
মানবতা দেবতা হারিয়ে গ্যাছে উপত্যকা
ছেড়ে নির্জন গুহায় অন্তরালে অলক্ষ্যে-
আমি খুঁজেছি অনেক দিন অনেক রাত
বন জংগল, পুকুর ডোবা নদী-সাগর
ঘরবাড়ি, উদ্বাস্তু শিবির পেরিয়ে মাড়িয়ে
হাঁটতে হাঁটতে আজ ক্লান্ত-দ্বিধাগ্রস্থ
চৈতন্য হারা আমি-
চিরদিন খুঁজব কি সংস্কারের কাঁটা ভরা
প্রাচীরে আটকা পড়ে
আমার মানবতা দেবতাকে বধ করে, করে ।

বাহরাম খান পাড়া
৭.৮.৮৭

শিকার

অনাহত এক পশলা বৃষ্টি অজস্র মোলায়েম

বাণে ঘায়েল করল আমার-

অশান্ত, অতৃপ্ত দুশ্চিন্তা উপদ্রুত

উষ্ণ মনকে

ভেসে এলাম সফেন তরঙ্গের লোলুপ ফানুস

আর অগণিত রঙিনস্বপ্নের বক-বলাকারা

বাদামী-লাল পালের ওপর দিয়ে উড়ে যায়

সবুজ বলয়ায়িত এক গ্রাম থেকে

আর এক গ্রামে-এক প্রান্তর থেকে আর-

এক প্রান্তরে ।

ছটিকে পড়া উল্কা পিণ্ডের মতন অদৃশ্য

হয় আকাশেই ক্ষনিকে আমার মনের টাকা

আর টাকা হতে উদ্ভূত কাল্পনিক চাহিদা গুলো

ফিরে আসি নিঃস্বের জীর্ণ কুঠিরে

ডেরায়, চেলায় ।

কাল বৈশাখী ঝড়ো-হাওয়া তাড়িত-

শাদা ধেণুর মতন মাথা নুইয়ে-লেজ উঁচিয়ে-

টাকারা যাদু আকর্ষণে নাচায়-দৌড়ায়

মানুষের মন-

তারপর চঞ্চল দোয়েলের মতন ভক্ষণ

করি জঙ্গলের ধারে, ক্ষেতের পাশে,

আবর্জনায় ঝাঁঝি পোকা- কেঁচো, ঘাস ফড়িং

দুঃখের দিনের পুরনো স্মৃতিগুলোর ব্যাঙেরা

ডাকে গাল ফুলিয়ে বর্ষায় ।

আর ভিজে গাছ-গাছালির সবুজ শাখা-পাতারা

মাথা ঝাড়া দিয়ে হেসে ওঠে,

এক মুঠো ভাতের সোনালি রোদকে করে-

অভিবাদন ।

আমার মনের পরাবাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো

করাতের পোচে কেটে ফেলি

কখনও পানি-ভাসা কচুরী অথবা

স্থির-পানি খালের বুকে বুক ডুবিয়ে
দেখি, স্বপ্ন আমার শবার ঘর-
খুঁজে ভূ-স্বামীর রেজিষ্ট্রি করা কল্পনার জমিতে
বনের জানোয়ার আমি সাহেবের
উচ্ছিষ্ঠাংশ খাই কুকুর বিড়াল
আরও অনেক প্রাণীর মতন
অনুকম্পার দৃষ্টি ধাক্কা মারে ডান হাতে
দরোজার রঙিন স্কীনে ।
কিংবা জীবিকা সাপের তাড়া খেয়ে
ছুটে যাই-কৃষক তাঁতী জেলে, কামার
কোমরগঞ্জের হাটে
পুঁটি মাছ-চালতা, ডাটা কচু-কাঁচ-কলা
ব্যাগে সহবাস করে আনমনা ফিরে আসি
মনের মাঠে সুখের স্বাধীন পতাকা পত্পত
উড়ে-
বাবা-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে-
ভাত-নুন-তরকারী উদরের ঘরে ঢুকিয়ে
স্বাদে-গন্ধে-আনন্দে গদগদ ছপ্ ছপ করে
শুইয়ে দিই নাড়ি ভূড়ির বিছানায়-
নতুন জীবন পাই শান্তির মুহম্মদ (সা:) কে ভেবে,
দাঁত খিলাই শীতল পাটিতে বসে
কিংবা কাজে মন দিয়ে ছাহড় বন্ধ
হাসি মস্কারা করি বিড়ি ফুঁৎকারে
গালগল্প মেরে ছায়া ঘেরা নিকোনো উঠোনে ।
ছারপোকা কিংবা মশা গুন গুন করে উড়ি
আর খুঁজি চৌকির নিচে ঈষৎ ফাঁকে-
মুটেগিরি-
শরতের শীতল আমেজ ভরা সকালে
ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে
কচলাতে ছুটিয়া যাই- এক সের রিলিফের
গম কিংবা পাওনা টাকার প্রত্যাশায়
চৌধুরী বাড়ির আগিনায় ।
আসে বৃষ্টি- গুটি সুটি মেরে বসি

বৃষ্টিরা কেড়ে নেয় মন শুধুই চেয়ে
চেয়ে চেয়ে অনর্গল
ভাবের ধারা-পানির ধারার সঙ্গী
হয়ে ছুটে যায় ক্রমশঃ নিচের দিকে
খাল বিল নদী পেরিয়ে সাগর-মহাসাগরে- ।
ছোড়ারা শোলা ভাসে হই হুল্লোড়
করে- ফুটবল খেলার গোল নিয়ে
শুনি, চৌধুরীর কণ্ঠ পাশ্চিম
বড়ো ঘরে- বলদ আমি খাটি খাটি
আর খাটি খাবার বেলায়
ঘাস-খড়-পানির আশায় চেয়ে থাকি
সংস্কারের দড়ি দিয়ে বাঁধা মজুর আমি
গোড়ার খুটিতে ছিল ছিল জলভরা চোখ ।
টাকা ঘাস-ভাত-চাই-বাঘব বোয়ালের
শিকার ডানকিনা ।

টিকরপুর, ঢাকা

৮/৯/৮৭

মোটের সহবাস

আবছা আঁধারের নরোম তণু মাড়িয়ে ছুটল
দু'চোখা বেদনার মানবানুগত দানব;
দূরে মোরগ ভোরকে ডাকে, কানে আসে,
করণ সুর, আহ্বান ঈশ্বর পূজার;
আকাশে মেঘরাজ পাড়ি জমায় অজানা দেশে
অভিমানিনী রূপসি মরচ্চাণীর তাল্যাশে-
বিড়াল ছানার কিংবা কুকুর ডাক রাতে
সতর্ক করে, জাগায় প্রহরির আধো ঘুমন্ত চোখ;
মোটের খসখসে হাত স্পর্শ করে, চুম্বন খায়
কোম্পানির সিল দেয়া বাক্স পেটীর;
আর বালুর আলোয়, পিচ্ছিল কাদাময় পথে
আগে বাড়ে পা টিপে টিপে সন্তপর্ণে-
ঘুমন্ত মনিব বাড়ির বিরান বারান্দায়;
বায়ুর শীতলতা গায়ে জড়িয়ে সে সাড়া দেয়
টাকার ভালবাসায় রাতের মৌন রহস্য মুখ;
ব্যস্ত হাত-পা-মাথা-চোখ-কান সচল
মাংশল ইঞ্জিল সঘাম মোটে-প্রেরসির মতন
আঁটসাঁট বোবার সহবাসে, ক্লান্ত, ক্রান্তি লগ্নে ।

চকবাজার, ঢাকা

২৬.৭.৮৭

হারিয়ে যাবে কবিতা

কাষ্ট নির্মিত কেরারায় আরাম দেয় যুদ্ধ ক্লান্ত
জীবন সৈনিককে- হতচ্ছারা
এক ভাবুক শিল্পীকে-
ধারেই হারিকেনের চিমনির ঘোর কালো
আচ্ছাদন ইংগিত দেয়-
“পৃথিবীটা ভারী অসুন্দর”
ছেঁড়া বালিশ, আবর্জনাময় ঘরের মেঝে
শিল্পীমনের এলোমেলো অবস্থা স্পষ্ট করে ।
খাবারের সময় পেরিয়ে গেল কখন
অথচ টাকার স্বজনেরা কথা কইছে টাকার সাথেই
ছেঁড়া লুঙ্গিটা বুলছে-বলছে
আমি যখন আছি, থাকবো ।
অত্যাধুনিক কোন দেহাবরণ
পাওয়ার স্বপ্ন দেখো না
শুকনো কড়ই কাঠের বেঞ্চিগুলো সারিবদ্ধ;
বিছানা পেতে ওর ওপর বসা কোন পেত্নী
আশ্বাস দেয়- আরও অপমান করার ।
আর আমিও আশ্বস্ত হই, খাট কেনার-
ক্ষীণ আশা নস্যাৎ করি-
অর্থলোভী সুদখোরের কথার ঝাঁঝে
আর মনে ছুরিকাঘাতে ।
মা-বাবা হারানো কোন ঐঁড়ে বাছুর-
কোন নামকা ওয়াস্বে চাকুরে প্রতিভূ ।
হাতের কাছে- আঁকা ছবিগুলো প্যাঁচাল
পাড়ে- তিরস্কার করে
ডাইরীর কবিতারা অট্টহাসিতে ফাটে-
সম্ভাবনা আছে কি?
দিনের আলোক দেখার নাকি
পিতার মুখেগালে নিরাশার কালো ছাপ লেপে
হারিয়ে যাবে কবিতা দুর্ভাবনা আর অভাবের
পংকিল ডোবায়-
অসংখ্য ল্যাংটা মানুষের ভিড়ে পরাবাস্তবে ।

টিকরপুর, ঢাকা, ২১/২/৮৭

হরতাল

রোদ ভরা তেতলার ছাদের 'পরে গুটি দুই তিন টিনের চেলাঘর,
তারি বারান্দায় সাজানো নানা জাতের সৌখিন টবে ফুল গাছ,
তিন মনের তিন বন্ধু সেথা সুখে থাকে নাহি ভয় নাহি কো ডর,
শিমূলের খাটিয়ায় বসে পরের টাকায় খায় ডাল ভাত মাছ।
মহারাজের মত কখনও হুকুম জারি করে একে অপরকে
দেখে চাষী, কামার, কুমার, তাতী, ছুতার, ঋষি সকলেই হাসে
বলো প্রচণ্ড বুদ্ধিমান স্ববিরোধী দলের নেতা যাবে কি ভড়কে ?
আমার জনগনই অর্থাৎ ঐ পরিচিত শব্দটি দেখো কত ভালবাসে
ওদিকে সেনাপতি মহারাজ ঝাঁকিয়ে বসিলেন গদিতে আর কি।
কেহ ঘটালে প্রমাদ লেলিয়ে দেবে পুলিশ, জনতায় হ্যাঁ হার কি ?
রাত ভরে স্বপন দেখে একবন্ধু সকালে উঠিল হাউমাউ কাঁদিয়া
কারা যেনতার ছেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল অযথা জোর করে
আর হোতারার বুটের আঘাত করি, তরুণ শিক্ষার্থী নিল বাঁধিয়া,
কবি বন্ধু বললে এ মুঞ্চিল দেখি, এক ভূত সরালে আর ভূতে ধরে,
হেসে উঠে সব বন্ধুর অভিনয় যথার্থ, হঠাৎ দেখে মেসে নেই চাল
ভূত সরানোর দাবি নিয়ে পথে গুরু হলো মুড়িখন্ডের হরতাল।

চকবাজার, ঢাকা

২২.৭.৮৭

কাটে দিন রাত এখন

মুরগীরা শরীর খুঁটে নিকোনো উঠোনের
আড়ে দাঁড়িয়ে চঞ্চু গুঁজে পাখায়
পাখিরা ডাকাডাকি, কোলাকোলি করে
প্রত্যুষের আগমনে
হলদে পাপিয়া বুলবুলি, টুনটুনি নাচে
আমড়া, ডালিম, কামরাঙা গাছের শাখায়
শাখায় পুলক ঝিলিক মারে সর্বাঙ্গে ।
শ্যামলা পল্লীবধূ আড় চোখে চায়
ধান ঝাড়ে কমনীয় রূপ আকর্ষণ করে মন বেহাইয়ের
বধূর নরোমতনু যৌবন রসে ঢল ঢল করে
উপচে পড়ছে মদিরা-কেনা ভালবাসার
নেশায় কাতর চোখ, অমৃতের সাকী ।
যুগল খাড়া স্তনের পাহাড় নেতিয়ে পড়ে
কাম-সাগরের অথৈ জল স্পর্শ করে আবেশে,
সুডৌল উরু যেন স্বর্গের তোরণ বধূর ।
পূর্বাহ্নে রূপালি অরুণ, অতপ্ত হলদে
আলোর রঙ গায়ে মাখে, খড়ের ঘর চাটাই
নেংটা, উদগত রোগা চোখ শিশুর ।
সুনীল আকাশ বৃকে রাখছে ছোপ ছোপ শাদা
মেঘমালা: রূপোর টুকরো-
অনাথের কাংখিত, সিকি, আধূলি ।
বাসের চটি বেড়ায় আঁটানো ভাংগা হুকোর
সুগোল ছিদ্র ছেনু কৃষাণের স্মৃতি রোমন্তন করে ।
বোনের বাড়ি,- উপরোধে ঢেকি গিলে গিলে কেরারায়-
গা এলিয়ে নীরবে, উৎকর্ষায়, ভদ্রলোক ভাবে-
হয়ত যৌতুক পরিশোধের অপারগতা- কিংবা
দাওয়ায় বসা হাড়িসার দাদুর কথাই ।
পায়রা-পায়রি বাক বাকুম সুর তুলে চালের চূড়ায় বসে
মাথা-চোখ-চঞ্চু কথা কয়, ছাই রঙের পাখা নেড়ে
ঘুরে ঘুরে আহ্বান করে, সহবাসের ।
কাঁচা পেঁপে গাছের নিচে

বাঁশের ফালি মোড়ানো লাউয়ের মাচা
হলুদ-আদা-ঝাড়, চিচিংগার আকর্ষি সমেত লতা
শুকনো কধিঃ ধরে জড়াজড়ি করে মমতায় ।
প্রজাপতি উড়ে, বসে, চিবুকে, অধর-ওষ্ঠে
চিচিংগা-ফুল দলকে চুম্বন করে, চেপে ধরে ।
সুখে গদ্ গদ্ করে নাভীতে ছল ঢুকায়
মধু পান করে মেটায় পিয়াস
আমি মানুষের ভালবাসায় ফুটাই হৃদয়ের
কুমড়ো ফুল-জন্মাই
সবুজ কুমড়ো-সোনালি ধানের শীষে
সবুজে সবুজে, অবগাহন করে
শতরূপে আমার সত্তা
হারিয়ে সর্বত্র কাটে দিন রাত এখন ।

আউলিয়া পাড়া, কিশোরগঞ্জ ৭.৮.৮৭

তবুও স্বপ্ন দেখি

শরতের মেঘমালা আঁধারাচ্ছন্ন করে
সোনালিরেণু ভরা ব্যস্ততম মুখরা-
মহানগরী খালি প্যাঁচল পাড়ে অসময়ে
লক্ষ যন্ত্রদানবের পিষ্টন নির্যাতনে
মুর্ছা যায় সুললিত মন- ।
বার বণিতারা পান চিবায়,
আঁচলে টাকারা মুখ লুকায়, তঙ্কর
ঘুরে ডেরার বারান্দায়,
শিক্ষিত বেকার আমি ছিন্নমূল
দুশ্চিন্তার টমটম গাড়ী চালাই কখনও
ট্রাফিক আইন লংঘন করি জিদে-
শিকার ধরি সাপের মতন ।
গ্লানি-দুঃখ-আক্রোশ বক্ষ পিঞ্জরে

বন্ধী আছে
বেলুনের মতন উর্ধ্বচাপে,
উর্ধ্বশ্বাসে উর্ধ্বদিকে,
অনেক, অনেক, অনেক, অনেক
দূরে মহাকাশে উঠি
সোঁ সোঁ করে ছুটা পাইপ গানের-
গুলিরা গাল চাটে ভগবানের ।
নাভিশ্বাস ওঠে পরের ঘরে দিন
যাপন করে ফেরিওয়ালা নিতাই;
ভাড়ার কথা শুনলেই গাঁ শিউরে ওঠে
বেচা কেনা কম
বাস্তবতার নিরীখে আমি সরল কবি
শিক্ষা ও সমাজ শ্রেণীর যাঁতাকলে
চাপাপড়া স্বাদের মুগ মুসুরি কলাই
সামনে আসছে সুদিন
আশার ভেলা ভাসাই সংসার সমুদ্রে
তবুও স্বপ্ন দেখি ।

জাতীয় গ্রন্থ ভবন গুলিস্থান, ঢাকা
১৫.৯.৮৭

মরণোত্তর সাধ

আবেগ ঝরে মৃদু ছন্দে টল টল করে জল স্রোত টানে,
হাল মাঝুল-পালের তরী সুন্দর মরমী মাঝি মত্ত গানে ।
নিশ্চল নির্বাক সবুজ প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য কত,
মানবে মানবে চলে কল কোলাহল, কেহ কেহ আশাহত ।
মগ্না হিয়ায় হেরি উদার গগন আর জাগিল মানসপটে
কতশত যুগ হেরি চলে গিয়েছিলু আবার এসেছি তটে ।
হেরিতে সেই মানব বাস্তুভিটা, থাকিবার দুঃখভরা এই ঘর,
মৃদু কাঁপুনিতে সলিল মাঝে হৃদয় কাঁপে মোর থরথর,
কেন জানিনা আমি যবে হেরি কত মানুষের আনন্দ ঝরে

মোর ছোট জল তরণী, ধরণী, তলে শুধু দুঃখ বোঝা নিয়ে ভরে।
 সেই সুন্দর ভুবন মায়ার কানন স্বভাবের এষে এক মহাদান,
 অনন্তকালের আমার যত অবলাকথা, যত মনের তীক্ষ্ণ বান।
 মানবরত ছলনা খেলায় তবু কেন আনন্দ উল্লাসে কেহ পড়ে,
 হৃদয়ের ভাবনা স্মৃতি শোক উচ্ছ্বাস উৎস দ্রুত সে খালি করে।
 কেহ কি জানে, হয় ওই আমার প্রিয় জীবন স্রোত মত্তর চলে,
 সায়াহ্নে ভাসিয়া আসা তরী ঘোর সাঁঝের বেলা মন-মাঝিকে বলে-
 'ওগো শাস্ত্র প্রান্তর তোমার 'পরে চলে মিথ্যা ক্রীড়া শিশুর,
 সম্বিত ফিরে পায়, ভেসে ডুবে জলে লেংটি পড়া রূপক কিশোর।
 হৃদয় আনন্দে মাতে যবে হেরি বহিছে ধীরে ঝির ঝির বায়,
 কলসি কাঁখে গৃহবধূরা স্নান শেষে মৃদু পদে বাড়ি যায়।
 শালিকের ঝাঁক উড়ছে নীলগগনের নিচে ভারী সাধে
 পথে ঘাটে গৃহহারা নদী শিকস্ত্রির লোক কোন সুরে কাঁদে!
 কোথা ঠাঁই আমি কোথা যাই হয় কভু অবনি পরে মোর,
 মিলিবে কী এতটুকু বাসা জীবন বাকী আর কত দূর!
 শীতল সলিল ঢালি ঢালি বুক, যত হতাশাকাতর নর নারী,
 জীবন পাথারে ভাসে অসহায় সে দুরূ দুরূ বুক, সুখ কাড়ি
 কে নিয়ে গেল জানিনা বলিল না কিছুই- তারা কালে কালে-
 যুগে যুগে আসি কাধে চড়ে, হাল বিহীন নৌকো ভালে
 চলে তব' পরে, হয় সুন্দর আমি, সেই মানব সমুদ্রে একা,
 কোথা গিয়ে পাব ভগবান তব রহস্য জালের শেষ দেখা?
 মরণের পরে আর জাগিবে না আঁখি বলিব না হয় কথা,
 তুমি শুধু চলে যাবে নদী কল কল্ রবে আমার হৃদয় ব্যথা
 রাগ বাগিনী মানব গানের আর কত সাজানো তাসের ঘর,
 রবে চির নূতন শন ডাটাবন মায়ার মাটি, নদীর দু'ধার চর।
 এত জল তব 'পরে কোথা লুকাই আমি, জগতে আসি ফের,
 উদাস হয়ে সোঁ সোঁ ঘুরিব পবনে, আশা মরনোত্তর জীবনের।"

ঢাকা-নওয়াবগঞ্জ, নদী পথে

৫.১০.৮৭

পার্ক

শত ব্যস্ততায় ডুবন্ত আত্মার মানব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে রাজপথে,
অদূরে জীর্ণ কুঠিরে শীর্ণ মানব থাকে মাথা গুঁজি কোন মতে ।
দুপুরের রৌদ্রের প্রচন্ডতায় শহরে আজি ভীষণ ক্লান্ত আমি
ঘুরি, অন্তিম প্রশ্ন রাখি আপন মনে একটু শান্তি একটু মুক্তিকামী
নয়ন-মনের স্বস্তি চাহি, খুঁজি প্রকৃতির অপত্য স্নেহ প্রেম ছোঁয়া
তাবৎ নর-নারী বিষয় দাবানলে পুড়ি হয় আপনি বুঝি গেছি খোয়া ।
ছলনা করি তুরায় চলে আসি কাজের ফাঁকে নিস্তর্র নিবিড় পার্কে,
তালা দিয়ে রাখিব এখন বিষয়ের নিরস-নিষ্ঠুর-অসুস্থ মনের দ্বারকে ।
এখানে আছে কিছু সুসজ্জিত বিটপ মোলায়েম সবুজাভ নরম ঘাস
মৃদু সমীরে দোলায়িত পল্লবের হাতছানি সুন্দর গোলাপের সুবাস ।
সমতলে থাকা লতাগুল্ম, কালোজলের দীঘি, খেলার মাঠ, ছায়ায়
পুকুর পাড়ে বসি অতি সহজে, খুঁজে পাই, শহরে হারানো আমায় ।
প্রেমিকা বসে বৃক্ষতলে বলে মনের গুপ্ত সরস প্রেমময় কথাগুলি,
এ যেন তরুর সাথে তরুর চলে লতকালতকি অব্যক্ত রহস্যময় বুলি ।
হেনকালে স্বর্গালয় মনে হয়, ক্ষণিকের আশ্বাদনে ডালিমদ্বয়, আহারে
দুটি প্রাণের আবেশে জড়িয়ে ধরা মধুর ক্ষণে-বৃক্ষ তলে বারে বারে
শুনি, অভুক্ত কাকের একটানা কর্কশ স্বর শতবার জানি কহে কেন;
অন্ন চাই ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে কাক অভাব ক্লিষ্ট মানব ডাষ্টবিনে যেন
সুরম্য অট্টালিকায় আসে না কানে যন্ত্রের যন্ত্রণা বিদ্ধ সেই কষ্টসূর,
সম্পদের পাহাড় চূড়ায় যারা মদ্যপানে আছে আসক্ত, চির বিভোর,
ছুটে যাওয়া অকস্মাৎ গাড়ির হুইসেল ভাবিতে দেয় না কিছুই মোরে
ছোবল মারে বিষধর সাপে, পিচকরা পথে থাকি থমকে অনূতিদূরে
ওরে আয়, আয়, আয় শহুরে অহংকারী অথবা এতিম জারজ, প্রাণ
গোধূলি লগ্নে, আয় ছুটে সুশীতল ছায়ায় নিয়ে যা স্বর্গীয় সুগন্ধ ঘ্রাণ
সদ্য ফোটা কমলের বিনাব্যায়ে, আয় আজিকার পুত পবিত্র মনে
মহানগরের পার্কে, কোটি মানবের “সুস্থ হৃদ” ভাবি তারে ক্ষণে ক্ষণে ।

সোহরাওয়ার্দী, রমনা, ঢাকা, ৩০.১১.৮৭

জবাই

একি করিলেম! এক প্রাণের সজীব স্পন্দন
আমি বন্ধ করে হায়,
কী করে বসে আছি প্রাণের মায়া ধরি
প্রাণ কাঁদে না মমতায়।
যবে ছুরি দিয়ে গলে দেখি রক্তাক্ত নিঃশ্বাস
তারপরে একি! নিস্তেজ দেহ,
সে কি করুণ দৃশ্য, মৌলভীর-হৃদ গলে না
হায় পারে না বলে কেহ-
তেমন কিছু, আমি ঢেকি গিলে উপরোধে
এমনি পাষণ হলেম কেন,
জীবনের চেয়ে সদাচাবে মূল্য দিলেম
স্বর্ণছাড়ি-কয়লা নিলুম যেন।
আমি ঘাতক দানব পিশাচ-ঈশ্বরের দিয়ে
দোহাই, করিয়ে এমন কাজ
অপরে বধ করি আনন্দে মাতি পাপী
আমি কপট হটকারী রংবাজ।
বাইরে মোর ধর্মাচরণ ভেতরে হলাহল
নৃশংস হত্যায় কাঁদেনা মন,
ঈশ্বর খুশী নহে-সত্যকে ঢাকি মিথ্যা
দিয়ে-লুকিয়ে চুরি করি গুপ্তধন।
যেথায় প্রাণ নেই-নিষ্ঠুর পাষাণতা
অনুতাপ আছে আমি ঘাতক,
আমার প্রাণের মায়া করি লোভী আমি
যেন পানির আশায় উর্ধ্বমুখী ছাতক।
এতটুকু বাজিল না ব্যথা-এতটুকু দুঃখহীন
হৃদয় নরাধম পশু সম,
আমি ঠকাই আমারে, ঈশ্বর হাসে
নিমেষে করি বধ, শত ধিক্ মম।
প্রাণ বধে দয়া নেই যার ঈশ্বরের দোহাই

দিয়ে তার কি লাভ হবে,
পাষণ কভু পারে না প্রেম পাগল ঈশ্বর পেতে
মনের ঈশ্বর কাঁদে যবে ।

বাহরাম খান পাড়া, ১৮.৮.৮৬

কাব্যরস

(মহাকবি কায়কোবাদ স্মরণে)

জীবন রহস্যের একটি জিজ্ঞাসা নিয়ে একদিন তুমি এসেছিলে,
ছন্দের যাদু কারাগারে আটক হয়ে সুর সাগরে ভেসেছিলে ।
মরণ রহস্য বলনি তুমি;
ফুল সৃজনের উর্বর ভূমি,
সুবাসে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া তোমার রঙিন ফুলকাব্য দল
প্রজাপতি সম কল্পনারে যুগে যুগে করেছ আহ্ বেদম পাগল । .
আমার তৃষিত হিয়া,
জেগেছে ক্ষুধা নিয়া,
হেরিতে তব কাব্যলোক আর অমৃত করিতে পান আর সন্ধান,
হৃদয় মেলিতে বিশ্বচরাচরে করিতে আমাকে অপরে আত্মদান ।
একটি কুসুম কলি,
আপনাকে আপনি বলি,
নবযুগের বারতা লয়ে“এসেছ আবার” নুতন কবি কায়কোবাদ,
যুগে যুগে আসি আমি, আমি মানিনা আর যুগের সব ভাবানুবাদ ।
আমার পতাকা তলে,
ছায়া পেয়ে যায় বলে,
আমারি হয়ে আসি মানব আমারি হয়ে চলে যাই আমি চলে যাই,
এ ছলনা বুঝিবে কে জানিনা কোথা আপনারে পাই খুঁজে খুঁজে পাই ।
সকল কালের রাজা,
দানি যুগেরে সাজা,
নূতন শাসনে করিমত্ত ধরাতল ফের আসি একই প্রেম অনুরাগে,

ধূধু মরুভূমে মরিচীকা নহে কাব্য সুধা হে প্রিয় ভাললাগে ।
তব গান যত দান;
অমর এই মহাশ্মশান,
সকলি অমৃত সমান হে প্রাণপ্রিয় সাধক প্রিয় বরেণ্য জন,
যুগের তালে তালে নাচি তুমি সকল যুগেরে করো বরণ ।
দখিনা দুয়ার খুলি,
কৃজন কাকলী বুলি,
আজও অনুভবি মৃদু সমীর আজও শুনি অনুরাগে গান,
প্রিয় বিহঙ্গ গায় সুরেছন্দে তব, অমৃত সমান কর দান ।
সকল ভক্ত জনে,
মাঠে প্রান্তরে বনে,
একি সুর পাই অবিরত পাগল প্রায় আহা আমি মরি মরি মরি,
আনন্দে আত্মহারা বুলবুলি তোমার কাব্যসুধা হৃদয়ে ধরি, ধরি ।
সহে না প্রিয় না বলনা,
এ তোমার কোন ছলনা,
নশ্বর ধরা 'পরে অবিনশ্বর একি তোমার বাজে হৃদয় কথা-
আমি মানব তুমি মানব কেবল কবি আমি আর তুমি যথা--
দূর হোক সব ছাই,
মানব, মানব তাই,
মিটে যাক আজ যত দূরত্ব দ্বন্দ্ব কোলাহল এ অবনি' পরে
মানব মানবে ধরিবে টানি বিষ উদগীরণ ধর্ম বর্ম নাহি ধরে-
নাহি আঘাত নাহি কারো,
নমি নমি আত্মা আরো,
মানবাত্মায় সুখ আসুক শান্তি স্বর্গসম আজিকার এ মর্ত্য ভূমে
হৃদয়ে হৃদয় জড়া জড়ি ধরি মনুজে বাঁচিব- এ মধুর শাদাভূমে ।
ভরে যাক ধরা খানি,
আপনারে আপনি দানি,

বল, প্রিয় অলক্ষ্যে থাকি ছলনা ভরে “এসেছ আবার” হাসি লাগে,
তোমারে চিনিব কেমনে এ যুগে কর্মশ্রোতে নবীন অনুরাগে?
প্রিয় বলিয়া যারে,
অধিক কাছে তারে,
ধরিব টানিয়া সব জাতি অতি নিকটে ধর্ম ভেদী মিশিব সুধাছন্দে,
অবগাহি কাব্যরসে বাঁচিব ওগো প্রিয় কবির বাঁচিব মহানন্দে ।

টিকরপুর, ঢাকা ১৭.৫.৮৬
রাত- ১.৪৫ মি:

স্মৃতির সাক্ষী

(সহপাঠী মিহির রঞ্জন আদিত্য সরকারের সৌজন্যে)

আজও নলুশ-রাজার পাথর সরকারের সারথীর রথ
খুঁজে জগন্নাথ হলের জীর্ণ ধ্বসে পড়া ছাদের নিচে
নরমেশ যরে আহুতি শিক্ষার্থী খুসদ্বাজকে--
দেবালয়ের দেবতারা ঈশ্বরের বাণী ব্যাগে পুরে
ফেরারী আসামী চৈতন্যহারা অলিতে গলিতে
রাজপথে বিষন্ন বদন ছাত্র ঘুরে বেড়ায় কথা কয়,
মহামুণী বটের সাথে দুর্বীর সবুজ গালিচায় বসে ।
স্বপ্নের শিক্ষাঙ্গনের মুক্তির দরোজা বন্ধ চিরতরে
ন্যায়ের বাণী হু হু করে কাঁদে ইট সুড়কির নিচে
ভাগ্যে জুটেনি কারও মরণোত্তর দাফন ও দাহ-
আত্মজ-মাটি-শ্মশান আজও হাতছানি দিয়ে
ডাকে কফিল নির্মল নামে পূবালি হাওয়াকে ।
গোঁড়া চাঁদের বুলেট বিদ্ধ বুক হতে ফিন্‌ক
দিয়ে পড়া নৈবেদ্য লাল রক্ত চুষে খায়
গোপীনাথ দেশ মাতৃকা ।
পশ্চিমাকাশে দেখি কেবল শহীদে
লাল জমাট রক্ত আর রক্ত আরও গাঢ়
হয় শাদা সাঁঝে লালভ আলোকে অস্তাচলে ।

শৃগালের চিৎকার শুনে দুঃসময়ে নির্দোষ
রত্নগর্ভা সতর্ক মুরগীর সাহসী বাচ্চা মোরগ
ছাত্র-পালায় আস্তাকুঁড়ে ।

সান্ধ্যবাতি জ্বালাও গৃহলক্ষ্মী ছাত্র জনতা
হটাও ঘরের তমসা স্বৈর নীতি,
চিরশোকের কালো ব্যাজ, পল্লী রূপসীর
সখের বাজু বন্ধ পড়ে আর কতকাল থাকবে
রক্তাক্ত বাংলার স্মৃতির সাক্ষী হয়ে ।

টিকর পুর, ২.১২.৮৭

অশোক-রাজত্ব মানুষের

আশার শাদা আকাশে জমেছে নিরাশার কালো মেঘ
জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় শুকপাখি পলায়নপর
ঈশান কোণে ঝড়ের ইংগিত দেখিঃ
এক তপস্বী মানব পৃথিবীর আদিম জড়তায়
কাঁপছে থরো থরো পয়োধির উত্তাল ঢেউয়ে
অত্যাধুনিক নৌযান বিধ্বস্ত,
শান্তির জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্ন স্তুপে
বসবাস করে অথের জাত সাপ,
বিষের লকলকে জিহ্বায় ছোবল দেয়
প্রাত্যহিক আনন্দের মুহূর্তগুলোকে ।
অনেক, অনেক, অনেক দিন ধরে
ক্লান্তি ক্ষুধার মধ্যাকর্ষণে বুলছি
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী
ভগবান নিউটনের সূত্র ধরে ।
কুয়াশা মরিচীকা চাদরকে
ভাবি শান্তির শাদা কপোত,
অত্যাধুনিক পশু, ইতর নিরন্ন মানুষ
অন্ন পাপের হাবিয়াহ্ জাহান্নামে জ্বলছে-
কান্নার সমুদ্রের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে,
শোকের বীণা করুণ নিনাদ কী পৌছবে

কোন দিন বড়লোক দেবতার সমুখ স্বর্গ আঙ্গিনায়?
নাকি চিরদিন একগুঁয়ে ঈশ্বর সরকারের একচ্ছত্র
ক্ষমতায় তমসচ্ছন্ন থাকবে তমালগুচ্ছের জীবন,
জীর্ণ কুটিরের সহচর দাঁতাল মুর্থ শ্যুর
হাডিসার নরকংকাল দৈনিক মজুর,
সময়ের পাপীয়া পাখিরা আত্মশক্তির
পাখায় ভর করে সংসার বায়ু সমুদ্রে
উড়ছে তো উড়ছেই-
হয়ত একদিন কানে শুনবে বিকট
আওয়াজ ইশ্রাফীলের বিলয় সিঙ্গার,
দেখবে রুদ্রচণ্ডের অশান্তির বন দাউ দাউ জ্বলছে-
সভ্যতার ধবংশ স্তূপে দাঁড়িয়ে সে দিন
কায়েম হবে- নিরন্ন মানুষের শোক
দুগ্ধ ক্ষুধা মোচনের অশোক-রাজত্ব।

টিকর পুর, ১৩.১২.৮৭

দখল

এখন শুনি হেসা ডাক উচাটন সভ্যতা ঘোটকীর
তেলে ভাজা ডানকিনা মাছ দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষের
প্রাণের তোলপাড় প্রজ্জ্বলিত উনুনের ওপর
পৃথিবীর কড়াইয়ে।
ছিন্নতারে দুগ্ধের বীণা বিংশ শতাব্দির
বাগাড়ে বেজে ওঠে বেসুরা
সমাজ পথিক মানুষ শ্রেণীর
মূলহীন জীবনে অসহায় ঈশ্বরের কানে,
একটি বিনুক নিঃশ্বের সমুদ্রতলে ঘষাঘষি
করে সুখের মানিক চুরি করে বিশাল
জলজন্তুর দুশ্চরিত্র ধণিক লুটেরা।
হয়ত ইতিহাসের দেহকংকাল কানে কানে
বলে গেল “তোমাদের মরজীবনে দেবতার

অভিশাপে খাবারের সময়টা রাহুগ্রহ
চুষতে থাক ভাগ্যের অর্থহীন কাঁটাময়
বিষভরা কষ্টের বৃদ্ধাঙ্গুল ।
টাকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীটা
কোন দিকে যাব দিশেহারা
চৈতন্যহারা কালের অবোধ শিশু?
চাকুরীর হিমালয় ধ্বসে পড়েছে
নুইয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গগুনে দিন ফুরায় না
ইহলোকের হাহাকার বেকার যুবকের ।
অভাবের ঝড়ে পড়া গাংচিল ক্ষুধার্ত-
মানুষ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে ,
পৃথিবীর নরকে উড়তে উড়তে হয়রান-
কোথা যাবে সে? কোন সুখের স্বর্গ তোরণের-
খুঁজে কাটিয়ে দিল মানবেতর অর্ধজীবন-?
বর্ণচোরা আকাশের খালি অর্ধচন্দ্রকার-
বোল ঢেকে রেখেছে নারকীয়
পর্যদুস্থ আত্মঘাত্তময় সারা
পৃথিবীর সরস মাটির ভাত ।
উপড়ে ফেলতে হবে অন্যায়ের আগাছা
ফলাতে হবে সুখ ধানে সোনালি শিস ,
সময়ের রথে চড়ে প্রবল মানুষগিরি
শ্রেণীর যুদ্ধে উর্বর পৃথিবীটা
দখল করতে হবে সাম্যের মানুষ্যজীবনে ।

টিকর পুর, ১৩.১২.৮৭

রক্তাক্ত কলম

লক্ষ দেউলিয়া পাখা গজা উই মানুষের
আত্ম প্রত্যয়ে দীপ্ত ভাস্কর মনের উর্ধ্বে
উখিত মুষ্টিবদ্ধ হাত-

আগলে রেখেছে মানুষ কলম রক্তের কালির
আল্টামডান পৃথিবীর ডেইনের ধারে নিঃসাড়
দেহকুকুর মানব অবয়ব পড়ে আছে ।
এটমিক বিস্ফোরণে তীর সংগ্রামী স্বরে
ঈশ্বরের সপ্তাকাশ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে
পৃথিবীর শরীর ঘর্মাক্ত দুগ্ধচিস্তা উপদ্রুত
সবুজ চত্বরে লিখব একটি কথা-
মানবতা ।

এখন আকালের তাণ্ডব টাইফুনে বিধ্বস্ত
অজস্র মানুষের সুখের বাস্তুভিটা-
দাম্বিক ঈশ্বর সরকারের দম্ব দাপোট
মানুষ শ্রেণীর ধনিক শিকলে বাঁধবে
তাবৎ সাহসী জীবন সৈনিকের দুর্জয় হাত ।
বেড়ালের সিংহ গর্জনে কাঁপে সজনে শাখা ।
সংগ্রামের রক্তবীজ উগ্ধকর বৈষম্যের
মাতৃভূমিতে,
দানবের রাজপথ মন্ত্রীসভার সখের বাড়ির
ঠিকানা,
সোঁ সোঁ করে সেখান দিয়ে ছুটে জলপাই
বঙের নিঃশ্বাস মনের অবাক, বিরক্তি
পাশ কেটে যাওয়া ত্রাস গাড়ি,
কখনও সখনও
হকার্স মার্কেটের গলি হতে দৈবক্রমে
অভাবের কুয়াশায় আচ্ছন্ন কষ্টের
ছানি পড়া চোখের মধ্যমণি হতে
ছিটকে পড়ে এক টুকরো রোষের

অগ্নি আলে ।

শাদা ফ্যাকাশে সভ্য মুখোশধারী
শ্বেত ভল্লুকটার ওপর,
আর কাঠের পুতুলে সুন্দর গোলাপী
সফেদা মেখে স্বগ্নের বিখ্যাত ডাইনি
ম্যাডাম বাম পাশে,
শীতল কালো চশমার ভেতর পাহাড়
মাল ভূমিতে মানুষ পিপীলিকার গণ জমায়েত-
ষোড়শী সলাজ পল্লী বধূ লজ্জার লাউয়ের
মোলায়েম ডুগা খেয়ে ফেলেছে,
লাউয়ের লতারা এখন বাঁশের চাতালে
রোগা মা কংকাল সার পাইলে শিশুর
উদগত চোখে চো । মিলিয়ে চেয়ে থাকে,
জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে খড়ের বিছানায়
কখনও ভিক্ষা মাগে, দেহের পেলবতা
কুড়ে খায় তপ্ত আলোক সূর্যে ।
লজ্জিত রিক্সা বধূর মেঠোপথের বাঁক
ঘুরে সন্তপর্ণে কদাচিত ইজ্জত লুটে খায়
ডোবার কচ্ছপ দূর্বৃত্ত ।
সরস মাটির ওপর জগদল পাথর
কারখানার বুক চিরে শাবল শ্রমিকের হাত
কালো মলিন তৈলাক্ত মলম গায়ে মাখে,
ঘামের দুর্গন্ধ ভরা কারো গা ঘেষে
ছুটে যায় আর এক কামড়ায়,
কাজের হরিণ শ্রমিকের কান খাড়া
সভ্যতার মূল পৌঁছে দেয়
ফিনিশিং কোষে,
নর্দমার সুড়কির রাস্তার চটি জুতোর
বাড়ি খেতে খেতে শুতে যায় মাটির
চাটাইয়ে আর স্পন্দ দ্যাখেঃ
সাধের কষ্টের গালিচায় শুয়ে আছে
বিংশ শতাব্দির নামী দামী
বানর,

লাকড়ি কামলার সাংসারিক দুশ্চিন্তায়
পুড়ে ইট খোলায় বিলাসের চিহ্ন ইট-
হতাশার ধূম ধূমায়িত হয়ে বেরিয়ে যায়,
ঝাংধরা লৌহ-পাইপ ক্যান্সারের কণ্ঠ
নালি দিয়ে আত্ননাদ করে ওঠে,
ভগবানের অভিশাপে আগুনের আঁচে
ঝলসে যায় ধরিত্রী মা মাটির চামড়া
কুলির-
শোভা পায় রঙধনুর রঙিন স্বপ্নের
ইমারতে ইট
নানা স্টাইলের ক্লাস্তিকর কারুকাকার্যে
ছোটলোকের পৃথিবীর গগণচুম্বি ইমারত
স্বর্গের পাহাড়-
মানবতার উষ্ণতায় মগ্ন কপোত কপোতীর
ভালবাসায়,
শের আলীর হাতের চাঁদ করতলে দাও,
একটি মহান তাপস রক্তাক্ত কলম
কলিযুগে,
মানুষ কলমের ক্ষুধার্ত লকলকে জিহবার
নিপ সূচাখে হৃদয়ের রক্তকালি দিয়ে
মহাবিশ্বের ধ্রুব খাতার পাতায় লিখব
একটি কথাই, “ক্ষুধা”।

১৪/১২/৮৭, নবাবগঞ্জ

হৃদয়ের আসামী

সোনালী ধানের ক্ষেত আমার কালকলিজার
টুকরো হাসছে ধানের হলদে দাঁত বের করে
যেন আমাকেই ডাকছে আহলাদে সহবাসকরি ।
আমিও শুয়ে পড়ি বিছানো ধানের আঁটিতে
যেন রাজকীয় সুখের গালিচা-
সবুজ সবুজ আর সবুজের ভেতরে আমি
ডুবে গ্যাছি কড়ই, নেবু লাউ বাঁশ
ঝাড়ের একান্ত আত্মীয়
আমাকে আজ খাইয়েছে নিজ গ্রাম
মোরগ মোরগীর কল্লিত রান নিমতলে
সজনে শাখার চড়ই বাতি ।
শাদা মেঘের আকাশে চড়ে আমার চেতনা
শুনে চিলের দুঃখ আবেগ নাকি সুখের
মিহিসুর কখনও
ধানের নরোম তণুর ফাঁকে ফাঁকে ঘেষাঘেষি
করে ঘাস ফড়িং আত্মভোলা আত্ম গোপন করি
কৃষাণের কাচির সুখের ধান কাটার
ক্যাচক্যাচ শব্দে ।
আ'লের সতেজ দুর্বলতার মোলায়েম
চিকন পাতা চিবাই হলুদ রোদ্দুর
গায়ে মাখি দ্বিপ্রহরে
হাঁপাতে হাঁপাতে নাসিকাগ্রে ঘৃণার
শ্লেষ্মা বের করি জটিল যুগের
রশি দিয়ে বাঁধা জোতদারের বাধ্যগত
ভূমিদাস পাঁটী ।
আলু লতারাও দুলিয়াপড়ি শুভ্র-
বাতাস নাগরের পৌরস্বদীপ্ত হাতের
ছোঁয়ায় কখনও মাটির ভেতর-
শীতলতায় আরামে ঘুমায় আমার
নয়নের মধ্যমণি আলুক্ষেত-
শীতের বধু ।

মুটে মজুরের নিষ্পাপ বাচ্চারা ইস্কু
রসের ভালবাসায় ছুটি উর্ধ্ব শ্বাসে
মরণের দূত ট্রাকটারের পিছনে
মনের পীচ রাস্তায় ।
রূপসি গাঁয়ের রূপ ভরা সর্বাঙ্গ
ডোবার ধার আরামের স্বর্গীয় মোহ
অশ্রুচ্ছায়া বৈঠক খানার মাটির চাটাই
পৌষের অপক্ক বড়ই আমার কল্পনার
রক্তরস চুষে খায় ।
তারপর ও তিলার্ধ জায়গা নেই
আমার ও নাম নাজানাচুম্বক যৌবনাপুত
দেহাবয়ব মেঠোপথ শ্রেয়সী
কানে কানে ডেকে নেয় পায়ের সোহাগে ।
কোথায় কোন জন মানবহীন শূন্যতায়
আমার আত্মার শিহরণ তোলে দোয়েল
কোয়েল লেদাপাখী মন ভুলানো অপ্সরীর
মধুর সুর মুর্ছনা আহ্ !
হারিয়েছি আমার সত্ত্বা গাঁ বধূয়ার রূপ
রস গন্ধে ।
পেলবিত শিম পাতা প্যাডে মনের
কথা লিখে পাঠাই পূর্ব্বিয়তমার কাছে পায়রার
চঞ্চু ডাকহরকরা মারফৎ-
হঠাৎ সম্মিৎ ফিরে পাই
ভিখিরির শোকগাঁথা আহত টেকির কোঁ কোঁ
ক্রন্দনে
কুলীন স্ত্রীরা লাথিমাঝে ধান ভানার ছুঁতায়
ভিখিরীণি টেকির পাছায়
সুখের লৌহ বেড়ী মুখোশ কুড়ে খায়
ছপ্ছপ্ তুষ ছাড়ানো এক মুঠো
ললাটের চাল ।
তারপর আমার সত্ত্বা বেড়ালের চোখে
দ্যাখেঃ অরচনের উষঃ আঁচে গোটা
গাঁ খানি পুড়ে ছারখর পাকসেনার

গোলাবর্ষনে হিংসা দেষ ক্ষোভের
সাপে নেউলে জীবন পণ বাগড়ায় ।
পৌষে কুয়াশাচ্ছন্ন বিজন সকালে
চৈত্রের দেহের খরতাপ জ্বরের অদৃশ্য
আগুনে দাউ দাউ জ্বলছে সবুজ ঘাস ।
আমার সতেজ মন পুড়ে অঙ্গার
শরীর হয়েছে শীর্ণ তামাটে শুকনো খড় ।
কখনও কেটে খাওয়াই আমাকে কাচি
দিয়ে মিছরির ছুরি টাউটকে,
ধূর্ত চালবাজরা মগজের গম ক্ষেত চষে
ফসল তুলে কু-সংস্কারের জঙ্গল ঘেরা
সরল মন ঘরের আগিনায় ।
এক রাশ জ্বালা আর আক্রোশের গমচারা
আমি অশান্ত ভাল লোক পঞ্চায়েতের
মনুয়া কাঁটা, ভয়ে নিঃশব্দে পদচারণা করি
সমাজ কাঁঠাল গাছের নিচে ভূতুরে প্রচ্ছায়ায়
চোর-
কখনও অপবাদের হোষ্টা খেতে খেতে
কাহিল হয়ে যাই ।
সমাজপতি কুকুর জিহ্বার বিষাক্ত লালা
ফেলে কামড়াতে আসে আমার সত্ত্বাকে
শুয়োরের চেতনায়, তোলপাড় করে তখন
আমার মানবিক সত্ত্বা, দুমড়ে মুষড়ে
আঘাত করি তখন শরীর ।
কচুক্ষেত উথাল পাথাল করি শুয়োরের পাল
ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে খেদাই
ডোম স্বেচ্ছাচারী চেয়ারম্যান ।

কৌশলের জালে হাত পা বাঁধাপড়ে যায়
কখনও আমাকে দাঁড়াতে হয়
হৃদয়ের আসামী সমাজ সংস্কারের
ফৌজদারী আদালতের কাঠগড়ায়
বিনিদ্র রক্ত চক্ষু নিয়েও শুতে হয়
আজীবন সামাজিক কাঁথায় নিচে ।
বাহরাম খান পাড়া
১৮.১২.৮৭

আগে যুদ্ধ তারপর

আমার অস্থি মজ্জায় শান্তিকপোত লেনিনের চেতনা
যুদ্ধেলিপ্ত গ্রহে শুনি উদাত্ত আহ্বান :
পুঁজিবাদ করোটির শানকীতে খাব বিষমাখা
ভাগ্যের ভাত ।
পঙ্গপালের মতন মরতে চাই আমি অমানুষ
মানবতার যুদ্ধে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে ।
আমার ধমনীর রক্তে আটলান্টিকের উষ্ম শ্রোত
সমাজতন্ত্রের,
আমার ক্ষুধার্ত পেটে সর্বান্তে তোলপাড় করে গর্জনশীল
চল্লিশার বিপ্লবী কণ্ঠ, অশ্বিনে ঝড় ।
শুনি,
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আমার হৃদয়, কাঁপছে
পৃথিবীর জ্বলন্ত বাতির আগুনে পুড়ছে
কামারের দা-ছুরির লৌহ, আমার হাড়িড
মেরুদণ্ড, কখনও
বিচারের মিয়াইয়ে রেখে পিটাচ্ছে
আমার সমস্ত সত্তা অচেতন আমি পঙ্গুজীব
হাতুড়ির হৃদয়াঘাতে ।
সভ্যতার হাড়াইয়ে গলাচিপে ধরে
ক্ষুধার আগুনে জ্বালিয়ে কখনও আমাকে

বানিয়েছে দা-কুড়াল পিশাচের হাতিয়ার ।

আজ তাই আমি বৈষম্যের কচু ক্ষেত
কেটে কেটে পৃথিবীর লোকালয় করব
বিরান...

নামবে কিয়ামতের রাত

আমার জিহ্বা কুড়ালের কুপে কাটবো

আমি বিলাসী ধনিকের সখের লিংগ ।

মারণাস্ত্র কৌশল আমার ব্যথার্থ

ভূবন চষে ধ্বংসের লিঙ্গা চিরতরে

মিটিয়ে দেব ।

খঞ্জ নপংগকের অপবিত্র দানবদেহ

নিষ্ক্ষেপ করব আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত

আগ্নেয়গিরিতে ।

আমার সত্তা বিজ্ঞান ও ক্ষুধার কোটি কোটি

ডলার খেয়ে নভোযান রকেট ড্রাগন

উড়ছে মঙ্গল গ্রহে আমার শরীরে

আরও সুখের ইলেকট্রন কণা আছে কিনা

জানা ও চুষে নেয়ার নেশায় ।

আমার ইকারুশের সাধের আকাশে

এখন আর আনন্দের বলাকারা উড়েনা ,

ডাকে না প্রেমের পাপীয়া মধুর আওয়াজে

আমার মনের ডালিম শাখে বসে

ভাতের টানা পোড়নে দুশ্চিন্তার কম্বল

গায়ে জড়িয়ে বিধবা খায় ঈশ্বরের

কৃপা শীতের সকালে হলুদ রোদ্দুর

হতাশার মাকড় ঘুরে ফিরে দৈন্য ঝগড়ার

জাল বুনে স্বামী স্ত্রীর বিশ্বাস

ভিতের আঙ্গিনায় ।

ধিকার দিয়ে ব্যঙ্গ স্বরে চোঁচিয়ে ওঠে

সমাজের হতুম পঁচার

যখন

বিজ্ঞলোকের টর্চের আলো গায়ে

স্পর্শ করে আর ভাবে

বিজ্ঞানের চোখ আর মিউ মিউ
চুরির স্বভাব
এর চেয়ে বরং ভাল ।
লেপের নিচে যখন নখরের
আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত করে
স্ত্রীর যোনীদ্বার
তখন হুঁশ আসে বেয়াড়া জেনারেল
জামাইয়ের,
তখন উদ্দেশ্যবুঝে কুচক্রী বিড়াল
আরাম খুঁজে স্ত্রীর সতীত্বে
সময়ের কুয়াশারা উবে গ্যাছে অদৃশ্যে
দ্বিপ্রহরের তপ্ত শাদা অরুণের আঁচখেয়ে
শরীর হয়েছে বলীয়ান ।
নাড়ির টিউবে রক্ত টগবগ করে
ক্ষোভ- রোষের তরঙ্গ বইছে দেহ সমুদ্রে ।
ছিঁরে খাব পাষাণ রাঘব বোয়ালের মাথা
বায়ুর ভীম প্রবল দাপোটে ভেঙ্গে উপড়ে
চুরমার করব আমি
উড্ডীয়মান ড্রাগনের লেলিহান
শাপের জিহ্বা-
চুমু খাব আমি অজগরের
বিষ দাঁতের আঁচড় সম্বলিত
ক্ষতস্থান-
তারপর শান্ত হবে আমার অশান্ত
আত্মা সরল সরস পৃথিবীর স্বর্গীয়
উদ্যানে চলবে প্রেমের খেলা
ফুল ভ্রমর নরনারীর শান্তির জীবন ।

বাহরাম খান পাড়া
২১.১২.৮৭

ভালবাসা

ভালবাসার পদ্মের আশায় তপস্যাপ্রিয়

রূপালি ইলিশ সাঁতরাই অথৈজলের

গাঁ ঘেষে ।

আমার ডান ও বাম পাশে বনটুই শিস দিয়ে

বয়সের তমাল গুচ্ছের কানে শুনায়---

সামাজিক বিড়ালের উর্বর বিষ্ঠায় জন্মেছে

বিয়ের ফুল-রূপরস গন্ধহীন খুকীর খেলনা

সংসার অরণ্যানী হতে বেরিয়ে আসা জোনাকী

আমি মিট মিট জ্বলি নিজ সত্তার বিশ্বাস ও

পৌরুষের পাহাড় ভেঙ্গে, কুয়াশার চাদরের

বুক চিরে, আলোক মেখে ।

কখনও নামগন্ধহীন দূর বহু দূরের নক্ষত্র

প্রেয়সীর যে ভালবাসার অমল কোমল আলোক

রশ্মি পৌঁছায় নি আমার মনের পৃথিবীতে

তারই প্রতীক্ষাজ্বরের কাপড় পরে জ্বলব

অনন্তকাল-

আমার সত্তার নাগ আত্মহের ফণাতুলে ফুস ফুস

খাচ্ছে কখনও

বীর্যের বিষাক্ত ছোবলে কাটছে

অশান্তির গণ্ডারকে

সটান দেহ শুয়ে পাড়ি, আচমকা ব্যামোর

পায়েস খায় চৌকির নিচে মেঝের মাটি ।

কপালের শিরায় আস্তানা গেড়েছে বিষের কীট

চোখেরা লক্ষ্য করে ঘুণে কাটা সত্তার কষ্ট

পায়তারা ,

ঘরের কোণায় আবছা আঁধারে লুকায়

ভালবাসার নিঃসঙ্গের চামচিকা ।

তবুও

বন-জঙ্গল-সমতল-পাহাড়-মহাসাগরের

অসম্ভবতাকে চিন্তার আগুনের তেজে

পুড়ছি, আর সময়ের উষ্ণ নিঃশ্বাস

বের করছি।

মন চলে যায়-

ভালবাসার নাগিনী বন্ধি আছে

মনুষ্য সমাজের ভিলেজ পলিটিক্সের কারাগারে-

নাকি পাতাল পুড়ির পাষাণ নাগরাজ

সমাজপতির মস্তিষ্ক কোষের দূর্বোধ প্যাঁচে?

আমার স্পৃহার ঈগল ছুঁমারবেই

দুষ্ট ইঁদুরগর্তে-

ছিঁড়ে ফেঁড়ে দুঃশাসনের ইঁদুর গতর

আমার হাত পা মাখতে চাই লাল রক্তে।

তারপর তারপর

শ্রেয়সীর অধরোষ্ঠের সোহাগ চুম্বন খাবে

আমার শান্ত মানবনাগ ফণায়-

নৈঃশব্দের রাত্রির বুক চিরে

শুকনো পাতায় মচমচ করে পায়ে সোহাগ মেখে

যাব কদম্ব তলের অভিসারে-

হৃদয়ের শরীর ফটো হয়েছিল গালির-

কাঁটায়- আস্তার আগুন নিভে

গিয়েছিল ভ্রান্তিঝড়ের ক্ষণিক দাপোটে

কালের পথ পরিক্রমায়

দেখব ভালবাসার গোলাপ গন্ধে

স্পর্শে তরুণ তরুণী চাঁদে মেঘে

লাগবে শিহরণ, চলবে মধুর

লুকোচুরি খেলা।

টিকর পুর

১.১.৮৭

অন্ন-পাপ-মৃত্যু

আদম সন্তান ! কী লজ্জা ঘৃণা ভয়ে শিউরে
উঠে না বুক?
দেবীর মহাসিন্দুর অমৃত সুধাপান করে
বর্ণচোরা পামর !
উদ্‌গীরণ করে যন্ত্রণার গণোরিয়া কীট
নরোম অঙ্গে মাছি বোঁ বোঁ করে
উড়ে বসে কামড়ায় দেখ
গলিত উদোম-যোনীদ্বার ডাষ্টবিনের ধারে ।
আমার অপরাধী পাকস্থলীর জ্বালায়
ঘুরি রাস্তায় দ্বারে দ্বারে
এক মুঠো অন্নের প্রত্যাশায়-
উহ্ ভগবান বাঁচিতে ইচ্ছে করে না আর
পৃথিবীর নরকে ।
আমার প্রাণের আর্তনাদ শোন দেবতা ।
অভিশাপের অগ্নিবর্ষণ ঢালো ভোগমত্ত
বেদিলের গায়ে,
আটশাঁট পোষাকে আবৃত ধূর্ত চালবাজের গায়ে,
পাথর শীলে চুরমার কর পাষাণের অট্টালিকা সব
আমার যৌবন নদীর কল্ কল্ স্রোতধারা
শুকিয়ে গ্যাছে--
শুষ্ক তপ্তমরু সাহারার অযাচিত হীন আবদারে ।
রক্তমাংশ চর্বি খেয়েছে বেনামী অসংখ্য
নরাধমে,
দুর্গন্ধ বিষ বাষ্পে ভরা বাতাসে শ্বাস নিতে
ভীষণ কষ্ট হচ্ছে,
মুক্তি পিয়াসী আত্মা আমার দেবতা,

বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সর্বাঙ্গ
মুক্তিসেনার মতন ফাঁসির রিঙ গলায়
চেপে দেখি শীতল জমাট রক্ত !
দিগন্ত জোড়া ধোঁয়া তারপর-
অসীম অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার ।

ঢাকা-কোমরগঞ্জ, নদী পথে
১১.৭.৮৭

আমি সেই কবি

আমি কবি, না অকবি, না অতিকবি নিয়ে বাড়াবাড়ি
আরে বেটা চেয়ে দেখনা
কই কীরে মিছে?
পাগলা বেটার কাপড় নিয়ে করিস তোরা কাড়াকাড়ি
আরে দেখনা ছেলের প্যাকনা
দুষ্টু যত বিছে ।
ষাঁড়েরা করে গুতাগুতি গাইয়েরা চায় ফ্যালফ্যাল
কৃষাণ আসে লাঠি নিয়ে
দ্যাখে সে তামাশা
সাহেব হাতে কলম খোঁচায় পিয়ন করে ম্যালম্যা
ও চিনে পান্তাভাত আর বিয়ে,
বিড়ি ফুঁকে কাশা ।
চণ্ডিচরন, গণ্ডীচরন, কাশী আর বাচ্চুমাদবর মিলে
খসে দিলে সালুর গায়ে জুতো
মান গেল কিসে?
হাতে কত শক্তি কার, পরীক্ষা দিলে কেউ কিলে
নুজ বুড়ো মারলে ছুঁরে থুতু
পায়ে তারে পিষে ।
মারের চোটে মৃত্যু-পথিক কেঁদে কয় সালু দেশবাসী
তোমরা থাক্ চিরসুখে
গেনু চলে আমি,

আমার কথা স্মরণ করো সবার গলায় লাগবে ফাঁসী
বুকের মানিক রাখো বুকে
স্মরো দিবায়ামী ।
এখন রাঘব বোয়াল তাড়ায় যত ডানকিনা তিতপুঁটি
সামনে পেলে খুলে বিরাট হা
গিলে ফেলে আর কি !
জেলে সালু চলে গ্যাছে আসবে কবে মেলি চক্ষু ভ্রুকুটি
ধরবে জালে বড় দাদার গা ,
কও হলো কার কি !
ডাকছি আমি সালু সালু হলেম আমি কবি সেই কবি
আঁধার ঘরে জ্বালি আলো আর
সাজাই যুগ দর্পণ ,
ঘূর্ণিঝড়ের গরম হাওয়া লয়ে আসি , নিম্নচাপের ছবি
তুলে ধরি মনের কথা সবার
লিখি শত চরণ ।

টিকর পুর
৩১.১.৮৭

প্রত্যাশা

আমি যদি পড়ন্ত বিকেলের সোনালি
আভা হতাম?
আমি যদি সবুজ বনের চিকন পাতা
হতাম?
আমি যদি মৃদু সমীরণ হয়ে কম্পন
দিতাম?
আমি যদি শাদা মেঘের টুকরো হয়ে
বেড়াতাম আকাশে?
আমি যদি কোকিল কূজন হয়ে
সুধা ঢালতাম কানে ?

আমি যদি সোহাগিনীর সোহাগে
বাঁধা পড়তাম?
আমার সন্তা যদি হারিয়ে দিতাম
সর্বত্র এলোমেলো করে-
এক অনাবিল মনের সুখে কাটতো
জীবাত্মা আমার !
হায় আমি যে মানুষ আমি বাঁধা আছি
সংসার যন্ত্রণার রশিতে ।
বিষয় জলের গভীর খাদে নিপতিত
ব্যঙ্গাচি আমি..
নরকের হুইসেল শুনি সর্বক্ষণ
মানুষ গাড়ীর
আর বেহুঁশ চিত্তে দিন গুনি
চির শান্তির সাথে মিলনের প্রত্যাশায় ।

টিকরপুর
৪/৭/৮৭

সত্য সুন্দর কলম

বিস্তৃত সবুজ শ্যামলিমা আকাশের নিচে
সোনালি ধানের শিষ দুহিতা কুর্নিশে রতা মা-মাটিকে
কিচির মিচির করে দিব্যি আরামে উড়াল দেয়
পাপিয়া টিয়া চন্দনা শালিক ।
তবু মন ভরে না তো ! কী এক আবেশে
মন স্নেহকাতর কোলের শিশু
কেবলি আরাম খুঁজে আরাম বিরল
সংসার খাঁচায় খুঁজে সুখ স্বর্গের ঠিকানা ।
ক্ষেত্রের ঘোলাটে জলের গায়ে থুবড়ে
পড়ে মনের বেদনার হলদে-বরা পাতা,
ফিরে আসি বার বার নিরবে গাঁয়ের
স্তম্ভ জমাট নিরবতা বিকেলে,

ঐ গহন তমসাবৃত তমাল গুচ্ছে, অরণ্যে
ক্লান্তি, বৈষয়িক অর্থ ভাবনাগুলো
পলায়নপর সৈনিকের মতন
দ্রুত পালায় কোথায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ।
আর আমি মৌনা প্রকৃতির অনন্তরূপে
নিমগ্ন সন্ধানী মুখ গুঁজে আছি মহাসুখে
কে পায় আর আমায় খুঁজে?
দূর বহুদূরের
রহস্য নারীর সন্ধানে
তপস্বী আমি
অতীতের
বর্তমানের
ভবিষ্যতের
আত্মার সাথে মোলাকাত করে আত্মা আমার ।
অদৃশ্য সর্বকালের আমি
মায়াবী সন্ধ্যায়
নির্জন দুপুরে
চাঁদনি রাতে,
কবি-মহাকবি যুগ মহাযুগের সরব ভীল রমনী ।
কর্মরত চাষা
ভূতুরে কৃষক পক্ষরাতির
নিঃসঙ্গ চোর
তাল তমালের অশরীরি ছায়া ভয় যোগায় মনে
পানির ভেতরে হলদে-রূপালি অপরাহ্নের
অতৃপ্ত অরুণ ডুব দেয়,
যেন ভিক্ষকের কাংখিত অব্যক্ত লোভের
আধূলি হারিয়ে গ্যাছে
সংসারজলের পেটে ।
নিকষকালো অন্ধকারে একটু পরেই পৃথিবী
যাবে ঘুমুতে,
বিবেকের ফেরারী আসামী আশ্রয় খুঁজি
জীর্ণ কুটির ক্রোড়ে ।
কার তালাসে ভবঘুরে আমি জানি না

শ্রোতের টানে ভেসে বেড়াই মুখ জঞ্জাল
শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে,
সাগর হতে সাগরে -
রাজনীতি চিড়িয়াখানার কাঁটাতারে আটকা পড়া
সিংহশাবক বিপ্লবী কবি।
সেখানেই
আগ্নেয়গিরি চোখে দ্যাখে
অগ্নুৎপাতে, লাভায় লেখে
নামাজে
সন্ধ্যায়-
পূজায়
প্রার্থনায়
একই সূর চিরন্তন কালের পাতায় পাতায়
এ বেলায় সন্ধ্যার ভ্রমণেরত
কোন চামচিকা-বিড়াল
শেয়াল মেথরের কথাটিও,
কালান্তরে সজীব হয়ে ওঠে, বজ্রকণ্ঠে
কথা কয় সত্য সুন্দর কলমের খোঁচায়।

ভিটেবাড়ী, বাহরাম খান পাড়া, ৪.৮.৮৭

বন্যার আত্মীয়

ঘরে পানি, উঠোনে পানি, চারিদিকে
পানি আর পানি থৈ থৈ করে,
হাঁস মুরগী গরু ছাগল আর মানুষে
কষ্টের বাসিন্দারা ওই চিবির পরে।
শিশু কিশোর যুবা ভেলা করে যায়
বেড়ায় জড়া জড়ি করে এদিক ওদিক,
আশা, উনুন ধরিয়েছে বিরক্তি ভরে মা
মাচায় লাউয়ের খিচুরি পাকিয়ে নিক।
বাটিতে নাহি বসিবার স্থান নাহিহাটি বার

তাই সকলে পাকা রাস্তার ধারে ।
বসি, গল্পে মাতে বিষন্নবদন কেহ
মৌন, কেহ ব্যস্ত কাজে একেবারে ।
দুপুরে শিশুরা জলক্রীড়া করে দেয়
সজোরে লাফ, উঠোনের নিমগাছ হতে,
শ্রাবণের বারিধারা মাখি গায়ে
মহাখুসি খিল্ খিল্ হাসে মতে মতে ।
ভাবের ভীড়ে কবিতা মোর হ-য-ব-র-ল
কী লিখিতে বসে কী লিখে ফেলি,
পানির তোড়ে ভেসে আসে জঞ্জাল
কল্পনার ভূমি আমি ধরি শুধু মেলি ।
আমার উদ্বাস্তু দুঃখ সংকট সমস্যারা
পাহাড় হতে নামা পানি ঢল বুঝি তাই,
প্রসারি জিহ্বার স্রোত খাই আমি
বাড়িঘর ফসল মাঠ মানুষ ছাই সর্বদাই ।
মানুষ রূপে এসে দৈত্য পিটিয়ে যায় অন্তর
কারো ক্ষুধার অন্ন নিয়েছে সব বন্যায়,
সকালে ছিল চাল রাতে কি হবে ভাবে বসে
ছিন্নবসন শঙ্কমুখী নিঃশক্তি মা-আর কন্যায় ।
উৎকণ্ঠায় হতাশায় কাটে না সময়
মনে নিসর্গে ভারী মিল দেখি এখন আছে,
গাঁও নয় সারাদেশখানি জলে সয়লাব
উরি-অসহায় মানুষেররা কত ভোগে,
এবেলায় ঠিক ধনীর যায় নৌ বিহারে
নিঃশ্বরা শুয়ে থাকে আক্রান্ত আমাশায় রোগে ।
হু হু করে বেড়ে ওঠে দর তরকারী চালের
কিনিবে কে কার এত টাকা কড়ি কই,
বন্যার জল আসে ভাসায়ে সব, যেতে
যেতে বলে, “গরীবের আমি আত্মীয় হই” ।

টিকরপুর ২০.৮.৮৭

এক বিন্দু প্রেম

বলো এ স্বর্ণ হার নহে

এ প্রেমের মালা তোমারি,
পরেছি হায় আমি সুন্দরী
হৃদয়ে পুষেছি এক কুমারী ।

ভুলিয়াছি আমায় তাই
প্রেমিকা আমি সাজি,
মলয়ে পূজা দিয়ে যাই
যতনে কুড়াই পুষ্পরাজি ।

হাতছানি দিয়ে ডাকি শশী,
এসো মোর মুখের'পরে,
দিব স্নিগ্ধ কর ধরায়

হে নারী ভালবাসি তব
দূর করি আঁধার তব তরে ।
কুহেলিকা ছলনাতো নয়,
যৌবনে হৃদয়ে প্রেম থাকে
জানি না বৃদ্ধ কালে কি হয় ।

হেরিও মৃত্যুপরে আর
কাঁদিও অনেক করিম্ন জয়,
প্রেম ছাড়া ফুলআর ভ্রমর
বাঁচে কত কাঁটার আঘাত সয় ।

প্রেম সে স্বর্ণ দিয়ে কে কবে
কিনেছে মোরে বল, বল, বল,
শ্রোতস্বতীর মতই সে যে
সফেন উর্মি চলে কল্ কল্ কল্ ।

তুমি কি আমাকে বুঝেছ ?
বারেক সুধাই আমি মনে মনে,
সখি গণে তুমি বলো 'না'
মর্মে বলো নারী ক্ষণে ক্ষণে ।

তোমার অদৃশ্য মধুর হাতে
দিও মোরে প্রেম কণ্ঠহার,
শরমে থাকিও দূরে আর-
শ্যাম আমি হেরিব রূপ তারকার ।

আঘাত দিলে তুমি সেও
সুখ লাগে মরমে বড় ভালো,

তোমাকে হেরি প্রিয়া চান্দমুখ
হলে যদিও কৃষ্ণকালো ।
ক্ষতি কি একবার শুধু প্রিয়া
ফুলের মালাখানি নিয়া
আসিও প্রিয়া কাছে আর
কাঁপিয়ে দিও মম মগ্ন হিয়া ।
এক বিন্দু তব দেয়া প্রেম
অজস্র বিন্দু করি আমি ধরায়,
সৃষ্টি তরে বিলাইব আর
আমি ভালবাসিব মানবাত্মায় ।

টিকুর পুর, আগলা
ঢাকা
১১.২.৮৭

নিদাঘের ঋষি

বড় কঠিন সময়
এখন আমার ঘরে,
রোগের বাতাস বয়
কাঁপছি অভাব জ্বরে ।
ইমারত কি ডেরায়
বিবেক ছাড়াই বাঁচে,
মানুষ মুখ ফেরায়
দুঃখ কই কি পাছে?
এই সময়ে বিশাল
মাপের মানুষ কে যে,
আমাকে দিওনা না গাল,
গরীবের তেজ লেজে ।
মুখে সত্য করে বমি,
আর চষে হৃদ-জমি ।

করমুলী, কিশোরগঞ্জ
৪/৪/২০০৪

যাপিত জীবন

এখন আমার কষ্টরা ঘুড়ি উড়ায়,
এখন যক্ষ্মারোগ তীক্ষ্ণ নজরে চায়,
এখন আমার নিঃশ্বাসে বিষ ছড়ায়,
জ্বলছে বুকের খাঁচায় অগ্নিদহন।
নিঃসঙ্গ রাতের পেঁচা আমাকে ডাকে,
জীবন শিল্পী! নদী শিকস্ত্রির বাঁকে-
তোমার পঁচা লাশ খাবে শকুনে কাকে,
এই কলি যুগের চিহ্ন করে বহন।
পাপে আগুনে পুড়ে যাওয়া ধ্যান-বন,
না খাওয়া, বলসে যাওয়া পেট মন,
হারানো জীবন ঘনিষ্ঠ বিধ্বস্ত পণ,
চলে না ভাই মনতরী-সাতকাহন।
তারপরও বেঁচে আছি আশ্চর্য হয়ে,
মানসিক কংকাল স্বকীয়তাটা লয়ে,
দুঃসহ অতীত যাতনা বাডা বয়ে,
দক্ষ আমি হাঁটছি ভবিষ্যতে এখন।

করমুলী, কিশোরগঞ্জ

৪/৫/২০০৫

দাফন

ফিনকি দিয়ে রকত
ঝরছে ঝরছে,
কেউ কেউ হালুতাশ
করছে করছে,
নিংড়ানো হাহাকার
শুনিয়েই চুপ,
আগোচরে সমাজের
দিয়ে যায় ধূপ ।
বিচারের ডর নাই
সবাই কংস,
কর্ণধার কলা গাছ
দেখছে ধবংস ।
এ কেমন দেশ টায়
করছিবে বাস,
খুব করেই খুনের
হচ্ছে যে চাষ ।
বিবেকের মরা লাশ
দাফন করিয়া,
ফিরে যাই সভ্যতায়
ফ্যাশন ধরিয়া ।
তারপরে বলব কি
ধিক্ তোরে ধিক্,
রক্তের হোলি খেলা
তোরে কেড়ে নিক ।

করমুলী, কিশোরগঞ্জ
১/২/২০০৬

ক্ষুধার মিছিল

রোগ আমার ঘরে দৌড়াদৌড়ি করে, কখনও
অট্টহাসি দিয়ে ফেটে পড়ে, কখনও কান্নায় ভেঙে
পড়ে, জানালায় দাঁড়িয়ে শিস দেয়, যেন সে জটা
মাথার অদ্ভুত পাগল-

ভয়ে স্বপ্নে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি, জড়িয়ে
ধরে, ৯ মাসের বাচ্চা,

অশ্রুর ফোঁটা ঝরে উনুনে চড়া হাড়িতে ।

ক্ষুধা তপ্ত জ্বরের আগুনে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, আমি
আবার কান্নার শরীর জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে যাই,
পাঁজরগুলো, দেয়ালে আটানো, ফটোগ্রাফ
একটি একটি করে গুনে, জমা দিই, কাত করি
ছেঁড়া কাঁথায় ।

ভাতগুলো গ্যাসট্রিক সাপের বিষ যেন, ওরা
বসবাস করে কোটরে উদ্‌গত শুষ্ক চোখে,
ও কিসের মিছিল, বাঁশঝাড়, ঝাউঘাস আর
দেবদারুর শরীরে, লেপ্টে আছে, চিৎকার দিচ্ছে
রৌদ্রে, কুয়াশায়, মরা বাকলের মত, ও কিসের
মিছিল, বলতে পারো বউ ও কিসের মিছিল?

তোমাকে যখন পালকীতে করে বাবাপড়শী,
মলাই চাচাকে নিয়ে ঘরে আনে, তখন

তোমার পরনে ছিল, লাল কাপড়, পাড় ছিল
জরীর । আমি নূতন তহবন্দ আর সূতী পাঞ্জাবী

পরেছিলাম, বড্ড সুন্দর সেদিন দেখাছিল তোমায় ।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল, পাকা ডালিম, রসে ভরপুর,
বউ, তুমি বলতে পারো, ও কিসের মিছিল, ওরা
ডোবা-নালায়, আমার নিকোনো উঠোনে, গাভীর
শীর্ণ শরীরে মিশে যাচ্ছে মশাল হাতে, বিক্ষোভ
করছে পুরনো দিনের হাজিরা পেতে ।

আমার হাসি পাচ্ছে ওরা কি পাগল হলো,
শেষ মেশ, কে দেবে শুটকী মাছ, কাঁচা মরিচ-
পিষে খাওয়ার খোঁজ?

কবে খাল বিল শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে,
মাছেরা উড়ে গেছে ভগবানের ধনাঢ্য পুকুরে-
আহা, বউ ওরা দেখো আসছে মিছিল করে
খোকার পেটে, খোকা কাঁদছে, কাঁদছে, কাঁদছে -
খোকার কান্নার শব্দে ওরা ঘরের বেড়া-
ভেলকী দিয়ে চলে যাচ্ছে, ভাংচুর করছে দেউরী,
তোমার জল সিক্ত চোখ দু'টো খোকার গায়ে
সুখে আছড়ে পড়ে, নিউটনের মত ঠিকই
আবিষ্কার করছে, ও কিসের মিছিল।
তুমি তো আর কিছু চাওনি, চাওনি তো লাল
ফিতে, হাল্কা খয়েরী কাঁচের চুড়ি, ঠোঁট
পালিশ, স্নো পাউডার আলতা, কোনদিন
বলনিতো বিয়ের দু'মাস পর হতেই, বুঝে নিয়েছ
তোমার আকাশ সীমাবদ্ধ, তোমার চুল মেঘ নয়,
ও কচুরীপানার শিকড়; তুমি বুঝে নিয়েছ তোমার
ভাষা, ও শুধু বৃষ্টির দিনে বকরীর বিপদ-
কোথাও পাওয়া যায় না ঘাস-মাঠ বেজায় ভিজে।
তুমি ছলিমদ্দির বউ- পতিপ্রাণা, তাই তার
অস্তিত্বে মুখ রেখে, বরছে তোমার অশ্রু
সদ্য লেপে মুছে দেয়া মাটির বিছানায়, শিশি,
পিতলের বদনা, ও সবে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন
যে আগুনে পুড়ে পুড়ে, তোমার রাগ আমার
দিকে চিন্তিত মুখে তাকায় ইশারায়, বুঝিয়ে দেয়,
-ও ক্ষুধার মিছিল, আমি দেখি শুকনো
সজেনার ডালে, চন্দনার গায়ে, বেড়াল আর
বাছুরের গায়ে, ক্ষুধার মিছিল- লালগামছা
কোমরে বেঁধে, লাঠি উঁচিয়ে আমি ধীরে ধীরে
ধীরে, হারিয়ে যাই ক্ষুধার মিছিলে।

বালুরচর, নবাবগঞ্জ

২৪.১২.৯২

কাব্যগ্রন্থ- দিব্যদৃষ্টির খোরাকি
(লিরিক সিরিজ-১) (১৯৯৯-২০০৯)

রুহের আত্ননাদ

জীবন্ত স্বরূপের মাঝে অরূপ এই আমি-
এই রুহ কে, কি পরিচয় জানে অর্ন্তযামী
তাবৎ সৃষ্টি জানে না আপনার কথা কেউ,
সৃষ্টিতে ঢলে পড়ে অন্য সৃষ্টি রূপের ঢেউ।
মহাপ্রস্টার দয়ায় আমি বুঝিলাম সব,
আমার রুহে শুনি মহা প্রস্টার কলরব।
আমি বৃত্ত রূপ যেখানে শুরু সেখানে শেষ,
জন্ম পূর্ব-ইহ-পরকাল বিচিত্র পরিবেশ।
যত মঞ্জিল আসে ততরূপে থাকি কি করে বুঝি,
হারিয়ে আপনায় ফিরে ফিরে আপনাকেই খুঁজি।
পাপ পুণ্যের গাড়ী চড়ে মালিকের দুয়ারে যাই,
জানিনা কিছু জানি না শুধু তাঁর দয়া ভিক্ষে চাই।
প্রভু কি আছে আমার! পথ ভুলে পাপী নারী-নর,
আমাকে ঘিরে আছে নফস শয়তান মনোহর।
রুহানী কান বধির, চোখ অন্ধ হাত পা অবশ,
এ বুকে পাপের আবরণ, পুণ্যের এসেছে ধ্বস।
রুহানী আত্ননাদ শুনো প্রভু পাক জাত,
খাওয়ালে খাব নূর! চাই নূর দৃষ্টিপাত।
বাতেনী জ্ঞান ছাড়া লিখে বলার শক্তি কই,
পথহারা শিশু, আমি আর আজ আমি নই।
অরূপ দর্শন তরে কাঁদছি বিরলে একা,
প্রভু শক্তি দাও, দয়া করে দাও রুহে দেখা। .

০৭-১২-২০০৮

কিশোরগঞ্জ।

আমি ডুবে আছি

কাদা মাটির গন্ধ লাঙ্গলের ফলা, চাষী,
ধূলি উড়িয়ে চলা মই, কিশোরের হাসি,
আঁল নিয়ে ঝগড়া ঝাটি খাদ সেচা-খাল,
মজুরের ধান কাটা, জাল ঘেরা খাল,
এখনও দেখিনি, গাভীর ঘাস খাওয়া,
ঐ সুস্বাদু ঝোলে নিরন্ন নিঃশ্বের চাওয়া ।
ফাগুনে ঝাঁ ঝাঁ ডাক প্রত্যাশে মোরগ স্বর,
গভীর রাতে চোর ধরা স্বর ধর ধর ।
বিধবা নারীর ঘোমটা মুখে নিচু গলা
বাউল গান, বাউলের ভঙ্গি ধরে বলা ।
এখনও শুনিনি, মজুবে কোরআন পড়া,
মাঠে ময়দানে আলেমের ওয়াজ করা ।
জমা বাজারে চায়ের দোকানে চা খাওয়া,
বিষয়ী রূপে গড়ে ওঠা বাহবা পাওয়া ।
হয়নি এখনও, সর্বদা সংসার কাজে থাকা,
স্বস্বার্থ উদ্ধারে হইনি এখনও পাকা ।
শানকি ভরা মোটাভাত আলু ভর্তা মেখে,
খেতে গিয়ে পানি চাই, গলায় যায় নি টেকে ।
পৌষের সকালে রোদ পোহানো চোখ বুজে,
হাঁটা হয় নি মেঠোপথে গরু খোঁজাখুঁজে ।
নানা মতের হাওয়া লাগেনি গায়ে ধ্যানে,
মাথা কুটে দাঁড়ি করিনি পাকা মিথ্যে জ্ঞানে ।
ঘরে বাঁশের মাচায় খুন বিছানা পেতে,
আসিনি তো এখনও মায়ের দুধ খেতে ।
মহাপ্রস্টার মহালোকে নিরেট সত্য রুহ
ডুবে আছি সাধ্য নেই ভাঙ্গিয়া ফেলি ব্যুহ ।

২৫-০৪-২০০৪ কিশোরগঞ্জ ।

মায়ের স্বর্গীয় বাহনে যাত্রা

ক' মাস হলো আমি রক্ত খেতে শুরু করেছি,
আঁধার জড়ায়ু বিছানায় বসত গড়েছি ।
চোখ কান মাথা হাত পা আমার হলো সব,
নিঃশব্দে কান পেতে শুনি মানুষের কলরব ।
আমার শিরায় শিরায় বহে সদা পশুত্ব,
হারালাম আলোক, হারালাম সঞ্জীবনীত্ব ।
আমি মূর্তিমান মাটি পানি তাপ দিয়ে গড়া,
আসছি তবে ডাকছে অবিরাম বসুন্ধরা ।
ঠাঁই নাই আমার, ঠাঁই নাই কোথায় যাব,
সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি, জানিনে স্রষ্টা ফিরে কি পাব ?
বিরহে কাঁদিল আলোর জগৎ আমি নাই,
দেহ ছেড়ে যেন ফের ভাল ভাবে ফিরে যাই ।
গুরু দায়, দেহ বানাতে হবে আমার করে
না হলে যে নির্ঘাত আলো হারাবো চিরতরে ।
আজ আমি টিকে আছি শ্বাসে, নিরুপায় একা,
সহজে হারালে তাই, আলোর কি পাব দেখা ?
আঁধারের দেয়াল তুলে, কাছে টানার খেলা,
হে মহালোক, যাচি, আমার একফোঁটা ভেলা,
যেন না হারায় আঁধারে, দয়া করো দয়া করো,
মহাদয়ালু নিজে আমার দেহ খানি গড়ে ।

২৫-০৮-২০০৪ কিশোরগঞ্জ ।

মায়ের স্বর্গীয় বাহন হতে অবতরণ এবং তারপর ...

মায়ের অপত্য স্নেহ রক্ত জ্বাল করা দুধ,
আঁধারে আলোক বলক, নব জাত্রত বোধ,
এনে দিল, এনে দিল স্নেহ মুঠি মুঠি আনি,
পিতা-ফুপু-খালা-চাচা, মামা-নানী, চাকরাণী,
যখন যা চাই চিৎকার দিলে ছুটে আসে,
আমার এ রূপ দেখে দূরে মহা স্রষ্টা হাসে ।
যত বাড়ছে এ দেহ আমি তত ছোট হই,
ফুটে কথা চেয়ে দেখি আমি আর ছোট নই ।
দুনিয়াবী জ্ঞান আমাকে হাতুড়ী দিয়ে মারে,
জগৎ যত দেখি তত রুহের শত্রু বাড়ে ।
মার খেতে খেতে হয়ে উঠি আমি মারমুখী,
দ্রোহ করে রুহ, শয়তান মেরে মহাসুখি ।
এ জগতে দেহ-মন-রচহে মহাযুদ্ধ হবে,
হে সৃষ্টিকর্তা, যাচি বিনয়ে, তুমি পাশে রবে ।

২৫-০৯-২০০৪

কিশোরগঞ্জ ।

গর্ব

গর্ব যেন আকাশ ছুঁয়েছে অটালিকা হয়ে,
ইচ্ছে স্বাধীন চলেছি আমি নদী রূপে বয়ে ।
আমার দু'চোখে আগুন, দেখে পুড়ে করি ছাই,
অস্থির কাঁপে সামাজিক মন তাপে জ্বলে তাই ।
জিহ্বা রক্ত পিপাসু রক্ত চায় সন্ত্রাস করে,
যুদ্ধ করে প্রলাপ বকে, বস্তুরাদ ঝাড়া ধরে ।
আমার গর্ব জাতআধিপত্য তুমুল নাচে,
ঝরাই গুলি বৃষ্টি জনারণ্যে অস্ত্র রাখি কাছে ।
হরিণ-ধরা বাঘ, দাঁতে চিবানো আমার কাজ,
গর্বসূত্রে, মানুষ কোপাই আমি পশুরাজ ।
আমি ইচ্ছে করে দেহ টাকে নাচাই হেলে দোলে,
শ্বাসের প্রাণী ভুলেই গেছি মন দিয়েছি শূলে ।
আমিত্ব মুছে যাক্ স্রষ্টা প্রেম উঠুক গেজে,
গর্ব স্রষ্টার, বুঝে তাই দাসত্বে যাই লেগে ।

৪-০৩-২০০৫ কিশোরগঞ্জ ।

রাগ

প্রচন্ড কাল শ্রোত রাগের যম পানে বহে,
ডুবিয়ে মারে লালসায়, বিষয় সুখে দহে ।
অটালিকা গিলেখেয়ে নাচে তা ধিন্ ধিন্,
হা হা হাসে শক্তিমান পিষেমারে শক্তিহীন ।
রাগের বশে তালাক দিয়ে পথে নামে প্রেম,
শূন্য ঘরে ঘুঘু চড়ে হয় কোথা গেলো শ্যাম ।
রাগের বসে দেখাই আমি অঙগুলি তা বুঝে,
দেশে দেশে যুদ্ধ লাগে সন্ত্রাসীদের খুঁজে ।
অটহাসি উড়ে গিয়ে সৃষ্টি করে ঘৃণীঝড়,
স্নেহ শিকড় উপড়ে ফেলে ভাঙ্গে মন-ঘর ।
মারামারি কাড়াকাড়ি চলে যেন অহরহ
বন্য আমি কামড়ে খাই যা পাই গয়রহ ।
মাটি চৌচির রাগে, চৈত্রেয় দাবদাহে দেশে,
আসে পাষণ যাদুকর অগ্নিমূর্তির বেশে ।
ব্যোম এসে বসো সর্বংসহায় যাও রাগ,
তারপর শুয়ে পড় ঘুচাও মনের দাগ ।
ওগো পবিত্র প্রভু, ভয়ে হাত মুখ পা ধুয়ে,
একাত্তিভে কাঁদছে, আমার দিগন্ত নূয়ে ।
প্রত্যাবর্তন করিব আমি, বুঝে কাঁপে দেহ
আনন্দে ঝিলিক দিয়ে ওঠে রুহ, দেখে না কেহ ।

১-১-২০০৫ কিশোরগঞ্জ ।

কামের কান্না

উলঙ্গ নৃত্য ইশারায় ডাকে দেহ রমনে,
উত্তেজিত মন কাতরায় যৌনতা বমনে ।
প্রমোদ বালার ছড়াছড়ি নেশা ডেকে আনে,
যাকে খুশি চায় টাকাপায় অবিরাম দানে ।
রঙ্গিন রজনী নেশা আর রমনী কি সুখ !
গোপনে গোপনে যাই আমি নামিদামী লোক ।
বড় ছোট নেই কাম আসে চুপে চুপে ঘরে,
কই বাধা আজ পরবধু তবু টেনে ধরে ।
এমন হয়ে গেছে যে, জেনা আর কিছু নয়,
কোথা লজ্জা দেখে যাই বেহায়াপনার জয় ।
আমি কোণঠাসা রুহ, অন্তরালে বেঁচে আছি,
যৌবন আগুন জ্বলে, প্রভুর দয়া যাচি ।
মা চাহিনা সম্ভোগ চাহি যে এশকে এলাহী,
প্রভু, ভয়ে কাঁপি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ।
বিবেক তরী বেয়ে চলি ভরা যৌবন নদী,
কন্ কন্ কাঁদি, প্রভু, তুমি দেখা দিতে যদি !

৭-২-২০০৫ কিশোরগঞ্জ ।

গীবত ও কিনা

আজকাল আমি লাশের গোস্ত খাই বেশ,
ভোরে ওঠে সারাদিন খাই রাতে করি শেষ ।
এ কোন স্বভাব আমার ! নাকি শিখেছি দেখে
শিয়ালও ভাল, লাজে পালায় মানুষ থেকে ।
আমার লাজ নেই বনে না থেকে গৃহে থাকি,
নিজ ঘাড় কেটে মিছে মাথা উঁচু করে রাখি ।
আমার জিহ্বা অসংখ্য মিথ্যে খেয়ে ফিরে ঘরে,
রটায় উঠানে বসে মিটি মিটি হাসে পরে ।
সুন্দর সবুজ ঘেরা গাঁও দূর হতে হাসে,
চৈত্র মাসে লুকায় কিনা বৈশাখে জাগে ঘাসে ।
বস্তু জ্ঞান ব্যঙ করে দিব্যজ্ঞানের চলাকে,
কৃষ্ণ রাত চেপে ধরে দিবালোকের গলাকে ।

৮-৮-২০০০

কিশোরগঞ্জ ।

জিহ্বার অতি কথন

মনের জমিনে আগাছায় গেছে ছেয়ে,
ফসল জবান মিথ্যে, সে মুখরা মেয়ে।
মিথ্যেবাদী আগাছা মুখে জন্মে চিটা,
রিক্ত ধান গাছ হারিয়েছে নিজ ভিটা।
রূপশ্রী বস্ত্রালয়ে কত রঙ্গের বস্ত্র,
কী দেখি কী কিনি প্যাঁচাল চলে অজস্র।
যত কথা তত মতের বাহারি মিথ্যে সঙ,
আড়ালে থাকে নীরবে শাদা সত্য রঙ।
আমার জিহ্বায় ভাসে টুকরো মেঘ,
মিথ্যে গর্জনে বারে অগ্নি বৃষ্টি আবেগ।
ইলিশ মুখে ধুম, কথা ডিম পাড়ে।
সবুজ শান্তি উধাও অস্থিরতা বাড়ে।
দিগন্ত জুড়ে অন্ধকারের বইপত্র,
শিয়াল বিড়াল পড়ে দেখে দেখে ছত্র।
এ কোন উৎকর্ষ হয়েনার মতন,
মুখে মনে করে বস্তু ভ্রমের যতন।
মন এক অঙ্কুর ইচ্ছে পূরণ করে,
ঢিল ছুঁড়ে মৌচাকে আর মধু কি বারে ?
মাছি হুল ফোটায় তার লেজ বাঁকায়,
গীবতের শূল মুখে দু' পাখা বাঁকায়।
মিথ্যে অনুমানে রাখে সাপের লেজে পা
তারপর কি হলো গো শিউরে উঠে গা !
জ্যোতিহীন বদনে কামড় ! ভাগ্যে কি লেখা,
সহসা চোগলখোর এসে করে দেখা।
খুঁজে খুঁজে কত কি ধরিত্রীর সব দিক,
এক কবি ভাবে অবিরাম জানি ঠিক-
নিন্দে আর মিথ্যে বলে হন রববাদ,
রসনা পূজার ফলে আসে ঘুম অবসাদ।
দরোজা চৌকাঠ খাট আসবাব বলে,
অতিকথন বিষ খেয়ে কবি পড়ে ঢলে।

ঘৃণাভরে পাখি উড়ে যায় বহু দূরে,
অহংকারী দেখে কেঁচো মাটি খুঁড়ে
নমিঃ গুণ, হে মানব দোষ রাখি পেটে,
পাবে ক্ষমার ঝরনা, গীবত গিরি কেটে।

৫-৬-২০০৫ কিশোরগঞ্জ ।

ঈর্ষা

আমি ঘূর্ণীঝড় চূর্ণি বজ্রাঘাত নাশি,
জীবগু অস্ত্রের স্বাদে উন্মাতাল হাসি ।
আগুন দ্বারা গোসল করি অবহেলে,
হিমলেপে শুয়ে থাকি জীর্ণ কুটি পেলে ।
শব্দাবলী গিলে ফেলি জিব কাটি ঠোঁটে,
ঘুমে, উদর ক্ষুধা কোথা গেলো ছোটে ।
জাত বংশ ঘুচে গেল ধ্বংস দর্প গান
বন্যা খরা তুচ্ছ করি আনি শস্যপ্রাণ ।
আধুনিক আবিষ্কার কিসে এত দাম,
দিব্যচোখে, আবিষ্কার ! আবর্জনা নাম ।
তুচ্ছ করি সৃষ্টিরাজি উঁচু করি শির,
শ্রষ্টা তরে নত হই গুণ করে ভীড় ।
সত্য সুন্দর মহালোক শ্রষ্টার ভয়ে,
রুহ উদগত স্মরে নত জানু হয়ে ।
হিংসা অবলোপে সোজা সত্য পথ ধরে,
হওয়া যায় অনেক বড় যুদ্ধে লড়ে ।
সে যুদ্ধ চাই হিংসা চাই নাকো আমি,
অন্য গুণে মুগ্ধ হব, ঈর্ষা যাবে নামি ।

৮-৭-২০০৫ কিশোরগঞ্জ ।

আসক্তি

আদিম আকর্ষণে ছুটি, সত্য লোকে আমি,
আমার যা কিছু ঘৃণা করি সংসারে নামি।
প্রচন্ড রাগেছিলাম করি তাবৎ বিদ্যমান,
সরল পথে সত্যব্রতী! চাই-ই দিব্যজ্ঞান।
আমার আয়ুর পথ চলা শুরু হলো গায়ে,
শস্যক্ষেত পশু নারী বাড়ী ঢলে পড়ে পায়ে।
নেয়ামত ভোগী অভিভাবক হয়েছি পরে,
এসেছি চল্লিশে, আজও তুমুল ঘৃণা করে।
চাইনা মোটে একেবারে না তবু ভুরি ভুরি,
নেয়ামত গিজ গিজ করে শুকরিয়া মুড়ি
অবিকল ফিরে যায়, ঈমান অটল তাই,
এই রুহ আল্লাহর আর কিছু নাহি চাই।
লোভ গর্ব জাতমান আর যত দোষ ঠিক,
আছড়ে মারিব লোকালয়ে ধিক দোষ ধিক
বলি স্বভাব জ্ঞান অর্জনে মোটে ইচ্ছে নাই,
পেয়ে আল্লাহ, কুদরতে চোখ মেলে তাকাই।
স্বভাবে নব রূপ দেখি আল্লাহ আকবার,
খুঁটে খুঁটে নব নেয়ামত করি আবিস্কার।
রে বেদ্বীন কাফির দম্ব করিস অন্ধ চোখা,
সৃষ্টিকুলকে প্রিয় ভাবিস! দেয় তোরে ধোকা
কিছু না পেয়ে সব পাওয়ার দাবী কে করে,
চোখ থেকে কানা, সোনা ছেড়ে রূপা চোরে ধরে।
তাবৎ সৃষ্টির মালিক পেয়ে আর কি চাই,
আর কিছু চাই না বলে সব কিছু পাই।

২২-১-২০০১

কিশোরগঞ্জ।

রিয়্যা

অন্ধকারে বসে চিবাই লোকাচার হাড়
রাষ্ট্রাচার বিজ্ঞানের সৃষ্টি, প্রভু আমার,
দেবদেবী আর কত কি পূজা করি,
গড্ডালিকায় ভাসিয়েছি গা ভক্তি ভরি ।
আমি খাই বেদআত বিষকাটালি পাতা,
মুক্ত চিন্তা ফাঁসে ঢুকাই বানর মাথা ।
আমার হাতে গড়া শাসন দন্ড, সম্পদে,
ডুবে আছি বংশক্রমে সুখে প্রমোদে ।
লাশ দেখে কি ভয়! আমার মরণ নাই
দু'চোখে যাহা দেখি যেন সব চাই ।
ইচ্ছার রাজত্ব গড়েছি এই লোকালয়ে,
মন তরী ভেসে চলে সময় নদী বয়ে ।
দুষ্ট আমি ধূর্ত আমি কূট বুদ্ধিতে সেরা,
ঠেসে ধরে আত্মীয় দিয়ে সব প্রথা বেড়া ।
সাত হতে চৌদ্দ বছর ক্রমে গেছে কাল ।
পশু দলে ভীড়ে গেছি চাটি পাপের গাল ।
সারা রাত ধরে কাল্পনায় দেখেছি ঘুরে,
রিয়্যা পশু যায় নি শয্য ক্ষেত্রে বেঁধেছি দূরে ।
শিরকের পশু হাটে রিয়্যা কি আর ছার!
ঐ পশু সখে কিনে, কেউ ধরে রিয়্যা ঘাড় ।
আচমকা সে দিন ভাঙ্গিল পা পথ মাঝে,
অচেতন থেকে কত দিন, একদা সাঁঝে-
ঘুরে দাঁড়াই, মৃত্যু থেকে ফিরে আসা আমি,
হে মালিক দু'জাহানের প্রভু অন্তর্যামী
রক্ষা করো রুহ আমার, সত্য গেছি ভুলে,
জেগে ওঠ রুহ নফস মরুক সমূলে ।
আর মিছে সব ধাঁ ধাঁ কিসের লোক লাজ,
স্রষ্টা-ভয়ে সদা কাঁদি, পানাহ্‌ চাহি আজ ।

১১-১১-১৯৯৯

কিশোরগঞ্জ ।

জিতেন্দ্রীয়ের আহাৰ

কবিত্ব যেখানে শেষ দিব্যত্ব সেখানে শুরু
অনুভূতির নির্যাসের প্রচ্ছায়া পড়ে ঠিক,
উপমার গায়ে আর তা-ই আঁকে কল্পতরু,
উপমায় হারায় কবি ছুটে দিক্ বিদিক ।
কলিজা নিংড়ে সবটুকু কষ্ট দেয় তুলে,
আকাশে আর আকাশ হয় বেদনায় নীল,
একাকী ডেকে ডেকে যায় যেন উরন্তু চিল ।
কখনও রক্তাক্ত কবি চেয়ে থাকে বুক খুলে,
আপনাকে দেখে সব সৃষ্টি মাঝে, হয় লীন ।
পর্ণ কুটিরে অভুক্ত কবি পায় মহাসুখ,
ছেঁড়া বসনে পাতা চিবোয় চলে যায় দিন,
অষ্ট প্রহর অনিন্দ্যসুন্দর নূরানী মুখ ।
অতি ভোজ ধারালো দাঁতে কামড়ে রুহ মারে
বেচপ বপু অস্বস্থি ভরা কামে উন্মাতাল,
অসময়ে রোগে ধরে, জীবন সংগ্রামে হারে ।
তারপরও কি চাই ভোজ মরিচীকা হাল ?
এই রুহ যখন মুক্ত তখন জানি খায়,
হয় আলো, না হয় আঁধার, যদ্যপি না চায়,
ললিত শরীর, নিখর পড়ে থাকে ধরায় ।
তার তরে এত ব্যস্ততা রচহের শোভা পায় ?
চাল চুলো কার তরে আর কার তরে আলো,
আমি যদি শ্রুষ্ঠা নামের সুধা ভোজন করি,
নিত্য মিটে ক্ষুধা, রচহের শরীর থাকে ভালো,
তবে তাই হোক, জিতেন্দ্রীয় দেহ নৌকো গড়ি ।

১৬-০৭-২০০৮

কিশোরগঞ্জ ।

দুনিয়ার ধনলোভ

চিৎকার করে লাভ নেই অন্ধ পূঁজিবাদ,
যতসব সমাজবাদ, এ যে পশুর সাধ ।
তার দাস হব আমি! এই আমি বুদ্ধিমান,
ক্ষোভে ঘৃণায় ধিক্কার দিই! হও খান্ খান্,
নরকীট! খাও ভাল করে খাও রুহ রাগ,
যাবি কোথা, দেখ চেয়ে এখানে রক্তের দাগ-
খেয়েছিস দুনিয়া, রুহ সব চাপা পড়ে,
বিলাপ করে, বাতাসে শুনি শোঁ শোঁ অশ্রু ঝরে ।
আজ আমি বিপন্ন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে মাথা,
পা অচল বুক জখম, গায়ে মোড়ানো কাঁথা
ঘুমঘোরে দেহ রাখি বসে আছি গাছ তলে,
সম্পদ আকর্ষণে খেয়েছে আমায় ছলে বলে ।
মৃত প্রায় রুগ্ন দেহ বুদ্ধি সুপ্ত অন্ধকারে
একাকী কাঁদি দু'চোখে বহে নদী, কষ্ট বাড়ে ।
এ কষ্ট কেউ দেখে না, স্রষ্টা জানে, আমি বুঝি,
নবী নেই কাছে, শৈল্যবিদ প্রয়োজনে খুঁজি-
করিব অস্ত্রোপচার ধনাসক্তি রোগ নাম,
ভোঁতা জ্ঞান ছুরি সুচতুর শত্রু ধরা ধাম ।
যাঁর হুকুমে রুহ, তাঁর শপথ করে কবি,
মহাদ্রোহে কোপায় মূর্তিমান নফস ছবি ।
পেশা মাল প্রেম যবেহ করি প্রবৃত্তি থেকে,
নির্ভরতা উপড়ে ফেলি যা চিত্তে বসে জেঁকে ।
তারপর হংস সম ভাসি দরিয়ার জলে,
পেশা ভৈরবে থেকে পড়ি না গায়ে তার ঢলে ।
তরু সম চুষি রস, ব্যয় করি ধন হতে,
কলাপাতায় অব্যঞ্জনাগ্নে তুষ্ঠ; খুঁজি পথে-
জানে না কোথা আহার, পাখি উড়ে ডালে ডালে,
কাজ করুক মানুষ! আহার নির্দিষ্ট ভালে ।
সম্বন্ধ কি কাজে খাদ্যে, দারিদ্র্য ভয় করো ?
কোথা থেকে দেবে, স্রষ্টা জানে! তাঁর নাম স্মরো ।
ধন হাতের কাছে থাক আর না নাই বা থাক,

ভুরি ভোজ চিন্তা মানুষের যাক্ চুলোয় যাক্ ।
চৈত্রে বুক শুকায় জল তৃষ্ণায় তবু নদী,
ধৈর্য ধরে, ভিক্ষা চাহে কি সমুদ্রে নিরবধি ?
বর্ষা এলে জল গিলে দান করে অকাতরে,
দুঃখে সুখে নদীর সমান অনুভূতি ধরা পরে ।
সাপুড়ে স্বভাব জানে তাই সাথে থাকে যম
সম্পদ হাতে রাখা নিশ্চয় সাপ পোষা সম ।
সাপ সাপুরে রঙ্গ চলে অন্যে খেললে মরে,
যবাই করো হৃদয় হতে, রাখো হাতে ধরে ।
তা বুদ্ধি করে ধ্যানে রাখ, রুহ দিচ্ছি সঁপে,
স্রষ্টা নাম ফেরেশতা সম যাচ্ছি আমি জপে ।

২১-৯-২০০০

কিশোরগঞ্জ ।

কৃপণতা

চিত্ত বিভোর, চায় গোটা পৃথিবী গিলে ফেলে
সময় কাটায় সুখ কল্পনায় অবহেলে
যেন শেষ নেই সুখ কামনার, যুগযুগ
করছি অবলীলায় অনায়াসে সুখ ভোগ ।
আপন ঔরসে আসা শিশু তার তরে চাই
সুখাবাস, ধরে রাখি সম্মুখে যাহা পাই ।
এই সুখ টাকা বাড়ি গাড়ী যত আছে যেনো,
আরও চাই নেশায় মাতিয়া, জানিনে কেনো ।
ধান গাছগুলো চেয়ে দেখি চোখ মেলে ক্ষেতে,
যতটা প্রয়োজন রস খায় শিকড় পেতে ।
অকাতরে পাকা ফল দানে বৃক্ষ স্বস্তি পায়,
প্রাণীরা অকৃপণ হাতে নিঃশ্বের পানে ধায় ।
আমি ভাবি মরিচীকা সম কী ! তা ঠিক নয়, '
মৃত্যু না জীবন সম্মুখে, প্রভু জানে নিশ্চয় ।
কাকের বাসায় বড় হয় কোকিলের ছানা,
কুহু কুহু গান ছাড়া আর কিছু নেই জানা ।

কূজনে মগ্ন কোকিল এবাদত সম গানে,
তুষ্ট হয়ে শ্রুষ্ঠা কোকিলেরে স্নেহ দানাদানে ।
মানুষ যেন জলযান চলেছে জলে ভেসে,
জলদি সম্পদ সম, পিঠ পেতে দেয় হেসে ।
জল নেশায় বঁদ, থেমে গেলে মরিচা ধরে,
যানে মায়া জল ছিদ্র হলে জলে ডুবে মরে ।
ঠিকানা হারানো রুহ, পঁচে গেলে ভেসে ওঠে
জলে মায়াহীন যান শ্রুষ্ঠা পানে বেগে ছুটে,
অরূপ মহাশক্তি লাগি আমি ফিরে গেলে,
পেছনে রবে কৃপণতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ।

১১-০৬-২০০৪

কিশোরগঞ্জ ।

ধরাশায়ী ইজ্জত

কেঁদে কেঁদে উপজাত ঝরে, গায়ে অগ্নি মাখি,
কষ্টি পাথরে যাচাই করি সোনা নাম রাখি
মান-শান-শাসন ঘিরিয়া ধরিলে কি হবে,
খাঁটি সোনা ধর্ম গুণে ঠিক নিরাপদ রবে ।
ফলমূল যত বিলিয়ে স্বাদ নিজেই শেষে,
উজাড় করে খোদাই করে নাম, পরিবেশে ।
মুখে ঢেকে শরবত সহজে ছোবলা হয়,
এই আখ গুণের কথা একবার কি কয়?
অরুণ আলোকিত করে ধরা, আহা কি দান!
সে কারণে কে বলিবে সে চেয়েছে তার মান?
জল-ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে আপনি কোথা ফিরে?
ধেয়ে চলে সাগর-নদী-শশী-পাহাড় ছিঁড়ে ।
কে গো তুমি সমীর দাদা যাওয়া-আসা করো,
জড় দেহে হাসি ফোটাও, জীবন মেলে ধরো ।
বাদশাহ সুলায়মানকে জানে সৃষ্টিকুল,
মহামান্য ! জলস্থল অন্তরীক্ষে অতুল,

খোদা খোঁজে হয়রান, ভেতরে সন্ধ্যাসী নিজে,
দেননি দৃষ্টি যশ-মান-শানে, কে বলে কী যে!
অম্বর, ভাস্কর যদি চায় কিরণের দাম,
পারে কে দিতে সে সম্মান জানিনা তার নাম।
সেই অম্বর, ভাস্কর ভুলি নিজ নাম,
চায় অহর্নিশ আপন স্রষ্টাকে, কক্ষ পথে ধায়,
যশ নাম প্রচারে তারে বলি কে খুঁজে পায়।
সময়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে কফিন মোড়কে আমি
নিখর পাথর দু'চোখে দেখি মোর অন্তর্যামী।
শুকুনের থাবা ধারালো নখে আঁচড় কাটে,
রাজকীয় চেয়ারে, বুক পিঠে শাসান ঘাটে,
আগুনের সর্প লেলিহান জিহ্বা দিয়ে চাটে,
বাড়িঘর সংসারে বংশ মর্যাদার হাটে।
পুড়েছে সব! অভিযুক্তকে, লালনের দায়ে?
ফিরে দেখি আমি, তাই পিষে ফেলি দাম পায়ে।
ঝঞ্জা মুক্ত নির্মল আকাশে ফুটে চাঁদ মুখ,
এখন সাফ হজম হয়েছে ইজ্জত মুখ।

২৬-১০-২০০৫

কিশোরগঞ্জ।

রুহানী নামায

এ কিসের ধনি আজান! তাইতো আজান! আজান!
তরুসম কাঁপি আমি সমন শুনে, ভয়ার্ত প্রাণ!
জিহ্বায় জিকির জারী রেখে ধীর পদে নামি জলে,
অজু করে নামাজে, আশা ভয়ে বলি মোমসম গলে,
আমার দুষিত দুর্বল শরীর প্রভু, দয়া করো,
কোরআন পড়ি চাই মারফ, মোরে অলি রূপে গড়ো।
চোখ-বিষন্ন আকাশ, বারে অশ্রু বৃষ্টি, কম্পমান
সম্মুখে তোমার! অপবিত্র রুহ-দেহ দন্ডায়মান!
লুটিয়ে সর্বসহায় নতশির তৃষ্ণার্ত জলদি,
প্রভু ভিক্ষে চাইছি প্রেমবারি, কতকাল অবধি।
জানি, ইচ্ছে সূর্য জ্বলছে কলবে, শক্তিহীন দেহ,
তবু প্রতি কোষে জপে আল্লাহ্ জানেনা আর কেহ।
আমি আর আমি নই নামাজে রুহ সেজদারত!
ফেলিবে কোথায়! সবখানে তুমি, এ পাপ আর কত?
আহাম্মদ কাঁদে, কোলে লয়ে, মিটাও রুহানী ক্ষুধা,
গাফুরুর রাহীম দাও এশকের অমিয় সুধা।

১০-০৯-২০০৮ কিশোরগঞ্জ।

সিয়াম

অপরূপ সৃষ্টির গভীরে গিয়ে
দেখেছি রহস্যে ভরা,
অবাক বিস্ময়ে শুনেছি প্রভু
কীর্তন, নতশিরে ধরা ।
জন্ম লগ্নে ঘুমঘোরে দ্যুলোক
ভুলোকে বেড়াতে এসে,
নিজেকে চিনে, দেহ ত্যাগী হয়েছি
পরিণত দরবেশে ।
হায় আজ পঞ্চেন্দ্রীয় ক্ষত
বিক্ষত নড়ার শক্তি কই,
ষড়রিপুর কামড়ে মৃত প্রায়
আমি আর আমি নই ।
যেন ভূত! অজানা ভয়ে শিহরিত
রুহ, চেনা যায় না,
দয়ার নবী! আমার নিদান
কালে ধরিলেন বায়না-
দয়াময় প্রভু, কোন্ পথে
তোমাকে পাওয়া যাবে সোজা,
বলিলেন, প্রভু, চাও কি আমাকে?
তাহলে করবে রোজা ।
আল্লাহ, আল্লাহ জিকির করি
কল্ব ক্ষুধার্ত হলে,
রোজা তাজা করে রুহ আর
রিপু পিষ্ট করে পদতলে ।

০২-০৯-২০০৮ কিশোরগঞ্জ ।

প্রভুর প্রতিকীবাড়ি

কোন উপমা নেই বিশ্ব ভ্রম্মাণ্ডে
যত চিত্রকল্প দেখি,
কত খুঁজে পাইনি একটি শব্দ
অবাক কাণ্ড এ কি!
বিষন্ন বদনে কে কোথা বাস
করে সৃষ্টিকূল,
জানে না কি হবে কার
আপন ভুবনে মত্ত মশগুল।
নেই উন্মাদনা প্রভু বাড়ী
ফিরে যাওয়ার, চক্ষু মেলে,
কানুন কাতর সব! বসা আছে
সময়ের জাল ফেলে।
বোধহীন পশু আর জড় সব সৃষ্টি,
দেখে বলে হয়,
প্রেমাসক্ত ঐরা কারা! মোরা বিনে
প্রভু বাড়ী যায়?
কাঁদে ধূলি তরলতা বারিধারা
উর্ধ্বাকাশ কাঁদে,
পদধূলি চেয়ে কাঁদে প্রাণিকূল,
অশ্রু সিক্ত বায়ুসাধে-
পূণ্য বুড়ি দাও হাতে মোর
পৌঁছে দেবো আহাম্মদ রুহে,
শুনে কাতর আপন মরতবা
জীবন ইনসান দৌঁছে।

ধূলির ধরায় প্রভুর সাক্ষাৎ!
নেয়ামত ভাবা যায়?
ফেরেশতা হাত তুলে দোয়া করে
মকবুল সম্প্রদায়।
প্রভুর প্রতিকী বাড়ি কাবা ঘর
হতে মুসলিম বলে উঠে,
লাব্বায়েক, আল্লাহুমা লাব্বায়েক
ইসলামে হাসি ফোটে।

২৬-১০-২০০৮

কিশোরগঞ্জ।

যাকাত

দিব্যচোখ খুলে দেখো, অলি,
তুমি ছাড়া সবে,
উদ্যম করেছে নেয়ামত
ভান্ডার তারা কবে।
মহাবিশ্বের যত মহাসৃষ্টি,
অমোঘ বিধি মেনে,
চলে অবিরাম, কাজের
শেকলে বেঁধে, নেয় টেনে।
পয়োধির বারি চুষে নেয়
বিরাট আকাশ মুখ,
মাটি নৌকায় পেরেক সম
পর্বত স্থির ভুলোক।
সবুজ আঁচলে ঢেকে, সাধে
প্রসাদ, উদ্ভিদ বধু,
তাবৎ রাও যেন সুরভূতি
স্রষ্টার, কর্তৃ বরা মধু।
সূর্য আপন আগুনে পুড়ে
স্বাদ পায় দানে,

চাঁদ-মুখ কলঙ্ক তবু
রূপসী কে না মানে!
সৌরভ ছড়ায় ফুলরাজি
আর ঝরে যায়,
হিংসা দুর্গন্ধ ছড়ায় ইনসান
জ্বীনে বায়।
সহজ শ্রোতের প্রতিকূল
সব নরাধম,
রুহের, ডেকে আনে অপমৃত্যু
পাপিষ্ট সম।
তখনই যাকাত ফেত্রা ছুটে
আসে চলে-
শ্রষ্টার কৃপায় দেখা যায়
বায়ু রূপে জলে,
রুহ যাকাত সঞ্জীবনী পেয়ে
বেঁচে ওঠে.
পাপ হয় লাশ, জলে ডুবে মরে
খুঁটে খুঁটে।

২৩-১০-২০০৮

কিশোরগঞ্জ।

আত্মশ্লাঘা

এমন অনেক সৃষ্টি দেখেছি
ধরিত্রী নভে,
আজন্ম একমুখী, স্রষ্টার
অনুগত সবে ।
হয় লুপ্ত তবু চাহে না আত্ম
প্রচার নাম,
নিজে কি জানে না ধর্মে অটল
থাকাই কাম ?
চুম্বক স্বভাব মেরুমুখী,
আর কিছু নয়,
চিনে সবে তারে, সে চিনে স্রষ্টা-
রে জানি নিশ্চয় ।
মুখ বুজে আছে গুণ, বলে
কখনও মুখে ?
যত দিন বাঁচে মেরুর দিকেই
থাকে ঝোঁকে ।
ফলমূল আর খাদ্য কহে না,
স্বাদের কথা,
জন্মে বেড়ে ওঠে অমোঘ নির্দেশে
যথাতথা ।
বৃক্ষরাজি, পশুপাখি প্রশংসারত,
মহান প্রভুর,
মানুষের দেয়া কষ্টে সবাই
করে সবুর ।
কত বলিব, কে গাহে না স্রষ্টার
গুণ গান,
সকলের চেয়ে পেয়েছি বেশি
স্রষ্টার দান;
এ মানুষ! যে কিনা করে আত্ম
প্রশংসা হয়,

অকৃতজ্ঞ ধিক্ তারে
এরূপ কী ভাবা যায়,
কে বলে নিরেট মুখ্ সে
সৃষ্টি মাঝে,
সাম্বাৎ ইবলিশ যেন বক
ধার্মিক সাজে ।
আত্মশ্লাঘা মহাপাপ জেনে নদী
শ্রোত হয়ে,
নদী তলে ডুবিয়ে জঞ্জাল শ্লাঘা
যাব বয়ে ।
দুই চোখ যেন নদী হয়ে যায়
অশ্রু ঝরে,
সাগর প্রেমে ছুটে যাই সরল
পথ ধরে ।

০১-১১-২০০৮ কিশোরগঞ্জ ।

তওবা

ঈমানের বজ্র নিনাদ শুনে তওবা-
তড়িতের তাপে,
বৃষ্টি সম অশ্রু ফেলে, মেঘ পাপে
তর তর কাঁপে ।
হাসে শাশ্রু মন্ডিত মেঘ, মুক্ত
আকাশ দরবেশ,
পেটে তার জন্ম লয় সবুজ
নেয়ামত অশেষ ।
শিশু তার বসুন্ধরা বেড়ে ওঠে
ফুলে ফলে ভরে,
সজীব রুহ পায় স্বরূপ, পুণ্য
তুলে দুই করে ।
গতরে ঢুকে নফস সূর্য চুষে
নেয় সব রস,
পুণ্য শূন্য মরা ধরা শয়তান
তারে করে বশ ।
হৃদয়ের 'পরে বসে কুমন্ত্রণা
দেয় অনর্গল,
ষড়রিপু যোগ দেয় সর্বনাশ
সাধে করে ছল ।
হেন কালে শুধু কাঁদো, কাঁদো
কাঁদো ওগো রুহ,
একা অনুতাপ ভরে ভেঙে
ফেল শয়তানী ব্যুহ ।
হৃদয় নিংড়ানো কান্না, পাপ
পরহেজ করে চলে,
তাজা করো রুহ, দেহরাজা
নিক্ সে দখলে ।
সাবান দেখেছ কেউ! আর
ধবধবে সাদা বস্ত্র?
বড় দরকার আজ কান্না, সে

তওবা সম অস্ত্র ।
সদিচ্ছায় কাঁদো কেউ যেন না দেখে
ফেলে হে, একা,
একথা নিশ্চিত তুমি পাবেই
মহাপ্রস্টার দেখা ।
তওবা প্রাণ রুহ যখন একাকী
পথ চলে,
যখন জৈবিক কষ্ট সহ্যে কৃতজ্ঞ
হয়ে বলে ।
ঈমান একীনে বলীয়ান আমি,
আল্লাহ সহায়,
ভয় করি নাকো যতই কষ্ট
লাগুক গায় ।
ঈশ্বর-রূপে মুক্ধ সর্বদা প্রভু
প্রেমে পাগল,
এমনি সবুর তার দেখো ঝরে
না অশ্রুজল,
ঝরছে রক্ত গা হতে তেষ্ঠায়
মৃত প্রায়,
তপ্ত মরু ভূমে বুক লাগা সর্প
দংশিছে পায়,
সমুদ্রে ডুবে যায় তবুও ভুলে
না প্রভু নাম,
উনুনে চড়ে না হাড়ি তবু করে
না বদ কাম ।
নারীর উদ্যোগ যৌবন, পৌরুষ
নাহি চায়,
এ রকম পুরুষ এ যুগে খুঁজে
পাওয়া দায় ।
ইসলামী জ্ঞান-আলো ঈমানের
জ্যোতি জ্বালি-
তওবা জন্মে, লয় জোরে পাতকীরে
স্বর্গে টানি ।

বুদ্ধি দারোগা পোশাকে অর্চনা
অস্ত্র করে গুলি,
কুফর পতিত, রিপু বিতাড়িত, মুক্তরুহ
ভুবন গেছে ভুলি।
বৃত্তি শোচনা কাতর স্রষ্টা ভয়ে ভীত
কাঁদে মন্দ্র গীতে,
জিকিরে মশগুল আশেক রুহ সব
জাগি সত্য ভিতে।

২৭-১২-২০০৮

কিশোরগঞ্জ।

সবর

আশি পশুও নই, ফেরেশতাও নই
আমি মানুষ, তাই জীবন ঘরে যখন রই,
তখন দিগন্ত জুড়ে চোখ মেলে,
চেয়ে দেখি দাঁতাল হিংসার শুষোর অবহেলে,
ধেয়ে আসছে কামড়াতে আমার সত্তা মন,
জড়াতে চায় অপরাধে, লুফে নিতে চায় ঈমান ধন।
আচ্ছা তখন আমি কি করি?
আমার শিকড় যায় নি সমাজাচারের গভীরে
আমার জিহবা স্বাদ পায়না খুনে, যায় নি মিথ্যার ভীরে
কখনও কখনও ভুল হয় গুনাহ্ স্পর্শ করে নরোম গা,
ঢুকতে চায় তীর ফলা হয়ে, ছুঁতে চায় বুকে বুহের পা,
আচ্ছা তখন আমি কি করি?
আমি যখন সত্যের গোশত খাই
সমুদ্রের লোনা জল দিয়ে,
অক্সিজেন হয়ে ঢুকে যাই ফুসফুসে
তখন মানুষ বাঁচে দম নিয়ে।
আবার শুরু করে বদ চিৎকার তুলো

দিই কানে,
পাপের ঝড়ো বাতাস আমার
পবিত্র ঘরে আঘাত হানে ।
আচ্ছা তখন আমি কি করি?
আমি গহীন বনের সুরেলা পাখি
উড়ি ঈমান গগনে,
আমার নাকের ঘ্রাণে স্রষ্টার অস্তিত্ব
খুঁজে পাই, ফুল ফোটে মন পবনে ।
আমার এ ঈমান ফুলে বিষ ঢালে
প্রবৃত্তির প্রজাপতি,
অদূরে শয়তান খিল খিল হাসে
চির অসৎ মতি ।
আমি চাই ঈমানের ভ্রমর আসুক
খেয়ে যাক ঈমানের মধু নূর,
আমি সতীত্ব রক্ষায় চিৎকার করি
কেঁদে ওঠে বুহের অন্তঃপুর,
স্রষ্টার দিকে মুখ তাক করে
করি সবুর ।

২৯-১-২০০৯

কিশোরগঞ্জ ।

শুক্র

কবর যাত্রী হাঁটছি অনাদিকাল থেকে
কবরে কবরে নিজেকে সন্তপর্ণে রেখে,
কোথাও নিজ কবর খুঁজে পাইনি, তাই
'অবশেষে স্রষ্টার মুখোমুখি হয়ে যাই ।
তিনি বলছেন, “আমি” তোমার অন্তর্যামী,
যেদিকে যাও পাবে আমাকে, উৎস “আমি”
বুঝিলাম না, ফের তাকালাম ধরা পানে,
অবাক হয়ে দেখি উল্টো শ্রোত সবখানে,
স্বঘোষিত গর্বিত মানুষ আর স্বভাব
প্রশংসায় পঞ্চমুখ অপূর্ব সন্ডাব ।
বৃক্ষ, মাটি, পানি মুখে তুলে দেয় আহার
শুক্রের ঢেকুর তুলে ইচ্ছে যাহার ।
যেন শিকড় আর মাটি একাকার মিশে,
বাঁচে বৃক্ষ ফুটে ফুল প্রয়োজন আর কিসে?

মহাউল্লাসে হয়েনা খাচ্ছে বসে ধরায়
শয়তানী প্রবৃত্তিকে, আছে কে যে, সরায়?
অশান্তির দাবানলে জ্বলছে যে মানুষ,
অনৈতিক আঁধারে ঢুকে খাচ্ছে বসে ঘুষ,
কিসের পরকাল বেহেশত ও দোজক,
মানুষ এখন গাড়ী-বাড়ী-নারী পূজক ।
ধর্ম প্রচারক দল অসহায়, এরা বিক্ষিপ্ত
অধার্মিক বিষয় জ্ঞানী ছিদ্রাবেষণে লিপ্ত ।
ঠাঁই নাই পা ফেলার পবিত্র চরিত্রের,
অসম্ভব একতা দুনিয়াভক্ত মিত্রের ।
আমার অবচেতন মনের মহাপ্রভু,
উড়ে উড়ে হয়রান আকাশে, জানি, কভু
সাগরে নির্জন দ্বীপে শুক্র নেমে আসে,
লোনা জল ছোঁয়া লাগে, হয়ে নিষ্পাপ, হাসে
আমার এ শুক্র জাতীয় ভাবনারা দোলে,
অরণ্যে হাঁটা কবি'র নরোম তুলতুলে

মনের চিত্রকল্পে, পাহাড়ের গুহায়,
সুউচ্চ পর্বত শিখরে নিরবে লুকায়।
দ্রোহী সমাজে ঢুকতেই পারে
না পরাজিত সৈনিক
নভে বাস করে, আষাঢ়ে
অশ্রু বৃষ্টি ঝরে, দৈনিক
শিশুর খেলনার মতন পড়ে থাকে অলক্ষ্যে
বিষয়ী জীবন পরিত্যক্ত কবিস্বামীর বক্ষে।
বঁচে আছে দরবেশ বনে, দেখে না কেউ,
কিশোরের ছুঁড়া টিলে পুকুরে ওঠা ঢেউ
এ গুপ্ত ধন, থাক গোপন, প্রকাশে ভয়,
মোজাহাদা মোবাকাবায় নিশ্চিত বিজয়,
এভাবেই চলছে সুফি, পরাভূত রিয়া,
বুঝিলাম, প্রভু শুকর এখন, শুকরিয়া।

৮-২-২০০৯

কিশোরগঞ্জ।

আশা

আমি বেহেশতেই ছিলাম, স্রষ্টার সাথেই
ছিল আমার যোগাযোগ
পবিত্র জীবনে, স্রষ্টার নাম জপিতাম
আর করিতাম অতুল সুখ ভোগ।
দুশমনের কান পড়ায় পা ফসকে পড়ে
গেলাম, অসীম যোজন দূরে।
রিক্ত এখন হতভাগ্য মানুষ শয়তান,
শয়তানের পেছনে ঘুরে।
শিং গজানো দাঁতাল শূয়োর রক্ত

লোলুপ খুনী যমদূত,
লোমশ পশু কখনও হয়ে যাই
অদৃষ্টপূর্ব কদাকার ভূত ।
অশুভ সুখ কাতর পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে
বন্দি আত্মার শত্রু ইবলিশ,
শিরায় শিরায় অদৃশ্য ধাবমান সে যে
প্রতিনিঃশ্বাসে ঢালছে বিষ ।
আমি এখন কি করি অবিরত বিলাপ
করছে আমার বৃহৎ হায়,
অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়
শ্রুষ্ঠা-জপহীন কখন জানি মরে যায় ।
আমার ভূতুরে দেহ যখন ঘুমায় তখন
পঙ্কু আমি বাহির হয়ে পাই-
সাগর জলের দেখা, বহু পথ ঘুরে
ফেরে জল, সাগরে খুঁজে পায় ঠাঁই ।
উগ্ধ সুখ নিদ্রায় বীজ, কর্মক্লান্তি শেষে
ফিরে আসে আপন মাটির ঘরে
আবার মাটিকেও দেখেছি সর্বসহা রূপে
পর্বত হয়ে মাথা, উঁচু করে ।
নিত্য অগণিত শ্রুষ্ঠার সৃষ্টি উপমা
দেখে অবাক হয়ে যাই,
ফিরে আসি আমার মাঝে আর
ওসবে আমি সাদৃশ্য খুঁজে পাই ।
কখন ঢুকে পড়ি এক দুনিয়াবাদীর ঘরে
তার চিন্তায় মগজে মননে,
দেখি তাঁর রূহ আর কাঁদে না
আমৃত্যু সুখ পিপাসু ব্যস্ত আত্মহননে ।
আবার দেখেছি অবশ অলস ঘুম কাতুরে
কপট পিশাচ, সাথে
নিরর্থক সমাজাচার খায় নিত্য দিন
আর স্বর্গ স্বপ্ন দেখে রাতে ।
পাপের মহীরুহ সর্দপে উঁচু করে মাথা
দেখেছি বিস্তার করে নিজকে

হঠাৎ তওবার ঝড় এসে মহীরুহ
উপড়ে ফেলে,
শিকড় সমেত কুফরি বীজকে ।
আরিফের মোরাকাবা বাগানে ঢুকে
রিপু ছাগল ইবলিশ
সজারু-সাপ,
আশা, তওবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে
এসব, পায় মারেফাতের
আর এক ধাপ ।

১৫-১২-২০০৮ কিশোরগঞ্জ ।

ভয়

ঈমানী নূরের চাঁদ ঝলসে ওঠে
রচছে, আল্লাহর ভয়ের চোটে ।
সাইবেরীয় প্রচন্ড শীতে
জলন্ত অগ্নিকুন্ডের ভিতে
দন্ডায়মান আমি অস্থির,
আল্লাহর শাস্তির ভয় করে ভীড়
এই রুহে, তাই প্রশ্ন করে যাই
নির্বাক অরণ্যকে, আর উত্তর পাই
যেভাবে চায় স্রষ্টা সেভাবে চলি,
ভোরের পাখিরা নির্জনে জেগে উঠলে বলি,
তোমরা কি স্বস্থি নিয়ে থাকো?
নাকি স্রষ্টার ইচ্ছেমত নিজেকে রাখো,
অনায়াসে বলে তারা 'ভাই, বলেছ ঠিক'
স্রষ্টার বিধি মতে বাঁচিতে আমরা আন্তরিক ।
পর্বতে গিয়ে শান্ত দেখে তারে সুধাই,

বলে, 'স্রষ্টার নাম রেখেছি মনে, করে খোদাই'
শুধালাম 'নীলাকাশ, খোদাকে ভয় পাও তুমি'
বলিল, "আমার ভয় কাতর হৃদয় চুমি,
লালাভ পাণ্ডুর মেঘাচ্ছন্ন দেখে কি মনে হয়,
স্রষ্টার ভয় আমার বুকে পেয়েছে জয়?'
তারপর গেছি লোকালয়ে মানুষের ভীরে
দেখি মানুষ থাকে ভয় হতে মুখ ফিরে।
একদা নির্জনে যাই দরবেশের কাছে
দেখি তাঁর রূহ ভয়ে কান্না রত আছে।
শুধালাম, 'তাঁরে, কিসের এত ভয়, বলো
কেন একাকী নিজে ভয়ের আগুনে জ্বলো।'
চাহিল না ফিরে নির্বাক ঝরিতেছে অশ্রু
শান্ত সৌম্য মুখ তবু অশ্রুতে ভেজা শাশ্রু।
অধোবদনে থাকিলাম পড়ে কিছুক্ষণ,
মৃত্যুকালে থাকে যেন ঈমান মহাধন
হঠাৎ তিনি করলেন, দোয়া, হাত তুলে
নিশ্চিন্তে রহিলাম তাঁর কর ধরে বুলে।

০৯-৭-২০০৯

কিশোরগঞ্জ।

এশকে এলাহী

প্রখর রৌদ্র দক্ষ আমি ছায়াতলে যাই,
বাঁচি নিঃশ্বাস ফেলে, আহ্ শুকরিয়া ভাই,
'বিটপ আমার'! বাঁচালে রৌদ্র তাপ হতে ।
বুঝিয়াছি আমি ছায়া কিছু নয়, আড়ালে
থাকিয়া ঐ গাছ প্রভুর মত না দাঁড়ালে
পেতো কি মানুষ সুখ চড়িয়া ভব রথে?
একদা ঈসা (আঃ) যাচ্ছিলেন পথে একাকী,
জীর্ণ শরীর মানুষ, কোটরীগত আঁখি
দেখিয়া হাঁকিলেন তিনি, 'এ অবস্থা কেন'?
বলিল লোকেরা, 'আল্লাহর ভয়ে' শুনিয়া
বলিলেন তিনি, 'ভাল' যাও স্বপ্ন বুনিয়া
আল্লাহ পাক আশা পূরণ করেন যেন ।
কিছুদূর গিয়ে দেখিলেন আরও লোক
অধিক জীর্ণশীর্ণ, সুধালেন, 'কি অসুখ
জানিতে চাই' বলিল তারা, 'জান্নাত চাই'
দোয়া করে এগিয়ে যান, অন্য সম্প্রদায়
পড়িল চোখে, সবচে'জীর্ণ, উজ্জ্বলতায়
চাঁদমুখ, 'কি হেতু', বলে, 'প্রভু প্রেমে ভাই' ।
বসেন তিনি তাঁদের সাথে আর বলেন,
'তোমরা নৈকট্য প্রাপ্ত আল্লাহর', হলেন
বন্ধু তাঁদের, এশকে এলাহীর তুল্য কি?
হযরত সররী সকৃতি (রঃ)র মধু-বচন,
আল্লাহ হাশরে ডাকিবেন করে যতন
'ওহে অলি'; এর চেয়ে আর বেশি মূল্য কি!
সুখকর সব কিছুই পঞ্চেন্দ্রীয় চায়,
কষ্টকর মন্দ পঞ্চেন্দ্রীয় এড়িয়ে যায় ।
ষষ্ঠেন্দ্রীয়ের বেলা একই কথা খাটে,
বুদ্ধির নির্দেশে ভাল চর্চা মন্দ বর্জন
করে, ষষ্ঠেন্দ্রীয় এগিয়ে করে অর্জন
এশকে এলাহী, রুহ মগ্না জিকির পাঠে ।
আল্লাহ ছাড়া আর সবে ভালবাসা মূর্থতা,

এ ভালবাসা জন্মে অন্তরে বুঝে নাও তা,
জীতেন্দ্রীয় হলে ষষ্ঠেন্দ্রীয় পায় বল,
স্রষ্টার পরিচয় জ্ঞানে আকর্ষিত মন,
মহানন্দে বিভোর প্রেমে মত্ত আমরণ,
দেহদাস তার, রূহ দেখে সৃষ্টি কৌশল।
দুনিয়া থেকে মুখ ফিরানো, বীজবপন
আল্লাহর জিকির ফিকির, পানি সেচন,
জন্মে মারেফাত সুবৃক্ষ-ফুল মনোহর,
ইলমে মারেফাত কুদরত চিন্তা করো
ইন্শাআল্লাহ পাবে দিব্যদৃষ্টি নিশ্চিত ধরো,
এষে এশকে এলাহি, বুঝেছি নাহি ডর।
সংসার যে তাসের ঘর কখন জানি
ভেঙ্গে যায়, ভাবছি পলকে পলকে হানি
আঘাত, মৃত্যু ঢুকে ঘরে, শংকায় কাতর
আমি, তাই জীবন পরিকল্পনা করিনা,
সোল্লাসে সদা সুখের পালকিতে চড়িনা।
আমি ভীষণ মৃত্যু পিপাসু নিরেট পাথর।

২৭-৯-২০০৯ কিশোরগঞ্জ।

শওক

তরক্কে দুনিয়া আমার ব্রত,
নির্জনে তোমার জিকিরে রত,
তোমার অনুরাগে যাক প্রাণ,
শরীর থেকে পেতে চাই ত্রাণ,
তোমার দুর্বীর টানে-
দুনিয়ায় তপস্যায় যা পাই,
তাতে আমার তৃপ্তি মোটে নাই,
এসো হে সখা তুলে নাও কোলে,
চাহিনা ভুবনে থাকিতে ঝুলে,
ছুটিব তোমার পানে ।
মৃত্যু চাই মৃত্যু, দীদার পেতে
বড় বাধা সে, জানি কাছে যেতে
দেবেনা সে, আমার কষ্ট সে বুঝে?
নিজ হাষ্টি ডুবিয়ে খুঁজে খুঁজে
হয়রান রুহ, তবু
মেটে না আকাজ্জা মৃত্যুর আগে,
আশেকের পরম ইচ্ছে জাগে
মৃত্যুর পরে সে, কবর বাগে
মিলে যাবে মাসুকে অনুরাগে,
ফিরিবে না আর কভু ।

২৭-৯-২০০৯

কিশোরগঞ্জ ।

রেযা

আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক মাথায় চাইনা বাঁচা,
স্ত্রী-দৌলত-বংশধর ভেসে যাক বারিধারায়,
নিষ্ঠুর জন্মাদ আমি ধরার, চিবাই কাঁচা
তার পালিত লোভ শুয়োর, পাগল পারায়
ছুটছি, অন্তর জ্বলে যাচ্ছে প্রেমের আগুনে
কোথা নির্জনতা বন-পাহাড়! অভূক্ত মালা
দেবো, উপহার, আমার মাসুককে ফাগুনে
চাইনা বেহেশত দোজক ছরপরী বালা ।

তারপর যদি হাতে আসে রাজদন্ড তাতে
অখুশি নই, পরিচিতি থাকে দুনিয়াময়
যদি আমার, কি ক্ষতি, আমি ছুটে চলা রাতে,
কোরআন সুন্নাহ হাতে ধরা অকতোভয়
এশকে এলাহির রজ্জু ধরা এক পথিক ।
মানবীয়গুণে বিকশিত অমূল্য মানুষ ।
বনে কিংবা সমাজে থেকে ছুটি দিক বিদিক
কেঁচো সময় মাটি খাই, মল ফেলি মাটি, হুঁস
আছে আমার, কখনও দেখিবেনা কেউ গায়ে
মাটি! অমলিন, স্রষ্টার এশক রসে সিদ্ধ
কল্ব, চলি দুনিয়ায় কেঁচো পাহীন পায়ে,
স্রষ্টার ভয়ে কাঁপে কল্ব যেন নিঃশ্ব রিক্ত
কুঁজো হয়ে যায়, তাপে দন্ধ কেঁচোর মতন ।
আমাকে শুনাতে চাই দাউদ (আঃ) এর কথা
কি ভাবিতেছ? শোন হে রুহ, শোন দিয়া মন
দাউদ (আঃ) পাইলেন আল্লাহর ওহী বার্তা,
'সংসার চিন্তা! আমার বন্ধুদের লাভ নাই,
এ যে রুহ হতে দোয়ার মাধুর্য নষ্ট করে
তারা রুহানী তথা পার লৌকিক হোক চাই
আমি, সংসারে যেন তাদের মন না ধরে' ।

অবশ কুণ্ট অন্ধ একলোক দেখেন নবী

ঈসা (আঃ), সে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে করে
মোনাজাত, কিছু না আমার দুর্দশার ছবি,
অন্যরা যে বিপদে তা দাওনি আমাকে, স্মরে
যাই তোমার নাম, আমি ভাল আছি হে প্রভু’
শুনিয়া ঈসা (আঃ) বলিলেন ‘সত্য বললেহে’
অবশ্য কুণ্ট অন্ধত্ব স্পর্শে তাঁর আর কভু
রহিল না, সুস্থ দেহে নবীর সাথে চলে সে
একেই বলে রেযা, আশেকের অনুরাগ,
স্রষ্টার রাহে রুহ যেন তার জান্নাত বাগ ।

৩-১০-২০০৯ কিশোরগঞ্জ ।

কোরআন তিলওয়াত

কোরআন তিলওয়াত শুনিয়া
কেহ বলিবেন স্বাভাবিক স্বরে,
আহা এ আবার তেমন কি বেশ তো,
স্রষ্টা সওয়াব দিবেন পরে ।
ঠিক আছে, সওয়াবের কথা,
মর্মটা কি জানার দরকার নাই?
কেহ বলিবেন, চলিছে চলুক
আর গভীরে কেন অযথা যাই ।
শুন মানুষ, উদ্ধারে তব
এলো কোরআন লৌহে মাহ্‌ফুজ হতে,
নিদারুণ আঁধারে আলোকবর্তিকা
মহান স্রষ্টার ইচ্ছায়, মতে ।

রুহের চোখ এযে, জেনে রাখো,

উহা ছাড়া এ চোখ নিশ্চয় অন্ধ ।
আঁধারে ঢাকিয়া ফেলিবে জীবসত্তা,
মুক্তির সকল পথ হবে বন্ধ ।
গৃহ কর্ম হতে রাজ্য শাসন
দাসত্বের মূল উৎস, কোরআন,
দৈব শক্তির লাগি, কোরআন
এক মহান রক্ষাকবচ, প্রাণ ।
বুঝে পড়, অন্তরে রাখো সযতনে
সম্পদ সম হাতে ঐশী গ্রন্থ,
যেন রেল গাড়ী, রেল পথ ধরে চলে
জীবন হয় প্রাণবন্ত ।
ঈমানের স্বরূপ যেন ফুটে ওঠে
স্পর্শ করে পাক কোরআন,
যেন মোরাকাবায় রুহ লতিফায়
শুনছ প্রভু বাক্য, তাঁর শান ।
নাই উপমা নাই কিছু তার সাথে,
দুনিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি আমি,
দান করেছেন তিলওয়াতে কোরআন
প্রভু, আমার অন্তর্যামী ।

৪-৪-২০০৯

কিশোরগঞ্জ ।

দিব্যদৃষ্টির খোরাকি

মানুষ জাতির কথা বলিতে গেলে
বলিতে হয়,
এক রক্তে মাংসে গড়া সবে
বৈশিষ্ট্য এক নিশ্চয়।
ফুটিলে কাঁটা সবাই সম
ভাবে ব্যথা পায় গায়ে,
একই রূপ গঠন, বেঁচে থাকে
শ্বাস টেনে বায়ে।
ভুবনের বিচিত্র রূপে বিচিত্র সাজে
বাস করে,
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবে বহুমতে
ওঠে গড়ে।
জীবন, মোমরচ্ছ সবার মধ্যে আছে
কে না জানে,
এক প্রভু, স্বর্গীয় কেউ মানে, দূত,
কেউ না মানে।
তাতে কি! মহাপুরুষ অলি আল্লাহ
শুধু চাইলে,
নিজ বুহ দিয়ে জ্বেলে দিতে পারেন
ধারে পাইলে,
অগণিত বুহ, নিমেষে নূরে নূরে,
সয়লাব হবে ধরা, ইবলিশ
চলে যাবে দূরে।
কে এই মহা মুনি দরবেশ,
তাঁর পরিচয়?
আর কিছু নয়, আল-কোরআন
হাদিস নিশ্চয়,
তাঁর দিব্য দৃষ্টির খোরাকি;
হুবহু গিলে ফেলেন,
জ্বল জ্বল জ্বলে ওঠে রচ্ছ, ঐ নূর,
দিয়ে খেলেন,

মহাপ্রভুর সাথে আশেক
মাণ্ডুকের প্রিয় খেলা,
পবিত্র তাঁর জীবন শান্তিময় কাটে
তাঁর বেলা ।

২৯-১০-২০০৮

পল্লবী কোয়ার্টার, মোলমারা, কিশোরগঞ্জ

কাব্যগ্রন্থ- বিলাপ (১৯৮৬-৯৮)

সিঁড়ি

নিচে নামতে সিঁড়ি ওপরে উঠতে সিঁড়ি
সিঁড়ি ভাঙ্গে জনক,
ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইলে এই সময় যে
মা, নড়ছে টনক।
সিঁড়ি ভেঙ্গে স্বাধীন হলাম বহু কষ্টে মাগো
সিঁড়িতেই-উত্থান,
গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত ইতিহাস সিঁড়িতেই শুয়ে
বেহেশতে যান।
এখন খালি বাড়ি মা, খালি দেশ মানের
সিঁড়ি ভাঙ্গাবে কে,
উত্থিত হাত স্বাধীনতা কল্পনা জোয়ার আজ
পিতা রাঙাবে কে।
ইতিহাস তুমি, তোমার ইতিহাস মাটি, এ
মানুষ হাড় মজ্জা!
সিঁড়ি ভেঙ্গে জন্মালে বাঙ্গালী, আশ্চর্য এই যে,
সিঁড়িই শেষ শয়্যা!

২৭.১১.৯৭

বাহরামপাড়া পাড়া।

বিলাপ

(জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর রুহের মাগফেরাত কামনায়)

টুঙ্গীপাড়া :

একি, চোখে তো কিছুই দেখি না
পুত্র শোকে এখন কি হবে,
পড়িয়াছে বুঝি ছানি বাবারে-
দুর্দশা শুরু হলো সবে ।

৩২ নম্বর :

টুঙ্গীপাড়া মা

মাগো

মনের বেতারে শুনেছি বঙ্গবন্ধু কই,
তোমার বুকের উঠোনে কান পেতে রই।
দেখিয়াছি মাঠে হাটে ঘাটে,
দুঃখী মানুষের ললাটে,
সবুজ রমনা ময়দানে ভাষণ রত ঐ ।
ইতিহাসে মূর্তিমান,
শেখ মুজিবুর রহমান,
শতাব্দীর বিলাপ শুনে শিহরিত হই ।
বিব্রত জাতি কণ্ঠ স্তব্ধ সব,
মেঘাচ্ছন্ন দিন স্বভাব নীরব ।
এখন বলো কাঁদিব কতকাল আর,
হৃদয় জুড়ে শুধু চলছে হাহাকার ।
চোখে আলো নেই তমসা ভরা এ মনে,
হয় না আকূল প্রাণ বাউলের গানে ।
হায় এই হতভাগা পিতাহারা শিশু,
বেঁচে আছে কোন মতে অসহায় যিশু ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু অপরাধ,
এ জাতির বিবেক হত্যার অপবাদ ।
দূর কর হে গতাসু মহান পিতার

বাংলাদেশে ঐ দালালের মিথ্যাচার ।

কে তুই, অসুর সৈদিন অস্ত্রহাতে

আগস্টে রাতে হায়না রক্ত পাতে;

বীজ বুনেছিস দীনতা, শয়তানির-

আছি সাতই মার্চ-বজ্রবাণীর,

আদর্শ বুকে লয়ে মেধা শ্রম দিয়ে,

গড়িব বাংলা পিতার আদর নিয়ে ।

মা- মাগো মা ।

মনের বেতারে শুনেছি আমার বঙ্গবন্ধু কই-

জন্মভূমিগো তোমার বুকে কান পেতে রই ।

ও সর্বদাই মনে হয়,

বঙ্গবন্ধু চেয়ে রয় ।

তাঁর বজ্রকণ্ঠ শুনে অশ্রুসিক্ত হই ।

এই বাংলার দিকপাল,

প্রিয়তম তুমি মহাকাল,

বাংলায় ঘুমাচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঐ ।

টুঙ্গীপাড়া :

সময়! আমার বুক ফাঁকা করে,

ঈশ্বর নিলে তারে সোহাগ ভরে ।

বাংলা আমার মুজিব আমার,

শূন্য হাতে প্রভু ফিরিব আবার,

তোমার দরবারে, ফিরিয়ে দাও-

ফিরিয়ে দাও-

--

৩২ নম্বর :

আকাশ ছাদের বাংলার ঘরখানি

হিমালয় ঘেরা ষোড়শী বধূ,

জমিন চৌকি দুর্বা জাজিম টানি

বসে মা, হাতে শিশু অষ্টমধু ।

তুমি দেশ প্রেম ডানপিঠে রাগী মন

বনে ছনের ঘরে বেঁচে থাকা,
একান্তরে মনে পড়ে রহিমেন?
মুজিব দীর্ঘায়ু হোক রোজা রাখা ।
মুমূষের কষ্ট নিঃশ্বাস বেয়নেটে খোঁচা
ভাল লাগে মা--- বলে উঠা-
“স্বাধীনতা”; শত্রু পথ বুখা-
লাঠি হাতে দুঃসাহসী যুদ্ধে ছুটা ।
কোটি কোটি বাঙালী গাহে জারি গান
শেখ মুজিব দিল দরিয়ায় ওঠে তুফান ।
মানচিত্র তুমি, তুমি বাংলার প্রাণ,
এদেশ এ গৌরব তোমার অবদান ।
শ্রেষ্ঠ বাঙালী তুমি, তুমিই তো মহান ।
আজ দুঃখে কাতর,
জাতি অনড় পাথর,
দিকহীন নৌকার মতন চলছে ।
বনে নীড় হারা পাখি,
বিরহে যাচ্ছে ডাকি-
অনলে দহে হৃদয় খানি গলছে ।
নদী বিল বিল সব,
মাটির মায়া নীরব
কৃষাণের পা যে ক্ষুধায় টলছে ।
শ্রমিকের উদ্দাম,
হারিয়ে পায় না দাম
কালো টাকায় ভুতুড়ে পায়ে দলছে ।
দুষ্টের চরকায়,
সন্ত্রাস প্রাণ পায়,
টাউন্টের ইশারায় সমজটা জ্বলছে ।
এখন ইচ্ছে করে,
তোমার পথধরে,
ঘুমুতে যাই টুঙ্গীপাড়ায় প্রিয়তম,
বাঙ্গালী লাইলী মজনু নমঃ হে নমঃ
সাগরে জল বাড়ছে মনে অশ্রু বারে,
খুন বন্যায় ভাসে দেশ স্মৃতি মনে করে ।

একি হলো বিরহের মালা পরে গলায়,
নিঃস্ব বাঙ্গালী চলিয়াছে ঐ কোথায়।
অর্ধনমিত পতাকা নতশির পাপী,
এই জাতি হায় লজ্জা জ্বরে উঠে কাঁপি।
পাল্টে দিন রাত কান্নার নাই শেষ,
হায় মুজিব কাঁদে শোকাক্ত পরিবেশ।
স্নান কিরণ রবির, মেঘে যায় ঢেকে,
হায় মুজিব রক্ত নদী চলছে বেঁকে।
শোকছায়া নামে শিশুহীন মায়ের কোলে,
শিশু ঘুমায় আজ দোলনা কবরে দোলে।
তর্জনী উঁচিয়ে ঐ শুনায় জনতায়,
এবার দারিদ্র্য মুক্তির সংগ্রাম হায়।

টুঙ্গীপাড়া :

ওরে বাছা, ওরে আমার ধন
কান্সালীনি বাঙ্গালী আমি,
অসহায় ক্ষুধার্ত স্বজন
এই বুকে আসে আঁধার নামি।
যেন মেঠো পথ হাটে চালের আশায়,
রাহু ঋণ ঝুলে আছে মাথায়, মাথায়।
এই সবুজ কাশিয়া মূর্ছা যায়,
ধূ ধূ মাঠ শুয়ে থাকে শূন্য মাচায়।
আখের ঘুরায় মগজ ভাগ্য পাতায়।
এই ডাকিছে চড়ই পাখি অভাবে,
এ ভাবেই দিনযায় হায় স্বভাবে,
আর খেটে খাওয়া মানুষকে কাঁদায়।

৩২ নম্বর :

মাগো

বড় দুঃখে বুক ফেটে যায়,
স্মরি যখন স্মৃতির পাতায়।

শুনিবে কি মাগো আমার কথা,
কারবালা যেন সে শোকগাঁথা ।

টুঙ্গীপাড়া :

বলো হে বাছা বলো শুনিব আমি
কেমনে সে আঁধার আসিল নামি ।

৩২ নম্বরঃ-

তবে হে শোন দিয়া মন তখনও রাত
জাগে নি পাখি, পনেরই আগস্ট প্রাতঃ ।
ঘিরিয়াছে আমায় হায়নার দল আর
বিকট আওয়াজে উঠি কাঁপি বার বার ।
বুঝিলাম এ আজরাইল এসেছে ঘরে,
ভাঙ্গিতে বুক হাজার বছরের, করে-
হরণ, নিতে এসেছে ঘৃণ্য হায়না দল,
অমূল্য ধন হায় চিরতরে করে ছল ।
ফোন করে বিবেকের দরজা পেলাম না খোলা,
যন্ত্রণা স্মৃতি বুকে এ জাতি আজ আত্মভোলা ।
রাসেল বলেছে মেরোনা আমায় মেরোনা হায়,
পামর সেনারা হেঁচড়িয়ে উঠায় দোতলায় ।
ব্রাশ ফায়ারে নেভালো রাসেলের জীবন দীপ,
শেখ কামাল দেখে বাড়িতে ট্যাংক লরী জীপ ।
একি হলোরে! অন্তঃকণ্ঠ বউ বুলেটের মুখে,
অসহায় সবে মুজিবের শয়ন কক্ষে ঢুকে ।
বাবা, বাবা, ছেলে বউ বিচলিত প্রশ্ন করে,
রেনু মা ছুটে আসে মাতম করে জাপটে ধরে ।
কান্নায় জগৎ মুহ্যমান তবু পশু দল,
উল্লাসে,পায়ে দলে নির্মল অশ্রুজল ।
হায়না দল 'দ্রুম' 'দ্রুম' গুলি করে ঢুকে ঘরে,
লুটিয়ে পড়িল বংশধর, খুনীর কামড়ে ।
বঙ্গবন্ধুর রক্ত ছুটে সিঁড়ি ভাঙ্গলো,

পবিত্র দেহ আজ ঐ পতাকার রঙে রাঙলো ।
হায় মুজিব, হায় মুজিব করে বিলাপ বাংলার জান,
তরুলতা প্রাণীকূল প্রাণহীন আজ জাগে মহাশ্মশান ।
দিশেহারা নদ-নদী-সাগর ঐ উত্তরের গাড়ে পাহাড়,
গেল ঝরে পুষ্পরাজি, সরে গেলো হাত দুঃখী দয়ার ।
মেহেদী হাতে নববধূ নিস্তেজ আহারে নিদা যায়,
রক্তে ভেজা মানবতা মুক্তিসেনা পড়ে শিকল পায় ।
সন্ন্যাসীর তপোবনে উল্লাস করে ঐ পামর অসুর,
ঘরহারা নারীর লাজ টানলো বুক লজ্জা সমুদুর ।
কোন্ জালিমের তপ্ত হাতে গেল গলে এ জাতির মান,
হায় মুজিব, হায় মুজিব করে বিলাপ বাংলার জান ।
কি নির্মম পরিহাস চাঁদের জোছনা নেই, স্নান রবি,
হায় কাঁদতে কাঁদতে বুক জড়ায় ধ্যানী মুজিবের ছবি ।
কি হলো গো বুকের মানিক কি হলো কাঁদে চন্দ্রিমা বুড়ি,
এখানে ঢলে পড়ে বিশ্ববিবেক শান্তির জুলিও কুরি ।
হায় মুজিব! হায় মুজিব!!
হায় মুজিব!!!

১৯.১২.৯৭

বাহরামখান পাড়া

মাটি

আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি সদা সূর্য কিংবা মেঘে,
উদ্দীপিত স্নায়ু অগ্রহী মন ফসল বুনে স্বপ্নে জেগে।
বুক চিরে লাঙ্গল ফলা দেখে জগৎ কাদাময় রক্ত,
তারপর সুখ কই বুকে পাথর বাধানো রাস্তা শক্ত।
কোপায় সন্ত্রাসী শরীর হই নির্মম হাতে জলাধার,
অনাদর অনাহারে হই বন পাই না খুঁজ চাষার।
কখনও ডুবে যায় দালানে আমার সন্তা, মাটি নাম,
মানুষ নামের কীটেরা মাথায় দাঁড়িয়ে দেয় না দাম।
শস্য ব্যাধির আক্রমণে মুখ পুড়ে যায় ঔষধ কই,
পুড়ে থাক সবুজ চাদর ঐ ন্যাংটো শব-পড়ে রই।
সেই আদিম গ্রহ সৃষ্টি লগ্নে ছিল বড় ভাল সময়,
ছিলাম বিকশিত কুসুম ঘোষিত হত আত্মার জয়।
দিনে দিনে আজ পরাভূত আমি, অনাচার গ্রাস করে,
হারালাম সরল স্বভাব, সভ্যতার নিদারুণ ঝড়ে।

১০.০১.৯৮

বাহরাম খান পাড়া

দা-এর দরকার

আমার প্রচুর দা-এর দরকার
দেখুন প্রচণ্ড লোভে ভালটা কাঁপে জ্বরে,
সইতে পারিনা যে সংসার ভার
এখন পিছু হটে সত্য অসত্যের ভরে ।

আমার প্রচুর দা-এর দরকার
কেটে ফেলব দুর্বুদ্ধির হাতটা,
কেটে ফেলব দুর্মুখ টেলিফোন তার
জ্বালিয়ে দেবই অশান্ত শ্রেনির ঝাপটা ।

আমার প্রচুর দা-এর দরকার
জনে জনে হাতে হাতে নীতি-দা দু'টা,
কুপ্রবৃত্তি ধন বিষ কাটালীর ঝাড়
কচুকাটা দে, মরুক ব্যভিচার, সাপটা ।

১৫.০১.৯৮

বাহরাম পাড়া

কসাই

শয়তান কসাই হৃদয়গুলোকে হত্যা করে,
চুপচাপ ছোরা হাতে নিরুদ্বেগে পড়েছে সরে।
কুচিন্তার কাক কুকুর যেন সোল্লাসে মাংশ খায়,
কোথা উড়ে গেছে জীবন মৃত্যু দ্রুমশ মুক্তি পায়।
শীতাত্ত বাতাস কামরায় নিঃশ্ব চামড়ায় কানে
কুয়াশা শান্তি চাদর ছিঁরে যায় সূর্যের টানে।
ভারী দুঃসময় আত্মার এখন মাংশাসী মানুষ,
নিলাজ আত্মহে চেটে খায় সকল অনাচার ফানুস।
বিস্ময়ে তাকাই মহত্ত্বের টুকরো শাদা মেঘে-
উদার আকাশ কেনই বা যায় না একটু রেগে।
কেন বুকে লালন করে গোধূলি শাস্তি রক্তলাল,
অগ্নি বর্ষণে মেটায় না মনের দুঃখ খেদ-ঝাল।
আহা ফুলের মেলায় ফেরেছা যেন স্বর্গীয় কসাই,
ভালবাসার ছুরি দিয়ে করো না সদা হৃদয় জবাই!
পালাবে দূষিত নিঃশ্বাস রক্তে ভিজে সব দুর্বাঘাস,
হোক না ধরণী ফের সুরের কসাইখানা সুখাবাস।

১৭.১১.৯২

বটতলা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

আহত হৃদয়

আষাঢ়ে মেঠোপথ কাদাময় আহারে যেন একটুখানি,
নেই জো দাঁড়াবার টক দই সাজিয়ে রাখে কে জানি ।
দাঁত খিঁচে আসে তবু খেতে হবে হয় যেতেই হবে,
সফল ছা-পোষা ঋণের বোঝা টেনে চলেছি নীরবে ।
জোড়া তালিতে আর কত চলা যায়, কত চলা যায়,
তাকালে দুনিয়া অন্ধকার ভেসে যায়, কুরে খায় ।
গেল যৌবন কৈশোর আহত পাখি বার্ষিক্য এসে,
কবরে টানে, মাথাভরে গেছে দুঃখের পাকাকেশে ।
মিয়া ভাই গঞ্জে গেছে পথে জানি কে দাঁড়ালে নিকটে,
ছুরি মেরে খতি নিল, ভাই পড়ে আছে গরু শকটে ।
থানা পুলিশ, চুপ, ঐ হেতারা আদিম সমাজে থাকে,
মিছে নীতি মিছে শাসন নিরাপদে কে প্রাণ রাখে?
ছোঁড়াটা যায় না স্কুলে, আমার মত মূর্খের শিকার,
ধরে টেনে দুশ্চিন্তা গ্রাস করে মানসিক বিকার ।
রৌদ্র-বৃষ্টি সমান বুঝে এই মন যে বিদগ্ধ কত,
কাজ নেই যাহা পাই তাও জোটে চেষ্টা করে শত ।
এর কি নেই কোনই বিবর্তন, নেই কোন শেষ ?
ইচ্ছে করে সংসার বেড়া ভেঙ্গে থাকি আমি বেশ ।
স্নেহ কিসের ছাই, কিসের ভালবাসা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা,
থাক ছুটে যাই শহরে বইয়ে দেব উন্নতির বন্যা ।
আহারে সেখা গিয়ে দেখি গাড়ি বাড়ি নারী ঠাসা,
রাজপথ আমি মানুষ কচুরীপানা যেন জলে ভাসা ।
চালাতে গিয়ে রিকসা গাল খাই পয়সা নাহি পাই,
হাবা গেঁয়ো খুঁজি খুপড়ি ফের দিনের কাজে যাই ।
দিন যেতে যেতে আমি হয়ে উঠেছি সাহসীমনা,
কথা পড়ে না মাটি, ঝেড়ে ফেলেছি কান্সালীপনা ।

বুঝি শিক্ষিতের অনাচার, বুঝি জীবন কাহাকে বলে,
লাথিটির পালটা লাথি আহত হয়ে পড়িনা চলে।
যেদিন আঁতুর ঘরে এসেছি স্বর্গ হতে খসে পড়ে,
আহত হয়ে কাঁদি চিৎকার দিয়ে বজ্রমুষ্টি ধরে।
বাঁচার মত বাঁচতে হবেই এই জীবনের ভূমি চেষ্টে,
হৃদয় যদি আহত থাকে জীবন কার আসে বশে?

২৬.১২.৯২
বালুরচাঁর/বক্সনগর

কারণ

নদীর সাথে জলের চলতে তো
হয়না মোটে কষ্ট,
ঘর মুখো মন থাকলে নারীর
হয়না মোটে নষ্ট ।
আহা পেটের বেরাম হবে বলে
ভাত কেউ খায় না?
ওই হাঁসের খেলা পানির সাথে
পাখনা পানি পায় না ।
গরুর পালে গরু যাবে তাই না,
বাঘের সাথেই বাঘ,
মানুষের সাথে মানুষ মিললে
হায় মনে পড়ে দাগ ।
মানুষ শুধুই দাপট দেখায়
তুলিয়া ধরে অস্ত্র,
হায় খুন করে তৃষ্ণা মেটায়
রক্তে ভিজে বস্ত্র ।
আকাশ দেখে পানির ভেতর ঐ
পাতাল দেখে আকাশ,
বাতাস দেখে গাছের শরীর ঐ
গাছ দেখে বাতাস ।
পালের সাথে নৌকা মিলে তাই
নৌকার শোভা পাল,
রাগের মাথায় করো না কিছুই
বড্ড লাগবে ঝাল ।

কেন এমন হয় গো সাথী ছাই
চললে তোমার সাথে,
দিন যে আমার হল রাত হয়,
কিইবা আছে রাতে ।
বাগড়াটে নয় কেউ, আমি শুধু
করি এখন বারণ,
হিংসুটে মন যুদ্ধ সব লাগার
জানবে মূখ্য কারণ ।

১২.০৪.৯১ নবাবগঞ্জ, বটতলা

প্রিয়তমা, তুমি

-(আনার কে)

প্রিয়তমা, আবেগ উদ্বেল কুঁড়েঘর-

অশ্রু ফেলে জানোয়ার ইমারতে, কষ্টের বিছুটি লতা

অর্থের লোকারণ্য জ্যামে-তবু খেয়ালি সাবলীল

চেতনায় ডাকতে ইচ্ছে করে,

কণ্ঠের বাঁশি কি ছুঁড়ে ফেলবে?

তোমার আঙুলি ঠুকে ক্ষুধার্তের কলিজা আর-

স্বরেও সুরে নিঃসরণ করে ভেজারক্ত কান্না ভয়ংকর

হারমোনিয়াম, শাদা বোতাম যে আজরাইল

কথার প্রজাপতি উড়ে যায় সুরের নীলিমায় আমার

ভাবনার পাখিটা শিস দিয়ে যায় গোধূলির হাওয়ায়

সারাদিন খুনী বেদুঈন-পথচারী পদচিহ্ন ঐকে রসাল

তনু করেছে বিস্কু-আচ্ছা বলো আমার হবে?

পশ্চিমাকাশের রক্ত লাল আবীর মেখে উড়ে সে ধূলাবালি

নেশাচুর উত্তরীয় সঙ্গে করে ছুটে অজানায়

আমি ধাওয়া করি পিছে-ফিরি হয়রান হয়ে

একসময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়-সারারাত ভরে,

কবিতা-পানির প্লবনে সয়লাব দুনিয়া

পলি জমে জমিনে ভালবাসার ঘাস হয়

আমিই তো সবুজ ঘাস-

ভালবাসার ঘাস ফুলে তোমার খোঁপা সাজাই

আদ্যোপান্ত পুরোটাই কবিতা-প্রিয়তমা তুমি।

প্রিয়তমা হারিয়ে গেছ দিল দরাজ ছেঁড়াকাথায়

বহিবিহীন চুলার অতপ্ত পেটে অনাহারী সাধনায়

গরীব দেয়া জ্বালার দৃষ্টি ছড়াও অনাথের শরীর

বস্তি, ষ্টেশনে উলঙ্গ ক্ষুধার্ত মানুষের পিঠে-

আগ্নেয়গিরির বমিতে উঁচু নিচু হোক সমান সমতল

তুমি অরণ্যের তপ্ত আঁচের আদলে ভস্ম কর মাংশ

যেমন আমার কলম মুখ গিলে আপোষহীন

বিষাক্ত অক্ষর দ্বিধাহীন।

দেখো দূষিত নিঃশ্বাসের কারা দেয়নি মানবতার

লাল ফিতে মুক্তি
অথচ চেয়ে আছে জনতার সমুদ্র সৈকত
অনাগত শিশুর আঁতুর ঘর
ফুলের সুরভি ভরে আসা সুরধ্বনি
আশায় পিপাসায় দিন গুনে
কখন এক মুঠো গান জ্বালিয়ে দেবে পশুত্ব
কোন শিল্পীর বাসর বিতান প্রতিবাদ দুর্গ।

২৬.০৮.৮৮

জাতীয় লাইব্রেরী, ঢাকা

অস্ত্র হাতে

স্বপ্নচারী. স্বপ্নচারী, ওঠো না ওঠো ঘুমের বোরাকে ওঠো,
বলো-আলম এনেছি দেখোনা এনেছি ছিনিয়ে খড় খুটো ।
ছিল যা ধন আমার হেঁসেলে নিবি নে নিবি নে তবে আর,
নাহি চাস যদি হৃদয় খুলে আমি দেখাবো না বার বার ।
দোস্ত অরুণ, তরুণ এসো হাত ধরি এসো, এসো জ্বালাই,
নাহি ডরি রোগ শোক, বাজ্রাবাত যত অলক্ষুণে বালাই ।
ঠাই চাই ঠাই চাই চাই, চাই সংগ্রাম চাই বাঁচিবার,
আর কিছু নাহি, নাহি কিছু আর নাহি ভুবনে যাচিবার
আর যদি নাহি দিস মাগো- ভাত আর ফেনা যাবই রেগে,
লুটাব দেহ ধূলিতে ছুটিবই ক্ষুধার স্বর্গ রাজ্যে বেগে ।
ঘূণীঝড় উড়াল দেবই শন্ শন্ শন্ ভাসিব সব,
নাচব নাচব আপন ইচ্ছায় তুলি অটুহাসি, হেসা রব ।
মাগো আমায় খেতে দেবে কি না বল বল ত্বরা করে বল?
না রেখে ভাত ওরে পাগলি ক্ষুধার্তের সাথে করিস ছল ।
দেখেছিহু ভাল ছেলে ছুটল অস্ত্র হাতে দেখ চেয়ে দেখ,
ঝরাবো রক্ত পাবো টাকা করিবই কপাল অভারটেক ।

১৯.০২.৮৮ আগলা, ঢাকা

দুঃসময়ের সন্তান

পিঠের ব্যথা রৌদ্রোজ্জ্বল নদীপিঠে আছড়ে পড়ে যেন সম ব্যথাতুর,
এখানেই জন্মেছি এই শ্রোত বটবৃক্ষ পাশে মাঠ সোনার দেশ মোর।
যদি জীবনের গতি থেমে যায় প্রায় বাঁচি কাঙ্গাল সম কচুরীপানা,
বহর ঘুরে একদিন আসিবে তুম্বার আষাঢ় সম্বল সেই আশাখানা।
ইচ্ছে করে না আমার ও সব আর, ভাবি ভাল লাগে দেখতে শুধু টাকা,
কবে আসিবে রকেটের মত দ্রুত টাকা আমার কুকাম পড়বে ঢাকা।
আমার আশপাশ সব গিয়েছে দূর সৌদি-কুয়েত-কাতার আবুধাবি,
আছিপড়ে বৃক্ষডালে টিয়া কি দাম আছে পকেটে নেইতো টাকার চাবী।
হালগরু-নৌকা বিক্রি করিয়া বিদেশের ফেরী এবার হব পার পণ,
বাবার আকুতি কোথা যাবে, আদম বেপারী মার দিলে কি হবে তখন?
বুড়ো ছেলেটা নিয়ে পারি না আর-যতসব অলক্ষুণে চিন্তা কেন করে,
এ সাদাসিধে জন রপ্তানী বেনিয়া জাতি বনেছি কি হবে অতীত ধরে।
এখানে আসিত বর্গী ইংরেজ মারাঠা পাঠান মুগল আরবী বলি,...
ভালা বাসা পেয়ে লাখি মেরেছে শান্তি ঐশ্বর্য তারা দু'পায়ে গেছে দলি।
এখন দেশ ভিখারিণী সম দু'হাতে কষে ধরেছে ভিক্ষার ঝুলি-তাই,
প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বে মাথানত করে ভিক্ষা নেব দুঃখ করে লাভ কি ছাই!
কে আছো এমন রচখে দাঁড়াবে খাটো নিজের দেশে দাও মেধা-শ্রম-ঘাম,
বিশ্ব সভায় দুঃসময়ের সন্তান লিখিবে নিশ্চয় স্বর্ণ হরফে তোমার নাম।

নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ১৫.১০.৯৮

হারানো বিজ্ঞপ্তি

বন্ধুরে

আমার দুঃখ হয় বলিকারে,
আমার মন আমারেই মারে,
বিষয় নেশার ধাঁধায়।
অবাধ্য শরীর পুত্র যেমন,
আমার মন কাঁদায় তেমন-
সোনার হিসাব ভুলে হয়েরে
তামার সাধন সাধায়॥

বন্ধুরে

তুই আমারে বইল্যা দেনা,
লোটা বেইচা বাওয়াশ কেনা,
আমার কি আর সাজায়।
এমন দুঃখী কে আর আছে,
মন নাই যার নিজের কাছে,
হল্লা কইরা দাঁড়ি পাকায়
প্রাণপাখি তার খাঁচায়।

১১.১১.৯৭

বাহরামখান পাড়া

বলপেনের অভিযোগ

বলপেন অভিযোগ করে
রক্তাক্ত মানবতা ভাড়াটে ঘরের তাকিয়ায়
শাদা কাগজে মুখ রেখে, কাত হয়ে
সুন্দর পৃথিবী অসুন্দর হলো কেন?
আদ্যোপান্ত নির্ধুম রাত্রি পার হয়ে
যদ্যপি হিরোশিমার কথা ভুলে গেছি,
তারপরে ক্ষেপণাস্ত্রের মুখ তাক হলো আমার দিকে
সুন্দর সন্তানের মাথা নিমেষে গলিত লাশ হয়েছে।
অশ্রু মায়ার বুক চিরে ঝরছে
তপ্ত মরণতে চোখের ছানি
আর্দ্র ঘুমোট আশ্বিনের দুপুর ঝাপসা দেখায়
কবে জানি মানবতার সবুজ পৃথিবী হয় ধূ-ধূ-ধূ
বিরান প্রান্তর।
বলপেনের সূচাগ্র মুখঃ প্রতি দিনই চুষে
খাচ্ছে অস্ত্র চুক্তির শাদা কাগজ।

২৫.০৯.৯০

কাশিমপুর, নবাবগঞ্জ।

এখন আমি অস্পৃশ্য

সহসা স্বাধীন সত্তার বুড়িতে রৌদ্র ঢুকে গেল

অন্ধকার কীট কোথা যাবে?

মিশে গ্যাছে রক্তে শিরায় শিরায় মজ্জায় ওরা,

এখন আমি অস্পৃশ্য

নৈমিত্তিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত এখন সেই

আদিম কেশরাজের স্বভাবে সবুজ পাতার চিৎকারে,

বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ আর্দ্র হচ্ছে সহসা কোথাও কোথাও হচ্ছে

বৃষ্টি-ঝড়-টর্নেডো বিশাল পৃথিবীর বাটি উপুড় হয়ে গ্যাছে,

সিক্ত এখন স্বাদের বুলে উর্বর মাটি আর বিজ্ঞানের দু'হাত

দিয়ে উজাড় করে দিচ্ছে তার প্রেম আমার স্পর্শে সেই

মাটি সেই জ্ঞান কলুষিত, এখন আমি অস্পৃশ্য।

অফিসের ফাইল মাঠের ফুটবল গিল্লীর শাড়ি বাবুর খেলনা

যখন আমার নেশায় তাড়িত হয় কল্পনার এক চিলতে

মাদকতায় যখন স্পর্শ করি ওরা হয়ে ওঠে ঘৃষ

দুর্বিনীত, পরকিয়া, মায়াহীন আহা সেই আমি এখন অস্পৃশ্য।

কোথা যাব কবরে শ্মশানে কিংবা জমে থাকব মমিতে?

ভয় পায় মৃত্যু জখম এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা

আমার চোখ কান মন মগজ এবং দু'হাতকে-

যেমন পুলকিত হরিণ বাঘের হ্রাণে পালায়।

শেষমেশ নরক শিহরিত আজ যে হারে এবং যেভাবে

আগাছা দখল করছে পৃথিবীর বাগান

যুদ্ধ এবং তাণ্ডবতায় আত্ম হত্যা করে শূন্যে বুলে

থাকতে চাই হয়ে বিরাট প্রশ্ন বোধক,

এখন আমি অস্পৃশ্য।

০২.১০.৯৭ বাহরামখান পাড়া

আমি লাশ বলছি

ফুটিয়া সৌরভ না ছড়াতেই ঝরিয়া গেল
অকালে একটি ফুল; কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড
ঝড়-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ নিষ্ঠুর বাতাসের দাপটে,
এক ঝাঁক কাকের কর্কশ ডাকে দুঃসংবাদ বয়ে
আনলো কিসের?
একটি লাশের --নৃশংস হত্যার অসহ
নির্যাতন-মৃত্যুর অসময়ে।
বৃদ্ধ পিতার হৃদয় নিংড়ানো হাহাকার
ভাই বোনের কান্না, সংবেদনশীল মনের
যন্ত্রণার দাবী
তুমি এভাবে চলে গেলে?
কালপতাকা পতপত্ উড়ছে, বলছে
লাশের কথা, সুপ্ত প্রতিভার কথা
অকালে ঝরে যে হৃদয়ের আকুল বেদনা শত ধারায়
উৎসারিত করে--
শাদা ধবধব্ কফিন জড়ায়ে গায়ে
আমি লাশ বলছি
এসেছি-- চলে গেলাম
পৃথিবীবাসী দেখো, পাপ-ঘাতক-রক্তাক্ত খেয়াঘাট
শপথ-নাও প্রতিবাদের মুষ্টি ছুঁড়ে বাতাসে।

২০.০৭.৮৬

আগলা, নবাবগঞ্জ

নিৰ্বাচন এলে

আজি কাৰ্তিকৈৰ সকাল
হলুদ আলোয়,
ডুবেই গেছি বিবেকহীন
তমায় সমাজে॥
এভাবে ওভাবে ভুলিয়ে
করি ছিনতাই
জয়ের মালাটা, আর
ডরাই নমাজে॥
লাখিটা মারিয়া কপালে
বেকুব চাচার,
চুরির সুবিধায় মত্ত
কাৰিখায় কাজে ।
চলছে দিন সুখ কত-
চলুক না আহা !
নিৰ্বাচন এলে পড়ি
সীমাহীন লাজে

০১.১১.৯৭ বাহরামখান পাড়া

জ্বলন্ত হারিকেন হতে চাই

আমি যদি জ্বলন্ত হারিকেন হতাম!

নির্ভেজাল আলোক বিচ্ছুরণ করতাম!

আমাকে দেখতে পেতো সবুজ ঘাস মলিবাঁশের বেড়া
ঘরের খুঁটি দূর থেকে টর্চ হাতে ক্ষেতের আল দিয়ে
যাওয়া রহিমউদ্দিন, দেখতো বেড়ার ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে পড়া
আলোক কণিকায় করত বসত

জীবনীশক্তির সলতে পুড়ে দেখাতাম পথ, অন্ধকার হতো
আমায় ডেকে যাওয়া সাথী-এসো দেখো দূর থেকে
কেমন সুন্দর আমি

কথা বলতো সিলভারে বাতি তার দিব্যচোখ দিয়ে
দেখে বলতো আমার সোনালি রঙ সত্যি চমৎকার।

ব্যাঙ ডেকে বলতো চোখে আলোক খেয়ে ভয় পাই না মায়া
বিস্ময়কর আলোক কতদিন হতে চেয়েছি একটি হারিকেন!
হাত-পা-হৃৎপিণ্ড-মস্তিষ্ক চিমনি দিয়ে দেখি একটি নতুন জীবন
আহা মধুরতর পুরুসাক্ষ্যবাতির অভিজ্ঞতা
সবুজের মখমল ধানক্ষেত

আমাকে একটু আরাম দেবে?

ভাল করে দেখে নিতে চাই ছোট বাবুর নিষ্পাপ মুখ
যুবতীর ডাগর চোখ, লজ্জা পাওয়া সুটৌল স্তন
সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া খোশগল্প আর খোকার
স্কুলের পাঠ পড়ে যাওয়া----

তারপর না হয় আমি হারিয়ে যাব বাতাসে
আমার নিঃশ্বাস শেষমেশ বিশ্বাস ভঙ্গ করে
আমার ভেতর থেকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিবে
প্রাণের জ্বলন্ত হারিকেন।

২০.০৩.৯৬

বাহরামখান পাড়া

অন্ধকারের জীবশা

বিরাত আকাশে অসাধ্য মানব চেষ্টার মেঘ
কখনও বৃষ্টির ফোঁটা অশ্রু বেশে ঘরের
চালে গড়িয়ে পড়ে কপোলে-
কপালে দুশ্চিন্তার চামড়া রেখা পায়চারী করে
কি করে চলবে বারান্দা চৌকি ও একটি-
পিঁড়ির খোড়া মুরগী সংসার
চতুর্দিকে দেনাও ছা-পোষা পাড়া গৈয়ো
কূটিল পরিবেশ মনে হয় সমগ্র পৃথিবীর পা
জমিনে ঠাঁই পাবে না রৌদ্রে ঝলসে গ্যাছে
ইচ্ছেগুলোর হাত--
ওখানে একটি পয়সারও গাছ নেই .
কারও মুখ হা করে গিলছে গলির কুকুর ।
লজ্জা নেই গরুটার
সে পানতা ভাত-নুন-কাঁচা মরিচের খড় খায় সকালে
সারা দিন হাভাত হাভাত করে, ঘুমায় গোয়ালে
ভারী সুন্দর ছবি এই ঘরে ঝুলানো কালক্রমে ঝাপসা হয়ে
আসে দু'চোখে নিথর পা অবশ হাত নিন্দনীয় কুষ্ঠ রোগী
বসবাস করে না কলমী শাখে-প্রজাপতি বিষখেয়ে
ধরা পড়ে সময়ের বালকের হাতে ।
এক দুই তিন করে ষাটের কোটায় গিয়ে মরে উবু হয়ে
থাকে রাণীক্ষেত রোগে মরা মোরগ
যৌবনের বুট পালক কামড়ে কামড়ে খায়
পিঁপড়া বড় লোক, কাদা পানির রাজত্ব শেষে ক্রমে
পঁচে হচ্ছি অন্ধকারের জীবশা ইতিহাস ।

০৫.১১.৯১

বাহরামখান পাড়া

এক কবিতার কবি

মাথায় এখন ভীষণ চাপ
দেখে যত মিথ্যে কবি,
সাধ জাগে কার কবি হওয়া
কাব্য নয় সম্ভা ছবি।
বলছে কি যে বুঝা ভার সেই
শব্দ ক'টা রপ্ত করি,
খাতার মাঝে বেল ভাঙ্গিল কে
কশে খাতা গেল ভরি।
এক কবিতায় কবি হলাম
লেখা বটে জুড়ি নাই,
পাবেই বটে নোবেল প্রাইজ
এটা সেরা লেখা তাই।
সে যে ভাষা মায়ের ধণ্ডিছেলে!
কত নাম আনে বয়ে,
সে যে বিশ্ব কবি বনেই যাবে
এক লেখা কবি হয়ে।

২৮.০৩.৯১ নবাবগঞ্জ

গুণ

আমাকে নিয়ে তর্ক করো না
সেই কবে সৃষ্টির উষালগ্নে এসে গেছি
পৃথিবীর জলস্থল অন্তরীক্ষে আজ কাল পরশু থাকব
অনিন্দ্যসুন্দর বুলবুলির পুচ্ছে জিগা দানা খেয়ে
শালিকের ডালে ঠোঁট মোছা, হাঁসের পানিতে ভাসা
চৈত্র মাসে প্রাণ ভরে গোসল করা প্রজাপতির ডিগবাজী
খাওয়া-ওসব হয়ে ।

এক সময় আন্ধার রাতে দেখতাম প্রজাদের অবস্থা এখন
রাজপথে দাহ করা ভ্রুশ পুত্তলিকাই আমি ফাঁসি মঞ্চে
দ্রোহ ও দীনতার কারিগর বলেই বানিয়েছি একপাল দাঁতাল
শুয়োর-এরাই কামড়াবে নিদ্রিত গৃহবধূর শ্বন এবং
শানকিসমেত বৃদ্ধ ভিক্ষুক ছিটকে পড়বে
ডাষ্টবিনে বন্দুকের গুতোয়

আমাকে নিয়ে তর্ক করোনা
লঞ্চটি কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বাঁধা পড়ে আমার ঘাটে
আজ কাল আমার ভারেই নুইয়ে পড়ে দিগন্ত
আমার ঘাড়ে চেপে সে হয় খেয়ালী আমার দুই বাহু প্রসারিত
মনে হয় সাপের বিষ থলি; লাশের গন্ধে ভরে যায় সভ্যতার নাক
মিথ্যে বেসাতি হয় আমার মুখরোচক গল্পের চানাচুর
আমাকে দিয়ে খায়েশ মিটিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না
“বুলেট ঝাঁঝরা করে বট পাতার কলিজা
খুব সাধারণ আয়ুর প্রজন্ম কোকিল, বসন্তে আসি
বর্ষায় চলে যাই, সময়ের গায়ে সুর তুলি
কারু ভাল লাগে কারু লাগে না ।
তাহলে কি আমি রক্ত ঝরা কণ্ঠ সুর?
আমার সূর্যটা যদি চলে যায় আর গ্রহে
জমিন কি হবে না হিমশীতল?
অন্ধকার কি করবে না গ্রাস চোখের কর্ণিয়া হৃদয়ালোক?
অতএব আমাকে নিয়ে তর্ক করো না ।

১৪.০৪.৯১

নবাবগঞ্জ

হৃদয়চারী (দ্বিতীয় খন্ড) ১ম খন্ড পুণ: প্রকাশ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পৃষ্ঠা-৭০৭

দিব্যচোখ

(শফিউল আলম খান কে)

আমার চোখ চশমা টেলি-মাইক্রোস্কোপ রাডার
এবং এরপর যা- আবিষ্কৃত হবে-
আমার কল্পনা জ্ঞান-জ্ঞানভাণ্ডার সর্বশেষ
এবং এরপর যাহা মগজে রবে-
তবৎ আগুন জল মেয়ে লোকের অলংকার
এবং এরপর যত স্বামীর গেহ-
নিরুদ্ভাপ, তাল পাতার সেপাই তুচ্ছ সবকিছু
পথে পড়ে থাকা কাঙ্গালের শব্দ দেহ ।
আমার হা-এ ঢুকে পৃথিবী, স্বর্গ, নরক জ্বলন্ত
দ্যুতিময় ধূসর কবিত্ব রংধনু,
বিচলিত মন ফিরে আসে কল্পনা ময়ূর পুচ্ছ
বামনের চাঁদ ধরা ভাঙ্গা সত্তা অণু ।
গিঁট খুলে সূতাটার পাওয়া যায় নাটাই তাই
নেশায় পেশায় স্রষ্টার স্বভাব হোক,
সহজ তাড়না কলিজায় গুণ কুসুম ফুটাই
চাই সেই বুকের আরশি দিব্যচোখ ।

১৯.০১.৯৮

লাভলী গেস্ট হাউস, নবাবপুর রোড, ঢাকা

ওম

মাটিতে বীজেরা ওম চায়,
ডিম মুরগী থেকে তা খায়,
ওমে, ওমে প্রেম প্রাণ পায়,
শীত বস্ত্র শীতের সকালে জান প্রিয়া দেয় কি?
কেউ যদি মূক হয় কষ্টে,
সমাজটা যদি ভরে নষ্টে
কুবচন থাকে যদি ওঠে,
বলো প্রিয়া বলো ব্লটিং পেপার চুষে নেয় কি?
ওম দেয় টাকা ধনীলোক,
জ্ঞানী জ্ঞান দিয়ে পায় সুখ,
নিঃশ্বের ওম খুপড়ি হোক-
চাহি ক্ষতি চণ্ডাল চিঙে পায় অপরিমেয় কি?
লেপে ওম পেলে ঘুম পায়,
ওম পানি পেলে সরে যায়,
মনে পাপ এলে পুণ্য হয়-
দূরে যায়, চণা পড়ে পানি থাকে পেয় কি?

১৩.০১.৯৮

বাহরাম খান পাড়া

খোকার রোজা

রোজা দিনে চৈত্র মাসে,
রোজা রেখে খোকা হাসে ।
দুপুর গড়িয়ে এলে,
রোজা ভুলে খোকা খেলে ।
অপরাহ্নে মা'কে এসে
বলে কি যে চুপে হেসে ।
মা সুধায় আড় চোখে,
পেটে ক্ষুধা শুষ্ক মুখে ।
খোকা খুশি সন্ধ্যা হলে,
ওজু করে কুয়া তলে ।
আবু তারে নেয় কোলে,
মিষ্টি মুখে রোজা খুলে ।
দাদু বলে আহা একি!
রাখলেই রোজা দেখি,
খোকা ঘুমে যায় বুঝা,
স্বপ্নে দেখে রাখে রোজা ।

২০.০৩.৯১ নবাবগঞ্জ

রাজনীতিবিদ

মুখের কথায় চিড়ে ভিজে
বল দেখি কার?
কার পাঞ্জাবী দুক্ধ ধবল?
--ভাঁজে বুদ্ধি ধার?
মন্ত্র দিয়ে তন্ত্র দিয়ে
মাঠে দুর্বা ঘাস,
মিশিয়ে দেয় মাটির সাথে
সৃষ্টি করে ত্রাস।
লাল ফিতে কেটে উদ্বোধন
করেন কে বলো,
ঝাঁকে ঝাঁকে মিছিল করেই
কার ডাকে চলো।
স্বর্গপুরী বানিয়ে দেবোই
সভায় কে বলে,
কথার খেলাফে রাজা চেনো
বাস করে দলে।
গুতা মেরে বলদ লেজে
ধরায় কে জিদ,
তিনি আর কেউ নন সস্তা
রাজনীতিবিদ।

০৩.১১.৯৭

বাহরামখান পাড়া

মৃত্যু ঘন্টা

পূর্বাহ্নের শনিবার আসিবে ফিরে আরকি,
এ রোদের লাশ দেখাবে শুধু অমৃতের সাকি?
মানিক জোড় এ জগৎ ও জগৎ ভাল নয়,
আসা যাওয়ার জীবন কেমন ছন্দময়।
সরিষার মত শক্তি থাকিলেও আমি বলি,
সম্ভোগ করে আর সব যাব দু'পায়ে দলি।
অন্তর শিশু-পাথরের মত স্থির দু'চোখে,
বহে গঙ্গা দুঃখে শতকের স্বাক্ষর বুকে
মাথায় মতলব কানে অস্ত্র বান্-বানানী,
পেটে কুখাদ্য-যৌনতায় পশু যায় হার মানি।
তারপর আমিই হব স্মৃতিফলক আর কি,
দুর্ভায়ু ভরা ধরার শেষে খুলিবে দ্বার কি!
যেন আমার আগমনে সত্যের উৎকণ্ঠা,
জেগে দেখে দুঃস্বপ্ন-কানে শুনি, মৃত্যু ঘন্টা।

১২.১০.৯০

কাশিমপুর/নবাবগঞ্জ/ঢাকা

উদারতা, একফালি চাঁদ

আমরা প্রতি নিয়তই আটকে যাচ্ছি,
শব্দ তাড়ানো দূরত্বই চেয়ে থাচ্ছি।
এক গাঁদা সমাজের সংস্কার, অহং
ছিল যাহা মনে অকালে হারালো সে রঙ।
দিন নয় রাত হয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টা,
পেছন দিকে যায় এই স্বার্থে ঢাকা মনটা
মাটির খাটে যাহার শরীর শুইবার কথা,
শূণ্যে, ফাঁসি কাঠে বুলে ঐ বিদায়ী উদারতা।
বৈরী বাতাস যেন ঘর সংসার শরম কাপড়,
আহা নিমেষে করে উদোম,হিয়ে মারে থাপড়।
স্প্রিং টানিলে বড় হয় হায় মনটা হয় না মোটে,
সবুজ রেখেছে ঘিরে অথচ কাক মরা খায় ঠোঁটে
স্বজাতি-বিজাতি, জাতীয়তাবাদ তাকাবরি সব,
মারণাস্ত্র যেন স্তব্ধ করে নিমেষে কলরব।
গিলে খায় গ্রহ সংকীর্ণতার স্থায়ী ঘর বাড়ি,
পাখিহীন খাঁচা হৃদয়হীন নর কাটে যেন আড়ি।
মিথ্যে ভরসা ধারণা ঘনঘটা জাতিসংঘের,
বিশ্বাসী নই আর বাদে কুটিল বিশ্বমোড়লের।
উদারতা, একফালি চাঁদ আসবে মাথার'পরে,
মানুষে মানুষে বুকে বুকে যদি বা জড়িয়ে ধরে।

০৯.১১.৯২

কলেজ মাঠ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

কাব্যত্রু- কাব্যলক্ষ্মীর ঘর সংসার (২০০২-২৩)

জীবন্ত বাস

জীবন্ত বাসগুলো চোঁচাচ্ছে পৈতৃক ভিটে বিচ্ছেদে থেমে, থেমে,
ইস্ অনুভূতির অস্থিরতা নাইছে চর্মলোমকূপ ভরে রোদ্দুরে ঘেমে।
আদুরে ধূলিকণাগুলো উড়ে এসে অগোচরে বুলাচ্ছে হাত মাথায়,
ছুটছে মন দূরে বহুদূরে লিখছে কবিতা বর্ণিল স্বপ্নের স্মৃতি-খাতায়,
আশা-নিরাশা, দুঃখ-সুখ যত কলিজায় ঘুমঘোরে জড়াজড়ি করে,
চেয়ে থাকে অসহায় বাস-বাতায়নে জটলাপাকানো মানুষের 'পরে।
টিকেট অনিচ্ছায় গিলে শান্তি ভরা নর-নারীর আসন-নিশ্চিত মন,
বিমোয় শরীর জেগে থাকে মাথার 'পর সযতনে ঐ থলে ভরা ধন।
এমন করেই চলছে অবিরাম চলছে ফেলে পায়ের বদলে চাকা-পা,
আরও পরে এ পায়ের কী হয়! মর্মান্তিক নাকি আমি না, জানি না।
জীবন্ত বাস আর কিছু সময় পর গাঁ-নগর পেরিয়ে ছুটবে রে কোথা
বহুখন্ড প্রাণ স্ব স্ব ঘরে গিয়ে বহুদূর হতে, বাঁধবে জানি মিলন-সূতা।

নগুয়া কিশোরগঞ্জ ২০/৫/২০০২

কবিতা, কাব্যের ভাব

কোথায় জানি একটু ফাঁক, একটু গোমর,
এই একটু ফাঁক গোমরের নাম কবিতার ভাব-কাব্য,
এই ফাঁকেই শ্রোতৃস্বতীর ফলগুধারা বহে,
বহে ঈমান-একীনের ময়ূরপংখী, ছুটে তটিনী সুনাব্য।
এখানে জীবন অনিশ্চিত, সংশয় বাড়় ঝঞ্জাময়
ঈশ্বর পরীক্ষা নেন বলে থাকে না কেউ, পিছে আগে,
ঈষ্ট বিনে; গায়েব-নাথে বিশ্বাসী ঐ ভাগ্যবানের
শক্তি-পালন-দয়ার মূলে ঐ ঈশ-বাধগ, রহে অগ্রভাগে।

২৪/৮/২০২৩

মীরপুর, ঢাকা

অশান্তির ঘর

ওই টিনের চালার অশ্রু বৃষ্টি শত ধারায় ঝরে,
দেখ বজ্রসম যন্ত্রনাময় মুখরা বাস করে ঐ ঘরে।
শূন্য বিতান মধুময়, স্ত্রীর ঝাঁঝালো বাক্য নাই,
দৃঢ়চেতা চৌকাঠে অনুক্ষণ হাসি দেখিতে পাই।
কপালে ওঠে না চোখ, মলিন নয় দরোজা মুখ,
কাজ শেষে ফিরে, চাই দাঁড়াই, না কাঁপুক বুক।
শুদ্ধ ঘুম শেষে প্রাতে ওঠে নুতন দিনে ফিরে,
কে না চায় সুখে করিবে বাস আপনার নীড়ে।
ঘরকুনো বিড়াল সতত মিঁউমিঁউ করেই যায়,
দুধ না পেলে রাগে অধিকারে আঁচড় কাটে পায়।
বড় কষ্টে এ ঘরে থাকা অবলাকে ভাবিতে হয়,
পাষাণীর 'পর জয় পাওয়া মোটেই সহজ নয়।
নগন্য কারণে শিল-পাটা-হাড়ি নাকে মুখে ছুঁড়ে,
ভেংচি দিয়ে কথার জ্বালা বাড়িয়ে খাড়ায়দূরে।

করমুল্লী কিশোরগঞ্জ, ২০/৫/২০০২

নরককালের বয়ান

২০২২সাল ২৪ অক্টোবর রাতে আমার
বুকে বঙ্গোপসাগর এসেছিল আর,
এসেছিল দক্ষিণবাংলার নিশাঞ্চল, সৈকত
প্রবল ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছাস হবার--
পেয়েছিল আশ্বাস, ভারতীয় ভূবেনশ্বর
ঘাড় বাঁকিয়েছিল রাস্কুসে তীর হতে
সে কত নির্মম, সে কী ভয়াল! মৃত্যুদূত!
আমার বক্ষ পিঞ্জর চূর্ণী ঘূর্ণী আবর্তে
হাত-পা-মাথা-ধড় ছিন্নবিছিন্ন ছিঁড়ে ফেড়ে
ঐ বিশাল করতল মুষ্টিতে চেপে চেপে,
সে দিন আমি কাঁদতেও পারি নি গো আহ
ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ঘর কেঁপে,
ভেসে গেল কোথা জানি নে ভয়ংকর তমায়,
হাঁস-মুরগী-গরু-বাছুর আমার মা-বোন
পয়োধীর যম-ঘরে বরফশীতল মরণ ডাকে
আমার আত্মা উদাও অজানায়, এ কোন্
স্বভাব, এ বুঝি তোমার নাথ-কুদরত কিয়ামত
হাজির! জগৎ দাঁড়িয়ে! চক্ষুস্থির করে
কিয়ৎক্ষণ! ফের ঘুরিয়ে নেয় মন জীবন যুদ্ধে
আমি তলিয়ে গেলাম সয়লাব জলঘরে।
সেখানে আমার অস্তিত্বের তিলার্ধে ঠায় নিতে
আসা পিপড়ে-সাপ-হরিণ অজানা জান,
ঘিরে রেখেছিল আমার রগ ওষ্ঠ টেনে বাঁচিতে
কিন্তু ভাগ্য নির্মম, তুলিল সব প্রাণ বান।
আমি অসহায় নরককাল দাঁড়িয়ে রইলাম 'থ'
আচমকা জল ভিজে ঘূর্ণীঝড় পুড়া শেষে--
বান্দালী জাতির গর্বিত মায়ের নাড়ী ধরেই,
এই বুঝি তোমার সোহাগী দেশ সর্বনেশে!
দানব ঝড়-জলোচ্ছাস চলে গেছে, চলে যাবে
শুধু তোমার মাতৃ জটর খাঁচায় ঘুমাতে চাই,
আমার সর্করণ চাহনী তোমার কর্নিয়ার 'পর
আবার জাগিতে চাই, নব সাহসে নিই ঠাঁই।

কিশোরগঞ্জ, ২৪/১০/২২

জীবন শিক্ষা-পুঁথি শিক্ষা

ভীষণ তারা করে ফিরছে শূয়োর
ঘুৎ ঘুৎ করতে করতে বর্জ্য চটকায়ে,
উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণবৃত্তি, বনো ঞ্জোরের
ত্রিসীমানায় গেলে দেবে ঘাড় মটকায়ে।
বুদ্ধির তলপিতলপা গুছিয়ে আমি
ধূর্ততা-যোগে ঐ ঞ্জোরের সাথে নেই,
হুকা হুয়া ডেকে ডেকে সদল বলে গা
বাঁচাই চাই মুক্তি, হারাতে চাই না খেই।
কাংখিত মোক্ষম হাসিল শেষে ছুটি
নেব, নশ্বর দেহাতীত হব সতর্ক বটে,
অহেতুক ঝামেলা বাড়াতে চাই না
শান্তিপ্রিয় শিয়াল, যেন অঘটন না ঘটে।
জীবন পাহারায় যারে বসিয়েছি সে
পলাতক, শান্তি-হাঙ্গির বাতিঘড়ে বসে
আমাকেই তাড়ায়, আমি বেঈমানশালার
টুটি চেপে ধরে শেষে যাব বাধা চষে।
আমি অন্ধ নই, বোকা নই, না সাহসহারা
আমাকে পাশ কাটে কেউ, বাস করে
সে বোকার স্বর্গে, আমি হিংস্র সেনা থেকে
রাজা, জীবন গড়েছি তৃণমূল থেকে ধরে।
জীবন শিক্ষা, পুঁথি শিক্ষা দূঁই বুড়ি ভরা
হাত রথ লাগাই শ্রম মনন ঐ পূঁজি করি,
ললাট রাখিব সৌভাগ্য প্রসূতি করে যে
নিরবে নিরবে রাখিব ঈশ-সান্নিধ্য ধরি।

-----কিশোরগঞ্জ, ২৫/১০/২২

জগদীশ ফলান ফলন

অর্থ বিধির আপত্তির মুখে কারুর গোথাস
উদাও, স্বাস্থ্যহানির পরিণতি ডেকে আনে,
প্রাণ তার অস্থিত্ব হারায়, মৃত্যুর ঐ হাতছানি
প্রজ্ঞা-সাহসে কী ফলে সে ও বিধিই জানে।
যমের মোকাবেলা নাকি পণ কৌশলগত অস্ত্র-
ধান, ললাট পরখে চাই ঈশ-ইচ্ছে গো, চাই
জীবন যুদ্ধে অনায়াসেই সহজ সমাধান মিলে
না, দুঃসাহসী অধ্যবসায় চাই, কোথা আর ধাই?
প্রবল যবন-চোখে ফাঁকি আর গুহায় গুপ্ত বাস,
সদ্য ফোরকান পাওয়া নবীর সুল্লাত তরীকা
নবীরে আড়ালের তরে কুদরতী কবুতর বাসা,
করি দুশমন-শিকার নিখুঁজ, ছিঁড়ে ইচ্ছে-শিকা।
ভাবি যুদ্ধ থাক না তোলা, হেকমত বলে তাই,
সদেচ্ছা প্রতিফলন আমলে ফলে নিশ্চিত জয়,
সত্য থাকে গুপ্ত, মা'রেফাত বাতেনে লুকানো,
দিনমণি ছড়ায় আলো তাপ, নিশির হইলে লয়।
অগ্নিকুন্ড নাকি শান্তি শীতল করে খাঁটি ঈশ-ভর
জগদীশ ফলান ফলন, ইব্রাহীম-সুকর্ম উসিলা,
কাফের খাটায় গায়রে গায়ের জোর অনর্থক যে,
মজনু অলির স্মরণে থাকে দেখে এলাহীর লীলা।

-----কিশোরগঞ্জ, ২৮/১০/২০২২

কাব্যলক্ষ্মীর ঘর-সংসার

জেলা হিসাবরক্ষণ আর সমাজসেবার অসহিষ্ণু কে
ঢালে হিসাব উত্তাপ আমার গায়ে,
আমার গা কবিতার অদৃশ্য শরীরের সাথে মিতালী
চাহিলেও থাকে না হিসাবের ছায়ে।
আমি ছাড়া আমার কবিতার পাঠক নেই, নেই আর
কবিরও, কে কই গা ছাড়ার তাপের,
কবিতার উত্তাপ বপু ত্যাগের মানুষ কই, লক্ষ্মণ কই
শীতল ফুরফুরে আমেজ যথা মাপের।
আমার হৃদপিণ্ড হ'তে সাহস-সহায় নিবিষ্ট লক্ষ্যেই
এগিয়ে যেতে হবে, উদ্ধার করতে হবে,
কাব্যের ভগ্ন স্বাস্থ্য, মান নেই বাজারে অবিক্রিত শস্য!
এ কী দুর্যোগে, মুখের স্বর্গ রাজ্যে ভবে!
জন্ম আমার! আমি পাপে ভারাক্রান্ত পাক-সাঁফ পাপীর
চাই গো চাই, যীশুর মত পাপমুক্ত হয়ে,
আর নয়, আর নয় কিছু চাহিবার, কিছু যাচিবার মর্ত্যে
যে, যাব গো ক্রুসিফাইড পাপভার বয়ে!
কাব্য লক্ষ্য পথে অন্যরূপ দানব আসি মন কাড়ে গো
আমি একা বড়ই একা! কবিতা রচি যেই,
কাব্য গায়ে রঙ দিতে পারি নে, ধরনী তলে আসা শিশুর
গায়ে তেল জল নেই, ঐ বাধা পাষাণী সেই।
অকারণ মোর আপাদমস্তক আঁকড়ে, মনোযোগ ছিন্ন
করে, ঘর সংসার উত্তপ্ত উদর ক্ষুধা কড়াইয়ে,
সিদ্ধ কমল কোমল কাব্য লক্ষ্মীর মরণ চায় ফাঁসিকাষ্টে
আমি হাজির হই নি গো কবিত্ববাজী বড়াইয়ে।
এ শুধু ঈশ তরে নিবেদিত নৈবেদ্য, প্রাণ দান পুষ্পার্ঘ্য
যে, প্রাণের আকুলতা অশ্রুজল নিংড়ানো রোধিরে,
যুগপৎ মিলে মিশে মুক্তির লাগি হাত বাড়ায়, কাব্যলক্ষ্মীর
ঘর সংসার করুণা ভিক্ষে করে রাখি বুঝি বোধিরে।

-----কিশোরগঞ্জ ২৮/১০/২০২২

অবিরত শ্রমঘন হই, আমি বিজয় ঝুঁকি বই

ফলাফল জানি না, যবন মোকাবিলা চাই
হেকমতের সাথে, মনে হয় ছল ফোটাতে চায়,
বল্লায়, তার সূচ নিয়ে এগিয়ে মোর চামে
ফোটাইছে ছল, আমার রোধিরে বিঁধেছে হায়।
ভরে বল্লা-বিষে, ফোলে গেছে মাংশপিণ্ড,
কোথা পাব ঔষধ-ওঝা, ঝাড়-ঝাঞ্জায় দয়াল বিধি!
আশা সাহসি কর্ম বর্ম হাতে, বীরমুক্তিযোদ্ধা
মৃত্যু ঝুঁকি তবু ডরায় না অবিরাম যুদ্ধের প্রতিনিধি।
ঠায় দাঁড়িয়ে যায় যে দিকে তাঁর আত্মাহুতি
সোনালী বিজয় আনে ছিনিয়ে বীর শ্রেষ্ঠ মহান বীর
লেগে থাকে অবিরত অধিকারে যেন দ্যুতি!
প্রতিক্ষণ বিন্দু সম কর্মপুঁজি মওজুদ গড়ে ভূধর বীর
পরিণামে স্বর্গ লভে, ঈশ দর্শনজোটে একীন
ঈমানে মারেফাতে শরীফ আরিফ মহান তাপস এই
শিরক-কুফর-মুনাফেক-ফাসেক কোথা হীন
দূরে রহে, বাঈমান অসীম তেজে, কর্মই ধর্ম, সুপথে
সুকর্মই আনে জয়, দেউলিয়া বুঝি আর কেউ,
কাংখিত গুপ্তধন, ঈশ্বর-সোহাগ শ্রমে ঘামে জোটে, ঐ
অকর্মণ্য গুনে বারিধি পাড়ে বৃথা ফেনিল ঢেউ।
দিলে শক্ত মোড়ন ঘোড়া হাঁটে অনুক্ষণ অবিরাম বটে
‘পরে আয়াসে হও সওয়ারী সুখে পিঠে তার,
শরীরের নাম নাকি মহাশয়, যত সহাও তত সে সয়,
বেতমিজেরে চাবকে, চাবকে ভেঙ্গে দে ঘাড়।
তবেই সেই পথ ছাড়বে, হাঁটতে পারবে সরল পথে,
পথের কাঁটা সরালে ফের, নও জীবন গড়বে,
তমার ঘোরে নেত্র নিশ্চভ, সবর শেষে আসেঐ যে
উষার ভাস্কর লও মনোবল, নব তেজে লড়বে।

-----কিশোরগঞ্জ, ৩১/১০/২২

এশক-খুন

আমার বুকের আঁধার কেটেছে, লেগেছে
হলুদ রোদ্দুর, এখানে ইজ্জতের মীনাফী,
জল সম নরোম মন ছুঁয়ে হংস ঋষির ঐ
কলিজার ভেতর দিয়ে নাথের দয়া মাখি,
শান্তি স্বর্গ পেলাম লয়ে সিরাতুল মুত্তাকিম,
সম্মুখে যাই আয়ু কাটাই; ক্লান্তিরোধক ঘুম
বিশ্রাম সম হেঁটে হেঁটে আমাকে লয়ে যায়
আর আমার শিরায় শিরায় প্রার্থিব ওম,
আমার নির্লোভ চেতনার মনুজে বনরাজ
গর্জন দিলে বারিধি গর্জে ওঠে, বাড় ওঠে,
অশ্বশক্তি আছড়ে দেয় ঐ আস্থার আকাজ।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি বাড় শেষে মরা খড়
সম, তছনছ সাজানো বাগান মনোহর বন
ঘর দরোজা আরও কত কি! আমি শাদা
শান্তি ঘোটকে চড়ে দিক বিজয় ঈশ-ধন,
ফিরিয়া পাইতে আত্মার আলো, স্বর্গ সুখ
আদম-হাওয়ার মতন কৃতপাতক নিষ্কৃতি।
আমার রোধির রিপু পুড়ে পুত চাই অদম্য,
অধ্যবসায়, অভরণ জড়ায়ে, মনুষ্যত্ব বিকৃতি
লোপ পাক, সাক্ষাৎ দরবেশ যেন জ্ঞানে গুণে
মাটির বপু যেন দ্যুতিসম পুত পরশ পাথর,
এশকে এলাহীর মনোরম তারা, এশক-খুনে।

-----কিশোরগঞ্জ, ৪/১১/২০২২

সুখ দুঃখের পালা বদল

বাবা নেই, মা নেই পিছে ধরে, নিলে উলাউড়ায় টানি,
আমি আছি পড়ে, নাতি হাতে নানী চোখে পড়া ছানি।
কোথা যাই, কার কাছে চাই দুনিয়া হারার নিঃশ্ব মাঠ,
ধূ ধূ শাদা- নেই তরলতা, নেই আহার, শুইবার খাট।
পথ পরিবার, পথ সম্বল, দয়া ভিক্ষে করি সারা বেলা,
নাতি মোর 'খাতি চায়' পেসাব-পায়ু কই করি মেলা।
রেস্তোরার বাসি-পাঁচা তুলে নিই মুখে নষ্ট-খারাপ পেট,
তারপর থালা হাতে বসি, শহুরে পথে করি মাথা হেট।
চাহি আনাকড়ি, ধূলো ভরা গতর পরিধেয় খাট পেতে,
এ-ই কী জীবন? এর নাম জীবন? মনু রত সুখে মেতে।
হঠাৎ নানী অসুখে পড়ে, অজ্ঞাত এ জ্বর একশত চার,
নাতি ফিরে এ-ওর ধারে, খালি গলা ধাক্কা জোটে আর-
এমনি সময় উঠেছে ঝড়, জ্বর ধূয়ে মুছে করে যেন সাফ,
দরবেশ বাবা এক ডাকিছেন, চাহি খোদায় করিতে মাফ।
দাও বর রাহমানুর রাহিম দাও গো বুড়ি-নাতিরেবর ঐ,
যেন ফিরে পায় শক্তি তার, প্রার্থনা করি তব স্মরিয়া লই।
দিতেই মাথায় হাত, ভিখিরি ছোকড়ার জাগে দিব্যজ্ঞান,
খোদা বিনে ভয় নাহি করে কারুর তার, করে চিন্তা-ধ্যান।
বুড়িরে দানে স্বর্গ চাদর, তাহে উঠে আড়ালে উড়ে যায়,
ভূধর গুহায় করে বসবাস আজি নানী-নাতি নহে অসহায়।
যেথা এককালে অজ্ঞানে, ঈষ্ট-কৃপায় এখন উল্টোদিক,
নাথ সহায়-ভরসায় কাটে দিন, পরশ পাথর ছোঁয়ায় ঠিক।
সে পাথর অলি মোবারক, নিশ্চিত ঈশ-রহম খাস যে পায়,
হেদায়েত সে লভে গো, সিরাতুল মুস্তাকিমেরাধামে ধায়।

-----কিশোরগঞ্জ ১৮/০৩/২০২৩।

বিজয় নিশান

এই মাতৃভূমি-মাতৃজঠর মায়ের সমান সমান হয়,
জন্ম লয়ে সেথা আর জীবন যুদ্ধে ফিরিবার নয়।
ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে বড় হয় দেহ কলেবর,
ধীরে ধীরে সরে যায় মুরগী-ছানা, বাড়ে এরপর।
নিজগীতিতে আনি 'হৃদয়চারী' পরে খ্যাতি পান,
দেখে আর কেউ সে কী! নব নব সৃষ্টি উঁচু মান
দুনিয়ায় সয়লাব হোক না কীর্তি তাঁর চাই তাই,
আত্মতৃপ্তি ভরে দেখিবে সন্তানেরে কত সুখ পাই।
বার বার ফিরে যায় কাপুরুষ, মাতৃমান ধরে টানে,
বীর যেন সুজন মন, কল্প সীমা ছাড়ি দূরে ঘা হানে।
এখন বুঝিয়াছে বুঝি! সৃষ্টিশীল কবি স্মরণীয় কী যে,
কবি আপনি ঘরে কাঁটা না হয়ে, বিভুঁই জয়ী নিজে।
অষ্টপ্রহর মত্ত সৃষ্টি আর সৃষ্টির উৎসবে দশক চার,
অকৃত্রিম কারিগর! সাহিত্য রসে ভিজে একাকার।
কে পায় তাঁরে বর্ণচোরা যে, সৃষ্টির অভিনব নায়ক,
আপনার পথে আপনি হাঁটে, ঐ আপনার বিধায়ক।
নক্ষত্র সম জ্বলে উঠে, ঐ পথ দেখিয়ে বারিধি মাঝে,
কুলহারা গতিহারা মজলু যাঁরা, ঝান্ডা ধরে রণ সাজে।
কশে ধরে জীবন নৌকা! অগাধ জলে আর কে পারে,
পিশাচ, শঠ, ধড়িবাজ ঝরে, কবি বিজয় নিশান নাড়ে।

-----মীরপুর ঢাকা, ১৮/৩/২০২৩

অলির ছোহবতে একদিন

হে আল্লাহ! হযরত শাহ আলী (রহ)‘র রুহানী ফায়েজ দিন,
হাজিরানা যত মোনাজাতে চাহিছে হাত তুলে দোয়া আমিন।
ভীড়ে তাঁর রওজায় ছোঁয়ে কেউ কাঁদে, মহতীর উসিলায় যদি,
কপালে জোটে হেদায়েত খাসরহমত আর-রাহীমের নিরবধি।
তাঁর রুহানী ফায়েজে, ঐ অলীর ছোহবতে পাই অমরত্ব খুঁজি,
স্বর্গ লীলার শিহরণ, স্বর্গীয় সুখ আর পরমেশ-চাওয়া-বরই বুঝি।

এই হযরত শাহ আলী(রহ) যেন জিন্দাপীর নূ মনে জাগরুক,
জীবিত কী মৃত কে করে তফাৎ, মুক্তির লাগি রহে কী জোক!
ছোহবত আর এশকে আলী(রহ) ঐ সিরাতুল মুস্তাকীম-মুশিদি

ফেরেশতা সম পীর, তাপস, ধর্মগুরু মারেফাত দিব্যজ্ঞানবিদ।
মনুজে দলে দলে গন্ধে আসে নিবে যত সুরভি অলৌকিক,
ইবলিশ যত যায় ফিরে, হাক্কানী করে খোদায়ী রহম ভিখ।
সম্মুখে বাইয়্যাতের যেন বটবৃক্ষ, এক ইমাম তেজী মহামনু,
একীন-ঈমানী সাধক, দরিয়ার পাঞ্জেরী আর অম্বর রঙধনু।
আমিয়াব হাশর মাঠে, কাউসার পেয়ালা চাহি, তৃষা নাহি,
হযরত শাহ আলী (রহ) সাথী, রাসুল (সাঃ) পানে ঝাড়াবাহী।
এশকে এলাহী পুঁজি আমার, একেশ্বর খুঁজি, খুঁজি আর খুঁজি,
দেওয়ানা মজনু নাথ বরাবর, লক্ষ্য ছুঁড়ি রহি আপনি উজি।
জপেতপে ফিকিরে ধ্যানে প্রাণেশ শান্তি দাও শাহ আলীরে,
খান্নাছ কুপ্রবৃত্তি রূপ চোখের বালি চাহি না চোখের বালিরে।
মহাকালে হারাবো না আমি, হারাবে না তুমি সত্য দরবেশ,
এই শত কোটি মন ছোঁয়ে, মনসিজে রহিবে চিহ্ন, চিহ্নলেশ।
সহীহ্ জ্ঞানে ধ্যানে, রচে যাই পদাবলী, নাহি কিছু চাই যে,
আমিও ছিলাম জনতায়, বিংশ শতকে তেইশ সালে ধাই যে।
জয় হোক সত্য জয়ের, জয় হোক সত্য ভয়-তাকওয়ার ঐ
আঁরে নাথে, বরে নাথে সত্য নেশায় ছুটি খাঁটি তাওহিদ বই।

শাহ আলী(রহ) মাজার মসজিদ

মিরপুর ১ ঢাকা, ১৪/৩/২০২৩

বিচিত্র পথে দ্বায়ী

ভুবনে একেশ্বরবাদী বলে, সব কিছু স্রষ্টার জানো,
মহীর বহুঈশ্বরবাদী কহে, সব কিছুই স্রষ্টা মানো।
একটি বাংলা 'র' প্রাণনাথ ভেদ,
বলে দিলো সহজেই মনোখেদ।
তাওহীদ-শিরক, বিভু-বান্দার জ্ঞান মগজে আনো,
ডাক্তার জাকির নায়েক ক'ন,
দাস সংবাদদাতা মালিক নন,
'সৃষ্টিই স্রষ্টা'র শিরক তত্ত্বে সমূলে তুফান হানো।
সার্বভৌম মালিকানায় দাও মান,
সুরা ইখলাস মূলে দাও তাঁর শান।
হৃদয়চারী হে প্রাণে ধরো, গুণী জীবন্যাসে ছানো।
তার চে' বেশী কিছু নহে, শক্তি কারো নেই,
সর্বশক্তি এক জগদীশের, ভাবে ধরো সেই।
দাসে দেন স্রষ্টা অলৌকিকতা, সমগুণে কেন টানো।
কেউ যদি বলে অমুখ, অমুখকে তো জানি,
সামা করিতেন না বলেন, ইতিহাস সন্ধানী।
তাঁরে কেন টেনে এনে গজল সামা গানে,
সুর-তাল-লয় এই মোহ কেরাত ময়দানে,
করেছিস পাতক, সোনাখন্ড পাঁকে দানি ধান ভাণো!
বলি হে, বায়োজিদ বোস্তামী (রহ) কেনই যে,
বেশ্যারে নামাজ দাওয়াহ দেন ঘরে নিজে,
রহস্য কিনারা কী! কে নষ্ট জ্ঞানী না বাঈজী গানো!
হৃদয়চারী হে, তুমি অলীর উপমা তো দাও,
অলীর নসিহত তোমার গীতি গজলে গাও,
হোক জগতে নানা কথা! এ চিশতির স্বর্গ সুধা ধ্যানো!

মিরপুর ঢাকা ২৮/৩/২০২৩

পদপদ্ম

ভাস্কর হতে আলো সমেত উত্তাপ
এসে এই গায়,
শূন্য হতে ফুসফুসের কুঠুরী ধরে
শুদ্ধ এই বায়।
বৃক্ষ তরুলতা হতে এসে পুষ্টিমান
পুষ্টি এই ছায়,
এই নৃ-শেকড় হতে আসা মায়ার
এ-ই ভিত্তি দায়।
আমাকে করেছে রক্ত-মাংশ-বারি
দিয়েই নারী-নর,
নেপথ্যে কৌশলী সর্বশক্তিমান ঐ
অদ্বিতীয় ঈশ্বর!
অদৃশ্য ধাতা আত্মা-আয়ুর মালিক
সর্ব আবস্থানের,
মাতৃ-জঠর-ভুবন-কবর-হাশর মাঠ
ঐ মিলনস্থানের,
মঞ্জিলের পথিক, পাথেয় অর্ন্তদৃষ্টিই
কই তব কই,
তব তপ তপস্যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
জপা জিব বই।
ফুল চন্দন মুখে, গায়ে রুহে সান্নিধ্যে
রবে জগদীশ্বর,
সত্য সুন্দর ধরাধামে রচে স্বর্গ বিস্ময়!
বর শান্তিই গড়।
মনু! বপু তনু বহে এই পদ ধন্য বটে,
বহে দৃ পদপদ্ম,
তবে তুমি কী বহ! স্মরণ, স্মরণ, স্মরণ
তোমার আরাধ্য!

কিশোরগঞ্জ ১/১০/২০২২

সুপথে চাহি যেতে

পরিব্রাজক স্বভাবজাত পরিভ্রমণরত,
হেরি উর্ধ্বাকাশে এক বেল্লিক শত
বুঝানোর পরেও বুঝে নি ক্ষমতা,
মূল্যায়ন যা করার ছিল, ঐ মমতা
পরিমাপ করেনি, যা নিশ্চিত ছিল,
ছিল পাওনা একেশ্বরের, আহ! দিল
কি? উল্টো মূর্খ সে করে যে বিতর্ক?,
সুসংবাদদাতা হতে হয় নি সে সতর্ক,
মিথ্যে অহংবোধে জড়ালো অশুভ ঐ
অমূলক ক্ষমতাহীন বেড়া জালে, কই
কেউ তো এক বিন্দু এগিয়ে এলো না
এমন কি মাছি হতেও কেউ গেলো না,
ছিনিয়ে আনে কিছু প্রার্থীত, বিভূ হতে;
পড়িল ছেদ তার স্বর্গীয় জীবন ব্রতে।
তার কী হলো, মূর্খ কেমন মনুজে সে,
আমি ভাবতে পারি না কত মিথ্যুক যে,
সে কী পরিমানে, মূর্খ বিদ্রোহী ধরে ঐ
শয়তান আর সে তুণে প্রাণ সঁপে লই,
ধ্বংস হলো প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বায়ে কোথা,
হারায় অজানায় ঐ মনু, আর তার হোতা,
ধারাল কোন আজব পাখীর হিংস্র ঠোঁটে,
যবনিকাপাত ভাগ্যে, কর্মদোষেই জোটে।
সর্বনাশ শেষে বহু চেষ্টা করি আমি যত,
ফেরাতে চাই আপনায় পারি নে, সতত
আসে ফিরে ঐ ভাবনা, তাকওয়া কী যে,
আমার শংকিত আত্মা ঢুকে পড়ে ফ্রিজে,

বরফ-শীতল খুন মাংশ দেহ ভয়ে ভয়ে,
ওহ প্রাণনাথ! হেন বেওকুপ দলে না লয়ে,
বিলয়ে না পড়ি, ঐ অশেষ কালের মতো,

আদ-সামুদ জাতি বিনে আরো যে কতো,
পড়েছে পথ ভ্রান্তির শাস্তির করাল গ্রাসে,
ভয়ানক সে যাত্রা ! চাহি না পড়ি সে দ্রাসে ।
আজাব চাহি না গো প্রিয় নাথ আমার !
দিও স্বর্গ সুখ , চাহি সরল সুপথ ঐ আর
না দেখিয়া আলেমুল গায়েবে দৃঢ় বিশ্বাস ,
চাহি নেবো সত্য সুন্দর সৌভাগ্য নিশ্বাস ।
আর নিয়ামত নারী-সংগ কত সুখ সংসার ,
নিশিতে ধাতার কীর্তন , জিকির আজগার ,
চাহি গুণ বিকাশ আর হবো যোগো জাহেদ ,
যোহদ রাখি জীবন যৌবনে বাহক ঐ ভেদ ,
বুঝি , যা বুঝে দরবেশ ডাকে নাথে অবিরাম
ক্ষণ ক্ষণ লাগায় কাজে ঐ বিপুল শ্রম ঘাম ।
বাঁচে আপনি বাঁচায় জগৎ , আমার এই বোধ ,
ফিরে চলে নিরব কক্ষে চাহি পাতক রোধ !
ঐ দুষিত চেতনার পাখা ঘূর্ণি না চাহি না ,
অহেতুক অবচেতনে দুনিয়া ধাঁ ধাঁ গাহি না ,
দিশে দিশে ঐ বেতমিজ মন ভরে সিন্দুকে ,
যেন খুঁজে না পায় শত্রু শয়তান সিন্দুকে ।
আপনারে রাখি ওরে নির্জলা সত্য সুন্দরম !
আমি জানি , জানে সর্বশক্তিমান প্রাণনাথ মম ,
আমি নির্জনে রহে সাধন করে যাব যে লড়ে
ওয়াছা-ওয়াছার সাথে , বুদ্ধি ফেরেশতা বরে ।

কিশোরগঞ্জ ৩/১০/২০২২

কর্মযোগে আঁধার কাটে

আমি ঘোর অন্ধকারে, কাটবে কবে,
এই অন্ধকার, বুঝি নে কী নেই ভবে
জানি নে, তবে নেই যে নেই কিছু,
একটা ধন নিশ্চিত, ছুটি কার পিছু?
মোর প্রাণনাথ খুঁজি হয়রান, দিব্যচোখ
খুলে না, আঁধার কাটে না, দিব্যহীন বুক,
কোথা ভগবান-ঈশ্বর-খোদা মালিক মোর
তাঁর রেজা লয়ে, কারামত দরিয়া হয়ে হয়ে,
যেতে চাই জ্যোতি-জগতে কাল কষ্ট সয়ে।
দুনিয়া ছাড়তে চাই না দুনিয়াও তাই চায়না,
এ ছাড়া না ছাড়া বিষয় নয়, বিষয় নূর বায়না
খোদা তরে; সে পাওয়া হলে সার্থক জন্ম যে,
লৌহ কঠিন অহোতমা একাকার তপরত হে,
বর দেয় স্বভাবে নিকষকালো কর্পূরসম উড়ে,
বিলীন আত্মা, সাধক পায় সত্য সিদ্ধি ঐ চূড়ে।

জীবন নিশীথ বন্ধুর ঈষ্ট ধরে রাখো নিজ ঘাড়ে,
ঐ পরমেশ তুষ্টি নিয়ে কাটাও জনম, সদাচারে।
যার শ্রমে ভেসে যায় কালিমা কাজ বিনে নাই
কিছু নাই, সর্বভূত সারাবার বিদ্যে বৈদ্য সাঁই,
নিজেকে জানি, জানি কর্মবানে ভাসাই দেহতরী,
ভবঘাট হতে দেবো পাড়ি, পরপাড়ে কর্মফল বরি।

কিশোরগঞ্জ ৬/১০/২০২

মানবীয় চিন্তা শেকড়

মানবীয় চিন্তা শেকড় কী গো কী
ছোঁয়া দিয়ে শিখরে, দেখায় বাতিঘর ঝিক্‌মিক্‌রে,
আরবী ভাষায় লৌহ মাহফুজ ঐ
ঢেলে দিলো ঈশ সত্য সুন্দর জ্ঞান-নূর চিক্‌চিক্‌রে।
অতলন্ত সেই অদ্বিতীয় ঈশ জ্ঞান,
ছিনে আনে সুস্থ সবল অনিন্দ্য মহত্তম ঐশ্বরিক মনন,
অশ্লীল শিরুক আবরণ খুলে ফেলি,
ফিরি কুদরত অরণ-সেতারা হেকমত হেরি অগনন।
কী পাই গুনে গুনে আজব, আজব,
আরও কত কী রহস্য কুল কিনারা নাই বুঝি না বুঝি,
নাথ-স্মরণ উদ্ধার করে মনুজে ঐ
সদা দানবীয় যাঁতাকল হতে, বিমুখ দানব সোজাসুজি।
বলে সংবাদ বাহক স্বর্গদূত নয় কেন!
আজকের চক্ষু কান তুক হাত-পা সেও নাকি হবে পর,
হাশর-মাঠে ওরা ভীড়ে কর্ম সাক্ষ্য,
আদ-সামুদ জাতি হেন বিধি বাম ফুঁসে নরক যন্ত্রনাকর।
এত সব আসে আমার মগজে হয়,
তার কী বা রাখিব উপমায় বুঝিজ্বলে রয় জ্ঞান প্রদীপ
বেশি বুঝিলে হারাবো সব আমার,
সরল সহজিয়া সিরাতুল মুস্তাকীম সূচাত্ৰ কলম বল নিপ।
খুঁজি ফোরকান, আর নব নাহি চাই,
ফিরে পাই বর রহম সাধন ভজন, ব্যাঙ্গ বেয়াদপ নিরাশ।
আমি আশা বিশ্বাসে উতড়ে যাব গো,
যাব সত্য বাস্তা উড়াই, মিথ্যে উলকা পুড়ে ছাই বিনাশ।

কিশোরগঞ্জ ৬/১০/২০২২

মুখ্ যা রটায়

সৃষ্টি জগতের নিরঙ্কুশ মালিকের,
প্রশংসায় লিপ্ত কেউ, হেদায়েত পাওয়া একজন,
সুলায়মান বাদশাহ নবী (আঃ)
বুঝে তাজবীহ করা পাহাড়, পাখ-পাখালী অগনন।
ভীম বাহনে উষা সন্ধ্যা ভ্রমন,ঐ
ভর দেয়া লাঠি, গায়েব-অজ্ঞান জ্বীন ঐ কর্মে লিপ্ত-
প্রাসাদ ইমারত সৃজনে ব্যস্ত জ্বীন,
যে নবী যে মানব রহমত-ক্ষমতায় ছিলেন সিন্ত।
দয়াবান প্রাণনাথ, সকাশে বুজুর্গ ঐ
সময়সুসংবাদ দিলে নাফরমান আয়াত না মানা,
বেঈমান মজা লয় ব্যঙ্গ করে হাসে,
এরা মোহর মারা কাফের, মুশরেক সব জান্তা জানা!
ঐ হীনমন্যের ভাষায় নাকি মনগড়া,
ফোরকান! জাদু বিদ্যে! হায়রে কাফের মুখই বটে,
অল্প জন বাঈমান, বেঈমান বেগুমার,
নরক করেছে যোগাড়, তারা যা নয় তাই যায় রটে।

কিশোরগঞ্জ ৭/১০/২০২২

ভালবাসায় বাঁধা আমি

প্রতি জীব অনুজীব রকমারী পত্র মহীরুহ
ঘিরে রাখা তৃণ, অজানা যত প্রাণ,
দয়ায় ভেসে যায়, কান্নায় কাতর বায় চির
নব রূপে আসে যায়, পায় ত্রাণ।
আমার দেখার শেষ নেই, বুঝার শেষ নেই,
ঘুরে ঘুরে হয়রান বহুকাল আমি,
কেউ বলেনি তো আমি আজ অভুক্ত ক্ষণে
সবে গিলে, দয়া ছুঁড়ে অর্ন্তযামী।
আমি ভালবাসি তমা-আঁধার রূপ, সাদা ঐ
অন্তরীক্ষ অনন্ত আর বর্ণিল মেঘ,
ভালবাসি মোহন ভুবন, পয়োধি মহাবারিধি,
ভূধর-ভূগর্ভ ইচ্ছে মত, হৃদয়াবেগ।
শেষ হয় না মগজ-ক্রীড়া, নিরন্তর সৃষ্টি হতে
অন্য সৃষ্টি আর আতিশয্য বরাবর,
ধরি মোরে মেলে, অগনন সৃজন কৌশল যত
দিব্যদৃষ্টিতে পাই গুপ্ত খবরাখবর।
যে যায় সে আর আসে না ফিরে, বিচিত্র চিত্র
জাঘ্রত হয়ে আসে কত যে হেরি,
তারপর চাহি না আমি কিছু আর যে কিছুই
সেবি সবে পরি করুণা-নরম বেড়ি।
আশেক হবো গো ঈশের, হবো ভাব-তন্ময়
এইখানে আছে মুক্তি, চাহিত কিছু,
আকাশ পাতাল ভাবি হই এলোমেলো ওই
সরল পথ ত্যাগি, গরলে হই নিচু।

কিশোরগঞ্জ ৮/১০/২২

সোনার মানুষ

আমি আকণ্ঠ ডুবে গেলাম নিকষ
আঁধারে দু'টো নেত্র রেখে,
ভালবেসে নিস্তর্রতা, ভাবলাম এটা
মোর সরল পথ, চলি দেখে।
এ বুকে বঙ্গোপসাগর তল পাই না
হীরে-রুহ খুঁজি দিব্য কুড়াব!
ঘূর্ণীঝড়ে ঘুরপাকে কেমনে আধ্যাত্ম
ধন-মুক্তো লভে আশা পূরাব।
মোর ভরসা মোর অস্থিত্বের পেছনে
ঐ অজ্ঞাত-নাথে চেয়ে আছে,
মোর অঙ্গ মহী-কণ্ঠ ধারণ করে ছুটে
ঐ পেতে মোরাকাবায় কাছে।
নিঃসঙ্গতা আর বিভূ-ভয়, ঈশ-খোঁজা
পথরহস্যময় করে গো তুলে,
তখন দয়া চাহি খোদার, কূল পেতে
বুঝি ভব সুন্দর ঈশ-রেজায় বুলে।
এলে ঈশ-বিশ্বাস, সেবা, সত্য, সবার ধরে
ছুটে ঐ সোনার মানুষ গুণ লভে,
অলীরূপ অলৌকিক হই, এ ধরার 'পরে
বাঁচা-মরা সমান, হবে সাধক যবে।

কিশোরগঞ্জ, ৯/১০/২২

গিলে অহোৱাত

আমাৰ মध्ये কল্পনা সফেন বাৰিখিৰ ঢেউ
ফণীৰ মতো ফণা ধৰে উঠছে, মিলে যাচ্ছে,
এ তরঙ্গ যেন আয়ুৰ মতো উবে যায় গো,
হিমেল কনকনে বায়ে আৰু ৰূপ পাচ্ছে।
তাহলে ৰইল কী অবশেষে যে আজকের,
এই মুহূৰ্ত্তেৰ হাকিকত কৰ্মচাঞ্চল্য ঐ সব
আমলৈৰ নিৰ্যাস কী, কেন অবয়বে ৰহে
আপাদমন্তকে থাকা কৰ্ম কোলাহল কলৰব।
সে জানি তবে বুঝি ভক্ষনের যে জের কী
গো সে যে শক্তি বাঁচিবার হেতু কিছু নাকি,
তা যদি হয়, এ কালে, আমি নেই, নেই ওই
ধরনী আজিকার, কী হলো! বুঁজে দৃ'আঁখি,
চিন্তা কৰো, আমি চলে যাব আৰু এক নব
পৰ্বে কৰ্মফল নিৰ্যাস লয়ে ভিন্ন আৰু ৰূপে,
আবার কেউ চলে আসবে আমার শূন্যতায়,
আমি চলে যাব পৰ্দার আড়ে গায়েবে চুপে।
এ ভব-খেলাঘরের ক্রীড়নড়ক কে গো গুপ্ত
থেকে খেলছেন অবিরাম অনাদি অনন্তকাল
আৰু খেলবেন কত তাও অজানাই আমার,
রিপু পড়ে পুত যদি হই তবেই ভাল কপাল।
কবর, হাশর, পুলসেৱাত, পাই স্বৰ্গ না নৱক,
কোথা গিয়ে ঠেকে যাই, জানে প্ৰিয়তম নাথ,
কুকৰ্ম-সুকৰ্ম-অকৰ্ম-অপকৰ্ম মিলে একাকার,
জীবন যুদ্ধক্ষেণ তৱণী ছুটে, গিলে অহোৱাত।

কিশোৱগঞ্জ ১০/১০/২২

ও! গিরি-পৃথিবীর পেরেক

কী কর হে, ও! গিরি পৃথিবীর পেরেক
নিরবে দাঁড়িয়ে ঠায় ঐ আবহমানকাল,
উত্তরীয় বায় তব গা ছুঁয়ে আসে গো,
কনকনে শীত লয়েই আসে বেয়ে ঢাল।
আজি বারিধি ছুঁয়ে যাওয়া দক্ষিণা বায়
ফিরে যায় গিরি পেয়ে শান্ত-শান্ত হয়ে,
আমার বুকের পয়োধিতে বহি অশনি
ঘূর্ণীঝড় বহিবে যবে কাল হাসরে বয়ে!
তখন কী তুমি, ও! গিরি উত্তিত হয়ে রবে?
শান্ত সৌম্য রূপবান হয়ে বহে স্বর্গ-হাওয়া,
সুবিশাল গতির বেয়ে নামবে সুর বাগে গো
তাকওয়া জরী-পোশাকে নৃ,এশক-বাওয়া-
আমি হব কী তব শিকার, নাকি কিছু আর
আমি বুঝি নে, বুঝিয়াও যে, ঘাড় বেঁকা মনু,
সুন্দরী নারী রূপসী ধরণী ধাঁ ধাঁ ঘিরে রাখে,
মেঘের আড়ে থাকে যথা ঐ অশনি রঙধনু!

মিরপুর-১ ঢাকা ১৪/৯/২৩

ঈশে ভক্তি দৃঢ়তর গড়ি

আমি সাঁতরে সাঁতরে প্রশান্ত মহাসাগর
আরও যত সাগর-মহাসাগর প্রদক্ষিণ করে,
নিমজ্জিত হয়ে, ডুবে ডুবে কত কী নব
আজব জীব প্রত্যক্ষ করে প্রাণেশ যাই স্মরে ।
আমি ঘুরে হয়রান হই, গজারী জঙ্গল
সমুদ্র সৈকত, বঙ্গোপসাগরের ঐ ম্যানগ্রোভ
আমাজান নদী তীর, আফ্রিকা অগম্য
বন, খুঁজি অগনিত গুপ্ত যত সৃষ্টি সত্য ধ্রুব ।
আমি উড়ে উড়ে যাই মেঘপুঞ্জ 'পরে
বোমে উলকা ছুটা, রঙধনু, ছায়াপথ ধরি,
আমি যাই চন্দ্রপিঠে আর গ্রহে ফিরি
অবাক হই ঈশে ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ়তর গড়ি ।

কিশোরগঞ্জ ১০/১০/২০২২

ত্রিয়ামায় মুজাহিদ

গভীর তিমিরে কী এক আশ্চর্য নিরবতায়,
দেম ঘুমে ঘুমাইছে হাঁস মুরগী মানুষ কীট,
সব পাখ-পাখালী, নিশাচর ওই ডেকে যায়,
ভুবন নিরব কিন্তু আমার বুক জাগ্রত অরবিট।
পাঁক পুকুরে জন্মা অনিন্দ্য শাপলা বাঙ্গালীর
রোধিরে পাওয়া স্বাধীনতা অর্জন প্রতীক, ঘুম
আমার আমাকে ছেড়ে, ধরিদ্রীকে করেছে
ঘুম-কাতুরে, এই শরীর-হাড়-মাংশ ধামধূম
খাচ্ছে দাচ্ছে বোকারাম, বুঝেই না পয়োধি
অনল ছুঁয়েছে, ভূধর গেছে উবে আমি দুঃসহ
হাশর ময়দানে ছলছাড়া, বিভূ বিশ্বাসে চাই
মজবুতি, চাই সৎ কর্ম সবার মুজাহাদাবহ।

কিশোরগঞ্জ ২১/১০/২২

ঈষ্ট দয়া-সূত্র

ষড়ঋতুর মেজাজে ষড়ঋতু রহে বিদ্যমান
চেতনায় ঐ আধিক্য অথবা আকাল হলে,
বিভ্রাট ঘটে জীবনে নাকি বৈচিত্র্য আনে
লক্ষ্য স্থির, দৃঢ় বিশ্বাসী মনুর ফসল ফলে।
প্রজ্ঞা, জ্ঞান পুজি বটে নশ্বর অনুসঙ্গ রহে
আমার মেরুদণ্ড সরল স্রষ্টার দৈব প্রাণসত্ত্বা
ক্ষণ মূল্যবান, কর্ম সাধন মুহূর্ত মুহূর্ত ভরে,
উন্নত আত্মা গড়ে পাব এ জীবন সারবত্ত্বা।
কে বলেছে মানব জীবনে শুধু ভোগ আর-
ইতর প্রাণীসম শরীরই প্রধান বেঁচে থাকা,
এই জীবনে রয়েছে স্বর্গ-নরক বিচিত্র রূপ
আত্মার রয়েছে আবার ঈষ্ট দয়া-সূত্র রাখা।

২৩/১০/২২ কিশোরগঞ্জ

বর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত না আধ্যাত্মবাদে সুখ!

আমার শোণিতের কণিকায় লেগেছে আঙুন
প্রলেতারিয়েতের, রাজপথে পড়ে থাকা,
বাস চাপা পড়া কুকুর শৃগাল ছানার দেহই
যেন কিছু নহে, ও! প্রাণ নয়, ছি!! হাঁকা।
একমুঠো ভাত, শিং মাছের বুল কাঁচা লংকা
খোঁজা ভিখিরি-নেত্র ফ্যাকাসে সভ্যতা,
পানতা নুন, অর্ধ পঁচা পিঁয়াজ ঘুম কাতর দেহ
শানকি সাথে মাটি-বিছানা ধুলো ভব্যতা।
কভু বস্তির খুপড়ি ঢুকে যায় দশতলা ইমারতে!
ধবধবে সাদা রূপসী অবলা-কামনা-সাজ,
পারফিউম যেন বস্তির খোলা টাটির দুর্বিসহ ঐ
নাক ঢাকা থাকা, মেঘে শিরেই ঢালে বাজ।
শিলাবৃষ্টি ঝড় তমায়, কখনও অরুণ কিরণ অসহ
আমার পায়ের কালচে চামে দাগ কাটে না,
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, হাতে গড়া ঠান্ডা গরম বর্নায়
আমার পদ যে হাঁটে না গো পথে হাঁটে না।
পক্ষাঘাতে নিখর, দ্রুতযান মোটর আরামের নয়
ছেঁড়া আভরণ, ছানি পড়া কর্ণিয়া-দুষ্কৃত,
আমাকে অচেনা করে ফেলেছে জানি স্বজন কেউ,
নিঃশ্ব বলে আপন পর সবে রাখে মেপে পথ।
বর্জোয়ার দ্বান্দিক উপসর্গ আমার মগজে খামছে
ধরে বুঝাতে ধনবাদের কর নাগালে স্বর্গসুখ,
প্রলেতারিয়েত নাকি নরক! গিরি উপত্যকা সম
এয়ে সৃষ্টি বৈচিত্র চিত্র, চাই আসুক শান্তিমুখ।
কোথা দেখিব ঈশ, কোথা খুঁজিব ঈশ প্রিয়তম রব
সে তো মনে, নাথ-রেজায়, গুকের তাকওয়ায়,
সবর, ভরসায়, রিপু পুড়ে পুত হওয়ায় ত্রিভুবনে ঐ
বসিও না কেউ, ধনী-রিক্ত, উঁচু-নিচুতা জুয়ায়।
হায়রে সর্বস্ব যাবে, যাবে অতি অমূল্য সময়, যাবে

বাঈমান ছাড়ি বেঈমান-খোয়ারে জীবন হরণ,
আধ্যাত্মিক সম্পদ নাই যার, কিছু নাই তার খবিছ
-সঙ্গ ছাড়ি, তওবাতুনছুহায় চাহিইলাহী বরণ।

কিশোরগঞ্জ ৩০/১০/২২

আখের-বর

আমি আমার দহলিজের আরাম কেরারার
মধ্যে, ছবিঘর খাতার সব,
পৃষ্ঠার মধ্যে আমার রিক্ত হস্ত, বেইজ্জতির
লক্ষণ, শুনি হাহাকার রব।
আমার বক্ষপিঞ্জরে ভূমিকম্প উঠে পাগলা
মসজিদে রত রোবুদ্দমান,
ফোরকানের সুম্পষ্ট বাণীর প্রতি ইংগিতে
চাই ইজ্জতই দেদীপ্যমান।
বিচারালয় আর মানুষের হাত থেকে নেমে
কড়াঘাত-বেইজ্জত নিন্দা,
আমার বক্ষপিঞ্জরে অবশিষ্ট নেই রক্তবীজ
আমি জীবন্মৃত লাশ জিন্দা।
এ জীবিকা যেন শাপ, সাক্ষাৎ নরক, চাই
খাস দয়া নাম হতে বিচার,
ন্যায্যতার হৃদিস কোথা গো আকুতি যে,
দাও দয়া তব, করি উজাড়।
না হলে তোমার অমোঘ নিয়ম ভাঙ্গবে,
সিদ্ধান্ত তব, পরীক্ষা নেয়ার,
বান্দারে অবিশ্বাস করাতে খান্নাছের ওয়াছা
ওয়াছা বল বিপথে দেয়ার।
কাতুকুতু দেয় নৃ মস্তিষ্কে, ফতুর করে সর্বার্জন
যায় নরক, সর্বনাশের দিকে,
জীবন যুদ্ধে পরাজয় মর্মান্তিক, রিপু বিষ্ঠা মুখে
মরা বলসানি কাবাব শিকে।
ছিঁড়ে রিযিক ঈমান পথ ডোরা নয় কাল নাগ,
আমি দেবো ভেঙ্গে বিষদাঁত,

সাপে নেইলে যুদ্ধে আবার বেজি হয়ে শয়তান
ওই ফণীরে করব কপোকাত ।
হার না মানা জীবনযোদ্ধার এই হোক শপথ এ
নশ্বর সব মুছে ফেলে গুপ্ত নাথে,
চাই আত্মমগ্নতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা, জীবন যবনিকা
পূর্বে যেন খবিশ আড়ি না পাতে ।
এ অভিশপ্ত শাপে যাকে ছুঁয়ে না দেয় নানা ছবি
ধরে, থাকে ঐ হেদায়েতে চেপে,
রিপু পুড়ে পুত হয়ে কাংশিত লক্ষ্যে আখেরে যে
উতড়ে যাবে ঈশ্বর দিবে মেপে ।

৩/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

সিদ্ধি

নিশির নিশাচর পেঁচা কুঁউ কুঁউ ডেকে,
আসে আমার প্রাণে নিশ্চরিতায় একাকী,
আমি স্মরণে ব্যস্ত জাহ্নত নয়ন, মগজে
ভাবি গিরির ধূলিসম উড়িবার কথা কী!
ধরিত্রী মিশে উত্তোলিত হবে, হবে চূর্ণ,
আসি নামি কিয়ামত, অম্বর যাবে ফাটিয়া,
আমার বপু কম্পমান, শিরায় চিহ্ন ভয়ের,
আমি লুকাই চেষ্টা করি, সর্বাঙ্গক খাটিয়া ।
স্বর্গ-বাগের নিবাসী পারি কি না হতে কই,
আন্তরিক নই, সুন্দরী-ভুবন পানে যে চাহি,
আমি ছেয়ে আছি ঐ ঈশ-করণায় লেপ্টে
একান্ত নিভতে মজনু হতে তাঁর, আর গাহি

তাঁর গুণ কীর্তন অহোতমা ভরে, আমার গা
অঙ্গ অনঙ্গ করে বিনিময়ে, পাতক-ক্ষমা মাগি
তাঁসীর পড়ে তার পিণ্ডে মুদ্রাধারে, হাড়ে ঐ
মাংশ-কণায়, চেতন-অবচেতনেই ভয় লাগি।
তাহলে বুঝিব কী করে, মুক্তি কোথায়, কী ই
বা বুঝিব! সাধনার সিদ্ধিতে লেগেছে হাওয়া!
অষ্টপ্রহর আমি আর আমার বংশধর কন্যায়,
অল্প পাঠাভ্যাসে আনি ইতিবৃত্ত, সত্য পাওয়া।
এই যে, বলছি সিদ্ধি! সিদ্ধি ছুঁয়ে যায়, ঐ পায়
ধরা দেয়, দেয় না প্রাণ ঘণীভূত হয়, হয় না,
যোহদে জাহিদ পায় সব, অধ্যবসায়, একাত্মতায়,
রুহানী কিরণে ভাসে প্রকট, শরীরে যা সয় না।

৫/১১/২২ কিশোরগঞ্জ।

রকমারী মিথ্যে ফাঁদে জীবন

এক আঁতুত ফাঁকা-শূন্যতায় জীবন
উদ্ভিদে, ফলশূন্য ফলাফলের লাগি,
জীবন ভর-বড় হচ্ছি সংসারে হায়,
কোথা যাব, নির্মম নরক রহে জাগি।
কারু শুধরে কারু না, এ গডডালিকা
প্রবাহে, অনুরূপে কাটে আয়ু অনুরূপে,
দ্বিপ্রহর নিশি ভাসে নৈশব্দের জোয়ার;
আমি ভেসে যাই তমায় শূঁকি বিনোদন।
কভু আত্মসমর্পণ করি বস্তুবাদে অবকাশ
যাপন করি ঘুমে ঘুমে, বিষয় সম্পদ রাজ্যে,
শেষে ভাঙ্গা কুলার ছাই লয়ে যাই কবরে
অথবা পুড়ে যাই ছাই হয়ে জড়িয়ে দায়ে।
ভুবন ভার মুক্ত হয়ে তার ভবিতব্যে যাবে,
ধাতার অমোঘ নিয়মে, যেমনভাসে দেহে,
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বপু-অঙ্গ ভাররূপে; আর কী
এই অঙ্গে রোধির জোয়ার ধমনী নাচে, গেহে
ছিল পাতক-পুণ্য ভারযুক্ত একদিন সর্বসহা
অবশেষে আমি নরককান্ড করে নরক মুখে
আমার ঘুম নাবা-খাবা নেই জীবন সায়াহ্নে,
সবকিছু ছেড়ে ধীরে হাঁটছি এ আঁধার রুখে।
দেখি পাই কিনা আলোরেখার দেখা আখেরে,
অথচ জীবনই গেল বৃথাই অকারণ অপজন্মে,
পঁচাদেহের জন্য রাখি, পার্লার সাজনী রকমারী,
মিথ্যে বেড়াজালে আটক, কাটে জীবন অধম্মে।

৬/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

জাগাও আত্ম সহজিয়ায় ধাই

ঝির ঝির বওয়া নিলুয়া বায় বাওয়া ধানচারা, দোয়েলের
নিরব হাঁটা, রৌয়া বিলের কাঁপানীরে শাপলা ভাসা,
নদী-পেটে ধরা মৎস্য শিকারী ছাওয়াল, শিশুর ডুব দেয়া
দেখে চোখ ছানাবড়া ক্ষুধা গেছে উড়ে ভাবে টাসা।
প্রাসাদোপম নীড়ের আরাম গালিচায় সুখছটায় অবগাহন
করা মানব-মানবী জগৎ জুড়ে, ঐকেছি ছবি তাবৎ,
অথবা আত্মমগ্ন ধাতার স্মরণে থাকা অচিন এক দরবেশ,
বন-জানোয়ারের সুখময় সহবাস নৈসর্গিক আলবৎ-
ধরিত্রীর সর্বসহা মেজাজ আমার মগজে আলোড়ন তুলে
কিন্তু আহা এই সবের সবি হারাবে কালগর্ভে ছলে,
ভবিতব্যে রহেঅরুণের হারিয়ে যাওয়া, গিরি-উৎক্ষেপণ
বিচূর্ণন, যত রহে বারিধি-জল রূপ নেবে মহানলে।
অম্বর ফেটে চৌচির তখন আমার নিরাপত্তা কোথা গো!
আমাকে তো বলা হয় নি ধন-মান ভরসা এখানে,
ওসবে আপাদমস্তক ডুবা নির্বুদ্ধিতা, মোটা মাথা সম যে
জন্তু জানোয়ার ব্যর্থ মনোরথ ডাকি অসিদ্ধি আনে।
আমার চাহিত সোনার হরিণআন-নূর যার উপমা ওগো,
এক উজ্জ্বলতম প্রদীপ ফোরকান নজীর কাঁচঘর,
আলোময় আপনা হতে জ্বলে উঠা আরবী জয়তুন তেল,
প্রাণেশ-ছায়া স্বর্গঘর অহোতমা চাই ঈশ্বর-বর।
আর সব বিলয়-বিলোপ রকমারী হয়ে রয় অকারণ, নহে
নিজ ধন তবু আপনার হোক অজ্ঞপ্ত পথে চাই,
বিপথের ছিঁটেফোটা ইশারা, হোক না মনোমুগ্ধকর তাই,
তওবাতুননাছুহা ব্রত শেষে ঐ সহজিয়ায় ধাই।

৮/১১/২২ কিশোরগঞ্জ।

হোক বিহ্বত আশা-বিশ্বাস জিহ্বা

শশী, দিকচক্রবাল, মনুষ্য-সুখ উপাদান সব
আমার শেষ পাওয়া নয়, নয়ঝুট রকমারী দর্শন,
আত্মহনন, আমি যেতে চাই আরও গভীরে
রিপু পুড়ে পুত হতে, তাওয়াক্কুলে ইব্রাহীম, বর্ষন-
ঐ নুর যা এসেছিল তাঁর 'পর, নীরবাসী ঐ
খিযির (আঃ) জিকির, বন্ধুর পথ ভরা স্বাপদেই,
ঝুটে ভরা কল্পনা-প্রসূত পাতক কালিমায়,
কর্ণিয়ায় দিগন্তজোড়া বাগ, দুধ নহর, আপদেই।
এই হোক বাঞ্চা মোর, কৌশল অবনি 'পরে
কার কথা রাখি খান্নাছ নাকি জগদীশের বল না,
এখানে পাতকী অভিসারিণী পাতক লাগায়ে
গায়, ইংগিতেই আনে মদন বাসনা করে ছল না।
ঐকে দে ভালে, সুপ্রসন্ন তিলক রেখা সুকন্মে,
আপনি জেনে বুঝে চাও বিধির খাস রহমত-দয়া,
ভেতরে বিহ্বত কর আশা আর বিশ্বাস জিহ্বা,
ভুলে বাসী শাপ, চাই ভেতরের পুণ্য চাওয়া নয়।

৯/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

আর কত জ্বালাবি রে জীবিকা !

জীবনে কিছু বুঝে উঠার আগেই জীবিকা
হামলা করেছিল আমার হৃদপিণ্ডে ঐ,
জীবিকা নামক রূপালী ইলিশেরা
চকচকে টাকা অবয়বে চাকুরী গতির লই।
কালো বিছা যা চুলকায় আজীবন
নামেই বিধি বাম উন্নয়ন, কিস্তিতসম সম্মুখেই
রকমারী রূপে বহুরপী সঙ কবিত্ব-
গিলু গিলে, গলা ধাক্কা দিয়ে নাচে ধেই ধেই।
মগজ উদরে গিয়ে খুঁজে পায় না
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ স্বাদজাত নিগুঢ় সব তত্ত্ব,
আমার অকর্মণ্য শরীর রত্ন-আত্মা
লয়ে বাজীমাৎ করে, ক্ষুধার ভয়ে হারায় সত্য।
আত্মা চমকে দাঁড়ায়-এই ভুবনে
জীবিকার অনেক ভাগ, উন্নয়ন-রাজস্ব-ভূদাস,
ভিথিরি-জমিদারী, বণিক্য-বাণিজ্য
সব আমার পায়ে হোচটা খায় ছড়ায় সুবাস।
মানুষ আর মানুষ থাকে না, রোবট!
দেহ দানব সেবায় কাটে জনম ক্ষিতি 'পরে,
আমি চেয়ে দেখি তার অত্যাচারই,
কত জ্বালাবিরে জীবিকা-সোনার হরিণ ধরে।
আমি রূপ মুগ্ধ তার, ভক্ষণে অভ্যস্ত
নই, নই ছিঁড়ে করিব গ্রাস ধরনী সবটা এমন,
মনুজের আধ্যাত্মিক মান, রচে শান,
ফিরে যেতে চাই পরপাড়ে আজি করি এ পণ।

১০/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

আমাকে খুঁজে পাই না

আমার জিহ্বা আমি হাত হাত করে
লম্বা করেছে, সমকাল হয়ে আরও কাল কত
পেরিয়ে বলল, সে যেতে চায় হয়ে
পুলসেরাত স্বর্গ অবধি; স্বাদ নেবে ইচ্ছে মত ।
আমি আমার কর্ণকে বলতে শুনেছি,
অনাদিকাল থেকে ঐ অশ্রাব্য, কুশ্রাব্য ভাষায়,
কথা-কখন, এখন সে আর সুবচন,
আর শুনতে চায় না, থাকে কুশ্রাব্যের আশায় ।
আমার কর্ণিয়া-নেত্র নও দৃষ্টি চায়,
দাগ কাটে না অক্ষিতে, মন যায় অবোধ হয়ে,
সে মনেই করে না বিলয় অস্তিত্বই,
ধরা-রঙ-বেরঙ মনোলোভার ধাঁ ধাঁ চলে বয়ে ।
আমার হাঙ্কিকে আমি চিনি, বুঝি
নে, সে হাওয়ায় বয়ে চলেছে এই হিয়ার নামে,
তারপর কীরূপ লভে, কোথা আলমে
বরষকে, সিঁজিনে নাকি ইল্লিয়নে গিয়ে থামে ।
আমার মগজে নিউরনে সত্য থাকে না
ঝুট বাসা বাঁধে, কল্পনার বেড়া জাল অহেতুক,
নব সত্যে ঝিলিক মেরেই রঙ্গে হাসে,
পিছলিয়ে নিয়ে চলে আঁধারে হারিয়ে আলোক ।
একান্ত আমি সব হারিয়ে নির্বাক অগ্নি
পাথারে আর মানসেতু পুলসেরাত তো কাছেই,
কেন যে আমি হকের আবিষ্কারক হইনি
রকমারী রূপে মুগ্ধ করে কুমন্ত্রণা লেগে আছেই ।
এই সেই প্রকাশ্য যম রোধির প্রবাহে, না
চেনা যায় না, বুঝা যায় না মিথ্যুক খান্নাছ দাজ্জাল,
কুপথে সরিয়ে ফিরে যায় আর আদমে
এই আমাকে খুঁজে পাই না বাজাই তার করতাল ।
হেনকালেই হেদায়েত হেকমত ভরসা,
তাকওয়া রিয়াজত দৃঢ়-ঈমান নিয়ামত ছিনে আনি,
আশা আর ভয়ে রহি প্রাণনাথ-এশকের
প্রজ্ঞা বুদ্ধি দিয়ে চেতনা গড়ে ঈশ্ট দিলো গো দানি ।

১১/১০/২২ কিশোরগঞ্জ

প্রেমের শুরু-শেষ

আমি আমার চক্ষু শর দিয়ে মিতালী-হৃদয় স্পর্শ করে,
ষোড়শীর অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিলুম প্রেমাকুতি ভরে।
একমুঠো অমল কোমল প্রেম, যা প্রলুব্ধ করে অভিসার,
কমল-পাপড়ীসম অধর-ওষ্ঠ লেহন ঢেউ ভাঙ্গে নদপাড়।
আপিঠ লম্বিত কৃষ্ণকেশ, কোমড়-বিছা টিকলি বাজুবন্ধ,
রেশমি চুড়ি রুমালে রাখা তেলে পিঠা আনা করে অন্ধ।
সতর্ক কান ভীতু হরিণীসম চুপি মৃদুপদ নুপুর ঝংকারে,
প্রেমিক ওরা দু'মন হারায় তমাল তলে সন্দিগ্ধ আঁধারে।
হৃদয়ের উষ্ণ মদন আলিঙ্গনে দু'বাহু আর করতল কাঁপে,
বিগলিত হিয়া, যৌবন রসের তটিনী ভাসে কখনও পাপে।
সোনা-সোহাগা মিলন, আত্মার বন্ধন বুঝি আরও দৃঢ় হয়,
যুগল আত্মা, চোখের সাগর গভীরতায় যৌবনে ধীরে বয়।
শান্ত সৌম্য মানব-মানবী হিয়া অতঃপর আনে জয় করে,
আত্মা প্রাণেশ-এশক অসীম মমত্ব খাস চায় মিনতি ভরে।
সার্থক প্রেম তারেই বলে যা পরিণতি পায় ঐ ঈশ্বর-পথে,
যেতে যেতে এ মহাপ্রেমে, এশকে এলাহী খুঁজেমতে মতে।

১১/১১/২২ কিশোরগঞ্জ।

বুদ্ধিই স্বর্গদূত !

আমি একদিন ঘুরতে ঘুরতে উড়তে উড়তে যাই
প্রশান্তমহাসাগরে, তারপরে দক্ষিণ গোলার্ধে ধাই ।
উঃ-দঃ গোলার্ধের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে সৌদি উঠি,
জাবালে নুর পর্বতে ঐ হেরা গুহায় অতিথি জুটি ।
আমার রুহ স্রাণ শূঁকে ফোরকানের সূতিকাগারে,
এখলাছ এছলাহ দম লয়ে নূজ্য হই ঈমান ভারে ।
মর্তে ক্ষুন্নীবৃত্তির দায়ে দেহে ঢুকি তেজারতি করি,
আয় রিয়াল টাকা, ডলার সংসার করি জেব ভরি ।
এলে আজান জুমাবারে তুরা বন্ধ করি তেজারতি,
আমি উঠে যাই আর দশজন হয়ে দিয়ে কী যতি !
স্মরি আমার ঈশেরে প্রাণ ভরে আজিকে অর্ধবেলা,
নিশি জাগি প্রাণেশে-খুঁজে, ধ্যানে করি ফের মেলা ।
স্বর্গ পানে রিপু পুড়ে পুত হয়ে সাদা বস্ত্র পরিধানে,
যাই রওজা মোবারকে ধন্য আমি ঐ সোহাগ বানে,
কান্না কাতর এতিম মজলুম আত পীড়িত শত জনে ।
দানি শান্তি বারতা, ঐ আত্মশক্তির রোধিরে জয় রণে ।
যেন খবিশ খুবলে না খায় আর মানব এ জনমে এসে,
বুদ্ধিই স্বর্গদূত, বুঝে একীন ঈমান, হারে পাতক শেষে !

১৫/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

সত্য দায়

আমি কেন এসেছিলাম, কী করতে এসেছিলাম,
তা জন্মপূর্বে নাথ চিহ্নিত করেন, বুঝেই নিলাম।
আমার বুকের ভেতর বাসা বেঁধেছে সন্ধ্যাস-গুরু,
ঐশ্বরিক এশক আবহে মুহ্যমান হিয়ার চলা শুরু।
কভুজানিনে তবে স্থান-কাল, রূপ-রস-গন্ধ ভরে,
পাইনি কুসুমাস্তীন বরং কন্টকাকীর্ণ ইংগিত করে।
আমি গৃহী, বিষয়ানুগত হতে পারিনি গো বিবাগী,
যোহদ জাহেদের তাকওয়া, রিপু পুড়ে পুত ত্যাগী।
প্রাণনাথ ভাবনায় কুশলী কেউ, কেউ স্মরণে অনন্য,
আমি আটকে গেছি কাদাজল পাতকে পথহারা বন্য।
একাত্ম নির্ভাবান অধ্যবসায়ী নই, পাইনি সিদ্ধি আজও
ষাটোর্ধ এক প্রবীণ, নিষ্পাপ উন্মত্তে ইয়াসীন তাজও।
বারবার লক্ষ্যচ্যুত যাত্রী ছিনতাই হয় মনোযোগ সম্বল,
নুন আনতে পানতা ফুরায়, অলি-স্বপ্ন ছুঁই ছেঁড়া কম্বল।
আমাকে করেছে উদভ্রান্ত নানাজাত কল্পনা দিয়ে যন্ত্রনা,
তবু রয়েছি ধরে সিরাতুল মুস্তাকীম, মুক্ত খান্নাছ-মন্ত্রণা।
কালেমা ত্বাইয়েবার অগ্নি সাযরে দক্ষ, নিই সুখ-শ্বাস,
আসিবে কী আত্মায় নুরানী নুর! এ জনমে আছে আশ।
ভাসি নিশ্চিত বিপদে নির্জনে একাকী মুর্শিদ গুরু কই,
গুপ্ত জ্ঞান অর্জনে অগ্রসর নই, অমূলক ভাবে ব্যস্ত রই।
সতর্ক হরিণসম বাঁচিলে, ক্ষণ সদ্যবহারেই রক্ষা হবে,
নিশি ভরে তাহাজ্জুদ-জিকির অমল নিশ্চিত স্বর্গ লভে।
ক্ষণ ক্ষণ স্মরণ মহাক্ষণ গিরিসম কর্মফল সরল পথে,
আর ভাব ফেলে সাফ চড়িতে চাই হে, ঈশ সুর রথে।
খাস রহম হেদায়েতে মেলে যা অভিপ্রায় তা জগদীশ,
বন্ধুর পথে ওই আপদ এসে কেড়ে নিবে সবি অর্হনিশ।
বেছে নেয়া কঠিন, সব ঈশ-বাঞ্ছাধীন কেউ ভালে পায়,
ঢেলে শ্রম-ঘাম ধরিব শ্যাম এ হলো অভীষ্ট সত্য দায়।

১৬/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

সফল জীবন্মৃত

রূপার মুদ্রা না সোনার মুদ্রা কোনটা চাহি আর আমি,
‘শাহনামা’ আমার তার চেয়ে কী কম না বেশি দামী!
প্রচারাকাজ্জা আর আত্মশ্লাঘা আত্মার বিপদ ডাকিয়া,
করে কুপোকাত আর গতর হয় নাদুস নুদুস পাকিয়া।
মারেফাতে নিষিদ্ধ তা, নাথ রাখি আপনার হাওলায়,
বান্দা রহে মালিক-রেজায়, মাখলুক এশক্ মাওলায়।
গভীর নিশি ভরে দরবেশ রহে স্মরণে বিভোর একা,
ক’জন জানে সে একগ্রতা শ্রমঘন কাতরতার দেখা।
জীবনে উঠার সিঁড়ি প্রচারে নাই, আছে রেজা বৃদ্ধিতে,
বহুকাল ধরে কাজে ব্যপ্তে, আছে আত্মমগ্ন সিদ্ধিতে।
যে যায় আগে, বড় বলে জাগে, তুমি নাই তার ধারে,
তটিনীর তরঙ্গ তটে এসে ক’টাই সার্থক হতে পারে।
তোমার জীবনে টেনে আনো স্বাদ অর্চনার, তাহে মজে,
যেভাবে যে রহে, ধন্য সে, ললাটে রহে সুখ ঈশ ভজে।
আমি চাহি গো গীতি কবিতার বিলাপ লাশ ‘পরে চাহি,
হেথা রহে মারেফাত রাহে খোদার, স্বাদ আহলাদ দাহি।
রিপু পুড়ে পুত হয়ে, যোহদের মোড়কে পুরে ঈমান করে
মিটাব পিয়াস কাউসারে, হক দৌলত কবরে আনন্দ ভরে।
দরবেশ নসিহত গিজ গিজ করে ইবলিশ দূরে, স্বর্গদূত ঐ,
এশকে এলাহী জ্বল জ্বল করে জীবন্মৃত আমি কামড়ে রই।

১৭/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

একি অপরূপ রূপ হেরি ভরসার !

একদিন আমি অম্বরের ঠিক নিচ দিয়ে ভেসে ভেসে
মেঘে চড়ি, মাথায় ছিল জরীর টুপি,
গায়ে আজানুলব্ধিত কোর্তা, শশ্মমন্ডিত একবৃদ্ধ এক
জায়গায় গিয়ে পাইমরু-বায়-উঁকি।
উঁচুমাগের মহান তাপস হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ
(আঃ) ছাহেবের বাটির চিহ্ন আলয়ে,
পৌঁছুতেই আমি স্থির হয়ে গেলাম, বন্য প্রাণ-কীট-
পতঙ্গ-নৃ-ভক্তি রূপ ছটায় সভয়ে।
ভীম-ফল-ফুল-মহীরুহ ধরে আরও জানা অজানা
সবের সশ্রদ্ধভাবে অবাক হয়ে রই,
আরও গাবরে গেলাম দেখে কেউ ফিরে না উষা-
গোধূলী বেলায় না ভোজে না লই।
বল্লাম এ শিক্ষা কার, শুনলাম কেন জান না হে
কবি, এ হল আমাদের প্রিয় নবী,
হযরত ইব্রাহীম (আঃ), সমীপে কেহ গেলে ভুড়ি-
ভোজ করেই ফেরে সিদ্ধি লভি।
ঠোটে লয়ে অগ্রভাগে থাকে ভরসাধারী অনায়াসে
ঈশ্বর আদেশ ধরি; আমি সম্মান
ততোধিক রেখে গেলাম বাদশাহ নমরুদের অগ্নি-
কুন্ডলে যেথা খলিলুল্লাহ মহান,
স্বর্গদূত সতীর্থ না হয়ে ঢুকেছিলেন তাওয়াক্কুল-
শ্রেষ্ঠ নবীবর! আহ! কী আরাম
অগ্নিকুন্ড যে বাদশাহ কাফের নমরুদের চোখে
ধূলো, মোজেজা নবীর! তামাম
জগৎ জানুক এ কুদরতে এলাহী, ভরসার নজীর!
একি অপরূপ রূপ হেরি ভরসার!
সত্যব্রতধারীর চিত্ত বিগলিত সাধনা সিদ্ধি-লাগি
আজি প্রাণ চাহে, তরী বহি আশার।

১৮/১১/২২ কিশোরগঞ্জ

ঘুরে ফিরে ভুল আসে

যখন যে ভাবনায় ছিলাম আমি,
মধুমক্ষিকার মধুচক্রের নিরাময়ী সুধা দান, অর্ন্তযামী
আর আমি একাত্রে নিবিষ্ট চিন্তে,
রিয়াজত, তওবায়, রিপু পুড়ে পুত হয়ে রহি, আদিভ্যে
ক্ষুধা আর খবিস ন্যের মধ্যখানে,
অহোতমা জ্বলে, শশীর কোমল ঈমান জ্যোৎস্না দানে।
এশকে রব তাওয়াক্কুল-কলিজায়,
লহু দিয়ে আপাদমস্তক সজীব রেখে সাধে তার দায়।
আমার ভুল না আর সবার চলে,
ধরায় প্রাপ্তির অধরা ধরার অবিরাম ছেঁটা, নিষ্ফল ফলে।
ছুঁই বিষাক্ত ছলনাময়ী রূপবান,
মায়াজালে করে বশীভূত, এই এখলাছ করে খান্ খান।
মদন নেশায় মত্ত, ব্যভিচার ঘায়,
ধরার আমি অসহায় আত্মসমর্পণ করি খান্নাছ-ঘরাণায়।
যোগাই অস্ত্র ঐ পাতক কাটিবার,
ভুলে বিভ্রান্ত আদম-ঈভ সন্তান, মজ্জাজাত অস্থির অপার।
ললাট গুঁজে কাঁদিকাটি নির্মল হই,
হায়াতে জিন্দেগীর শেষটায় কী, সদা সেই ভাবনায় রই।

২৫/১১/২২ কিশোরগঞ্জ।

যে পথে ঈশ নৈকট্য

জীবনের সবগুলো মিনিট সেকেন্ড ঘন্টা
হারিয়ে আজি নিঃশ্বাস প্রায়, আর অল্প,
দুর্বল সময় দিয়ে কতইবা পারব সব যা
উতড়েযাবার জন্য বিয়োগান্তক গল্প।
ফিরে দেখি আমার চক্ষু ফিরা পশ্চিমে ঐ
নাক-মাথা ঠেকে আছে প্রাণনাথ ঘরে,
হাত-পা-হাঁটু মোড়া, স্তব্ধ নিখরসমর্পিত
ভূমিলগ্ন লাশ কেউবা কাঁদছে অঝরে।
এভাবে শরীর মন নেতিয়ে পড়া দেখিনি
কখনও তবু যদি শেষ রক্ষা হয়, আশে
তবু যদি উচ্ছেদ্যে যাওয়া মন স্থির বসে
নৈকট্য উপায় দেখে অর্চনা ভালবাসে;
সন্ধ্যা-মধ্য-শেষ নিশি আর কাটে না গো
অঘটনঘটনপটিয়সীর মিথ্যের বেসাতি,
করাল গ্রাসে আত্মপ্রসাদ আর খবিস চর্চায়
মত্ত, তাই মধ্যতিমির ঘুমকাতর-বজ্জাতি,
আচরি ফিরে না পায় নিজ উন্নতি ধরাধামে
কী করে পেতে হয় গো মুক্তি বেহুদা যত
বেসুরা যত কর্কশ ক্লান্তিকর কন্ম হতে মুক্তি
কই বুঝে চায় সালাত, আর সব মিছে ব্রত।
ধূয়া ধাঁ ধাঁ কাকে কী দেবে সেই আশায় কে
আছে নির্বোধ যত করিও না ফেরি সর্বহারা
মেধা অজাতে, সময় ধরে বরে, তাকওয়া দুধ
হতে মাখন! সম্মুখে পর জনম আছে সারা!

২৬/১১/২২ কিণোরগঞ্জ।

ফল চাহি ভেঙ্গো না মনোবল

কাজে আনন্দ কুঁজো, কাজই মোক্ষম, কী! ফলাফল,
জানে প্রাণনাথ, এশকে এলাহীর পথে ঐ পথে,
জান কোরবান করে আখেরে পাবে সুখ স্বর্গ অবিরল,
কামাই নাই কামে খাটো অহোতমা হাত রথে।

মানব জাতি আপনি আপনার বুট কল্লনা জালে বন্দী,
এখানে ওখানে জড়ায় রয় কেহ আসক্তি-কশে,
বেহাল দশা! মুক্তি খুঁজো না ভোগ ভক্তির নন্দিত নন্দী,
প্রাণপাত নহে অসাড়ে, জীবন লেপিও না মসে।

যেথা রহে অসরল, নিত্যানন্দ ভোগ মত্ততার, অসততার,
যেথা রহে চুরি বাটপারি, প্রবঞ্চনার বিষাক্ত লীলা,
চাই নাকো আমার পথে এমন কারাগার খুলে ধ্বংস দ্বার,
জীবন যাবে অঘোরে, নিবে মিথ্যে বাড়-বৃষ্টি শিলা।

২৭/১১/২২ মিরপুর ঢাকা

হৃদয়চারী ২য় খন্ড (৩য় অংশ)

১। মেঘের আড়ালে সূর্য- উপন্যাস (২য় সংস্করণ)

২। ঘোটকের জবান ১ম ”

৩। মনিকাঞ্চন যোগ-উপন্যাস (২য় সংস্করণ)

মেঘের আড়ালে সূর্য

হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞা

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মাইনুল হাসান,

যুগ্ম সচিব (অবঃ),

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

মেহেরা হাসান

পৃষ্ঠপোষকতায়

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

কিশোরগঞ্জ সদর

মেঘের আড়ালে সূর্য

[এ উপন্যাসের কাহিনীর স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী কাল্পনিক]

ছদ্মবেশীর মতো মনের সমস্ত কামনা-বাসনা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ঘুরছি আমি এক অজানা রাজ্যে কিসের আশায় আমি কিছুই বুঝি না। মুক্ত বিহঙ্গের মতো সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াই মুহূর্তে। অপূর্ণ সাধ মিটাতে আশ্রয় নেই কল্পনালোকে। অথবা চিরন্তন সত্যকে নির্ভর করে চলে আমার অভিযান। সে অভিযান কান্তার মরুতে দুর্গম গিরি পর্বতে অথবা বিরাট অরণ্যানীর মধ্যে।

আমি কে? আমাকে ধারণা করতে পারি না। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেই। আকাশের তারকা হয়ে নক্ষত্ররাজির মামা হয়ে আমি বেড়াই কল্পনালোকে। সত্যি তাতে আমার ভালোই লাগে। সমস্ত সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য মনের কৌতূহল অদম্য। সমস্ত সৃষ্টি কী এক অনবদ্য নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধা! কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। যদি তার এক বিন্দু ব্যতিক্রম ঘটে তবে নিমেষে হাসি-কান্নায় জীবন প্রবাহে ভরপুর এ পৃথিবীটা মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। আমার কৌতূহল হলো ঐ যে অগ্নিপিণ্ডটা দেখা যায়- যার আলোকে পৃথিবীটা দেদীপ্যমান তাকে জানা, কিভাবে সে অনাদিকাল থেকে আলোক দিয়ে আসছে বিন্দুমাত্র তার ঘাটতি নেই। কেইবা তাকে সৃষ্টি করল। আমরা তো জানি, যার সৃষ্টি আছে তার ধ্বংস আছে। ঐ যে আমাদের সেবায় নিয়োজিত বিদ্যুৎ কারখানা যেখান থেকে বিজলি এসে মুহূর্তে সমস্ত শহরটা আলোকিত করে দেয় কিছু এই কারখানার তো ধ্বংস আছে। একটি অংশ বিকল হলেই সমস্ত কারখানাটাই বিকল হয়ে যায়। আর

সাথে সাথে সমস্ত শহরে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু ভাবুন তো সূর্যটার কথা, সে অনাদীকাল থেকে আলোক দিয়ে আসছে। অথচ তার কোনো অংশই বিকল হয় না। এখানে বিবেচনার রহস্য দানা বাঁধে। সত্যি কারখানার সৃষ্টিকর্তা আর সূর্যটার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বিরাট একটা গরমিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানেই অন্তর্দ্বন্দ্ব কেটে যায়। মুহূর্তে একটি সিদ্ধান্তে মাথা নত করি যে, সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি এক মৌলিক, তার ক্ষমতা তুলনাবিহীন, তুলনাবিহীন কৌশলী তিনি।

এমনি করেই কল্পনার বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে ভাবছিল ছদ্মবেশী তার কল্পনার পাখায় চলা হতে হঠাৎ থামিয়ে দিল রোস্তুম। সে বলল, কি রে কি ভাবছিস? তোকে নিয়ে আমার যত ভাবনা। উত্তর দিল ছদ্মবেশী, হ্যাঁ রে রোস্তুম তুই কি আমাকে বলে দিতে পারিস, কেন মানুষের অধঃপতন ঘটে? এখন রাখত তোর অধঃপতন-টধপতন। এসব ভাববার সময় আমার নেই। ঐ যে শালারা আসছে দে ছুট-বলে পালিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে রোস্তুম। এই রোস্তুম সে কি পুরুষ। অন্যায় দেখলেই তার রক্ত টগবগ করে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে সে তো তৎক্ষণাৎ অত্যাচারিকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে বসে। লম্বা গোছের এই মানুষটা তার গোঁফ পাকিয়ে ঘুরে। তার রঙ ফর্সা, কথা আস্তে বলে, গাভীর বজায় রেখে চলে সর্বদা সহাস্য বদন, বন্ধু মহলে তার জুড়ি নেই।

এই রোস্তুমটি কে, কি তার মূল পরিচয় যথাস্থানে তার ডানপিটে স্বভাবের কথা বলবার আগে বলতে হয় যে আমার ভাব সহচর। আর দশটি সাধারণ ছেলের মতো সামান্য বিদ্যে অর্জন করে তা বিক্রি করে দিয়ে অর্জন করেছি ক্ষুণ্ণবৃত্তির উপায় চাকরি। রোস্তুম সে দূর পর্যন্ত আগাতে পারেনি।

যাক ততক্ষণে অফিসের সময় গড়িয়ে এসেছে। তড়িঘড়ি নাওয়া-খাওয়া করে অফিসে ছুটলুম। দেখলাম পথে একটি ভিক্ষুক। তাকে আমি বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করে আসছি। তার কাজ হলো এই যে, কোনো একটি ছিমছাম কোট-প্যান্ট-টাই পরা লোক দেখলে তার

পিছনে লাগবে। যতক্ষণ না পয়সা দেবে ততক্ষণ তার পিছন ছাড়বে না। আর সুযোগ পেলেই তার পা ছুঁয়ে বসবে। পথচারী আর করে কি? পকেট থেকে পয়সা বের করে তাকে দিয়ে দেবে। কেউবা দু'চারটে বকুনি দেয় তার এই অমার্জিত কাণ্ড দেখে।

লোকটা বয়সে বৃদ্ধ। দাড়ি-চুল পেকে গেছে। হাতে একটা ভাঙা বাসন, ছেঁড়া একটি লুঙ্গি আর গায়ে জড়ানো একটা ন্যাকড়া। “একটা পয়সা দিলে সত্তরটা পয়সা দেন আল্লাহ।” সারাদিন এই তার জপনা। যাকগে ততক্ষণে অফিসের দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। অফিসার মহোদয়কে সালাম ঠুকে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। অফিসে কাজ একটা বিশেষ কিছু নেই। তাই যতক্ষণ অফিসে থাকি ততক্ষণ একদম বসেই থাকি বলতে হবে। ঘন্টা দু-তিনেক বসে থেকে ফিল্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম।

সাইকেলে চড়লাম। গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে চলেছি। এটা মনচর এলাকা। বসতি ঘন ও পাতলা উভয় রকমই আছে। যাকগে, বলছিলাম কি, মেঠোপথে সাইকেল চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে আমার মন উদাসীন হয়ে পড়েছে। গ্রামবাংলার এই নিবিড় রূপ দেখে কার মন না বিগলিত হয়।

বসন্ত ও শীতের মাঝামাঝি সময়। শীতও নেই তেমন, গরমও নেই। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় না। মিষ্টি-মধুর আবহাওয়ায় দূর-দূরান্তের গাছরাশি সত্যি কবিমন পাগল করে তোলে। যাক কৃষাণরা মাঠে তামাক ক্ষেত নিড়াচ্ছে আর গভীর নলকূপের সহায়তায় বোরো রোপন করছে কোমড়ে গামছা হাতে নিড়ানি পরিধানে অল্প দামি লাল খয়েরি রঙের লুঙ্গি। যুবক-বৃদ্ধ একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কোথাও আবার দেখলাম তালগোল পাকিয়ে বসে তামাক টানছে। সত্যিই দেখার মতো।

ইউপি কার্যালয়ে পৌঁছে এবং স্থানীয় গ্রামীণ হর্তাকর্তাদের সঙ্গে অল্প আলাপ-আলোচনাতেই বুঝতে পারলাম তারা অন্য এক জগতে আছে। সেখানে কেবল আছে স্বার্থপরতা, হঠকারিতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার আর গরিবের সম্পত্তি আত্মসাতের গোপন ষড়যন্ত্র। এক ধনীলোক গরিবকে ঠকিয়ে নির্মূল করে কিভাবে বড় হবে কওে সেই কুচিন্তা। সিনেমা হলের রূপালি পর্দায় দেখেছি কুচক্রী শামছুজ্জামান। দেখলাম এখানেও ঐ রূপ জামানের অভাব নেই। যাক আমি এখানে এসেছি আতঁপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে, সরকার পাঠিয়েছেন। তাদের জন্য এই কুচক্রীদের মোকাবেলায় কত দূর বা কি করতে পারব আল্লাহ জানেন ভালো।

যেখানে গরিব না খেয়ে, অর্ধাহারে-অনাহারে ধুঁকে মরছে সেখানে ঐ মানুষরূপী পাষণ্ডগুলো কিভাবে বিদেশ থেকে খয়রাত করে আনা গম আত্মসাৎ করে ভেবে অবাক হই। দুঃস্থ-মাতাদের জন্য আনা কাপড়-চোপড় তারা বিক্রি করে দেয় আর যে দু'একটা দেয় তা ওদের ইজ্জতের বিনিময়ে। এদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারে না গ্রামের ঐ তোতা মিয়ার তের বছর বয়স্কা মেয়েটি। যাক এদের কার্যকলাপের ডায়েরি আমি লিখতে পারব না, এতে কলম আর কালিই অযথা খরচ হবে আর সাথে সাথে মানসিক অস্থিতি অনেক বেড়ে যাবে। কি কাজ আছে, এরা মানুষের উপর এমনভাবে চড়াও হয়ে বসে আছে যে এদের বিচার করার মানুষ নেই। আজকাল তেলে মাথায় তেল দেয়ার জন্য মানুষের অভাব নেই।

গুটিকয়েক বন্ধু সমভিব্যাহারে রওনা দিলুম বিকেলবেলায় বেড়াতে। সবাই মিলে ঠিক করলুম নদীর চরে বেড়াব। নদীটার নাম আড়িয়াল খাঁ অর্থাৎ উহাকে প্রবল স্রোতস্বিনী বলা চলে না, বলা চলে স্রোতবিহীন লম্বা জলাধার। তার এহেন করুণ অবস্থা দেখে সত্যিই কান্না পায়, উহাকে একটা স্মৃতি বিজড়িত ভগ্ন প্রাচীন খাঁ বাড়ির মতোই

মনে হয়। এক সময় উহার প্রবাহ ছিল প্রবল। অসংখ্য নৌকা নিয়ে মাঝিমাঝারী দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করত। কত মানুষ পারাপার করত। কালক্রমে জনৈক কুচক্রী চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রে উহার উপরে বাঁধ চড়াও হয়ে বসে। আর তার সাথে সাথেই গতিশীল নদী নিথর হয়ে পড়ে।

যাকগে উহার সাবেক চর এবং বুকের কিছু অংশ স্থানীয় কৃষকের এখন খামার। আর সেই খামারেই রয়েছে একটি চিতাশাল। ধুধু বালুচরে ঐ শ্মশানটাকে মনে হয় যেন একটি নদীর উপর ভাসানো জলচৌকি। সেই চৌকির ভিতরে রয়েছে যে কত রহস্য তা জানার উৎসুক নিয়ে চললাম সেখানে। দেখলাম দূর থেকে কেবল ধোঁয়া উড়ছে আর ধুতি পরিহিত কতক লোক দাঁড়িয়ে। ছয় বন্ধুর চার জন ভড়কে গিয়ে কাছে যেতেই পারল না। কি জানি ঐ লাশটা আবার রাত্রিবেলায় রাক্ষস হয়ে গ্রাস করতে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে ইতস্তত করে বললাম, তোরা কেউ যদি যেতে সাহস না পাস তাহলে আর কি, আমি একাই যাব। চার জন চলল সাথে আমার মতো দেখার আগ্রহ নিয়ে। একটি বড় বটগাছ তার গোড়ায় অর্ধনির্মিত কতকগুলি দেয়াল, বিস্তীর্ণ জায়গায় রঙিন গাছ। সব পরিস্থিতি মিলে এমনটা মনে হয় যে, এ এক অভূত জায়গা। তাই তো দেখছি কয়েক বেটা লম্বা লাঠি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা নাড়াচ্ছে। বুঝতে দেরি হলো না যে, নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু মারা গেছে এবং তাকে ভস্মীভূত করা হচ্ছে। আন্তে আন্তে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, শেষ? মোলায়েম ভাষায় লম্বা চুলওয়ালা ধুতি পড়া এক মধ্যবয়সী লোক জবাব দিলেন, আছে, তবে একটা নাভী। এই বলে একটা বাঁশকে দুই ফালি করে তার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা ইঞ্চি তিনেক লম্বা একখানি কালো পর্দার মতো দিলেন, দেখলাম। আগ্রহ সংযত করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, মুখাগ্নি কে দিলেন?

কথাটার ভাব বুঝে অন্যভাবে ঘুরিয়ে (সাধু মশায় যার সাথে কথা বলছিলাম) জবাব দিলেন, পুত্র থাকলে তিনিই অথবা তিনিই অথবা ধরেন বংশ বুনিয়েদের মধ্যে যদি কেহই থাকেন তিনিই মুখাণ্ডি করেন।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা ভাই কেমন করে লাশটা পোড়ায়?

লোকটা পদ্ধতিটা বুঝিয়ে বলতে লাগল, দু'দিকে দুটো কলাগাছ রেখে খুঁটা দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে দিয়েছে। তারপর লাকড়ির উপর লাকড়ি রেখে সুকৌশলে কোমর সমেত উঁচু করেছে। আর তার উপরে লাশটা শুইয়ে লাকড়ির নিচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনসমেত ধোঁয়া উঠে ধীরে ধীরে লাশটির রঙ বদলিয়ে দিয়েছে। তারপর নাকি লাশের শরীরের তেলে আগুন ধরেছে নাক, মুখ, কান, ইন্দ্রিয়গুলো পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই বহু দিন লালিত আদুরে মানব সন্তানের দেহটি পুড়িয়ে তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্বর্গে কতদূর গিয়েছেন তা সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন।

আগাগোড়া সব ঘটনা শুনে ঐ দিনেই সমস্ত গাংটা শিউরে উঠছিল। বন্ধুর অনুরোধে আর থাকতে পারলাম না। আর কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে মহাশয়ের কথায় কথায় নিজেকে কত দূরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ বন্ধুর টানে চলে আসলাম। পথে দেখা এক লোকের সাথে। লোকটি উপযাচক হয়েই জিজ্ঞাসা করছিল, হিন্দু পোড়া হয়ে গেছে? কিছু রসিকতা করেই জবাব দিচ্ছিলাম, একটা নাভী নাকি বাকি আছে মাত্র।

যাক লোকটা হাসল। তারপর বর্ণনা করতে শুরু করল সে অনেক দিনের কথা, পনের-বিশ বছর আগের কথা, শ্মশানে লাশ পোড়া দেখতে গিয়েছিলাম, আর আগুন দেয়া মাত্রই লোক উঠে বসে

পড়ল আর দাঁত খিলখিল করে হাসতে লাগল আর দেখে বাপরে বাপ বাঁচাও কে আছ খেয়ে ফেলবে বলে দৌড় দিয়েছিলাম ।

সে দৌড়ে কত দূরে গিয়েছিলাম, কখন আমার জ্ঞান ফিরছিল কিছুই বলতে পারব না । শুধু এটুকু জানি এক বাড়ির বাংলোঘরে শুয়ে আছি- পায়ে ব্যান্ডেজ, মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে জলপট্টি দেয়া ।

যাকগে, আমি নাকি পড়ে আছিলাম এক জঙ্গলের কাছে, মাথা থেকে রক্ত ঝরছে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে পা কেটে । পরে মনে হচ্ছিল গাছের সাথে নিজেকে ধাক্কা লাগিয়ে আর ইট-সুরকি প্রভৃতির সাথে হোঁচট খেয়ে নখ প্রায় অনেকগুলিই উপড়ে গিয়েছিল । শেষে এ যাত্রায় বাঁচলাম প্রাণে মরা থেকে ।

সে এমনি করেই আকারে-ইঙ্গিতে বর্ণনা করে যেতে লাগল যে চিতাশাল দেখে আসলাম অথচ তখন মনে যে ভয়ের উদ্বেক না হচ্ছিল এখানে তার কথা শুনে ঠিক তার দ্বিগুণ ভয়ে মন-প্রাণ কেঁপে উঠছিল মাঝে মাঝে ।

বন্ধু আবেগে-ভয়ে-উল্লাসে ঐ লোকের সাথে দু'এক ঘটনা যোগ করল । বলল, আমার দাদাকে বলতে শুনেছি । এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে নিয়ে লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল মধ্যরাত্রে । সেখানেই নাকি ভড়কে গিয়ে বন্ধুটির জীবনহানি হয় ।

এমনি করে তার সহসাথীকে বলল, ভাই তুমি অন্ধকার রাত্রি যদি এই লাশ কাটা ঘরে লাশটা দেখতে যেতে পারো তাহলে তোমাকে বহু টাকা পুরস্কার দেব । পুরস্কারের কথা শুনে বন্ধু ভাবল, ঠিক আছে যাইযাই দেখি না কেন? অপর বন্ধুটি লাশ সেজে সেখানে গিয়ে শুয়ে রইল, অতঃপর সে ঘরে যেতেই হু করে ঘরে হেসে উঠল । সাথে সাথে বন্ধুটি ভড়কে গিয়ে মারা পড়ল আর কি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি আমার বাটীতে বসে আছি। বাটী তো নয় একখানি চৌচালা ঘর, তাতে চার বন্ধু মিলে মেস করে থাকি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবোলতাবোল অনেক কিছুই ভাবছিলাম। সে ভাবনাগুলি এমনই বিচ্ছিন্ন যে তার কোনো বর্ণনা দেয়া মুশকিল। বোধকরি তখন রাত হবে একটা। এক বন্ধু চাকরি করে কোর্টে। মামলার নথিপত্র নিয়ে বেচারা বিপদে পড়েছে। মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীদের শুনানির নকল। পাঠকের বুঝতে দেরি হবে না কত লম্বা যে সে নথি- যে একবার না দেখেছে তাকে বুঝানো মুশকিল। বললে বন্ধুবর, তোমার হাতের লেখা সুইফট হ্যান্ড। তাই দাও না আমার শুনানির নকল লেখে।

বন্ধুর অনুরোধে ধরলাম মোকদ্দমার শুনানিতে। লিখে চলেছি আর শেষ হয় না। ধীরে ধীরে মনটা নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে। হাত ও কোমরে ব্যথা ধরছে। স্বস্তির জন্য মনটা ছটফট করছে। এমনি সময়েই রোস্তম এসে হাজির। বললাম, রাখো তোমার শুনানি। এবার রোস্তমের দুঃসাহসিক শুনানি শুনে মনটা সতেজ করব।

বললাম, ভাই রোস্তম, তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনটা যেন কি বলে ওঠে। কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছুই বলতে পারিনে। তুমি কেমন পুরুষ ভাই, যদি তোমার মতো হতে পারতাম! রোস্তম এতক্ষণে মুখ খুলেছে। বলল, আজ রাত এক জায়গায় যাবি? অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়ে আনব। প্রত্যুত্তর না করে তার সাথে সাথে চললাম। কোথায় চললাম কেন চললাম কিছুই বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জানি, আবেগে আপ্ত হয়ে এই অপূর্ব মরদের পাশাপাশি দ্রুত বেগে কোথায় যেন চলছি।

এক বিরাট নদীর চর। আইল দিয়ে তামাক ও গম ক্ষেত বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কখনও পাতা নাড়িয়ে কখনও হেলেদুলে আইল দিয়ে চলেছি। মাইল দুয়েক যাওয়ার পর পেলাম এক অদ্ভুত বট গাছ। বিকট

কালো মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এরই নিচে একর তিনেক উঁচু ভূখণ্ড।
পরে তার মুখে শুনেছি-ইহা এক গোরস্থান।

যাকগে আমি তো আর আগে জানি নে। জানলে হয়তো ভয়ে
পাথর হয়ে যেতুম। বটগাছের নিচে বসে পকেট থেকে একখানি
সিগারেট আর ম্যাচ বের করে দুই ঠোঁটের মধ্যখানে দিয়ে আগুন
ধরিয়ে দিল। লম্বা লম্বা কয়েক টান দেয়ার পর বলল, শুনবি? আমি
বললাম, কি শুনব? সে বলতে লাগল এক ঘটনা। ঘটনাটা আমার মনে
বেশ দাগ কেটেছে। শুধালাম বল।

সে বলতে লাগল- সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে বাড়ি
ফিরছিলাম। বড় জেলা শহর রাত বারোটোর পর রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা
থাকার কারণে কারফিউ এবং পুলিশ বাহিনী পাহারায় থাকে। পরে
বাড়ি যাওয়ার সহজ রাস্তা ছেড়ে যেখানে পুলিশ থেফতার করার সম্ভাবনা
নেই সেই রেললাইন দিয়ে চলেছি। পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে।
কিছুদিন আগে কতক বদমায়েশ ডাকাত দলের সাথে আমার ঝগড়া
শেষে এক রকম মারামারি হয়েছিল। সবগুলিকে হারিয়ে দিয়েছিলাম।
তাদের সর্দার দৌড়াতে দৌড়াতে আমাকে বলে কি তা জানো! খুন
করব। আমি মাথা নাড়লাম। অন্ধকারে সে দেখে ছ কিনা জানি না।
এর পর বলতে লাগল, মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করেছি। সামনে
পড়েছে একটা বড় বিলের মতো। প্রায় সমস্ত বিলটা জুড়েই বুকসমেত
পানি। রেললাইনের দু'ধার দিয়েই এই বিল প্রায় আধ মাইল লম্বা।
সমস্ত বিলজুড়ে রয়েছে কচুরিপানা। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কিছু লোকের
যেন একটা সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বুদ্ধি আঁটলাম এদের পাশ
কেটে যাব। তাই নেমে পড়লাম পানিতে, কেবল মাথাটা বাঁচিয়ে পানি
দিয়ে চলতে লাগলাম।

কোয়ার্টার মাইল এমনি করে গিয়ে এই ডাকাত দলকে এড়িয়ে আসলাম। ইহার পরে পড়ল একটি সেতু। সেতুর কাছেই ছিল একটা বাঁশঝাড়। এই ঝাড়ের চতুর্দিকে ছিল কলা গাছ, কড়ই গাছ প্রভৃতি। ওদিকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনলাম, পাশেই তমসাস্থন্ন রাতে সহায়তা করল হাতের টর্চটি। হাতটা একটু বাঁকা করেই টেনে টিপনি দিলাম। দেখলাম অদূরে একটি মোটাসোটা প্যান্ট-শার্ট পরিহিত একটি লোক এবং তার পাশেই ভয়ে কম্পমান প্রায় অর্ধপাগলিনীর মতো একটি যুবতি দাঁড়ানো। মেয়েটির মুখে টর্চ ধরতেই বুঝলাম যে আমার বন্ধুর ভগিনী এবং পরিচিত। তৎক্ষণাৎ আমি কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করেই আরও কাছে অগ্রসর হলাম। দুটো লোক হাতে ছোরা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি অগ্রসর হয়ে একটি লোকের সাথে লড়লাম। সে এক কৌশলে। কারণ আমার হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না এই টর্চটি ব্যতীত। যা হোক টর্চটি শরীর থেকে দূরে ও ডান পাশে রেখে তবেই টিপ দিলাম। যাতে ছোরার আঘাত পাশ কেটে যায়। তাই হলো। তখন অপূর্ব কৌশলে লোকটির হাতের কজিতে ধরে ফেললাম। আমি ধরে জোরে হাতের রগে টিপুনি মারতেই ছোরা পড়ে গেল। অতঃপর দু'এক টুসি বুকে মেরে ফেলে দিলাম। অন্যটির হাতে কোনো ছোরা ছিল না। অতি সহজেই তাকে পরাস্ত করে অতঃপর আসল ক্রিমিনাল, যে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ ছোরাটা হাতে নিয়ে তার দিকেই অগ্রসর হলাম। পূর্ব কায়দা অনুসরণ করে তার দিকে অগ্রসর হতেই সে মেয়েটিকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি সোজা তার উরু বরাবর মারলাম এক আঘাত। বোধ করি তার উরু এপার-ওপার হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাকে আচ্ছামত কিল-ঘুষি দিয়ে টুটি ধরে কাছেই ডোবার কাছে নিয়ে এলাম। সে উহু-আহা করে চিৎকার করছিল। তাকে আমি ধরে জোরে পানিতে নিক্ষেপ করলাম। অবশিষ্ট সকলেই দৌড়ে পালাচ্ছিল।

আমি মেয়েটির কাছে আসলাম। সে আমাকে দেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। বোধ করি চিনতেই পারছিল না। শেষে আমি বললাম, আচ্ছা সুমি তুমি এখানে কেন? কি করে এখানে আসলে, এরা কারা? এসব বলতেই সে হু হু করে কেঁদে উঠল। আমি বলে চললাম, আমি তোমার ভাই কামালের বন্ধু, একই সাথে লেখাপড়া করেছি কলেজে। মাঝে মধ্যে তোমাদের বাসায়ও আমি গিয়েছি। যাকগে, আসো আমার সাথে। তাকে নিয়ে চললাম।

এখন চিন্তা করছি তাকে নিয়ে কোথা ওঠা যায়। বাড়িতে গেলে হয়তো মা বকবেন। আচ্ছা দেখি বন্ধু রফিকের বাসায় ওঠা যায় কিনা। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্বিপ্রহর রাত্রিতেই তাকে নিয়ে চললাম রফিকদের বাড়িতে। সজোরে তার দোরগোড়ায় গুটিকতক আঘাত করতেই সে ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগল, কে কে, কি চান?

বললাম, খোল, খোল বলছি, আমি রোস্তুম।

আমার নাম শোনামাত্রই সে দরজা খুলে দিল। বললাম, আগে একটা চাদর দে, তার পরে কথা বলব। আমার সাথে আর একজন আছে।

সে কোনো কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কি এসব বলছ ব্যাপারটা খুলে বলো।

আমি বললাম, দেরি করো না। আগে চাদর দাও। সে একখানি সাদা চাদর আমাকে দিল। আমি সুমিকে চাদর দিয়ে এলাম। সে কোনোমতে শরীরটা আচ্ছাদন করল। তার শরীরের কামিজ ঐ কুত্তার কামড়ে প্রায় ছিঁড়েই গিয়েছিল। অতঃপর তাকে আমি রফিকের সামনে এনে দাঁড় করাতেই রফিক বলল, ওর পরিচয়টা দাও না শুন।

আমি বললাম, সে অনেক কথা। পরে বলব। আমি বড় ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম করতে দে।

ঘন্টাখানেক পরে তাকে সব কথা খুলে বললাম। মেয়েটি বলল, আমি গুটি কতক বান্ধবী নিয়ে এক দোকানে এসেছিলাম কাপড় কিনতে। কয়েকটা বদমায়েশ যুবক কয়েকদিন ধরে আমাকে বড্ড বিরক্ত করছিল। আমি দোকানে দেখি হঠাৎ আমাকে পিছন দিয়ে এসে কে কি যেন নাকের কাছে ধরল। এর পর আমি অজ্ঞান এবং কিছুই বলতে পারব না। তারপর দেখি অন্ধকার রাতে আমি এখানে, যেখান থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ। এরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। খুব জোর করছিল। আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য সঠিক সময়ে আল্লাহর পাঠানো দূত হিসেবেই যথাসময়ে তুমি এসেছ।

আমি বললাম, ও ছোকরাগুলি কারা?

সে বলল, ওরা হচ্ছে বখাটে এবং কলেজের কিছু সংখ্যক দুষ্টি-বদমায়েশ ছাত্রনামধারী দুষ্কৃতিকারী।

রফিক বলল, শুনলাম এখন রাত অনেক, এবার একটু শোও। আমি তার পাশেই শুয়ে পড়লাম। আর সুমিকে রুমের মধ্যস্থলে চাদর দিয়ে পার্টিশন দিয়ে ও পাশে যে একটা চৌকি ছিল তাতে বিছানাপত্র দিয়ে শুতে দিলাম।

সেখানে সে ঐ রাতে ঘুমাচ্ছিল কিনা বলতে পারব না। কিন্তু পরদিন যা লক্ষ্য করলাম তাতে সন্দেহই রইল না যে গত রাতে সে একটুও ঘুমায়নি। যাকগে শেষ রাত্রে রফিককে বললাম, ভাই রফিক, তুমি তোমার ভাবীর কাছ থেকে একটা কাপড় এনে দাও, নইলে ইজ্জত বাঁচানো কঠিন হবে।

সে বললে, কেমন কাপড়, ভালো না মারবারি?

সে বলল, ভালো হলেই তো ভালো হয়। তবে অনুরোধ, ঘটনা যেন তোর ভাবী না জানতে পারে, ঘটনা বুঝলি তো।

সে বলল, একটুও চিন্তা করিস নে, একটুও জানতে পারবে না। পাক্কা মুরব্বির মতো উত্তর দিল সে।

আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। রাত প্রায় শেষ। তাকে ডেকে তুলে বললাম, সময় হয়েছে এবার কাজ করো।

সে তার অতৃপ্ত ঘুমের চক্ষু টিপতে টিপতে দু'একটা হাল্কা হাই তুলে উঠে বসল। আন্তে আন্তে দরজা খুলে সোজা চলে গেল তার ভাবীর ঘরে। ভাগ্য ভালো সেদিন তার ভাই ছিল না। দরজা টুকতে টুকতে সে বলল, ভাবী ও ভাবী, দরজাটা একটু খোলো না-দরকার আছে বড্ড।

ভাবী চকিতে ঘুম থেকে উঠে বলল, রফিক এত রাতে, তোর আবার কিসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

আমি একটু জিভ কেটে সহজ স্বরে ও হালকাভাবে জবাব দিলাম, কই রাত তো প্রায় পোহায়ে গিয়েছে, শোনোনি আজান দিয়েছে মুয়াজ্জিন? এত ঘুমাও ভাবী তুমি! ভাবী আর কথা না বলে দরজা খুলে দিল। তখনও অন্ধকার আছে। বলল রফিক, ভাবী আমাকে একটা কাপড় দাও।

আমাকে আর বাড়তে না দিয়ে ভাবী বলল, একি বলছিস? খুলে বল তো সব।

আমি বললাম, ও ভাবী ভুলে গেছি। একটা ছায়া ও একটা ব্লাউজও দিতে হবে।

ভাবী তো একেবারে হতভম্ব। আমি অনুনয় স্বরে বলতে লাগলাম, ভাবী সব খুলে বলব পরে, সময় এলেই। আগে আমাকে দাও তো।

রফিকের ভাবী তাকে অত্যধিক স্নেহ করত। তাকে তার পুত্রতুল্য মনে করত। তার স্নেহে রফিক ধন্য হয়ে আছে। যাকগে ভাবী দিচ্ছি বলে একখানি ব্লাউজ, শাড়ি ও একটা ছায়া দিল। রফিক সেগুলো হাতে করে একদম পৌঁছে গেল তার ঘরে। সাথে সাথে রোস্তুমকে দিয়ে বলল, পরতে দে। রোস্তুম দেরি না করে সুমিকে এগুলি পরতে বলল। সুমি পরে নিল।

রোস্তুম আবারও রফিকের কাছে বলল, ভাই কাপড় তো দিলে এবার কিছু টাকা দাও তো, মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রফিক বলল, কত টাকা লাগবে।

রোস্তুম বলল, যা আছে তাই দেও না কেন? কোনোমতে যেতে পারলেই তো হয়।

সাথে সাথে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিল রোস্তুমের হাতে। রোস্তুম এবার তার হতভাগিনী সঙ্গিনীটির হাত ধরে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিল। তখনও আবছা অন্ধকার। কিছু দূর এসে রাস্তার মোড়ে পাওয়া গেল এক রিকশা।

রোস্তুম বলল, আমাদের ময়মনসিংহ বাসস্ট্যাণ্ডে নিয়ে যেতে পারবে?

রিকশাচালক প্রথম ভাড়াটি পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে তাদের রিকশায় চড়তে ইশারা করল।

আধঘন্টা খানেক পরে তারা পৌঁছল বাসস্ট্যাণ্ডে, তখনও ফাস্ট ট্রিপ ছাড়েনি। তাই ক্ষুধার্ত এই পরোপচিকিষ্য মানবসন্তানটি সঙ্গিনীটিকে নিয়ে ঢুকল এক মধ্যবিত্ত রেস্টোরাঁয়। মেয়েটি ছিল ক্ষুধার্ত। হোটেল বয় যথারীতি নাস্তা এনে দিয়ে গেল।

আমি বললাম, লও একটু খাও।

সে কিছুই বলল না। শুধু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে লাগল। আর এমনি করে আমার দিকে চেয়েছিল যে, সে করুণ চাহনি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না। তার সে চাহনিতে সে কি চেয়েছিল বা প্রকাশ করেছিল তা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এইটুকু বুঝলাম যে সে যাহা অনুভব করেছিল তার প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, চোখের অশ্রু তাই প্রকাশ করেছিল। তার বুক ফেটে গিয়েছিল আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় কিন্তু মুখ খুলবার সাহস হচ্ছিল না। সাহস যদিবা ছিল মেয়ে জাতির সেই চিরাচরিত লজ্জা আর দুর্বলতার শিকার সে ছিল বৈকি। মেয়ে জাতির প্রতি আমার এই ধারণা।

যাকগে বলছিলাম, লও খাও। এবার সে ডুকরাইয়া কাঁদতে লাগল। এখন কি করি! অন্য সময় যা না প্রকাশ পেয়েছিল খাওয়ার সময় তাই প্রকাশ পেল। যদিও আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তথাপি কিছুই মুখে

তুলতে পারলাম না। তার ব্যথায় আমি ব্যথিত হয়ে গেলাম আর বললাম, সুমি তুমি দুর্বল, অপ্রকৃতিস্থ, ক্লান্ত। কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে একটু করে শক্ত হতে লাগলাম। বললাম, চলো আমরা তোমাদের বাসায় যাই। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সে কোনো কথা কইল না। আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। এসো একটু খেয়েই হাত মুছে উঠে দাঁড়লাম। আন্তে আন্তে বাইরে এসে দোকানিকে গুটি কতক পয়সা চুকে দিয়ে বাহির হলাম। বাসস্ট্যান্ডে তার সমভিব্যাহারে এসে দাঁড়লাম। একটু পরেই একটি বাস এসে পড়ল। ডেকে বলতে লাগল ড্রাইভার এসিস্ট্যান্ট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা ইত্যাদি।

আমরা বাসে উঠে বসলাম। হু হু করে ঘণ্টা আধেক বাস ত্বরিতগতিতে চলার পর তাদের বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই নেমে পড়লাম। বোধ করি তার পরিবারেই সকলেই তার জন্য ব্যস্ত-উদ্ভিন্ন ছিল। তবে শুনলাম তার আঝা-ভাই সকলেই বাড়ির বাইরে ছিল তার খোঁজে।

যাকগে তার মা বাসার গেইটের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল উদ্ভিন্ন মুখে তার অপেক্ষায়। কখন তার সেই হতভাগিনী মেয়েটির পদার্পণ ঘটবে বাড়িতে। মেয়েটি আদৌ বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে কিনা এই সন্দেহ তার মনে কেবলই বোধ করি দোলা দিতে লাগল। আমাদের দেখা মাত্রই খুশিতে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না। শুধু দু'হাত বাড়িয়ে তার মেয়েটিকে তার বুকে জড়িয়ে নিলেন। মেয়েটি ডুকরিয়ে কাঁদতে লাগল। মা-মেয়ের সমবেত ক্রন্দনে এমন মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবী তার স্মৃতির বাইরে চলে গিয়ে কোনো দুঃখ-ব্যথার সাগরে পাড়ি দিয়ে বসেছে। আর সেই ব্যথার সাগরে মিলেছে এক অমৃতের সন্ধান আর সেই অমৃত সন্ধান আমি।

তিনি বললেন শুধু আমাকে বাবা, বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ক্রমাগতকাঁদছিলেন।

তৃতীয়পবিচ্ছেদ

পৃথিবীতে মানে সমগ্র পৃথিবী তো ঘুরিনি কখনও, আমার এই দুই যুগের জীবনে যতটুকু পরিভ্রমণ করা সম্ভব হয়েছে এবং যত লোকের সাথে মেলামেশা হয়েছে বিশেষত যে সমস্ত মহিলা আমাকে মাতৃস্নেহ প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে সোহাগী নাম্নি জনৈকা মধ্যবয়সী মহিলা যাঁকে মা বলে সম্বোধন করতাম, শ্রদ্ধাবনত মন্তকে সেই অখ্যাত-অজ্ঞাত ‘মা’-এর নাম না উল্লেখ করে পারি না। গর্ভধারণ না করেও অপরের পুত্রকে এরূপে আদর করা আর কোনো মহিলাকে আমি দেখিনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি আমাকে তার পুত্র অপেক্ষাও বেশি স্নেহ করেন।

রোস্তুমের সাথে আমার পরিচয় অল্প দিনের অর্থাৎ কলেজে পড়াকালীন ছাত্র জীবনে। তাদের বাড়িতেও মাত্র কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু আমার বুকের কথা সব খুলে বলতে পারছি না। তারা শিশু দুঃসন্তান। ছোট মেয়েটি দশ বছরের। বড়টি ডানপিটে ছেলে রোস্তুম। তার বাবা যখন মারা গেছেন তখন রোস্তুম ছয় বছরের যুবক। ছোট সংসার। সংসার ভালোই চলছিল। হঠাৎ স্বামী মারা যাওয়ায় মার সংসারের সমস্ত ভার তার উপরই পড়ল। চাষযোগ্য জমি কয়েক একর আছে। তাতে ধান, পাট, ইক্ষু, প্রত্যেক ফসলই কিছু না কিছু জন্মে। রোস্তুমের পিতা জীবিত থাকাকালীন তিনি গৃহস্থীর সব কাজ করতেন। এখন সব কিছু আধা দিতে হয়। যাকগে এতে তাদের ছোট সংসার ভালোই চলে। সংসারে তারা তিন জন মা, বোন, রোস্তুম। এই ছোট সংসারে মা একমাত্র অবলম্বন। মায়ের স্নেহের জোরে আবদ্ধ হয়ে দুটি শিশুর জগতের কোনো কিছুর চিন্তা করতে হয় না। মা এক অমূল্য রতন। জগতে যাদের মা নেই তারাই কেবল তার অভাব উপলব্ধি করতে পারে।

যাকগে আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। রোস্তুমের মায়ের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি কতগুলি গুণের সমাহার। একাধারে তিনি

অপরিসীম মাতৃত্ব স্নেহদানকারিণী, কঠোর শাসনকারিণী, সতিসাহসী
ধৈর্যধারিণী। আমাকে তিনি তার পুত্র স্নেহের চোখে দেখেন। আমি তার
স্নেহে ধন্য হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, তার আদরের তুলনা দুষ্কর।

রোস্তুমের মায়ের নাম সোহাগী। তার বাপের বাড়ি রসুলপুর।
মা-বাবা নেই। আছে কেবল তিনটি বোন দুটি ভাই। সেবারে আমি
রোস্তুম, কমলা ও মায়ের সঙ্গে রোস্তুমদের মামার বাড়ি গিয়েছিলাম।
সেখানে গিয়ে আমি যতটা আশা করেছিলাম ততদূর পেয়েছি কিনা
বলব কেমন করে। শুধু এটুকু বলতে পারি, সংসারে মা-বাবা না
থাকলে আর যারা থাকেন অর্থাৎ পরের বাড়ি হতে যারা সংসার পাতার
চিন্তায় শ্বশুরবাড়ি আসেন তারা প্রায়ই সমান হন না। সে কিসের জন্য
বলতে পারব না। এতগুলি লোক তাদের বাড়ি গিয়েছে দেখে মামির
আগেই নাভিশ্বাস উঠেছে। এমনকি পৌছা মাত্রই তিনি তার স্বভাবজাত
নাসিকাকুণ্ঠন করে বলে উঠলেন, এঁ্যাগা ননদী আর কুটুম্ব নেই যে,
তাদের বাড়ি যাবে। যত সব ভেজাল সব আমাকে সহ্য করতে হয়।
তাই বলি তোমার ভাইয়ের সংসারে তুমি যা কিছু পাও চুকিয়ে নেও না
কেন। তোমার ভাইয়ের সংসার আমি আর করতে পারব না।

কথাগুলি শুনামাত্রই দেখলাম মামণির চোখ-মুখ, লজ্জায়-রাগে-
ক্ষোভে একেবারে লাল হয়ে গেছে। তিনি শুধু বললেন, বোন তোমরা
সুখে থাকো, তোমাদের সংসারে ফাটল ধরাতে আমি আসিনি। হ্যাঁ রে
আজ কত দিন হলো ভাইকে দেখিনি-মনে কত আশা ছিল ভাইয়ের
সংসারে এসে একটু হয়তো..... কথাটা শেষ করতে দিল না। মামি
বলল, থাক সুখ আর লাগবে না- কি ভায়ের আদর!

এতক্ষণ রোস্তুম চুপ করেই ছিল। এইবার মুখ খুলল এবং সে
এমনভাবে যে, বৈশাখ মাসে যেমন করে তুফান হয় বাড়ির গাছপালা
সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে সে তাই করল, বলল চুপ করো মামি।

তোমার ভাত খাওয়ার জন্য আসিনি। তুমি আজ আমাদের সাথে যে ব্যবহার করলে, তা মামি না হয়ে অন্য কোনো পুরুষ হতো তবে দেখিয়ে দিতুম এ কথার মজা।

রাগে সে আর কোনো কথা বলতে পারল না। কেবলই তার মনে দোলা দিতে লাগল এই কি তার মামার বাড়ি! এতটুকু সহানুভূতি আর ভালোবাসা যাদের মধ্যে নেই তারা কি মানুষ না পশু? কিন্তু কি কাজ আছে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা বোকামি। তাদের গায়ে হাত তোলা কাপুরুষতা। সে আর কোনো কথা না বলে সোজা বেরিয়ে এলো।

পেছন দিক থেকে মামণি তাকে ডাকল অনেক। তবে সে শুনবে কেন? মামণি আমার গায়ে হাত রেখে বলল, সবই আমার কপাল, কপাল যদি না থাকবে তবে এমন বাপের বাড়ি ক'জনের আছে। আমাদের কথার এই ঝড়-তুফানের মধ্যে গলায় উঁচু স্বরে কাশি দিয়ে প্রবেশ করলেন মামণির বড় ভাই তাহের খান। নাটকীয় পরিবেশ দেখতে পেয়ে তার ভাবতে দেরি হলো না যে একটা কিছু হয়েছে। বললেন তিনি, বোন কেমন আছ? অনেক দিনই চেষ্টা করেছি রোজমদের বাড়ি যাব কিন্তু সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারিনি। যাকগে সোহাগী এসেছ যখন তখন আমার সংসারে কিছু দিন থেকে যেও। আরো অনেক কিছু তিনি হয়তো বলতে চেয়েছিলেন, বাধা দিলেন মামণি, বললেন-শুধু ভাইয়া.....।

তাহের খান অত্র এলাকার একজন নামিদামি মানুষ। বাপের প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছেন। এগুলোর দেখাশুনার দায়িত্ব তার। তিনি একজন সরল প্রকৃতির লোক, কথা কম বলেন। যে তার সঙ্গে একবার আলাপ করেছে মুগ্ধ হয়েছে। বেচারী তার সংসারে যা করতে পারেন না বা চাহেন না তাহাই ঘটে যায়। এমন সৌভাগ্যশালিনী বউ পৃথিবীতে কে কয়টা পেয়েছে। যাদের দোদর্দণ্ড শাসনে ও একগুয়েমি

চিন্তাধারায় আত্মীয়স্বজনদের প্রতি অনীহা ভাব সংসারের সকল স্বর্গীয় ভাব কেটে যায়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই রকম একজন মাটির মানুষের ভাগ্যে এমন সহধর্মিণী জুটল! তার স্বভাবে রয়েছে শঠতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, এককথায় সব খারাপ হৃদয়বৃত্তিগুলি তথাকথিত মামানি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ভদ্রলোক তাহের খান বউয়ের সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যান।

যাকগে তাহের খানের তিন ছেলে। ছেলেরা সবাই পিতৃস্বভাব পেয়েছে। বড় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। ছেলেটা একটু ভাবুক প্রকৃতির, সে সর্বদাই খেয়ালী প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। ভাববিলাসী এই ছেলেটি মুক্তবুদ্ধির লোক। আকাশ যেমন নির্মল উদার তার মনটাও তেমনি। শিক্ষকদের নিকট সে স্নেহের পাত্র। তার প্রায়ই বাংলার স্যারের সঙ্গ দিত এবং তার স্যারের কথোপকথন নির্জনে তাকে ভাববিহবল করে তুলত। আজও তার মনে পড়ছে স্যার বারান্দায় বসে আছেন আসন পাতিয়া হয়তোবা কোনো গুণধর কবির লেখা একটা কাব্য গ্রন্থ পড়তে পড়তে তিনি যখন উড্ডয়ন করছেন ভাবের গগনে হয়তো কখন নিজ থেকেই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছেন। কখনও করুণ বিষাদ বিরহে শিউরে উঠছেন, ঠিক এমনি সময়েই প্রকৃতির নবজাত শিশুটি তার একান্ত স্নেহের পুত্রটি এসে হাজির- রহস্যময় শান্ত আর সৌম্য মুখচ্ছবি দর্শন করে বলছেন, এসো, বাবা এসো, তোমাকে এতক্ষণ না পেয়ে কোথায় কোন সুদূরে তোমাকে আমি খুঁজতেছিলাম ততক্ষণে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম ভাবের রাজ্যে সেখানে আমি শিশু।

স্যার, স্যার, বলছেন কি? এ কি সম্ভব? বরাবরই বলে আসছেন। আমি প্রকৃতির শিশু, আজ আপনি শিশু হয়ে গেলেন? প্রকৃতির শত রূপ দেখে তার রহস্যময়তার কোনো কূল-কিনারা যখন পাই না একাকার হয়ে মিশে যাই রহস্যজালে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদ্ভিত হতে থাকে মনে ততই তখন কিনা স্যার আপনি বলেন, হে ধরিত্রী

সন্তান এ রহস্য ভাবনা ভেবে কেউ কোনোদিন শেষ করতে পারেনি, সকলই হারিয়ে গেছে হে বৎস, তুমি কি পারবে ছিন্ন করতে রবি ঠাকুর, সাদি, রুমি, আমির খসরু, ওমর খৈয়াম-সকলই তো অসহায় হয়েছেন সেখানে হারিয়ে গেছেন।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায় তবু এই প্রকৃতির দুই খেয়ালী সন্তানের আলোচনা ভাবের রাজ্যে বিচরণ আর শেষ হয় না। ততক্ষণে গিন্নী ভিতর থেকে ডাকছেন, ওগো সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো, নাবা-খাবা করবে না! কথা কয়টি শুনে সুমন বলল, স্যার আজ তাহলে উঠি। স্যার বলছেন, এসো বাবা অট্টহাসিতে মুখর হয়ে কাব্যের পাতাগুলি মুড়াতে লাগলেন-ভালোভাবে সাজিয়ে বুকে পুরে অন্তঃপুরে রওনা দিলেন। আচমকা সুমন ঘড়ির কাঁটা খেয়াল করল এবং ভাবল-আগামীকালের বিষয়গুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। পড়া জমিয়ে রাখলে চলবে কেন?

যাক তাহের খান কালক্রমে একজন নামকরা ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন। তার ব্যবসার উন্নতি ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছিল। এখন তিনি কোটিপতি হয়েছেন। বড় শহরে কোম্পানি খুলেছেন। লক্ষাধিক টাকা প্রত্যহ রোজগার হয়েছে। শহরে কয়েকটা বহুতল বাড়ি করেছেন। তার সুখ-আরাম-আয়েশের শেষ নেই। তাই বলে ধন-সম্পদ বেড়ে উঠলেও তার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি আগে যেমন মাটির মানুষ ছিলেন তেমনই রয়েছেন। বন্ধুদের নিকট তিনি বন্ধুবৎসল, পুত্রদের নিকট আদর্শ পিতা, কিন্তু স্ত্রীর নিকট আদর্শ স্বামী হতে পারেননি। বোধ করি এইটি তার দুর্ভাগ্য। স্ত্রীর কর্কশ স্বভাবের কাছে তার স্বভাব মিলে না। তাই তিনি তার নিকট হয়ে উঠলেন বোকা, দুর্বল পুরুষ হিসেবে, স্ত্রীর নিকট তার কোনো মূল্য নেই, তার সরলতা স্ত্রীর নিকট ভাসে অপদার্থের চিহ্ন হিসেবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাটক শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ থাকে অনেকক্ষণ। জীবনে অনেক নাটক দেখেছি, কিন্তু আমার জীবনের নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা যে আমি নিজে সে কথাটাই আমার কাছে অবাক ঠেকল। আমি কি ছিলাম কি আছি আর কিইবা হতে যাচ্ছি, তাই বুঝতে আমার বিম্বয় লাগে, জীবনের প্রথমই স্বপ্ন দেখেছিলাম অনেক বড় কিন্তু সে স্বর্গের পরে এসেছিল আলস্য আর সে আলস্যই আমার সব সাধ কেড়ে নিল। এখন শুধু পড়ে আছে শূন্য খোসাটা। তার কোনো বাজার মূল্য নেই। তাই ভাবি এমনি করেই বুঝি মানুষ জগতে দক্ষ হয় সাধ করার পরে তাহা বাস্তবায়নের জন্য যদিবা কঠোর পরিশ্রম না করে তবে নিষ্ফল আশা। তাই এখন ভাবছি, এই তো যাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লড়তাম এককালে তারা তো সবাই আমাকে পিছনে ফেলে আমার আলস্যের সুযোগে লুটে নিল সব।

আমি ভালো ছাত্র কিইবা আর থাকলাম, সমাজের মানসম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদানগুলি তো হারিয়েই ফেললাম, তাই কিনা এখন বুঝতেছি। ছাত্র জীবনে বেশি কিছু ভাবতে নেই, কোনোদিকে একদম হেলে পড়তে নেই। অতি ধর্মপ্রিয়তা আমার সব সর্বনাশ করেছে। জীবনের প্রথমে ছিলাম কৃতী ছাত্র। এই ধর্মাক্ততা আর আলস্য পড়াশুনায় ঔদাসীন্য এখন আমার খেতাব দিয়েছে গাধা ছাত্র। এই তো পরিণতি, তাই কেবল পাস করেছি, না আছে কোনো বিভাগ আর না আছে কোনো স্থান। মেয়ে জাতি আমার উপরে উঠে যায় সেটা একদিন আমার সহ্যের ছিল বাইরে। আজ তা দেখি একান্তই বাস্তব। আমার মাথার উপর কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। পরাজয় ঘটেছে আমার তাই কিনা ভাবছি। এই বার প্রতিশোধ আমি নেবই। ভালো পড়াশুনা কাকে বলে দেখব। পড়াশুনা করলে অবশ্যই ভালো করতে পারব। কেউ আমাকে আটক রাখতে পারবে না। আমার মাথাটা খোদা আমাকে এমন খারাপ দেননি যে আমাকে সবার পিছনে থাকতে হবে। কখনও নয়

প্রতিযোগিতা করার মতো মন-মস্তিষ্ক দুই-ই আছে এবং আমার অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে অনেক।

অনেক ভাবছিল ছদ্মবেশী। হঠাৎ তার ভাবনার বেড়াজালে বাধা দিল রোস্তুম। এই দেখ, বেশি ভাবিও না। দেখ দেখি আমার দিক চেয়ে খাই-দাই আর বেশ মনে যাহা চায় তাই করে বেড়াই। আমি কঠোর বাস্তবপন্থি, তুমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো কল্পনালোকে কেবল বেড়াও বাস্তবের স্বাদ তো কিছুই পাও না। এখানেই তোমার চরম পরাজয়। পরাজয়ের গ্লানি কেবল বহে বেড়াও বুঝেছ! বলে সে উধাও।

রোস্তুমের কথাগুলি ছদ্মবেশীর মনে ও কর্ণকুহরে বারবার দোলা দিতে লাগল। সে কি সত্য বলেছে? আমি কি তাহলে ভুল পথে চলেছি অর্থহীন ভাবনা তাহলে কি আমার পরিত্যাগ করা আশু কর্তব্য? হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আর বেশি ভাবব না। বাস্তবে কেবল কাজ করে যাব যা হাতের কাছে পেয়েছি তাই করব। আর যাহা সম্ভব ও আশা করেছি তাহাই যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে অর্জন করবই করব। কারণ আমি জানি “পরিশ্রমেই সৌভাগ্যের প্রসূতি”।

সে দিন ছিল মঙ্গলবার। বোধ করি সকাল আটটার দিকে হবে। রোস্তুমের মামণি বলছেন, বাবা নদী থেকে চারটে মাছ ধর না, দুপুরে কি খাবে সকাল যা হোক বেগুন ভর্তা দিয়ে চালিয়েছি। এখন তো তাও নেই। তখনি আমি উপস্থিত ছিলাম কমলাদের বাড়ি। রোস্তুম বলল, ছদ্ম চল না নদীতে যাই। আমি দ্বিধাজ্ঞি না করে তার সাথে সাথে চললাম।

জালটা কাঁধে ফেলে হাতে একটি থলে করে রোস্তুম দ্রুতপদে চলছে। আমি তার পিছনে পিছনে চলছি। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলাম রোস্তুমের ডিঙ্গিখানা ঘাটেই বাঁধা আছে একটি বৃহৎ বট গাছের মূলের সাথে। সে নৌকায় উঠে আমাকে বলল, উঠ। আমি ডিঙ্গিতে চড়ে

বসলাম। ঘন্টা তিনকে একাধারে বসে বসে হাল টানতে টানতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে রোস্তুমকে বললাম, ভাই, এখন তুমি একটু টানো। সে কেবল একটু হাসল এবং হাল ধরে টানতে লাগল। তার হাসার কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। কেন সে হাসল বা হাল ধরার পর আর কোনো কথা না বলে নৌকাটিকে সোজা মধ্য নদী বরাবর টেনে চলল কিছুই বুঝলাম না। বুঝলাম তখনই যখন দেখলাম আমাদের গোটা ডিঙ্গিখানি প্রবল জোয়ারে ডুবে যাচ্ছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আমাদের ডিঙ্গিখানি যখন হেলাতে-দোলাতে লাগল এবং পরক্ষণে ডুবিয়ে দিল তখন আমি যে কিরূপ অবস্থার শিকার হয়েছিলাম এবং আমার চৈতন্য কি লোপ পেয়েছিল কিনা তা বলতে পারব না। তবে বাঁচার জন্য হাত-পা নাড়াতে নাড়াতে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম তীরে। তখন প্রায় রাত হয়েছিল ১০টা। রোস্তুমের আর কোনো খোঁজখবর না পেয়ে শেষে সোহাগী মায়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বাড়িতে পৌঁছে দেখতে পেলাম রোস্তুম দিব্যি বসে আছে। প্রথমত তাকে দেখে আমার খুবই রাগ হলো, পরক্ষণে তার শান্ত, সৌম্য ও আগ্রহান্বিত মুখখানা দেখে আমার সমস্ত রাগ পড়ে গিয়েছিল। সে-ই আগে আমাকে বলল, কি রে ছদ্ম এত রাত হলো যে, কোথায় ছিলি? আমি আর কোনো কথাই বলতে পারলাম না এবং বোধ করি প্রথমেই এত কঠিন ও অদৃশ্যপূর্ব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমি তখন প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, কেন রাত্রি হবে না- যে বিপদেই না আমাকে ফেলে রেখে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে বাড়ি চলে এসেছ।

সে বলল, খুব অভিমান করেছিস ছদ্ম তাই না? আসলে দেখ এটা একটা ব্যাপারই না, এই রকম অসময়ে মাছ ধরতে গিয়ে বার বারই আমার ডিঙ্গিসহ আমি তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছি আর ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তলিয়ে যাওয়া ডিঙ্গি নিয়ে কূলে উঠেছি। এই রকম করতে করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এই তো নূতন তোকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবার জন্যই আজ

আমি মাছ ধরতে ধরতে দেরি করে জোয়ার যখন আসল তখন নদীর বাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। এইখানে তিন দিক থেকে প্রবল স্রোত এসে মিলিত হয় বিধায় ঢেউয়ের সংঘর্ষে ডিজি কেন বড় বড় ময়না নৌকাও এই স্থানটুকু পার হতে না পেরে ডুবে যায়। আর একদিন আমি কৌতূহলে অভিভূত হয়ে এ জায়গাটি দিয়ে যাওয়ার সময় আমিও যখন এর শিকার হলাম তখন যুদ্ধ করার কৌশল অবলম্বন করে ডিজিটা বাঁচানোর জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অর্থাৎ বুঝলেন না তখন থেকেই আমি ইচ্ছা করে এই স্থান দিয়ে যাই আর নৌকা ডুবে গেলে আনন্দের সাথে যুদ্ধ করে নৌকার পাটাতন ধরে ডুবে আর ভেসে তীরে পৌঁছাই। যাকগে তোর কেমন লাগল তাই বল। খুব ভয় পেয়েছিলে বোধহয়?

আমি বললাম, দেখো আমার সাথে ঠাট্টা করো না। ভয় পাব না কেন, এ রকম ঢেউ আমি কোনোদিন দেখিনি। এক-দুই হাত উঁচু হয়ে আসছে আর সেই সাথে ঘুরতে ঘুরতে উপরের ঢেউ নিচে আর নিচের ঢেউ উপরে। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। কি করে যে কূলে উঠেছিলাম আল্লাহ জানেন। তার পর কূলেই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে তখনই পাড়ের ঘাসের উপর গুয়ে পড়লাম আর কিছুক্ষণ অর্ধচেতন থাকার পর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম থেকে উঠি তখন রাত দশটা বোধ করি বেজেছে। আর বিলম্ব না করে তোমার মতো হতভাগ্য বন্ধুর খোঁজে বের হলাম। ভাবলাম দেখি বাড়িতে পৌঁছেছে কিনা। ঐ প্রবল স্রোতস্বিনীর গ্রাসে পড়ে তারই পেটে হজম হয়ে গিয়েছে। আমি তাকে হতভাগা বলার সাথে সাথে সে উচ্চহাস্যে ঘরখানা মুখরিত করে তুলল এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে ব্যাপারখানা যেন কিছুই নয়। আমার কাছে তার এহেন আচরণ দেখে মনে হলো যে আমার বন্ধুটির কাছে আমি যেন একটি অবুঝ ক্ষুদ্র শিশু, শংকায় অভিভূত মায়াহরিণীর মতো একটি বালিকা। অথবা কোনো ষোড়শী যখন একদল ডাকাতির সম্মুখীন হয় তখন তার যে অবস্থার সৃষ্টি হয় আমি যেন তার চোখে তা-ই দেখলাম।

বলল, নে এই বার খা, পেট হয়তো চোঁ চোঁ করছে। মা, কমলা কেউ জেগে নেই মনে হচ্ছে। হাঁ রে মা, তোর কথা বাড়ি আসতেই জিজ্ঞাসা করেছিল চল রান্নাঘরে। তোকে খাইয়ে আমি এই

অবুঝা অথচ সবল শিশুটির ঔদাসীন্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু না বলে হারিকেনের আলোতে রান্নাঘরে গেলাম। সে একটা পিঁড়ি ঠেলা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে বাসন ধোয়া আরম্ভ করল। ভাত, লবণ দিয়া যখন তরকারি দেয়ায় গেল তখন আমার শরীরটা খানিক শিউরে উঠল। দেখলাম সেই মাঝনদীর পানিতে ডুবে যাওয়া বোয়াল মাছের টুকরা ভাজি করা আছে।

রোস্তুমের অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তির কথা আমার অবিদিত ছিল না বা তার ব্যবহারও আমার অজানা ছিল না তথাপি তার এমন শক্তি ও অসমসাহসী কৌতূহল দেখে কিসের আবেশে খেয়ে চললাম টের পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, আল্লাহ এ জীবকে কি দিয়ে তৈরি করেছেন যার মধ্যে এতটুকু ভয় নেই, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কোনো কাজই তার কাছে অসাধ্য নয়। এমনকি অসাধ্য কাজটাই সে কৌতূহলে গদগদ হয়ে ভালোভাবেই সুসম্পন্ন করে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বাড়ি ফিরে এসে স্নেহময়ী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে গেলাম এবং আর কোনো কথা না বলে তার পাশেই শুয়ে পড়লাম। মনে হতে লাগল এ কিসের সাথে আমি শুয়ে আছি। আজকের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা তার কাছ থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। যদিওবা তার পাশেই শুয়ে পড়লাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন গত হয়ে গিয়েছে। রোস্তুমের সাথে আমার দেখা নেই। ততদিনে আমি একটি ক্লাস ডিঙ্গিয়ে আর একটি ক্লাসে উঠেছি। অর্থাৎ ব্যাচেলর অব সায়েন্স পার হয়ে মাস্টার অব সায়েন্স হওয়ার চেষ্টা করছি। তার স্মৃতি বিজড়িত পূর্বকার জীবন ভুলতে পারিনি। ভুলবইবা কি করে, এত দিনের যার সঙ্গে বন্ধুত্ব তাকে কি আর দুই-চার বছরে ভুলা যায়। যাক কি বলতে চাইছি তা বলি। জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। অফিসে সারাদিন একটানা খাটুনির পরে সন্ধ্যায় বাসে নৌকায় চড়ে ৩০-৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে দৈনিক ক্লাস করতে যাওয়া বস্তুত এক প্রকার ঝামেলা ও শ্রমসাধ্য তাই বলতে হবে। আমার ভাবনারাশি মাঝে মাঝে ধাক্কা খায়। আসলে খাটুনি নয়। আমার সহকর্মীকে সহজে কাজে পাই না। সহকর্মী কেবল হেসে তার সুললিত যৌবনোদ্দীপ্ত দেহখানি নেড়ে নেড়ে বলবে, দেখুন ছদ্ম আজ আপনি যান কাল অবশ্যই আমি যাব। তার কথার ভাষা ও ভাবভঙ্গি আমাকে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে না বলতে পারি না। অবশেষে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোন্ পরিবারটি সবচেয়ে গরিব, কার কোথায় অভাব আছে, কাউকে সাহায্য করার দরকার-এসব খুঁজে ফিরি।

চাকরিটা মন্দ নয়। মন্দ কেবল এই জায়গায় যে আজকালকার মানুষ বড়ই ব্যস্ত সাংসারিক কাজ নিয়ে, মানে খাঁটি বাংলায় বলি, পেটের ধান্দায় ব্যস্ত। তারা না বুঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে আমার ভাষা, না বুঝে সদাশয় সরকারের জনহিতৈষী সমাজকল্যাণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আছে সরকারের কড়া নির্দেশ। হায়রে কি করে বড়ি-কনডম ব্যবহার করতে হয় তা যখন মহিলাদের কাছে বলবার যাই তখন নাভিশ্বাস ওঠে। এমন চাকরিই আমার ভাগ্যে জুটল।

ছোট একটা গ্রাম টিকিরপুর। লতাপাতায়, জঙ্গলে ঘেরা গ্রামখানি তারই মধ্যে হাজার পাঁচেক লোকের বাস। এই গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে সরকারি গণমিলনায়তন কেন্দ্র। তার তিন দিকেই বনজঙ্গলে ঘেরা।

এখানেই থাকি আমি আর চৌধুরী সাব। মানে চৌধুরী সাব বলছি এই জন্য, তারা এখন আর সেই প্রতাপশালী চৌধুরী নন। এক সময় ভালো সম্পত্তি ছিল, জাঁকজমক ছিল, কালের বিবর্তনে সব নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে এসেছে। আর সেই পরিবারের মধ্যে জন্মিলেই তো আর চলে না। এরা যারা জাত নিয়ে গর্ব করে তারা সব সময়ই সব যুগেই নিচু হয়ে থাকতে চায় না তাই আর কি। আমার মতো মাস্টার্স ডিগ্রি করছেন! তার মধ্যে উচ্চাশা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

যাকগে এখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব ভালো বন্দোবস্ত না দেখে এরই বিকল্প উপায় খুঁজে বের করলাম। কেন্দ্রের পাশেই এক বাড়ি। বাড়ির সকলে আমাদের বউবিহীন অসহায় দু'টি নরের খাবার ব্যবস্থা করল। আমরা সাগ্রহে তাহা মনে নিলাম। মাসে চারশ' টাকা দিয়ে খেয়ে চলেছি। ক্রমে এই পরিবারের ভাবীর হাতের পাক খাই, তার সাথে বেশ জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা-রসিকতা করেন। ভাবীর স্বামীধন অনেকটা বদমেজাজী। মাঝে মাঝে গাঁজা খায়, সিদ্ধি খায়। আসলে ভিতরটা ভালোই। তিনি জলিল ভাই। তার তিন ভাই আর দুই বোন। সবাই অল্পের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলিল ভাইয়ের মা খুব ভালো মহিলা। আমাদের স্নেহের স্বরে ডাকেন। খাবার সময় কাছে এসে বসে আপন মায়ের মতোই খাবার দেন আর কি। দেখলাম পৃথিবীতে স্নেহ-মায়া-মমতা মানুষের মাঝে এমনি করে বিরাজ করছে যে তা ভাবলে অবাক লাগে। যাদের সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনে হয়তো এর আগে কোনোদিন দেখিওনি, সেই মানুষটি এত বেশি ভালোবাসেন, এমন করে পুত্রের মতো মধুর বচনে আহ্বার করাচ্ছেন, মনে হয় যেন কত কালের আত্মীয়।

কমিউনিটি ঘরের এক কোণে টেবিল-চেয়ার পেতে বসেছি। এখানেই পড়ি। রোস্তুমের জন্য মনটা কেমন করে উঠল। আজ তার

নামে একটানা চিঠি লিখব ভেবে তার ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্য বাক্স উলটপালট করলাম। শেষে খুঁজে পেলাম আর কি। লিখতে বসলাম, “ভাই রোস্তম। অনেক দিন গত হয়ে গিয়েছে তোমার কোনো কুশলাদি জানছি না। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কেননা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও মনটা তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। তোমার মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি তা আর কোথায় পাব। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে আর সাহস, শৌর্য-বীর্য দ্বারা অস্বাভাবিকতাকে জয় করতে তোমার জুড়ি নেই। যাক আজ আমার মনে কেবলই উদিত হচ্ছে একটা কথা, তোমার দেখা যদি কোনোদিন পাই তবে আমি সার্থক হব্ আর যদি তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারি তবে মনে করব আমার পুনঃজন্ম হয়েছে। কেননা বহু ইতিহাস পড়েছি। বহুবীরের কাল্পনিক কাহিনী হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে কিন্তু তোমার মধ্যে অখ্যাত-অজ্ঞাত যে শৌর্য-বীর্য আছে তা যদি মানবসমাজ গ্রহণ করত তবে তোমাকে নিয়ে ইতিহাস রচনা করত বৈকি। মাকে আমার সালাম দিও আর কমলাকে দিও প্রাণঢালা স্নেহাশীষ, ইতি তোমার ছদ্ম।”

চিঠি লিখে মনে হলো মনটা কিছুটা পাতলা হয়েছে। যাকে যে পূজা দেয়ার দরকার তা দেয়া হয়েছে। মানুষ মুক্ত মানুষের গুণে, চরিত্রে ব্যবহার মাধুর্যে আর আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই এমনি কাজ করে তবে আপন কাজে মনোযোগ দিলাম।

আমার নূতন কর্মস্থলে আমি একাকী বোধ করি। মনের ভাষা খুলে বলবার মানুষ পাইনি। তাই শুধু বই নিয়ে বসে থাকি। কতদিন যাই না কোনো অজানা-অদেখা প্রান্তরে, ছুটে বেড়ানো হয়নি উদ্দেশ্যহীনভাবে গহিন বনে অথবা নদীর বক্ষে। আসলে বয়স হয়েছে, বড় হয়েছি, সংসার ধর্ম করতে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছি, তাই আমার সুকুমার মনের বৃত্তিগুলি মনে হচ্ছে কেড়ে নিচ্ছে কে যেন। তাই মনে করলাম একদিন ছুটি নিয়ে যাব রোস্তমদের বাড়িতে। সেই আগের মতো ছলছড়াভাবে ঘুরে বেড়াতে মনটা পাগল হয়ে উঠেচে।

ক্লাস করতে রওনা দিচ্ছি। তখন বিকাল ৩টা বোধ করি হবে।
কলেজে পৌঁছতে ২ ঘণ্টা সময় লাগল। গেলাম। ক্লাস রুমে কিছু
বন্ধুবান্ধব দেখলাম গল্পগুজবে মত্ত। স্বাভাবিক সৌজন্য বাক্যব্যয়ের পরে
বসলাম তাদের পার্শ্বে। হঠাৎ এক বন্ধু বললে, কি হে ছদ্ম, আজকে
মজা হবে তাই না?

আমি তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, কিসের মজা রে
.....।

বললে, দেখ না ঐ রাশিদা আসছে।

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে?

বললে, বাপু বয়সে তো বুড়া হওনি তাই এখনি এত গম্ভীর হলে
নাকি?

বললাম, গম্ভীর-অগম্ভীরের প্রশ্ন নেই। তুই যা বলছিস তার কোনো
অর্থ নেই। কেননা অকারণে একটা মেয়েকে নিয়ে হাসি-তামাসা করা
উচিত নয়।

সে বলল, তা হাসি-তামাসা কেন ও মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে
বলেকয়ে তার সাথে কিছু সময় কাটানো আর কি।

তার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। ততক্ষণে দেখি রাশেদা
পাশে উপস্থিত। মেয়েটি আসলেই সুন্দরী। সুঠাম দেহের অধিকারিণী
আর মধ্য শ্রেণীর ছাত্রী। নোট করার জন্য আমাকে প্রায়ই বিরক্ত করে।
আমি তার কথার প্রতি যতটা না সাড়া দেই ততটা সাড়া দেই তার
রূপে, চমক লেগে। এমনি রূপের অধিকারিণী সে। যাক বলছিলাম কি,
রাশেদার নাম ডাকার সময় হলে ক্লাসে উপস্থিত আছি বলার জন্য
সবাই উৎসুক থাকে। সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী। যাক সে অমনি
বসে আছে কিছু বলল না। পরে আর একজন বলল, কি হে কথা হচ্ছে
না যে, বোধ হয় বাসায় ঝগড়া হয়েছে।

অমনি রাশিদা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, এত কথার
দরকার কি? ক্লাস করার জন্য এসেছো তাই করো।

সবাই একযোগে হেসে উঠল। মেয়েটি বুঝল তাকে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাই গতান্তর না দেখে এখান থেকে উঠে গেল। বইগুলো বুকে চেপে ধরে আনমনা হয়ে খোলা মাঠের দিকে জানালা দিয়ে চেয়ে রইল। বোধ করি ভাবছে; এই ছেলেগুলি ভারি দুষ্ট। এত উঁচু একটা ক্লাসে পড়ছে অথচ মোটেই ছেলেমি আর দুষ্টমিটা ছাড়তে পারছে না। অভিমানের আগুনে পুড়ে পুড়ে সে ভস্মীভূত হচ্ছিল।

এদিকে আমরা ভাবলাম, এমন কোনো কথা তো বলা হয়নি তাকে যে উঠে যেতে হবে। কেহ কেহ মন্তব্য করতে লাগল, আসলে মেয়ে জাতিটাই এমন। ইশারাতেই বাঁকা হয়ে যায়। যাকগে কিছুক্ষণ পর স্যার আসল, ক্লাইমেটরজি এর উপর পড়িয়ে স্যার চলে গেলেন। আমরা পূর্ববৎ বসে রইলাম। পরবর্তী স্যার জিওমরফলজি এর উপর ক্লাস নেয়ার পর যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। পথে সেই রাগী মেয়েটি আগে আগে যাচ্ছে। যদি কেউ আবার ঠাট্টার বেড়াজালে আটকিয়ে ফেলে সেই ভয়ে। আমাদের রাতে থাকতে হয় কলেজ হতে আধ মাইল দূরে একটা মেসে। আবার পরদিন সকালে উঠে আসি অফিসে। এমনি করেই দিন চলে। আজ রাতে যখন দেখলাম আমি মধ্যগগনে ঘুরে বেড়াচ্ছি অথচ আমার কোনো ঠিকানা নেই, যতই দিন যাচ্ছে ততই দুঃখ বাড়ছে। পৃথিবীতে এতগুলি দিন পিছনে ফেলে এসেছি অথচ কিছুই করলাম না, তখনই নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল। আমি সাহিত্যচর্চা করব। মনের খোরাক নিব আর কালের সন্তানকে দান করে যাব কিছু। এমনি চিন্তা মনে আসতে লাগল। পরক্ষণে মনে আসতে লাগল, এই মৃত্যুস্কুধা এই জরা-জীর্ণ পৃথিবীর বন্দিশালায় নিজেকে আটকে বন্দি হতে মুক্তি নিয়ে চলে যাব স্বর্গে, বলে আর সেখানে অমৃত সঞ্জীবনী আর সুরা পান করে অমর হব। আর একটা পথ আছে সেটা হলো সাহিত্য, সেই সাহিত্য মানে স্বর্গীয় জগৎ। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে ঘুম হতে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ঘন্টাখানেক পড়ে গোসল-নাস্তা সেরে অফিসের উদ্দেশে রওনা দিলাম। অফিসে পৌঁছেই এমন এক কাহিনী শুনলাম-এমন এক ঘটনা অবলোকন করলাম তা ইতিপূর্বে কল্পনাও করিনি। দেখলাম রোস্তুমের আম্মা আমার নামে একখানি পত্র দিয়েছেন। বাকবাকে হাতের লেখা চিঠিখানি পেয়ে আর কতই আনন্দের অশ্রু বারে পড়তে লাগল। দীর্ঘ পত্রে তিনি লিখেছেন, এখন আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতেই আছি, রোস্তুম আগের মতোই ডানপিটে রয়ে গেছে। সে না শুনে আমার কথা না শুনে ভাইয়ের কথা, কোথাও কোনো অন্যায় দেখলেই লাফিয়ে পড়ে আর বাগড়ায় জড়িয়ে যায়। সে এখন কয়েকটা মারামারি কেইসের আসামি। কি করব বাবা আমি তাকে নিয়ে। সে যেভাবে উদ্যত হয়ে চলেছে তাকে শাসন করবে কে? আমার সাধ্য নেই যে, তার ভিতরে যে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে তা নিভাই। আর তাই এই শেষ বয়সে ছেলের জ্বালাতন সহ্য না করে ভাইয়ের বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম।

ভাবী মারা গেছেন হঠাৎ করে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে। তিনি অতিরিক্ত পান খেতেন আর সেই পানের সাথে জর্দা খেয়ে অতিরিক্ত নেশা করতেন। যাক তিনি চলে যাবার পর আমার মাটির মানুষ ভাইটি কোনো গতান্তর না দেখে তার বিরাট সংসার দেখবার কোনো উপায় না দেখে, আমার উপরই শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন সংসারের চাবি।

কমলা এখন বড় হয়েছে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে। পড়াশুনা করছে মনোযোগ দিয়ে। আল্লাহ যেন আমার দুটি সন্তান দুই পদার্থ দিয়ে তৈরি করেছেন। একটি মাটির আর একটি আগুনের।

বাবা তুমি বড় হও। তোমার মঙ্গল কামনা করি। পত্রদ্বারা কুশলাদি জানিও। ইতি তোমার অভাগিনী ‘মা’।

মা ফের পত্রখানি পাঠে এক দিকে যেমন আনন্দিত হলাম অপর দিকে তেমনি দুঃখে-বিষাদে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। বিশেষ করে রোস্তুমের কাণ্ড দেখে।

পরে একদিন আমি ঢাকায় তাহের খানের বাড়ি যাওয়ার মনস্থ করলাম। সুযোগ হলো কলেজ পনের দিনের বন্ধ। অফিস হতে ছুটি নিয়ে যথারীতি তাহের খানের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে গেলাম সেখানে। মা আমায় দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। কমলা আল্লাদে আটখানা। সে এখন অনেক বড় হয়েছে। নাদুসনুদুস চেহারা, ফুটফুটে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ। কে বলবে এ বাপ-মরা একটি এতিম মেয়ে। তারপর আরও আনন্দিত হলাম খান সাবের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া অনার্স পরীক্ষার্থী ছেলেটিকে দেখে। যেমন মিষ্টভাষী তেমনি সদাচারী। মনে হলো ছেলেটি তার গতাসু মা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের তৈরি। কারণ তার মা সম্পর্কে পূর্বে আমি অনেক কিছু জেনেছি।

যাক যিনি মারা গেছেন তাকে নিয়ে কিছু বলা না বলা সমান কথা। তবে মানুষ মরে গেলেও তার কাজ ও কথা তাকে নিয়ে তর্ক জগতে থেকে যায় আর সেই অনবদ্য চিরন্তন সত্যটাই বোধ করি সেই দিন আমার মনেও কেবল দোলা দিয়া যাচ্ছে। যাক বলছিলাম কি, সুমন আর কমলা দুজনেই পড়াশুনা করছে এক ঘরে। তাদের উভয়েরই বয়োজ্যেষ্ঠ আমি। তাই শ্রদ্ধাভরে বললে, ছদ্ম ভাই আসুন।

আমি কোনো দ্বিধা না করে তাদের সাথে বসলাম। দেখলাম দুইটি কপোত-কপোতী যেন জোড়া হয়ে ডাগর টানা টানা চোখ নিয়ে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে আর আমাকে কি ভাষায় আপ্যায়ন করবে বুঝতেই পারছে না। তাই আমিই প্রথম বললাম, আচ্ছা সুমন তোমার অনার্স পরীক্ষা কখন?

সে বলল, বড় ভাই আমার পরীক্ষা হবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে।

সাথে সাথে জিজ্ঞাসা না করতেই কমলা বলল, ভাইজান আমার কথা তো জিজ্ঞাসা করলেন না।

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, একজনকে শেষ না করেই আর একজনকে প্রশ্ন করা মানে যাকে প্রশ্ন করা হলো তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা। যাক বলছি, তোমার পরীক্ষা কবে? সে বলল মাঠে। বললাম ভালোই হলো, একজনের ফেব্রুয়ারি আর একজনের মাঠে। দেখলাম চারটি চোখেই হাসি ফুটে উঠল। বুঝলাম এদের মধ্যে আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই।

সুমন বললে, কমলা ভাইজানকে চা দাও না।

সুমনের কথার সাথে সাথে কমলা উঠে দাঁড়াল এবং চা তৈরি করে এনে দিল। আমি-সুমন দু'জনেই চা খেলাম কিন্তু কমলা চা খাইল না লজ্জাবশত।

চা পান শেষে সুমনকে ইশারায় কমল দূরে নিয়ে কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বলে। অবশেষে আমার নিকটে এসে বললে, ভাইজান, আজকে আমরা চিড়িয়াখানায় যাব, যাবেন আপনি।

আমি বললাম, দেখো, আমার হাতে সময় নেই। মায়ের সাথে কথা বলে রোস্তুমের একটু খোঁজখবর নিই, আচ্ছা আসি কেমন?

তারা দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি প্রদান করল। আমি ধীর গতিতে ঘর থেকে বের হলাম। দেখলাম, দুটি প্রাণীর মধ্যে কত হৃদয়ের বন্ধন, কত আনন্দঘন সময় যাপনের সেতুবন্ধন করেছে তারা, মনে হলো দুটি প্রাণীর নিষ্পাপ ভালোবাসা যদি চিরস্থায়ী হতো!

আমি নিচে নেমে মাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করলাম। ঝি দৌড়ে এসে আমাকে বললে, মা ঐ যে আসছেন। মায়ের সৌম্য মূর্তি দেখে নিমেষে শ্রদ্ধায় আমার কেবল মনে হচ্ছিল তিনিই তো সত্যিকারের মান্যবর, যার মুখের অবয়বে হৃদয়ে ভক্তিরসে আপ্ত হই। যাক, মা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন, পাশে বসে তার হৃদয় নিংড়ানো কথাগুলো শুনতে লাগলাম।

বললেন, ছদ্ম, দেখ আমি এই ছেলেটাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছি। তার মধ্যে কি যে আগুন জ্বলছে, মা হয়েও আমি তাকে বুঝতে পারি না। দেখ দেখি অনর্থক অন্যের উপকার করতে গিয়ে দু'জনের পক্ষ হয়ে মারামারি করে এ পর্যন্ত ২/৩টি কেইসের আসামি। বাড়ি থাকতে পারে না, তাই আজ সে দেশান্তর। মা'র কথাগুলো শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। চিন্তা করতে লাগলাম, রোস্তুমের মতো একটা ছেলে আজ ছন্নছাড়া, তার মনের মূল্য কেউ দিচ্ছে না, তাকে কেউ বুঝতে চেষ্টাও করছে না।

এমনই হয়, জগতে যারা অন্যের শান্তি কামনায় নিজেকে বিলিয়ে দেয় তারাই জগতে নির্যাতিত, তারাই জগতে অপাণ্ডভ্যেয়। আজ তাই রোস্তুমের জীবনে শান্তি নেই। স্নেহময়ী মাতার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে সে। ভাবাবেগে নির্বাক হয়ে গেলাম। শেষে মাকে সান্ত্বনার স্বরে বললাম, মা দেখি রোস্তুমকে এ পথ থেকে ফিরাতে পারি কিনা। আল্লাহই জানেন আমি কত দূর সার্থকতা লাভ করতে পারি। বললাম, মা, রোস্তুম এখন কোথায় আছে?

মা বললেন, বলতে পারি না বাবা, আজ দু' মাস হলো সে বাড়ি আসে না, কোথা থাকে আল্লাহই মালুম, দেশের বাটীতে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি। সেখানেও নেই। অথচ আমাদের জমি ঠিক ফসল করা হচ্ছে। কোথা থেকে সে এসব করে আমি জানি না বাবা।

ভাববিহবল কণ্ঠে মা'র কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পথে মনে হতে লাগল এমন পুরুষ জগতে দেখি না, এমন আত্মত্যাগ, এমন প্রাণশক্তির অধিকারী মানবজগতে এখনও আছে ভাবতে ভাবতে এক অজানা রাজ্যে চলে গেলাম। সেখানে কেবল দেখতে লাগলামঃ মানুষের মনুষ্যত্ব যদি থাকে, যাকে ঘিরে অবস্থান করে তার সম্মান, তার প্রতিষ্ঠা, তার মহামূল্যমান জীবনের সার্থকতা, সে রোস্তুমের মধ্যেই আছে। আমাদের এই দুর্নীতিময় সমাজে একে মেরে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া মিথ্যা অহঙ্কার, অত্যাচার, নির্যাতন মানুষে-মানুষে

ভেদাভেদ মানবের প্রতি অবিচার, তাকে হত্যা করার চিন্তা, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে এক জুলুমের রাজ্য কায়েম করার জন্যই আছে সমাজের কেউ কেউ। এদের ধারক-বাহক যেসব মানুষ নামধারী অমানব তাদের প্রতি কেবলই আমার ঘৃণা, বিদ্বেষ মনে জাগতে লাগল। ভাবলাম যেভাবেই হোক রোস্তমকে খুঁজে বের করবই। তার মনুষ্যত্বের মূল্য আমাকে দিতেই হবে। অন্তত হৃদয়ের অর্থ্য দিয়ে ভক্তি দিয়ে আমার মনুষ্য জীবন সার্থক করবই। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফেরারি আসামি রোস্তম। তাকে খুঁজে বের করা যেমন পুলিশের অসুবিধা, আমার পক্ষেও কম নয়। ভাবলাম তাকে কোথা পাওয়া যাবে? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করলাম, সুমিদের বাড়ি যাব। একমাত্র এইটিই তার নিরাপদ স্থান। অন্তত পৃথিবীতে স্থান আছে যেখানে গিয়ে সে পায় অনাবিল শান্তি, আনন্দ। আমি আমার ছুটির সব ক'টি দিনই তাকে খুঁজে বের করার চিন্তা নিলাম যাক যে উদ্দেশ্যে গেলাম বিফল মনোরথ হলাম না। দেখলাম রোস্তম সেখানে আছে।

রোস্তম অবাক হয়ে বলল, কি রে, ছদ্ম এ কি তুই এসেছিস? তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

বললাম, ভাই কত দিন তোমাকে দেখিনি, কত কষ্ট করে শুধু তোমাকে দেখার জন্যই সুমিদের বাড়ি আসলাম। ভাবলাম তুমি এখানেই থাকতে পারো। তোমার অনেক কথাই আমি জেনেছি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, আমি ফেরারি আসামি। তাই নয় শুধু, সুমি আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। বলেছে, তুমি যেতে পারবে না। তাই উপায়ন্তর না দেখে এখানে আছি বেশ কিছু দিন।

এরই মধ্যে সুমির মা এসে হাজির। বললেন, কে উনি রোস্তম?

রোস্তম বললেন, আমার বন্ধু ছদ্ম।

সন্নেহে আমাকে বসতে বলে ঝিকে ডাকতে লাগলেন আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করার জন্য। খানিকটা আলাপের পর বুঝলাম মহিলাটি খুব ভালো। অবশ্য তার পরিচয় পূর্বেই পেয়েছিলাম। যাক, এ মুহূর্তে আমার আগ্রহ থাকল সুমিকে দেখার জন্য। সে রোস্তমের মানসী। বললাম, কি হে কোথা তোমার প্রেয়সী একবার দেখাবে না কি?

সে বললে, দূর রাখ তো।

তার কথায় আমি বললাম, এ কি বলছিস? সুমি যে তোর বান্ধবী, তথা ভাবী জীবনসঙ্গিনী সে কি ভুল?

আহা কি যে জ্বালাতন শুরু করছিস। রোস্তুম বলল, এই রহিমা, সুমিকে আসতে বল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আসল সুমি। দেখলাম অপূর্ব সুন্দরী সেনারী। দেখবার জিনিস, ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর। দুষ্কর বলছি এমন রূপ তার আমি আগে ভাবতেও পারিনি। তবে তার অসহায়বস্থার যে ঘটনাটি পূর্বে শুনেছিলাম তা মনে পড়ল।

আমাকে দেখে থতমত খেয়ে সুমি বলল রোস্তুমের দিকে চেয়ে, উনি কে? রোস্তুম বলল, আমার বন্ধু ছদ্ম।

ছদ্ম মানে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন তাই না?

রোস্তুম বলল, অনেকটা তাই, তবে সুমি দেখো ও আমার একান্ত বন্ধু। তাকে আমি অত্যন্ত মহব্বত করি। বাল্যকাল হতেই অনেক সময় তার সাথে কাটিয়েছি। অনেক অভিজ্ঞতার সাক্ষী আমার এই ছদ্ম।

সুমি তার কথায় সমর্থন জ্ঞাপন করল। মেয়েটি রোস্তুমের দিকে চেয়ে শান্ত অথচ ক্ষীণ নিচু কণ্ঠস্বরে বলল, তাহলে তাকে আতিথ্য গ্রহণ করতে বলো না রোস্তুম।

রোস্তুম বলল, হ্যাঁ আমিই যখন তোমার মানে তোমাদের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণে অনাহূত আমন্ত্রিত, তবে আমার বন্ধুটিও বাদ যাবে কেন বলো।

সুমি গোস্যা করে বলল, তুমি ভারি পাজি, দুষ্ট। আচ্ছা, আমি চা আনছি, বসুন, বলে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

এই ফাঁকে রোস্তুম বলল, দেখ ছদ্ম, সুমি আমার একান্ত আপনজন, তাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন, এই দুর্নীতিবাজ সমাজের মাথামুণ্ড ভাঙতে সেই আমার শক্তি। তার ভালোবাসায় আমি পেয়েছি নবজীবন। আমার সমস্ত গ্লানি মুছে গেছে।

আমি তার কথা শুনে হাসতে লাগলাম, মনে মনে ভাবতে লাগলাম, বনের পাখিও পোষ মানায় তাহলে দেখছি। খানিক পরেই সুমি চা-ট্রে নিয়ে এসে হাজির। আমাদের আপ্যায়ন করিয়ে সে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বুঝতে পারলাম সে যেন রোস্তুমকে তার রহস্যময়

আঁখি দ্বারা কটাক্ষ করে কি যেন বলে গেল। আমি এমন, মেয়েরা কখন যে কি করে তা খেয়াল করি বেশি। রোস্তমকে বললাম, কেমন হে বন্ধু.....।

সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, ছদ্ম আমি একটা প্ল্যান করেছি, শুনবে?

বলল, শুনব না কেন? ঐ সে তোমার প্ল্যান তো বহু দিন ধরেই শুনছি। চিরাচরিত অউহাসিতে ঘরখানা মুখরিত করে সে বলতে লাগল, এসব পুলিশকে আমি পাত্তা দিই? আর অন্যায়কে কোনোদিন দিইনি আর দিবও না। আমার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চলবেই। এ পথ থেকে কেউই আমাকে সরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আর সেই সাথে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেছি একটা পাঠাগার স্থাপন করব, পরিশ্রম করব। পরিশ্রমলব্ধ পয়সা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করব। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আগুন জ্বালিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করব জ্ঞান বিতরণ করব, কেমন হয়?

ভালো, খুব ভালো, আমি বললাম।

সে বলে চলল, দেখ মা-বোন এরা সবাই আমার আশ্রয়ে আছে। মামা মানুষটাও খুব ভালো। একেবারে মাটির মানুষ। যাক সেখানে মা শান্তিতেই আছেন। আমার বাড়িটা যদি আমার একার হতো তাহলে বিক্রি করে দিয়ে একটা এতিমখানা স্থাপন করে দিতাম। ভগিনীর হিস্যার জন্যই পারছি না। দেখ এ দেশে হাজার হাজার নর-নারী অশিক্ষিত, অজ্ঞ জ্ঞানের আলোক বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে জীবনযাপন করেছে। কত অনাথ শিশুর লেখাপড়া তো দূরের কথা শাকান্নের ব্যবস্থাও হচ্ছে না। তাদের এ অবস্থা কখন ঘুচবে? আর অত্যাচারী, কালোবাজারি, উঁচু শ্রেণীর পাষাণ মানুষগুলো বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলছে। আমার দেশে এমন গরিব আছে যারা তাদের সন্তানকে যা না খাওয়াতে পারে ঐ শ্রেণীর লোকেরা তাদের পোষ্য বিলাতি কুকুরকে তা খাওয়ায়। দেখ বৈষম্য, এর জন্য কি একাত্তর সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে? আমরা স্বাধীনতার জন্য শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়েছিলাম?

আসলে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও এর লক্ষ্য আজও অর্জিত হয়নি। তাই অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামে আজ বাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর জন্য তুমি কি করবে শুনি?

বলল, হ্যাঁ তাই ভাবছি। ভাবছি ডিগ্রি নিতে হবে। আর সেই সাথে দেশসেবায় ব্রতী হতে হবে। জনকল্যাণমূলক কাজ করব আর প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে একে একে সব সার্টিফিকেট নেব। পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে যাব, যাতে চক্রান্তকারীরা কোনো ছলে-বলে-কৌশলে আমায় পরাজিত করতে না পারে বলে শেষ করল তার প্ল্যান।

আমি মনে মনে ভাবলাম, পারবে, এই অমিয় তেজোদীপ্ত রোস্তম পারবে। তার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। এক ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া তাকে বাধা দিতে পারে এমন কেউই নাই। আল্লাহ তার সহায় হবেন। কেননা সে সত্যের পূজারী, ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের কঠরোধ করে মৃত্যু ঘটায়।

বললাম, ভাই তোমার আকাঙ্ক্ষা দেখে আমার সত্যিই আনন্দ লাগছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। রোস্তম আজ আমি বাড়ি যাচ্ছি, ছুটি কম। বাড়ি থেকে ফিরে তোমার সাথে অবশ্যই দেখা করব। আর তুমি যদি মার সঙ্গে দেখা করতে না পারো তোমার সংগ্রামী জীবনের তাড়ায়, মাকে আমি সাব্বুনা দিব।

সে আমার গলা ধরে মহাব্বতে আলিঙ্গন করে বারবার বলতে লাগল দোয়া করো, ছদ্ম আমি যেন সফলকাম হই আর তুই সত্যিই বলছিস আমার অভাগী মাকে চিরদিনই আমি কেবল দুঃখ দিয়েছি, কোনোদিনই শান্তি দিতে পারিনি। ভাই যদি পারিস আমার হয়ে মাকে বুঝাবি, সাব্বুনা দিবি। কমলাকে আমার দোয়া দিস। জেলে না গিয়েও আজ আমি কয়েদি। যতদিন পর্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী না হব তত দিন আমার সংগ্রাম চলবেই বলে হাত নাড়িয়ে ভেতরে গেল। আমি আর কোনো কথা না বলে, চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে এই মহামানবের দৃষ্টির অন্তরালে চলে আসতে লাগলাম। সত্যিই এমনি

মানব সে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে হৃদয় দিয়ে কেবল ভালোবাসা যায় আর কিছু দিয়ে নয়। রাস্তায় এসে গাড়িতে বসে কেবলই তার কথাগুলি সুর করে আমার কানে আর হৃদয়ে বাজতে লাগল।

রোস্তুম বলল, সুমি আজ পাঠাগারের বই সংগ্রহের জন্য আমাকে একজন প্রকাশকের কাছে যেতে হবে। বর্ণালী প্রকাশনা সংস্থা বলেছে কিছু সৌজন্য পুস্তক দেবে। আমার কাপড়গুলো দাও। সুমি তার চোখে চোখ রেখে কথাগুলি মনোযোগসহকারে শুনল। আর ছলছল অশ্রুতে পূর্ণ আঁখি দু'খানি রোস্তুমের হৃদয়ের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে সুমি বলল, রোসো তুমি আমার জীবন, আমার মরণ, তোমাক না পেলে আমি বাঁচব না। রোসো বলে তাহার বুকে মাথা রেখে সুমি কেঁদে ফেলল।

রোস্তুম তার অশ্রুভরা নয়ন আর মুখখানা তুলে বলল, সুমি তুমি দোয়া করো, সুমি আমি যেন তোমার ভালোবাসার শক্তিতে বিজয়ী হই। তোমার ভালোবাসা অক্ষয়, অমর। তুমি আমার প্রাণ, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না সুমি। বলে তার উষ্ণ দু'ফোঁটা অশ্রু সুমির কপোলে ঝরিয়ে রাখল। তারপর সুমি উঠে দাঁড়িয়ে রোসোর জন্য প্যান্ট-কোট আনতে গেল। মাথার চুলগুলো ভালোভাবে আঁচড়িয়ে জামাটা পরিয়ে দিল সুমি। তার পর সুমি এক কাপ দুধ খাইয়ে দিল রোসোকে। রোসোও তাকে খাইয়ে দিল। তার পর রোসো গন্তব্যস্থানের দিকে চলল। সুমি যতক্ষণ না তাকে দেখা যায় এক পলকে অশ্রুভরা নয়নে দেখতে লাগল। রোসো তার প্রাণের ধন যেন আবার সহিহ-সালামতে ফিরে আসে। রোসোও অনুভব করতে লাগল সুমির দৃষ্টি যেন তার উপরে আছাড় খেতে লাগল।

রোস্তুম বই সংগ্রহ অভিযানে সফল হয়ে সে দিনকার মতো গুটি দশেক সুসাহিত্যিকের কাব্য, উপন্যাস, পানি মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে আসল। তার লাইব্রেরিখানা একখানি ছোট ঘরে। সেটিও আবার এক পল্লীর নির্জন বনের ধারে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সংবলিত এ জায়গাটিই তার সংগ্রামী জীবনের কেন্দ্র হিসাবে স্থির করল। সুমিদের বাড়ি হতে অনেক দূরে। ময়মনসিংহের উল্লাপুর গ্রামে।

যাই হোক, রোস্তুম তার মতে এখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শিক্ষা দিতে লাগল, ভাষা শিক্ষা দিতে লাগল নিজেদের অধিকার সচেতনতা আরও কত কি। এরই মধ্যে সে প্রাইভেট বিএ পাসও করে ফেলল। রোস্তুমের আজন্ম স্বভাবজাত কার্যটিও একদিনের জন্যও থামেনি। ঐ তো সে দিন এক মজুতদারকে আচ্ছা করে কিল-ঘুষি লাগিয়ে দিল। অভাবের সময় যে মালগুলি জমিয়ে রাখছিল চড়া দামে বিক্রয় করার জন্য তার কাছে। তাই তার শত্রুও ক্রমে বেড়ে চলল। সাধারণ মানুষ যেমনি তাকে শ্রদ্ধা করে তেমনি অসৎ লোভী গ্রাম্য মাতব্বরদের সে দুশমন হয়ে উঠল। এলাকায় দ্রাস সৃষ্টিকারী এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবে ইতিমধ্যেই গ্রামের মাতব্বর, চেয়ারম্যান এরা সবাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিল।

একদিন রোস্তুম গ্রামের সাধারণ যুবক ও প্রৌঢ়দের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এ কাজ যদি আপনাদের ক্ষতিকর হয় তবে বন্ধ করে দিই। আর কিছু মাত্র লাভ হলে চালু রাখব। কিন্তু আমি কোনো অন্যায়কে ভয় করি না, অন্যায় শক্তিকে চিরদিন পদাঘাত করে আসছি। আমার ভালো কাজের জন্য অন্যায়ভাবে প্রশাসন যদি আমাকে সাজা দিবার চায় তবে আমি তার তোয়াক্কা করি না। প্রয়োজন হলে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চাই। আপনাদের অনু-বন্ধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মৌলিক চাহিদাগুলির সমাধান চাই। এর জন্য যে কোনো ত্যাগ, প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিব, তবুও কর্তব্য হতে এক পা পিছিয়ে যাব না। সকলেই তার কথামত সায় দিল এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, যেভাবেই হোক তারা শিক্ষা অর্জন করবে, পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাবে এবং যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলবে। এমনি করেই চলল রোস্তুমের অভিযান।

যে যুবকটিকে আমি একদিন দেখেছিলাম কৌতূহলবশত ভরা মাঝনদীতে চেউয়ের সাথে পাঞ্জা খেলতে, যে যুবকটি একদিন দেখেছিলাম দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে একাকী লড়তে, সেই সৈনিক আজ যে

কাজ ও দায়িত্ব হাতে নিল তা সে করবেই এ নির্দিধায় বলা চলে। রোস্তুম দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করত, ছয় ঘণ্টা পড়ত আর ছয় ঘণ্টা পড়াত।

এমনি করে সে তিনটি বছর কাটিয়ে দিল ততদিনে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আজ সে একজন প্রতিশ্রুতিশীল জনসেবক, কর্ম প্রেরণার শিক্ষাগুরু। রোস্তুমের পরামর্শে যারা ভিক্ষা করত কিংবা আয়ের কোনো উৎস খুঁজে পেয়েছিল না, তাদের দেখাল সত্যিকার পথ, তাদের বন্ধু ও দার্শনিক হিসেবে। আর সাথে সাথে এবার অসৎ বিভ্রান্ত প্রভাবশালীরা তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য রোস্তুমের কাছে যেতে লাগল। যে রোস্তুমকে তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য রোস্তুমের কাছে যেতে লাগল। যে রোস্তুমকে তাদের দলে ভিড়াবে সে লাভবান হবে। তার ব্যক্তিত্ব ক্রয় করার জন্য এবার তারা মেতে উঠল। রোস্তুম কিন্তু অটল-অনড়। তার চিন্তাধারায় এমনিভাবে প্রতি গ্রামে গ্রামে হাজার রোস্তুম গড়ে উঠবে যারা দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে এবং সর্বোপরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে।

রোস্তুম পড়াশুনা করে রাত্রিতে লাইব্রেরীতেই শুয়ে থাকে। পরিশ্রম করে যা পায় তাতেই চলে, এদিকে মা'র ইচ্ছা তার পৈত্রিক ভিটে যেন বিরান না থাকে। 'মা'র অনুরোধ সে রাখল। তার নিজস্ব জমিতে যে ধান পায় তার জমির হিস্যা ভগ্নির অনুমতি সাপেক্ষে সম্পূর্ণ টাকটাই জনকল্যাণমূলক কাজে বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের আয়বৃদ্ধি মূলক কাজে ব্যয় করে। এ অদ্ভুত চরিত্রের লোকটিকে মানুষ, দেবতা বলে মান্য করত এবং আদর করে রোস্তুম ভাই বলে ডাকত। আর শক্তিতে সত্যিই সে রোস্তুম। পাঁচজন সাধারণ লোক যা করতে পারে না সেই কাজটিই সে করে ফেলে। যার ফলে মানুষ তাকে এ যুগের রোস্তুম বলে জানে।

একদিন কুচক্রীরা তার বিরুদ্ধে মানহানি কেইস দিল। পুলিশ লাইব্রেরিতে এসে তাকে এরেস্ট করল। ইচ্ছা করে সে কোর্টে গেল। আর সেখানে সে ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করে, বিনা

উকিলে কর্মসূচির উপরে বক্তব্য রাখল, তাতে জজ সাহেব তার প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুন্যর পর তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করল ও মুক্তি দিল। সে গ্রামে এসে আবার শুরু করল অভিযান।

রোস্তুমের আজ বেশ কিছু দিন হলো সুমিদের বাড়ি যাবার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুমি তার বিরহ কেমন করে সহ্য করবে। সে যে তার নবজীবনদাতা, ইজ্জত রক্ষাকারী। একদিন ছুটে এলো প্রিয় দর্শনে। সুমিকে দেখে রোস্তুম বলল, সুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি, একরত্তি সময় পাইনি যে তোমাদের বাড়ি যাব, তাই।

সুমি প্রত্যুত্তর করল না। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে ভিতরে তার ভালোবাসায় অনুরাগ বাড়ছিল।

রোস্তুম তাকে কাছে টেনে বলল, রাগ করেছে লক্ষ্মীটি! দেখো আমার দিকে তাকিয়ে।

সুমি তার বুকে মাথা গুঁজে কেঁদে দিল। রোস্তুম তাকে বুঝাতে লাগল, নরম হতে নেই। দেখো, তুমি যে একটি আগুনের সঙ্গিনী। সুমি বুঝল, তার ব্যর্থতা, কর্মবহুল জীবনে কত সময় পায় যে তার ভালোবাসায় দাবি কানায় কানায় পূর্ণ করবে?

সুমি তাকে বলল, রোসো আমি তোমার সাথে কাজ করব, আমাকে তুলে নাও তোমার মধ্যে। অন্তত আর কিছু না পারি তোমার পাশে থেকে তোমায় শক্তি দেব, তোমার পাশে থেকে আমি ধন্য হব। কি বলো রোসো?

এইবার রোসো নিরুত্তর। শুধু ছলছল অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুটি মুছে দিল সুমির। অনেকক্ষণ পর বলল, দেখো সুমি, তোমার মা-বাবা কি মনে করবেন? তোমার ভাই আমার কলেজ জীবনের বন্ধু, সে-ই কি মনে করবে? তাছাড়া তুমি গ্রাজুয়েট, অন্তত এ বুদ্ধিটুকু তোমার আছে যে মা-বাবার মনে কষ্ট দিতে নেই। একটু ভেবে দেখো, তারা খুব কষ্ট পাবেন এই ভেবে যে, তুমি অবিবাহিত অথচ সর্বক্ষণ আমার সাথে আছ। আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না সুমু।

আমি তোমারই। তবুও সমাজ সংসার বলতে একটা কিছু আছে যাকে অন্তত স্বীকার করতে হয় তোমার কল্যাণের জন্যই। সুমু বাড়ি ফিরে যাও, আমি যখনই সময় পাই তোমায় দেখে আসব। আর আমার পাশে তো তুমিই আছ, চিরদিনই থাকবে। যখন তোমার অসুবিধা বোধ করো।

আমি তো আছিই, বলবে সমস্যা সমাধান করে দিবে কেমন? সুমি মাথা নাড়ল।

সুমির সঙ্গে এসেছিল তার ছোট বোন লতা। তার বয়স নয়-দশ বছর হবে। সে লাইব্রেরির মধ্যে বহু বই দেখে আনন্দিত হয়ে নাড়াচাড়া করছিল। একবার একটা বইয়ে অপূর্ব ছবি দেখে বড় বোনকে ডাকতে লাগল, আপা ও আপা, শোন না। ও আপা কত সুন্দর বই পেয়েছি রোসো ভাইয়ের পাঠাগারে।

ততক্ষণে সুমির ভাববিহবল অবস্থা কেটেছে। দুষ্টুমি ভরা হাসি দিয়ে আঁখি দুটোতে আনন্দের ফুলকি তুলে রোসোকে বলল, লতা ডাকছে, ভালো বই নাকি পেয়েছে, জ্ঞান দেব রোসো সাহেবের পাঠাগারে। তা দেখি না কেন।

রোসোও প্রত্যুত্তরে দুষ্টুমি মুচকি হেসে দুই জোড়া নয়নের তারা এক করে বলল, যাও।

লতা দেখাল ছবির বই, আর সুমি দেখল কত রঙ-বেরঙের বই স্তূপকৃত করে সাজানো আছে সেলফগুলিতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বুঝতে লাগল মনের মতো উপন্যাস আছে কিনা। অসংখ্য বই, জীবনী, গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক, রম্য রচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুভাষার বই আছে, পৃথক পৃথক সেলফে এই কদিনে যে এত বই সংগ্রহ করা যায় তা অকল্পনীয়। তার মনে আনন্দ ঢেউ খেলতে লাগল। হ্যাঁ আমার রোসো এমনি কাজ পারবে না তো পারবে কে! আমি বই পড়ব নিয়মিত, এ যে আমার রোসোর পাঠাগারের বই।

লতা অনেক কিছুই বকিয়া যাচ্ছিল কিন্তু কিছুই সুমির কানে গেল না। সে যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন রোসো স্বয়ং তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে লাগল, পড়তে ইচ্ছা হয়?

সুমি বলল, যাও। লতা বলল, ভাইজান ভাইজান দেখুন কত সুন্দর ছবির বই। আমি এইটা নেব। দেখব দেখব আর দেখব। কত ভালো লাগে ছবিগুলি ভাইয়া!

রোসো বলল, লতা দেখি তোমার পছন্দের বইটা?

লতা বলল, না তাহলে এটি আপাকে দিয়ে দেবেন।

আমি দেব না। আহা পাগল দেব না, দেখি। হ্যাঁ ঠিক, কত সুন্দর ছবির বই। এই নাও।

লতা খুশিতে ডগমগ হয়ে আপাকে দেখাতে গেল। আপা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। বই নাড়াচাড়া করছিলেন আর রঙিন স্বপ্ন দেখছিলেন। যাক, লতার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বইটা দেখতে হলো। ভারি সুন্দর তো! বলল সুমি।

তার কথায় রোসোও যোগ করল, ভারি সুন্দর তো! উভয়ের চোখে চোখে দুষ্টমির চিহ্ন। খানিকক্ষণ পরে রোসো শরৎ সাহিত্যের দু'খানা উপন্যাস, বেগম রোকেয়ার একখানি জীবনী আর সূর্যসেন মাস্টারদার জীবনী বের করে সুমিকে ছোট করে ডাক দিল। সুমি কাছে এসে বইগুলো খুলে খুলে বারবার দেখতে লাগল। রোকেয়ার জীবনীটা নারীমুক্তির দাবিতে পূর্ণ। অগ্নি মহিলা, অবিস্মরণীয় মহিলা। তার জীবনটা যোগ করে সব কাঁটি বই একত্রে বান্ডিল করে বুড়িতে পুরে বলল রোসো, পড়ো কিন্তু।

বটে বটে জ্ঞানদেব মহামনীষী রোসোর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। হলো তো?

হ্যাঁ হয়েছে, হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবার চলো ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নিই।

বলে লতাকে মাথায় হাত দিয়ে রোসো বললে, এসো যাই ভিতরে, খাবে কেমন? চলো সুমি।

ডাল-ভাত-মাছ রান্না করা ছিল। রান্না রোস্তম নিজেই করে। রোস্তম তাই বলে ফেলল, লতা আমার হাতের পাক খাবে?

হ্যাঁ খাব, খাব নিশ্চয়ই, খাব ভাইয়া, আম্মুকে বলব ভাইয়া নিজেই পাক করে খায়।

সুমি লতাকে বলল, থাম।

রোসো বলল, উপরে উঠে বসো লতা। আমি বেড়ে দিচ্ছি, বলে কোমরে আঁচল গুঁজে শশব্যস্ত হয়ে কাজে লেগে গেল সুমি। বাড়া শেষ হলে সুমি বলল, খাও।

রোসো বলল, তুমি খাবে না সুমি? সুমি রীতিমত লজ্জাবনত হয়ে বলল, আমি পরে খাব।

এ হয় না সুমি, এক সাথেই বসো।

সুমি হেসে বলল, তুমি জানো না মেয়েরা খাইয়ে কত আনন্দ পায়।

আচ্ছা দেবী তোমার আনন্দ নষ্ট করতে চাই না। তব আনন্দ মম আনন্দ। লতা খাও। এই আমি এক টোক খেয়ে ফেললাম।

লতা খেতে শুরু করল। ছোট কচি হাত দিয়ে হাপুসহুপুস খাইয়া ফেলল। যাক এদিকে ইচ্ছা করেই রোসো খেতে দেরি করল। উদ্দেশ্য সুমি আর সে একসাথে খাবে।

লতার খাওয়া শেষ হলে রোসো বলল, ঐ কোটায় শোও গিয়া।

লতা ছোট হলেও বেশ বুদ্ধিমতী। বলে ফেলল, তোমার খাওয়া শেষ হলো না তো ভাইয়া।

রোসো রসিকতা করে বলল, আমি ছোট মানুষ, তাই খেতে দেরি হয়।

ভাইয়া কি যে বলে, বলে লতা চলে গেল এবং রোস্তমের কোটায় সটান শুয়ে পড়ল।

এদিকে রোসো সুমিকে বলল, এসো সুমি, বসো।

সুমু কিছুটা লজ্জা, আনন্দ, শিহরণ নিয়ে রুসোর পাশে বসল। রোসো ভাতের লোকমা তৈরি করে সুমিকে কাছে টেনে নিয়ে সোহাগভরা মৃদু ডাকে বললে, খাও।

সুমি হাঁ করল আর তার হাতে লোকমা তৈরি করে রোসোকে খাওয়াল। শেষে এক লোকমা সুমি অর্ধেক রোসোর মুখে দিতেই রোসো বাধা দিয়ে বলল, বাকিটা তোমার। সুমির তুলতুলে সজীব করতলে হাত দিয়ে বাকিটা সুমির মুখে তুলে দিল।

এইভাবে দুটি নর-নারী তাদের ভালোবাসার ভোজন শেষ করল। প্রেম-অনুরাগে মানুষ যে কত নিবিড় ও নিষ্পাপ থাকতে পারে বোধ করি এ দুটি নর-নারীই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সুমির জীবনে রোসো, রোসোর জীবনে সুমি এক অনাবিল শান্তিবীণা বহাইয়া দিল। পরস্পরের টান, কাছাকাছি অথচ নিষ্পাপ মানুষ যখন হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাদের মধ্যে স্বর্গ এসে বিরাজ করে। তাদের মধ্যে পাপের কালিমার চিহ্নমাত্র থাকে না। জগদ্বাসী এ দুটি নর-নারী সম্পর্কে যে ধারণাই করুক সত্যিই ওরা দুগ্ধ ধবল এক পবিত্র বন্ধন। স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ আর হৃদয়ে হৃদয়ে রাখার এক মহান শিক্ষা।

যাবার সময় এসেছে। সুমি বিদায় নেবে রোসোর কাছ থেকে সাময়িক। তবু ভালো করে তাকে দেখে নিতে চায়। চোখের চারটি তারা দিয়ে পরখ করতে চায়, তাই হলো।

গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বললে, সুমি কাকিমা কিছু মনে করবে না তো? যদি মনে করে আমি যাই সাথে, না তুমি যেতে পারবে?

সুমি বলল, পারব আমি। আমাদের অনুমতি নিয়েই এসেছিলাম লতাকে সাথে নিয়ে, তাই চিন্তা নেই। আর রোসো, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো, সাবধানে থেকো, সময় পেলেই যাবে, কেমন?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যাব দেবী তোমার পদমূলে পদ্ম দিতে।

যাও! সুমি হাঁকল।

এইবার বিদায়ের পালা। সুমির চোখ দুটি অশ্রুতে ছলছল করে উঠল-রোসো তার আঁচল দিয়ে মুছে দিল। বলল, সুমি কেঁদো না, তোমার কান্না আমার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ছিঁড়ে ফেলে, তাই কেঁদো না সুমি। বাড়ি গিয়ে চিঠি দিও, আমিও দেব কালকেই। কেমন?

আচ্ছ।

ত্বরিত দু'চোখের মিলন শেষে লতাকে সুমির কাছে ঘেঁষে বসতে বলে রোসো ধীরপদে গাড়ি থেকে নেমে এলো। কেবলই তার মনে হতে লাগল, এই রমণীজাত বিশ্বয়কর, এদের ভালোবাসার তুলনা নেই। এর দ্বারা যতটা হৃদয়ের সুখ পাওয়া যায় পৃথিবীতে তার তুলনা নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোস্তম তার প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে নিয়মিত অধ্যয়ন করে থাকে। আর গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে, ঐ পাঠাগারে নিয়মিত যাতে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থাই করে দিল। ইতিমধ্যে রোস্তম স্বভাবসিদ্ধ যে কাজ করে থাকে সেই কাজই করে। তার একটা গুণ কি, যে তার সংস্পর্শে একবার গেছে মুগ্ধ হয়েছে তার ব্যবহারে। মানুষকে প্রভাবান্বিত করার একটা স্বাভাবিক শক্তি তার আছে। কাজেই তার অনুগত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলল।

বর্তমানে গ্রামের যে হালত তা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো চিরকালই লাঞ্ছিত-বঞ্চিত। তারা আত্মজ্ঞানশূন্য, আত্মচেতনা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। কাজেই সহজেই প্রভাবশালী ধনী কুচক্রীদের দ্বারা তারা প্রতারিত হয়ে আসছে। যে পরিবারের এক শতাংশ জমি ছিল, চতুর-কৌশলী মহাজন মাতাব্বর শ্রেণী তাহাও কেড়ে নেয়। তারা মানবের জীবনযাপন করে। তাদের বুঝানোর লোকের অভাব চিরকালই আছে। এই দেশটি বহুদিন ছিল পরাধীন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে শোষিত শ্রেণীটি এখনও কিছু বলবার সাহস পায় না। আর যদিবা সাহস পায় বলতে পারে না, তাদের টুটি চেপে ধরার ব্যবস্থা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই শোষক শ্রেণীটি নানাভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছে। ক্রমাগত দুর্নীতি, ধাঙ্গাবাজ, ঘুষ, কালোবাজারি ইত্যাদি করে প্রচুর সম্পত্তি কামাই করেছে আর পানিমূল্যে মজুরদের খাটিয়ে এই শ্রেণীটির সম্পত্তির পাহাড় যে কত উঁচু করেছে তা বলা মুশকিল। তাই দেখা যায় এই প্রতিপ্রতিশালী শ্রেণীটি গণতন্ত্রের নাম দিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শাসনের দণ্ড হাতে নিয়েছে। সে এক কৌশলে মজুর, অর্ধশিক্ষিত বেকার লোকদের বিবেচনা রীতিমত পানিমূল্যে ক্রয় করে নিয়েছে আর বুলি আওড়াচ্ছে বড় বড়।

রোস্তুম চিন্তা করছে এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেভাবেই হোক ক্ষমতা ঐ শ্রেণীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে এবং একটা শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে হবে আর মানুষের জীবনে শান্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। তা কিভাবে করা যায়, এই বিষয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। সে উপায় বের করল, মানুষের উন্নতি আর শান্তির চিন্তা তাদেরই করতে হবে আর তাদের নির্বাচিত নেতা শুধু তাদের কথাই বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাবে। তাই সে সেই জন্য মানুষকে বুঝাতে লাগল, হে মানুষ তোমরা তোমাদের উন্নতির জন্য, শান্তির জন্য বহু ত্যাগ করেছে, স্বাধীনতারূপ অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছে, কিন্তু দেশীয় এক শ্রেণীর দালাল তোমাদের বিপথগামী করে রেখেছে। তারা নির্বাচিত হয়ে নীতি দ্বারা তোমাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে বলে। আসলে ভুল, তোমাদের কাজ তো তোমরাই করবে। তারা হবে তোমাদের কথামত তোমার পরিচালক বই কিছু নয়। জ্ঞানার্জন করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, যদিও তোমাকে যুদ্ধ করতে হয় তাই করো, তবুও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

তার শিক্ষা ধ্যান-ধারণা যেমনি সে অক্লান্তভাবে প্রচার করতে লাগল অমনি তার বিরুদ্ধে সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুচক্রী লেগে গেল। এমনকি পাঠাগার সমেত তাকে উড়িয়ে দেয়ার হুমকিও দিল। কিন্তু রোস্তুম অটল-অনড়। যে কোনো শক্তির মোকাবেলা করার সৎসাহস তার আছে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যে তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে। তাই দেখা গেল ক্রীত ভোটে বিজয়ী গণপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান-মেম্বার এক শ্রেণীর টাউট মাতব্বর তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠল তাকে কিভাবে নাস্তানুবাদ করা যায় অকালে ঝরিয়ে দেয়া যায় সেই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। আর করলও ঠিক তাই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করল, সে এই দেশের দালাল, মানুষের উপর জুলুমকারী ডাকু। সে সম্মানী লোকের উপর অত্যাচার

করে। ডাকাতি করে, আরও কত কি। রোস্তম সেভাবে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। সে রীতিমত কুস্তিবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছিল যাতে পুলিশি শক্তি তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেও আটকে না রাখতে পারে আর তার সহযোগী ভক্তদের এক একজন এইভাবে তৈরি করতে লাগল অগ্নিমন্ত্র দিয়ে, যে কোনো অবস্থাতেই যেন তার পরিচালিত ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। একটি অভিযোগে একদিন তাকে এবং তার কিছু সহযোগীকে ধ্রেফতার করে। সে আর তার সহযোগীরা কৌশলে পুলিশকে হটাইয়া নির্দিধায় চলে আসে। গ্রামের টাউট গ্রামব্যাপী তার বিরুদ্ধে হাজারও প্রকার কুৎসা রটনা শুরু করে। এমনি অবস্থাতেও অব্যাহত থাকল তার সংগ্রাম, সবার চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে।

এই সং ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী আত্মত্যাগী, শিক্ষিত, সদালাপী, সদাচারী, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী প্রজ্ঞাবান কৌশলী এবং সর্বোপরী অপরমেয় শারীরিক শক্তির অধিকারী মানুষটিকে কে না পছন্দ করে! কে না তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়! তার কোনো কাজই তো মানুষকে হত্যা করতে নয়। তাই কুচক্রী শয়তানদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে সাফল্য লাভ করল তার অভিলাষে। দেখা গেল ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষ অসৎ নেতৃত্ব থেকে মানুষ তার নেতৃত্বে ক্রমশ আসছে এবং মুক্তির ইঙ্গিতে শান্তি পাচ্ছে। গরিবরা বুঝল তাদের অধিকার আছে, তাদের কাজ করতে হবে, অলস বসে থেকে পরিবার তথা জাতির শত্রু হয়ে কেউ বাঁচবে না। এই বাঁচা বাঁচা নয়, অসত্যের নামান্তর। আগামীদিনের বংশধরদের কিছু দিয়ে যেতে হলে অবশ্যই তাদের উন্নয়নের চিন্তা তাদেরই করতে হবে। তাদের ভাবনা হলো সঞ্চয়সহ মানবে-মানবে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সবাই যেন শান্তিতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাই তারা করবে।

তার পাঠাগারে লোক সংকুলান হয় না। তাই গ্রামে গ্রামে সংগঠন করে পাঠাগার দেশীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করল। এই সেই রোস্তম গড়ে তুলল প্রতি গ্রামে যুবকের সংগঠন

আর পাঠাগার। কোনো বিরুদ্ধ শক্তিই তার বিরুদ্ধে কিছু করে সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়। পুলিশ ধরে তাকে থানায় নিলেও পরদিন দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ তার জন্য অপেক্ষমাণ, কখন তাদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মুক্তির সংবর্ধনা দেবে। কর্তৃপক্ষ তাই নিরুপায় হয়ে শর্তহীনভাবে তাকে মুক্তি দেয়। বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা এই মানবটিকে এমনই গুণ দিয়েছেন যে, যার সাথে কথা বলবে সে যদিও ছোট শিশু হয় অথবা কঠিন হিসাবি নিম্নবিত্ত পরিবার, কারো সাথে কথা বলে তার চিহ্ন আড়ষ্ট হয় না, প্রতি ক্ষেত্রেই তার সাফল্য অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। তাই চেয়ারম্যান এখন প্রমাদ গুনছে। কিভাবে লোকটাকে বের করা যায়।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এমনি সম্মোহনী শক্তি দিতে পারে যেন মানুষ হয়ে ওঠে দেবতা। এই ছেলেটি তার জ্বলন্ত বাস্তবতা। সে এমনি গুণের অধিকারী যে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে যে কোনো জাতের প্রতি তার সমান সহনশীলতা রয়েছে। আর সূত্রধরশীল, কামার-কুমার সবাই তাকে বন্ধু বলে নিজেকে কৃতার্থ করতে চায়। মানুষ অন্তর থেকে তাকে নেতা করেছে। অথচ সে সৌভাগ্য গর্বে গর্বিত নয়।

এতগুলি গুণের সমাহার যে হৃদয়ে সেই হৃদয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ হতে লাগল পাগল। আর কুচক্রীদের সে হতে লাগল জাতশত্রু। এবার তাকে নিতে হবে অস্ত্র। যে অস্ত্র দ্বারা সমগ্র গ্রামবাসীদের পরিচালক হবে রোস্তুম। দেখা গেল মানুষের প্রতিনিধিই সে হয়ে গেছে আর কুচক্রীরা হয়েছে পরাজিত। রোস্তুমের চিন্তা অনেক উর্ধ্বে উঠেছিল। সে চায় গ্রামের লোক একটিও থাকবে না কোন দিক দিয়ে মানবেতর।

আমি রোস্তুমের অস্বাভাবিক সাফল্য দেখে আশ্চর্য হলাম। তাই কৌতূহলী হয়ে মাঝে মাঝে তার কর্মস্থলে গিয়ে আনন্দ পেতাম। আর এই আনন্দের ভাগটুকু তার মাকে দিতাম কিন্তু কি জানি যেন রোস্তুম তার মাকে এসব কিছুই বলত না। বলত, মা আমি তোর কাছে ফিরে যাব। এই পুরুষটি কেন এই রকম। তাহা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব টেকল। তবে আমি হাল ছাড়লাম না। আমি বুঝে উঠতে পারি না, যদিও তার এসব কার্যকলাপ তবুও মাঝে মাঝে মনের অজান্তেই ভাবনামুক্ত হতাম। যাক রোস্তুমের কার্যকলাপ বোধহয় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের টনক নেড়ে দেবে। এই রকম পুরুষ চোখে পড়ে না। বস্তুত যে নিজের বিষয়ে উদাসীন থেকে অপরের কল্যাণ কামনায় ব্যতিব্যস্ত থাকে আর আপন জন মাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। কেন এই রকম হয়। তার কারণটা বোধ করি যে মাকে বলে-কয়ে লাভ হবে না, যদি সার্থক হতে পারি তবেই বলব। নচেৎ নয়। মার কাছে তার এই লুকানোর ইতিহাস কেন হল মার কাছ থেকে তো সে সাহস পেতে পারত। তবে মা এমনি ছিলেন যে এই ছেলেটিকে তিনি হতভাগ্য ছাড়া আর কিছুই কোনোদিন ভাবতে পারেননি। কাজেই হতভাগ্য ছেলেটি তার অর্থর্ব সুখ নিয়ে কি করে মার কাছে গর্ব করবে। কি করে তাকে সান্ত্বনা দিবে তাই তার আপন জন যে একেবারে নিকটে তার সংগ্রামী জীবনের সাফল্য বিজয় অভিযান হতে ফেরা না পর্যন্ত মার কাছে যাওয়া, বলা একেবারে নিরর্থক। এই ভাবনার প্রেক্ষাপটেই যে সংসারের সকলের কাছ থেকে অগ্নিস্কুলিপ্সের মতো দূরে থেকেই নীরবে কাজ করে যাচ্ছিল। যদি তার আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদি তার গতিপথে কষ্টক হয়ে যায় এই ভয়ে সুমিকে বললে, আমি সে দিনই তোমার হব যেদিন আমার সমস্ত কর্মের সাফল্য নিয়ে তোমার কাছে হাজির হব। বস্তুত রোস্তুম একক তাকে সান্ত্বনা আশা-উৎসাহ দেবার প্রয়োজন নেই। সবকিছুই তার মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সে নিজেই নিজেকে উৎসাহ দিত; অনুপ্রেরণা যোগাত আশায় বুক বেঁধে কর্মের সাগরে পাড়ি জমায়। তার সাদা

ধবধবে হৃদয়ের প্রান্তে যে কোমলভাবটি ছিল তাই দিয়ে মানুষের অতি নিকটে চলে যেত আর আমাকে দিয়ে মাকে অভিবাদন পাঠাত আশীর্বাদ কামনা করত মায়ের। পুলিশের চোখকে এড়ানোর জন্য চলে যেত প্রিয়ার বাড়ি। কিন্তু প্রিয়ার উষ্ণ আলিঙ্গনে ভেসে যেত না, প্রিয়াকে কাছে টেনে জীবনের সাধ পরিপূর্ণ করার প্রয়াস পেত না তবে প্রিয়ার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর তার ভালোবাসা যুগপৎ কাজ করে তার মানসিক শক্তি বহুগুণ বেড়ে যেত এ কথা ঠিক। তাকে বললাম, রোস্তুম তুমি তো আমার বন্ধু, আমার কাছ থেকে এ মুহূর্তে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করো?

সে দৃঢ়ভাবে বলল, ছদ্ম, দেখো আমি আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে কর্মে নেমেছি। যদি আমার বন্ধুই হোস, তাহলে বলব আমার মাকে বলবে যত দিন তার ছেলে সৌভাগ্যবান না হবে তত দিন অন্ততপক্ষে হতভাগ্য ছেলে হিসেবে যেন আমাকে স্মরণ রাখে। আর তার অভিসম্পাত না দিয়ে তোকে যেন তার ছেলে হিসেবে করে নেয় আর সৌভাগ্যের পুত্রের জন্য মায়ের হৃদয় নিংড়ানো আশীর্বাদ যেন তোকেই দেয়। আমার এই কথাটুকু তুই রাখবি।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম এত বড় মহামানব আর কতজন হতে পারে? সে তার সৌভাগ্য আশীর্বাদ অন্যকে এমনভাবে বিলিয়ে দিয়ে হতভাগ্যের বিশেষণ কাঁধে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? আমার জীবনে এমন দেখিনি কোনোদিন যে কেউ পৈতৃক সম্পত্তির ফসল অকাতরে দরিদ্র জনে বিলিয়ে দিয়ে নিজে কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে। এমন তো কোনোদিন দেখিনি যে, কে তার নিজের জন্য এক বিন্দু চিন্তা না করে অপরের জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিতে এত সহজে প্রস্তুত হয়। বস্তুত তার এই মহাপ্রাণশক্তি তাকে নিয়ে যাবে এমন এক জগতে যেখানে সে মহারাজা। যেখানে তার আত্মা স্বর্গীয় রস আশ্বাদনে ব্যাপ্ত

হবে যেখানে তাকে সৌভাগ্যের পোশাক পরিয়ে বিশ্ব বিধাতা তার রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকে জানাবেন মোবারকবাদ। এই মর্ত্যের ভূমিতে বসবাস করে পাপ-পুণ্যের সীমাহীন খাদে কত প্রাণ অকালে চলে গেল কত প্রাণ পাপের পঙ্কিল গর্তে পড়ে নিজেকে অসম্মান করেছে। কত নর-নারী জীবনের হিসেব মিলাতে না পেরে তার আগেই প্রস্থান করেছে। তারই মাঝে জগৎ স্বামী পাঠালেন এমন মানব যে তার হৃদয়ের বিকাশ করে দেখিয়ে যাবে,ভুলিয়ে যাবে সব বৈষয়িক কলুষতা,তার কাজে মানবীয় গুণাবালির সব প্রকাশ পেয়েছে এমন কথা বলি না। তাকে এটুকু বলিতে পারি এই পঙ্কিল জগতে যতটুকু বের হয়েছে আর হতে যাচ্ছে এর সৌভাগ্যেই জগৎ আরও বহুদিন পরিষ্কার থাকবে। সীমাহীন দুর্গতির মধ্যেও মানুষ মনুষ্যত্বের দাস, হবে পশুত্বের না হয়ে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অত্যাধুনিক সাজে সজ্জিত চার তলা বাড়ি। তাহের খান নামকরা ব্যবসায়ী এক্সপোর্টার। বড় বড় কন্ট্রাক্টরিও করেন। দেশের বাড়িতে অগাধ সম্পত্তি, সব মিলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। তা সত্ত্বেও তার ধনের অহঙ্কার ছিল না। ভিতরটা বর্তমান কালোবাজারিদের চেয়ে বহুগুণ ভালো এ কথা নির্দিধায় বলা চলে। যাক বলছিলাম কি, শহরের এই বাড়িতে থাকেন, তাহের খান,সোহাগী,তার মেয়ে কমলা ও পুত্র সুমন। সংসার ভালোই চলছে। সোহাগী ভায়ের সংসারকে ভালো করে পরিচালিত করছেন। আর বোনের হাতের ছোঁয়ায় সংসারের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। কোথাও কোনো অভাব নেই। অভাব শুধু একটাই, আর তা হলো রোস্তুমের। মায়ের প্রাণ কাঁদে, মামা দুশ্চিন্তায় ভোগেন। বোন কমলা মাঝে মাঝে হৃদয়ে ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে মায়ের কাছে দৌড়ে যায়।

যাক আমি কথামত ঘন ঘন তাহের খানের বাড়ি যাতায়াত শুরু করলাম। মায়ের মনে রোস্তুমের স্থান দখলের চেষ্টা করতে লাগলাম। সান্ত্বনা দিতাম কিন্তু অবুঝ মাতৃমন কেবলই আহাজারি করত। তবুও যা সম্ভব নয় তাই করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম। ভাবলাম যে, বন্ধুর কথা যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে।

একদিন তাহের খান সাহেব (যাকে আমি মামা বলে ডাকি) বলল,ছদ্ম সাহেব, দেখুন আমার ভাগ্নেটি অনেক দিন দেখি না, সে কিসের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেছে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে কাজে নেমেছে। কোনোমতেই এই সংকল্প থেকে তাকে রোধ করা যাচ্ছে না। এমনকি বাড়িতে পর্যন্ত থাকে না, দেখুন তো ছেলেটিকে আমি কি করব। ভেবেই পাচ্ছি না-এ দিকে তার মাও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তার অসাম্প্রাণ আর অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বোনটি আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। সুমন কতভাবে খুঁজছে, ঘুরছে তাকে খুঁজে বের

করার জন্য কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না, সবই গুড়ে বালি। এখন যে কি করি ভেবেই পাচ্ছি না। কথাগুলো খান সাহেব ভাববিহবল কণ্ঠে বলছিলেন, আমি কিছু জবাব দিলাম না। ভাবলাম, কোনো অবস্থায়ই রোস্তুমের কথা ঠিক না বলা যাবে না। তাহলে যে তার ভীষণ ক্ষতি হবে। কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, কোথা জানি আছে আল্লাহই জানে। উভয়ই কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সুমনের সাথে দেখা। সে বলল, ছদ্ম ভাই ভালো আছেন তো।

আমি বললাম, ভালোই, তুমি কেমন?

সে বলল, ভালো। আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। ঐ যে কোন্ দিন এসেছিলেন বাসায় তার পর থেকে।

বললাম, কর্মক্ষেত্রে থাকতে হয়, হয়তো তাই। আজকে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। এই মাত্র এসেছি।

সে বলল, আচ্ছা আসুন, সুনীল স্যারের বাসায় যাই। তিনি খুব সঙ্গীতপ্রিয়, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। আমাকে খুব ভালোবাসেন। যাবেন? আসুন ভাবলাম, হাতে সময় আছে, মোটামুটি যাওয়া যায়। তাই গেলাম তার সাথে। বিকালবেলা সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে চোখে চশকা ঁটে বসে আছেন। বেশ তো মজা হবে।

দূর থেকে, অস্পষ্ট স্বপ্নে, সুমনকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, কাছে এসো আমরা যথারীতি সৌজন্য আলাপ শেষে স্যারের বাসায় বসে গেলাম।

বললাম, স্যার একটি গান শুনাবেন?

স্যার বললেন, শুনাব।

আসলে স্যার নিজেই গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে ফরমায়েশ অর্থাৎ নির্বাচন করার আবদার পেলেন।

আমি বললাম, স্যার দেশাত্মবোধক?

সুমন বলল, স্যার প্রাকৃতিক অথবা ভাববোধক। যে কোনোটাই আমার সমান প্রিয়, শেষে স্যার কি চিন্তা করে যে গাইলেন এই পদ্মা, মেঘনা,

যুমনা, সুরমার নদী তটে। গানটি ভালোই লাগল। স্যার ভালো গান গাইতে পারেন। যাক, সুমন প্রায়ই স্যারের বাসায় যেত আর সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি ছিল তার কৌতূহল। সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যই স্যারের সঙ্গে হৃদয়তা জমিয়ে তুলল। অনেক দিন পরে এই রকম একজন সঙ্গীত রসিকের সঙ্গীতের রস পান করে সেদিনকার মতো প্রস্থান করলাম। পথে রোস্তুমের ব্যাপারে সুমন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। আমি নিরুত্তর। কারণ একটাই ছিল, আর সেটি রোস্তুম ভাইয়ের নিষেধ। সে আজ্ঞা পালনে আমি অন্যথা করলাম না।

আমার কর্মস্থলে ফিরে এসে আমি যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলাম, আমি জীবনে তাহা ভুলতে পারব না। কেননা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই জীবনে শিক্ষা দেয়, কৌতূহলী করে। আমি সেদিন রাতে ভাবীদের বাড়িতে খেতে গেলাম। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করি। যাক, যাহা বলবার তা বলে ফেলি। দেখলাম জলিল ভাই কতিপয় বন্ধু নিয়ে বসে আছে আর মধ্যস্থলে আছে গাঁজা-সিদ্ধির কৌটা, চাকু আর এক খণ্ড কাঠ। কাঠে রেখে চাকু দিয়ে একজন সিদ্ধি কাটছিল। আমি কলকি দেখেই বুঝেছিলাম যে এ আসরটা সিদ্ধি খাওয়ার।

এর আগে কোনোদিন এই সিদ্ধির আসর তো আর দেখিনি। তাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম। সিদ্ধি খেলে কি হয়? একজন জবাব দিল, আরে জলিল উনি কে। বললে, উনি অফিসার আমাদের।

তিনি বলে চললেন, সিদ্ধি খেলে কোনো নারীর চিন্তা আসে না, যেমন মদ খেলে হয়। আর একটু পরেই ভগবানের চিন্তা আসে। সেভাবেই পাগল হয়ে ভগবানের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করি।

ভাবলাম এ উঁচু ভাবনা। আচ্ছা তাহলে ধর্ম নিয়ে এত সাধ্য-সাধনা, তর্ক-বিতর্ক, হাজারও পথে হাজারও যাত্রী গমনে উদ্যোগী, সে ক্ষেত্রে শুধু কি সিদ্ধি খেলেই সিদ্ধ হওয়া যায়? মনে সংশয় দানা বেঁধে উঠল। আসলে সিদ্ধি খেলে আদৌ সিদ্ধ হওয়া যায় কি-না তাই জানবার জন্য পুনর্বার প্রশ্ন করলাম, এ খেলে তো হাটের ক্ষতি হয়?

বললে, না।

সমস্ত ধারণাটি মিলে আমার কাছে এমন তালগোর পাকাল যে সেদিনকার মতো আর কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। তবে সেদিন বন্ধুটি আশ্বস্ত করছিল এই বলে যে, সিদ্ধি গাঁজা, মদ খেলে সহজেই দেউলিয়া হওয়া যায়। আমার ধারণার সাথে বন্ধুবরের ধারণা মিলে যাওয়ার মনে পুলকিত অনুভব করলাম। আসরটার প্রতি ঘৃণা মনে দানা বেঁধে উঠল। চলে এলাম। ঋণ প্রকল্পের ঋণ আদায় করা অসম্ভব, তাদের অভাব চোখে পড়ার মতো। দু'দিন পরে দেখলাম সাত-আটটি সন্তান, কঙ্কালসার দেহ নিয়ে সামনে অঙ্কুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সভ্য জীবনের ছোঁয়ামাত্র আসে নাই, আছে মানবেতর রূপে বাঁচার তাগিদ। তার কথা না রেখেইবা করি কি? আমার সামনেই দেখলাম শুধু চারটে চালের ভাত চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে বাচ্চাগুলো। আর পুরুষটি সে তাদের মধ্যে বসে হাতে মাছি তাড়াচ্ছে। মনে হয় জীবাণুর হাত থেকেও বাঁচতে পারছে না। সে পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র না দেখার মতো একটি জীব। সারাটা দিন ওয়ার্ক করে সেদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। তাই একটা চেয়ার টেনে বসে ভাবতে লাগলাম, এরাই তো স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক, আর তাই তো সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। সাথে সাথে মনে পড়ে রোস্টমের কথাগুলো। মনে মনে তাকে শ্রদ্ধার্থ দিতে লাগলাম। এই জীবনের উন্নতি করার সাধ নাই, শ্রেষ্ঠ সাধনা, যেখানে ঋষি দরবেশও পরাজিত, কারণ শাস্ত্র কথায় বলে কিনা সেবা ধর্ম পরম ধর্ম। এই পরম ধর্ম পালনে অন্তত আমি পিছপা হব না। তাই মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি আমলা হলেও অন্তত এই দলের সাথে বেঈমানী করতে পারব না, যারা অনুযোগ দেয় দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমি ভালোই করেছি পুলিশকে না দিয়ে। মহান শান্তিশৃঙ্খলা বাহিনী তো শুধু এর জন্যই।

যাকগে কি বলতে কি বলে ফেলি। জীবনে মানুষের অতি কাছে না গেলে, একাত্ম না হলে, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিন্দুমাত্রও টের পাওয়ার উপায় নেই। দূর থেকে কালো চশমা ঐটে যতই বুলি আওড়াই না কেন। যাকগে বাসায় ফিরে এসে দেখলাম দয়াল নামের বন্ধুটি এসে হাজির। উদ্দেশ্য সহকর্মীকে কন্যা দেখাবেন। কাজেই নিয়ে চলল দুষ্টমি সাধন করার জন্য। ভাবতে লাগলাম, কত মেয়েই তো দেখি। আচ্ছা এইবার না, যেভাবে রাস্তাঘাটে সর্বত্রই মেয়ে দেখি আজকে না হয় একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখব। যে বধূ হবে না, যে ফুল জীবনে ফুটবে না তাকে দেখি না কেন। তাই বন্ধুর প্রস্তাবে রাজি হলাম। মেয়ে বাড়ি গিয়ে দেখলাম কন্যা দায়গ্রস্থ মাতা দাওয়ায় বসে রাঁধছেন। কি ভাবছেন জানি না, তবে তিনি আমাদের দেখে সহাস্য বদনে বললেন মেয়েকে, উনাদের বসতে দে।

আমরা বললাম, না।

কেননা ভেতরে ভেতরে হাসি আসছিল। মেয়েটা বারবার দেখে নিলাম। পথে আসতে আসতে ভাবলাম। এই রকম করে বিনা খরচায় দুনিয়ার সব পুরুষ যদি মেয়ে পছন্দ করত, তাহলে পৃথিবী থেকে যৌতুক নামের শব্দটি উঠে যেত। তা কি কোনোদিন সম্ভব- হবে? জানি না।

নবম পরিচ্ছেদ

রোস্তুমের মা বিচলিত হয়ে উঠলেন। আর হবে না কেন? পৃথিবীতে প্রত্যেক মা-ই এই রকম হন, যখন তার ছেলের থাকে না উদ্দেশ। ছেলেকে নিয়ে মায়েরা কামনা করেন তাকে খাওয়াবেন। তার বউ ঘরে আনবেন। নয়ন ভরে দেখবেন। সন্তানের প্রতি মায়ের এই চিরন্তন দাবি তা বোধ করি কোনো মায়ের জীবনে এড়াতে পারেন না। কিন্তু কোনো মা কি কখনও ভাবছেন যে তার সন্তান যদি তার অগোচরেও থাকে তবে ও যে সকল কর্তব্য সমাধা করে মায়ের মনস্কামনা পূরণ করতে পারে? অর্থাৎ অলক্ষ্যে থেকেও মা যা আশা করেন তা করতে পারে? ছেলেকে সামনে রাখার মায়ের যে আবদার, যে চিরন্তন কামনা তার বুঝি অবসান নেই। মা মা-ই, হৃদয়ের রক্ত-মাংস সমেত রগগুলি যদি একটা একটা ছিঁড়ে ফেলা যায় তবে যে কি রকম ব্যথা অনুভব হবে তা মা গর্ভধারিণীই জানে। না, মায়ের প্রশংসা কীর্তন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, হৃদয়ের কামনা দেখেই বলা যায় কার কামনা বেশি দামি, প্রিয়ার না মায়ের। যে প্রিয়া যৌবনে সংগৃহীত একখানি বন্ধু। আর যে মা সে গর্ভধারিণী তার থেকেই জন্ম। কাজেই মা-ই প্রধান, নমস্য, পূজ্য। আরাধ্য।

কমলা সেদিন মাকে প্রশ্ন করছিল, মা আর কোনো দিন কি রোস্তুম ভাইকে পাব না? ভাইয়া যে আমাকে কত আদর করত। মা, বলো চুপ করে থেকে না। মা সেদিন ডুকরিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

এমনি শত দুষ্চিন্তায় মায়ের শরীর আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। সেই শান্ত, সৌম্য তার নারী মূর্তি আজ আর নেই। ক্রমেই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন।

তাহের খান বললেন, অমন ছেলের আশা করো না, যে ছেলে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। ভুলে যাও তাকে। নচ্ছার, পাজি। বোনটি আমার দিন দিনই শুকিয়ে যাচ্ছে। সুমনও পিতার সূত্র ধরেই

রোস্তুমের দোষারোপ করছিল। রোস্তুম যে কাজটি ভালো করে নি এ কথা জগতে কে না বলবে। যার সামান্যতম জগৎ চিন্তা আছে। আছে দয়া-মায়া-মমতায় ভরা একখানি হৃদয়।

যাক এ বাড়ির এমনি অবস্থায় আমি সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না, পেলাম না কোনো সুযোগ মায়ের আশীর্বাদ কুড়ে নেয়ার। জগতে যদি এমনি হতো তাহলে বোধ করি জগৎ বহুদিন আগেই বিলীন হয়ে যেত। আসল-নকলের কোনো তফাৎ থাকত না। থাকত না কোনো সম্পর্কের চিহ্ন। রক্ত যেখানে নেই হৃদয় থাকলেও সেখানে সন্দেহের উদ্বেক হয়। এই চিরন্তন সত্যটিই সেদিন একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলাম। আর ভাবছিলাম, এই বাড়িতে তো কিছু পারলাম না। দেখি না সুমিদের বাড়ি যাইয়া কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সেখানে গিয়ে দেখি আরও বেশি কান্নার রোল পড়েছে, কারণ তারা রোস্তুমের বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত ছিল, তারা সচক্ষে দেখছিল তার প্রতি মানুষের তথা মুখোশধারী সমাজপতিদের নির্যাতন, দেখছিল কোনো অবস্থায়ই যখন রোস্তুমকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তারা বসে পড়ল আর কি করা যায়। সুমি, সুমির মা, বাবা, ভাই কামাল সকলেই সমানভাবে চেষ্টা করেছে। কিছুতেই কিছুই হয় না। কিছুতেই রোস্তুম তার কর্তব্য হতে ফিরবে না। যদি জীবনটাও চলে যায় যাক।

সুমি রোস্তুমের কাছে গিয়ে শত চেষ্টা করেও যখন বিফল হয়েছে তখন অশ্রু ফেলে চলে এসেছে আর কি। রোস্তুমের একই কথা, যত দিন আমার আরাধ্য সম্পদটি না পাব তত দিন সুমি, মা, ভাই-বোন কেউ আমার নও। সকলেই আমার বহু দূরের বহু জনমের অচেনা মানুষ। সুমি যদি আমায় ভালোবাস, আমার ভালো চাও তাহলে আমায় একা থাকতে দাও। আমাকে কাজ করতে দাও। অন্যায়ের বিরুদ্ধে

লড়বার সুযোগ দাও। সুমি তোমাকে আমি ভালোবাসি। এ কথা ধ্রুব সত্য, তাও মিথ্যা হয়ে যাবে তখনই যখন আমার কর্তব্যস্থলন হবে।

এত বড় কথায় সেদিন সুমি আর স্থির থাকতে পারেনি। সুমি বলে, আচ্ছা যা ভালো তাই করো। যা তোমার মঙ্গল তা-ই চাই, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আমি চলি, বলে অশ্রু মুছতে মুছতে বিদায় নিল।

আজ তাই যখন তাদের বাড়ি গেলাম। অমনি আমাকে দেখে বললেন, আপনার বন্ধুটি কেমন আছে বলতে পারেন?

আমি বললাম, সে তো আপনি ভালো জানেন।

সে বলল, আমি জানি না, আমাকে এ মুহূর্তে তার সাথে জড়াতে নিষেধ করেছে। কারণ তাতে নাকি আমাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভাই আমাদের ক্ষতির কথা ভাবি না। আপনার যে বন্ধুটি এতদিন সহাস্য বদনে কথা বলত আজ তা নেই। আজ সে রুদ্র, পাথর, নিষ্ঠুর, অন্যায়ের গলাচিপে ধরে, হত্যাকারী ডাকু। তার ভয়ে কম্পমান মানুষ। আত্ননাদ করে ছুটে পালায়। আচ্ছা ভাই, আপনি কি বলতে পারেন, আপনার বন্ধুর মা কোথায় আছেন? আমি তার সাথে দেখা করব। দেখি তাকে এ পথ থেকে রক্ষা করা যায় কি-না।

আমি কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। অনেক ভেবেচিন্তে কিছুই উত্তর বের করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম, এ মুহূর্তে যা করা যায় তা হলো তাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত যেন না হয়, সে বিষয়ে প্রাণাধিক সাহায্য করা।

বললাম, দেখো যেতে চাও যাও তার মায়ের কাছে। আমি সেখানে থেকেই আসছি কিন্তু তোমরা সবাই মিলে এমনি কিছু করো না যাতে তোমাদের বিশেষ করে তার ক্ষতি হয়। ধরো তুমি তার মায়ের কাছে গেলে, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বলে তার অবস্থান জানালে আর সঙ্গে

সঙ্গে তিনি উত্তেজিত হয়ে তোমাকে সঙ্গে করে বড় লোক ভাইটিকে নিয়ে আসল তার কাছে আর সাথে সাথে সমাজপতি তথা প্রশাসন তার আত্মীয়স্বজনের নামধাম জেনে নিল আর সেই সঙ্গে তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের ছেলেকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রেফতার হবে- হাজতে যাবে। রোস্তুম খবর শুনে হয়তো মুখ ফিরে থাকবে না। সিংহের মতো হুংকার দিয়ে গর্জে উঠবে আর সাথে সাথে প্রশাসন এমন ফন্দি আঁটবে যে, হয় রোস্তুমকে এ কাজ হতে সরে দাঁড়াতে হবে নচেৎ তাদের মানে মা, বোন, মামা সবাইকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। এমনি অবস্থায় রোস্তুমের আজীবনের সাধনা পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই অতি সাবধান, তাকে বাঁচার নাম করে মারার চেষ্টা করো না, তোমরা নারী জাতি সামনে দেখো, পিছনে দেখো না। এ মুহূর্তে যা করার খুব ভেবেচিন্তে করতে হবে। আর এ ব্যাপারে তোমার মা, মামা, ভাই, সবাইকে বলবে খুব সাবধানে চলতে যাতে প্রশাসন না বুঝে যে তোমরা তার মঙ্গলাকাজক্ষী।

সেদিনকার মতো আমি সে বাড়ি থেকে প্রস্থান করলাম। রোস্তুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তার গোপন লাইব্রেরির দিকে। দেখলাম সেখানে রোস্তুম নেই। তবে ঘরের বইপত্রের সবই এলোমেলো, এমনকি ইতিপূর্বে এ ঘরে যে ধরাধরি হয়েছে তাও বুঝা গেল স্পষ্ট। জিনিসপত্র সব উল্টাপাল্টা। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চিন্তা করতে লাগলাম কি করা যায়। ভেবেচিন্তে কিছুই পেলাম না।

বের হয়ে অনেক দূর গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা শুরু করলাম, রোস্তুম সম্পর্কে তার পরিচয় দিয়ে। তারা বললে, পুলিশ তাকে ধরতে এসেছিল সদলবলে, ধরতে পারেনি। অনেক ধস্তাধস্তির পর পুলিশ গুটি কতক হত্যা করে পালিয়েছে। এখন গ্রামবাসী অস্থির। পুলিশের কড়া

পাহারায় আছে গ্রামখানি। আমি মনে মনে যা ভাবছিলাম তাই হলো। এখন কোথা পাই তাকে। পুলিশের সাথে মল্লযুদ্ধ চালানো এসব তো নতুন কিছু নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে বহুব্যবসায়ী এইরকম কেসে পড়ে তাকে এই রকমই করতে হয়েছে। কিন্তু তাকে কোথা পাই আমি। এ দিকে মনের মধ্যে চাকরির তাড়া। মনকে বললাম, রাখ তোর চাকরি গর্দভ কোথাকার!

এদিকে চরে বিরাট হলুদ পড়ে গেছে। বিরাট পুলিশ বাহিনী গ্রামে এসে যাকে ইচ্ছা ধরছে, মারছে, জেল হাজতে পাঠাচ্ছে। আর পুলিশ বাহিনীর সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছে চেয়ারম্যান জাফর চাকলাদার। চরের ভিতর চলছে অকথ্য নির্যাতন। নারী-পুরুষ-শিশু কেউই রেহাই পাচ্ছে না। রোস্তুমের জিদ চেয়ারম্যান মজাচ্ছে পুলিশ দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর। কিন্তু চরবাসীও নীরব রইল না। একদিকে তারা যেমন তাদের প্রাণের বন্ধুটি হারাল অপর দিকে কেন তাদের উপর এই অকথ্য নির্যাতন? কি অন্যায় তারা করেছে? কিসের জন্য তারা চেয়ারম্যানের কারসাজির শিকার হবে- একটা সহজ-সরল লোক যে মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। যে তার জীবনের বিনিময়ে অন্যের সামান্য উপকার করতে পারলে ধন্য মনে করে। হাজার হাজার নর-নারী, যার সৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। যুবকদের জ্ঞানের জন্য যে জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত করেছে- সেই শিক্ষিত নিরপরাধ একটি ছেলের প্রতি এই চেয়ারম্যানই কারসাজি করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বীজ রোপণ করেছে তার সঙ্গে উঠতে না পেরে পুলিশের আশ্রয় নিচ্ছে আর পুলিশ শান্তি-শৃঙ্খলার নামে আমাদের উপর চালাচ্ছে নির্যাতন-অত্যাচার নির্বিচারে। সমস্ত চরবাসী স্লোগান তুলল, আমরা চাই না চেয়ারম্যান জাফর- উৎখাত কর অত্যাচারের শাসন, আগুন জ্বালাও চেয়ারম্যান বাড়ি, গরিবের শত্রু, গম চোর ইত্যাদি স্লোগান তুলে গ্রাম মুখরিত করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান তার দলবলসহ পুলিশ বাহিনী আতঙ্ক হয়ে উঠল। শৃঙ্খলার নামে বেদম

প্রহার চলল। গ্রামবাসীরাও বসে রইল না, যে যা পারে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করল। দু'পক্ষীয় চার জন নিহত, পঞ্চাশ-ষাট জন আহত। চেয়ারম্যান বাহিনী বিরাট জনারণ্যের নিকট পরাজিত হলো।

পরদিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসন ব্যাপারটি তদন্ত করতে আসে। সমগ্র চরবাসী একত্রে হয়ে মাঠে সমাবেশ করল। ইতিমধ্যে রোস্তুম কোথা থেকে খবর পেয়ে স্বৈরচেয়ারম্যানকে কবর দিতে আসল। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মানুষ হর্ষধ্বনি তুলে স্লোগান তুলতে লাগল, রোস্তুম ভাই রোস্তুম ভাই জিন্দাবাদ, চেয়ারম্যান আমরা কাকে চাই, রোস্তুম ভাই রোস্তুম ভাই; অত্যাচারী উৎখাত করো, গম চোরদের উৎখাত করো ...।

অতঃপর তাদের সালাম গ্রহণ করে রোস্তুম উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বি ভাই ও বন্ধুগণ, আপনারা এই চরের অধিবাসী। আপনাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একচ্ছত্র স্বৈরশাসন কায়েম করেছে ঐ গণবিরোধী, গণপ্রতিনিধি নামধারী মুখোশ পরা ক্ষমতাসীনরা। তারা দেখতে পায় না আপনাদের সাহায্যের জন্য, উন্নতির জন্য দেয়া সরকারি সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছে, গ্রামের লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে না, মানুষের উপর অত্যাচার, অবিচার চরমে পৌঁছে। যার নজির গতকালকের ঘটনা। তারা কি অপরাধ করেছিল যে নির্বিচারে তাদের উপর স্টিমরোলার চালানো হচ্ছে। এতে মদদত যোগাচ্ছে পুলিশ বাহিনী। তারা সবে মিলে আপনাদের প্রতি যে নির্যাতন শুরু করেছে কোনো অধিকার নেই তাতে। অন্যায়ভাবে গতকাল দু'জন নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এরা কি অপরাধ করেছিল? অনেক আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছে। এরা কি অপরাধ করেছিল? চেয়ারম্যানকে বলি, যদি আক্রোশ থাকে আমার প্রতি, আমার উপর চালাও, দেখি কে কতক্ষণ পারে কিন্তু এই নিরীহ-

অত্যাচারিত জনগণের উপর আর অত্যাচার চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার এই অপপ্রয়াস কেন? কিছু করতে না পারলেও লাউচারা কাটবা? এটাই ভীরা কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের মূলমন্ত্র। আমি বলি, আপনার এই অপপ্রয়াসের সাধ মিটে যাবে যা ভাবছেন তা হবে না। অত্যাচারীর দিন ঘনিয়ে এসেছে, মানুষ বুঝতে শিখেছে তাদের অধিকার আর সেই অধিকার রক্ষায় তারাও আজ বদ্ধ পরিকর। যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এ দেশের মাটিতে অত্যাচারের শোষণ আর নিপীড়নের রাজদণ্ড কায়েম করেছিল তাদেরও উৎখাত করেছে, অর্জন করেছে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার সুফল অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নতি তথা সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে বিশ্ববাসীর নিকট একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাঁচার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। আবারও যদি এ দেশের মাটিতে স্বৈরাচারী দুঃশাসন কায়েম হতে চায় তাদেরও কঠোর হস্তে দমন করা হবে। বন্ধুগণ, আমার সংগ্রামী সালাম গ্রহণ করুন, বলে তার ভাষণ শেষ করতেই সকলেই সমবেতভাবে বলতে লাগল, রোস্তুম ভাই জিন্দাবাদ, মোদের চেয়ারম্যান কে রোস্তুম ভাই, অত্যাচারী উৎখাত করো, রোস্তুম ভাই জিন্দাবাদ।

এরপর বিরাট জনারণ্যের মিছিল নিয়ে উপজেলাতে রোস্তুম ভাই উপজেলায় চলে যায় এবং উপজেলার চেয়ারম্যানের কাছে সকল ঘটনার কৈফিয়ত তলব করে। উপস্থিত জনগণ সেখানে জননেতা হিসাবে রোস্তুম ভাইকে ঘোষণা করে এবং জনগণের চাপে উপজেলার চেয়ারম্যান তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। উপস্থিত মানুষ অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে রোস্তুম ভাইকে পাইয়া হর্ষধ্বনি করতে লাগল। রোস্তুম ভাই জিন্দাবাদ, নেতা কে রোস্তুম ভাই।

তাকে কাঁধে করে মানুষ চরে পৌঁছল। রোস্তুমের এই সাফল্যের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি দৌড়ি তার কাছে গেলাম। দেখেই সে হাসতে হাসতে বলল, কি রে ছদ্ম।

আমি বললাম, হ্যাঁ। বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার কি যে আনন্দ লাগছে, বলতে পারছি না। মনে মনে শতবার তাকে সালাম দিচ্ছিলাম আর বলছিলাম ডেকে, রোস্তম তোমার মা, বোন, মামা, সুমন আর তোমার সুমিকে খবরটা দিয়ে আসি গে, বলে কেটে পড়লাম।

সুমনদের বাড়ি এসে প্রথমে মাকে সংবাদ দিলাম আর আনুপূর্বিক সব বললাম। তিনি প্রথমত তথমত খেয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, চল এখনি চল। কই কমলা, সুমন, আসো আসো রোস্তমকে পেয়েছি। ভাইজান ও ভাইজান আমার রোস্তমকে পেয়েছি, পাগলের মতো বলতে লাগলেন। তাহের খান তাড়াতাড়ি ত্রিতল থেকে নামতে নামতে এক জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন আর ভাগ্নের সুসংবাদে আনন্দের আতিশয্যে সোহাগীকে ঝাঁকাতে লাগলেন আর বলতে লালেন, চল চল, কই রোস্তম, এখনই তাকে দেখিতে যাইব।

সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই খৈতর নদীর তীরে প্রায় ক্রোশ দু'ক্রোশব্যাপী উল্লাপুর গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম। পথে যেতে যেতে মনে পড়ল সুমিদের কথা। ভাবলাম মা পৌঁছার আগেই আমি সুমিকে নিয়ে কোনাকুনি রাস্তা ধরিয়া রোস্তম ভাইয়ের পাঠাগার অবধি পৌঁছে যাব। তাই বললাম, কাকিমা আমার একটু পরে আসতে হবে, দরকার আছে টাঙ্গাইলে। আপনারা বরং যান আমি হয়তো আপনাদের আগেই পৌঁছতে পারি।

মা বললেন, এ কি কোথা যাবে?

আমি বললাম, হেথায়, বলে আর অপেক্ষা না করে রাস্তা কেটে ফেললাম। অন্য রাস্তা ধরলাম।

ওদিকে সুমিদের বাড়ি এসে খবর দিতেই সুমি আনন্দে যে কি করিবে বুঝে উঠতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে মা, বাবা, ভাই এবং ছোট বোন লতাকে খবরটা পরিবেশন করল। সবাই যেন একটা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছ এমনই বোধ হইল। স্থির হলো রোস্তমকে দেখতে উল্লাপুর গ্রামে যাবে। সবাইকে নিয়া পথ চলতে লাগলাম।

উল্লাপুর গ্রামে পৌঁছে গোপন বনের পার্শ্বে অবস্থিত ছোট লাইব্রেরির চতুর্পাশ্বে দেখিলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মায়ের পায়ে রোস্তম মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে, মাথা তুলছে না। শত চেষ্টা করেও খান সাহেব বুঝাতে পারছে না। রোস্তম ডোকরাইয়া কাঁদছে আর মাকে বলছে, মা এত দিন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি- কর্তব্যের জন্য, আমাকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও।

মা তাকে তুলে জড়িয়ে ধরছে আর বলছে, রোস্তম আমার, সোনামণি আমার, বলে কাঁদতে কাঁদতে সাড়া হচ্ছে।

এদিকে সবার একটা ক্রন্দন রোল, সুমন, কমলা, তাহের খান, সুমি তার বাবা, মা, ভাই যেন শোকে মুহ্যমান সবাই যেন একটি হারানো ধন খুঁজে পেল। যেন কোনো অকূল সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল যে মানিক তাকে পাওয়া গেছে, তার দৃশ্য কী করুণ হৃদয়বিদারক।

প্রায় ঘন্টা পরে সবাই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। মা ছেলেকে বুকে নিয়ে গেলেন তার বাসভূমে অর্থাৎ ছোট একটা কুটিরে বসলেন, বসালেন। ওদিকে তাহের খান, কমলা, সুমি, সুমন সবাই উঠে দাঁড়াল ঐ কুটিরেই। সবাই নির্বাক-নিস্তব্ধ। এই মুহূর্তে আমিই নীরবতা ভাঙলাম। বললাম, পরিচয়টা হয়ে যাক। উনি রোস্তমের মা সোহাগী, উনি রোস্তমের মামা তাহের খান, বোন কমলা, মামাতো ভাই সুমন। ওপক্ষে বললাম, উনি বান্ধবী সুমি, বন্ধু কামাল, মা, বাবা।

মা'র কোল থেকে মাথা তুলে ততক্ষণে রোসো সম্বিং ফিরে পেয়েছে। সুমিকে দেখামাত্র অস্ফুটস্বরে বলে উঠল সুমি-তৎক্ষণাৎ সুমি বাঁধভাঙা নদীর মতো ভেঙে গেল, নদীর স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। রোস্তমের কাছে আসার উদ্যোগ করতেই বুদ্ধিমতী মাতা সুমিকে কোলে নিয়ে গেল। মা'র বুকে সুমু কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বলে উঠলাম, এবার মিষ্টির পালা।

রোস্তম সোজা দাঁড়িয়ে নম্র কণ্ঠে বলল, মা এই তোমার পুত্রবধূ সুমি, বলে সে ও সুমি তৎক্ষণাৎ মাকে সালাম ঠুকে এসে দাঁড়াল। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মামা, সুমীর মা, বাবা সবাইকে সালাম করল। মা আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, বাসর তাহলে পাঠাগারেই হোক। সবাই উচ্চহাস্যে ঘরখানা মুখরিত করে তুলল।

টিকরপুর, ঢাকা ২/৬/১৯৮৬

সমাপ্ত

(২নং উপন্যাস ১৪/৪/১১বাং-১/১/১৪১৮, বাহরাখান পাড়া)

ঘোটকের জবান

চোর মারা এবং চোর ধরার কথা শুনিলে ছানার উৎসুকের সীমা থাকে না। একদিন সেই সুযোগ আসিয়া গেল। ছানাদের এক প্রতিবেশীর জমি হইতে পাশ্ববর্তী নগর কান্দা গ্রামের শূইন্যা চোরা রাতের আঁধারে কয়েক বোঝা ধান কাটিয়া চুরি করিয়া নিয়া গেল। এই এলাকায় কোন চুরি ছোঁচরামি হইলে শূইন্যা চোরাকেই সন্দেহ করা হয়। ছানাদের প্রতিবেশীর জমি হইতে ধান চুরি হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু এই ধান কে বা কাহারো চুরি করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। সন্দেহবশতঃ থানায় শূইন্যার নামে কেইস ফাইল করা হইল। একদিন সকালে বাঁকড়া মাথার স্বাস্থ্যবান, বড় বড় চোখের, গোঁফধারী দারোগা দুই পুলিশসহ হানা দিয়া শূইন্যাকে ধরিয়া ফেলিল। পিঠমোড়া বাঁধিয়া ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া বন্দুকের গোড়া দিয়া গুতাইয়া গুতাইয়া ছানাদের বাড়ীর সামনে আনিল।

চোখের পলকে গোটা পঞ্চাশেক ছেলে, বুড়ো এবং যুবক চোর দেখিবার জন্য জমিয়া গেল। আশপাশের বাড়ীর মেয়েলোকেরা দেউড়ীর ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। ছানা খবর পাইয়াছিল একটু দেৱীতে। সে তাহার মায়ের হুকুম তামিল করিতে গিয়া বাড়ীর সামনেই ‘বিছরার’ বেগুনক্ষেতে ঢুকিয়াছিল বেগুন তুলিবে বলিয়া। তাহার সাথে ছিল তাহারই চাচাত বোন আঙ্গুরা। আঙ্গুরা ‘টোনা’ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে আর ছানা নুইয়া নুইয়া বেগুন তুলিয়া টিল মারিয়া আঙ্গুরার উদ্দেশ্যে ফেলিতেছে। বেগুন গাছ শুঁঙ এবং কাঁটায় ভরা। তাই আঁকিয়া বাঁকিয়া শরীর বাঁচাইয়া বেগুন গাছ হইতে বেগুন উৎপাটনের কাজটি সতর্কভাবে সম্পাদন করিতেছে সে। বাড়ীর সামনে অনেক মানুষ এবং পুলিশ দেখিয়া ছানার চাচাত বোন আঙ্গুরা চিৎকার দিয়া উঠিল। আঙ্গুরা বলিল, ‘ভাইয়া, পুলিশ’। ছানার

কর্ণকুহরে শব্দাবলী পৌছানোর সাথে সাথে দুই তিন লাফে ক্ষেতের ভিতর হইতে ছানা ছুটিয়া আসিল এবং আগুরার নিকটবর্তী হইয়া হস্তদন্ত হইয়া আগুরাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, ‘কই’। আগুরা এক হাতে তাহার ‘টোনা’ সামলাইয়া অন্য হাত উঁচু করিয়া শাহাদাৎ অঙ্গুলি বাঁকা করিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিয়া বলিল, ‘এ-এই দেহ’। দুই জনেই খিঁচে এক দৌড়ে ঘটনাঙ্কলে গিয়া পৌছিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। ছানা লোকজনের জটলার ফাঁক গলাইয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া গালের ভিতরে ঢুকিয়া পুলিশ কর্তৃক চোর মারার দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আগুরা আর ভিতরে ঢুকিতে পারিল না। বাধা হইয়া দাঁড়াইল তাহার ‘টোনা’। কাজেই তাহার ‘টোনা’র বেগুন তাহার চাটীর নিকট রাখিবার জন্য ছানাদের ‘ইশা’য় গেল। ছানা চোরের মার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। শূইন্যাকে বড় দারোগা উল্টাপাল্টা করিয়া লাথি মারিতেছে, চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া টানিয়া হাতে পায়ের গিরায় গিরায় বেতের লাঠি দিয়া পিটাইতেছে। শূইন্যার শরীরের জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া গিয়াছে। অবিরল ধারায় রক্ত ঝরিতেছে। শূইন্যা পানি, পানি বলিয়া চিৎকার করিতেছে কিন্তু লোকজন তাহা ভ্রক্ষেপ করিতেছে না। বরং তৃপ্তিসহকারে পুলিশের মার দেওয়া দেখিতেছে। ছানার দৃষ্টি গিয়া পড়িল শূইন্যার কথায়, সে দ্রুত দৌড়াইয়া গেল কুয়াপাড়ে। দুই বালতি পানি তুলিয়া বদনা ভরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পানি লইয়া আসিল এবং যথারীতি মার খাওয়া চোরের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বদনার পানি দেখিয়া চোর চোখ তুলিয়া চাহিল। চোর তাহার হাত বাড়াইতে পারিতেছিল না। তাই ছানা বদনার নালা দিয়া পানি শূইন্যার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল। ঢোক, ঢোক করিয়া শূইন্যা সমস্ত পানি খাইয়া ফেলিল। ছানার এইরূপ কান্ড দেখিয়া সকলেই হতবাক। দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুনের মধ্যে হঠাৎ পানি ঢালিয়া দিলে যেমন আগুন নিভিয়া যায় তেমনি প্রচন্ড উত্তম মধ্যম দেওয়ার সময় হঠাৎ মুখে পানি ঢালিয়া দেওয়ার ঘটনায় স্তম্ভিত দারোগার হাত যেন অবশ হইয়া আসিল। চোরকে মারিতে মারিতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দারোগা সাহেব বিশ্রাম

নেওয়ার জন্য চেয়ার টানিয়া গাছের ছায়ায় বসিলেন। উপস্থিত লোকজনের কেহ কেহ থিক্কার দিয়া ছানাকে উপহাস করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাদের মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইল না। বিশ্রাম শেষে দারোগা সাহেব শূইন্যা চোরাকে রিক্সায় তুলিয়া পাদানীতে বসাইয়া কস্টেবল দুই জনকে রিক্সার সীটে বসিতে বলিয়া নিজে অন্য একটা রিক্সায় বসিয়া মেঠোপথে ধীরে ধীরে থানার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ছানার মনে নানা প্রশ্ন উদ্ভূত হইতে লাগিল। সে তাহার বাবাকে ইত্যাকার নানা প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল। ছানার বাবা একজন ঘোড়াওয়ালা। ঘোড়া দিয়া বোঝা বহাইয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তাহারা চার ভাই একবোন। এক চাচা মনিপুর ময়াল হইতে কাঁচামাল কিনিয়া স্থানীয় মফস্বল শহরে বিক্রি করে দিনাতিপাত করেন। ছানার কামরান চাচা নিজ এলাকা হইতে আস্থা উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছেন দিনাজপুরে। তিনি সীমান্ত এলাকায় নূন্যতম দামে জমি কিনিয়া গৃহস্থী করিয়া কোন রকম কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিয়া যাইতেছেন। তাহার একছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে ছোবান বয়স পনের বছর। মেয়ে আঙ্গুরা বয়স আট বৎসর। তাহারা বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে বেড়াইতে আসিয়াছে। মাস কয়েক থাকা হইবে। অন্য চাচা ‘মিঞার বাপ’ অন্যের জমি বর্গা করিয়া ভালই চলিতেছেন। তিনি অপুত্রক। তাহার কোন সন্তানাদি নাই। ছানার এক ফুফু আছে। তাহার ফুফু বাড়ী পার্শ্ববর্তী নলছিটা গ্রামে। ছানাদের বাড়ীভিটা কিয়ৎ পরিমানে থাকিলেও মাঠে ধানী বা ফসলী জমি একেবারে নাই বলিলেই চলে। ছানার বাবা আসকার ঘোড়াওয়ালা গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগী। ঘোড়ায় মালামাল টানিয়া কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে তাহার পেটের ব্যথা ইদানিং আরও বাড়িয়াছে। ছানার বয়স দশ বৎসর। সে স্থানীয় পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। এইটুকু ছেলে আর কিইবা করিবে তবু সকালে বিকালে ঘোড়াকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ঘাস কাটিয়া আনে। একদিন এক পতিত জমিতে ঘোড়া চড়াইয়া বাপবেটা

বসে আছে অদূরে ঘাসের উপর। এমন সময় ঘোড়ায় দুই কামড় ফসলী-চাড়া খাইয়া ফেলিল এক জমিওয়ালার। দ্রুত ছুটিয়া গিয়া ছানা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াকে টানিয়া আনিল। কিছুক্ষণ পর ক্ষেতওয়ালা আসিয়া তাহার ফসলী-চাড়া খাওয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিল ছানাকে ‘আমার ক্ষেত কে খাওয়াইয়াছে পশু দিয়া, তাহা কি তুমি জান?’ ছানার বাবা আসকর পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল যাহাতে মিথ্যা জবাব দিতে না হয়। কিন্তু ছানা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে বলিল যে, তাহাদের ঘোড়াই দুই কামড় ফসলী-চাড়া খাইয়াছে। ছানার এই সত্য উচ্চারণে ক্ষেতওয়ালা যাহার পর নাই খুশি হইল। ছানার একটা স্বভাব হইল এই যে, সে কিছু জীবজন্তু পোষে। জীবজন্তুর মধ্যে কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, শালিকপাখি। এই সকল প্রাণীর জন্য নিজ খাবার হইতে কিয়দংশ রাখিয়া বাকী খাবার নিজে খায়। আবার কখনও তাহার মায়ের বা বাপের খাবার কম দেখিলে, একেবারেই না খাইয়া সময় কাটাইয়া দেয়। একদিন এই রকম একটি ঘটনা ঘটিল। যে পরিমান ভাত হাড়িতে আছে তাহাতে ছানা ও তাহার মা-বাপের ভাত হইবে না। ফলে ছানার মা ভাত খাইবে না বলিয়া স্বামী-ছেলের পাতে সবটুকু ভাত ভাগ করিয়া দিল। ছানার কেমন জানি সন্দেহ হইল তাহার মায়ের দিকে। ছানা কিছু না বলিয়া তাহার খাবার হইতে মুটি মুটি তুলিয়া তাহার পালিত কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর ও শালিককে খাওয়াইল। এই সব প্রাণীদের খাবার দেওয়া শেষে যখন ঘরে ফিরিতেছিল তখন তাহার মায়ের কথা শুনিতে পাইল, তাহার মা জায়নামাঝে নামাজ আদায় পূর্বক দোয়া করে, তাহার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, ‘হে সর্বশক্তিমান পরমদয়ালু আমার মালিক, এইবেলা আমার স্বামী-বেটাকে খাওয়াছি। আমার আপত্তি নাই, যে আমি কিছুই খাই নাই। রাতেও আমি খাইব না যদি ভাগ্যে না থাকে তবু আমার স্বামী-ছেলের খাবার জুটাইয়া দিও।’ ছানা তাহার মায়ের আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। মোনাজাতে মায়ের কথা শুনিয়া ছানা বুদ্ধি আঁটিতে লাগিল কিভাবে অবশিষ্ট তাহার খাবার ভাত তাহার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাকে

খাওয়ানো যায়। নামাজ শেষে ছানা তাহার মাকে বুঝাইয়া বলিল, ‘মায়া, দোয়ার মধ্যে তুমি কি কইলা তুমি ত খাইছনা’। ছানার কথা শুনিয়া ছানার মা আঁতকিয়া উঠিল। ছানার মা রোকসানা বলিল, ‘বাবা আমাদের গরীবের সংসার খাইয়া না খাইয়া আমার চলিতে অইব’। এই কথা শুনিয়া ছানা ঘোঁ ধরিল এই বলিয়া যে, তাহার মাকে না খাওয়াইয়া সে ছাড়িবে না। সে ভাতের নলা বানাইয়া তুলিয়া তুলিয়া তাহার মাকে অবশিষ্ট সমস্ত ভাত খাওয়াইয়া ফেলিল। ক্ষুধার্ত ছানা এক গেলাস পানি ঢোক ঢোক করিয়া খাইয়া ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

ছানা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ছেনি-খাচা হাতে লইয়া সোজা চলিয়া গেল মাঠে। সেখানে গিয়া যাহা দেখিল তাহা অবর্ণনীয়। গ্রামের আবুল হোসেন আর তোরাবালীর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। আবুল হোসেনের চিরাচরিত অভ্যাস তাহার কোদাল লইয়া সে নির্মমভাবে অন্যের জমিনের আঁইল কাটিয়া দেয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করিবার মত। তাহা হইল এই যে, জমির আঁইল ছাঁটিয়া কাটিয়া নিজের করিয়া নেওয়ার তাহার কুখ্যাতি বহুদিনের পুরনো। গ্রামের মানুষ তাহাকে আঁইল কাটা আবুল্যা বলে। ইহাতে তাহার শরম লজ্জা হয় না। এক দিকে সে ‘ধুন্ধা’ অন্য দিকে পরস্পরহরণ করার ক্ষেত্রে তাহার জুড়ি নাই। তাহার সাথে তোরাবালির ঝগড়াও বহুদিনের পুরনো। জমির আঁইল নিয়া প্রত্যেক সিজনে ফসল বোনার সময় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া সংঘটিত হয়। উভয়ের মধ্যে ঝগড়া যখন তুঙ্গে, তখন ছানা গিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। হঠাৎ ছানা চিৎকার দিয়া উঠিল, “এই হাঁপ দেহা যায় লাইলের গাতায় মনে অয় জাত হাঁপ।” মুহূর্তেই ঝগড়ায় লিপ্ত তোরাবালী এবং আবুল্যার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল কথিত সাপের গর্তের দিকে। গর্তে আদৌ সাপ কি ব্যাঙ ছিল তাহা বড় নয়, বড় হইতেছে তোরাবালীকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিরাপদ দূরত্বে নিয়া সে যাত্রায় আবুল্যার উত্তিত কোদাল হইতে ছানা রক্ষা করিল।

ছানা তাহার ছেনি খাচা নিয়া তাহাদের বাড়ীর অদূরে মাঠে ঘাস- তুলিতেছিল। এমন সময় তাহার চোখে পড়িল জটামাথা প্রায় অর্ধনগ্ন সুদীর্ঘ শৃঙ্খমন্ডিত এক লোক বসা আছে। কৌতুহলী ছানা ধীরে ধীরে লোকটির কাছে গিয়া লোকটিকে প্রাণভরে দেখিতে লাগিল। লোকটি চক্ষু বুঁজিয়া আছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর দেখা গেল লোকটি তাহার চক্ষু খুলিয়াছে। লোকটির ঠোটদ্বয়ের নড়াচড়া দেখা গেল না। কিন্তু ছানা তাহার কানে শুনিল অদ্ভুত রহস্যময় “আমার প্রাণেশ্বর প্রাণের আরশে আছেন, আর সব ঝুট হ্যায়” লোকটি ছানার দিকে মায়াবী দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চাহিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ছানার সমস্ত শরীর কার্যকরণের আকস্মিকতায় ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল, এমন ঘটনা তাহার জীবনে আর ঘটে নাই। সে ধীরে ধীরে ছেনি-খাচা লইয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল। সে তাহার ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ছানা তাহার ঘুমঘোরে অবচেতন মনে লোকটিকে দেখিতে পাইল। আকাশের তারকার মত উজ্জ্বল হইয়া বাতাসে তিনি উড়িতেছেন আর ছানাকে তিনি বসাইয়াছেন তাঁহার পবিত্র ঘাড়ে। তিনি ছানাকে বুঝাইতেছেন যে, “বুকের মধ্যে স্রষ্টা রহিয়াছেন তাঁহাকে জানো এবং তুমি তোমাকে নিজেকে জানো, তোমার গুণের বিকাশ করো।” তাঁহার স্পর্শে ছানার সমস্ত শরীর শীতল হইয়া গিয়াছে এবং পুলকিত বোধ করিতেছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখে দেখিল তাঁহার মা, তাহাকে খাবার গ্রহণ করার জন্য ডাকিতেছেন। সে তাহার আজিকার ঘটনা কাহাকেও বলিল না, মনে মনে রাখিল।

গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ঝগড়া বিবাদ, জুয়াড়ীদের জুয়ার আসর, গাঞ্জা সেবনকারীদের আসর এবং মেয়ে লোকদের বেলাল্লাপনা ইত্যাদি সমস্ত কর্মকাণ্ডের সুযোগ দানকারী রহিম শেখের বাড়ীর উঠোন দিয়া সে আর কখনও যাইত না। ইহা সকলের চোখে পড়িল। গ্রামের খুন সন্তাস তাহাকে আরও স্পর্শকাতর করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে হইয়াছে ভালোর আবরণে মন্দ কার্য চলিতেছে অবাধে আর মন্দ তো দেখিয়া

শুনিয়েই মন্দ। ইহার ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। ছানার ভাবনা জগতে তোলপাড় পড়িয়া গেল। সে ক্রমে ক্রমে লোকটির কথার রহস্য বুঝিতে লাগিল।

ছানার মনে পড়িতে লাগিল কিছুদিন আগে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গেল শ্রীরামদী গ্রামের রাস্তার উপরে তাহা বর্ণনাতে। একটি জলজ্যান্ত লাশ বর্শাবিন্দ অবস্থায় সে দেখিয়াছিল। উহা তাহার মনে রেখাপাত করিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে দেখিতে পাইল একটি লোকের ভুরি বাহির হইয়া গিয়াছে, বরশির মত বর্শা বাহির করা যাইতেছে না। দাঙ্গার আরও রূপ দেখিয়াছে প্রতিবেশী গ্রামে লাল গিয়াসউদ্দিন জবানী আর মোহাম দ্বিমত হইয়া রাস্তার এই পাড় ঐ পাড় লাঠালাঠি গুরু হইয়াছে। অনায়াসে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাথা ফাটাইয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছানার কতই বা ছিল বয়স। এই বয়সেই অতি কৌতুহলী বিধায় সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়াছে লাশ দেখিবার জন্য। পাকুন্দিয়ার মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করিয়া পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীকে পরাজিত করে। যুদ্ধটা গুরু হইয়াছিল শেষ রাতের দিকে। চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সকাল ৭টায়। তখন দিনের আলো ফুটিয়াছে। দলে দলে পাবলিক রাজাকার ধরিয়া আনিতেছে, পিটাইতেছে, অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতেছে। জবাই করা গরুর মত ঘুংড়াইতেছে। পাকুন্দিয়া স্কুলের উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। ঐ গাছের তলায় কয়েকটা লাশ পড়িয়া আছে। আরও সামনে অগ্রসর হইলে দেখা গেল পাকুন্দিয়া ঈদগাহ মাঠের দক্ষিণ পূর্বকোণায় চৌদ্দ পনেরটি লাশের সারি। একটি লাশের সাথে আর একটি লাশ কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা। কেহ মরিয়াছে। আর কেহ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়িতেছে। আরও অগ্রসর হইয়া থানার সামনে গেল সে। অসংখ্য লাশ এদিক ওদিক ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। রাজাকার শ্রেষ্ঠ মাওলানা হাদিউল ইসলাম এর মাথা ইট দিয়া চেপ্টাইয়া ফেলিয়াছে, মগজ-বাহির হইয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। থানায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পত পত উড়িতেছে। এই যে লাশের ছড়াছড়ি

তবু কাহারো মনে কোন আক্ষেপ নাই। পাক হানাদার রাজাকার আলবদরের পরাজয় দেখিয়া সকলের মনে স্বস্তির ছায়া পড়িয়াছে। লাশগুলি যেন মানুষের নয়, হিংস্র জানোয়ারের লাশ যাহা দেখিয়া উপস্থিত জনতা থুথু নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধাবশেষ দেখিয়া ছানা কখন বাড়ি ফিরিয়াছিল তাহা তাহার মনে নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে দেখিল আগুরার জ্বর আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি করিয়া বালতি লোটা লইয়া পানি আনিয়া আগুরার মাথায় পানি ঢালিতে লাগিল। বাড়ীর ক্ষুদ্র শিশুর অসুখ বিসুখে আপন মা কাছে না থাকিলে আর কেহ তাহা খেয়াল করে না। আগুরার ক্ষেত্রে ও তাহা ঘটয়াছিল। আগুরার মা সংসারের অভাব মোচনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়াছিল যদি কিছু আনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। ছানার পানি ঢালা দেখিয়া আগুরা যাহার পর নাই শান্তি পাইল। আগুরার করুণ মায়াবী চাহনি দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। বিরাট পৃথিবীর মধ্যে দুইটি নাবালক-বালিকার মধ্যে অবচ্ছেদ যে বন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যেন ছিল হইবার নয়। তাহা না হইলে নিক্ষেপ এই আত্মার টান কেন সৃষ্টি হইবে। একজন একটি কলা বা বড়ই খাইলে অন্যজনও তাহার অর্ধেক স্বাদ পায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, গ্রাম্য ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল আগুরার কঠিন জ্বর হইয়াছে। তাহাকে সাবধানে রাখিতে হইবে, মাথায় পট্টি বাঁধিয়া দিতে হইবে, সাণ্ড-বার্লি পথ্য খাওয়াইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ছানা আসিয়া যখন আগুরার মাথায় পানি ঢালিয়া দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। আগুরা যথারীতি বিছানা হইতে উঠিয়া ছানার সাথে চলিয়া গেল এবং দুই জনে মিলিয়া পাকা ডালিম উঠাইয়া খাইতে শুরু করিল। সুস্থ প্রাণের সাথে অসুস্থ প্রাণ মিশিয়া সুস্থ হইয়া গেল। আত্মিক শক্তি রোগ-শোক জয় করিতে পারে তাহার প্রমাণ মিলিয়া গেল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কী আছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছানার কামরান চাচা, দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকায় পাহাড় জঙ্গল কাটিয়া বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে। সেখানে যেমন মশার উৎপাত তেমনি মাঝে মধ্যে বিষাক্ত সাপ ইত্যাদি আসিয়া বাসস্থানে হানা দেয়। বাজার ঘাট চলাফেরায় যাহার পর নাই অসুবিধা তবু ভাগ্যের টানে জীবিকার সন্ধানে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ তাহাকে এইরূপ বিরূপ অবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহার দুইটি মহিষ একটি গাভী, হাস মুরগী ছাগল এবং একর দশেক জমি এই নিয়া চলাফেরা। সকাল হইতে তিনি কাজে লাগিয়া যান আবার সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। এক এক জমিতে এক এক ফসল করেন তিনি। লবণ আর কেরোসিন তৈল ছাড়া আর কিছুই কিনিতে হয় না তাহার। এই দিকে তাহার ছেলে খোকন আর মেয়ে আঙ্গুরা দুর্গম হইলেও একটি স্কুলে পড়ালেখা করিতেছে। তাহারা নিয়মিত যাইতে পারে না স্কুলে। বাজারের দিন হইলে লোকজনের যাতায়ত থাকে তখন ছেলে-মেয়ে একত্রে মানুষের আনা গোনা সম্বল করিয়া স্কুলে গমন করে, তাহাতে অসুবিধা হয় না। গহীন বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া যাতায়ত, কখন কি হইয়া যায় বলা মুশ্কিল। যাক যাহা বলিতেছিলাম, ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ আগুবা ক্য উপলব্ধি করিয়া যথাযথ জ্ঞান আহরণ করিয়া আংগুরা মেট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে এবং দিনাজপুর কলেজে ভর্তি হইয়াছে। এ দিকে ছানাও কম যায় নাই। আঙ্গুরার চেয়ে ছানা চার বৎসরের বড় হইলেও আর্থিক অনটন এবং তাহার বাবার অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে একই বৎসর পরীক্ষা দিয়া চার বৎসর গ্যাপ দিয়া বিজ্ঞান বিভাগ হইতে মেট্রিক পাশ করিয়াছে। একদিন ছানা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে দিনাজপুরে আঙ্গুরাদের বাড়ীতে গেল। দীর্ঘদিন পরে আঙ্গুরাদের বাড়ীতে ছানাকে দেখিয়া আঙ্গুরার মা, বাবা ভাই সকলেই যাহার পর নাই খুশি হইয়া গেল। ছানাকে তাহারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি দেখাইতে লাগিল। একদিন ছানা আঙ্গুরাকে লইয়া প্রোথাম করিল সামনেই গাটো পাহাড় সেখানে যাইবে পাহাড় দেখিবার জন্য।

যথারীতি তাহারা নাস্তা করিয়া কাপড়-চোপড় পড়িয়া রওনা দিল গাঢ়ো পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের যতই নিকটবর্তী হইতেছিল এই যুবক যুবতী ততই যেন প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে প্রেমের স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতেছিল। যৌবনে দুই বিপরীত লিঙ্গের শরীর-ছোঁয়া রহস্যময়, চোখাচোখি-প্রাণে প্রেম উন্মাদনা তৈরী করে, এমন কি এ-কে অপরের গভীর অন্তরঙ্গ করে তুলে। তাহাই হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশের ঝোঁপ ঝাড়ের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় উভয়েই ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় বসিয়া পড়ে। শরমের মাথা খাইয়া আঙ্গুরা ছানার গায়ে হেলান দিয়া চোখ বুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই প্রথম নারীদেহের ছোঁয়ায় ছানার শরীর শিহরিত হইয়া উঠিল। নির্দোষ, নিষ্কাম প্রেমাস্পদের নৈসর্গিক, স্বর্গীয় আকর্ষণ, প্রিয় নারীর চোখ, মুখ, নাক কান, ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস, লম্বা ঘন কালো চুল গোলাপ পাপড়ীর মতন অধর, ঠোঁট, কপোল সোহাগী চিবুক, মোলায়েম দুইটি হাত সোহাগে সোহাগে রমন-মত্তন করিয়া বিলি কাটিয়া উভয়েই মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। নারীর পরম সম্পদ ইজ্জত সুরক্ষিত রাখিয়া, আঙ্গুরা বার বার ছানার দিকে, ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। দুই জনের এই ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবে এই আশা করিয়া ছানাকে আরও কাছে টানিতেছিল আঙ্গুরা। হতবিহবল ছানা যুবতী নারীর এই ভালবাসার ভার বহন করিতে পারিতেছিল না। তবু স্বর্গকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিবার পাত্রও সে নয়। স্বর্গের মর্যাদা সমুন্নত রাখিয়া, স্বর্গকে বুক টানিয়া নিয়া-সে স্বর্গবাসী হইতে চাহিল। নারীদেহ পৃথিবীর স্বর্গ। ইহা উপলব্ধি করিয়া, এইশান্তি বুক লইয়া, ইহার ছোঁয়া ও উষ্ণতা বুক মাখাইয়া সে খালি ভাংগা গলায়, আঙ্গুরার কপোলে কপোল রাখিয়া, চিবুকে চিবুক মিশাইয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠ জড়াইয়া, অধরে নাক লাগাইয়া কানে মুখ বসাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, আমার স্বর্গ আমার ভালবাসা। অনুরূপভাবে আঙ্গুরা ছানার বুক মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া থাকিল, মুখে কিছু কহিতে পরিল না। চোখে ভালবাসার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আঙ্গুরা তাহার প্রাণদেবতার

ভালবাসার ভরসা এবং ছোঁয়া পাইয়া নিখর হইয়া পড়িয়াছিল। অব্যবধারায় আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল। আঙ্গুরা তাহার ওড়না মাথায় দিয়া, নারীসুলভ চপলতায় মুহূর্তে মুখে হাসি ফুটাইয়া প্রাণদেবতার পদধূলি লইয়া ভালবাসার নিদর্শন একটি বনফুলের থোকা কুড়াইয়া ছানার চোখে, চোখ রাখিয়া ছানার হাত যুগল একত্র করিয়া ছানার হাতে অর্পণ করিল। ছানাও তাহার কর্তব্য করিতে ছাড়িল না। আঙ্গুরার মাথার ওড়না জড়াইয়া ধরিয়া হাতের আঙ্গুরী খুলিয়া, ভালবাসার নিদর্শন রূপে, আঙ্গুরার হাতে পরাইয়া দিল। বনফুলের গোছা বানাইয়া আঙ্গুরার খোঁপায় গুঁজিয়া দিল। আকাশ বাতাস পাহাড় এবং সাক্ষী থাকিল যে উহারা এ-কে অপরকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। কিন্তু বাধ সাধিল অন্য জায়গায়। এই যে নারীদেহ, উহা এত কাছে পাইয়াও ছানা কেন তাহাতে কালিমা লেপন করিল না, কেন উন্মত্ত হইয়া গ্রাস করিল না, কোন শক্তি বলে কামের চরম ও পরম আকর্ষণ, সমপরিমাণ বা তাহার চেয়ে বেশি বিকর্ষণে রূপান্তরিত করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নারীর সুটোল সুউচ্চ বুক কামাবেগের মুখ হিসাবে পরিগণিত পাপড়ীসম ওষ্ঠ-অধর, কামের উদ্ভূত মহাসমুদ্রে নিজেকে কেন অবগাহন করাইল না, তাহাতে বিম্মিত না হইয়া পারা যায় না। পৌরুষের এই গর্বিত রূপে প্রকৃতিও বিমুগ্ধ হইয়া গেল! সলাজ নেত্রে পাহাড় আর প্রকৃতি চাহিয়া দেখিল, পৃথিবীতে স্বর্গ এখনও রাখা যায়, যে স্বর্গের জন্য মানুষ ছুটিয়া বেড়ায়, যে স্বর্গকে পাইবে বলিয়া মানুষ ব্রত করে, যে স্বর্গকে স্বপ্নীল মনে হয়, সেই স্বর্গ যে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাল কাজের ভিতর দিয়া প্রতিভাত হয় তাহা কয়জনে টের পায়! না খাওয়াতে স্বর্গ, না পাওয়াতে স্বর্গ, আমানত রক্ষায় স্বর্গ, নারীর ভালবাসাকে জয় করাতে স্বর্গ আর সেই নারীর নিকাম উষ্ম ভালবাসাকে সম্বল করিয়া তাহার সিঁড়ি বাহিয়া ক্রমাগত উর্ধ্বলোকে আরোহণ করা যায়, আপনার মন-আরশে থাকা স্রষ্টাকে হৃদয়ার্থ্য দিয়া, নিজেকে উপস্থাপন করিয়া এক অনাবিল, শান্তি পাওয়া যায়। উহা কয়জনে ভাবে? ষড়রিপুকে দমন করিয়া, সুপ্রবৃত্তিকে বিকশিত করিয়া মানুষ সাধনার

পাহাড় কাটিতে পারে, এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় জিতেন্দ্রীয় হইয়া উঠিতে পারে, মানব সত্তার জয়গান গাহিতে পারে, তাহা আর নাই বা বলা হইল।

ছানা আর আঙ্গুরা সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী ফিরিল। পোলাও কোরমা করিয়া আঙ্গুরার মা তাহার ভাসুর পুত্রকে খাওয়াইল। ছানার চাচাত ভাই ছোবান কিছুক্ষণ আগে শহর হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। ছানার সাথে সেও খাইতে বসিয়াছে। উহারা পিঠাপিঠি। সম্ভবত উহারা একই বৎসর তাহাদের মায়েদের গর্ভে আসিয়াছিল। অবাক হইবার বিষয় এই যে ছানার চাচাত ভাই ছোবান তাহার খাবার বাটি হইতে মুরগীর রোস্ট আর ঝুল ছানাকে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, “এত দিন পরে তোমার মনে হইয়াছে? আমরা কি অবস্থায় আছি তাহার খবর লইলে না।” শুনিয়া ছানার মনে হইল ছোবানের বুদ্ধি গজাইয়াছে। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াইয়া এই ছেলেটিই সংসার আগলে রাখিয়াছে। এক একবার এই পাহাড়ী এলাকায় বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে, ফসল হানি হইয়াছে, স্থানীয় মানুষের রোষের শিকার হইয়াছে, এমন কি নতুন জীবজন্তুর উপদ্রবও সহ্য করিতে হইয়াছে এই বিভূঁই-বিদেশে তবু হাল না ছাড়িয়া তাহারা টিকিয়া আছে বহাল তবিত্তে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাদবর তাহাদের নিয়মে বলিয়াছে এই গ্রামে থাকিতে হইলে তাহাদের আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা তাহাদের খাদ্যাভ্যাস তাহা ছোবানদেরও খাইতে হইবে। স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। বিব্রতকর পরিবেশে নিজেদের বিশ্বাস ও খাদ্যাভ্যাসকে চাপাইয়া রাখিয়া দাবাইয়া রাখিয়া উপরোধে টেকি গিলিয়া ছোবানদের চলিতে হইয়াছে। আজ আর স্থানীয় বিভিন্ন উপজাতীয় গোত্রীয়দের সাথে চলিতে তাহাদের অসুবিধা হয় না। ইহা এখন সহ্য ও লব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগিয়াছে। এখন আর তাহা লাগে না। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মিলিয়া মিশিয়া এক মানুষ আর এক মানুষের সুখ দুঃখ বুঝিয়া শান্ত্বনা দিয়া সুসমাজ গঠনে তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে।

দিন দশেক আঙ্গুরাদের বাড়ীতে বেড়াইয়া ছানা তাহার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। ছানা তাহার নিজের বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিল তাহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাহার পিতা আসকর ঘোড়াওয়ালা মারাত্মক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা গিয়াছেন। ছানা বাড়ীতে আসিয়া নতুন কবর দেখিয়া তাহার বুক হঠাৎ ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ উদিত হইয়া ছিল যে, কোন একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছে তাহার অসুস্থ পিতা মারা গিয়াছে। সে আর কাঁদিতে পারিতেছে না। অধিক শোকে সে পাথর হইয়া গিয়াছে। সাত দিন দিন যাবৎ তাহার মা কথা বলিতে পারিতেছেন। শোকে ছানাদের পরিবার মুহ্যবান। এখন ছানার কি হইবে তাহা আর ভাবিতে পারে না চতুর্দিকে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আন্তে আন্তে শোক কাটাইয়া উঠিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল ছানা। এই বাজার হইতে মালামাল লইয়া ঐ বাজারে যায়। আবার ঐ বাজার হইতে ঘোড়ার ‘বাইশ’ লইয়া ঐ বাজারে আসে। ইহাতে যে আয় রোজগার হয় তাহাতে কোন রকমে সংসার চলিয়া যায়। তাহাদের ঘর ছনের ঘর। এই বছর ঘর আর ‘ছাওয়া’ হয় নাই। সমস্ত খুঁটিও পুরাতন। তাই ঝড় তুফানে তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া যাইবে যে কোন সময়। তাহার জন্য সঞ্চয়ের দরকার। বই কিনিবার জন্য, কলেজে ভর্তি হইবার জন্য পয়সার দরকার। তাহার মাথা ঘুড়িতে লাগিল। চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল। আশ্চর্য হওয়ার বিষয় তাহার মনোবল মোটেই ভাঙ্গিল না। জীবন যুদ্ধে দৃঢ় অটল থাকিবে বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল। অথচ গায়ে একটি ভাল জামা নাই। কিন্তু মনে স্বপ্ন আছে বিশাল। বর্তমানে যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের জন্য। সে ঘোড়াওয়ালা হইয়াও কলেজে ভর্তি হইয়াছে। তাহার গ্রামের রহিম শেখের ছেলে বুবেল তাহার সাথেই কলেজে ভর্তি হইয়াছে। বুবেল তাহার পিতার মত দুশ্চিন্তের অধিকারী। কলেজে ছানাকে ছোট বানাইবার জন্য ঘোড়াওয়ালার ‘পুত’ ঘোড়াওয়ালা বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করে। ছানা জবাব মুখে না দিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করে যে ভাবেই হোক ভাল ফলাফল করিতে হইবে দিনে রাতে খাটিয়া। বুবেল তাহার সাথে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চায় এবং ঝগড়া করেও। রীতিমত কলেজে ছানাকে একঘরে এবং কোণ্ঠাসা করিয়া ফেলে। ছানা দিশেহারা হয় না কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায় এই ভাবিয়া যে ইতরের দল ভারী। সে হঠাৎ প্রায়ই চটিয়া যায় আবার সামনে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া শান্ত হয়। ইহাই বোধ হয় উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একদিন ছানা কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিতেছে, এমন সময় কতিপয় যুবক লইয়া রুবেল পথে তাহাকে আটকাইয়া ফেলে। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলে যে, ক্লাশে কোন্ কোন্ ছেলে পিছনে থাকিয়া মেয়েদের উত্থাপন করে তাহাদের নাম বলিয়া দিয়াছিল সে। ছানা সাহসী যুবক। সে রুবেল ও তাহার সহযোগীদের ভয় না পাইয়া জবাব দিল “হ্যাঁ আমি বলিয়াছি, স্যার জানিতে চাহিয়াছে সেই জন্য বলিয়াছি। সত্য বলিয়াছি কি হইয়াছে তাহাতে।” তাহার কথার প্রত্যুত্তর না করিয়া বৃষ্টির মত ছানাকে বহু হাতে কিল ঘুষি মারিতে উদ্যত হইল। ছানাও কম কিসে, বাঘের মত হুংকার দিয়া স্রষ্টার নাম মুখে উচ্চারণ করিয়া পাল্টা আক্রমণে প্রস্তুত হইল এবং আক্রমণ করিতে লাগিল। সে একাই একশ। ইচ্ছামত নরাধম অপদার্থদের পিটাইয়া সে বিদায় করিল! অতঃপর তাহার বইপত্র গুছাইয়া তাহার নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

ছানার মায়ের দিনকাল ভাল যাইতেছে না। স্বামীর শোক আর ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহার শরীর ভাংগিয়া গিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই তাহার শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ছানা তাহার মায়ের সেবা, ঔষধ পথ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যোগাড় করিয়া দিতেছে। এমন কি কলেজ করিয়া ঘোড়ার ঘাস খড় কাটিয়া, মালামাল বহন করিয়া, নিজের লেখাপড়ার বাড়ীর কাজ করিয়া ও রান্নাবান্না কাজে ছানা তাহার মাকে সাহায্য করে যাহাতে তাহার মায়ের কষ্ট না হয়। ছানা একদিন ভোর রাতে দেওয়ানগঞ্জ বাজারে যাইবে কাঁচামাল নিয়া এমন সময় দেখিল পথে এক বৃদ্ধলোক গুইয়া আছে। জায়গা সে

ঠাওর করিয়া রাখিল। ফিরতি পথে দেখিল সেই জায়গায় বৃদ্ধ লোকটি আর নাই। কিন্তু একটি কাপড়ের ব্যাগ পড়িয়া আছে। ছানা মনে মনে চিন্তা করিল, ব্যাগটি নিশ্চয় ঐ বৃদ্ধের। ঘটনাস্থলেই ছানা ঘোড়াসহ দাঁড়াইয়া পড়িল। ব্যাগটি যদি সে ফেলিয়া যায় তবে কেউ না কেউ তাহা ছিনাইয়া নিবে এবং বৃদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাই এখন তাহার কর্তব্য হইল, দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যাগটি পাহাড়া দেওয়া বৃদ্ধ না আসা পর্যন্ত। সকাল গড়াইয়া দুপুর দুপুর গড়াইয়া রাত এবং রাত গড়াইয়া আবার সকাল হইয়াছে কিন্তু বৃদ্ধের আর খবর নাই। এই দিকে তাহার সাথে তাহার ঘোড়াও উপুস করিতেছে আর তাহার মা-ইবা কী করিতেছে তাহা কে জানে! ইত্যাদি অনেক চিন্তা তাহার মনে ভীড় করিতেছে। পরদিন দুপুর বেলা দেখা গেল বৃদ্ধ লোকটি অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া হাজির। তাহার ব্যাগটি যেভাবে রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক সেইভাবেই পড়িয়াছে আছে। আর তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে ছানা। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া ব্যাগটি যথাস্থানে দেখিতে পাইয়া পরম আনন্দে তাহা কুড়াইয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় ছানা সহাস্য বদনে কহিল, ‘ব্যাগটি কি আপনার?’ বৃদ্ধ উত্তর করিল, ‘হ্যাঁ’। ছানা বলিল, “তাহা হইলে নিয়া যান আর দেখুন সব ঠিকঠাক আছে কি না” বৃদ্ধ কহিল, “তুমি কে বাবা” ছানা জবাব দিল, ‘আমি পথচারী’। আপনার ব্যাগ পাহাড়া দিতেছি গত দুইদিন যাবৎ। শুনিয়া বৃদ্ধ যাহার পর নাই অবাক হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চান্দ্রিপুর ইউনিয়নে রটিয়া গেল শেখ বাড়ীর রহিম শেখ চেয়ার ম্যানী ইলেকশান করিবেন। তাহার কুকীর্তি সর্বমহলে ততোধিক রটিয়া আছে। তাহা হইলে কী হইবে কুটকৌশল যত আছে সব প্রয়োগ করিয়া তিনি ইলেকশানে জনমত পক্ষে নিয়া আসিবেন। তিনি শালিস করিতে গিয়া পক্ষ নিয়া ঘুষ খাইয়াছেন তাহাতে কী হইয়াছে, তিনি হত দরিদ্র সুন্দরী মহিলা দেখিলে গলিয়া যান এবং পান চিবাইয়া চিবাইয়া, ব্যাপারী-জামা নাড়াইয়া নাড়াইয়া মুখের কুলি ফেলিয়া চুনসমেত পানের ডাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া টিপিয়া টিপিয়া কুকর্মের ইশারা দেন এক চোখ বন্ধ করিয়া সামান্য এবং সামান্য অর্থের বিনিময়ে, পানি মূল্যে ইজ্জত লইয়া পথে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসেন তাহাতে কী হইয়াছে তিনি ইলেকশান করিবেন! তাহার চরিত্র ফুলের মত পবিত্র চেলাচামুড়াদের দিয়া মাইকিং করাইবেন অসুবিধা কোথায়! তিনি মানুষের ঝগড়াকে পুঁজি করিয়া, শালিসী করিয়া মানুষকে মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া দেন তাহাতে কী হইয়াছে! তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন দরবার হইতে পারে! আর যদি দরবার করিবার জন্য কেউ দুঃসাহস দেখায় তাহা কী তাহার সম্মুখে ধোপে টিকিবে? জুয়ার আসরের নেতা তিনি, বাংলা মদের আসরের নেতা তিনি, আবার মসজিদ, মাদ্রাসা কমিটির গণ্যমান্য নেতা তিনি যখন যে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে সেই দলের স্থানীয় নেতা বনিয়া যান তিনি। অনেক দূর হইতে নারী শিশু পাচারকারী গরুচোর ডাকাতদের নেপথ্যে নেতৃত্বদানকারী নেতাও তিনি; তাহার রক্ত চক্ষুর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কাহার আছে, কে কি বলিয়া বিপদে পড়িবে, কে চায় ইচ্ছা করিয়া বাহিরে শেখের বিরুদ্ধে গিয়া অযথা হয়রানীর শিকার হইবে? যাহার এত সমাজ বিধ্বংসী রূপের কথা বলা হইল তাহার সাথে সংঘর্ষ হইবে কিসের এবং কাহার তাহা সহজেই অনুমেয়? অর্থাৎ বিষয়টি পরীক্ষার করিয়া বলা যায় এইরূপে যে, যে বা যাহারা গুণের চর্চা করিবে

তাহার বা তাহাদের সাথেই এই দোষাবলীর ধারক বাহকের সাথে সহজেই সংঘর্ষ বাঁধিয়া যাইবে। এখানে ‘ছানা’ একটি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র। তাহার কোন প্রভাব এলাকায় নাই বা থাকিবারও কথা না তবে অদূর ভবিষ্যতে যখন নির্বাচন হইবে তখন এই ক্ষুদ্র আলোকের কণা জ্বলিয়া উঠিলে সামান্যতম জায়গাও যে আলোকিত হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রহিম শেখের ভয়টা এইখানেই।

তিনি তাই তাহার ছেলেকে ডাকিয়া ঝুকুচকে, রাগতঃস্বরে চিৎকার দিয়া বলিয়া দিলেন, যাহাতে সে কাহারো সাথে ঝগড়া না করে। রুবেল মাথা নাড়িয়া সায় দিল। একদিন রুবেল তাহার সাজপাঙ্গ নিয়া নিরীহ ছানার বাড়ীর পার্শ্বেই কি কাজে আসিয়াছিল। তখন ছানার গুণগানে উচ্চকিত ছিল তাহার প্রতিবেশি। তাহারা বলিয়া দিল এমন সোনার ছেলে থাকিলে মানব সমাজের উন্নতি না হইয়া পারে না। কথাগুলি শুনিয়া রুবেলদের ভাল লাগে নাই। তাহাদের গায়ের মাংশ ছিদ্র হইয়া হাড়ে গিয়া লাগিয়াছিল। তাহারা কোন প্রত্যুত্তর করিল না শুধু বুঝিয়া নিল ছানা আর যাহাই হোক তাহাদের বন্ধু হইতে পারে না, কাঁটার মত গায়ে বিঁধিয়া যায়।

দিনে দিনে ইলেকশনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভোট চাহিতে চাহিতে গলদঘর্ম ভোটপ্রার্থীদের ভোটের প্রার্থনার ঢেউ এখন ঘরে ঘরে লাগিয়াছে। ভাল-মন্দের মিশ্রণে চলা মানুষগুলি রহিম শেখের গুণমুগ্ধ। কিন্তু শুধু ভাল মানুষগুলির বিবেক না বোধক জবাব দানে প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মধ্যে ছানা অগ্রভাগে। এখন কি করা যায় রহিম শেখ ভাবিয়া দেখিতেছে। একদিন গভীর রাতে কয়েকজন লোক লইয়া তিনি ভোট ক্যাম্পেইনে বাহির হইয়াছেন। কেহ কেহ নীরব রহিয়াছেন, কেহ দুই কথা মুখে শুনাইয়া দিয়াছেন আর কেহ কিছুই বলেন নাই। যেইমাত্র ছানার ক্ষুদ্র ছনের কুটিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন তিনি একটি বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন আর তাহা হইল এই যে, ছানা তাহার মায়ের শিয়রের পাশেই চৌকির কিনারে হাত রাখিয়া মাথা ও পিঠ হেলান দিয়া ঘুমাইয়া আছে আর তাহার পাশেই, একটি হুঁদুর একটি

বিড়াল আর একটি শালিক পাখি আনাগোনা করিতেছে। এই তিন জনশত্রু প্রাণিরা পাশাপাশি থাকিয়া, সহাবস্থানে থাকিয়া মানুষের দৃষ্টি কাড়িতেছে, ইহাতে অবাক না হইয়া কি কেউ পারে! তাহা না হইলে সকলেই জানে বিড়াল ইঁদুর দেখিলেই দৌড়ায় এবং কামড়াইয়া মারে আর পাখি দেখিলেও ছোবল মারে আর কামড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অথচ কেউ কাহাকেও মারিতেছে না, সহজ ভাবেই যাহার খাবার সে-ই খাইতেছে, কেহ বা ঘুমাইতেছে দেখিয়া যেন মনে হয় একে অপরের বন্ধু। ছানা তাহার পালিত ইঁদুরকে কি শিক্ষা, দিয়াছে, পালিত বিড়ালকে এবং পালিত পাখিকেই বা কি শিক্ষা দিয়াছে তাহা ছানা এবং তাহার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেহই জানে না। এইরূপ ঘটনা দেখিয়া রহিম শেখ ভিতরে ভিতরে বিম্মিত হইল। ছানার প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত আতংক নিয়া ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিল। মুখ ফুটিয়া আর কিছু বলিবার সুযোগ পাইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, আসকর ঘোড়াওয়ালার এই ছোকড়াটি যেন ভিন্ন এক ধাতু দিয়া গড়া। ছানাকে সহজভাবে বুঝা যায় কিন্তু কিছু বলা যায় না। ছানা যাচিয়া কাহারো সাথে ঝগড়া করে না, সে কাহারো শত্রু না কিন্তু ঝগড়াহুলে উপস্থিত হইলে, ঝগড়ার উষ্ণতা কমিয়া যায় এক পর্যায়ে নিঃশেষ হইয়া যায়।

নির্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। আগামী-পরশু দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। রহিম শেখ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, ছানাদের বাড়ির অকুস্থলে কাঁলাইপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেন্টার সে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহাতে যে কোন রিস্কে সে প্রস্তুত। তাহার সিদ্ধান্তক্রমে সে বৈঠক বসাইল তাহার নিজ বাড়ীর বৈঠকখানায়। আলাপ আলোচনা শেষে কাগজে পত্রে চুক্তি সম্পাদন হইল সন্ত্রাসীদের সাথে চুক্তিপত্র ফাইলবন্দী করিয়া ফাইলটি বালিশের নিচে রাখিয়া রহিম শেখ সকলকে বিদায় দিয়া অন্য ঘরে কি প্রয়োজনে বাহির হইয়াছিল। এই ফাঁকে ছানার পোষা বিড়াল ঘরে ঢুকিয়া ফাইলটি মুখে লইয়া অতিদ্রুত কয়েক লাফে টিপে টিপে লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং প্রিসাইডিং অফিসারের আস্থানায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিল, প্রিসাইডিং

অফিসার নুতন একটি ফাইল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ফাইল হাতে লইয়া, ভিতরের কাগজ পত্র দেখিয়া আঁকিয়া উঠিলেন। সাথে সাথে পুলিশকে ডাকিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। পুলিশ অফিসার সত্ৰাসীদের ডিফেন্স করিবার সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। পরদিন সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হইয়াছে এমন সময় সত্ৰাসীদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যখনই অগ্রসর হইতে শুরু করিল, অমনি নিরাপত্তা বাহিনী ব্যারিক্যাড সৃষ্টি করিল। সত্ৰাসীরা পুলিশি উপস্থিতি ঠান্ডার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য পিছু হটিল বটে, গোলাগুলি করিতে পিছু পা হইল না। গুলি করার প্রস্তুতি নিয়া যখন নিশানা করিল তখন হঠাৎ করিয়া ছানার পালিত শালিকটি সত্ৰাসীর চোখ বরাবর ঘেঁষিয়া উড়িয়া গেল। সত্ৰাসীর নিশানাভ্রষ্ট হইল এবং নিরীহ জনতার জীবন রক্ষা পাইল। অন্য দিকে আরেক সত্ৰাসী যখন গুলি করিতে উদ্যোগী হইল তখনি পালিত ইঁদুর পিলপিল করিয়া সত্ৰাসীর পায়ের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল এবং বাম পায়ে কামড়ও বসাইয়া দিল। নিশানা ভ্রষ্ট হইয়া গুলি জনতার উপর দিয়া চলিয়া গেল। পুলিশ গোলাগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া গুন্ডাদের ধরিয়া ফেলিল এবং পিঠমোড়া বাঁধিয়া জনতার সম্মুখে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বসাইয়া রাখিল। মানুষের স্বস্তি ফিরিয়া আসিল এবং যথারীতি ভোট গ্রহণ সম্পাদন হইল। জনতার রায় প্রতিফলিত হইল এবং অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে একজন ভাল প্রার্থী নির্বাচিত হইল।

ছানার আত্মশক্তির বৃদ্ধির জন্য স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আজকাল তাহার মায়ের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতেছে। মনে হইতেছে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন। দিন পনের একটানা শ্বাস কষ্টে ভুগিয়া তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। অনেক চেষ্টা সাধ্য করিয়াও ছানা তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না। ছানাকে দেখিবার জন্য পৃথিবীতে আর কেহ রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আঙ্গুরা যে কলেজে পড়ালেখা করিতেছে সেই কলেজে যাওয়ার পথে বনের পার্শ্বে একটি জীর্ণ-কুঠিরে এক বুড়ি বসবাস করে। এই বুড়ির কে আছে, কি খায় দায় তাহা কেহই জানে না। একদিন আঙ্গুরা কৌতুহলবশতঃ কলেজে যাওয়ার পথে বুড়ির-কুঠিরে প্রবেশ করিল। কুঠিরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহা বর্ণনাতিত। বুড়ি কংকালসার একটি ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া আছে। ছোট ছোট হাড়ি পাতিল বাসন, ঘটি গেলাস বাটি ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য হইবার বিষয় এই যে, এক ফোটা দানা নাই ঘরে যাহা বুড়ি খাইবে। বুড়িকে আঙ্গুরা জিজ্ঞাসা করিল, ‘বুড়ি মা, আপনার কে আছে?’ অস্ফুট স্বরে বুড়ি যাহা বলিল তাহা বুঝা গেল না। তবে এখন যে তাহার আর কেহ নাই তাহা আকারে ইংগিতে বুঝাইয়া দিল। বুড়ির কপালে হাত দিয়া দেখা গেল জ্বর আসিয়াছে। আঙ্গুরা নিকটে এক নালা ছিল, যেখানে গিয়া ঘটি ভরিয়া পানি আনিয়া বুড়ির মাথা কপাল মুছিয়া দিল। বুড়ি চোখ মেলিয়া তাকাইয়া কষ্ট করিয়া উঠিয়া বসিল এবং আরও কিছু ইতিহাস বর্ণনা করিল। বুড়ি জানাইল তাহার স্বামী সন্তান ছিল। সকলেই পর্যায় ক্রমে মারা গেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। সামান্য কিছু জমি জিরাতও ছিল। ইহা এখন অন্যেরা চাষ করে। কিন্তু কিছুই দেয় না। যাহা দেয় তাহাতে তাহার আহার জুটে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আঙ্গুরা দেরী না করিয়া দ্রুত দোকানে গেল। কিছু চাল ভাল আর ফলমূল নিয়া আসিয়া-বুড়িকে দেখাইয়া ফলমূল খাইতে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, হাড়ি পাতিল ধুইয়া মুছিয়া লাকড়ি টুকাইয়া ভাত আর ডাল রাঁধিয়া বুড়িকে খাইতে দিয়া সেইদিনকার মত আঙ্গুরা প্রস্থান করিল। কলেজে যাওয়া এবং আসার পথে, নিজের যাতায়াত ও নান্তার পয়সা বাঁচাইয়া, টানা দুই বৎসর প্রতি দিন বুড়ির খোঁজখবর করিত আঙ্গুরা। আঙ্গুরাকে বুড়ি দেখা মাত্রই কাঁদিয়া ফেলিত এবং বুকে জড়াইয়া ধরিত। আপন সৃষ্টিকর্তার নিকট চোখের পানি ফেলিয়া

আঙ্গুরার জন্য আশীর্বাদ করিত। তীব্র দারিদ্র্যতা এবং অসহায়ত্ত্বের কারণে বুড়ির সমস্ত অনুভূতির মধ্যে আঙ্গুরা জায়গা করিয়া লইল। আঙ্গুরা এই সুযোগে, বুড়িকে সোজা সাপটা বলিয়া দিল দেখুন মা আমি নগন্যা। আপনার স্রষ্টা আপনার একেশ্বর, আপনাকে সৃষ্টি করিয়া আমাকে আপনার খেদমতের জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু নই। আপনার সুখ ও সেবা নিশ্চিত করিয়াছেন আমার উছিলায় আপনার স্রষ্টাই। তাই মহান স্রষ্টা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আপনার কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফেলুন, নিজেকে উৎসর্গ করুন, দেখিবেন পরম শান্তি আসিয়াছে বুকে। আর এই বুকের আরশেই তাঁহার স্থান। দেখুন নিজেকেই নিজে জয় করিতে হইবে। ইহার জন্য আর কোন অস্ত্র নাই। শুধু স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির বিচ্ছেদের কান্নাই পারে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহামিলন ঘটাইতে। কাজেই মা আপনি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া যাইবেন আবার জাগিয়াই কাঁদিয়া যাইবেন বলিয়া আঙ্গুরা কান্ত হইল। বুড়ি কিছু বুঝিল কিছু বুঝিল না। তবে উহা বুঝিল যে, রক্ত সম্পর্কের না হইয়াও যে বিনা স্বার্থে আরেকজনের সেবা করিয়া যায়, সে আর কেউ নয় ঈশ্বরের দূত, দেবী। তাকে প্রণাম করিলে প্রাণেশ্বরকেই প্রণাম করা হইবে। বুড়ি আরও বুঝিল যে, তাহার বুকেই যে প্রাণেশ্বর তাহাকে দেখা যায় না। কেন তিনি দেখা দেন না তাঁহাকে যে দেখিতেই হইবে, না হইলে যে মরিয়াও শান্তি নাই। চোখের জল দিয়া হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া আপন প্রাণেশ্বরকে দেখার কাজে বুড়ি লাগিয়া গেল।

তিন বৎসর পরের ঘটনা দেখিয়া আরও আশ্চর্য হইতে হয়। বুড়ির চোখের জল কাজে লাগিয়া গেল। বোধ করি বুড়ির চোখের জলে আধ্যাত্মিক জগতের নদী হইয়া গিয়াছে। তাই বুড়ি যখন মারা গেল তখন তাহাকে দাহ করিবার জন্য প্রথমত স্থানীয় লোকজন আসিল মরণোত্তর ব্যাথাতুর হইয়া। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম। যাহা হোক আগুন লাকড়ি যোগাড় করিয়া যখন দাহ করিবে তখন দেখা গেল শত চেষ্টা করিয়াও মরদেহ পুড়া যাইতেছে না। তাই লোকজন এক রকম ভয়

পাইয়া দেহটি নদীতে ফেলিয়া দিল। আর দশটি লাশের মত দেহটি ভাসিয়া রহিল না চোখের পলকে অতই গভীর জলে লাশটি ডুবিয়া গেল।

আঙ্গুরাদের বাড়ীর পাশেই আছে চিড়ার মিল। চিড়া ভাংগানোর জন্য একবার আঙ্গুরার ভাই ছোবান সুগন্ধী ধান ভিজাইয়া রাখিল। ধানের বোঝা মাথায় করিয়া পথে হাঁটিতেছে এমন সময় পিছন দিক হইতে তাহার অলক্ষ্যে এক বিষাক্ত সাপ আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া গেল। লোকজন ধরাধরি করিয়া ছোবানকে বাড়ীতে নিয়া আসিল। আঙ্গুরা কলেজ হইতে তখন কিয়ৎক্ষণ হইল বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহার ভাই ছোবানকে দেখিয়া তাহার যাহা যাহা মনে হইল তাহাই করিল। ভাল করিয়া বাঁধিয়া কাটিয়া কাটিয়া ক্ষত স্থানে চুমু দিয়া অতঃপর প্রচুর কালরক্ত বাহির করিল। উহাতে রোগী কিছুটা বিষের ভারমুক্ত হইল। তাহার পর নিজে ব্যবস্থা করিয়া হাসপাতালে নিয়া দিন দুয়েক রাখিয়া ভাল করিয়া নিয়া আসিল। আঙ্গুরার পিতা প্রচুর খাটে। দিনরাত খাটিয়া খাটিয়া ফসল ফলাইতেছে। সংসারে যাহা লাগে তাহা লাগাইয়া উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করিয়া জমি ক্রমাগত বাড়াইতেছে। যাহা হোক অতিরিক্ত খাটুণীর ফলে আঙ্গুরার বাবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার বয়স হইয়াছে। বয়সের ভারে নৃজ্য আঙ্গুরার বাবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত। অনেক চেষ্টা সাধ্য করিয়াও বয়োবৃদ্ধ কামরানকে বাঁচানো গেলো না। পিতৃবিয়োগে শোকাহতা আঙ্গুরা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আঙ্গুরার ভাই ছোবান খবর দিল ছানাকে চিঠি পোষ্ট করিয়া। ছানা ছুটিয়া আসিয়া তাহার চাচার লাশ দেখিতে পাইল না। তবে কাঁচা কবর দেখিয়া স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কবরের নিকটেই গড়াগড়ি গেল। তাহার আরও তিন চাচার মধ্যে এই চাচাই তাহাকে বেশি আদর করিত এবং গল্পাচ্ছলে তিনি নীতিকথা বুঝাইয়া দিতেন। তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুরু ছিলেন তিনি। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার দোষ বা গুণ জীবিত মানুষের নিকট ভাসিয়া উঠে এবং উন্মোচিত হয়। এ বেলাতেও তাহাই হইয়াছে। ছানা

যে জীবন যুদ্ধ করিতেছে তাহার শিক্ষা পাইয়াছে তাহার চাচার কাছে থেকেই। কাজেই আর কাহারো কিছু হোক বা না হোক ছানার যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছানার চাচী মেঘলা আকাশের মত মুখ ভার করিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন। কোন কথা কহিতেছেন না। ছানার মনে হইতেছে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্ছা যাইবেন। তাহাই হইল, অল্প সময় পরেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন এবং অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহাকে ধরাধরি করিয়া হাসপাতালে নেওয়া হইল। ডাক্তার বলিলেন, অধিক শোকে তিনি স্ট্রোক করিয়াছেন। তিনি আর কখনও কথা কহিবেন না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাঁহাকে দুশ্চিন্তাহীন রাখিতে হইবে। যে জায়গা হইতে তিনি শোকগ্রস্ত তাহার স্মৃতি তাহার সম্মুখে রাখিতে হইবে যাহাতে উহা নড়াচড়া করিয়া তিনি পুলক বোধ করেন। ছানা ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়া টানা সাতদিন হাসপাতালে রাখিয়া সদ্য বোবা হওয়া কোন রকমে বাঁচিয়া যাওয়া তাহার চাচীকে নিয়া বাড়ী ফিরিল।

খবরের কাগজে পাঁচদিন পর এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইল। ছানা ও আঙ্গুরা ভাগ্যক্রমে ও চেষ্টায় উভয়েই এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করিল। তাহারা উভয়েই প্রথম বিভাগে পাশ দিয়াছে। উহা শুনিয়া ও বুঝিয়া আঙ্গুরার মা খুবই সন্তুষ্ট ও খুশি হইল। ছানা ও আঙ্গুরা উভয়েই উচ্চাভিলাষী। তবে তফাৎ হইল এই যে, আঙ্গুরার পরিবারের কিছুটা সামর্থ্য আছে। কিন্তু ছানার কিছুই নাই। তাহাকে গায়ে খাটিয়া পড়ালেখা করিতে হইবে। সে বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে শুধু মনের জোরে। না হইলে কিছুতে সম্ভব হইত না। একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাহার মা-বাবা তাহাকে রাখিয়া গিয়াছে। ছোবান বলিল, ‘ছানা পাঁজির হিসাবে ১২ই আষাঢ় মাসে বাবার মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্ণ হইবে সেই পর্যন্ত তুমি থাকিয়া যাও’। ছানা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

ছোবানদের বাড়ীর সম্মুখে ছিল একটি ছোট পুকুর। এক চাঁদনী রাতে ছোবান, ছোবানের মা, আঙ্গুরা ও ছানা একত্রে বসিয়া গল্প

করিতেছিল। হঠাৎ এক পোকা আসিয়া ছানার গায়ে তাহার হল ফুটাইয়া দিল। হুলের যন্ত্রণায় ছানা চিৎকার করিতেছিল ঠিক এমন সময় আঙ্গুরা ও চিৎকার শুরু করিয়া দিল। ছানার শরীরের যে স্থানে যন্ত্রণা হইতেছিল ঠিক একই স্থানে আঙ্গুরারও যন্ত্রণা হইতেছিল। আঙ্গুরার মা আঙ্গুরাকে ঝাঁপটাইয়া ধরিয়া কোথায় কি হইয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, দেখা গেল কম হাতের কনুইয়ের নিচে কিছু জায়গা ফুলিয়া গিয়াছে এবং ছোঁয়া যাইতেছে না। আঙ্গুরার মা কি করিবেন না করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতেছেন না। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আবার ছোবান ও দেখিল, ছানার বাম হাতের কনুইয়ের নিচে ফুলিয়া লাল হইয়া গিয়াছে তাহাতে হাত দিলেই ছানা চিৎকার দিয়া উঠে। যমজ সন্তানের মত একজনে ব্যথা পাইলে আর একজনের গায়ে ব্যথা লাগে উহা বুঝিতে গিয়া কাহারো কোন বেগ পাইতে হইল না। ছোবান ও ছোবানের মা ইহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিল। সে দিনকার মত তাহারা উঠিয়া গিয়া নিজ নিজ ঘরে শুইয়া পড়িল। রাতে শুইয়া ছানা আঙ্গুরা উভয়েই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল শাদা ধবধবে পোশাক শাশ্রমভিত, পাগড়ী মাথায় এক দরবেশ বলিতেছেন তোমরা আরও কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। ছানা ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রশ্ন করিল, ‘কি পরীক্ষা?’ উত্তর আসিল, ‘পরে জানিবে আলবিদা।’ ছানা হুড়মুড়িয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল একই সময়ে আঙ্গুরাও ঘুম হইতে জাগিয়া গেল। আঙ্গুরার মা, আর আঙ্গুরা একই বিছানায় শুইয়াছিলেন। শব্দ পাইয়া আঙ্গুরার মা জাগিল এবং আকারে ইংগিতে মেয়ের স্বপ্নের কথা বুঝিয়া নিল। ‘উহা কিছু না’ বলিয়া শান্ত্বনা দিয়া আঙ্গুরাকে পুনরায় শুইয়া পড়িতে ইংগিত দিয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন। পাশের ঘরে ছানা ও ছোবান দুইজনেই জাগ্রত। ছানা শুধু ছোবানকে কহিল, ছোবান, আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে আর কিছু না বলিয়া মূল বিষয়টি এড়াইয়া গিয়া আবার শুইয়া পড়িল। পর দিন সকালে নাস্তা খাইবার সময় কথা উঠিল যে ছানা, আঙ্গুরা কে কি পড়িবে, কোথায় পড়িবে ইত্যাদি। আঙ্গুরা মত প্রকাশ করিল যে সে

ডাক্তারী পড়িবে, ছানা বলিল যে সে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে এবং কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবে।

নাট্টা শেষে উভয়েই কলেজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। কলেজে যাইতে যাইতে উভয়ের মধ্যে যে আলাপচারিতা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ : “লেখাপড়া ও পেশাগত জীবনে যে যাহাই করুক না কেন তাহাদেরও অধিকার আছে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা, আধ্যাত্মিকতা ইচ্ছা করা মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া, সর্বশেষ আপনার স্রষ্টার প্রিয় পাত্র হইয়া দুনিয়া পরিত্যাগ করা। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা এক পেশে। ইহাতে আধ্যাত্মিক বিদ্যা চর্চা করার কোন প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ তো নাই-ই বরং কেহ এই রূপ চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করিলে, সামাজিকভাবে তাহাকে হেয় করিবার জন্য উঠোনে দাঁড়াইয়া থাকে। যতভাবে পারা যায় তাহাকে পাগল বানাইয়া রাখিতে হইবে, ইহাই যেন সামাজিক প্রথা। সন্যাসীরা ভিক্ষা করিবে, সন্যাসীদের সংসার সমাজ নাই, সন্যাসী মানুষ কোন কাজে আসে না ইহাই যেন ভূয়োদর্শন। ভূয়োদর্শনের ব্যতিক্রম ভূমিকা পালন করিয়া প্রচলিতের উর্ধ্বে উঠিয়া, অন্তর্গত জগতের বিকাশ করিয়া যে বিজ্ঞান চর্চা করা যায়, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিক হওয়া যায়, তাহাই এই যুবক যুবতীদ্বয় প্রমাণ করিয়া দিবে। একজন আর একজনের হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল তাহারা যেভাবে পরোপচিকীষা চলাইয়া যাইতেছে তাহা আরও বৃদ্ধি করিবে। এখানে অর্থের কোন প্রভাব নাই, এখানে সমাজের সন্ত্রাসী শক্তির নেতিবাচক প্রভাব কোন কাজে আসিবে না। শুধু মাত্র প্রয়োজন হইবে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া পরার্থে জীবন বিলাইয়া দেওয়া। ইতিহাস ঘাটিলে উহার ভুরি ভুরি প্রমাণ मिलিবে।”

ছানা একপর্যায়ে আগুরাকে বলিল, ‘গতকাল আমি একজন দরবেশকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা আছে। কি কঠিন পরীক্ষা তাহা কিছুই বলেন নাই।’ ইহা

শুনিয়া আঙ্গুরাও বলিয়া উঠিল, ‘ভাইয়া, আমিও তো এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।’ দুইজন একই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে এবং কঠিন পরীক্ষা দিতে হইবে ইহা ভাবিয়া উভয়ের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। ছানা আঙ্গুরাকে শান্তনা দিয়া কহিল, ‘পরোপচিকীর্ষা এবং আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আসিবে, প্রতিরোধ এবং অবজ্ঞা আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক এমন কি, জীবন নাশের হুমকীও হতে পারে, তাহাতে ভয় পাওয়ার কী আছে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের সাথে আছেন’ শুনিয়া আঙ্গুরা প্রবোধ পাইল ঠিকই কিন্তু মনের ভয়ও জড়তা কাটিয়া উঠিতে পারিল না। আঙ্গুরা বলিল, ‘চল আমরা এই নির্জন স্থানটায় একটু বসি।’ বলিয়া উভয়েই হাঁটিতে হাঁটিতে পাহাড় ঘেঁষিয়া নির্জন নদী তীরে বসিয়া পড়িল।

সামনে বিশাল নদীচর, কোথাও কোথাও কৃষকরা চাষাবাদ করিতেছে। নদীর উপর বালি হাঁস, পানকৌড়ি উড়িতেছে। নদীতে পাল তুলিয়া নৌকা চলিতেছে। দূরে দেখা যাইতেছে স্টীমার। যাত্রী উঠা নামা করিতেছে। এই মধ্যাহ্নে এই দুইটি প্রাণি জীবন যুদ্ধে নামিতে চাহে, তাহাদের ভিতরের মহান স্রষ্টাকে টানিয়া বাহিরে আনিতে চাহে, এই দুর্জয়ে কঠিন বন্ধুর চলার পথে কে হইবে তাহাদের আলোকবর্তিকা তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। নারী সুলভ দুর্বলতায় জড়াইয়া গিয়া আঙ্গুরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ছানার দিকে কঠিন চাহনি রাখিয়া ছানার আস্থা পাইতে চাহিয়া অক্ষুণ্ণ স্বরে শুধু বলিল, ‘আমি একা থাকিব আর কত দিন।’ শুনিয়া ছানা হতবাক। নারীজাতি আর যাহাই হোক স্বামী ছাড়া, প্রিয়তম সাথী ছাড়া পথ চলিতে পারে না। যাহারা চলে তাহারা হয় ডাইনী আর না হয় দুশ্চরিত্রা। দুশ্চরিত্রা না বলিলেও বলিতে হইবে যে, তাহারা জীবনে এমন আঘাত পাইয়াছেন যে, আর কাহারো সাথী হইতে চাহেন না। নারীর জন্য নারী সাথীর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন পুরুষ সাথী। আর এই পুরুষরাই যদি বুকে ছুরি মারিয়া অন্য নারীর সঙ্গ লাভে ধন্য হয় তখন নিজের জীবন যৌবন, মন-দৌলত সব বিকাইয়া দিয়াও যদি কাংখিত পুরুষের ছোঁয়া না পাওয়া

যায় তবে কি আর করা যাইবে,একা না থাকিয়া গতান্তর কি? কথায় আছে না! ‘জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা’ অর্থাৎ পুরুষ পাইলে নারী তৃপ্তি পায়, শান্তিতে থাকে।

যাহা হোক আগুরা সরাসরি কহিয়া ফেলিল “বিয়ে কর”। ছানা সরাসরি উত্তর দিল,‘হাঁ বিয়ে করিব আল্লাহতা’য়ালার ইচ্ছায়। আমার তো আর মা বাবা নাই, দুইজনেই মারা গিয়াছেন,চাচারা আছেন,তাহাদের মাধ্যমে প্রস্তাব নিয়া আসিব শীঘ্রীরই। কী খুশি তো’! বলিয়া আগুরার দিকে চাহিতেই আগুরা লজ্জাবনত হইয়া রহিল। এই প্রথম কোন পুরুষের মুখ হইতে বিয়ের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইহা যে কী আত্মা,শান্তনা এবং সুখ তাহা নারী মাত্রই বুঝিতে পারে,উপলব্ধি করিতে পারে কিন্তু কাহাকেও বুঝাইতে পারে না ভাষায়। নিজেকে ছানার দিকে উজাড় করিয়া দেওয়ার মানসিকা তৈরী হইয়া আছে আগুরার কিন্তু রুঢ় কঠিন ছানা তাহার পৌরুষকে প্রবাহিত করিয়াছে আধ্যাত্মিকতার কমনীয়, অরূপ সংস্কৃতিতে সে কী আর কামের ফাঁদে আটকা পড়িতে পারে! ছানার অন্তর্গত স্রষ্টা লজ্জা পাইতেছে এ কারণে যে সম্মুখে উপস্থিত কামের সমুদ্র! যদিও সে নারীর ভালবাসায় সিক্ত হইয়াছে তাই নিজেকে সংবরণ করিল।তাহারা কামের সমুদ্র পাড়ি দিল না বরং দৃঢ় মনোবল রিক্তহস্ত লইয়া ফিরিয়া আসিল। দুইজনই আত্মার জোরে চিৎকার দিয়া উঠিল, হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্রষ্টার নামে শপথ করিয়া বলিল,আমরা মনের আলোর জগৎ জয় করিবই করিব ইনশাআল্লাহ। এই মানব মানবীদ্বয়ের অন্তর্গত জগৎ খুলিয়া গেল, তাহাদের সম্মুখে সাপ, বিচ্ছু, বাঘ-ভল্লুক, পাহাড়-পর্বত, ঝাড়-জঙ্গল, সামাজিক বাধা, লোক নিন্দা, অর্থ-লিঙ্গা, সম্পদ লিঙ্গা ও দৈহিক লোভ ইত্যাদি কিছুই না। তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল দিন রাত পরিশ্রম, স্রষ্টা নাম প্রতিমূর্ত্ত অরণ করিয়া ভালভাবে পড়ালেখা করিয়া যখন সোনার মত পুড়িয়া পুড়িয়া খাদ মুক্ত হইবে,ইট-ভাটার ইটের মত কাঁচা অবস্থা হইতে পুড়িয়া পুড়িয়া যেমন লাল ও শক্ত হয়, মাটি হইতে আলাদাভাবে চেনা যায় সেইরূপ হইবে

সেই দিন স্রষ্টার রাহে তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। তাহার আগে, যে কাহারো জীবন বিনাশ হইবে, তবু কেউ কাহাকেও ছাড়িবে না, আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। এই জড়াইয়া ধরিয়া থাকা দৈহিকভাবে জড়াইয়া থাকা নয় বরং আধ্যাত্মিক সিঁড়ি বেয়ে উঠার ক্ষেত্রে আলোর জগতে লুকোচুরি খেলা, নুতন নুতন জগতে, হ্র গেলমান হইয়া, রাধাকৃষ্ণের অশরীর প্রেমলীলা হইয়া অনন্ত ধামে অভিসার করা। এইখানে দেহের সুখের কোন অস্তিত্ব নাই, আছে মনের সুখের সূর্য, যেইখান হইতে অবিরল ধারায় শান্তির আলোক বর্ষিত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কঠিন দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করিয়া করিয়া ছানা আজ রণক্লান্ত। সে তাহার ঘোড়ার জন্য আর সময় দিতে পারিতেছে না। আগে ঘোড়ার পছন্দ লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত ঘাস কাটিয়া আনিয়া যে ভাবে আদর করিয়া খাওয়াইত আজ আর তাহা করিতে পারিতেছে না। নচেৎ তাহার ঘোড়াটি এমনভাবে শুকাইবে কেন? তাহার প্রতিবেশি ‘হাবা’কে সে ঠিক করিয়াছে ঘাস কাটার জন্য। প্রতিদিন দুইবেলা ঘাস কাটিয়া আনিয়া দিবে তাহাকে দেওয়া হইবে দুই টাকা। ভোর রাতে মালামাল লইয়া এবং বইপত্র গোছাইয়া সে চলিয়া আসে স্থানীয় মফস্বল শহরে। ঘোড়ার মাল নামাইয়া দিয়া ঘোড়া কলেজের মধ্যে মাঠে চড়াইয়া ক্লাশ করিতে যায় ঐ কলেজেই। কলেজ পুরনো হইলেও অনার্স খুলিয়াছে কয়েক বৎসর হইল। সে রসায়ন (অনার্স) বিষয়ে পড়িতেছে। কলেজের ক্লাশ শেষে ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী আসিয়া আবার ঘোড়াকে খাওয়াইয়া পড়া তৈরী করিতে বসে। হাবা কোনদিন ঘাস কাটে কোনদিন কাটে না। নিজের কাজ পরকে দিয়া হয় না। তাই কোন কোন দিন সন্ধ্যার পূর্বে আবার ঘাস কাটিয়া আনিতে হয়। আবার নিজের পাক নিজেই করিয়া খাইতে হয়। প্রতিদিন ১০ মাইল হাঁটিয়া ঘোড়ার পিছনে ছুটিয়া আবার কলেজ করিয়া আসিয়া রান্নাবান্না তাহাকে বিধিয়ে তুলিয়াছে। জীবনযুদ্ধে হাঁপাইয়া উঠিলেও সাঁইজীর নির্দেশে রাত্রের একবেলা যখন তাহাকে মোরাকাবায় বসিতে হয় তখন সমস্ত জরাজীর্ণতা, ক্লান্তি অবসাদ, সব কিছু কাটিয়া যায় ধ্যানরাজ্যে কল্পনার পাখা মেলাইয়া আপন স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়া নিমগ্ন থাকিলে যে কী সুখ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে। হুজুরী কাল্বে দাঁড়াইয়া বসিয়া মাথা নুয়াইয়া স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা যে কী শান্তি তাহা প্রার্থনাকারী ছাড়া আর কে বুঝে! মানুষ কাঁদে অন্য কোন জীবজন্তু, বস্তু কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা রোগে শোকে ভুগিলে, আর ছানা কাঁদিতেছে নির্জনে গভীর রজনীতে স্রষ্টা হইতে নিজের বিচ্ছেদ বেদনায়। এই কান্নায় যে স্বর্গীয় মজা আছে তাহা কান্নাকাতর প্রাণ ছাড়া আর কে বুঝিবে! নিজ বুকে

লতিফায় লতিফায় ধ্যান ঢুকাইয়া স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়া করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে দুইমুঠো অন্ন গ্রহন করিয়া সারাদিন উপুস করিয়া সন্ধ্যায় আহার করিতে যে কী নান্দনিক ঐশ্বর্য এবং তৃপ্তি আছে ছানা ছাড়া আর কে বুঝিয়া উঠিবে! রসায়ন ক্লাশে প্রফেসর যখন দেখিলেন আর দশটি ছাত্রের তুলনায় ছানার মনোযোগ অনেক বেশি, প্রফেসর যখন দেখিলেন ছাত্রসুলভ ভক্তি শ্রদ্ধা ছানার অন্য যে কোন ছাত্রের চেয়ে বেশি তখন প্রফেসর ছানাকে আদরের বরণ ঢালি দিয়া বরণ করিয়া লইলেন। এই যুগে ছাত্রদের দলবাজি সম্ভ্রাস, গুডামী টেন্ডারবাজী অস্ত্রবাজী যেইখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, সেইখানে প্রফেসরও যেন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন ছানার উপরই। উহাতে সহজেই জ্ঞান বিতরণ করা যায়। প্রফেসরের আফসোস হইতেছে এমন ছাত্র দ্বারা যদি কলেজ ভরিয়া উঠিত!

হঠাৎ কলেজে একদিন বিপত্তি ঘটিল। কলেজের উন্নয়ন কাজের জন্য টেন্ডার জারী করা হইয়াছে। কলেজের ছাত্রসংসদের ছেলেরা আসিয়া দাবী করিল যে তাহারা কাজটি করিবে। কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় বলিলেন ‘তোমরা কি করিয়া কাজ করিবে তোমরা তো ছাত্র, তোমরা কন্ট্রীকটরী করিবে? লাইসেন্স পাইবে কোথায়’। এক ছাত্রনেতা আর এক ছাত্রনেতাকে টিপ্পনী কাটিয়া সহাস্য বদনে বলিল, “লাইসেন্সের সমস্যা হইবে না স্যার, উহা আমরা ম্যানেজ করিয়া নিব।” অধ্যক্ষ মহোদয় ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “তোমরা বড় জোর তদারকি করিতে পার, আমার পক্ষে”; ছাত্রদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, ‘তাহা হইলে আমাদেরকে কাজ দিবেন না স্যার?’ অধ্যক্ষ মহোদয় ঞ্চকুচকে বলিলেন, “তোমরা কি জোর করিয়া কাজ আদায় করিয়া নিতে চাও”? অন্য একজন ছাত্র বলিয়া উঠিল “প্রয়োজন হইলে তাহাই নিব” অধ্যক্ষ মহোদয় হতাশ হইলেন, আর কোন কথা কহিলেন না। ছাত্ররাও হন হনাইয়া দ্রুত বেগে অধ্যক্ষের অফিস হইতে বাহির হইয়া গেল।

টেন্ডার ওপেন করা হইলে দেখা গেল সব নিম্নদরে টেন্ডার পাইয়াছে অন্য এক প্রতিষ্ঠান। ছাত্ররা আহত হইল এবং অধ্যক্ষ কারসাজি করিয়াছে অভিযোগ আনিয়া ভাংচোর আরাষ্ট্র করিয়া দিল এবং কলেজ চত্বরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মিছিল করিয়া অপমানজনক উক্তি করিতে লাগিল। প্রফেসর হারুন এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছানা বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া আস্তে আস্তে অধ্যক্ষের অফিসের দিকে যাত্রা করিলেন। আরও ব্যাপক মারদাঙ্গা শুরু হইতে পারে তাহা জানিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিশ ঢাকিয়া আনিলেন। পুলিশ-ছাত্র দাঙ্গা হাস্যামা শুরু হইল। একপর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্রদের আক্রমণের তোড়ে পুলিশ পিছু হটিতে বাধ্য হইল। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা যখন অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে তখন ছানা উপায়ন্তর না দেখিয়া, একটু আড়াল হইয়া এক মুঠি ধূলি লইয়া স্রষ্টার নাম স্মরণ করিয়া ভাংচোররত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়া ছুঁড়িয়া! মারিল। এক মুঠি ধূলি হাজার মুঠি ধূলিতে রূপান্তরিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের মধ্যে আচমকা পতিত হইতে লাগিল। ধূলায় অন্ধকার হইয়া গেলে ছাত্র ও ছাত্র নামধারী বহিরাগতরা কে কোথায় পালাইয়া গেল তাহার হৃদয় পাওয়া গেল না।

একদিন প্রফেসর হারুন ছানাকে বলিতে লাগিলেন সামাজিক অবক্ষয়ের কথা। তিনি যে বাসায় থাকেন তাহার পাশের বাসার অমল চন্দ্র বণিকের কথা, অমল বাবুর এক মেয়ে এই কলেজেই ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষে পড়ে। অমল বাবুর স্ত্রী হাসপাতালে নার্সের চাকুরী করেন। হাসপাতালের কোর্যাটারে যখন অমল বাবু থাকিতেন তখন এক উত্যক্তকারীর অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত বাসা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। তিনি উঠিয়াছেন অতঃপর নিজের বাড়ীতে। সেখানেও বিপত্তি ঘটিয়াছে। সেখানেও ঠাঁই হয় নাই বিপদগ্রস্থ অমল বাবুর পরিবারের সদস্যদের। অমল বাবুর স্ত্রী উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাইয়াছেন। তিনি সেখানে দুই বৎসর থাকিবেন। তাহার একমাত্র কন্যা রানুকে রাখিয়া গিয়াছেন তাহার ছোট জ্যার নিকট। গত দুই বৎসরে ছোট জ্যা মেয়েটির উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন তাহা

আর নাই বা বলা হইল। তাহার স্বামী অমল বাবু কোন রকম মেয়েকে দুই বৎসর দেখিয়া রাখিয়া স্ত্রী আসার সাথে সাথে শহরে বাসা ভাড়া করিয়া তথায় উঠিয়াছেন। দেখা গেল সেখানেও ক্ষুদ্র সন্ত্রাসীদের উৎপাতে মেয়েটির ঘর হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অমল বাবুর অফিসের লোক আশীষ বাবু বাধা দেওয়ার কারণে গুন্ডা কর্তৃক প্রহৃত হইতে হইয়াছে। আশীষ বাবু হাসপাতালে মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা লড়িতেছেন। উহা কেমন কথা! যাহার সুন্দরী কন্যা সন্তান আছে তাহার নিরাপত্তা সমাজে এক রকম নাই বলিলেই চলে। নেকড়ের গন্ধে যে রকম ব্যাঘ্র ছুটিয়া আসে এবং আক্রমণ করিয়া বসে ঠিক তেমনি সুন্দরী মেয়েদের সমাজে চলাফেরা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রফেসর হাবুনের কথা শেষ হইতে না হইতে এক মেয়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তাহার স্যারকে বলিল, স্যার ঐ দেখুন স্যার, বখাটে ছেলেটি তাহার সাজপাঙ্গ লইয়া আমার রাস্তা আগলে দাঁড়াইয়াছে। ছানা হতবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ মেয়েটি তাহার স্যারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া বখাটে দল চলিয়া গেলে মেয়েটিও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। প্রফেসর হাবুন ছানাকে বলিল মেয়েটিকে আগাইয়া দেওয়ার জন্য। ছানা তদ্রূপ কাজ সম্পাদন করিয়া তাহার ঘোড়া লইয়া যথারীতি বাড়ী ফিরিল।

ছানার ঘরে আজ ভাল তরকারী পাক করিয়াছে। তরকারী নিজে বাটিতে করে হাবার মাকে সে দিয়াছে। হাবার মা তরকারী খাইয়া ভূঁয়সী প্রশংসা করিল ছানার। কোন জীবজন্তু এমন কি একটি পিপড়াও হস্তারক সে নয়। মহান স্রষ্টার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া মধ্য রাতে যখন যে শুইতে যায় মশায় কামড়াইয়া তাহার শরীর ফুলাইয়া দেয় তবু নিজে মশার গা ছোঁয় না। তবে বেয়াদবী সে একেবারেই পছন্দ করে না। সে নিজে বেয়াদব নয় এবং কোন বেয়াদব কে প্রশ্রয় দেয় না। এই দিকে সে খুবই কঠোর। তাহাকে সন্তোদা দিবে বলিয়া দোকানদার ডাকে কিন্তু পয়সা হাতে না থাকিলে সন্তোদা ক্রয় করে না। কেহ তাহার নিকট ঋণ পাইবে না। দোকানদারদের বিশ্বস্থ ছানা। পাইকারের মালামালের বহনকারী ঘোড়া হইতে কখন দুইটা বেগুন,

কিছু কাঁচামরিচ বা অন্য কিছু বস্তা ফসকিয়া পড়িয়া গেলে সাথে সাথে তাহা কুড়াইয়া লইয়া বস্তায় গুঁজিয়া দেয় যাহাতে মাল কম না হয়। তাহার ঘোড়া কখন ক্ষুধার্ত, কখন তৃষ্ণার্ত কখন কাহিল, পরিশ্রান্ত হয় তাহা বুঝিয়া ঘোড়ার সেবা সে নিশ্চিত করে। ঢোলা পায়জামা পাঞ্জবী পড়িয়া সে যখন ঘোড়া হাঁকিয়া ভোরে মোকামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কেহ তাহাকে পাগল, কেহ বুদ্ধিমান আর কেহ তিরস্কার করে। কিন্তু সবাই জানে যে, নিরীহ এই মানুষটি অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা স্বভাব চরিত্রে, কাজে কর্মে, চিন্তা চেতনায় মানবতা-মানবিকতায়। পাড়ার কাহারো অসুখ অসুবিধা হইলে লোকজন দৌড়াইয়া আসে, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে। ছানাও দ্রুত চলিয়া যায় ডাক্তার ডাকা কিংবা অন্য কোন সেবা করিবার জন্য। আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজের যথাকর্তব্য সমাধা করে। চক্রাকারে নিজের মানসিক-মানবিক শক্তি বৃদ্ধিকরণ সহ নিয়মানুবর্তীতার এমন নজীর আর একটি মিলানো মুশ্কিল।

দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বছর চলিয়া গেল। ছানা রসায়নে বি.এস.সি অনার্স সহ মাস্টার্স পাশ করিয়াছে। পড়াশুনার চাপ করিয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা রাত হইতে শেষ রাত পর্যন্ত সমগ্র সময় বাতি নিভাইয়া জানালা খুলিয়া কখনও চোখ বুঁজিয়া, কখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া, আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া কখনও বুক চাপড়াইয়া তিন বৎসরের শিশুর মত ডুকরাইয়া কাঁদিয়া পরিবেশ ভার করিয়া ফেলে। শুধু কাঁদে আর কাঁদে মুখে কিছু বলে না। তাহার এই কান্নার রহস্য আজও কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথচারী পঁচিশ বছর বয়সের এই যুবকের অস্বাভাবিক কান্না দেখিয়া কেহ বলে তাহার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সারা বছর উপুস করিয়া চলাতে কেহ তাহাকে নিন্দা জানাইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত এই যুবকের এহেন কার্যকলাপ জনমনে বিস্ময়ের জন্ম দিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে আঙ্গুরা ডাক্তারী পাশ করিয়া ইন্টারশীপ করিতেছে। আঙ্গুরাকে ডাক্তার না বলিয়া পরশপাথর বলিলে অত্যাক্তি করা হইবে না। ডাক্তারী কোর্স সম্পূর্ণ না করিয়াও রোগী দেখিয়া রোগীর ঔষধ পথ্য দিয়া যে হারে এবং যেভাবে রোগী ভাল করিয়া তুলিতেছে তাহাতে মনে হইতেছে সে যে জায়গায় রোগী দেখিবে সেই জায়গায় অপরাপর ডাক্তারগণ ভাতে মরিবে। নাম না করিয়াও একজন শিশু বিশেষজ্ঞের কথা বলিতে পারি, তিনি প্রতি শিশুর অভিভাবকের নিকট হইতে বিশ টাকা ডাক্তারী ফি গ্রহণ করিয়া কোন সময় একেবারে ফি গ্রহণ না করিয়া প্রতি দিন দুই হইতে তিনশত শিশু দেখিয়া সমগ্র উপজেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া বুলেটের মত নির্দোষ ও অব্যর্থ নিশানায় কার্যকরী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত হইয়া গিয়াছেন। তিনি এখন এম,পি হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন। তাহার জনপ্রিয়তা এখন, তখন সব সময়ই তুঙ্গে থাকিবে বসিয়া আশা করা যাইতেছে। ডাক্তারী পেশাটাকে শুধু মাত্র জনসেবা জনমঙ্গল ভাবিয়া লইলে এবং নিজেকে পূজারীর মত দেবীর কাছে উৎসর্গ করিয়া দিলে, কাঁচা পয়সা তথা তাজা ফুল আর মূর্তির স্বরূপ যেমন পায়ের তলায় পড়িয়া থাকে, গুণী ডাক্তারের আয়ের বিষয়ে তদ্রূপই বলা যাইতে পারে।

আঙ্গুরার বিবাহের কথা হইতেছে। নানা জনে নানা দিক হইতে প্রস্তাব নিয়া আসিতেছে। মেয়ে হবু ডাক্তার সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ধার্মিক, অমন মেয়ে কয়টি পাওয়া যায়। কাজেই ডজনে ডজনে ঘর আসিতেছে আর ফিরিয়া যাইতেছে। টাকা পয়সা বংশ বুন্যাদ প্রতিপত্তিওয়ালা পরিবারের ছেলেদের দিকে তাকাইলে কোন্ অভিভাবক না গলিয়া যায়। আঙ্গুরার মায়ের মন প্রায়শই বিগলিত থাকে। আর কখন কোন ভাল ঘরের সহিত বিবাহ হইবে তাহা ভাবিয়া মনের উষ্ণ জলে ভালবাসায় সিদ্ধ হইতে থাকে। বিবাহের বিষয়ে মেয়েকে

জিজ্ঞাসাবাদ করিলে মেয়ে হ্যাঁ না কিছুই না বলিয়া ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া সোজা হইয়া চলিয়া যায় আর কখনও মাথা নিচু করিয়া বসিয়া থাকে বোবা হইয়া, বোবার ভাণ করিয়া। অমন পাঁজি মেয়ে যে এক ফোঁটা হাসিও তাহার মুখে নাই। মনে, সমস্ত মুখে আকাশের সাঁঝ আসিয়া জমিয়া আছে। এখনই বুঝি বৃষ্টি শুরু হইবে। তখন আক্ষেপ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মা হইয়া আর কিছু করিতে না পারিয়া সোজা চলিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া থাকা ছাড়া আর কি করা যায়। আঙ্গুরার মা অনেক সময় ছেলে ছোবানের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিয়া থাকে, মেয়ে বড় হইয়াছে, বিয়ে দিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোবানের মা অনুযোগ করিয়া বলিয়া যায় দেখ, দেখি মা হইয়াছি, কেমন মা হইয়াছি, মেয়ের বিয়ে দেখিয়া মরিতে পারিব না, মায়ের আশা থাকে মেয়ের ঘরে নাতি নাতকর হইবে, তাহাদের দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে, আমার কপালে কি আর তাহা আছে? কিছুই বুঝিতে উঠিতে না পারিয়া ছোবান শুধু বলিল, ‘কি হইয়াছে মা খুলিয়া বল,’ ‘কী আর খুলিয়া বলিব তোর এই বোনটির কথা। কী! কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছিস, নাকি শুধু ভাই হইয়া আছিস’ রাগতঃ স্বরে বলিল, ছোবানের মা। ছোবান শুধু মা ও বোনের মধ্যে বিষাদভরা যুক্ত অবস্থা পর্যবেক্ষন করিয়া বিষাদ ভারমুক্ত না করিয়া মৃদু হাসিয়া আঙ্গুরার দিকে কানি নজরে চাহিয়া চলিয়া গেল। ছোবানের মা টেবিলে অবস্থিত টিনের মগটি আরও জোরে রাখিয়া টেবিল চাপড়াইয়া রাগে হন্ হন্ করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল। মা ও ভাইয়ের এহেন আচরণে নির্বিকার নির্লিপ্ত আঙ্গুরা শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কিছুই কহিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘরের দরজার ছিটকানি লাগাইয়া কাঁথা গায়ে দিয়া ভাবিতে লাগিল ছানার কথা। ছানার কথা, ভাবিতে তাহার যে কী সুখ! তাহা যদি কেহ জানিত তবে সেই সুখ কাড়িয়া নিতে চাহিত লক্ষ টাকার বিনিময়ে। ইহা যে অমূল্য। এই ভালবাসা, ক্রয় করাও যায় না, বিক্রয় যোগ্যও নহে। ছানাকে সে মনে প্রাণে ভালবাসে। ছানাকে না পাইলে জীবন বিফলে

যাইবে। উহা শুধু জানে সে, ছানা আর তাহাদের দুইজনের অর্ন্ত্যামী।
 এইতো গেলো মনের কথা, বাহিরের যে যন্ত্রণা আজকাল তাহাকে
 সহিতে হইতেছে তাহাতে কী হইয়াছে। দুই দিন আগেও ছানার সাথে
 তাহার কথা হইয়াছে, তাহাকে আশ্বস্থ করিয়াছে, বাতাসের মাধ্যমে
 ভালবাসার চিঠি পাঠাইয়াছে, আন্তরিক গুণাবলীর উৎকর্ষতার জন্য
 সহানুভূতির সওগাত পাঠাইয়াছে, তাহার ছানার প্রতি সে ভালবাসা
 তাহার বারি বিন্দু বৃদ্ধি করিয়া শত সহস্র গুণ সম্প্রসারিত করিয়া
 এশকে এলাহীতে রূপান্তরিত করিবার জন্য, বন্ধুত্বের মজবুত করিবার
 জন্য অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা কি কেহ জানে? রাতের সিংহভাগ
 কাঁদিয়া কাটিয়া সৃষ্টিকর্তার সহিত নিজ দূরত্ব কমাইয়া আনিবার
 অব্যাহত চেষ্টা সে করিয়া যাইতেছে, তাহার খবর কে রাখে! প্রতিদিন
 দুই ফোঁটা অশ্রু বেশি ফেলিয়া, প্রতিদিন দুইটা দানা কম খাইয়া,
 প্রতিদিন দুইটি কথা কম কহিয়া, আধ্যাত্মিক সুখের স্বর্গরাজ্যে যে সে
 একটু একটু করিয়া প্রবেশ করিতেছে, প্রতি নিঃশ্বাসে স্রষ্টাকে স্মরিয়া যে
 অব্যর্থ সুখের মহৌষধ সে গিলিতেছে, তাহা কি সকলে জানে? ছানা যে
 তাহার ইহ ও পর জনমের স্বামী, ছানা যে তাহার প্রাণের দেবতা ইহার
 খোঁজ কে লইবে? নারীর শরীর আকৃতি জানায়, কাঁপিতে কাঁপিতে
 দেবতার পূজার অর্ঘ্য হয়, কখনও দেবতার ভোগ হইয়া প্রাণেশ্বরের
 আর্শীবাদ হয়, এই রহস্য কি বলা যায়? বলিতে চাহে না তাহার শরীর
 যন্ত্রণা, যৌবন যন্ত্রণা রূপৌশ্বর্ষের কথা, বলিতে চাহে না ফুটন্ত পদ্মেরও
 মেয়াদ আছে, এক সময় ঝরিয়া পড়ে মধুসমেত সকালের শিশির হয়,
 তাহাতে কি! উহা কি সে বলিয়াছে কোথাও? অন্য মানুষ দেখিয়া
 তাহাকে, লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাইবে উহাই স্বাভাবিক, শত বিয়ের
 প্রস্তাব আসিবে, উহাই সত্য। মায়ের মন কাঁদিয়া উঠিবে, ভাইয়ের মুখ
 উজ্জ্বল হইবে, উহা কি বলিয়া দিতে হয়? যতই দিন যাইবে ততই
 প্রকৃতি কাঁদিতে থাকিবে, অযত্নসজ্জিত প্রকৃতি যেমন ফালগুনে ফুলে
 ফলে সুশোভিত হয়, চৈত্রে ঝরিয়া যায়, তেমনি অবস্থা কি তাহার
 হইতে পারে? হঠাৎ এই কথা ভাবিয়া তাহার বুক হাহাকার করিয়া

উঠিল। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া বালিশ বদলাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল স্বামীর উপস্থিতি যেন প্রাণেশ্বরের উপস্থিতি; উহা সাথে না থাকিলে শুধু কল্পনায় শান্তি পাওয়া যায় না। তাই ছানাকে বলিতে হইবে অচিরেই যেন বিয়ার প্রস্তাব নিয়া আসে। ইহাই যেন শেষ কথা। কিন্তু সেই জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেই সময়টুকু তো তাহাকে দিতে হইবে। এইসব ভাবিতে ভাবিতে আগুুরা ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিন কায়েক হইল হাবার মা মারা গিয়াছে। তাহার কঠিন রোগ হইয়াছিল অর্ধাহারে অনাহারে শক্তিহীন হইয়া তাহার হাঁপানী রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঔষধ পথ্যের অভাবে এই জন্যেই তাহার অকালে অক্সা পাওয়া। হাবার এখন আর কেউ নাই। সকালে বিকালে ছানার ঘরের বেড়া-পাল্লা ধরিয়া করণ চাহনি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ছানা মনে করিল যে, এখন আর তাহাকে দুই টাকা একটাকা দিলে হইবে না। এই টাকা দিয়া সে তাহার মা জীবিত থাকিতে লবণ কেবুসিন তৈল আনিত। দুই চার আনা দিয়া বিড়ি ফুকিত। আর তাহার মা রহিম শেখের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করিয়া যাহা পাইত তাহা দিয়াই সংসার চলিত, অনেক সময় পানতা, ভাতের ফেন, উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারী যাহা ফেলিয়া দিবে তাহাই হাবার মাকে দিয়া হাড়ি উদ্ধার করিত রহিম শেখের বউ। উহাই হাবা আর হাবার মা মহানন্দে ভুরিভোজ করিত। হাবার ইহাও এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর শোকের চেয়ে আহার বিহারের অনিশ্চয়তা তাহাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। হাবা ডরে আর তাহাদের বাড়ীতে থাকে না। সন্ধ্যা হইলে ছেঁড়া কাঁথা আর তৈল যুক্ত চেপ্টা খোলবিহীন কাপড় গুঁজিয়া দেওয়া বালিশ কাঁধে করিয়া লইয়া আসিয়া ছানার চৌকির নিচে ঘরের এক কোণে বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকে। হাবাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা বোকামী, উহাই জানিও ছানা রসিকতা করিয়া একবার বলে, “হাবা, রাতে না খাইলে অইব না?” হাবা হাঁ হাঁ করিয়া হাসিয়া উঠে। সে মনে মনে জানে ছানা ভাই খাইলে তাহাকে দিয়া খাইবে। যাহা হোক প্রতিরাতেই দুইজনে একত্রে খায়। দিনের বেলা ছানা উপুস করে বিধায় এই সময় উচ্ছিষ্ট যাহা থাকে হাড়ি চাটিয়া খাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে আবার বেলা পড়িলে দুইজনে মিলিয়া লাকড়ি দিয়া চুলা জ্বলাইয়া হাড়ি চড়াইয়া দেয়। ডাল আর আলু ভর্তা- উভয়ের উপাদেয় খাবার। ছানা রোজা রাখে জানিয়া শেষ রাত্র এবং দিনের হাবার খাবার এক সাথে রন্ধন করে।

ছানা মনে মনে ভাবিল পরীক্ষার ফলাফল তো বাহির হইয়াছে। এখন একটা চাকুরীর যোগাড় করিতে হইবে। উহা বাড়ীতে থাকিয়া সম্ভব কতটুকু হইবে তাহা ভবিতব্য বলিতে পারে। তাহার মন গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতেছে সে সফরে বাহির হইবে। উহা কিভাবে সম্ভব হইবে তাহা নিজেও জানে না। তার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, পীর ফকিরের মাজার, প্রাকৃতিক দৃশ্য সমৃদ্ধ স্থান, বন্দর নগর, নদী-পাহাড় ইত্যাদি দেখিয়া দেখিয়া, তাফাকুর বিষয়ে তাহাকে সমৃদ্ধ হইতে হইবে। যাক, প্রথমেই সে স্থির করিল, ঋষি দরবেশ আউলিয়াগণের মাজার জিয়ারত করিবে। কারণ সে জানে, জীবিত পীর ফকিরগণের তুলনায় মৃত দরবেশ আউলিয়াগণের শক্তি আরও বেশি প্রকাশিত হয় জীবিতকালে গোপনীয়তার জন্য চেনা যায় না বলিয়া। সফর আর জিয়ারত করিয়া এই বিপুল শক্তি গুঁকিয়া গুঁকিয়া নিজের বুক আরও সমৃদ্ধ করিবে। তাবু খাটাইয়া এক একটি মাজারে কমপক্ষে তিন হইতে সাতদিন অবস্থান করিবে। রিজিকের মালিক স্রষ্টা, তাহার একটি ব্যবস্থা হইবেই। যেহেতু তাহার একটি ঘোড়া আছে। উহার জান যদি ভাল থাকে, ভাড়া ও মালামাল বহন অসম্ভব হইবে না কাছে কোন হাট-বাজার পাইলে বিষয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া একবার হাবাকে বলিলে হাবা তো খুশিতে ডগ মগ। সে পারিলে এখনই বাহির হইয়া যায়।

দিন পনের আরও কিছু ভাড়া খাটাইয়া সন্ধ্যাত কিছু পয়সা সংগে লইয়া পালিত বিড়াল, পাখী ও ইঁদুর সঙ্গে লইয়া, তৈজসপত্রের পুঁটলি বাঁধিয়া বিছানাপত্র সমভিব্যবহারে ছানা-হাবা ঘোড়ার পিঠে পালাক্রমে চড়িয়া একদিন সফরে বাহির হইল। অলি দরবেশের মাজারে গিয়া ছানা যেন নুতন জীবন ফিরিয়া পাইল। স্রষ্টার বন্ধুর সাথে থাকা! উহা কি কম কথা! স্রষ্টার বন্ধুগণের রুহানী ফায়েজ তাহার আত্মাকে আরও বিমুক্ত করিয়া তুলিল। এই রুহানী ফায়েজের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া সর্বদা স্রষ্টাকে ডাকিত। দিনের বেলা, দুই চোখে যাহা দেখিত রাত্রি বেলা উহা ধরিয়া ধরিয়া কাঁদিত আর স্রষ্টার প্রশংসা

করিত।পাহাড় এলাকায় গিয়া, সমুদ্র সৈকতে গিয়া, বনবনান্তরে গিয়া, মালভূমি, সমভূমি উপত্যকায় গিয়া, জনারণ্যে পড়িয়া, জনবিহীন উষ্ম মরুভূমি দেখিয়া, তাহার প্রাণের আকুতি বাড়িয়া যাইত। কত প্রাণীকে যে স্রষ্টা কতভাবে খাওয়াইতাহেন আর প্রতিপালন করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া চেতনায় উপলব্ধি করিয়া, আত্মহারা হইয়াছে ছানা।

কখনও বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, কখনও রৌদ্রে পুড়িয়াছে,কখন হিমশীতল হাওয়ায় রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।আরও সাহস বুকে লইয়া, একেশ্বর ধারণা বুকে স্পষ্ট করিয়া, ভরসা অটল করিয়া, বাস্তব জ্ঞান রাজ্যের মহীয়ান পাঠশালায় ভর্তি হইয়া, ক্রমাগত রহস্যের ভিতর ঢুকিয়া,নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে সে। কুণোব্যাঙের মত কুয়োতে পড়িয়া না থাকিয়া, কুয়াকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সাগরে ভাসাইয়াছে। সাগরে যত কষ্টের ঢেউ থাকুক, অনাহার আর অনিশ্চয়তার সীমা পরিসীমা না থাকুক, মৃত্যুর বিভীষিকার পরিবেশ থাকুক তবু ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই কুয়ের পঁচা জলে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া। কারণ সে ব্যাঙ। ব্যাঙ কখনও ডুবিয়া মরে না। সে ভাল সাঁতার জানে না তাহা ঠিক কিন্তু দুই চক্ষু মেলিয়া জগৎ দেখিয়া কখনও ডাঙ্গায় আর কখনও জলে থাকিয়া থাকিয়া বাঁচে। সাগরের কুমিরকে তাহার ভয় করার কিছু নাই। বন্যা জলোচ্ছাসেও তাহার ভয় নাই তাহার এক মাত্র ভয়ের জায়গাটি হইল, সাপ, প্রবৃত্তি নফসের সাপ। এই সাপই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে। এই সাপ থাকে আরামে আয়াসে, কিনারে কিনারে পোতাশ্রয় খাদের গর্তে। নির্দিষ্ট বাড়িঘর, নির্দিষ্ট জীবিকা, সুখ আর শান্তি, প্রবৃত্তির উপাদেয় উপাদান নফস আন্মারা-সাপ। আজ এইখানে ছানা নাই ছানা উদ্দেশ্যবিহীন অভিযাত্রী পথচারী। প্রতিদিন সকালে ‘কাছে পিছে’ কোন হাট বাজার পাইলে ছানা ঘোড়া নিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ভাড়া খাটিয়া সন্ধ্যা হইলে ছানা তাবুতে ফিরিয়া আসিত। ঘোড়াকে কাছেই বন জমিনে চড়াইয়া দিয়া যাহা জুটিত তাহাই ছানা-হাবা-বিড়াল-পাখি আর

ইঁদুরে মিলিয়া খাইয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে তাহাদের দিন অনাবিল শান্তি কঠিন, কঠোর ধৈর্য্য আর হেকমত আহরণের ভিতর দিয়া।

ভাল-মন্দ-ডাকাত-পিশাচ-দেও-দৈত্য-দানব-মানব-ফকির-দরবেশ সকলের সাথে, সকল পরিবেশে নিজেকে জড়াইয়াছে নিজের অস্থিত্ব বিলুপ্ত করিয়া মহাস্রষ্টার ভালবাসার দুয়ারে হানা দিয়াছে, ভাবিয়াছে আকাশ তাহার ছাদ, জমিন তাহার ঘরের মেঝে, পাহাড় হইল বালিশ আর সমুদ্র হইল তৃষ্ণা নিবারণ কলস। সে ভাবিয়াছে খাল-বিল-নদী-নালা তাহার বাটি হইতে পড়িয়া যাওয়া পানিমাত্র। তাহা না হইলে, এমন দুর্জয় সাহস না থাকিলে, বিরাট অরণ্যানীর মাঝে যেখানে সমস্ত হিংস্র জন্তুর বসবাস সেখানে কি করিয়া দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটা ইয়াছে। যখন রাত হইয়াছে তখন বাঘের চক্ষু ছাড়া কিছু দেখা যায় নাই। অনেক সময় এমনও হইয়াছে যে, হাবা-ঘোড়া-ইঁদুর-বিড়াল আর পাখি রাখিয়া একাই চলিয়া গিয়াছে নিরবে নির্জন স্থানে, তিন দিন, সাত দিন এবং পনের দিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। যখন রাত গভীর হইয়াছে, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই, চতুর্দিক আঁধার আর আঁধার তখন অন্তরের আলো জ্বলাইয়া আরেক জগতে যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহাই বোধ করি বিশ্বমালিকের নিকটবর্তী হওয়ার উত্তম স্থান, উত্তম পরিবেশ আর উত্তম সুযোগ। এক একবার তাহার মনে হইয়াছে, এই রাত যদি আর শেষ না হইত! এই অন্তর্জগতের আলোক যদি আর নিভিয়া না যাইত! আর এখনি যদি তাহার ইহলীলা সাক্ষ হইত! তবেই মহামালিকের দ্যুতি জগতে আশ্রয় লইয়া সে তাহার জীবন সার্থক করিত। কিন্তু হায় ভাগ্য! রাত শেষ হইয়াছে, আবার দিন আসিয়াছে তাহাকে আবার দিতে হইবে আরও কঠিন কঠোর পরীক্ষা। আপাতঃদৃষ্টিতে বৈষয়িক সহজ উপার্জন, মানুষ জীবজন্তুর সাথে মেলামেশা সমাজ লইয়া সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা, সাধারণ লোকদের জন্য জবুরী ও স্বাভাবিক হইলেও সাধকের জন্য, বিব্রতকর, বিরক্তিকর এবং দিব্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার শামিল। কেননা, এখানেই আমিত্বের কেউটে সাপ বসবাস করে। এই

সাপের বিষ দুরারোগ্য আধ্যাত্মিক ক্যান্সার তৈরী করে। সাহসী ছানা ভয়ের পাত্র নয়। কেননা স্রষ্টার আশীর্বাদ তাহার সাথে আছে। এই আশীর্বাদকে সম্বল করিয়া নুরের জগতে থাকা নিরবিচ্ছিন্ন রাখে, অব্যাহত রাখে আর মস্তিষ্ক বাহ্যিক দৃষ্টি, দুই হাত, দুই পা চালাচালি করে বোবা হইয়া দুই পয়সা আয়ের জন্য, শরীরের সুস্থ এক রকম বোবা হইয়াই। আর সূর্যাস্তের সাথে সাথে আলোর জগতে পরিভ্রমণ শুরু করে পরম আগ্রহে, তখন দুই চোখ পাথর হইয়া যায়, বুকের ভিতর হইতে নুর বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

হাবা একদিন কহিল, ‘ভাইয়া, এখানে গভীর জঙ্গল। ঘোড়ার ভাড়া খাটে না, চল অন্য কোথাও যাই’। ছানা বলিল, ‘কোথা যাবি?’ হাবা বলিল, ‘যে দিকে চোখ যায়, যেখানে মানুষ থাকে, হাটবাজার আছে সেই দিকে।’ ‘তাহা হইলে চল’ বলিল, ছানা। জিনিসপত্র গোছাইয়া তাহারা আবার পথ চলিতে শুরু করিল। চলিতে চলিতে দেখা গেল, এক আখড়া, সেখানে কতিপয় ছন্নছাড়া বাউল, অরূপ সায়ে ডুবিয়া গান গাহিতেছে। আপাততঃ সেখানেই তাবু খাটানো হইল। হাবা মানুষের গন্ধ পাইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইল। হাটে ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। সাথে সাথে ভাড়াও পাইয়া গেল। বহুদিন পরে মাছ-গোস্ত-চাল-ডাল আনিয়া তাহারা তৃপ্তি সহকারে খাইল। রাতে গানের আসর বসিল। গানের সুর ছানার নিকট ভাল লাগিল। কথার গভীরতা তাহার হৃদয় ছুঁইয়া গেল। কিন্তু ভাল লাগিল না গঞ্জিকা সেবন। কিছু কিছু মহিলা ও যথেষ্ট বসিয়া গান শুনিতোছিল। তাহাদের মালা, হাতে বাঁকা লাঠি এবং টিনের বালতি। দেখে মনে হয় তাঁহারা দীনহীন, পথের ভিক্ষুক। তাহারা আত্মানুসন্ধান ঘর হইতে বাহির হইয়াছে এই কথাটি ঠিক কিন্তু ক্ষুণ্ণবৃত্তির জন্য যখন মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তখন মনে হয় তাহারা যে উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে তাহার বিপরীত কাজটি করিতেছে। তাহারা অরূপ সন্ধান বাহির হইয়াছে, আর এই অরূপ মহাস্রষ্টা তো সর্বত্র আছে, নিজের কাছেও আছে, উহাকে জাগ্রত করিলেই চলে, আত্মশক্তি, আত্মমর্যাদা আত্মোপলব্ধি ও

আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিলেই চলে, অন্যের কাছে হাত পাতা কেন, ভিক্ষা করা কেন, নির্বিকার চিন্তে অবলীলায় আত্মমর্যদা বিক্রি করে দেওয়া কেন? যাহা হোক অহিংস এবং অরূপ স্রষ্টা সন্ধানে ব্যাপ্ত মানুষসকলের প্রথমই উচিত হইবে নিজে নিরভাব থাকা, নিজদেহকে খাদ্যাভ্যাস, কামাভ্যাসসহ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া নচেৎ ফলাফল বুঝেই হইতে বাধ্য।

ছানা বাউল আখড়ায় মাসাধিক কাল থাকিয়া তাহাদের জীবন যাপন অনুসন্ধান করিয়া যাহা বুঝিল তাহা হইতেছে এই যে, তাহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। জীবন যাপন ব্যবস্থায় তাহাদেও আরো সজাগ থাকিতে হইবে। সত্যের তত্ত্বানুসন্ধান, আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে এখানে কোন বাধার প্রাচীর থাকা চলিবে না। অনেক কিছুই প্রথা হইয়া গিয়াছে। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার আর তাহা হইল এই যে, যে কোন প্রথা, সর্বদাই মূলভাবনাটিকে আড়াল করিয়া দেয়। তখন আর কেন উত্তর পাওয়া যায় না। কেন'র উত্তর কেউ খুঁজে না। মানুষ গডডালিকা প্রবাহের মত ছুটিয়া চলিতে থাকে, উহাতে মানুষ অন্তঃসারশূন্য, কংকালসার হইয়া যায়।

পৃথিবীর সব মহাপুরুষই অহিংস মানবতাবাদী ছিলেন, কিন্তু আত্মমর্যদাহীন ছিলেন না। মানুষের ভিতরে আছে স্রষ্টা। এই স্রষ্টার মর্যাদা রক্ষা করা, স্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর স্রষ্টার অনুগত দাস হওয়ার অর্থ পরিকল্পিত জীবন গ্রহণ করা। মহাপুরুষরা যে পরিস্থিতিতে, যেকালে, যেরূপ জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পরিস্থিতি যে সর্বদাই যে কোন কালে ও মহা কালে বিদ্যমান থাকিবে তাহা যেমন স্বাভাবিক নয়, সেইরূপ, ভিন্ন কালে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই প্রথাটিকেই ধরিয়া রাখিতে হইবে জোর করিয়া তাহাও জবুরী আবশ্যিকতার মধ্যে পড়ে না। মূল কথা, হইল সিদ্ধপুরুষ আপনার গুণাবলী বিকশিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথার গ্রাসে আত্মবলি দান করিয়া কিছুই হইবে না। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হইয়া, তথায় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করিয়া, আপন

মনুষত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া, নিজেকে সার্থক করা যায়, অন্তর্জগতে তাঁহাকে বন্ধুরূপে পাওয়া যায়, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা যায়।

হাবা ঘোড়া দিয়া ভাড়া খাটানোর স্বাদ পাইয়াছে। সে ছানাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ‘ভাই, এখানে ভাল মালামাল বহাইতেছি। কিছু দিন থাকিয়া যাই’। ছানা হাবার অনুযোগ উপেক্ষা করিল না। বরং বলিল, ‘তাই হবে’। ছানা হাবাকে বলিল, ‘হাবা আমি কিছু দিনের জন্য গাঢ়ো পাহাড়ে যাইব। তোমরা এখানেই থাকিও আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত’ বলিয়া ছানা এক কাপড়ে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে পাড়ি জমাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন বনানীতে বহুদিন নির্জনে থাকিয়াও ছানার নির্জনতা আর ক্ষুধার্ত থাকিবার তৃষ্ণা মিটিল না। এ যেন এক দৈব টান। যতই একা থাকা যায় ততই একাকিত্বের দিকে মন ছুটিয়া যায় আর দেহের খোরাকি কমাইলে আত্মার খোরাকির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, এই নূরানী রহস্যের দ্বার খুলিয়া তথায় নিজের অবস্থান পাকা পোক্ত করিবার মানসে দ্রুত পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ছানা। তাহার মনে হইতেছিল, সে যতই পথ অতিক্রম করিতেছে ততই যেন তাহার মনের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই স্রষ্টার প্রতি তাহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আখড়ার অদূরে পাহাড়ের গুহায় নিজের আস্তানা ঠিক করিয়া স্রষ্টার ধ্যানে লিপ্ত হইয়া পড়িল ছানা। গুহার নিকটেই ছিল একটি ঝরনা, প্রতিদিন ঝরনা হইতে সন্ধ্যায় ও শেষরাতে পানি পিপাসা নিবারণ করিয়া গাছের পাতা চিবাইয়া রস খাইয়া, কখনও বন্যগাছের ফলমূল বা বিচি খাইয়া চলিতেছিল তাহার পান ও ফলার। স্রষ্টা-স্মরণের কৌশল রহিয়াছে। সে প্রথমেই মনোনিবেশ করিল তাহার কাল্‌ব বা অন্তকরণের দিকে। অন্তকরণের রঙ হইল হাল্কা খয়েরী বা জর্দা রঙের। এই কাল্‌বে মোতাওয়াজ্জা হইয়া মনে মনে এই রঙ দেখিয়া একটানা সাতদিন সাতরাত খাটাইয়া দিল। তারপর তাহার মনে আসিল বুকের পাঁজরের ঠিক মধ্যখানে সবুজ রঙের মেলায়। সেই রঙের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়া আরও বহুদিন খাটাইল। ইহা রঙ হইবার পরে তাহার মনোযোগ আসিল বাম স্তনের ঠিক দুই আঙ্গুল নিচে বুকের মধ্যে। উহার রঙ হইল উজ্জ্বল লাল রঙের। এই রঙটিও মজ্জাগত করিয়া ছানা ফিরিয়া গেল বুকের ডান দিকে উত্তর মুখে। সেখানে সে দেখিল শুধু কালো আর কালো রঙ। অব্যাহত ভাবে সেই কালো রঙ দেখিয়া ছানার মনোযোগ আকর্ষণ করিল বাম বুকের ঊর্ধ্বস্থানে, সোনালি নীল রঙটি। তারপর ছানা দুই চক্ষুর মাঝখানে দ্রু-

এর দিকে তাহার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিল। উহার রং সূর্যের আলোর মত অথবা ধবধবে সাদা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু স্রষ্টা নাম জপ করিয়া আর বুকের স্থানে স্থানে কল্পনায় রঙ দেখিয়া ছানা যাহার পর নাই খুশী হইতেছে। দিনের পর দিন যে, সে অনাহারে রহিয়াছে, মাথার চুল বড় হইয়া কোমড়ে ঝুলিয়াছে, হাতের নখ বড় হইয়া আর এক আঙ্গুল হইয়া গিয়াছে, দাড়ি-গোঁফে একাকার আর তাহা বুক অতিক্রম করিতেছে তাহাতে তাহার খেয়াল নাই। কোনরূপ অস্বস্থি বা অসুবিধা ভোগ করিতেছে না। যেখানে যে অঙ্গ যে ভাবে রাখিতেছে সেইখানে সেই অঙ্গ সেই ভাবে থাকিয়া, তাহাকে নিশ্চল পাথরের মত হইয়া থাকিতে সহায়তা করিতেছে, চক্ষুদ্বয়ের ঘুম উধাও হইয়া গিয়াছে। স্রষ্টাকর্ষণের কান্নার অশ্রুর যেন শেষ নাই। উহা দুই চক্ষু বাহিয়া কপোল হইয়া, ফোঁটা ফোঁটা পড়িয়া মাটিতে রেখাপাত করিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে কেহ কান্নার ঝরনা বহা দেখে নাই, অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া যে পাহাড় বাহিয়া নিম্নদিকে ধাবিত হইতে পারে ইহাই প্রকৃতি প্রথম দেখিল। কান্নার, বিলাপের স্বর-সুর মুর্ছনায় পাহাড়ের গুহা, পাহাড় আর প্রাকৃতিক পরিবেশ সরস ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অতীব আশ্চর্য চোখে, অজগর পাহাড়ী জন্তু, পাখ-পাখালি সকলে দুই চোখ বিস্ফোরিত করিয়া ছানাকে দেখিত আর মনে মনে স্রষ্টাকে বলিত, আহা বেচারী ছানা এত কাঁদিতেছে, তাহাকে কামিয়াব করিয়া দাও, তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ বানাইয়া দাও প্রকৃতির ডাক, প্রকৃতির স্রষ্টা, সকলের স্রষ্টা শুনিবে বৈ কি কারণ প্রকৃতি নিষ্পাপ, নিষ্কলংক। মেঘ কাঁদিয়া গর্জিয়া উঠে ছানার জন্যই, মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরাইয়া ছানার জন্যই, সূর্য আলোক ছড়ায় ছানার জন্যই, প্রকৃতি গাছপালা তরুলতা এত সবুজ ছানার জন্য, মাটি মানুষকে মাথায় করিয়া রাখে, ছানাকে দেখিবে বলিয়া। নদী স্রোতস্বতী হয় ছানার কান্নার জোরেই।

একদিন ছানা ঝরনার কাছে গেলো পানি পান করার জন্য সন্ধ্যার সময়। এমন সময় বানরের তাড়া খাইয়া এক বন্য মোরগ গাছ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল; এক নেকড়ে আসিয়া বন্য মোরগকে তাড়া

করিয়া তাহার সম্মুখে আনিল। বন্য মোরগ দৌড়াইয়া আসিয়া ছানার কাছে তাহার ভাষায় কথা বলিল। আবার নেকড়েও তাহার ভাষায় কথা বলিল, ছানার সাথে। ছানা কি কহিল জানা গেল না কিন্তু দেখা গেল নেকড়ের পিঠে চড়িয়া বন্য মোরগ কিছুদূর গিয়া পাখা মেলিয়া উড়াল দিয়া গাছের ডালে বসিল এবং নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করিল। আশ্চর্যের বিষয়, পাশাপাশি ডালে বানরও ঝুলিয়া ডালে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। জন সমাজ হইতে বিছিন্ন হইয়া তাহার সুবিধা হইয়াছিল বহুবিধ। প্রথমতঃ কাহারো সাথে কথা বলিতে হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ কাম, ক্রোধ, লোভ গর্ব হিংসা বিদ্বেষ, ইত্যাদির চোরাবর্তে তাহাকে পড়িতে হয় নাই।

তৃতীয়তঃ ধন সম্পদের লোভ সম্মান লিন্সা আত্মশ্লাঘা, আত্ম প্রচার ইত্যাদির দংশনে তাহাকে পীড়িত হইতে হয় নাই, আধ্যাত্ম ও যোগ সাধনায় তাহার একাগ্রতা অটুট রহিয়াছে চতুর্থতঃ আত্মার পরম সম্পদ মহাস্রষ্টার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা পাইয়াছে, তাহার দেহ রাজ্যের সম্রাট বুহের নির্দেশে সমগ্র শরীর চলিবে, কোন অঙ্গ আর বিরোধীতা করিবে না, আর বিরোধীতা করিলেও কুলাইয়া উঠিতে পরিবে না এই বুহানী শক্তি সে অর্জন করিয়াছে। শরীরের চাহিদার উর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি তথা স্বর্গীয় দূতের আলোকবর্তিকায় চলার সক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। ইট পুড়িয়া একেবারে কাল রঙের হইয়া গেলে যেমন আর কখনও মাটির সাথে মিশিতে পারে না, তেমনি অবস্থা হইয়াছে তাহার। ষড়রিপুকে একেবারে মাটির সাথে মিশাইয়া দিয়াছে সে। শরীরকে কংকালসার করিয়াছে, ইহাতে তাহার সুবিধা হইয়াছে এই যে, পরীক্ষা করিয়াছে নিজেকে। আধ্যাত্মিক সাধনায় দুরূহ কিছু পরীক্ষা আছে। সেই পরীক্ষাগুলি দিয়াছে একের পর এক। যাহা একাধারে যেমন ছিল দুঃসাধ্য তেমনি ছিল বিপদজনক। যে কোন সময় হিংস্রজন্তুর আক্রমণ অপর দিকে শারীরিক পরীক্ষা উভয়বিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাকে পরবর্তী যে কোন কাজকর্ম হাতে নিতে হইবে। উহা তাহার স্মরণে ছিল। তদুপরি তাহাকে আশংকার মধ্যে থাকিতে

হইয়াছে প্রতিষ্কণ। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান উহা অর্জন করার বিষয়। বিশুদ্ধ জীবন যাপন জরুরী। জ্ঞান আহরণে এবং শুদ্ধ জীবন যাপনে ছানার নগদ উদ্যোগ ছিল। তাই স্বল্প বয়সে অর্থাৎ মাত্র দশ বছর বয়সে একজন কামেল পীরের তওবার গিলাপ ধরিয়া আধ্যাত্মিকতার ছবক লইয়া দিশে দিশে বই পুস্তকাদি পড়িয়া তাহার গহ্বব্যে বাহির হইতে সক্ষম হইয়াছে। নিয়মিত পড়াশুনা না করিলে যেমন ভাল ছাত্র হওয়া যায় না তেমনি ভাল ছাত্র না হইলে পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। তাই নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া যাওয়াই আসল কথা।

নবম পরিচ্ছেদ

জীবনে কখনও কখনও মনের খোরাকির চেয়ে দেহের খোরাকি বড় হইয়া যায়। অবশ্য ইহা যদি মানুষের চোখে পড়ে। তাহা না হইলে কেন আঙ্গুরা তীর্থের কাকের মত ছানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে এবং ছানাই তাহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান সেই ছানাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে তাহা কি মানিয়া নেওয়া যায়? উহার জন্য উকালতির শেষ নাই, তদবীরকারীর অন্ত নাই, ঘটকালির লোকেরও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। উহার কারণ কী? উহার কারণ হইতেছে তাহার পাড়া দেহ। এই দেহটির পেলবতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে তত মানুষের চোখে পড়িতেছে, যত বয়স বৃদ্ধি পাইতেছে তত দুর্গাম বদনাম রটিতেছে। আঙ্গুরা আইবুড়ি হইয়া গিয়াছে, সে কেন কোন বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হইতেছে না উহার রহস্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনাহুতের মত পাড়া প্রতিবেশি মহিলারা অসিয়া আঙ্গুরাদের দাওয়ায় বসিয়া আঙ্গুরার মায়ের মুখের উপরে কথা কহিয়া যাইতেছে, তাহাকে বিব্রত করিতেছে। কখনও গ্রামের দুষ্ট লোকেরা টিপ্পনি কাটিতেছে, কখনও উপরে পড়িয়া হায় আফসোস করিতেছে যেন মহাসর্বনাশ হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিবার ও পরিবারের বাহিরের মানুষের কথায় অতিষ্ঠ হইয়া একদিন আঙ্গুরা তাহার বড় ভাই ছোবানকে বলিল, ভাই বহু দিন যাবৎ আমাদের পুরনো বাড়ী নগর কান্দায় যাই না, চল না, একবার বেড়াইয়া আমি আমার ইন্টারনসীপ হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফলাফলও বাহির হইয়াছে। এখন হাতে সময় আছে চল, যাই”। আঙ্গুরার কথায় ছোবান দ্বিভুক্তি না করিয়া রাজি হইয়া গেল। তাহারা এক দিন বাক্স পোটলা বাঁধিয়া দিন কয়েকের জন্য নগর কান্দার উদ্দেশ্যে তাহাদের বাটিতে হইতে বাহির হইল।

নগর কান্দায় আসিয়া আঙ্গুরা যাহা দেখিল তাহাতে সে আঁতকিয়া উঠিল। তাহাদের পুরাতন বাড়ীতে সবাই আছে নাই শুধু তাহার ‘প্রিয়তম ছানা’। তাহার ঘরটি খাঁ খাঁ করিতেছে, বেড়া দেউড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার চাচা চাচীকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন ফলোদয় হয় নাই, তাহাদের কেহই সদোত্তর দিতে পারে নাই, তাহারা শুধু বলিল যে ছানার ঘর একদিন সকালে তাহারা খালি দেখিতে পাইয়াছে। ইহার চেয়ে বেশি কিছু তাহারা জানে না। ছানার সাথে হাবাকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাহারা কোথায় আছে, কিভাবে আছে উহাও কেহ জানে না। উহা শুনিয়া আঙ্গুরার অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া উঠিল। নিজেকে সামলাইয়া নিয়া একাকী ভাবিতে লাগিল, এখন কী হইবে! ছানাকে না পাইলে জীবনে সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। ছানাকে তাহার প্রেমের পূজা দিয়া দিয়া উহার পাত্র বদলাইয়া বদলাইয়া প্রেমের উচ্চমার্গে উঠিয়া উহাকে সম্প্রসারণ করিয়া একেশ্বরের প্রতি বুকভরা বিশ্বাস ও ভালবাসা লইয়া এক দিন দুনিয়া হইতে বিদায় লইবে। কিন্তু লোকনিন্দার মুখ ঢাকিবে কি দিয়া! ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার চোখের জল নামিয়া আসিল। উহা আঁচলে মুছিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিল, উহাই বুঝি ভাগ্য!

নগর কান্দায় দিন কয়েক থাকিয়া আঙ্গুরা মনে মনে সিদ্ধান্ত স্থির করিল যে, দিনাজপুর আর তাহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নয়। তাহাকে অতিশীঘ্র অন্যত্র আবাসন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাকে একটা চাকুরী যোগাড় করিতে হইবে কোন ভাল হাসপাতালে দূরে কোথাও। তাহাতেই বিবাহ বিষয়ক সামাজিক যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে। সে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখিতে লাগিল। চাকুরী খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন এক বেসরকারী মেডিকেল কলেজে তাহার চাকুরী জুটিয়া গেল। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে অজপাড়া গাঁয়ে জহিরুল ইসলাম নামে ধনাঢ্য জনহিতৈষী মহৎ বরেন্য ব্যক্তিত্ব বহু জায়গা জমি নিয়া একটি আধুনিক

সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খুলিয়াছেন। এই হাসপাতালে আঙ্গুরা নিয়োগ পাইয়াছে।

আঙ্গুরা তাহার বড় ভাইকে বিবাহ দিয়া তাহাকে দিনাজপুরের বাড়ীতে রাখিয়া, তাহার বৃদ্ধ মাতাকে সঙ্গে লইয়া পাড়ি জমাইল তাহার নুতন কর্মস্থলে। উহাই ভাল হইয়াছে। সে এখন তাহার মনস্পতিকে নির্বিঘ্নে পূজা দিয়া যাইতে পারিবে। তাহার ভালবাসার মানুষকে চোখের অশ্রু বরাইয়া, অশ্রুর শক্তি দিয়া বাঁচিয়া থাকিলে কাছে টানিয়া আনিতে পারিবে। এই বিশ্বাস তাহার মধ্যে এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা ছাড়া সে আর অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। এই বিশ্বাস কুহেলিকা কি না নির্জলা সত্য তাহা ভবিতব্যই বলিয়া দিবে। যে সত্যিকারের মানুষ সে তাহার ইহসুখ ভুলে, তাহার অস্তিত্বকে ভুলে না, তাহার সামাজিক অবস্থান যাহাই হোক না কেন। ছানার ভালবাসার জোরেই সে আজ এতদূর গড়াইয়াছে, তাহার এত উন্নতি হইয়াছে—সে কি টাকা পয়সা বা ধনদৌলত ইত্যাদি উপহার পাওয়ার জন্য ছানার নিকট হইতে? না; ছানা তাহাকে দিয়াছে শুধু এক আঁজল, এক রঙি ভালবাসা, গুণ বিকাশের অনুপ্রেরণা সততা ও সতী-সাপ্রদীত্বের এক চিলতে দিব্যদৃষ্টি, তাহাই তাহার জীবনে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া ভ্রুণ গজিয়া মহামহীর্ষুহে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে তাপসী রাবেয়া বসরী (রঃ) এর মত সারা রাত জাগিয়া এবাদত করে, সে তাহার রূপ-রস-যৌবন ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া সিন্দুকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, সে তাহার মাতৃদেবীকে ওয়ায়েশ করণী (রহঃ) ঐর মত পিঠে বাঁধিয়া, নিজের সুখ ও ঘুমকে বিনাশ করিয়া যতনে, যতনে, ভরিয়া দিতেছে, বলি-সে কাহার অনুপ্রেরণায়? সে আর কেহ নয়, সে ‘ছানা’। এই ছানাই তাহার জীবনের মৌলিক শিক্ষাগুরু, জীবন্তকিংবন্তী প্রাণপ্রিয় দেবতা, প্রাণস্পতি। তাহাকে শুধু নিরবে নিভৃত পূজাই দেওয়া যায়, অদৃশ্য সমীরণে গায়ে মেখে উপলব্ধিই করা যায়, সমাজের প্রথার আবরণে মর্যাদার আসনে দেখা যায় না। তাহাতে কি হইয়াছে, মানুষের হাত কাটিলে বাঁচে, পা নষ্ট হইলেও চলা যায়, চক্ষু অন্ধ হইলেও হাতড়াইয়া

হাতড়াইয়া চলা যায় কিন্তু হাট কাটিয়া নিলে, উহা মরিয়া গেলে, উহার শিক্ষা গুলিয়া ফেলিলে আর কিছুই থাকে না। থাকে শুধু দেহ পূজা। এই দেহ পঁচিয়া দুর্বা হইবে, তাহা কে না জানে? তাই এই দেহ পূজা না করিলে কি ক্ষতি হইবে?

নারীত্বের বেদনার গভীরতা সমুদ্রের তলদেশের চেয়ে বেশি, নারীত্বের উদারতা আকাশের চেয়েও বিশাল, নারীত্বের স্পর্শকতারতা প্রকৃতির চেয়েও প্রখর, নারীত্বের কমনীয়তা ও লাভণ্যতা প্রস্ফুটিত ফুলদলের চেয়েও কমনীয়, উহা কখনও কখনও হৃদয়কেও ছাপিয়া যায়। পৃথিবী যখন উষ্ম হইয়া যায়, তৃষ্ণায় যখন প্রাণিকুল আহাজারী শুরু করে, নীল বেদনায় যখন সমগ্র অম্বর নীলাকার হইয়া, সমস্ত তিজতা একত্রীভূত হইয়া যখন সমুদ্রের বিশাল জলরাশি লবণাক্ত হইয়া যায় তখন দেহ হইয়া উঠে স্বর্গীয়, উহা আর মাটির দেহ থাকে না, উহাকে রক্ষা করার জন্য বাতাস ছুটিয়া আসে, শাদা মেঘ জমিয়া গাঢ় কালো রঙ ধারণ করিয়া নীল রঙ ছাপিয়া মুষলধারে রহমতের বৃষ্টি বরিতে থাকে, সুপেয় পানিতে সমতল ভূমি দয়ার্দ্র হয়, সিক্ত হয়। সবুজ শ্যামলিমায় পৃথিবী ভরিয়া যায়, মৃদু সমীরে পাতা লতা নাড়িয়া নাড়িয়া ফুল হইয়া উঠে, স্বর্গীয় সুখে শিখন্ডীর মত পেখম মেলিয়া নাচিতে থাকে, অরবিন্দের পাপড়ীতে মন আন্দোলিত করে রঙ বেরঙের দৃশ্য তৈরী করে, নিছক কাছে ডাকিয়া সোহাগে সোহাগে ভালবাসায় একাকার করে, উদ্ভিদকুল, প্রাণিকুল। উহা যেন স্বর্গের ছায়া! বিটপ হয় গর্ভবতী নাগরের গর্ভ সঞ্চারে, নুতন মুখে, নুতন বিটপে, পৃথিবী সয়লাব হয়ে যায়। ইহা চিরন্তন অমোঘ সত্য। এই সত্য অস্বীকার করিবে কে?

আঙ্গুরার মনে, যৌবন আকুতি জানায়, কেন অযথা আমায় কষ্ট দাও, কেন তুষের মত দহন করে করে পুড়িয়ে মারো, কেন জাগতিক অস্থিত্ব বিলুপ্তির ঘোষণা কর, কেন নির্দোষ আবেগ বুদ্ধিয়া যৌবন রসের বাঁধ উপচিয়া বারে, কেন অতুল অনুপম সৌন্দর্য বিশুদ্ধ কঠিন প্রলেপে ঢাকিয়া রাখ, আঙ্গুরা উহার জবাব দিতে পারে না, চরম অসহায়ত্বের

গভীর খাদে পড়িয়া পরম কবুণাময়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে উদ্ধারের আবেদন জানায় অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া। সমগ্র প্রকৃতি ভারী হইয়া উঠে। এই অশ্রুজলে পাষণ গলিয়া যাইবে নিঃসন্দেহে।

স্রষ্টার ভালবাসায় সিক্ত হইয়া ছানা যখন উর্ধ্বলোকে ক্রমাগত ছুটিতেছে তখন হঠাৎ পিছন দিক হইতে শুনিল, কান্নার শব্দ, চাহিয়া দেখিল তাহার আঙ্গুরা। সাধনার জোয়ারে যখন তাহার সিদ্ধির তরী দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন ছানা চাহিয়া দেখিল হাস্রের মুখে তাহার আঙ্গুরা। শাদা ধব্ধবে সাধুর পোশাকে যখন নির্জনে একাকী ছানা পথ অতিক্রম করিতেছে তখন পাগলিনী বেশে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল রোদনরতা আঙ্গুরা। গভীর রজনীতে তপস্যায় যখন ছানা ক্লান্ত তখন ছানা দেখিল কাটা মুরগীর মত এপাশ ওপাশ করিতেছে তাহার আঙ্গুরা। স্বপ্নের আবেশে করজোড় করিয়া ডাকিতেছে, হে প্রাণপতি, কোথা যাও, নিয়ে যাও সাথে; আমি যে নারী, আমার নিরাপত্তা দিবে কে, তুমি ছাড়া! তুমি যে পুরুষ, তোমার ছায়া ধরে স্রষ্টার আশীর্বাদ পাইব যে আমি, তুমি এসো, তোমার ইজ্জত গায়ে লাগাইয়া তবেই স্বর্গের ছাড়পত্র পাইব, না হইলে যে, শয়তান বুখিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে। তুমি পুড়িয়া পুড়িয়া খাটি সোনা হইয়াছ, তোমার ভিতরে পাপের খাদ নাই। উহা ছাই হইয়া গিয়াছে। আমার ভালবাসার চাদরে বসিয়া তুমি স্রষ্টার পূজা দিও, আমার নারী-সৌন্দর্যের আয়নায় তুমি স্বর্গের মুখ দেখিও, আমার ইজ্জতের নিরাপত্তায় পাশে থাকিয়া তুমি পৃথিবীর সৃষ্টিশীলতায় অবদান রাখিও। আর তাহা না হইলে, আমার মরা মুখ দেখিয়া পার যদি শান্ত থাকিও, তখন যেইরূপ সর্বৎসহার গভীরের তৈল, খনিজ যাহা ঘুমন্ত ছিল, ছিল নির্লিপ্ত তাহা বেদুইনের মত উপরে উঠাইয়া নারীর পৃথিবী আগুনে জ্বলাইয়া দিও। ঘরে বাইরে রাস্তা ঘাটে সর্বত্রই আগুন আর নরকের ছড়াছড়ি, তাহাই দেখিও, তাহাই দেখিও!

ছানা একদিন গভীর রাতে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিতে লাগিল একজন নারী এত বড়! একজন নারী কি পারে সমগ্র পৃথিবী বিষাদময়

করিতে! নিশ্চয়ই পারে, আর পারে বলিয়াই আজ সে আঙ্গুরার কাছে
অসহায় পাথরের মত। কিন্তু না! তাহাকে পাথর হইলে চলিবে
না, তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে, বিগলিত বরফের মত হইতে
হইবে। হইতে হইবে তাহাকে হৃদয়চারী। আঙ্গুরার চোখ তাহার চোখে
লাগাইয়া, আঙ্গুরার মন তাহার হৃদয়ে লটকাইয়া, আঙ্গুরার রূপের দ্বাণ
তাহার নাকে শুকাইয়া, আঙ্গুরার মাথার দিব্য তাহার বুদ্ধিতে
জড়াইয়া, আঙ্গুরার পায়ের আলতা তাহার শরীরের কুতুকুতু বানাইয়া,
আঙ্গুরার চুলের গোছা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া, আঙ্গুরার হাসি তাহার
অনুপ্রেরণা বানাইয়া ঢুকিতে হইবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পুণর্গঠন
করিতে হইবে এই সমাজ আর মানুষের চরিত্র। ছানা ভাবিতে লাগিল
তাহার ভজন-সাধন জীবনের বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। মনে হইতেছে
তাহার সাধনা বুঝি পূর্ণতা পাইয়াছে। তাই ছানা মনস্ত করিল অচিরেই
সমাজে ফিরিয়া যাইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

ছানা গুহার বাহিরে আসিয়া আপনাকে যেন আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। সে সেখানেই চাহিতেছে আর চোখ খুলিয়া দেখিতেছে সর্বদ্রই যেন ভালবাসাহীন মরু-উত্তাপ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে তবু তাহাকে সেখানে থাকিতে হইবে, মস্তিষ্ক-পরিচালিত মানুষগুলিকে হৃদয়-পরিচালিত করিতে হইবে, সমাজের বিবেক হইয়া, মানুষের বিবেক হইয়া শক্ত হাতে সমাজের স্টিয়ারিং ধরিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার পুরনো সেই আখড়ায় ফিরিয়া আসিল, যেখানে হাবা, ঘোড়া, হুঁদুর ও পাখি আছে। আসিয়া দেখিল তাহার হুঁদুর মরিয়া গিয়াছে, পাখি উড়িয়া গিয়াছে আর ঘোড়াটি বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দিন গুণিতেছে আর হাবা আখড়ার সেবক হইয়া মানুষের ফাই ফরমায়েশ খাটিয়া জীবন যাপন করিতেছে। হাবা প্রথম তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তাহার দাঁড়ি চুল একাকার, হাতের আর পায়ের নখ আগুলের সমান হইয়া গিয়াছে, পরিয়া আছে গোলপাতা যাহা সাধারণ মানুষ দেখিলে জংলী ভাবিবে। তাহাই হইয়াছে। ছেলে বুড়ো, যুবা যুবরা তাহাকে দেখিয়া বন মানুষ মানব সমাজে আসিয়াছে ভাবিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। দুষ্ট ছোকরারা তাহাকে ঢিল মারে, পাগল ভাবিয়া তাহাকে রক্তাক্ত করে জখম করে।

একদিন সে তাহার ঘোড়ার পাশে বসিয়া আছে এমন সময় কিছু দুষ্ট ছেলে আসিয়া ইট পাথর মারিয়া তাহাকে মারাত্মক জখম করিয়া ফেলিল। অর্ধমৃত অবস্থায় ঘোড়ায় হেলান দিয়া আছে, এমন সময় হাবা আসিয়া তাহাকে চিনিয়া ফেলিল, দীর্ঘ দিন অনাহারে থাকার ফলে তাহার শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না, চোখ মুখ নাক গর্তে পড়িয়া গিয়াছিল। ঘোড়া তাহার শরীর পাতিয়া দিয়া তাহাকে আরাম দিত। ছানা ঘোড়ার শরীর বালিশ বানাইয়া উহাতে হেলান দিয়া শুইয়া থাকিত। দুই একদিন উহা দেখিয়া হাবার মনে জাগিল ইনিই তাহার

ছানাভাই, দ্রুত কাছে আসিয়া চিনিয়া বুঝিয়া তাহাকে চুমু খাইতে লাগিল, তাহার পরনের কাপড় আনিয়া পরিধান করাইয়া দিল, ঔষধ পথ্য আনিয়া শরীরের জখম স্থানে লাগাইয়া দিল। ছানা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। নুতন ভাবে ভাবিতে লাগিল ইহাই সমাজ। ইহাতে নরকের উপাদানও আছে আবার স্বর্গের উপাদানও আছে। হাবা ছানাকে টানিয়া ধরিয়া তাহার ডেরায় নিয়া গেল। প্রথম প্রথম কিছু খাওয়াইতে চাহিলে তাহা ছানা খাইতো না এবং মুখ দিয়া ফিরিয়া আসিত। এইভাবে মাসাধিককাল পার হইলে কিছু শক্তি অর্জনের জন্য প্রতি রাতে এক লোকমা ছানা খাইত। হাবা তাহার নখ দাঁড়ি চুল কাটিয়া দিত। উত্তম পোশাক কিনিয়া আনিয়া দিত। একদিন ছানা হাবাকে বলিল, হাবা তুই দেখতো এই পোটলায় কি আছে? দেখিল, সেখানে ছানার শিক্ষা জীবনের যাবতীয় সনদ পত্র আছে।

ছানা ভাবিতে লাগিল তাহার ঘোড়া দুর্বল হইয়াছে, হাবার বয়স হইয়াছে, তাহার প্রিয়তমা আঙ্গুরা কোথায় আছে সে জানে না, যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে তবে তাহাকে আনিয়া সংসার করিতে হইবে। উহাতে সামান্য বিষয়ের দরকার। চাকুরী যোগাড় করিতে হইবে। ছানা পত্রিকা খুলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেখিতে লাগিল। একদিন ব্রাক কলেজে আবেদন জানাইয়া সেখানে শিক্ষককতার চাকুরী নিল। ঘোড়া হাবা সহ সেখানে চলিয়া গেল। চাকুরীতে যোগ দিয়া মাসের বেতন পাইয়া, ভাবিতে লাগিল তাহার মা বাবা নাই, আঙ্গুরার মা আছে তাহার হাতেই এই টাকা গুজিয়া দিবে। ছানা হাবা আর ঘোড়াকে কর্মস্থলের বাটিতে রাখিয়া তাহার চাচীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল দিনাজপুরে। সেখানে সে তাহার চাচীকে পাইল না বটে তবে ছোবান ও তাহার ছেলে মেয়েদের পাইল এবং যাহার পর নাই খুশি হইল। ছোবান বলিল, ‘ছানা এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? এখনই বা কোথায় আছ, কি কর ইত্যাদি ইত্যাদি।’ ছানা ছোবান কে সব খুলিয়া বলিল। দিন কয়েক দিনাজপুর থাকিয়া আঙ্গুরার ঠিকানায় আঙ্গুরার কর্মস্থলে আসিয়া পৌঁছিল ছানা। ছানা দেখিল তাহার আর আঙ্গুরার কর্মস্থলের দূরত্ব অতি অল্প, দুই

ক্রোশের বেশি হইবে না। দ্বিপ্রহরে ছানা আসিয়া পৌছিল আগুরার বাসায়। বাসার গেইটে নক করিয়া বাসায় ঢুকা মাত্রই আগুরা ছানাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। শুধু অবাক হইল বলিলে ভুল হইবে, অধিকতর আবেগে পাথর হইয়া গেল। ইশারায় কাছে ডাকিয়া বসাইল এবং তাহার মাকে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া আনিল। শশব্যস্ত হইয়া আগুরা কি করিবে না করিবে তাহার কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। আগুরা তাহার মায়ের নিকট ছানাকে বসাইয়া দিয়া কাজের মেয়েকে নাস্তা আনিতে বলিয়া নিজে চলিয়া গেল অন্দরমহলে। সেখানে দুই রাকাত শোকরানা নামাঝ পড়িয়া আল্লাহ তায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। ছোট্ট শিশুর মত অস্থির হইয়া নিজেকে জাহির করিতে চাহিল। মাঝখানে লজ্জার পাহাড় আসিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায় রাঙা হইয়া মাথা নিচু করিয়া উবু হইয়া বসিয়া রহিল। আগুরার মায়ের হাতে বেতনের টাকা দিয়া ছানা বলিল, ‘চাচী আমার মা জীবিত নাই। তিনি থাকিলে খুবই খুশী হইতেন। মির্জাপুরের একটি কলেজে আমার অধ্যাপনার চাকুরী হইয়াছে। এই আমার প্রথম মাসের বেতন, মায়ের অনুপস্থিতিতে আপনিই আমার মা, আপনি এই টাকা গ্রহণ করিয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করুন’ বলিয়া উঠিয়া গিয়া, তাহার চাচীকে কদমবুচি করিয়া দুই হাত একত্র করিয়া টাকার তোড়া তুলিয়া দিয়া ছানা কৃতার্থ হইল। আজকাল মা-চাচীর সহিত এমন আচরণ কয়জন করে ভাবিয়া ছানার চাচী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

ছানা-আগুরার অদৃশ্য মানসিক যোগাযোগ কেহই জানিল না, গোপন জিনিস গোপনই রহিয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগুরা ছানাকে জিজ্ঞাসা করিল না সে এখনও কুমার কি না আর ছানাও জিজ্ঞাসা করিল না আগুরা কুমারী কি না। দুইজনের চার চোখ একত্র করিয়া চোখের ভাষায় কথা कहিয়া বুঝিয়া নিল, কেহ অন্য কোথাও বিবাহ করেন নাই। উভয়ের আত্মা ক্ষণিকের জন্য যুগপৎভাবে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

ছানা ‘উঠি’ বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই আঙ্গুরা আসিয়া হাত ধরিয়া বসিল; বলিল, ‘না দুপুরে খাইয়া যাইবা, আরও থাক, বেড়াও।’ ইহা যে, অসম্ভব তাহা ছানা কি করিয়া আঙ্গুরাকে বুঝাইবে? নারী তাহার প্রেমিককে পাইলে লজ্জা ভুলিয়া যায়, হাজার মানুষের সামনে অন্ধের মত আকুতি জানাইতে থাকে। ইহাই তাহার প্রমাণ, লোক লজ্জা পিছনে ফেলিয়া, সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া, পর্বত সমান কঠিন হইয়া, দুর্দান্ত সাহসী হইয়া উঠে এই নারী। কারণ ইহা যে তাহার অস্তিত্ব। ছানা আবেগ রোধ করিয়া ততোধিক কঠিন হইয়া পুনরায় আসিবার আশ্বাস দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ছানা যে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিয়াছে তাহা গোপন রাখিয়া, নিজে গোপন থাকিয়া, সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল, মানুষের উপর, মানুষ ও পশু সমাজের উপর। সে যখন রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায় সেই রাস্তায় কোন ঝগড়া ঝাটি লাগিয়া গেলে তাহা মিটিয়া যায় অথবা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় ঝগড়াটে মানুষ। কোথাও মদের আসর বসিলে সেখান দিয়া ছানা গেলে মদের বোতল ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যায়। জুয়ার আসর বসিলে ছানার আগমন মাত্রই জয়াড়ীদের বুক ধড়ফর করে এবং দিকবিদিক ছুটিয়া যায় জয়াড়ীরা, ছানা যখন ক্লাশে ঢুকে ছাত্রদের পড়াইবার জন্য ছাত্ররা মনোযোগ এড়াইতে পারে না। সে কোন আপিসের নিকট দিয়া হাঁটিয়া গেলে ঘুষখোরের আত্মা কাঁপিতে থাকে অদৃশ্য ভয়ে। সুদখোর ও মদ্য ব্যবসায়ী তাহার নুরানী মোবারক চেহারা একবার দেখিলে অদৃশ্য তাড়নায় সুদ এবং মদের ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়। মজার বিষয় হইল, এত কিছু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তাহাকে কেহ চিনেও না, সন্দেহও করে না। সাদা মাটা দীনহীন চলাফেরা করে ছানা। নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া বিনা অস্ত্র এবং বিনা উপদেশে অন্যায় দূরীভূত করার এমন কৌশল ও ক্ষমতা ইহার আগে কেহই দেখে নাই।

আসলে আমল দিয়া ছানা নিজেকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাইয়াছে যে, তাহাকে চিৎকার করিয়া ধর্মের বাণী প্রচার করিতে হয়

না। শান-শওকত করিয়া বাড়ীঘর বানাইয়া নিজের দিকে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করিতে হয় না। ধর্মান্তার বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে হয় না। অথচ মানুষ তাহার দর্শন, ছোঁয়া আর চরিত্র গুণে, বিমোহিত বিমুগ্ধ এবং তাসির হইয়া যাইতেছে। পর্বতের গুহায় সে যে আমল করিত, নির্জনে যে ভাবে স্রষ্টার নিকট নিজেকে সঁপিয়া দিত, সমাজে আসিয়াও তাহার ব্যক্তি ক্রম নাই, কৃপণতা নাই, ঘাটতি নাই। আত্মশক্তি, আত্মদর্শন এবং নিজেকে জানার প্রাণান্তর চেষ্টা যে মানুষকে কত উঁচু মরতবায় পৌছাইতে পারে তাহার নজির এই ছানা।

ছানা একদিন এক বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইল। বাড়ীর লোকটি ছিল বদমায়েশ প্রকৃতির। সে ছানাকে থাকিতে দিল এক ছাড়পোকা অধ্যুষিত চৌকিতে। লোকটি মনে মনে মজা পাইল ছানাকে উহাতে থাকিতে দিয়া। ছানা চৌকিতে শুয়া মাত্রই সমস্ত ছাড়পোকা একত্র হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া চৌকি হইতে প্রস্থান করিল। যাহাতে বদমায়েশ লোকটি বুঝিতে না পারে সেই জন্যই ছাড়পোকাদের নির্দেশ দিয়া আবার চৌকিতে রাখিয়া ছানা পর দিন এই বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল। এই রকম বর্ণচোরা হইয়া যে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁহাকে চিনিবে কে? ছানার ধীর অথচ সুকৌশল কর্মতৎপরতার কারণেই গোটা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। একদিকে সে যেরূপ উত্তম শিক্ষক অন্যদিকে আলোকিত আত্মার অধিকারী। উভয়বিধ গুণে গুণাবিত ছানা কলেজের নিকটই একখন্ড জমি কিনিয়া তাহাতে চৌচালা একটা ঘর বাঁধিয়া হাবা ও তাহার ঘোড়া লইয়া বসবাস করে। আগুরা মাঝে মাঝে আসিয়া টিফিন বাটি করিয়া, ভাল রান্না নিয়া আসে, সারা বছর উপবাসধারী ছানা শেষ রাতে কিংবা সন্ধ্যায় প্রিয়তমা আগুরার দেওয়া খানার স্বাদ প্রায়শই গ্রহন করে। উভয়ের অন্তর্জগতে চলে নিষ্পাপ নিষ্কাম অভিসার।

আকাশে মেঘ আর তারায় যেমন লুকোচুরি খেলা চলে, আলো এবং ছায়ার মধ্যে যেমন গোপ্লাছুট খেলা চলে তেমনি ছানা-আগুরার আধ্যাত্মিক জগতের লুকোচুরি খেলা অহর্নিশ চলিয়াছে। আগুরার দৈব

টানে ছানা আজ সমাজের বাসিন্দা, উহা কম কিসে? কোন নারীর এমন গুণ আছে যে, বিস্কন্ধ মরুভূমিকে তাহার আত্মার জোরে অশ্রুদিয়া উর্বর ভূমিতে রূপান্তর করিয়া দেয়। উহা যেন স্রষ্টার অপূর্ব নেয়ামত। উহা ভোগ করা চলে না দেখিয়া শান্তি, উপলব্ধি করিয়া সুখ। পরশ পাথর পরশ পাথরকে আকর্ষণ করে না বিকর্ষণও করে না তবে একটির ছবি অপরটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আঙ্গুরা-ছানার লীলা রাধা কৃষ্ণের লীলা, শিরি ফরহাদের লীলা, লাইলী মজনুর লীলার প্রতিচ্ছবি বৈ কি!

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছোবানের স্ত্রী রাহেলা যেমন বুদ্ধিমতি তেমনি চটপটে। তাহার মধ্যে মানবিক গুণও নিতান্ত কম নাই। রাহেলা যে কোন সময় যে কোন মানুষের সাথে সহজে মিশিয়া যাইতে পারে, মনের কথা উদ্ধার করিতে পারে। ঘটকালিতেও সে ভীষণপটু। রাহেলা একদিন ছোবানকে প্রস্তাব করিল, ‘চল না আমরা একদিন নগরকান্দা পুরাতন বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসি।’ বহু দিন পরে নিজ বংশ বুনিয়াদের বাড়ীতে যাওয়ার এমন প্রস্তাব ছোবান ছাড়িল না। ৫ বছরের কাদের আর চার বছরের টুনটুনি বেড়াইতে যাওয়ার কথা শুনিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। ছোবান রাহেলা বসিয়া ঠিক করিল বাচ্চাদের গ্রীষ্মের স্কুল ছুটি ধরিয়া তাহারা আগামী জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথমার্ধে বেড়াইতে যাইবে। দিনক্ষণ ঘনিয়া আসিল। বাচ্চাদের উৎকর্ষার শেষ নাই। অবশেষে বাড়ীঘর অন্যের হাতে বুঝাইয়া দিয়া দিনক্ষণ ঠিক করিয়া নগরকান্দার দিকে রওনা করিল। রাহেলা তাহার শ্বশুরের পুরাতন বাড়ীতে এই প্রথম আসিয়াছে, নুতন বৌ দেখিবার জন্য পাড়ার সকল মহিলা জড়ো হইয়াছে। রাহেলার বাড়ী দিনাজপুরের পাইকগাছায়। রাহেলা বা তাহার মা বা ভাইবোনদেরকে এখানে আনাইয়া দেখানো হয় নাই সত্য, তদুপরি রাহেলা যে এত দ্রুত পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মিশিয়া যাইবে তাহাও কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। রাহেলা একদিন তাহার ছোট চাচীর নিকট গিয়া বসিল। দাওয়ায় বসিয়া গল্প গুজব করিতে করিতে একবার তাহাদের মেয়ে আঙ্গুরার বিয়ার কথা উঠিল। আঙ্গুরা যে কোন ছেলের সাথেই বিয়েতে রাজী হইতেছে না তাহার রহস্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেহই আর কিছু বলিতে পারিতেছে না। এক পর্যায়ে রাহেলার চাচী শ্বশুরী বলিয়া উঠিল রাহেলা, মা তোমার কি মনে হয়? উত্তরে রাহেলা গম্ভীর হইয়া বলিল, ‘মা আমার মনে হয়

আঙ্গুরার জীবনে কোন কিন্তু আছে। না হইলে এমন মেয়ে, শরীরে গতরে নাদুস নুদুস অথচ বিয়ে করিবে না তাহা কি হয়? ইহা হইতেও পারে না, হইতেও পারে, আমাদের ছেলে ছানা সে এখন বাজিতপুর কলেজের অধ্যাপক। তাহার সাথেই আঙ্গুরা ছোটবেলা হইতে চলিত ফিরিত। অবশেষে আঙ্গুরার বাবা তোমাদের দেশে চলিয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে আর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় নাই। তবে মাঝে মাঝে ছানা দিনাজপুরে ছুটিয়া যাইত। ছানার মা বাবা কেহই নাই। ছেলেটা জীবনের সাথে, যুদ্ধ করিয়া করিয়া খাইয়া না খাইয়া লেখাপড়া চালাইয়া গেছে। অবশেষে এম এসসি পাশ করিয়াছিল। বহুদিন যাবৎ জানি না কি কারণে নিখোঁজ ছিল। তাহার পর আবার শুনিতছি তাহার চাকুরী হইয়াছে। ছেলেটি তো ভালই। তোমার কি মনে হয় আমাদের ছানার সাথে আঙ্গুরার বিয়ে দিলে কেমন হইবে? শুনিয়া রাহেলা চোখ উল্টাইয়া দিয়া আনন্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে তো খুবই উত্তম, সোনায়ে সোহাগা হইবে। রাহেলার চাচী শ্বাশুড়ী রাহেলাকে বলিল, তুমিতো আঙ্গুরার ভাবী হও। তুমি বুঝাইয়া বলিলে আঙ্গুরা নিশ্চয়ই রাজী হইবে। আর ভাবীসাবকে যা বলিবার আমিই বলিব। কারণ ছানার মা মরিবার সময় ছানাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া মরিয়াছিল। ছানা হয়ত উহা জানে না। তাই আমার খবরও রাখে না। তবে ছানা খুবই ভাল ছেলে। সে প্রায়ই আসে এবং তাহার জমি জিরাত গাছ গাছালী ফল ফলাদি আমি ভোগ দখল করিয়া খাইতেছি, দেখিয়া রাখিতেছি। আঙ্গুরার মা সকলের বড়। আমাদের ভাবীসাব ছানা তাহাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করে। আমার ভাসুর ছিলেন খুবই নীতিমান পরহেজগার। তিনিও উপযুক্ত স্ত্রী পাইয়াছিলেন। ভাবীসাবের গুণের শেষ নাই। তুমি আঙ্গুরাকে রাজি করাও। আর আমি ভাবী সাহেবকে রাজী করাইয়া ছাড়িব। রাহেলা বলিল ছানা ভাইকে বাজি করাইবো কে? উত্তরে আঙ্গুরার চাচী শ্বাশুড়ী বলিয়া উঠিল, ‘এই ছোঁড়া আমার হাতের পয়দা, রাজি না হইলে কান মলিয়া দিব। আমি তাহারই পক্ষ হইয়া ভাবী সাবকে প্রস্তাব দিব’। কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

পরে যাহার ঘণ্ডে সে সে চলিয়া গেল। ছোবানরা দিন বিশেক বেড়াইয়া তাহাদের নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

একদিন রাতে খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে, ছেলে পুলেদের শুইতে দিয়া রাহেলায় তাহার স্বামী ছোবানকে বলিল ওগো শোন জয়গুন চাচীর সাথে কথা হইয়াছে আগুরার বিয়ার বিষয়ে। তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়াছেন আগুরার মতামত উদ্ধায়ের জন্য। চল একদিন বাজিতপুর যাই। অনেক দিন মায়ের সাথে ও দেখা হয় না বাচ্চারা দাদু দাদু বলিয়া কখনও টেপুড়ে বলে। ছোবান, রাহেলার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, আগুরার বরফ গলাইতে পারিবে কত ভাল ভাল ঘর আসিয়াছে সে মুখ খোলে নাই, আর তুমি পারিবে এই বিষয়ে কিছু করিতে? ছানা তো ভাল ছেলে সে জানি, কিন্তু আগুরা রাজি হইবে? ছোবানের সন্দেহ কাটিল না। রাহেলা বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? যাহা হোক তাহারা সিদ্ধান্ত নিল ভদ্রমাসে তালের পিঠা করিয়া একদিন বাজিতপুর যাইবে। এদিকে ছানা একদিন হাবাকে লইয়া আসিল তাহাদের ভিটি বাড়ীতে। আসিয়া বাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের মন না ভাগিয়া ভরিয়া গিয়াছে জমি জিরাত আবাদ হইতে ঘর দরোজা ঠিক ঠাক করিয়া তাহাতে জয়গুন চাচীর ছেলে বড় ছেলে, বউ লইয়া থাকিতেছে। ছানা হাবার মেহমানদারীর ঘাটতি হইল না। আসার সময় ছানার জয়গুন চাচী ছানার তাতে গোটা কয় নারিকেল কুমরা ও দুই বাটি সরিষার রাখা পোটনা বানাইয়া দিয়া দিল। ছানাও দাওয়াত দিয়া আসিল তাহার বাসায় যাওয়ার নিমিত্ত। ছানার জয়গুন চাচী আগুরার সাথে বিয়ার কথা ভাগিল না কেন না ছোঁড়া কি বলিতে যাইয়া কি বলিয়া বসে? ছানা ছোট বেলা হইতেই এক গুঁয়ে যাহা কয় তাহা করবে সত্যবাদী ছেলে। জয়গুন চাচী মনে মনে ভাবিল আগে আগুরার মায়ের অভিমত লইয়া তাহার পরে ছানাকে আসিয়া ধরলেই কাজ হইয়া যাইবে। রাহেলা তাহার হিসাব মত পাঁজি খুলিয়া দিন তারিখ ঠিক করিয়া আসিয়া পৌছিল আগুরার বাসায় ননদী বড় ডাক্তার গর্বে তাহার বুক ফুলিয়া যায়। তবে যদি কথা না শুনে তখন কি

হইবে? তিনি রাগ করিবেন না অধিকার খাটাইয়া জিদ ধরিবেন। তাহা বুঝিয়া উঠিতে পরিতোছেন না। যতই সময় গড়াইতেছে মত লওয়ার বিষয়ে ততই যেন তাহার অস্থিরতা বাড়িতেছে। কারণ আঙ্গুরার বিয়ের বিষয়টা ফোড়া হইয়া পাকিয়া গলিয়া এখন তকতকা ঘা হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বেশি এখন আর মুখ ফেলে না। সকালেই এই ভাবিয়া শান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, আঙ্গুরা আর বিবাহ করিবে না। রাহেলা আঙ্গুরা একদিন সন্ধ্যায় ছাদে বসিয়া চা খাইতে খাইতে গল্পগুজব করিতেছিল। হঠাৎ রাহেলা প্রসঙ্গ পালটাইয়া প্রশ্ন করিল আছা আঙ্গুরা ছানা ছেলেটি কি রকম প্রশ্ন শুনিয়া আঙ্গুরা আচমকা তথমত খাইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হর্ষোৎফুল্ল এই রকম একটি চাহনি রাহেলার দিকে আঙ্গুরা নিষ্ক্ষেপ করিল যে, আঙ্গুরার চোখের এই হাসি আর কখন ও রাহেলা দেখে নাই। আঙ্গুরা মুখে কিছু বলিল না কিন্তু চোখে যাহা বলিল, তাহাতে রাহেলার আর বুঝিবার বাকী রহিল না যে, আঙ্গুরা ছানাকে ভালবাসে অন্তরের গভীরতম স্থল থেকে। তাই আজ আর কথা না বাড়াইয়া দুইজনেই উঠিয়া পড়িল। আর একদিন দুইজনে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া একান্ত আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে আঙ্গুরার সম্মতি আদায় করিল রাহেলা। এদিকে একদিন জয়গুন চাচী আসিয়া উঠিল আঙ্গুরার বাসায়। তাহার বৃদ্ধা মাকে দেখিবার লাগিয়া সাথে নিয়া আসিয়াছিল গাভীর দুধ আর কাঠাল। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া মারিয়া আঙ্গুরার মাকে কাছে বসাইয়া মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা তুলিল। আঙ্গুরার মা এ বিষয়ে নিজের মতামত দিবেনা বলিয়া সাফ জানাইয়া দিল। জয়গুন চাচী বলিল ভাবী মার আঙ্গুরার মতামত আমি নিব। উহার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। তবে ছানার ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন। আঙ্গুরার মা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল ছানা খুবই ভাল ছেলে। তাহার সহিত আঙ্গুরার বিয়ে হইলে মন্দ হইবে না শুনিয়া জয়গুন ভাবি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আরও দুই কাপ চা খাইয়া পুরাতন স্মৃতি আওড়াইয়া তাহায়া গল্প গুজবে মাতিয়া উঠিল। দিন পাঁচেক আঙ্গুরার বাসায় থাকিয়া জয়গুন চাচী একবারে সে ছানার

বাসার দিকে পাড়ি জমাইল। ছানার বাসায় আসিয়া প্রথমেই ছানার
 সংসারের হাল হকিকত দেখিয়া জয়গুন চাচীর চোখ ছানাবড়া হইয়া
 গেল। মনে মনে ভাবিল মা বাবা হারা ছানার জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসা
 অতীব জরুরী। ফলে কাল বিলম্ব না করিয়া এলোমেলো সাংসারিক
 জিনিস পত্র গুছাইয়া সোজাসোজি ছানাকে বলিয়া বসিল ছানা তোমার
 বিবাহের পাত্রী জুটাইয়াছি অচিরেই তোমার বিবাহ হইবে। ছানা একটু
 তথমত খাইয়া অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া কি যেন বলিতে চাহিল তাহা
 আর বলিল না। শুধু তাহার চাচীর হুকুম শুনিলার অপেক্ষায় থাকিল।
 কে যে তাহার বিবাহের পাত্রী তাহা তাহার চাচীর মুখ থেকে শুনিলার
 জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। যত শিক্ষিত আর জ্ঞানীই হোক বয়োবৃদ্ধ
 মরুক্ষীদের নিকট স্নেহ সম্পর্কের ছোট কেউ যে শিশুর মত হইয়া যায়
 তাকাইয়া কোলে উঠিবার লাগি কাকুতি মিনতি জানায়, ছানার ক্ষেত্রেও
 সেই রূপ হইয়াছে। ছানা বুঝিয়া নিয়াছে সে যেহেতু তাহার চাচী
 আঙ্গুরার বাসা হইতে আগমন করিয়াছে তখন পাত্রী আর কেহ হইবে
 না আঙ্গুরা ছাড়া। জয়গুন চাচীও কম বুদ্ধিমান নহে। তিনি মুখ চাপিয়া
 রহিলেন। অপেক্ষার বাঁধনে বাঁধিয়া দুই দিন দুই রাত্রি অপেক্ষা
 করাইয়া অতঃপর ঘোষণা দিলেন তোমাকে আঙ্গুরার সাথে বাঁধিয়া
 দিব। না করো না যেন। ছানা চাচীর মুখে কথা কয়টি শুনিয়া যে মনে
 মনে লাফাইয়া পড়িল। তবু লজ্জাবশতঃ মুখে কিছুই কহিল না। জয়গুন
 ভাবী তাহার ভাণ্ডার পুত্রের নীরবতা সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া আপাততঃ
 চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, লজ্জার মোড়ক খুলিতে সময় লাগিবে।
 লাগুক তবু বাছা ধন, আমার মতেই রায় দিবে এই প্রত্যাশা আছে।
 ঠিক তাহাই হইল আরও দিন কয়েক পরে। ছানা সোজাসুজি তাহার
 কাকীমা কে জানাইয়া দিল, তাহার চাচীর মতেই তাহার মত। প্রকৃত
 পক্ষে সামাজিক কাষ্টমসকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না তেমনি তাহা
 মানিয়া ও নেওয়া যায় না। ছানা আঙ্গুরা ঘনিষ্ঠতা মনের মিল যদি জগৎ
 বাসী জানিত সমাজ জানিত তবে কবে যে তাহাতে ফাটল ধরাইয়া
 ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার করিয়া ফেলিত এই প্রথাবর পুত্র তাহা এক রকম

দিব্য করিয়া বলা যায়। তবু আনন্দের খাতিরে সকলের উপভোগের খাতিরে সকলের দোয়ার খাতিরে এইরূপ প্রথার কাছে আত্ম বলিদানে আপত্তি নাই যদি তাহা ধনাত্মক হয়। রাহেলা আর জয়গুন চাচী বসিয়া ছানা আঙ্গুরার বিবাহের দিন তারিখ ধার্য করিয়া ফেলিল। কুষ্টি দেখিয়া শুভ লগ্ন দেখিয়া ঠিক করিল যে, পৌষমাসের পনের তারিখ বর কনের বিবাহ লগ্ন হইবে। তাহার আগেই আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশি বন্ধুবর্গ সহকর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন মানুষকে দাওয়াত করিতে হইবে। বিবাহ আসরে সকলে আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলে বর কনের জীবন মধুময় হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জীবনের শেষক্রান্তি লগ্নে আসিয়া কে না ক্লান্ত হইয়া পড়ে? আর সেই ক্রান্তি লগ্নে যদি কেহ দেখে তাহার জাতি গোষ্ঠি কেহ সাথে নাই, সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে, বিছিন্ন হরিণের মত একাকী, সময় যাইতেছে তখন এই ক্লান্তি বিভীষিকায় রূপ নেয়। ছানার ঘোড়ার এই দশাই হইয়াছে। এখন পথে পথে হাঁটা যায় না। পথে আর দুর্বাঘাস, আর ধুলা উড়া নাই, দৌড়াইয়া পথ চলা যায় না, হাঁটিয়া ও পথ আগায় না। এক কথায় পথ আর পথ নাই। উহা হইয়াছে দেওদানবের পথ। ভুর্গভ হইতে গ্যাস আনিয়া আর আকাশ হইতে বজ্র আনিয়া এখন রাখা হইয়াছে মানুষের পায়ের নিচে আর মাথার উপরে। তারে তারে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় হাঁটিতে গেলে বিদ্যুতের তারের ভয়ে হাঁটা যায় না কখন জানি কোন তার খুলিয়া পড়িয়া জীবনাবসান ঘটায়, কখন জানি গাড়ীর গ্যাস বিস্ফোরিত হইয়া জীবন সাজ করিয়া দেয়। হাতি, ঘোড়া গাধা পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। কাহার উপরে উহার দোষ চাপানো হইবে তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। গাছ কাটিয়া ইটের ভাটা বানাইয়া যন্ত্র যন্ত্রাংশের কোম্পানি বানাইয়া পৃথিবীর সব নগর বন্দর পথ ঘাট বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। উহার যন্ত্রণার ভার কাহাকে দেওয়া হইবে। যেখানে প্রাণের পরিচয় বড়, যেখানে প্রাণে মনুষ্যত্বের দিকটি প্রবল, সেখানে আগুন দিয়া প্রাণ পুড়িয়া পৃথিবীকেই নরক বানাইয়াছে মানুষ। আর নরকে যাইতে হইবে না। এখানেই নরকের দেখা মিলিয়াছে। ভাললোকগুলি, কোথায় যাইবে, কি খাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সব কিছুর মধ্যেই বিজ্ঞান ঢুকিয়াছে, এমনকি আধ্যাত্মিকতাতেও, ইহা ভাবিতে অবাক লাগে, কেউ কেউ অন্তর্জগতের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানকে নিয়া আসে উহা যে সহজ সরল

উপলদ্ধিজাত বিশ্বাস নির্ভর প্রেমতত্ত্ব তাহা বিজ্ঞান দ্বারা কিভাবে প্রমাণ সম্ভব। আর এই প্রমাণবাজির জন্য আমরা এত পাগলপরা কেন? উহা বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না, সুর এখন নিষ্কাম প্রেমকে কাছে টানে না, উহা টানে যন্ত্রীদের যন্ত্রণায় গোটা শরীরকেই, শরীর প্রদর্শনের উন্মত্ত বিকার এখন মানুষকে নাচাইতেছে। নষ্টালজিয়ার ছত্রাকে এখন সভ্যতা সয়লাব, মনুষ্য জীবন এখন অস্থির চরকায় ঘুরিতেছে, উহার যেন কোন সত্তা নাই। অস্তিত্ব নাই। বেওকুপের মত জন্মিয়া, পাগলের মত থাকিয়া, নিছক হিংস্রজন্তুর মত দেহ ত্যাগ করা যেন জীবনাচার।

যতই ছানার বিবাহের দিন আগাইয়া আসিতেছে ততই ছানার ঘোড়ার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। এই ঘোড়া তাহার জন্মের সাথী, তাহার বাড়িয়া উঠার সাথী, পিতার মত নিজের পিঠে বসাইয়া নিজের পিঠ খাটাইয়া সুখের আহার যোগাইয়াছে, তাহার ধ্যান জ্ঞানের অংশীদার হইয়াছে। আজ সে চলিয়া যাইবে? জীবন মৃত্যুর অমোঘ খেলায় কেহ আগে ফেলিয়া আগেই পাততাড়ি গুটাইয়া মাঠত্যাগ করে, কেহ পরে, উহাতে কি আসে যায় কিন্তু ছানার ঘোড়ার বিয়োগের সাথে সাথে যে ছানার জীবন যাপনে অন্ধকারের ছায়া নামিয়া আসিবে উহা আর কেহ না বুঝিলেও ছানা যে বুঝিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্যাস-বিদ্যুৎ-পেট্রোলের সাথে তাহার কোন শত্রুতা নাই কিন্তু উহারা যে দাহ্য পদার্থ পুড়াইয়া মারে, পুড়িতে পুড়িতে সম্মুখে আগাইয়া যায় উহা তো সত্য। ছানা এই রকম পোড়ার মধ্যে নিজেকে জড়ায় নাই সে পুড়িয়াছে তাহার রিপূর ঘোড়ার সহায়তায়। আর গাড়ীর সহায়তায় পুড়িয়া যায় হৃদয়, বাঁচিয়া থাকে রিপু দেমাগ, গর্ব এক কথায় নরক রাজত্ব।

কেহ ছানাকে বলিবে আপনি তো মাস্কাতার আমলে চলিয়া গিয়াছেন, আপনি তো সভ্যতার ধ্বংস চান, আপনি জড়াজীর্ণতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সুরম্য-সুসজ্জিত বাসস্থান পরিহার করিতে চান আপনি মানুষকে দাবাইয়া রাখিয়া মাটির সাথে মিশাইয়া দিতে চান। উত্তরে বলা যায় না, তা চাওয়া যায় না তবে গায়ের সাবান গায়ে না লাগাইয়া

জুতায় লাগাইলে তাহা কি শোভা পায়? মানুষ হইয়াছি কি জন্য তাহা ভুলিয়া বস্তু হইবার জন্য কি মানুষকে সুপারিশ করা যায়? এক কথা বার বার বলিতে চাহি না, বলিতে চাহিতেছি যে, ঘোড়াও প্রাণি আমিও প্রাণি, আর এই প্রাণির প্রাণে প্রাণে সংযোগ থাকিতে হইবে। আর আমার বাড়তি জীবন তাগিদ হইতেছে স্রষ্টার সহিত সম্পর্ক স্থাপন। উহা ঘোড়ার নাই। কিন্তু প্রাণে প্রাণে সংযোগ না হইলে স্রষ্টার সহিত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয় তাহা কে না জানে? আর প্রাণে আগুনে সম্পর্ক স্থাপিত হইলে প্রাণ পুড়িয়া গিয়া অবশিষ্ট থাকে রিপূর গাড়ী দেমাগের গাড়ী। তাই ছানা ঘোড়াতত্ত্বে নিজেকে ডুবাইয়া ঘোড়াবিহীন কিতাবে যাতায়ত করিবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ছানার জীবনের মূল যুদ্ধ গুরু হইয়াছে। গুহায় যে শিক্ষা সে পাকাপোক্ত করিয়াছে আপন হৃদয়ে তাহা এখন টিকাইয়া রাখাই দুষ্কর। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি কয়জন জীবন যোদ্ধা বিজয়ী হইতে পারে? তাহার এমন কিছু আমল বা কাজ প্রদর্শিত হইবে যাহা, ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে হাস্যকর মনে হইবে। লোক মুখে তো নিন্দার ঝড় উঠিবে। অনেক সময় পাগল ঠাণ্ডারাইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে? উহা কত সহ্য করা যাইবে। এই সমাজে মানুষ কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশি। বিনা প্রয়োজনে চা স্টলে আড্ডা মারিয়া কখনও ধ্বংসাত্মক কাজে মনোনিবেশ করিয়া পরনিন্দা করিয়া নিজের তৈরী করা অনৈতিকতার ফাঁদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহুতি দেয় মানুষ। এই পৃথিবীই যেন হাশরের মাঠ। লক্ষ লক্ষ মানুষ স্রষ্টাকে ভুলিয়া অস্বীকার করিয়া শরীক করিয়া আত্মতৃপ্তি পাইতেছে, সাথে সাথে আবার আত্ম হননের অসংখ্য সূচত্র সজ্জিন শরীরের লুমকুপে বিধিতেছে, তাহার অস্থিরতাও ক্রমাগত বাড়িতেছে। উহা এমন যে, কেহ কেহ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাও করে। কখন যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করিয়া। নির্দোষ আনন্দ পৃথিবীতে নাই। আনন্দ উল্লাস যতটুকু আছে, যতটুকু তাহাতে মিশিয়া থাকার সুযোগ আছে তাহার সবটুকুই নরকের উপাদান। উহা আত্মস্থ করিয়া

আগাইতে থাকিলে, সমুহ বিপদে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলে, যাহা হইবার তাহাই হইবে। অর্থাৎ আত্মশাস্তির নরকা কুণ্ডে নিজেকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইবে। উহা দেখিয়া শুনিয়া ভুলিয়া পাগলের মত তাহা বরণ করিয়া নিজেকে নিরর্থক করার লোক ছানা নয়। তাই তাবৎসুখ আর আনন্দ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়া যন্ত্রের মত চলা হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া নৈমিত্তিক সাধন যোগ্য কাজগুলি করিয়া করিয়া নিজেকে দুর্ভাবনা মুক্ত রাখিয়া বিপুল উৎসাহে সময়ের অপাচ্য উপাদানগুলি হজম করিয়া চলিবার সাহস সে পোষণ করে। জয় হোক তাঁহার এই চেতনার।

ছানা জীবন যাপনে যে সঙ্গিনীর দরকার তাহা ছানা প্রয়োজন বোধ করে না করে তাহার প্রতিবেশি। ছানার ভাবনা জগতে যে সঙ্গিনী দরকার তাহা ছানা প্রয়োজন বোধ করে কিন্তু প্রতিবেশি করে না। এই ভাবনা সঙ্গিনীর মাধুর্য বিরহে বৃদ্ধি পায় শক্তিকৃত হইয়া ভালবাসা শতধা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সম্প্রসারিত হইয়া এক সময় মহাজাগতিক হইয়া এক সময় মহাজাগতিক রূপ নেয় তাহা কেহই বুঝে না, ছানা বুঝে। আজ যে ছানা সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা বিরহের ক্রন্দনে মহাজাগতিক ঐশ্বরিক স্বর্গীয় মোহে। উহাতো তাহার বিরহ বিচ্ছেদের কারণেই সম্ভব হইয়াছে। যাহাকে যে যত ভালবাসিবে সে তত কাছে থাকিলেও তত অচেনা মনে হইবে ততই সার্থক হইবে তাহার জীবন সিদ্ধি লাভে ততই সে সক্ষম হইবে। ছানার নিদর্যতার অন্তরালে সহৃদয়তার বীজ লুকাইয়া থাকে। একদিন ছানা দাওয়ায় বসিয়া আছে এমন সময় আগুরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আগুরাকে দেখিয়া ছানা আশ্চর্য হইল না কিন্তু শ্রদ্ধাবনত মস্তকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল বসো। আগুরা বসিয়া কী কহিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে না উঠিতেই ছানা সপ্রসন্ন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা তুমি তো আমাকে নির্জনতার আড়াল হইতে টানিয়া আনিয়া মানব সমাজে প্রবেশ করাইয়াছ। বল, তাহা কোন্ শক্তিতে। উত্তরে আগুরা সহাস্য বদনে বণিতা করিয়া কহিল, জানি না। আগুরার উত্তর দানের মধ্যেই, কমনীয়তা মোহময়তা ছলনা

ভালবাসার ছন্দময়তা বিদ্যমান ছিল। তাহার মুখে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাচনভঙ্গি এবং চোখের ভাষাতেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। আঙ্গুরাকে আবার ছানা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা তোমার হাতে কি এখন কিছু সময় আছে? উত্তরে আঙ্গুরা বলিল, নাই, উহাতেও ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণে কাছে টানিবার দুর্নিবার প্রয়াস। আবারও ছানা প্রশ্ন করিল, তোমার মধ্যে হায়া কি লুপ পাইয়াছে? যেখানে বিবাহের কথা চলিতেছে সেখানে লজ্জার মাথা খাইয়া সামনে আসিয়া বসিয়াছ? উত্তরে আঙ্গুরা বলিল, সাধক সাহেব! বীরত্ব ও সত্যের পরীক্ষায় ফেল করিবে, সাবধান হও। বলিয়াই চলিয়া যাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেই ছানা বাধা দিয়া বলিল, দেখো তুমি কিছু মনে করো না আমার কাছে, তত্ত্বগত কিছু খটকা লাগিয়া গেছে। তোমার সহায়তায় যদি তাহার সমাধান খুঁজিয়া পাই। আঙ্গুরা বলিল, কী। উত্তরে ছানা বলিল দুনিয়ার সব সন্ধ্যাসী কামকে ভয় পাইয়া নারীকে এড়াইয়া পথ চলিতে ভালবাসে উহা নাকি সিদ্ধি লাভের অন্তরায় তাহা কি ঠিক! উত্তরে আঙ্গুরা বলিল, না। ছানা আশ্চর্য হইয়া মেয়েটির সাহস দেখিয়া ততোধিক কৌতুহলা হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল কিভাবে উত্তরে আঙ্গুরা সহজ ভাবে জবাব দিল দেখো ছানা, পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যে প্রধান শক্তি আকর্ষণ আর এই আকর্ষণের গোড়ায় আছে নারী। উহাকে বাদ দিয়া সৃষ্টির আনুকূল্য পাওয়া অসম্ভব। আকর্ষণকে ভয় করিয়া দূরে সরিয়া গিয়া বিপদগামীই হইবে, সিদ্ধি লাভ হইবে না। যতই নারী কামের আকর্ষণ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে ততই প্রেম হইতে, সৃষ্টির ভালবাসা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ছিটকাইয়া পড়িবে নপুংসক হইয়া সোজা নরকে। উহা সহজ কথা। উহা বুঝিবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। ছানা আঙ্গুরার কথা শুনিয়া অতিশয় অবাক হইতে লাগিল বলিল বসলে কেন বলো আরও। আঙ্গুরা বলিয়া যাইতে লাগিল। “দেখো ছানা, আমি ডাক্তার। ডাক্তারের কাজ হলো মানুষের শরীর নিয়া উহার রোগ শোক যন্ত্রণা ব্যথা ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। যখন দেখি যে, কোন অবস্থাতে, রোগীর রোগমুক্ত হইতেছে না তখন বলি রোগী যাহা ভাল মনে, করে

যেভাবে স্বস্থি পায় তাহাই যেন করে। উহার কারণ কি জান? উত্তরে ছানা বলিল না জানি না। আগুরা সহজ ভাবে বলিল, শরীরের আকর্ষণ প্রতিক্রিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার সর্বশেষ কৌশল। স্বামীর কাছে স্ত্রী থাকিলে, বা স্ত্রীর কাছে স্বামী থাকিলে আর কোন ঔষধের প্রয়োজন পড়ে না। ঔষধে যতটা না শক্তি আছে তাহার চেয়ে বহুগুণ শক্তি রাখে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায়। নচেৎ একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মেয়ে লোক স্বামী বিদেশে অবস্থান করার দিন কয়েকের মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়ে কেন? শারীরিক আকর্ষণ ও ভালবাসা আদর ইত্যাদির অভাবে। মেডিকেল সাইন্সে আর কোন কারণই লিপিবদ্ধ নাই। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় আছে তাহা বলিয়াই আমি উঠিব, বিষয়টি হইতেছে এই যে, তুমিতো জান মানবাত্মার মধ্যে স্রষ্টার বসবাস। এই স্রষ্টার চতুর্দিকে রহিয়াছে কামের প্রাচীর। এই প্রাচীরকে ভেদ করিতে হইতে হইলে কামের বিকর্ষণ জাত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শরীরকে নিউট্রাল করিতে হয়। এই নিউট্রালের ফলে শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী স্রষ্টার নিকট অতিদ্রুত এবং সহজে পৌঁছা যায়। দেখো ছানা, আমি স্রষ্টার রাহে, কাঁদিয়া কটিয়া তাঁহার দয়া আদায় করিয়া তোমাকে সমূহ বিপদ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি তুমি নিউট্রাল হইবে বলিয়া, আমার কথা স্রষ্টা শুনিয়াছেন আর উহাকে তুমি তত্ত্বের খাদে ফালাইয়া দিয়া সিদ্ধি সাধনা হইতে দূরে সরিয়া যাইও না। মনে রাখিবে নারীদেহই মুক্তির পথ, মুক্তির সিঁড়ি উচ্চমার্গে পৌঁছিবার জন্য যথেষ্ট। যে সাধক উহাকে অন্তরায় ভাবে সে সাধক নয়, সাধক নামের কলংক, ছানা আগুরাকে থামাইয়া দিয়া দিয়া বলিল, এমন মন্থব্য করিলে! উত্তরে আগুরা বলিল, করিলাম, আমি তত্ত্ব, সত্য বুঝি না, আমি বুঝি আমার শরীর স্বর্গ, উহাকে স্রষ্টা এত ভালবাসেন যে উহা হইতে পৃথিবী সম্প্রসারণ করেন। নচেৎ দুনিয়া আগামী কিছু দিনের মধ্যে আপনা আপনি ধ্বংস হইয়া যাইবে। কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকিবে না। আর জানিয়া রাখ, আমার স্বর্গে তুমি মধুকর, ভোমরা। তোমার আনাগোনা ফিসফিসানি গুন গুনানি আমার শিরায় শিরায় বহাইয়া দেয় স্বর্গীয় সমীরণ, তাহাতে

আমি নিঃশ্বাস নেই, বাঁচিয়া থাকি। তোমার বুঝিবার জন্য আরো কিছু বলিতে হইবে? বলিয়া মুচকি হাসি দিয়া পতিদেবতার মত দৃশ্যমান করিয়া আঁচল দিয়া মাথা ঢাকিয়া পদধূলি লইয়া, কংকন ধ্বনি দিয়া রহস্যময় ধীর পদে হাঁটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল আঙ্গুরা, ছানা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আঙ্গুরা ছানার বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই যেন এই পরিবারের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিয়া যাইতে লাগিল। দিনাজপুর নগর কান্দা বাজিতপুরের রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের কেহ কোথাও যেন বসিয়া নাই। সবাই যাহার যাহার অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে লাগিল। কেহ দুলহার জন্য কেনা কাটা আর কেহ দুলহীর জন্য কেনা কাটায় শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। এমন কি হাবার মধ্যেও দেখা দিল প্রচণ্ড প্রাণের জোয়ার। সে কলাগাছ কাটিয়া রাখিয়াছে, গেইট বানাইবার সরঞ্জামাদি প্রস্তুত রাখিতেছে। কেহ দাওয়াত কার্ড ছাপাইতেছে, কেহবা ফন্দি ফিকির আঁটিতেছে কিভাবে কিভাবে, কাহাকে কাহাকে দাওয়াত করিলে কত বেশি উপহার মিলিবে। ১৫ই পৌষ দিনটি যেন, সকলের কাংখিত দিন। এই দিনের অপেক্ষায় পুরো পরিবার কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এক জায়গায়। কোথায় বিবাহ হইবে তাহা নিয়া। কেহ বলিতেছে ছানাদের পুরনো বাড়ী নগর কান্দায় কেহ বলিতেছে, দিনাজপুর হইতে আঙ্গুরাকে উঠাইয়া আনা হইবে। আবার কেহ কেহ মত দিতেছে না বাজিতপুরেই বিবাহ হইবে এবং যাবতীয় কার্যাদি এখানেই সমাধান করা হইবে। যাহা হোক ছানা এব্যাপারে কিছুই বলিতেছে না দশের মত বা খবরীদের মতে যেখানে ভাল হয় সেখানেই করা হোক বিবাহের আয়োজন। ইহাই তাহার মতামত। অবশেষে ঠিক করা হইল যে, ছানাদের বাড়ী নগরে বিবাহের আয়োজন করা হইবে। এবং ছানাদের ঘরেই বিবাহ বাসর সাজানো হইবে। আঙ্গুরাদের পুরাতন ভিটায় ঘর উঠাইয়া গ্রামের সকল মানুষকে দাওয়াত দিয়া ধূম ধামে সব ব্যবস্থা পাকা করা হইতেছে। উহা যেন বিবাহ না। পূজা পার্বণের কিংবা ঈদের আয়োজন। তাহাতে সকল শ্রেণীর মানুষের পরম আনন্দ।

এদিকে ছানার ঘোড়ার শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল। ঘোড়ার শরীরের মাঝে মাঝে ঘা হইয়া গিয়াছিল, উহা শুকাইয়া যাইতেছে। তাহাকে আনা হইল তাহার পুরনো ভিটা ছানার ঘরের পাশেই সেই পুরনো গোহালে। তাহার পূর্ব পরিচিত আস্তাকুঁড়ে যাইয়া ঘোড়া পূর্ব স্মৃতি রোমন্থন করিতে লাগিল। তাহার বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের হ্রেষা ডাক দিতে শুরু করিল। পুরনো ঘাস খাওয়া খাইয়া যে খানিক স্বাস্থ্যবান হইল। তাহার যেন আর কিছুই অভাব নাই। ছানাও একমাসের ছুটি নিয়া আসিয়াছে বাড়ীতে। তাহার জয়গুন চাচী তাহাকে হলুদ মাখাইয়া ধান দিয়া দুলহা সাজাইবার হুকুম দিতেছে তাহার বাড়ীর আর মেয়েদের। ছেলেদের জানাইয়া দিয়াছে কিভাবে কোন তরীকায় এই ঘর হইতে ঐঘরে বর কনের আনা নেওয়া করা হইবে। এ যেন মহাপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় দিন কয়েক হইল আসিয়া যোগ দিয়াছে রাহেলা। রাহেলা বলিয়াছিল দিনাজপুরে হইবে কেন বাসায় বিবাহ হইবে কেন। তাহাতে যে আনন্দ হইবে না। আর আগুরা ছানার বিয়ার আনন্দ না হইলে তাহা হইবে নিতান্ত অন্যায় গর্হিত কাজ। যাহার পর নাই তাহারা কষ্ট করিয়াছে জীবন গঠনের জন্য, তাহারা শুধু শুধু বিয়ের আনন্দ মাটি করিবে কেন! দূর গ্রাম হইতে বাঁশি আনা হইল বাজনা পাটি আনা হইল, ছামিয়ানা ডেকুরেশন কাজ হইল, মুরবী ডাকা হইল কি পদের রান্না হইবে তাহার তালিকা করা হইল। তিন দিন আগে হইতে সরগরম হইয়া গেল পরিবেশ, বাড়ীর দেউড়ী ভাঙ্গিয়া ঘর সাজাইয়া ময়দান করা করা হইল। পূর্বা বজন সম্পন্ন বয়স্ক লোক আনা হইল ছানার আনন্দ যেন আর ধরে না। এই ছানাকে এক দিন যাহারা ঘোড়াওয়ালা বলিয়া টিটকারী করিত, যাহারা তাহাকে দুইঠোঁট মারিয়া পড়া লেখার বারোটা বাজাইতে চাহিয়া ছিল তাহারাই আজ কোমর কাচিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কলের গান বানাইয়া ছোট ছোট শিশুদের সঙ সাজাইয়া আনন্দ স্তুতি করা হইতেছে। আগুরাকে তাহাদের ঘরে বধু বেশে সাজানো হইয়াছে। একশত গজ দূরে ছানার ঘরে ছানাকে বরবেশে সাজানো হইয়াছে।

হাবাকে মহিম বানানো হইয়াছে, ঘোড়াকে পালকী রূপে সাজানো হইয়াছে। রাজকুমাররূপে দুলহা সাজাইয়া পাগড়ীপরাইয়া ঘোড়ায় বসাইয়া ধীরে ধীরে বর যাত্রী লইয়া ঘোড়া চলিয়াছে আগুরার ঘরের দিকে। ঘোড়া হইতে নামাইয়া দুলহাকে বসানো হইয়াছে দুলহীর সাথে কাজী আসিয়াছে দেন মোহর লইয়া দরকষাকষি চলিতেছে, দেন মোহর ঠিক করা হইয়াছে এক লক্ষ এক লক্ষটাকায়, কাজীর কাজ শেষ হইয়াছে। গুরু হইল বিবাহ পড়ানো। তাহা সমাপ্ত হইলে আবার ঘোড়ায় চড়িয়া দুলহা দুলহী যেই মাত্র ছানার ঘরের সামনে ঘোড়ার আস্তাকুড়ে আসিয়া পৌঁছিল অমনি ঘোড়া বসিয়া পড়িল। ঘোড়ার দুই পা অবশ হইয়া গিয়াছে, শরীর শীতল হইয়া পড়িয়াছে চক্ষুদ্বয় দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। শেষবারের মত তাহার জাতীয় হেঁষা ডাক দিয়া অমনি মানুষের জবান খুলিয়া গেল, ঘোড়া বলিতে গুরু করিল, হে সাধক সাধিকা, তোমাদের একবার বহন করিয়াছিলাম একত্রে শিশুকালে, আর একবার বহন করিলাম, আত্মশুদ্ধিতার উচ্চমার্গে পৌঁছবার পর, এখনই আমার জীবনাবসান হইবে, দেখো আমার প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইতে যাইতেছে, খালিস্থানের হিরন্ময়ের বাড়ীতে একটি ঘোটক একটি ঘোটিকা আছে, তাহাদের নিয়া আস, যত্ন করে প্রতি পালন করো তাহাতে ঘোটক প্রজন্ম রক্ষা পাইবে, তোমাদের চড়াইয়া তাহারও ধন্য হইবে, আসসালামু আল বিদা বলিয়া মাটিতে মাথা হেলাইয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল ছানার ঘোড়াটি।

২/৫/২০১১, ষোলমারা, কোয়টিার, সদর কিশোরগঞ্জ।

সমাপ্ত

মণিকান্ধন যোগ

‘এই মেয়ডা কেডা রে, ফুটফুটে সুন্দর সাদা ফ্রক পরেছে, বেশ মানিয়েছে’, বারেক ভূইয়ার হঠাৎ প্রশ্নে সপ্রসন্ন মুখে উত্তর দিল মাসুম,
‘ওমা দাদা কী বোকা, তুমি ওকে চেনো না! ও তো পান্না, আমাদের বাসার পাশেই বাসা।’

‘তাই বুঝি! তা ওকে ডাকো গল্প করি। বললেন বারেক ভূইয়া।
মাসুম বলল, ‘ডাকছি। দাদা তুমি গল্প বলবে। বেশ মজা হবে।
তুমি গল্প বলবে পান্না আর আমি শুনব।’,

‘ঠিক আছে শুনবে, তা ওকে ডাকছ না কেন? সহাস্য বদনে বললেন তিনি। পান্না, এই পান্না, তোকে দাদা ডাকছে, এদিকে আয়।

জোরে চিৎকার দিল মাসুম। মাসুমের চিৎকারে সচকিত পান্না উঠোনের দিকে ফিরে তাকাল। মাসুমের বুড়ো দাদা আর মাসুম উঠোনে মাদুর পেতে বসেছেন। ডাক শুনে পান্না দৌড়ে এলো। গুটোসুটি হয়ে মাসুমের বসল। বারেক ভূইয়া বললেন, ‘মা তোমার নাম কী?’

পান্না জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, ‘পান-না।’
‘তা তোমরা ক’ ভাই-বোন?’

পান্না বলল, ‘আমরা এক বোন, এক ভাই। বললেন তিনি।

‘গল্প শুনবে দাদু ভাই? আগ্রহভরে জানালেন।

মাসুম বলল, ‘শুনব। দাদু গল্প বলবে তুমি শুনবে না পান্না?’

পান্না মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁসূচক জবাব দিল।

তবে শুনো এক ছিল দুর্দান্ত সাহসী লোক। নাম তার তৈয়বালী খলিফা। লোকটি খলিফার কাজ করত মানে দর্জির কাজ করত, মানুষের জামা-কাপড় বানাত। রোজই সে সাতসকালে খেয়েদেয়ে বাড়ি হতে বের হতো আর দর্জির কাজ শেষে অনেক রাত হলে বাড়ি ফিরত। একদিন দর্জির দোকানের কাজ শেষ করে যখন বাড়ি ফিরছে তখন মধ্যরাত। এক হাতে হারিকেন আর এক হাতে লাঠি। গভীর

নিস্তন্ধ রাত। কোথাও কোনো টু, সাড়াশব্দ নেই। একাকী এমন গভীর রাতে তৈয়বালী খলিফা পথে হেঁটে চলেছে। কিছু দূর যেতেই বিরাট মাঠ পড়ল, মাঠের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঠের মধ্যে ছিল বিল মানে খুড়। ইহা আসলে বড় খাদ। লোকে বলে খুড়। তৈয়বালী যখন “খুড়ের” ধারে এলো তখন দেখতে পেল বিরাট কালো ছায়ার মতো ভূত। এই ভূতের নাম “ছকস ভূত”। ভূতের দু’পায়ের পাতা ও আঙুল পেছনের দিকে মোড়া। সামনের দিকে আগুনের বড় বড় দুই চোখ, লম্বা লম্বা দাঁত, চুলগুলো খাঁড়া খাড়া রডের মতো। বিকট কিস্ততকিমাকার “ছকস ভূত” যখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল তখন কি অবস্থা তৈয়বালীর বলো দেখি।

পান্না আর মাসুম আরও আগ্রহ ও ভয়ানক চোখে তাকাল দাদু ভাইয়ের মুখের দিকে। দাদু ভাই বলতে লাগলেন, মজার ব্যাপার জানো কি, তৈয়বালী কিন্তু একটুও ভয় পেল না। সে তার লাঠি উঁচু করে বিসম্মিত বলে দিল একখান ঠাসা আঘাত। এক আঘাতেই “ছকস ভূত” ঘেউ ঘেউ করতে লাগল আর কশে কামড়ে দেবে আর নখ দিয়ে খামচে দেবে বলে এগুতে লাগল। তৈয়বালী কিন্তু তার লাঠির আঘাত করেই চলেছে। এক সময় আঘাতে আঘাতে লাঠি ভেঙে গেল। শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। ছকস ভূত আর তৈয়বালীর মল্লযুদ্ধ চলল সারারাত ধরে। যখন ফজরের আজানের ধ্বনি ভেসে এলো তখন ছকস ভূত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। ছকস ভূতের সাথে ধস্তাধস্তিতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত তৈয়বালী বাড়ি এসে ফজরের নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল। কেমন লাগল দাদু ভাই ভূতের গল্প? বারেক ভূইয়া মাসুম ও পান্নার পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন রাখলেন।

মাসুম ও পান্না সমস্বরে বলে উঠল, ভালো লাগল দাদু ভাই।

মাসুমের চোখে-মুখে আরও প্রশ্ন ফুটে উঠল। সে তার দাদু ভাইকে বলল, দাদু তৈয়বালী ভূতের সাথে কুস্তি লড়ল। তৈয়বালী নিশ্চয়ই বিরাট পাহলোয়ান। দেহে প্রচুর শক্তি, তাই না দাদু?

বারেক ভূইয়া বালকের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না দাদু সে আমার মতোই সাধারণ মানুষ।

মাসুম আরও কৌতূহলী হয়ে বলল, তবে কিভাবে শক্তিশালী ভূতের সাথে লড়ে ভূতের বারোটা বাজিয়ে দিল তৈয়বালী খলিফা?

বালকের প্রশ্ন শুনে বারেক ভূইয়া মনে মনে খুশি হলেন। ভাবলেন দাদু ভাই একদিন অনেক বড় হবে। কারণ ভূতের সাথে লড়ে পেরে ওঠা যায় শুধু আত্মিক শক্তির জোরে। কোনোভাবেই কায়িক শক্তি দিয়ে দেও দানবের সাথে কোনোদিন কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

তিনি খানিক নীরব থেকে বললেন, ‘দাদু অন্য দিন তোমাকে বলব তৈয়বালী কিভাবে ভূতের সাথে লড়ে জয়ী হলেন, মনের জোরে না দেহের জোরে।’

মাসুম আবার প্রশ্ন করার মওকা পেয়ে গেল। সে বলল, ‘মনের জোর কি দাদু?’

বারেক ভূইয়া এবার একরকম জোর করেই বললেন, চলো আজ উঠি, অন্য দিন বলব।’ পান্নাও বিদায় নিয়ে চলে গেল। মাসুম ও বারেক ভূইয়া ধীরে ধীরে ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করল।

প্রায় এক মাস গত হলো বারেক ভূইয়া জেলে জসিম ভূইয়ার বাসায় এসেছেন। স্ত্রীর অবস্থা ভালো নয়। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। আজ খাওয়ার টেবিলে সে কথাই উঠল। খেতে খেতে বাপ-বেটার কথা শুরু হলো। বারেক ভূইয়ার ছেলে তহশিলদার জসিম। তার বাবাকে বলল, এখন কি করা যায়। উত্তরবন্দেও জমিটা তো বিক্রি হলো। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা-পয়সাই মায়ের চিকিৎসায় নিঃশেষ হয়ে গেল, অথচ শরীরের কোনো উন্নতিই হলো না। দেশে আর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। মাদ্রাজে নিয়ে যাব। দেখা যাক বিদেশে নিশ্চয়ই ভালো চিকিৎসা হবে।

বারেক ভূইয়া বলল, কিন্তু বাপ মাদ্রাজে নিয়া গেলে প্রচুর টাকার দরকার হবে। এত টাকা পাব কোথায়?

জসিম বলল, বাবা আমি কল্যাণ তহবিলে কিছু টাকা জমিয়েছি। সেই টাকা আর পশ্চিমবন্দের এক পাখি জমি বিক্রি করে লাখ দুয়েক হবে, তা দিয়ে শেষ চেষ্টাটা করা যায় কি না ভেবে দেখো।

বারেক ভূইয়া খানিক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, দেখো বাবা যা ভালো মনে করো, বলে ধীরে ধীরে খাটে গা হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মায়ের চিকিৎসার জন্য শেষ পর্যন্ত পথেই নামতে হয় কিনা তা আল্লাহই ভালো জানেন। ভাবতে ভাবতে জসিম জামা-কাপড় পরিধান করে সাইকেলে চড়ে অফিসে চলে গেল।

জসিম ভূইয়ার স্ত্রীর নাম রীনা। শিক্ষিত মেয়ে। তাহার স্বাভাব চরিত্রও ভালো, মিশুক। পাশের বাসার মিসেস শেফালী বেগমের সাথে মিসেস রীনার খুবই ভাব। মিসেস শেফালীর স্বামী জসিম ভূইয়ার অধীনে একজন সহকারী তহশিলদার। তাদের বাড়ি ঢাকা জেলায়। দুই পরিবারের মধ্যে খুবই সুসম্পর্ক। পড়ন্ত বিকেলে মিসেস শেফালী বেগম মিসেস রীনাকে নিমন্তন করেছেন। বাসায় ফলার শেষে উভয়ে খোশগল্লে মেতে উঠেছেন। মিসেস রীনা বলে চলেছেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির নানা কথা। শীতের দিনে আখের রস জ্বাল করে রাব তৈরির কথা। শীতের পিঠা, আখের রস দিয়ে ক্ষীর বানিয়ে খেতে কত মজা ইত্যকার নানা বিষয়। শেফালী বেগমও কম যান কিসে, তার বাপের বাড়িতে শীতের পায়ের, ভাপা পিঠা, ভিজ়ে পিঠা, খেজুরের রস দিয়ে তৈরি নানা উপাদেয় পিঠে ও খাবার খেয়ে এসেছেন বাপের বাড়িতে গিয়ে।

সাংসারিক নানা বিষয়ে কথা চলেছে দু'জনের, এমন সময় এসে উপস্থিত পান্না। মায়ের আঁচলে গুজে বসেছে। রীনা পান্নাকে দেখে বললেন, কি গো পান্না মা মাসুম কোথায়? এত বেলা হলো সে তো তখন ও বাড়ি ফেরেনি।

পান্না বলল, খালাম্মা স্কুল ছুটির পর আমি দেখেছি স্কুলের মনির ভাইয়ের সাথে মাসুমকে বসে থাকতে। আমি বলেছি তাকে চলে আসতে, আসেনি। বলল, তুই চলে যা পান্না, আমি পরে আসছি। মাসুমের কথা শুনে আমি চলে এসেছি।

পান্নার কথা শুনে রীনার চোখে-মুখে সামান্য দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, ছেলেটা যে কী তা বুঝি নে। কোনো কথা শুনে না। এই যে কত বলছি স্কুল ছুটি হলে সোজা বাড়ি চলে আসবি, কে শুনে কার কথা। শেফালী আপা এখন যাই। দেখি ছেলেটি আসল কি না।

পান্নার মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই মাসুমের চিৎকার শুনা গেল। সে তার মাকে ডাকছে। এই যে, মাসুম আসলে বুঝি বলে মিসেস রীনা তার বাসার দিকে রওনা দিল। পান্নার মামার অর্থাৎ টিপু খানের বড়শি দিয়ে মাছ ধরার খুবই সখ। কাচারির সামনে আছে বিরাট একটি সরকারি দীঘি। পিঁপড়ের ডিম, আটা, চিনি, নিয়ে মাছের টোপ বানাতে টিপু খুবই ওস্তাদ। ভাগ্নীকে ডেকে বলল, পান্না এসো দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কাল ইয়ে বড় মাছ ধরে তবে ছাড়বে। কি রে পান্না কি জানি বলছিলে, কাল নাকি তোদের স্কুল বন্ধ।’

ভাগ্নী পান্না খুশিতে ডগমগ হয়ে হেসে বলল, ঠিক বলেছ মামা, সরস্বতী পূজার জন্য কাল স্কুল বন্ধ থাকবে। মামা তোমার সাথে সারাদিন বড়শিতে মাছ ধরব। কি মামা ঠিক আছে না?

টিপু খান বললেন ঠিক আছে, মানে কাল সারাদিন ধরে ইয়ে বড় বড় মাছ ধরব, দেখবে অনেক মজা হবে।

মামা মাসুমকে আমাদের সাথে আসার নেমন্তন্ন করব কী? বলল পান্না। ভাগ্নীর কথার জবাবে গদগদ হয়ে মামা বলল, করো করো, মাসুমও থাকবে।

একদিকে স্কুল বন্ধ অন্য দিকে বড়শিতে মাছ ধরার আনন্দ দুয়ে মিলে বালিকা পান্নার মনে আনন্দ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। বালিকা পান্না খিচে দৌড় দিয়ে একেবারে মাসুমের বাসায় উপস্থিত হয়ে মাসুমের নিকট সুসংবাদটি পৌঁছে দিল।

পরদিন সকালে ভোর হতেই প্রস্তুতি চলল কিভাবে চারা ফেলতে হবে। কিভাবে মাচাং হবে ইত্যাদি। টিপু মামার কৌশলী হাতে ইত্যাকার সমস্ত আয়োজনই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সুসম্পন্ন হলো। মাসুম ও পান্না দু’জনে পাশাপাশি বসে টিপু মামার মাছ ধরা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ মাছে এক ঠোঁকর দিল। কিন্তু ছিপ টান দেয়ার

আগেই মাছ কেটে পড়ল। ইতিমধ্যে টিপু মামার মাছ ধরার ঘোর কেটে গেল। মামার পান্না খাওয়ার অভ্যেস আছে। পানের বাটা কাছেই ছিল। খানিকটা পান মুখে উঠিয়ে ঠোট লাল করে পানিতে থুথু নিক্ষেপ করতে করতে বলল, ভাগ্নী তোরা বড়শি বাওয়ার গল্প জানিস?

মাসুম ও পান্না সম্বরে বলে উঠল, ‘জানি নে। মামা গল্পটি বলো না।’

ভাগ্নীর অনুরোধ কি রসিক মামা ফেলতে পারে? রসিক টিপু মামা শুরু করে দিল চণ্ডীদাস রজকিনীর উপাখ্যান। চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেম কাহিনী বলতে বলতে বেলা গড়িয়ে চলল, মামার বড়শিতে মাছ আর ধরে না। মামার সম্মোহনী গল্প বলার ভঙ্গি বালক-বালিকা মনে সে অমর প্রেম কাহিনী গেঁথে গেল। মামার সম্মোহনী গল্প বলার ভঙ্গি বালক-বালিকার মনের চাহিদাকে সুনিপুণভাবে ভরে দিল। সে-ই কখন নাওয়া খাওয়ার সময় শেষ হয়ে গেল তা কেউ টের পেল না। মাসুম পান্না কল্পনার চণ্ডীদাস রজকিনী সেজে যেন দীঘিতে বড়শি ফেলেছে। মাসুমের বড়শিতে ১২ বছর পার হয়ে গেল মাছে আর ঠোকর দেয় না। মাসুম যেন চণ্ডীদাস রজকিনী পান্নাকে দেখার জন্য বড়শির উসিলার রোজ রোজ দীঘির পাড়ে বসে মাছ ধরার অভিনয় করে। পান্নাও কল্পনায় মনের নকশিকাঁথায় একে ফেলল চণ্ডীদাসরূপী মাসুমকে। বালক-বালিকাকে এমনি ভাব বিহ্বল করে দিল টিপু, যার কোনো অন্ত নেই।

বিকেল গড়িয়ে এলে হঠাৎ একটি মাছ পাওয়া গেল। মাছ ডাঙ্গায় উঠালে মামা-ভাগ্নেরা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেম কাহিনীর দুর্নিবার আকর্ষণ উপস্থাপনা ও বাস্তবতার অনুপম মিল সেদিন চিরতরে প্রেমের বীজ বালক-বালিকার মনে উপ্ত হয়ে স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল বৈকি!

দ্বিতীয় অধ্যায়

জসিম ভূইয়া খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিশেষ করে ইতিহাস ও ইংরেজিতে তার দক্ষতা স্কুলের শিক্ষকদের মুখে মুখে ছিল। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক অবস্থা ও পারিপাশ্বিক পরিবেশ তাকে সে সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত করেছে। ম্যাট্রিকুলেশন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে তহশিলার পদে যোগ দিয়ে চাকরি করেছেন। ইতিহাস সচেতন এই ভদ্রলোক সরকারের চাকরি করলেও মনে মনে স্বাধীনচেতা। নিচুমার্গের কোনো বিষয়ই তার মধ্যে ছিল না। এই বাংলার শাসনের ইতিহাস, স্বশাসন ও স্বাধীনতা তার অবচেতন মনে কেবলই আছাড় খেয়ে পড়ত। এ দেশে জন্মে এ দেশ শাসনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ইতিহাস সৃষ্টি না করলেও কতিপয় দুঃসাহসী মানুষ বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছেন এবং কিছুকালের জন্য শাসনও করেছেন দরদি মন ও ন্যায়-নীতির চোখ নিয়ে। তারা ইতিহাসে স্থান লাভ করে আছেন। এই ক্ষণজন্ম পুরুষ যারা, তাঁদেরকে নতশিরে শ্রদ্ধা করার জন্য জসিম ভূইয়ার মন পাগলপারা হয়ে উঠত। তিনি প্রায়ই অফিসে কিংবা বৈকালিক আডডায় মুখে আওড়াতেন ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ থেকে নুশরাত শাহ পর্যন্ত শাসকগণ এ দেশের বিশেষ করে কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুরের মল্লযোদ্ধাখ্যাত ঈশা খাঁ, খুদিরাম, তিতুমীর, সিরাজউদ্দৌলা, শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী প্রমুখের নাম। সমসাময়িককালে মায়ের ভাষা রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জনকারী রফিক, শফিক, বরকত ও সালামের নাম। যে সময় থেকে এ দেশে মানুষ বসবাস করা শুরু করেছে সেই সময় থেকে অদ্যাবধি, কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা দীর্ঘকালের জন্য বসবাসকারী জনগণ ভোগ করেননি। বরং কেউ কেউ মাথা উঁচু করে স্বশাসন ও স্বাধীনতার জন্য দাঁড়িয়েছেন মাত্র। হাজার বছরের ইতিহাসে একজন ক্ষণজন্ম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য ইতিহাস। তিনি যেন রাজনৈতিক

কবি। দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করে উপহার দিয়েছেন স্বাধীনতা। তিনি বাংলার স্বাধীনতার স্থপতি। প্রত্যুৎপন্নমতি জসিম ভূঁইয়ার এহেন ব্যাখ্যা দানে অনেকেই উপহাস করেন। আবার অনেকেই স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য শ্রদ্ধা করেন। কাজ না থাকলে অফিসে সালাম খানের সহিত তার ইত্যাকার সকল আলোচনা হয়। সালাম খান এমন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন ও অনুরাগী। বদমাশ বেটা রাজস্ব পিয়ন নাছির। সে জ্ঞানগত কোনো আলোচনা আরম্ভ হতেই নাক সিটকায়। দরজার আড়ালে-আবডালে গিয়ে হাসে। অস্পষ্টস্বরে একাকী বলে ওঠে, 'এই শুরু অইল প্যাঁচাল।'

মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেক কসরত পোহাতে হয়েছে জসিম ভূঁইয়াকে। তিনি সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু যেই সেই। অযথা অর্থ ব্যয় হয়েছে। বড় বড় ডাক্তার চিকিৎসার কাজ সম্পন্ন করলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। ইদানীং একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কখন জানি কি হয় আল্লাহ মা'বুদ জানে।

সালাম খান জসিম ভূঁইয়ার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, স্যার আপনি একটু বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসুন। মনটা অনেকটা হালকা হবে।

জসিম ভূঁইয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। কিন্তু এখন কাজের প্রচণ্ড চাপ। রাজস্ব আদায়ের মৌসুম। সারা বছর আদায়ের কথা থাকলেও এই মৌসুমে আদায় ভালো হয়। দেখা যাক পরিস্থিতি বুঝে চিন্তা করা যাবে। জসিম ভূঁইয়ার মনে বাড়ি যাওয়ার চিন্তা যেমন তোলপাড় দিতে লাগল তেমনি হঠাৎ থেমে যাওয়া আলোচনাও তার মনকে নাড়া দিতে লাগল। তার কল্পনায় ভেসে উঠছে রাজনৈতিক চিত্র। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা, যুগপৎ আন্দোলনে আইয়ুবশাহী বেসামাল হয়ে পড়ল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তান সরকার। ৬৯ সালে

হলো গণঅভ্যুত্থান। সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সরকার পদত্যাগ করল। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেল। কিন্তু স্বশাসন আর ক্ষমতা পেল না। ৭ই মার্চ ৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা দিলেন। এমনি এক অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল দেশের আপামর জনসাধারণ। পরবর্তীকালে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলো। স্মৃতির পাতায় সবই ভেসে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে ছেলেটা বড় হলো। সে এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ভাগ্যের ঘূর্ণি চাকা কারোর বিপরীত দিকে গেলে, তা বুঝি আর যা হোক উল্টানো মুশকিল। না হলে জীবনের মধ্যখানে আসতে না আসতেই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষটি হারিয়ে গেল কেন। জসিম ভূঁইয়ার পরিবার চরম ক্ষতি করেছে যে বিষয়টি তা কিন্তু ঠিক আছে। মাঝখানে বাবা ওপারে চলে গেলেন। অসুস্থ মা ঠিক আছেন। তাকে দেখাশোনা করার আর কেউ নেই বাড়িতে। দু'হাতে টাকা-পয়সা ব্যয় করেও যখন কোনো লাভ হলো না তখন ভাগ্যে যা আছে তাই হবে॥ মুক্তিযুদ্ধেও সময় দেশ-বিদেশে ঘুরে সপক্ষে কাজ করে বেড়ানো স্থানীয় গণপরিষদ সদস্যের সাথে, স্বাধীন দেশে মাথা উচু করে বসবাস করার বিষয়ে যুদ্ধে মানুষকে দেয়া আশ্বাস এ সবই জীবনবাজি রেখে যুদ্ধের সাথে কাজ করার জন্য জসিম ভূঁইয়াকে ভাববিহীন করে তুলছে। যুদ্ধ যখন শেষ হলো নিজ এলাকায় তখন জসিম ভূঁইয়ার প্রতাপ অনেক বেশি। তার আর ইচ্ছে হলো না পরাধীন চাকরিতে ফিরে যাওয়ার। স্বাভাবিকভাবে যে যার কাজে যোগদান করলেও জসিম ভূঁইয়া আটকে গেলেন স্থানীয় গ্যাড়াকলে। গ্রামের বয়স্ক মুরব্বি জসিম ভূঁইয়াকে উৎসাহ যোগাতে লাগল কিভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা যায়। এর জন্য তার যা কিছু আছে সবই দিয়ে দেবেন। কোমর বেধে লেগে গেলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে। কিছু দিনি পর চিঠি এলো তাকে পূর্বেও চাকরিতে কাজে যোগদানের জন্য। আবার স্কুলের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার চাপ আসতে লাগল। আর

এক নতুন জীবনের ইঙ্গিত। বিষয়-সম্পত্তি, নিজ ধ্যান-ধারণা ইত্যাকার সব মিলে নিজ গ্রামেই বসবাস করতে হবে কি না কে জানে।

যুদ্ধোত্তর সরকারি চিঠি পেয়ে জসিম ভূইয়া কাজে যোগদান করলেন তার পুরোনো কর্মস্থলে অর্থাৎ সাহিদপুরে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেখা গেল ভিন্ন জায়গায় পুরোনো নথিপত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। কাচারির দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসেবে সমস্ত দায়ভার তার উপরই বর্তাল। যুদ্ধকালীন সময়ে জসিম ভূইয়ার বাড়ি পাক হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলে ব্যক্তিগত নথিপত্রও পুড়ে যায়। নতুনভাবে কাজ শুরু হলেও সন্দেহজনকভাবে কর্তৃপক্ষকে না বুঝানোর দায়ে তাকে অভিযুক্ত হতে হলো। বিরাট অংকের টাকা আত্মসাতের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হলেন। অবিলম্বে টাকা-পয়সা পরিশোধ করতে হবে নতুবা চাকরি হতে বরখাস্ত হবার হুমকি এলো।

মিসেস রীনা ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে একদিন এ বিষয়ে মিসেস শেফালীর সাথে আলাপ করেছিলেন। মিসেস শেফালীদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কিছু টাকা পয়সা ধার দেবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেন।

মিসেস রীনা ছেলের ভবিষ্যৎ ও সাংসারিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কথা বলার মধ্যে কেঁদে ফেললেন। মিসেস শেফালী বেগম রীনা বেগমকে বুঝাচ্ছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহপাক নিশ্চয়ই মুশকিল আছান করবেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ ধারণ করতে হয় আপা। ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে এ বিপদে কেটে যাবে।

মিসেস রীনা নিজেকে সংবরণ করে বললেন, দোয়া করো বোন আল্লাহ যেন এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে মিসেস রীনা বিদায় নিয়ে নিজ বাসায় চলে গেলেন।

মিসেস শেফালী বেগম রাতে স্বামীকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করতেই সালাম খান সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে খুলে বললেন। সালাম খান বললেন, আসলে তহশিলদার স্যার চক্রান্তের শিকার। ভদ্রলোক সাত-

পাঁচ বুঝে না। মহকুমার বড় কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই এ অভিযোগ থেকে জসিম স্যার রেহাই পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি তা করবেন না। স্যার তো খুবই স্বাধীনচেতা মানুষ। যা হোক, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

মা-বাবার এমন কথাবার্তা পড়ার টেবিলে বসে পান্না শুনছিল। সে এখন ক্লাস এইটে পড়ে। কোনো কথায় অংশগ্রহণ না করেও এ কথা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি যে, মাসুমের পরিবারে একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।

কিছুদিন পর একদিন পান্না ক্লাস রুমের এক কোণে মাসুমকে ডেকে বলল, মাসুম আজ বিকেলে বাগানে এসো, তোমার সাথে কিছু কথা বলব।

মাসুম পান্নার কথা শুনে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। মাসুম ছিল ক্লাসের ফাস্ট বয়। পান্না দ্বিতীয়। দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু মিলও কোনো অংশে কম ছিল না। দু'জনের মধ্যে শিশুকাল থেকে প্রগাঢ় ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। একজনকে আর একজন একদিন না দেখে থাকতে পারত না। কোনো একটা ছুঁতা ধরে অবশ্যই একজন আর একজনের সাথে সাক্ষাৎ করত। বিশেষ করে ক্লাসের পড়া নিয়ে দু'জন প্রতিদিন একসাথে হতো আর চোখের ইশারায় মনের ভাব ব্যক্ত করত। সোজাসামন্ত মাসুম ভাবতে থাকল পান্না এমন করে কেন তাকে বলল যে, বাগানে কথা বলবে।

এমন কি বিষয় আছে যে বাগানে বলতে হবে।

যাক সারাদিন কোনোরকমভাবে কাটিয়ে বিকেলে দু'জন বাগানে একত্রিত হলো। একটা নীরব জায়গা বেছে নিয়ে পাশাপাশি দু'জন বসল। পান্নার হাতে একটা লাল গোলাপ। পান্না হুঁচড়ে পাকার মতো মাসুমকে বলল, মাসুম ইদানীং তোমাকে অনেক মনমরা দেখাচ্ছে কেন?

মাসুম বলল, কই না তো! মন খারাপ থাকবে কেন? কেন কি হয়েছে?

পান্না স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কি যে হয়েছে তা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মাসুমদের পরিবারে হতাশার কালো মেঘ জমে উঠেছে। অভাব-অনটন ক্রমেই গ্রাস করছে। মাসুমের চাঞ্চল্যকে, হাসি আনন্দকে দামিয়ে দিয়েছে অনেকখানি, তা ক' মাস আগের মাসুম আর আজকের মাসুমকে দেখে পরিষ্কার বুঝা যায়।

মাসুম পান্নাকে সোজা বলে বসল, কেন তুমি বাগানে আমাকে ডাকলে তা কিন্তু এখনও বলোনি।

পান্না একটু হেসে জবাব দিল, বা রে এ কথা কি মুখে বলা যায়। তুমি আমার চোখ দেখো, চোখের ভাষাতেই বুঝতে পারবে।

মাসুম কাঠকোটীর মতো বলল, কি বললে হে, চোখের ভাষা কি? আমি তো চোখের সাথে কোনোদিন কথা বলিনি।

পান্না মওকা পেয়ে গেল। মুখে হাসির রেখা টেনে গোলাপটি ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, তা এখন থেকে বলো।

মাসুম বলল, যা পারি নে তা করতে বলছ কেন?

পান্না মেয়ে মানুষ। ছলচাতুরী মেয়েদের সহজাত গুণ। তাই দিয়ে মাসুমকে ঘায়েল করল। বলল, 'বা রে, কি বোকা তুমি।'

মাসুমকে পান্না গ্রীবা বাঁকা করে তির্যক চোখে বোকা বলায় মাসুমের বুকে কি যেন একটা হয়ে গেল। তাৎক্ষণিক বুকের ঝড়েও মাসুম বিধ্বস্ত হলো। তার পৌরুষ জাগ্রত হয়ে উঠল। এবার পান্নার চোখে চোখ রাখতেই পান্নার চোখের ভাষা মাসুম অনায়াসেই বুঝতে পারল। পড়ন্ত বিকেলে কিশোর কিশোরীর এহেন ভালবাসার বোঝাপড়া প্রকৃতিকে ক্ষণিকের জন্য নিস্তদ্ধ করে দিয়েছিল। মাসুম পান্না পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে আবিষ্কার করতে চাচ্ছে। আর কোথায় যেন বাধা পেকে যাচ্ছে। একে অপরকে হারাচ্ছে আবার ফিরে পাচ্ছে। অন্তরঙ্গ, নিস্তদ্ধ এই মুহূর্তগুলি ফুরাচ্ছে না আর কোনোদিনও ফুরাবে না। মাসুম পান্নার চোখে চোখ পড়াতে দু'জনের দেহ শিহরিত হলো,

রোমাঞ্চিত হলো। কেউ যেন কাউকে চিনতে পারছে না। আবার কত জনমের আপন এ-ও বুঝতে পারছে না।

প্রকৃতির নিয়মে উভয়ের নিষ্ঠুরতা ভঙ্গ করে পান্না বলল, ‘এখন অমন করে কি দেখছ। তুমি না বললে তুমি চোখের ভাষা বোঝ না?’ তা দেখছি মশায় এখন তো আর চোখ ঘোরাতেই পারছ না আজ আর নয়, সন্ধ্যা হয়ে এলো মা ডাকছেন। আগামীকাল এমনি সময়ে দেখা হবে এখানেই, বলে পান্না সোজা বাসার দিকে ফুল হাতেই ছুটে গেল।

চোখ দিয়ে বুকে ভালোবাসার শেল মেরে ছুটে যাওয়া পান্নার দিকে বিহ্বলের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকা মাসুম ধীরে ধীরে তার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। সে রাতে আর মাসুমের পড়া হয়নি, স্বপ্ন বোনা হয়েছিল। আবোলতাবোল রঙিন স্বপ্ন। পড়তে বসলে সামনে এসে দাঁড়ায় পান্না, ঘুমালে স্বপ্নে দাঁড়ায় পান্না। পান্না, পান্নাই যেন স-ব।

আচমকা পিতার মৃত্যুতে শোকবিহ্বল জসিম ভূইয়া একের পর এক বিপদ মোকাবেলা করেই চলেছে। বারেক ভূইয়া যত দিন জীবিত ছিলেন জসিম ভূইয়ার কোনো ব্যাপারে কোনোরকম চিন্তাই করতে হয়নি। দিব্য স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়নি। আজকাল যেন চোখে-মুখে সরষে ফুল দেখছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সময় কাটাচ্ছেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া জসিম ভূইয়া দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে নিজ হাতে গড়া স্কুলের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে চাকরির খারাপ অবস্থা, তা শুছাতে কত সময় লাগবে। এখন তিনি কোন্ দিকে যাবেন। ছেলের ভবিষ্যৎইবা কি হবে? ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্ন নিত্যদিন তাকে ব্যাতিব্যস্ত করে রাখল।

একদিন জসিম ভূইয়া অফিসে বসে আছেন এমন সময় ডাকপিয়ন এক চিঠি তার হাতে এনে দিল। চিঠি খুলে দেখলেন হানিফ মাস্টার অনেক অনুরোধ করে তাকে লিখেছেন একবার গ্রামে আসার জন্য, স্কুলের বিষয়ে তার সাহায্যের দরকার। নতুন স্কুল, তিনি চাকরিস্থলে চলে আসাতে এখন তিনি একা, আর কুলাতে পারছেন না। এলাকার লোকজনকে বললে রীতিমত স্কুল চলবে। প্রচুর ছাত্র হবে,

মানুষ তাই জসিম ভূইয়ার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আরও কত কি লিখেছেন হানিফ মাস্টার। তাৎক্ষণিকভাবে এলাকার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। স্কুল বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করলেন মনে মনে। মুক্তিযুদ্ধের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক হিসেবে প্রশাসনের বড় কর্তা তাকে মূল্যায়ন না করলেও দরিদ্র, অবহেলিত, অশিক্ষিত, পাড়াগাঁয়ের জনসাধারণ তাকে স্মরণ করে তাকে মূল্যায়ন করে। ভেবে তিনি গর্ব অনুভব করলেন।

আজ তার মনে একটু হাসি খুশি ভাব দেখা গেল। অফিসের সকলেই আশ্চর্য হলো। জসিম স্যারকে আজকে মেলা আনন্দিত দেখাচ্ছে কারণ কি? এ-ও'র মুখের দিকে চাওয়া চাওয়া শুরু করে দিল।

জসিম ভূইয়া অফিসের সকলকে ডেকে মহাআনন্দে বারবার পড়তে লাগলেন চিঠিটি। নাছির পিয়াদাকে বলেন, স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে। তিনি বললেন, বলছিলাম না সালাম সাব বড় কর্তা আমাকে না বুঝালেও পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত জনগণ ঠিকই আমাকে মূল্যায়ন করবে। এই দেখুন আমি ভুল বলিনি। আমার কদর আছে। হ্যাঁ আমার কদর আছে।

সালাম খান জসিম ভূইয়ার মনের অবস্থা বুঝে শুধু জী জী করতে লাগলেন। ভালো-মন্দ কিছুই মন্তব্য করলেন না। তেল তোষামোদ যার অভ্যাসে নেই তাকে চাকরির ধারাবাহিকতার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েও রক্ষা করা যায় না। শুধু সমবেদনা জানানো চলে। সালাম খান জানেন কিছুদিনের মধ্যেই বড় কর্তার রিপোর্টে জসিম ভূইয়ার তহশিলদার পদ হতে বরখাস্তের সমন এসে হাজির হবে। তা একরকম নিশ্চিত করে বলা যায়। অথচ তাকে বুঝানো গেল না, মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে উচ্চবিত্ত তথা উপরওয়ালাদেও মনের মতো হয়ে চলা। নচেৎ এক ধাক্কায় তারা ফেলে দেবে নিচতলায়। সে অবস্থা হতে উঠে আসতে আবার কয় পুরুষ লাগবে তা কে জানে। ইচ্ছেমত তাদের

অপরাধ তারা চেপে যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের ঘাড়ের ওপর পা রেখে আয়েশী
জীবনযাপন করছে।

যাক, জসিম সাহেবের মুখ নিজ থেকেই আন্তে আন্তে নিষ্প্রভ
হয়ে আসছে। অফিসে তার ভবিষ্যতের কথা মনে করে। অফিস ছুটির
সময় তিনি সযতনে চিঠিখানি বুক পকেটে করে ছাতা, ব্যাগ নিয়ে
বাসার দিকে নীরবে চলে গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মাসুম যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন ঘটে তার জীবনে কিছু ঘটনা, যা তাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। মাসুমদের স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মুনীর ছিল সুসাহিত্যিক। তার রচিত নাটক ‘কয়লা ধুলে ময়লা যায় না’ স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন হলে মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকটি সকলের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। মাসুম মুনীরের সাহচর্য পেতে চায়। মুনীরও মাসুমকে কাছে টেনে নেয় এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করে। মাসুম কৌতুহলী মনে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বুঝতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে সাহিত্যরসিক বনে যায়। বাংলার শিক্ষক মি. শাহাব উদ্দিন মাসুমকে ভালো ছাত্র হিসাবে আদর করতেন। তার শিক্ষক মহোদয়ের কাছ থেকেও অনুপ্রেরণা লাভ করেছে মাসুম কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ে। বাসায় বাবার কাছ থেকে লাভ করেছে উচ্চ শিক্ষার অনুপ্রেরণা। যে উচ্চ শিক্ষা তার বাবা জসিম ভূইয়া লাভ করতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করতেন এবং তার ঔরজাত ছেলের মধ্যে তাই দেখতে চেয়েছিলেন যার ফল হয়েছে এই যে, তিনি নিয়মিত মাসুমকে পড়ালেখার তাগিদ তো দিতেনই বরং কাছে বসে থেকে কচি মনে বিজ্ঞানী হবার কিংবা উঁচু দরের সাহিত্যিক হবার এমনকি সরকারের উঁচু পদে চাকরি করার প্রয়োজনীয় মেধা-পরিশ্রম ইত্যাদি বিষয়ে মাসুমকে বলতেন। মাসুম মনের মণিকোটায় তা ঐকে নিত। শীতের সকালে উঠানে রৌদ্র পোহাতে বসে মাসুমকে বলতেন ভালো স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তি সুপণ্ডিত বরেণ্য মানুষের কথা বলে যেতেন মাসুমকে লক্ষ্য করে আর মাসুম তা শুনে শুনে উদ্ধুদ্ধ হতো, কল্পনা জগৎ সমৃদ্ধ করত। ওই বয়সেই মাসুম পড়ে ফেলেছিল পিতৃদত্ত, রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রাঙ্গদাসহ অনেক পরিণত কাব্যগ্রন্থ। মনিরও দিয়েছিল আকবর হোসেনের অবাঞ্ছিত শরণ বাবুর অনেক উপন্যাস, কাজী নজরুলের

সঞ্চয়িতা ইত্যাদি। আউট বই আন্তে আন্তে মাসুম পড়ার জন্য নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

স্কুলের পড়ালেখায়ও মাসুম কম যায় কিসে? স্কুলের শিক্ষকগণের সহিত ভালো সম্পর্ক থাকলে, একবার ভালো ছাত্র বনে গেলে আর কে হটায়। মাসুমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। সে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ছাড়াও প্রতিদিন তার বাড়ির কাজ সঠিকভাবে শিখে পরদিন সবার আগে ক্লাসে পাঠ বলে দিত, বিশেষ করে ইংরেজি ট্রান্সলেশন, অংক, বাংলা অর্থাৎ কোনো বিষয়েই সে দুর্বল ছিল না।

একদিন তো ইংরেজি শিক্ষক ভালো করে পড়া না পড়ার কারণে বললেন, হাত পাত, পাত। বলে হাতের পাতায় পটাপট কঞ্চির কয়েকটি আঘাত লাগিয়ে দিলেন। কান্নায় লজ্জায় সেদিন পান্নাসহ ক্লাসের সকলের সামনে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল মাসুমের। তারপর থেকে আর কোনোদিন এ রকম কাজ মাসুম করেনি। মাসুম রাগী, বড়ই একগুঁয়ে। একটা বিষয়ে ক্ষেপে গেলে আশেপাশে কে আছে কি আছে তা বুঝবে না। ও কাজটা সে করেই ফেলবে, নইলে সাপ্তাহিক সভায় বাদলের ঘাড় মটকে দিল কিভাবে। যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হেঁচ পড়ে গিয়েছিল। বাদল তো কাঁদতে শুরু কওে দিয়ে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে উঠল, মাগো, মেরে ফেলল রে। তার পর দে ছুট্। এক দৌড়ে বইপত্র হাতে, লয়ে সোজা বাসায়। তারপর অপরাধীর মতো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক থেকে বাগানে নিশ্চুপ বসে আছে এমন সময় পান্না গোয়েন্দা পুলিশের মতো সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে মাসুমের নিকট পরিবেশন করল, অন্যান্য ছাত্রদের মতামত, শিক্ষকদের মতামত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাতে বাদলকে মারার জন্য বড় ধরনের কোনো শাস্তি মাসুমের হবে তা মনে হয় না। তবে হেড মাস্টার সাহেব যদি শুনেন বা বিচার সে পর্যন্ত যায় তবে রক্ষে নেই। মাসুমের অঘটনে পীড়িত হয় পান্না, আর মাসুম সহানুভূতি ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পান্নার ওপর।

যাক তখন বুধবার, জুন মাস হবে, হেড মাস্টার সাহেব অষ্টম শ্রেণীর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় রোল নম্বরধারী ছাত্রছাত্রীদের ডেকে পাঠালেন। দফতরি এসে বলে গেল, বিষয় কি। ভয়মিশ্রিত উদ্বেগ নিয়ে মাসুম, পান্না ও রহিম তিন জনই হেড মাস্টারের রুমে উপস্থিত হলো।

হেড মাস্টার সাহেব একটা ভূমিকা করে তিন জনকেই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন। ক্লাসে এসে মাসুম ভাবতে লাগল আর মাত্র ৫ মাস। পাঁচ মাসেই স্কলারশিপ পরীক্ষায় ভালো করতে হবে।

সে সময় পড়তে পড়তে মাসুমের এমন অবস্থা হয়েছিল যে চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মাসুম ও পান্না এরা দু'জনেই বৃত্তি পেয়েছিল। সে বছর অত্যন্ত মেধাবী কৃতি ছাত্র মাসুম ও পান্নাকে ধর্মপাশা স্কুল থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। স্কুলের ইতিহাসে এটাই প্রথম রেকর্ড। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পান্না সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল। পল্লীগীতি গেয়েছিল। পান্নার কণ্ঠ যে এত সুন্দর তা কিন্তু কেউ জানত না। মাসুম তো না ই। স্কুলের গেম টিচার এক ঘণ্টার রেওয়াজ করিয়ে দেয়ায় ঠিকই সুন্দর গেয়েছে, 'কদম্ব তলে বংশী বাজায় কে, আমার মাথার বেণী খুইলা দেব, তারে আইনা দে'। মাসুম স্বলিখিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে দু'টি কথা বলেছে। কৃতি ছাত্রদ্বয়কে পুরস্কৃত করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

আনন্দে উদ্বেলিত মাসুম পান্না অনুষ্ঠান শেষে নির্জনে একত্রিত হলো। পাশাপাশি বসে কিছু সময় কাটাল। আজ যে কি আনন্দ লাগছে তা কেউ ভাষায় বুঝাতে পারবে না। সত্যিই পরিশ্রম করলে তার ফল মেলে। হঠাৎ পান্না প্রশ্ন করে বসল, মাসুম আমি যদি হারিয়ে যাই তবে তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে?

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মাসুমের মনেও এই একই কথা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাসুম বলে উঠল, কি বললে হে পান্না, আমিও তো তাই

ভাবছিলাম। তোমাকে বলতে চাচ্ছি এর মধ্যেই তুমি বলে ফেললে।
মাসুম বলল, তা তোমার কি মনে হয়?

পান্না শুধু চেয়ে থাকল চোখ টানা টানা করে আকুতি নিয়ে।
মাসুম পান্নার হাতে হাত রেখে পণ্ডিতের মতো বিগলিত মনে বলল,
বিশ্বাস করো পান্না, খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি হলে প্রেমিক প্রেমিকা চোখের
আড়ালে হলেও সুখে দুঃখে আপদে-বিপদে কখনও একে অপরের
মনের আড়াল হয় না। সত্যিকারের প্রেম দু'জনে একত্রে মিশিয়ে দেয়
বউ জামাইয়ে পরিণত করে।

বউ জামাইয়ের কথা বলায় পান্না ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু
করল। বকুল ফুলের মালা মাসুমের হাতে ছিল। সম্রাণ মালা পান্নার
গলায় পরিয়ে দিতেই পান্না নড়াচড়া দিয়ে সরে বসল, 'মাসুম তুমি
জানো না, মাসুম তুমি এ কি করলে মাসুম।'

মাসুম বলল, 'কি করেছি?'

পান্না লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার বউ
বানিয়েছ।'

মাসুমের উত্তর দেয়ার আগেই পান্না তার গলা হতে বকুল ফুলের
মালাটি খুলে মাসুমের গলায় পরিয়ে দিয়ে ভালোবাসার পাত্র কানায়
কানায় পূর্ণ করে দিল। একে অপরের হয়ে উঠল সাথী। এমনকি
জীবনে মরণে, কেউ ভুলবে না প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেল। কেন ভুলবে?
মাসুম পান্না আজ থেকে জামাই বউ। আহা, ভাবতে যেন গা শিউরে
উঠছে। রোমাঞ্চিত হচ্ছে উভয়ের শরীর। চঞ্চল হয়ে উঠছে মন। পান্না
চাইছে মাসুমের সাথে মিশে যেতে। বলছে, 'মাসুম আমাকে মাথায় হাত
দিয়ে একটু আদর করবে না।'

মাসুম পান্নাকে কি করবে কোথায় রাখবে ভাবতে পারছে না।
এক হাত কপালে অন্য মাথায় রেখে শুধু বলল, আমরা চিরসাথী। কেউ
আমাদের আলাদা করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। মাসুমের মাথায়
হাত রাখা ও কথা বলার সময় পান্না শুধু চোখ বুজে থাকল। এ যেন
স্বর্গীয় অনুভূতি। এ পুলক আনন্দ শেষ হবার নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আচমকা প্রোমোশন ট্রান্সফারের আদেশ এলো সালাম খানের। তিনি সহকারী তহশিলদার থেকে তহশিলদার হয়েছেন এবং একই সঙ্গে পোস্টিং পেয়েছেন রাজশাহীতে। এত দূরে চাকরি তিনি কখনও করেননি। পদোন্নতিজনিত কারণে তিনি রাজশাহীতে যোগদান করেন। রাজশাহী যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি সপরিবারে মাসুমদের বাসায় গেলেন বিদায় নেয়ার উদ্দেশ্যে। তার এমন উন্নতিতে জসিম ভূইয়া খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। তবু যেহেতু পদোন্নতিজনিত কারণে বদলি সেহেতু তিনি আপত্তি প্রকাশ করলেন না। তাকে যেতে দিলেন।

সালাম খান ছিল মাসুমের আব্বার সুখ-দুঃখের সাথী। সালাম খান সাহেব চলে যাওয়ায় কাচারি যেন গুণ্য হয়ে গেল। মাসুমের আব্বা আন্মা ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে তাদের বিদায় জানালেন। পান্না মাসুমের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে মুখে কোনো ভাষা ছিল না। শুধু কপোল গড়িয়ে অশ্রু বরছিল। মাসুম হাত দিয়ে অশ্রু মুছে দিয়েছিল। মাসুমের মুখেও ভাষা ছিল না। বিচ্ছেদ বেদনায় মাসুম আর পান্না কাতর হয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পর পান্না শুধু বলল, ‘প্রিয়তম, আমি জানি তুমি কবিতা লেখো, কল্পনার সায়রে সাঁতার কেটে ভেসে বেড়াও। সেই তোমার কল্পনার মানসী প্রতিমা সাজিয়ে আমাকে স্মরণ করিও। তোমাকে দিয়ে গেলাম আমার ভালোবাসার শক্তি। এ শক্তি কোনোদিন ফুরাবে না। আমার ভালোবাসার শক্তির আলোয় তুমি ভাসিয়ে দিও জগৎকে। তুমি একদিন অবশ্যই উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে কাব্যজগতে। তোমার মধ্যে ভালোবাসার পবিত্রতা রক্ষার যে সংযম আমি দেখেছি অবশ্যই আমার ভালোবাসার আমানত তুমি খিয়ানত করবে না এ বিশ্বাস আমার

আছে। প্রেমের দুর্নিবার টানে ভালোবাসার অমর শক্তি নিশ্চয় একদিন ঐশ্বরিক প্রেমে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, আল্লাহপাকের রাহে আত্মত্যাগ করে তার পুরস্কারের প্রত্যাশায় থাকলাম। বিদায় মাসুম, বিদায়।

কি আশ্চর্য, মাসুম ভাবছিল হয়ে যা ভাবছিল ঠিক এই একই কথা পান্নাও বলছে। ভাবনা জগতের মিল যে এক হতে পারে আজ তা সে প্রথম বুঝল। পান্নাকে হারানোর অসীম ব্যথা বুকে চেপে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করার আত্মপ্রত্যয়ে আজ হাত বজ্রবদ্ধ করল। অশ্রুট স্বরে বলল, বিদায় পান্না। মাসুমের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু পান্না ওড়না দিয়ে মুছিয়ে দিল। এর পর সহাস্য বদনে দু'জন দু'দিকে চলে গেল।

পান্নার পবিত্র ভালোবাসার শক্তি বুকে ধারণ করে মাসুম যখন ইম্পাতকঠিন দৃঢ়তার সাথে পড়ালেখার তরী এগিয়ে নিচ্ছিল ঠিক তখনই মাসুমের পরিবারে নেমে এলো আর এক বিপর্যয়। মাসুমের আঝা বরখাস্ত হলো চাকরি থেকে। পূর্বে দায়েরকৃত মামলার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারিভাবে মাসুমের আঝার চাকরি জীবনে এলো কালো মেঘের ঘনঘটা। স্বাধীনচেতা জসিম ভুইয়া নিজেকে নির্দোষ জেনে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে সপরিবার চলে এলেন। কোনো অন্যায় আপোষ করলেন না উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে। দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নিলেন। তবু মাথা নত করলেন না অন্যায় আবদারের নিকট। যোগ দিলেন নিজ হাতে গড়া সম্পূর্ণ নতুন হাই স্কুলে।

মাসুমের পড়ালেখার খানিকটা ছেদ পড়ল বৈকি। মাসুম তখন কেবল নবম শ্রেণী পেরিয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ছে। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

সাংসারিক নানারকম অভাব-অনটন, ভিন্ন পরিবেশে অনভ্যন্ত জীবনযাপন সঙ্গীহীনতা মাসুমের মনকে দ্রুত একাকিত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুললে মাছের যে দশা হয় মাসুমের দৈহিক মানসিক দিক তার চেয়ে খারাপ হচ্ছিল। বিশেষ করে তার বাবার আর্থিক দুরবস্থা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার কেবল মনে হতে লাগল সুখ, শান্তি, সম্পদ, পরিবেশ সব কিছুই আপেক্ষিক। কখন যে কার কাছ থেকে কোনটি চলে যায় তা

বলা মুশকিল। সে প্রায়ই ভিটেবাড়ির গহিন বনের পাশে নীরব জায়গায় অপরাহ্নে বসে সময় কাটাত। সমাজ ও বৈষয়িক অবস্থার টানাপাড়েন তাকে শুধু ভাবাতে থাকে। মানুষ যেভাবে সুখের সন্ধানে জীবনের প্রায় সবটা সময় ব্যয় করে তার কিছুই করে না অন্য সব প্রাণী। গোধূলি লগ্নে নীড়ে ফিরে আসা সব পাখির ঝাঁক তাকে আকৃষ্ট করত। আকৃষ্ট করত দোয়েল, কাঠঠোকরা চন্দনা। যারা তার নিঃসঙ্গতার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত বৈকি। কখনও ক্ষুধার জ্বালায় বাতাবনের বাতার কালি খেয়ে নিত মাসুম। আর আবছা আবছা আলোতে মন্ত্র মুক্তির মতো হারিয়ে যেত বনে বাদাড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সন্ধ্যা ফিরে পেয়ে ছুটে যেত বাংলাঘরের কোণের কোঠায়। নতুন স্কুলের সহপাঠীদের সাথে তার ভাব তখনও জমে ওঠেনি। স্কুলের শিক্ষকদের আদর, শাসন কোনো কিছুই স্বাদ সে উপলব্ধি তখনও করেনি। সন্ধ্যা হতে অনেক রাত অবধি নিবিষ্ট চিন্তে সে পড়াশুনায় মগ্ন থাকত। আবার ইচ্ছেমত পড়ার টেবিল হতে উঠে বাঁশের মাচায় শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবত। হারিকেন জ্বালিয়ে শুয়ে পড়া ছেলের দিকে জসিম মাস্টার চেয়ে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আশ্তে করে হারিকেন নিভিয়ে দিয়ে যেতেন।

মাসুমদের বাড়ির পাশেই ছিল মসজিদ। মাসুমের জ্ঞাতি চাচার নাম সলিম উদ্দিন। ষাটোর্ধ্ব বয়স তার। মুবাল্লেগ মানুষ। ভোরে মুয়াজ্জিনের আজান শুনে মাসুম ছুটে যেত মসজিদে। মসজিদে সলিম চাচা নামাজে শেষে বয়ান করতেন। তাবলিগের বয়ান। অতি মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন মাসুম তাবলিগের ছয় উসুলের সার কথা সহজেই রপ্ত করে ফেলে। সলিম চাচা নবী-রসূলদের কাহিনী অবলীলায় বলে যেতেন। তাদের মাজেজা শুনে শুনে মাসুমের মন ছুটে যেত সেই দিকে। নিজেকে এক এক সময় মাজেজাসম্পন্ন করে তোলার দিকে যত্নবান করে তুলতে চায়। পীর আউলিয়াদের অতুলনীয় গুণাগুণ, কষ্ট ধৈর্য তাকে মুগ্ধ করে দিত। কখনও সে দরবেশ হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করার কথা ভাবত। নদী যেমন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে

ফেললে ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায় তার বুক, তেমন পরিস্থিতির শিকার মাসুম নিজেই নিজের পথ তৈরি করতে চায় কিন্তু পারে না। বিশেষ করে ধর্মের চুম্বকের মতো শক্তিশালী আকর্ষণ, তাকে অন্য সব দশটা ছাত্রের আচরণ থেকে পৃথক করে ফেলেছে। পাঠ্যপুস্তকের কোনো কিছুই তার আর পড়ার বাকি নেই। যেখান থেকেই প্রশ্ন করা হোক না কেন মাসুম তার জবাবদানে প্রস্তুত আছে। অথচ বিষয়টি নতুন স্কুলের সকলের অজানা। সে স্কুলে প্রায় গড়হাজির থাকত। স্কুলের প্রতি কোনোই আকর্ষণ ছিল না তার। এক মাস পনের দিন পর হঠাৎ একদিন স্কুলে উপস্থিত হলে অন্যান্য সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাকে ঠাট্টা মস্করা করত। এতে আরও অনীহা তৈরি হতো। ফলে স্কুলে যাওয়া একরকম ছেড়েই দেয় মাসুম।

পঞ্চম অধ্যায়

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, কৃষিকাজ, ভিলেজ পলিটিক্স মোকাবেলা ইত্যাকার সকল ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন জসিম ভুইয়া। গ্রামে তার সুনামও ছিল অনেক। কিন্তু গ্রামের মানুষজন থেকে দূরে অবস্থান করে যে গুণকীর্তন শুনা যায় কাছে এসে সহবস্থানে তার উল্টো ঘটনা ঘটে যায়। শত বছর পাশাপাশি বাস করে এবাড়ি ওবাড়ি ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকে। এক পরিবারের উন্নতি আর এক পরিবারের গায়ে সয় না। এমনকি চরম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও কারও একটু কষ্ট হয় না। গাঁয়ের অতি বুদ্ধিমান মোড়ল ফাইজ উদ্দিন তাকে অনেক ফয়সালা দিত। কিভাবে ফসল ভালো হয়, গ্রামের উন্নতি করা যায়, মসজিদে ফোরকানিয়া করার বিষয়ে আরও কত কি? কিন্তু কাজে নামিয়ে দিয়ে পেছনে আর কেউ নেই। ডিপ টিউবওয়েল এনে গেড়ে চাঁদার জন্য ঘুরতে হতো। কেউ চাঁদা দিবার পারে না। নানা ঝগড়ামেলায় জড়িয়ে ভূতপূর্ব নায়েব সাহেব টের পেলেন আসলে গাটা কি। বাহির থেকে গাঁয়ের সবুজ রূপ দেখে মন ভরে, তার ভেতরের রূপ দর্শনে বহি করতে ইচ্ছে করে। হিংসা বিদ্বেষে জড়িয়ে মানুষগুলোর ভিতর কয়লার মতো কালো হয়ে আছে।

গেরস্থালি শুরু করে দিলেন জসিম ভুইয়া। গরু কিনলেন, মুনি রাখলেন। কিন্তু ভূতপূর্ব নায়েব সাহেব নিজে মাঠে কাজ করার জন্য যেতেন না। ফলে কামলা মুনি কাজে ফাঁকি দিত। শহুরে মেয়ে মিসেস রীনা স্বামী সংসারের রান্নাবান্না যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ হলেও বাহিরের মানুষের ভিড় ও পাকটাক এক রকম সহ্য করতেন না। যার ফলে জসিম সাহেবের বকুনি আর মিসেস রীনার ভাত না দেয়া দুয়ে মিলে মুনি কাজ ফেলে চলে যেত। কিছুদিনের মধ্যে নিজেই গৃহস্থীর কাজ করবেন আর ধান-গমে ঘর ভরে ফেলবেন এরকম অভিলাষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। অচিরেই সমস্ত জমিজমা বর্গা চাষে দিয়ে দিলেন। এতে যে

ধান হতো সংসার চলত না। নতুন স্কুলে শিক্ষকতা করছেন ঠিকই বেতন পেতেন না। ছাত্র কম। প্রতিষ্ঠাকালীন নানা খরচ করতে করতেই দফা সাড়া। খোরাকির ধান শেষ হয়ে এলে অনেক সময় আটার জাউ খেতে হতো। গুরু হলো জমিন ইজারা দেয়া। জমিন ইজারা দিয়ে টাকা ভেঙে খেতে কদিন লাগে। অল্প দিনের মধ্যেই জসিম ভূইয়ার জমি এক দেড় একরে সংকুচিত হয়ে এলো। ভাবতে অবাক লাগে, এত কিছুর পরও তার নৈতিক মনোবল নিচে নেমে এলো না। সদালাপী জসিম ভূইয়া কারও সাথে কোনোদিন ঝগড়া করেছেন, নিজের অভাব অনটনের কথা বর্ণনা করে দুঃখ করেছেন এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

স্বাভাবিক ছাত্র-জীবন পরিহার করে মাসুম যখন চূড়ান্তরূপে অজানা নেশায় মেতে উঠল তখন একদিন মাসুমকে ডেকে তার বাবা জসিম বললেন, মাসুম, তুই কি লেখাপড়া ছেড়ে দিলি? একদম যে স্কুলে যাস না?

মাসুম কোনো উত্তর দিল না। শুধু মাথা নেড়ে কি বুঝাল তা তার বাবা কিছুই বুঝল না। জসিম ভূইয়া বেশ চিন্তিত হলেন। তিনি মিসেস রীনার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন ছেলেকে বই পুস্তকসহ কিছু দিনের জন্য মামার বাড়িতে পাঠালে কেমন হয়? মাসুম সারাদিন কোথা থাকে, কি করে তা বলা যাচ্ছে না। ভোররাতে সে বের হয়, ফিরে সন্ধ্যায়। কোথায় কি করে কে জানে। অমন করে চললে তো ছেলের সর্বনাশ হবে। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। অথচ ছেলের কোনো উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না। একটা স্কলার ছেলে তার ওপর কত আশা ভরসা ছিল, সবই তো ধুলিসাৎ হতে চলল। মামার বাড়িতে রেখে কিছুদিন ভালো শিক্ষক দেখে প্রাইভেট পড়ালে মনে হয় পরীক্ষা ভালো করতে পারবে। মাসুমকে কেন্দ্র করে তার মা বাবার আর চিন্তার অন্ত রইল না।

এদিকে মাসুম মাথা নেড়ে করে রাখে। দাড়ি চুলে মুখ ভর্তি। ছোঁড়া মলিন আমা-কাপড়। অন্তর্মুখী মাসুমকে দশটি কথা বললে একটির জবাব দেয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, মাসুম সারা দিন শুধু

বিভিন্ন মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও কোনো পুরোনো দিনের স্থাপত্যশৈলী চোখে পড়লে তার ইতিহাস নিয়ে ভাবতে থাকে। ছোটবেলায় শোনা দাদার মুখে তৈয়বালী খলিফার সাহচর্যে এসে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নেয়া শুরু করেছে। লালন ফকির হাছন রাজা, মালং শাহ, রইছ উদ্দিন ফকিরের জীবনী পাঠে মুগ্ধ মাসুম অরুণ দর্শনে অধীর। আধ্যাত্মিক গুরু তৈয়বালী খলিফার দরবারে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়, মহাশক্তির সন্ধান কিভাবে পাওয়া যাবে, কিভাবে অরুণ দর্শন করে দিব্যচোখ লাভ করা যাবে, দিবারাত্র এ প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করেছে। কাউকে কিছু না বলে বহু দূর চলে যায়, দু'তিন দিন পর ফের চলে আসে।

এক রকম জোর করে ধরে ক্লাসের বই পুস্ককের পোটলাপুটলি বেঁধে রিকশা করে মাসুমকে পাঠিয়ে দেয়া হলো মামার বাড়ি। নানি নেই। নানা জীবিত। একমাত্র মামা চাকরিজীবী। মামি, পাঁচ খালাসহ বিরাট সংসার। এখানে মাসুমের কদর হবে কি? বাড়ির এক কোণে মাটিতে পাটি বিছিয়ে মাসুমকে থাকতে দেয়া হয়েছে। মাসুমের চেহারার যে অবস্থা তাকে ভদ্রলোকের সন্তান বলা চলে না। অজপাড়াগাঁ থেকে আসা হদ্দ বোকা এক বয়ঃসন্ধিকালের যুবক। কাছেও টানা যায় না আবার দূরেও সরানো যায় না। মেয়ের অনুরোধে টেকি গেলার উপক্রম। অবসরপ্রাপ্ত পেশকার নানা যথেষ্ট আধুনিক ও ধার্মিক। নাতির এরূপ দর্শনে তিনি খুশি হবেন কি করে?

যা হোক, কিছুদিন মাসুম এ বাটীতে থেকে জেলার বড় স্কুলের শিক্ষকের নিকট অংক, ইংরেজি প্রাইভেট পড়ল। যদিও তার পড়ার দরকার ছিল না। কেননা ভেতরে ভেতরে সে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিকই। বাবা মায়ের অনুরোধে অনেক সময় টেকি গিলতে হয় বৈকি।

এসএসসি পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলো। নানার বাসায় থেকে মাস তিনেক পরে ফিরে এলো যথারীতি নিজ বাড়িতে মাসুম। পরীক্ষা আরম্ভ হলো। তার সব ক'টি পরীক্ষাই সে ভালো লিখছিল। কিন্তু প্রকাশ

করল নাস্কুলের শিক্ষক ছাত্ররা ভাবল মাসুম তো দরবেশ হয়েছে। মক্ষরা করে অনেকেই বলল, ‘ও ঠিকই ফেল করবে।’

পরীক্ষা শেষ হলে উদ্দাম গতিতে মাসুম পূর্বের মাজার দর্শনের কর্মসূচিতে লেগে গেল পুরোদমে। তাতে কি স্বাদ পায় সে ছাড়া আর কেউ বুঝে না। হঠাৎ করে দেখা গেল মাসুম সাত দিন, পনের দিনের জন্য উধাও। হাতে কানাকড়ি নেই অথচ কিভাবে যে সে চলে অন্তর্যামী জানেন। আবার দেখা গেল বাড়িতে ফিরে এসেছে।

বাড়িতে ফিরে গ্রামের স্কুলের পেছনে ভিটের জঙ্গলের পাশে খাদের পাড়ে বসে থাকে। হাতে একটা ডায়েরি। ডায়েরিতে লিখে চলেছে অনর্গল কী যেন। কোনো উৎসাহী ছোকরা শিশু কিংবা মধ্যবয়সী গ্রামবাসী হয়তো

তার সাথে এসে বসল গল্পগুজব করার জন্য। কিন্তু মাসুমের সাথে কথা বলে আরাম পাওয়া মুশকিল। গুরুগম্ভীর ভাবজগতের কথা বললে গ্রামের মধ্যবয়সী মুর্থ হাইসু কীবা বুঝবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে হাইসু চলে যায়।

তখন চলছিল চৈত্র মাস। এ মাসে গাছের নতুন পাতা গজায়। পুরোনো সব পাতা ঝরে যায়। গ্রামের বউ ঝি কিংবা কিশোরীরা এ সময় গুল্ম তরু বনে ঝাঁকা ঝাঁটা নিয়ে শুকনো পাতা কুড়ায়। ভিটে জঙ্গলের মধ্যে প্রতিদিনই পাতা কুড়াতে আসে মাসুমের জ্ঞাতি চাচাতো বোন ললিতা। ললিতার বয়স চৌদ্দ পনের বছর। ললিতার কৌতুহল হলো এই যে, প্রায়ই মাসুম এখানে বসে কি করে। নেহায়েত প্রয়োজন না হলে এ বনের ধারেকাছেও কেউ আসে না। পাতা কুড়াতে কুড়াতে আচমকা দেখতে পেল এক সজারুর গর্ত। সে গর্তের আশেপাশে অনেক কাঁটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নিজের মধ্যে এ দৃশ্য দেখার আনন্দ সীমাবদ্ধ না রেখে শত গজ দূরে বসে থাক মাসুমকে লক্ষ্য করে, অনির্দিষ্টভাবে চিৎকার দিয়ে উঠল, আল্লা রে এইতা কি। হাতে একটা একটা কুড়িয়ে লয়ে উলটিয়ে দেখতে লাগল। ললিতার চিৎকারে মাসুম সম্বিং ফিরে পেয়ে আগ্রহভরে দেখতে এলো এখানে কি তাই।

মাসুম সজারু'র রঙিন কাজ করা কাঁটা হতে লয়ে বলল, ভারি সুন্দর তো।

আসলে ললিতা কাঁটার উছিলায় মাসুমের সাথে কিছু সময় কথা বলতে চাইছিল। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ললিতা মাসুমকে বলল, 'দাদা আপনি এখানে রোজই কি করইন।'

ললিতার এ প্রশ্নের জবাব মাসুম কি দেবে তা বুঝে উঠতে পারে না। অতি সংক্ষেপে মাসুম উত্তর দিল, 'লিখি'।

'কি লেহেন?'

মাসুম কি লিখে তা ললিতা বুঝবে না উপলব্ধি করে মাসুম কথার কোনো জবাব না দিয়ে পূর্বেও জায়গায় চলে যায়। ললিতাকে অবজ্ঞা করায় ললিতা নাক সিটকিয়ে মুখে ভেংচি দিয়ে সজোরে কোমরে আঁচল বেঁধে পাতা কুড়াতে লেগে গেল। বেলাজ ছেড়া হগল দিনই এখানে বইয়া থাহে মাইয়া মানুষ দেহনের লাইগ্যা। আবার কথা কইলে ফুইল্যা থাহে উত্তর দেয় না। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করতে থাকে ললিতা।

দু'দিন পরে গ্রামের সরলা সুন্দরী ললিতা সেজেগুজে মাথায় ফুল গুঁজে, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে এসেছে প্রতিদিনকার মতো পাতা কুড়াতে। পূর্ববৎ মাসুম তার কবিতা নিয়ে ব্যস্ত। শব্দের খোঁজে বেরিয়েছে। শব্দ আওড়াতে আওড়াতে ছন্দের মধ্যে হাবুডুবু যখন সে খাচ্ছে ঠিক তখনই ভেসে আসে ললিতার ব্যাঙ্গোক্তি। এতিমের মতো বইয়া কি করে ছেড়া, আবার ঢঙ করে, ছাইয়া থাহে, মনডা কয় হের কি নাই আরাইছে। মজনু হওনের ভান করে।

ললিতার মুখে মজনু শব্দটি শুনে মাসুম আঁতকে উঠল, যে মেয়ের সাথে বইয়ের কালো অক্ষরের কোনো যোগাযোগ নেই সেই মেয়ের মুখে মজনু সত্যিই তো! মানুষকে তার বয়স অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় যতই তার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার বুড়ি কম থাকুক।

আজকেও ললিতা মাসুমের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে মুখ ভার করে ঝাঁকা ভর্তি পাতা নিয়ে চলে গেল। আসলে ললিতার মনে যে

মাসুমকে লেগেছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ভালো-মন্দ না বুঝা, মেয়েপিপাসু বাঁচালের মতো মাসুম নয়। নিরীহ মাসুম হতে পারে ললিতার লুকোচুরি খেলার পুতুল তা যে মাসুমকে ভালো মানায়। ললিতার সরল মনে তাই আন্দোলিত হতে লাগল।

আজ মাস গত হলো মাসুম এখানে আসে না। মাসুম চলে গেছে বায়েজিদ বোস্তামির (রঃ) মাজারে। সেখান থেকে আরও কত জায়গায় তার ইয়ত্তা নেই। দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয় মাসুমকে ধরে আনল সিলেট থেকে। মাজারে ঘুরাফেরা করতে দেখে চিনে ফেলে মাসুমকে। তারপর সোজা নিয়ে আসে ধরে। এ দীর্ঘ সফর শেষে বাড়ি ফিরছে যখন তখন বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বইছে। কেন যে আনন্দের জোয়ার বইছে তা মাসুম জানে না। একেবার ফুলের তোড়া নিয়ে মাসুমকে বরণ করার পালা। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার মানসে যে যুবক দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে প্লাটফর্মে আর মাজারের ধূলিমলিন পাটিতে শুয়ে মশার কামড় খেয়ে রাত যাপন করেছে, ছেঁড়া, পাতলা পাঞ্জাবি, রুক্ষ চুল দাড়ি নিয়ে বাউলের মতো উভ্রান্ত হয়ে প্রকৃতির কাছে প্রশ্ন করে, দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই ছেলে মাসুম প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের গৌরব কুড়িয়েছে। মাসুমের বাবা মা আনন্দে আটখানা। কিন্তু মাসুমকে এ সুবাদটা দেয়ার পরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। মাসুম স্বভাবজাত হাসি দিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক একটি কথাই শুধু বলল, তাই?

মাসুমকে ভালো করে খাইয়ে দিল তার মা মিসেস রীনা। বলল, বাবা কোথা যাস, কোথা থাকস, আর যাসনে বাবা। ভালো পাস দিয়েছিস, এবার ঘরমুখো হয়ে কিছুকিদিন থাক না। তোকে কতদিন মাগুর মাছের ভাজি, দুধের মলাই, আর নারকেল নাড়ু খাওয়াতে পারি না। বাবা আমার কথা রাখবি?

মাসুম মাথা নেড়ে জবাব দিল এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, মা আমাকে নিয়ে তোমাদের খুব ভাবনা তাই না? অযথা এসব ভাবনা

করো না। কেন কি হয়েছে আমার? আমি কি করেছি যে আমাকে তোমাদের বেঁধে রাখতে হবে?

রীনা বেগম বলল, তা বলছি নে বাবা, বলছি তুমি কিছুদিন বাটীতে বসে নাওয়া খাওয়া ভালোভাবে করো তাই।

মাসুম বুঝতে পেরে মুখে শুধু বলল, হু।

অনেকদিন পর মাসুম ললিতার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ললিতা দৌড়ে এলো। চঞ্চলা চপলা মেয়ে ললিতা কোনোরূপ ভূমিকা না করেই বলে ফেলল, ‘দাদা তুমি আর ভিটে জঙ্গলে যাও না?’

মাসুম মাথা নেড়ে বলল, না কেন কি হয়েছে?

উত্তরে ললিতা কোনো কথা খুঁজে পেল না। শুধু চেয়ে রইল। ললিতার চাহনির মধ্যে রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু তা আবিস্কারের চেষ্টা না করে পথ চলার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই ললিতা বলে উঠল, শুনুন।

মাসুম বলল, ‘কি?’

ললিতা বলল, আমি ভাবতাম আপনি বেআক্কেল। সবাই বলে, না আপনিই আসলে চালাক।

কি বলবে বলো, আমার তাড়া আছে।

ললিতা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। ললিতার খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হয়ে মাসুম চলে গেল।

মাসুম কলেজ ভর্তি হয়েছে। কলেজে পড়ার জন্য মাসুম চলে যাচ্ছে। একদিন ললিতা মাসুমকে ডেকে বলল, দাদা, তুমি শহরে চলে যাবে আর দেখা হবে না। আমার বিয়ের ঘর আইছে, কয় দিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি চইল্যা যাইব। তোমাকে আমি গাল দিছি, মাফ কইরা দিও।

ললিতার গাল দেয়া না দেয়া কোনোটাই মাসুমের স্মরণ নাই। সে এতটুকু বুঝছে যে মেয়েটি ভালোবাসত অথচ কোনোদিনই মুখে বলেনি। আকারে-ইঙ্গিতে শুধু বুঝিয়েছে। আজ ললিতা বলল, দাদা

মায়াকে বইলা রাখছি তুমি আইজা আমার ঘরে খাইবা, দুপুরে আইও ।

ললিতার দাওয়াতে মাসুম আশ্চর্য হলো না । কারণ এ যে তার অন্তিম ইচ্ছে । যাক দুপুরে মন ভরে ললিতা আজ মাসুমকে খাইয়েছে । একটা পোটলায় কিছু কাটা পিঠে হাতে দিয়ে বলল, দাদা এইডি শহরে দিয়া খাইও ।

মাসুম কোনো কথা কইতে পারল না । শুধু স্নেহসিক্ত আচরণে আবেগাপ্ত হয়েছিল । সেদিনকার মতো অবলার বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়ে এসেছিল ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও লাইনে মাসুমের মস্তিষ্কেও বুড়ি পূর্ণ না হলেও বিভিন্ন মাজারে ঘুরে ঘুরে বাউল ফকিরদের সান্নিধ্য ও গানে ঈশ্বরাসক্তিবোধ তার মনকে সত্যি জাগ্রত করে। উহা যে মানবমুক্তির সুত্র তা বিশ্বাস করে। মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে প্রভেদ বোধ করি এই যে, পশুপাখি যা বিশ্বাস করে তাই করে। মানুষ যা বিশ্বাস করে তা খুব স্বল্প সংখ্যকই পালন করে। না হলে প্রত্যেকটা পশুজাত তাদের পৃথক পৃথক জীবনধারায় চলতে ফিরতে কোনোরকম ব্যত্যয় ঘটায় না। অথচ মানুষ মনে ধারণ করে এক, বাস্তব জীবনে করে আর এক। মানুষের মতো এমন মুনাক্ফিক আর হয় না। গরু সর্বদা হাম্বা করে ডাকে, কখনও কুহ কুহ করে না। তাই গরু চেনা সহজ। মানুষ হাম্বাও করে কুহ কুহ করে। মাসুম যা বিশ্বাস করে বাস্তবে তা পান করতে এ সমাজে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার মন মার খেতে খেতে ক্রমাগতই কোণটাসা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মাসুম বিপ্লবী হয়ে ওঠে। সমাজে ঈশ্বরাসক্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। কলেজে ছাত্রদের বিশ্বাস নানা মতে বিভক্ত। একদিকে বাতিলপন্থি ছাত্রলীগ, ছাত্রদল অন্যদিকে সত্যপন্থি ইসলামী ছাত্রশিবির। আইএসসি পড়াকালীন সময়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করে সমাজে ইসলামের হাকিকত প্রচারে উদ্যোগী হল মাসুম। একনিষ্ঠ কর্মোদ্দীপনা থাকায় অল্পদিনেই তার যথেষ্ট উন্নতি হলো। সে কলেজ শাখার সভাপতি পদ লাভ করল। ফলে দায়িত্ব পালন করতে তার সময় চলে গেল। দ্বিতীয় বর্ষে তার উপর অনেক দায়িত্ব দেয়া হলে একক প্রচেষ্টায় কলেজ হোস্টেলে তার সহকর্মী অনেক সৃষ্টি হলো। দিনরাত পার্টির কাজে নিয়োজিত থাকায় আইএসসি পরীক্ষা ভালো করতে পারল না। কোনোরকমে উত্তীর্ণ হলো। সে পরীক্ষার ফলাফলে বড় একটা ধাক্কা পেল। তার আর ডাক্তারি পড়া হলো না। আর কি করা। সে একই কলেজে বিএসসি ভর্তি হলো। ভাবল রাজনীতি করবে। কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচনে

অংশ নিল। পাস করতে পারেনি। কলেজ হোস্টেলে ছাত্রলীগের দ্বারা সে লাঞ্চিত হলো। ক্লাস ছেড়ে দিয়ে দলীয় কাজে মানে শিবিরের সাংগঠনিক কাজে তার পুরো দুই বছর কেটে গেল। বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে সে বুঝতে পারে আর যাই হোক পরে আর যাই হোক ফলাফল ভালো হবে না। তার টনক নড়ল। চরম ক্ষতির শিকার মাসুম এবারে চিন্তিত হয়ে পড়ল। দল বা পরিবারে কাউকে না জানিয়ে সে চলে গেল তাবলিগে হাতিয়া। হাতিয়া থেকে বরিশাল। তাবলিগে দাওয়াতের পোটলা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবল দরবেশরূপী শয়তানের পাল্লায় পড়েছে সে। সত্য সন্ধানী মনের অপূরণীয় ক্ষতি করবে শিবিরের আড়ালে পর্দার পেছনের শয়তানরা। এরাই ৭১ সালে নিরীহ মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে। বাড়িঘর পুড়িয়েছে। হত্যা লুট করেছে নির্বিচারে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য একটুও প্রাণ কাঁদেনি, কেঁদেছে লম্পট বিদেশির জন্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল আর মিথ্যে পারিবারিক অভিজাত্য এদের অহঙ্কার। দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট অগত্যা মাসুম তাবলিগ থেকে ফিরে এসে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গ্রহণ করল চাকরি। চাকরিতে থেকেই বিএসসি পাস করল। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সে এগিয়ে নিয়ে চলল বিদ্যা শিক্ষা। সে আর পেছন ফিরে তাকায়নি। সাহিত্য শিল্প, ললিতকলা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং একাডেমিক উচ্চ শিক্ষার কোনো কিছুই মাসুম বাদ দিল না। বিজ্ঞানে এমএসসি ভর্তি হলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নৈশ বিভাগে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাডেমিক সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য সে ভর্তি হলো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কলেজে।

ক্ষুরধার হস্ত মাসুম লিখে চলেছে অব্যাহতভাবে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটকসহ সাহিত্যেও বিভিন্ন শাখায়। নোংরা রাজনীতি পরিহার করে সে মনোযোগ দিল আধ্যাত্মিক সাধনায়। গভীর রাতে নিমগ্ন হচ্ছে জিকির আজগারে। আল্লাহপাকের নূর হৃদয়ে প্রতিস্থাপনের আশায় একান্ত নির্জনে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছে।

একাধারে জ্ঞান সাধনা, সঙ্গীতচর্চাসহ আধ্যাত্মিক সাধনায় যখন তার মূল্যবান প্রতিটি ক্ষণ ব্যবহার করেছে ঠিক তখন জন্মবিকার ক্ষেত্রে এক সিদ্ধান্তে মাসুমসহ যারা চাকরি করছিল সকলের বেতন ভাতাদি বন্ধ হয়ে গেল। চাকরিটা মোটামুটি ভালোই ছিল। জাতিগঠনমূলক কাজকর্ম ছিল। তাতে সে মানুষের ময়দানে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখতে পারত। সেই সাথে পড়াশুনাও চালিয়ে যাচ্ছিল। সাময়িকভাবে সমাজসেবা বিভাগের সকলের বেতন বন্ধ হয়ে গেলে ও চাকরি হতে সে স্বেচ্ছায় বিদায় নিল না। ধৈর্য ধরে মাটি কামড়ে সে বিভাগেই পড়ে থাকল।

এ যেন মাসুমের আর এক পরীক্ষা। এমন দিনও গেছে, সারাদিন পার করেছে শুধু পানি খেয়ে আবার সন্ধ্যের পরে যোগদান করেছে মাস্টার্স ক্লাসে। হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ক্লাসও সে মিস করেনি। জাতীয় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, মৌলিক সাহিত্য হিসেবে তার প্রবন্ধ, কবিতা অনর্গল ছাপছে। মাসুম এখন একজন উদীয়মান প্রতিশ্রুতিশীল কবি, ছড়াকার, প্রবন্ধকার। অর্থকষ্টে জর্জরিত মাসুম বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা পেত, তা দিয়েই কোনোরকম চলত। তার এ দুঃসময়ে মাঝে মধ্যেই তার চাচাতো বোন ললিতা জামা-কাপড় দিয়ে তাকে সাহায্য করত। এমন সময়ও গেছে অর্থাভাবে মাসুম মেস ভাড়াও দিতে পারছিল না। মেস ছেড়ে দিয়ে প্লাটফরমেও তাকে রাত্রি যাপন করতে হয়েছে। তবুও মাসুম জীবন সংগ্রামের হাল ছাড়েনি। যত দুঃখ কষ্ট তাকে আক্রমণ করেছে তত সে সাহসী হয়ে উঠেছে। চরম দারিদ্র্যতা তাকে নিখাদ সত্যের পূজারী করেছে। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তার অগ্নিগর্ভ লেখা সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেতারসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দিনে দিনে তার কদর বাড়তে লাগল। কোনো তোষামোদ, সম্মানের প্রত্যাশায় সে কিছুই করেনি। মানবেতর জীবনের চিত্র উঠেছে তার গানে, প্রবন্ধে, কবিতা ও ছড়ায়। বঞ্চিত মানুষের হাহাকার আর প্রতিবাদে উচ্চকিত তার নাটক যেন প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিবিশ্ব।

সপ্তম অধ্যায়

আজ অনেক দিন হলো সালাম খানের পরিবারের সাথে জসিম ভূইয়া পরিবারের যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ থাকবে কিভাবে, জসিম ভূইয়া তো আর চাকরিতে নেই। চাকরিতে থাকলে হয়তো যোগাযোগ থাকত। একই বিভাগ হিসেবে। সিরাজগঞ্জে পান্নাদের সময় ভালোই কাটছিল। তিনি তহশিলদার হয়েছেন। একজন নিষ্ঠাবান চাকরিজীবী হিসেবে তিনি বেশ বিভাগীয় সুনাম কুড়িয়েছেন। তার কাচারিতে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হওয়ার ফলে তিনি জেলা প্রশাসন থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে নিদারুণ অভাব ছিল। অভাব পূরণ হবার নয়। চাকরি জীবনের প্রথমে যার সাথে পরিচিত হতে হয় তাকে ভূলা যায় না। বিশেষ করে জসিম ভূইয়া পরিবারের সাথে তাদের যে সখ্য তা ছিল তা কোনোভাবেই পূরণ হলো না। নতুন অনেক সহকর্মী পেয়েছেন কিন্তু জসিম সাহেবের মতো এমন উদার মিশুক মানুষ তিনি আর কাউক পাননি। পান্নাদের পরিবাণ্ডে প্রায়ই আলোচনা হতো মাসুমদের কথা। দুটি পরিবা বিছিন্ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের আন্তরিকতা আজও অমলিন। সুখে দুঃখে তারা একে অপরের সাথী ছিল দীর্ঘদিন। পান্নার স্বর্গীয় ভালোবাসা মাসুমের বিরহে পান্নাকে মোটেই ব্যতিত করেনি। পাহাড় পরিমাণ অটল বিশ্বাস তার অবচেতন মনে বাসা বেধেছে। মাসুম সম্পর্কে পান্নার উচু ধারণা পান্নাকে ভালোবাসা মাসুমের বিরহে পান্নাকে মোটেই ব্যতিত করেনি। মাসুম সম্পর্কে পান্নার উচু ধারণা পান্নাকে সহজ জীবনযাপনে উৎসাহিত করেছে। তার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, বিরহের জ্বালা কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি। পাহাড় থেকে যেমন অনর্গল ঝরনাধারা বয়ে চলে, ক্ষীণধারা কারো চোখে পড়ে না অথচ ইহাই তো পাহাড়ের অশ্রুধারা কত কা যাবৎ ঝরাচ্ছে। কোনো অীভযোগ নেই। কেননা তার বুক তো পাথর দিয়ে গড়া পাষাণ। এখানে অশ্রুও আছে রিহের জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতাও আছে। মাথা উচু করে জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ

করে যাওয়া ছাড়া তো জীবন হয় না। এখানে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার স্বাদই বেশি।

সালাম খান অতিরিক্ত খাটাখাটনির ফলে বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার সহজাত হাপানি রোগ তো আছেই। ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করানোর ফলে ডায়াবেটিস যথারীতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম করার ফলে পুনরায় ইনসুলিন বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। একদিন পান্নার মা মিসেস শেফালী খান বললেন, পান্নার বাবা, বহু দিন তো বাহিরে বাহিরে থাকলুম আমরা, এবার দেশের মাটিতে বদলি হওয়া যায় না?

সালাম সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, তা যাওয়া যাবে না কেন, ফাতুর ছেলে বাছির বড় অফিসার, তাকে না হয় বলা যাবে বদলির বিষয়ে। তা নবাবগঞ্জে তো বাড়িঘর করা হয়নি, ওখানে গিয়ে কোথা থাকবে। তাছাড়া এখানে তো ভালোই আছি। কাচারি সংলগ্ন বাসা। এই ব্যবস্থা সেখানে আছে কি না কে জানে। বদলি হওয়া বা করা যে হাস্যামা ওসব আমার দ্বারা হবে না।

পান্নার মা বলে উঠলেন, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের টিপুই সব করবে। তুমি তোমার ভাগ্নের কাছে চিঠি লিখে দাও। বাছিরই সব করবে। দৌড়াদৌড়ি যা করার সবই করবে টিপু। আর জায়গা যখন আছে তখন নিজের বাড়িতে গেলে ব্যবস্থা একটা হবেই। চিন্তার কি আছে।

এর মধ্যেই দ্রুত সালাম খানের স্বাস্থ্যহানি হতে থাকে। মিসেস শেফালী বিচলিত হয়ে পড়লেন।

পান্নার এসএসসি পরীক্ষা সামনে। অথচ তার বাবা অসুস্থ। মেয়েটা পিতৃভক্ত। এতটুকু মেয়ে সবই বোঝে, বাবার সেবা শুশ্রূষা যেন তার নেশা। সময়মতো গোসল, নাবা-খাবা, ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাকার সর্ববিষয়ে মেয়েই বাবার খোজখবর করে। সালাম খান ঠিক করবেন। মেয়েটার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলেই বদলির জন্য চেষ্টা করবেন।

দু'মাস পর যখন পরীক্ষা শেষ হলো তখনই পূর্দমে চেষ্টা লাগিয়ে ভাগ্নে বাছির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার মামা সালাম খানের বদলির যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন। নবাবগঞ্জে এসে প্রথমেই নিজ বাড়িতে উঠলেন। বদলির যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন। নবাবগঞ্জে এসে প্রথমেই নিজ বাড়িতে উঠলেন। কিছুদিন পর অফিসের কাছাকাছি বাসা ভাড়া করে তারা সেখানে উঠে গেলেন।

বর্ষা মৌসুমে একদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন সালাম খান। প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন সালাম খান। জ্বরে হাপানির প্রকোপ আরও বেড়ে গেল। ডায়াবেটিসের রোগী এমনিতেই ডায়েট কন্ট্রোল করে কোনোরকম বেছে আছেন। তার ওপর হাপানির ধকল। সে যাত্রা আর রক্ষণ পাওয়া গেল না। গ্রামেগঞ্জে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না। হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসাও ছিল ভুল। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় সালাম খান দুর্বল হয়ে পড়লেন। ক্রমাগত এক মাস রোগে ভুগে কংকালসার হয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুও দিকে এগুতে লাগলেন।

সেদিন ছিল মোমবার, দুপুরের দিকে পান্না কাছে বসা, এমন সময় সালাম খান বললেন, মা আমি হয়তো বাচব না, তোরা যদি পারিস তোদের খালি ভিটের মধ্যে বাটী বানিয়ে ফেলিস। আল্লাহপাকের হাতে তোকে সপে দিলাম। তিনি অনেক কষ্টে বললেন। একটু পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পান্নার গগনবিদারি চিৎকার, তার মায়ের কান্নায় চতুদিকের আবহাওয়া যেন হাহাকার করে উঠল। এখন এক সময় ছালাম খান চলে গেলেন যখন সংসার দেখার আর কেউ রইল না কোনো আর্থিক সম্বল।

দাফনকাফন শেষে টিপু বলল, আপা কেদো না, কাদলে কি হবে, মানুষ মরণশীল, সবাই মরবে। দুলাভাই চলে গেছেন, তাতে কি, আমরা তো আছি। মিসেস শেফালীকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই। মাস কয়েক পরে মিসেস শেফালী বেগম তার সাত বছরের ছেলে কায়সার ও পান্নাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে এসে উঠলেন। পেনশনের সামান্য কিছু টাকা দিয়ে পান্নার পাপের ভিটায় একটা চৌচালা ঘর

তুলে বসবাস শুরু করলেন। মাসিক পেনশনের টাকা দিয়ে সংসার চলে না। কোনোরকম কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন। মানুষের জীবনে কখন কি ঘটে যায় তা উপরওয়ালা ছাড়া কেউই বলতে পারে না। নইলে এমন একটি সাজানো সংসার মাঝপথে পথ হারাবে কেন? সর্বদাই কেদেকেটে সময় যায়। কি হয়ে গেল, ছেলে-মেয়ে মানুষ হবার পথে থোর ধানের মাথায় আঘাত পড়ল।

এসএসসি পরীক্ষা ফল বেরোলে দেখা গেল পান্না পাস করেছে। কিন্তু পান্নাকে উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য মিসেস শেফালী বেগমের নেই। এমন সোনার টুকরো মেয়ে, তার কপালে আগুন লেগে গেল। হায় রে বিধি তোমার লীলা বোঝা দায়। দুশ্চিন্তায় অভাবে অনটনে মিসেস শেফালী বেগম একেবারে ভেঙে পড়লেন। একদিন পান্না তার মাকে অভয় দিয়ে বলল, মা, কেদো না তো। আমিই সংসারের হাল ধরব। যেভাবেই হোক কাওসারকে লেখাপড়া শিখাব।

মেয়ের কথায় সান্ত্বনা পেলেও ভরসা খুঁজে পান না তার মা মিসেস শেফালী বেগম। এইটুকু মেয়ে কি করবে? মিসেস শেফালী বললেন, না তোমাকে কিছু করতে হবে না। কারিগর পাড়ায় সুতা কেটে তবেই সংসার চালাব। আর কায়সারের লেখাপড়া চালাতে হবে। মা-মেয়ে দু'জনেই সংসারের হাল ধরার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল। কতটুকু কি করতে পারে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

পান্নাদের বাড়ির পাশেই একটি শিশুদের বিদ্যায় নিকেতন করা হয়েছে। সে শিশু বিদ্যালয়ে পান্নার ডাক পড়ল পড়ালেখা করানোর জন্য। পান্না সাংসারিক অভাব- অনটনের কথা চিন্তা করে এ শিশু স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য বিনা বাকব্যয়ে রাজি হয়ে গেল। বাচ্চাদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দান ছাড়াও ছড়া গান শিখানো পান্নার দায়িত্ব। মাসিক বেতন পাচশ টাকা। যা হোক, সে স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে দিল। বাচ্চাদের পড়াতে গিয়ে তাকে নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতে হয়। দিনে দিনে সঙ্গীত জগতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। সুমিষ্ট কণ্ঠ পান্নার। বিশেষ করে পল্লী সঙ্গীতে তার দরাজ কণ্ঠ সকলকেই মুগ্ধ করে। বিদ্বজ্জনেরা মন্তব্য করেন, এই মেয়ে একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে।

পান্নার জন্য এখন একটা বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় বখাটে তরুণ রতন তার পিছু লেগেছে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে সে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। অনেক সময় অন্য ছেলেদের নিয়ে শিস দেয়। এসব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পান্নার কণ্ঠ অনুশীলন চলতে লাগল। কোনোভাবে তাকে দমাতে কেউ পারল না। একদিন শোনা গেল সন্ত্রাসী বখাটে যুবকটা চাঁদা আদায় করতে দিয়ে গণপিটুনি খেয়েছে এবং পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পথের কাঁটা সরে যাওয়ায় পান্নাকে আর অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। তার স্কুলে যাওয়া আসা অব্যাহত থাকল। স্কুলে মাইনে যা পায় তা দিয়ে অন্তত বাজার খরচ হয় এবং নিজের জামা কাপড় সে নিতে পারে।

মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে পান্নার দিন ভালো কাটছিল। পান্নার মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল সে যদি বেতারে টিভিতে গাইতে পারত। কিন্তু কে তাতে সাহায্য করবে। বেতারে টিভিতে গাওয়ার সুযোগ কে করে দেবে। কল্পনায় কখনও বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখে পান্না।

এজন্য পরিশ্রম করে। আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ে গান গাওয়ার জন্য॥ গান শুনে দর্শক স্রোতা উদ্বেলিত, বিপুল করতালি দিয়ে তাকে সংবর্ধিত করে। যৌবনের ময়ুরাসনে বসে কিসের আশায় কেন যে বুক বাঁধে। কোথা আছে মাসুম? আর কি কখনও দেখা হবে? মাসুম এখন কি করে? একাকী কত কি ভাবতে ভাবতে পান্না ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে মাসুমের সাথে রাজপুত্র রাজকন্যা সেজে জলকেলি করে সরোবরে। নেচে গেয়ে বেড়ায়। ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বড় একা মনে হয়।

আজ শক্রবার আজকে পান্না তার পরিবারের সাথে একটু ভালো খাবার খাবে। পুরো সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড খাঁটুনিতে পান্নার পান্নার শরীর ভেঙে পড়েছে। তাই সে একটি মুরগি জবাই করেছে। পান্নার মা পোলাও করেছে। দুপুরে খাবার সময় দুই ভাই-বোন আর তাদের মা সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়। তখন মনে হয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে শেফালী সুখেই আছে। মিসেস শেফালী একমনে বলে যেতে থাকে বাচ্চাদের বাবা জীবিত থাকার সময়কার নানা সুখময় স্মৃতি। বলে যেতে থাকেন, শাহীদপুরের কাচারির পুকুরে টিপূর বড় বড় মাছ ধরার কথা, পান্নার বাবা বড় মাছের ভাজি খেতে খুবই পছন্দ করতেন। পান্নাকে ইঙ্গিত করে শেফালী বেগম বললেন, তোর কি মনে পড়ে তুই আর মাসুম একবার মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে? তার পর কি লস্কাকাণ্ডুই না হয়েছিল। অফিসের পিয়ন নাছির তোদের খুঁজে পায়। মাসুমের কথা বলায় পান্না পুলক বোধ করে কিন্তু মেলায় স্মৃতি রোমন্থন করে পান্নার মা বলতে লাগল, তোর বাবা সিরাজগঞ্জে বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আর দেখা হয়নি মাসুমদের সাথে। মাসুমের আন্মা খুবই ভালো ছিলেন। আমরা ছিলাম গলায় গলায় ভাব। একটা কিছু ভালো রাখলে আমাদের না দিয়ে খেত না। আমরাও তাই করতাম।

এই অনুকূল পরিবেশেও পান্নার অন্তরে মাসুম যে কী স্থান অধিকার করে আছে পান্না বলতে পারল না। কায়সার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না পান্না। অবচেতন

মনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল পান্নার মুখাবয়বে। শেফালী বেগম পান্নাকে বলল, নে মা আর একটু ঝোল দিই। পান্নার আর খেতে রুচি হচ্ছিল না। তাই সে বলিল, না মা আর খাব না।

শেফালী বেগম বললেন কি রে এইটুকু খেয়েই তোর খাওয়া শেষ? কি হয়েছে বল তো?

পান্না বলল না, মা কিছু না।

কিছু না বললেই হলো। মাসুমদের কথা বলতেই যে পান্না থমকে গেছে, পান্নার মা ঠিকই তা টের পেয়েছেন। মেয়ে বড় হয়েছে তাই আর কি তিনি কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, বদলির পর আর দেখা হলো না। মাসুম বোধহয় এখন অনেক বড় হয়েছে।

মায়ের কথা শুনে পান্নার মাথায় বিজলি খেলে গেল। পান্না মাথা ধরেছে বলে সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আজ থেকে আট বৎসর আগের কথা, কোথায় কখন মাসুমের সাথে পান্নার মালা বদল হয়েছিল। মাসুমকে সে কি বলে আশীর্বাদ করেছিল, মাসুম কি সে কথা আজও মনে রেখেছে? নাকি তাকে ভুলে গেছে? আজ পর্যন্ত মাসুমের খবরটা পাওয়া গেল না। একবারও কি সে তাকে দেখতে আসতে পারে না? নানা প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করল। বাবা মারা যাবার পর তার জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। তার জন্য কেউ নেই। তার উন্নতির পথ তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যৌবন জোয়ারে এ সময় ভেসে যেতে ইচ্ছে করে অথৈ সাগরে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তার মনে পড়ে বয়ঃসন্ধিকালের সেই মুহূর্তগুলো যা তার মনের পরশ পাথরে খোদাই করা আছে।

সামাজিক শৃঙ্খলের বাধায় পড়ে থাকা তার দেহখানি শুধু কাঁদে। কারণ এ মন তো হারিয়েছ সেই কোনোদিন মাসুমের মনে। আজ মাসুম কাছে নেই। আজকাল মা প্রায়ই বলছেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। টিপু মামা ঘর জোগাড়ে ব্যস্ত। কখন জানি কি হয়ে যায়। মাসুমের ভালোবাসার আমানত কি আমি রক্ষা করতে পারব? পান্নার বুক ধুক ধুক করে ওঠে। সে কল্পনাও করতে পারে না।

মাসুম ছাড়া তার জীবনসাথী অন্য কেউ হবে? যৌবন মানে না আইন ।
অন্ধকারেও আপন আলোয় ভেসে ওঠে । সংসারের যঁতাকলে কত দিন
তাকে পিষ্ট হতে হবে । কত দিন দমন রাখবে উচ্ছ্বাস । না কি এ প্রেম
তাকে সংসার বিরাগী করবে? এ কথা ঠিক যে সে যদি মাসুমকে না
পায় তবে আর যাই হোক সংসার করবে না । প্রয়োজন হলে চিরকমারী
রূপে জীবনযাপন করবে ।

নবম অধ্যায়

সবরে মেওয়া ফলে একটা কথা আছে। মাসুমের জীবনেও তাই ফলেছে। দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ থেকে মাস কয়েক হলো সে বকেয়াসহ বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেছে। এখন তার আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও শহরে সে একটা পাকা রুম ভাড়া করেছে। মাসে পাঁচশ টাকা। কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছে। এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র দু'মাস বাকি। সে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। যে করেই হোক ভালো একটা পাস করতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জন করেছে। রেডিওতে নিয়মিত গীতিকার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। এখন তার বাসায় নামিদামি শিল্পীরা আসে। সুরকার তার লেখার জ্যে বায়না দিয়ে যায়। যখনই মেয়ে শিল্পীরা তার দরোজায় গানের জন্য হানা দেয় তখনই সে কিছুটা বিব্রত বোধ করে। এমনিতেই সে মেয়ে-ঘেঁষা নয়। তদুপরি তার মনে জেগে ওঠে পান্নার স্মৃতি। পান্নাকে সে ভুলতে পারে না। ভুলবে কি করে? পান্না যে তার অস্তিত্ব। দুঃখ-কষ্ট আর কষ্টকময় জীবনে পান্না তার সঞ্জীবনী শক্তি। পান্নার দেয়া ভালোবাসা তাকে দিয়েছে অজয়কে জয় করার সাহস। তাকে শিখিয়েছে মানবতা। জীবন সংগ্রামে একটা মেয়ের ভালোবাসা যে কীরূপ মোহনীয় ভূমিকা পালন করে তা মাসুম হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে।

আজ কত দিন হলো দেখা নেই, পান্নারা আজ কোথায় আছে কে জানে? তার অনেক অন্যায় হয়েছে। পান্নার খোজখবর নেয়ার দরকার ছিল। সে কেন খোজখবর নেয়নি, সেজন্য সে অপরাধ বোধে ভুগছে। কিভাবে নেবে পান্নার খোজ? এতদিন তো তার পায়ের নিচে মাটি ছিল না। নানারকম বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা আর অসঙ্গতির মধ্যে নিখাদ সত্যেও সন্ধান পেতেই তো দশটি বছর কেটে গেল। অথচ অর্থাভাব তাকে কত ঘাটের জলই না খাইয়েছে। আচ্ছা, পান্নার কি

বিয়েশাদি হয়ে গেল? হ্যাঁ, তা কি করে সম্ভব? পান্না কি তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে? না তো সম্ভব নয়। কোনোমতেই পান্নার মন সায় দেবে না। পান্নার মন সায় না দিলে কি হবে, তার মা-বাবা তো ব্যবস্থা করে ফেললে তা মেনে নিতে হবে। তাহলে কি পান্নাকে সে পাবে না? তাও মাসুম মেনে নিতে পারে না। তার পৌরুষ জাগ্রত হয়ে ওঠে। যে করেই হোক পান্নার খোজখবর নিতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা শেষ হলে সে একবার সিরাজগঞ্জ ঘুরে আসবে।

মাসুমের মনে অজস্র প্রশ্ন দেখা দিল। মাসুম আজ পান্নার কথা মনে পড়তেই কেমন যেন উদাসী হয়ে পড়ল। সঙ্গীতজগতের মেয়েদের ভিড়েও পান্নার কণ্ঠ আজও তার কানে বাজে। আজও পান্নার ভালোবাসার ছোয়া তাকে সম্মোহনী মন্ত্রের মতো আকর্ষণ করে। পান্নার আশায় সে আর সব মেয়েদের সংস্রব এড়িয়ে চলে। ললিতার প্রেম সে প্রত্যাখ্যান করেছে। করেছে লীমা, যাইরীন আরও নামিদামি শিল্পীর প্রেমের আবেদন। তার মনে কোনো দ্বিধা নেই একদিন সে পান্নাকে পাবেই। পান্না ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দার সে গ্রহণ করবে না। প্রয়োজন হলে অকৃতদার থাকবে সারাজীবন। সেও ভালো। পান্নাই তার জীবন, পান্নাই তার মরণ।

কর্মের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আজ এত দূর পথ এগিয়ে এলেও কখনও এক মুহুর্তেও জন্য সে পান্নাকে ভুলেনি। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিপালিত মাসুমের জীবনে-যৌবনে পান্না মিশে আছে যেমন পানির মধ্যে মাছ ডুবে থাকে। পানি ও জলজীব একে অপরের পরিপূরক। মাসুম এখন ভরা যৌবনে পা দেয়া বাড়ন্ত যুবক। খোদার রহমতে পরিশ্রম আর সাধনার বদৌলতে সব শিক্ষাই সে পেয়েছে। জ্ঞান সাধনা আহরণে সে কোনোদিন গাফিলতি করেনি। তাই বলে সে সন্ধ্যাসী নয়। সে প্রেমিক রোমান্টিক কবি। পান্না তার মানস প্রতিমা।

এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো আজ দু'দিন। মাসুমের খুব ইচ্ছে করছে তার মাকে দেখার জন্য। মা-বাবার সাথে কয়েক দিন থেকে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসবে। অফিস থেকে যথারীতি ছুটি

নিয়ে সে বাটীতে গেল। খাওয়ার টেবিলে বসে মাসুম যখন মায়ের বানানো পিঠে খাচ্ছিল, ঠিক তখনই মা মাসুমের বিয়ের কথা বলল। কোনোরকম ভূমিকা না করেই মিসেস রীনা বলল, মাসুম তোর তো চাকরির বাক্সি ঝামেলা শেষ হয়েছে, এবার একটা বউ আন।

বইয়ের কথা উচ্চারণ করতেই মাসুমর গলায় খাদ্য আটকে যাবার উপক্রম হলো। কাশতে কাশতে যখন অস্থির তখন পানি পান করে খাবার গলার ওপারে নামিয়ে মাসুম বলল, মা আর খাব না।

কেন আর একটু খা। বললেন মা।

না, মা আমি আর খাব না। মাসুম বলল।

মাসুমের মা মাসুমকে হাত ধোয়ার পানি এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবা মাসুম কথাটা একটু চিন্তা করে দেখিস।

মাসুম কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা শোবার ঘরে চলে এলো। কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে মাসুমের মা মাসুমের বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, দেখলে হে, তোমার ছেলেকে বিয়ের কথা বলায় কোনো উত্তরই দিল না।

জসিম ভূইয়া বললেন, মাসুমকে ভাবতে দাও। বলেছ ঠিক আছে। ছেলে ভাবুক, সে বড় হয়েছে, তার তো একটা মতামত আছে বুঝলে। মতামতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী আমি নই।

ছুটি শেষে সপ্তাহখানেক পরে মাসুম যথারীতি তার কর্মস্থলে ফিরে এলো। ঢাকায় এসেই মাসুম তার বড় বসের সাথে আলাপ করে বিশেষ কারণ দেখিয়ে দিন পনের ছুটি মঞ্জুর করাল। সোজা চলে এলো সিরাজগঞ্জ। ডিসি অফিসে এসে সালাম খানের ঠিকানা জোগাড়ের ব্যবস্থা নিল। ডিসি অফিস থেকে জানল সালাম খান তো সাত বছর পূর্বে সিরাজগঞ্জ থেকে চলে গেছে নিজ জেলায়। নিজ জেলা কোথায় জানতে চাইলে বলে দিল ঢাকায়। স্টেশন নবাবগঞ্জ। যাই হোক, একটা হদিস তো পাওয়া গেল।

সিরাজগঞ্জ থেকে সে যাত্রা মাসুম ফিরে এলো ঢাকায়। ঢাকায় এসে খোঁজখবর নিয়ে সে দেখল সালাম খান মারা গেছেন দু'বছর

হলো। কিন্তু তার পরিবার কোথায় আছে এখন কর্তৃপক্ষ বলতে পারল না। তা বলবেইবা কি করে। চাকরি থেকে সরে গেলে কে কার খোঁজখবর রাখে। যাক, মাসুম মনে মনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাহলে পান্নাদের কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। যে করেই হোক তার মনে খোঁজাখুঁজির আগ্রহ বেড়েই চলল। সে প্রতিজ্ঞা করল, আজ হোক কাল হোক সে পান্নার খোঁজ নিয়েই ছাড়বে।

মাসুমের মৌলিক চিন্তা-চেতনার জন্য, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য ইতিমধ্যেই মাসুমের নাম, খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও একজন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে মাসুমের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার কাব্যগ্রন্থ প্রতিমা দর্শন জাতীয় সাহিত্য পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছে। দেশের সর্বত্র চলছে তার সংবর্ধনা। ইসলামি এলমে মারোফাত জগতের সাথে বাস্তবতার সমন্বয়ে এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়ে মাসুম ভূইয়া তৈরি করে চলেছেন সম্মোহনী শক্তিময় তার মৌলিক লিরিক। সে সাহিত্যরসিক অতিক্রম করে চলে গেছে আপামর জনসাধারণের মনের মণিকোটায়। কালজয়ী মাসুম ভূইয়া একদিন হয়তো বাংলা সাহিত্যের গৌরবে পরিণত হবেন। বিশ্বের দরবারে তার অমূল্য জ্ঞানগর্ভ লেখা যেমন একদিকে ধর্মের নামে ভণ্ডামি বকধার্মিকের মুখোশউল্লোচন করেছে তেমনি অকপট উচ্চারণ করেছেন সত্য। এ বয়সে তার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে লেখা রয়েছে এবং এখনও যা লিখে যাচ্ছে তার সার্থক আলোচনা করতে গেলে রীতিমত একটি বই লেখা হয়ে যাবে।

যে লেখকের বাহিরে এত সুনাম, জনসমুদ্র যার লেখা পড়ার জন্য, যাকে এক নজর দেখার জন্য, এমনভাবে আকাংখা করে মানুষ তারই মনোজগৎ একজনের দিকে চেয়ে আছে, নিরন্তর হৃদয় ভেঙে খান খান হচ্ছে পরমাণুর মতো লক্ষ খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে অপরিমের শক্তি, তিনি আর কেউ নন তিনি পান্না দেবী। মনের মণিকোটায় স্থাপিত প্রতিমা। এ জনমে তাকে না পাওয়া গেলে হয়তো সৃজিত হবে ইতিহাস। কিন্তু যৌবন! তার কি হবে। এ তো চলে গেলে

আর ফিরে আসে না। এ যে প্রতিমার অধিকার, প্রিয়তমাকে অধিকার বঞ্চিত করে কি লাভ। জীবন তো একটাই। পান্নাকে পাওয়ার জন্য মাসুম চেষ্টা করছে কিন্তু পাবে কোথা?

দশম অধ্যায়

পান্নার শিশু নিকেতন স্কুলে সেবার বার্ষিক শিশু সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়েছে। সে প্রতিযোগিতায় পান্না গীতিকার মাসুম ভূঁইয়ার একটি ছড়া গান বাচ্চাদের দিয়ে গাইয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু দীতিকার মাসুম ভূঁইয়া যে তার প্রিয়তম, পান্না সে কথা জানে না। স্কুলসহ নবাবগঞ্জ এলাকায় শিল্পী পান্নার নাম সকলেই জানে। এলাকার যে কোনো সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে পান্নার গান গাইতে হয়। পান্না এলাকায় পান্না ম্যাডাম নামে পরিচিত। পান্নার আভাবকত্বহীন জীবন পান্নাকে দিনরাত দুশ্চিন্তায় রেখেছে। পূর্ণ যুবতী পান্না আর কতকাল এভাবে একাকী জীবন কাটাবে। বাচ্চাদের সঙ্গীত শিখিয়ে, প্রাইভেট পড়িয়ে এখন তাদের সংসার সে সচ্ছলতার দিকে নিয়ে গেছে। পিতার মৃত্যুও পর তার ওপর যে ধকল গেছে এখন খানিকটা পান্না ম্যাডাম কাটিয়ে উঠেছে। ছোট ভাইটি এবার এসএসসি পাস করেছে। কায়সারের ইচ্ছে হলো বিদেশে যাওয়া। বিদেশের ব্যাপারে কায়সার নাছোড়বান্দা। পান্নার ব্যাংকে কিছু টাকা জমানো ছিল। তাই দিয়ে কায়সারকে পান্না মধ্যপ্রাচ্য পাঠিয়ে দিল। এখন সংসারে সে আর তার মা। মোটামুটি সুখেই দিন কাটছে। চিরকুমার টিপু মামা মাঝে মাঝে এসে পান্নাদের সংসারের খোজখবর করে। এখন পান্নার মা পান্নার একটা গতি করতে পারলেই বাঁচে।

একদিন টিপু মামার সাথে পান্নার মায়ের বিকেলবেলা চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। মিসেস শেফালী বেগম বললেন, টিপু, পান্নার জন্য একটা বর দেখার দরকার। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ের বয়স। ভালো একটা ছেলে পেলে, বিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্যটা শেষ করতে চাই। মেয়েটি অনেক কষ্টসাধ্য করে সংসারটা ঘুছিয়ে রেখেছে। নইলে যে কী হতো। পান্নার বাবা মারা যাওয়ার পর তো সংসার চলার আর কোনো উপায়ই ছিল না। পান্না না হলে কায়সারের বিদেশ যাওয়া হতো না।

টিপু এতক্ষণ ধরে তার ভগ্নীর কথা শুনছিলেন। তিনি মুখ খুললেন, বললেন আপা, তুমি কি ভাগ্নীর সাথে এ বিষয়ে কোনো আলাপ আলোচনা করেছে? পান্নার মতামত আছে কি না তা তো জানা দরকার।

মিসেস শেফালী বেগম অবাক হয়ে কুচকে বললেন, 'দেখো দেখি বলে হে টিপা। তা আবার মেয়ের মতামত কিসের? একটা ভালো ঘর হলেই তো চলে। কথায় বলে না মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ভাত দেখে, বংশ মর্যাদা না অর্থ সম্পদ থাকলে তবেই তো তাহলে মেয়ে সুখে থাকবে।

টিপু মামা সহাস্য বদনে বললেন, তা তো ঠিকই আছে, সুখে থাকবে। তবে বলছিলাম কি, যে মানুষের সাথে ভাগ্নীর জীবন কাটবে তার সম্পর্কে জানার আছে না কি।

টিপু মামার খোঁচা মারা প্রশ্নে ততোধিক রাগান্বিত হয়ে শেফালি বেগম বললেন, বলে কি রে ছোড়া, আগে ঘর দেখো, তারপর ছেলে দেখে শুনেই তো বিয়ে দেব।

আচ্ছা ঠিক আছে, বললেন টিপু। চা খাওয়া শেষ করে সেদিনকার মতো টিপু মামা উঠে গেলেন। টিপু মামা একদিন পান্নার সাথে আলাপ করলেন। এ বিষয়ে পান্নার মতামত জানার প্রস্তাবে পান্না হ্যা-না কিছু না বলে সোজা উত্তর দিল, বড় শিল্পী না হয়ে এবং এমও পাস করার পূর্বে সে বিয়ে করবে না। সে বলল, মামা, মা যখন তোমাকে বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তখন দয়া করে আপাতত আমার বরের ঘর না দেখলেও চলবে। যখন আমার সময় হয় তখন তোমাকে বলব, কি ঠিক আছে না?

ভাগ্নীর কথা শুনে মামার চোখ কপালে উঠে গেল। বলে কি হে দাস্যি মেয়ে। ভাবছেন মামা। মামার নীরবতায় পান্না একরকম জোর করে কথা আদায়ের প্রত্যাশায় বলল, মামা বলো তুমি এখন আর কোনো বর জোগাড়ের চেষ্টাতদবির করবে না।

মামা সংশয়যুক্ত কণ্ঠে বললেন, কেন?

ভাগ্নী বলল, সময় হলেই কেনন উত্তর জেনে যাবে।

তাই নাকি? আচ্চা ঠিক আছে।

বলতেই পান্না উল্লসিত হয়ে বলল, লক্ষী মামা, তোমার মতো মামাই হয় না।

মামা বুক সটান করে বলল, হে হে হে দেখতে হবে না মামাটা কার?

মামা ভাগ্নীর চুক্তি সম্পাদন হলেও ভয় কিন্তু কাটল না। আর সে ভয় হচ্ছে পাড়ার মানুষের সমালোচনার ভয়। নিন্দুকেরা বলাবলি করছে নায়েব সাহেবের ইয়া বড় খিঙ্গি মেয়ে। এখনও বিয়ে হচ্ছে না, বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। কে আসবে এই নচ্ছার মেয়েকে বিয়ে করতে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোনো সমালোচনাই পান্না পাত্তা দেয় না। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা মাসুমের খোজ সে করবেই এবার ভাবছে। কিন্তু এত দুনিয়ায় আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া যে তার খোজ পাওয়া যাবে না, এ কথা নিশ্চিত। অথচ কাউকেউ এ কথা বলা যাচ্ছে না। কারও কোনো সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না। স্বয়ং খোদাতায়ালা যদি সাহায্য না করেন গায়েবি বদদ দিয়ে তবে তার আর মাসুমকে পাওয়ার রাস্তা নেই। তাই সে রাত গভীর হলে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে একান্ত মনে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে। অসহায়ভাবে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে, কদেকেটে মাসুমকে পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

মনে মনে সুসাহিত্যিক ছড়াকার মাসুম ভূইয়াই তার প্রিয়তম অনুসন্ধান করে একটি দৈনিকের সম্পাদকের নিকট সে টেলিফোন করেছিল। সম্পাদক সাহেব উত্তরে বলেছে, মাসুম ভূইয়ার বায়োডাটা তাকে দিবেন। তবে একটু সময় লাগবে। কারণ মাসুম ভূইয়া প্রতি পনের দিনে একবার পত্রিকা অফিসে আসেন। তার সাথে কথা বলে তার বায়োডাটা সরবরাহ করা যাবে।

পান্না নিশ্চিত হয়ে সেদিন ফোনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। পত্রিকার অফিসে এমনিতেই লেখকদের বায়োডাটা সংরক্ষিত থাকে। তবুও লেখকের সম্মতিসাপেক্ষে তথ্যাদি পাঠকদের সরবরাহ করা হয়। পত্রিকার সম্পাদক প্রদও বায়োডাটায় পান্না নিশ্চিত হলো, এই সেই মাসুম। একাকী কিভাবে মাসুমের দেখার কাজটি আরও সহজ করে দিলেন। আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে কায়কাবাদ সাংস্কৃতিক পরিষদের মহাকবি কায়কোবাদেও জন্মতিথিতে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেই সাংস্কৃতিক পরিষদের অনুষ্ঠান তরুণ সাহিত্যিক মাসুম ভূইয়া প্রধান অতিথি। শিশু নিকেতন স্কুলের শিক্ষকগণকে দাওয়াত দেয়া হলো। আর পান্নাকে বলা হলো গীতিকার মাসুম ভূইয়ার প্রসিদ্ধ কয়েকটি গান পরিবেশন করার জন্য। পান্না তো সোৎসাহে মাসুমের গান রেহার্সেল দিচ্ছিল।

একটু পরেই গাড়ি থেকে নামলেন তরুণ সাহিত্যিক মাসুম ভূইয়া। বাল্যকালের সেই ভালবাসার মানুষটাকে দেখে পান্নার ভিতরটা কেপে উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। তখনও মাসুম পান্নাকে দেখেনি। উপস্থাপক অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানালেন আসন গ্রহণ করার জন্য। কবি কায়কোবাদের উপর স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা ও পরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা চলছে।

মাসুম ভূইয়ার বৃত্তা দর্শকরা পিনপতন নীরবতায় গুনছিল। সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আর কেউ করেনি। মহাকবির জীবনের আলোচনার ছাড়াও স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন মাসুম ভূইয়া। জাতির নৈতিক মান উন্নীত করার সাহসী উচ্চারণ তার লেখার স্পষ্ট। গ্রীন রুমে সবই গুনছিল পান্না। একটু পরেই সাংস্কৃতিক এক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুন্যর জন্য অতিথিবৃন্দ বসেছেন। প্রথম ক'জন শিল্পী, নিকেতনের শিশুশিল্পী গান পরিবেশনের পর, মঞ্চে এলো পান্না। অনুষ্ঠানে বিপুল করতালি উঠল।

এ কি পান্না। সেই পান্না মাসুম তার দু'চোখে সর্বে ফুল দেখতে লাগল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। এক নজর দেখে চোখ বুজে

খানিকটা নিজেকে সামলে নিলেন। কিন্তু বুক ভরা আনন্দে চিৎকার করে ডাকার ইচ্ছে হলো মাসুমের পান্না এসো আমার বুকে, এসো। কত দিন যাবৎ তোমার আমি দেখি না, তোমাকে না দেখতে দেখতে আমার দু'চোখ যেন পাথন হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ এ অনুষ্ঠানের মধ্য মণি মাসুম নিজেকে সামলে নিলেও চিন্তা করল, যে করেই হোক পান্নার সাথে তার কথা বলা চাই।

অনুষ্ঠান শেষে গুরু হলো মাসুমের অটোগ্রাফ দেয়ার পালা। সামনে এলো পান্না। পান্না মাসুম মুখোমুখি হতেই মাসুম বলল, তোমাকে কি অটোগ্রাফ দেব। আমি আমার সবই তো তুমি। বেচারি পান্না আনন্দাশ্রু আর রাখতে পারল না। কেদেই ফেলল। এতটুকু লেখা কাগজটি হাতের মুঠোয় পান্না অসুস্থ হয়ে পড়ল। ধরাধুরি করে তাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এলো লোকজন।

অনেকক্ষণ পর পান্না যখন ক্লিনিকে বসে আছে, এমন সময় মাসুম তার কাছে গিয়ে হাজির। নির্জন কামরা, কেউ নেই, শিল্পী পান্নাকে দেখতে গেছেন মাসুম ভূইয়া। আধঘণ্টা ভরে মনের মতো দু'জন দুজনের সাথে মিশে কথা বলল। তাদের সে অনুভূতি যেন ভুলবার না। এই সময়ের অপেক্ষাই তারা করছিলেন দীর্ঘ দিন। মরু সাহায্য হঠাৎ অলৌকিক বারিবর্ষণ আল্লাহপাকের তরফ হতে ঈমান পরীক্ষা কিনা তা বিধাতাই ভালো জানেন।

একাদশ অধ্যায়

মাসুম এত দিন যে চাকরি করছিল জীবিকার দায়ে তা এখন বদলানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। উচ্চ শিক্ষিত এ যুবক অবশ্যই মর্যাদাসম্পন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তারই বিভাগে মাসুম প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদে পরীক্ষা দিয়েছিল। সে ঐ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলো। এখন সরকারের নিয়োগ কর্তৃপক্ষ যদি তাকে সে পদে নিয়োগ দেয় তাহলেই হয়। পরপর তিন বার সে এই পরীক্ষায় পাস করেও নিয়োগ পায়নি। সব সম্ভবের এ দেশে চেষ্টাতদবির করে তার পদ অন্যে কেড়ে নিয়েছে। এ দেশে যোগ্যতার মূল্য নেই। যার অর্থ আছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তারই মাথায় তেল দিতে দেখা যায় সকলকে। ফলে এবারও মাসুম তার চাকরিটা হবে কি হবে না তা নিয়ে ভাবছিল। আচারসর্বস্ব প্রথার বিরুদ্ধে ছিল মাসুমের কলম উচ্চকিত। ধর্ম পালনের নামে যখন সর্বত্র চলছে ধর্মান্ধতা, ভণ্ডামি আর আত্মিক শ্রীবৃদ্ধি শূন্যের কোটায় সমাজের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের তখন সে অবস্থা উত্তরণকল্পে সাবলীল ভাষায় লেখনীর মাধ্যমে তার কলম স্পষ্ট প্রতিবাদ করল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেল প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীরা। পত্রপত্রিকায় তার বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালেখি হলো। এমনকি ধর্ম ও মানবতা বইটি নিষিদ্ধ করার জন্য দেশের সর্বত্র প্লোগান উঠল। মুসলমানরা তাকে গালি দিতে লাগল, হিন্দুরা ধর্মদ্রোহী অন্যান্য ধর্মের নেতারাও তাকে গালি দিতে ছাড়ল না। আবার অন্ধকার নেমে এলো তার জীবনে। একদিকে কর্ম জীবনে কাঙ্ক্ষিত পদ না পাওয়া, অন্যদিকে দেশব্যাপী তাকে নাজেহাল করার ঝড় দুয়ে মিলে মাসুম একটা অস্থির মধ্যে সময় কাটাচ্ছিল। সে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছিল, আল্লাহ যেন এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন। সত্য উচ্চারণ করে যাওয়ার শক্তি দেন। অকুতোভয় মাসুম রাত জেগে লিখে চলেছে। মাসুমের রুহের বা আত্মার রিপু দমন, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র

উন্নত সাধন করার যে জীবন, সেই জীবন ও সমাজের দর্পণ, তার লিরিক ইতিমধ্যেই ভাষান্তরিত হয়ে বিশ্বের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রচণ্ড ধীশক্তি সম্পন্ন ও সাহসী সে। সে বিশ্বাস করে অসত্যের এ মেঘ একদিন কেটে যাবেই। আজ হোক কাল হোক মানুষ তথা দেশবাসী একদিন তার মনুষ্যত্বের খাঁটি ধর্মের বাণী অবশ্যই মেনে নেবে।

একদিন বিকেলে মাসুম তার বাসায় বসে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভাবছিল। কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর ধর্ম ব্যবসায়ীরা তার উপর ক্ষেপে গেলেও মানবতাবাদী, প্রগতিশীল মানুষ তাকে সাধুবাদ জানায়। হক্কানী ধর্মী আলেমরা তার ভাবধারায় কখনও মিথ্যা বা ধর্মদ্রোহী কিছু দেখতে পায়নি তার লেখায়। এখন মাসুম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, কখন জানি কি হয়ে যায়। যেভাবে সন্ত্রাস-রাহাজানি সর্বত্র বিরাজমান, প্রতিক্রিয়াশীলদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা তার উপর হামলা চালাতে পারে। মাসুম যখন এসব ভাবছিল তখন বেলা বারোটো হবে। লেখার টেবিলে সে বসে আছে এমন সময় পান্না এসে উপস্থিত। সঙ্গে তার টিপু মামা। টিপু মামা ও পান্নাকে দেখে মাসুম বসতে বলে উঠে গেল নাস্তা জোগানোর জন্য বাহিরে। বাহির থেকে এসে নাস্তা পরিবেশন করে বললেন, এখানে আমি একা থাকি। স্বপ্ন বেতনের চাকরি, তাই কোনোরকম মাথা গুঁজে আছি।

টিপু মামা একটু রস করে বলল, সেদিনের সেই মাসুম আজ অনেক বড় হয়েছে। তোমাকে দেখে মনে হয় না সেদিনকার সেই ছোট শিশুটি আজকের টগবগে তরুণ। তা মাসুম তোমার বাসা চিনেছি, এখন থেকে প্রায়ই আসব। কিছু মনে করো না যেন।

মাসুম বিনয়সহকারে বলল, মামা বলছেন কি। আসবেন, আসবেন অবশ্যই আসবেন।

টিপু মামা মুখে যাই বলছেন ভিতরে ভিতরে ভাবছিলেন, দেশ বরণ্য একজন লেখক এভাবে একটা অগোছানো ঘরে থাকছেন, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যাক, তিনি

পান্নাকে বললেন, ভাগ্নী তুমি থাকো আমি ঘণ্টা দুয়েক পরে বাহিরে একটু কাজ আছে ঘুরে আসছি, বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

টিপু মামা বিদায় নিতেই পান্না মুখ খুলল। বলল, মাসুম আমি মামাকে ম্যানেজ করে নিয়ে আসছি শুধু। তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। ওই দিন অনুষ্ঠানে এত দিন পরে তোমার সাথে দেখা, কোনো কথাই বলতে পারিনি।

মাসুম বলল, সে দিন বলতে পারো নি আজ বলো কি বলবে।
কি আর বলব, পান্না বলল।

কেন কিছু বলার নেই তোমার মাসুম জিজ্ঞেস করল।

পান্না বলল, আমার কিছুই ভালো লাগছে না মাসুম, তোমার বিছানায় কি একটু শুতে পারি।

কেন শুতে পারবে না, শোও। তোমার কি খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ আমার খারাপ লাগছে, ভীষণ মাথা ধরেছে।

তাই নাকি। মাসুম বলল, আমার ড্রয়ারে মাথা ধরার ওষুধ আছে, দেব?

দাও, বলল পান্না।

আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি সটান সোজা শোও। মালিশটা দিচ্ছি। টাইগার বাম, একটু ঝি ঝি করবে, পরক্ষণেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

মাসুমের হাতের ছোঁয়ায় পান্নার শরীর আরও নিস্তেজ হয়ে আসছে, নিজেকে সামলে নিয়ে মাসুমের হাত চেপে ধরে বলল, মাসুম এ ভাবে আর কতদিন চলবে? আমি যে আর সহিতে পারছি না। বিয়ে নিয়ে নানা সমালোচনা শুনতে হয়।

পান্নার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিয়ের শব্দটি শুনার পর পরই মাসুম প্রথম বুঝতে পারল যৌবনের আহাজারি আর তার সামাজিক অত্যাচারের কথা। কি বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না মাসুম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, পান্না তুমি তো জানো তোমাকে না পেলে আমার পৌরষ বৃথা, কেঁদে কেটে

দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। সেই কবে তোমাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলুম, সে হতে আজ অবধি তোমাকে একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি। তোমার দেয়া ভালোবাসা আমার দুঃখ কষ্টের জীবনে শক্তি যুগিয়েছে। উন্নতির পথ দেখিয়েছে আলোকবর্তিকা রূপে। আজ অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তোমাকে ঘরে তুলে নেয়া। আমাদের মনের মিলন তো হয়েছে সেই কবেই। বাকি রইল এর সামাজিক স্বীকৃতি। এ আর কি বিষয়।

মাসুমের কথাগুলো চোখ বুজে শুনছিল পান্না আর নিজেকে মনে মনে বধু রূপে সঁপে দিচ্ছিল। মাসুমের হাত চেপে ধরে মাসুমের বুকে মাথা রেখে উষ্ণ সোহাগ, ভালোবাসা অনুভব করছিল। এ কি মাসুমের শরীর যে পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কই সে তো বলছে না। পান্না তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত দিল। তাই তো জ্বর আছে শরীরে। পান্নার মাথাব্যথা ছিল মাসুমের সোহাগ পাওয়া হাতের ছোঁয়া ভালোবাসার উষ্ণ আলিঙ্গন পাওয়ার জন্য ছলনা মাত্র। মাসুম তার প্রিয়তমা হলেও বিয়ে পূর্ব শালীনতা সীমার মধ্যে থেকে প্রিয়তমাকে আবেগ আপ্ত হয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। কতদিন তারা মনের কথা বলেনি, কাছে আসেনি। এ যেন প্রেমিক যুগলের মহামিলন। বহু কাক্ষিত, প্রতীক্ষিত ভালোবাসা আদান প্রদানের উচ্ছসিত উদগীরণ। মরণ ছাড়া যুগলের বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। কত কথা জমা রয়েছে মনে। ভাবের মহাসাগরে রহস্যময় মগ্নন করেছে, লোকচুরি খেলায় দু'জনেই কতই না কল্পনার পাখায় ভর করে খেলেছে। তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতির বিষয়ে আর সামাজিক আচারে দু'জন দু'জনকে ছাড়াছাড়ি হতে হবে ক্ষণকাল পরেই তা ভাবতে কতই না কষ্ট হচ্ছে।

মাসুমের একাকী অগোছালো প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা পান্নাকে ব্যথিত করে তুলল। পান্না মাসুমের হেঁসেলে গিয়ে দেখল দুটি হাড়ি, একটি কড়াই পড়ে আছে। তেল, নুন, কিয়দংশ কাগজের পোটলায় পড়ে আছে। কে রান্না করে আর কিবা খায় দেশের বরণ্য সাহিত্যিক মাসুম। দেশজোড়া যার খ্যাতি সেই কবির দৈনন্দিন জীবন এমন

দৈন্যদশায় আছে ভাবতে কষ্ট লাগে। মাসুমকে বাঁচানোর জন্য হলেও মাসুমের সাথে সঙ্গ দিতে হবে, যে যাই বলুক। পরে যা হবে হবে। তা নিয়ে পান্নার মাথাব্যথা নেই। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল মামা এলেই মামার সাথে সব ব্যাপার খুলে বলবে। টিপু মামা যদি তাকে সাহায্য করে তবে সে নিয়মিত মাসুমের খোঁজখবর রাখতে পারবে। সে সাহস করে মাসুমের ব্যক্তিগত খোঁজখবর না করলে নিঃসঙ্গ এই লোকটি হয়তো মারাই যাবে। মাসুম ভীষণ একা সব সহ্য করে যায়। যে মনের মানুষ তার মনের কথা বুঝতে পান্নার একটু কষ্ট হয়নি। নইলে প্রচণ্ড জ্বরেও কেন মুখ ফুটে বলছে না তার ওষুধ আর মাথায় পানি দিতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে সব ঘুরে দেখে এসে পান্না, বলল, মাসুম তোমার তো খুব কষ্ট, না?

মাসুম কিছু হয়নি এমন ভান করে বলল, কই কিছু না তো, কষ্ট হবে কনে, এভাবেই তো চলছি।

পান্না অধিকার নিয়ে বলল, কষ্ট হচ্ছে না বললেই হলো। আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে আজই বাজারে গিয়ে সব কিনে আনি, একা হোক তবুও তো নিয়মিত খাবারদাবার ঠিক রাখবে নাকি?

মাসুম বলল, কি হয়েছে?

পান্না বলল, কি হয়নি তাই বলো। এমন করে কেউ চলতে পারে? আপাতত এ অধিকার আমার থাকুক আর না ইবা থাকুক আমার ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি তোমার এ অবস্থা দেখে। আমি এর একটা বিহিত করে তবে ছাড়ব।

মাসুম অনেকটা হেঁয়ালি করে মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে বলল, পাগলি মেয়ে এমন করো না তো। তুমি মাঝে মাঝে এসো, তোমাকে দেখে আমি সব কষ্ট ভুলে যাব। তুমি এ দয়াটুকু করো ব্যস।

পান্না ততোধিক বধুর খবরদারি নিয়ে বলল, আচ্ছা আর হেঁয়ালি করতে হবে না।

এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। মাসুম এগিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখল টিপু মামা। টিপু মামার হাতে কিছু আপেল, কমলা, পরোটা, বুড়ি ভরে এনেছেন। পান্না এগুলো হাতে নিয়ে বলল, মামা বসো, কথা আছে।

টিপু মামা বরাবরই রসিক। কিরে ভাগ্নী কি হলো, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সমন। কি হয়েছে পান্না?

পান্না মাসুমের সংসারের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। কোমরে আঁচল গুঁজে রীতিমত যুদ্ধংদেহী গায়ের কিশোরীর মতো বকে যেতে লাগল। মাসুমের সংসারের অবস্থা টিপু মামা কিছু বুঝার আগেই হাতে ধরে টেনেহিচড়ে নিয়ে সব অগোছালো হেঁসেলে দেখিয়ে মাসুমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, দেখো সাহিত্যিকের জীবনযাত্রা। পান্না বলল, এভাবেই কি মানুষ বসবাস করে?

টিপু মামা একটু রসিকতা করে বলল, দেখলুম অবস্থা। তা এ তো মাসুমের সংসার নাকি তোমার, কি হলো? ওহ বুঝেছি পুরুষ সংসারের এহেন দীনহীন অবস্থা তুমি সহ্য করতে পারছ না।

মামার এ তির্যক প্রশ্নে পান্না বলল, মামা, খোঁচা মেরো না কিন্তু, তুমি ভাবছ আমি কিছু বুঝি না?

বুঝবে না কেন, সবই বুঝ, দেখতে হবে না ভাগ্নীটা কার। বলতে বলতে মামা ভাগ্নী মাসুমের মুখোমুখি বসল। মামাকে প্রধান বিচারক বানিয়ে পান্না সব অভিযোগ পেশ করল। আর মাসুম আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো শব্দ খুঁজে পেল না। রায়ে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আদেশ করলেন, এখন থেকেই সংসারের দুরবস্থা গুছাতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টি বাঁধবে কে? ঘণ্টি বাঁধার জন্য অবশ্যই মাসুমকে তো সংসারী হতে হয়। বউ আনতে হবে ঘরে।

‘বউ’ শব্দটি উচ্চারণ করতেই পান্না অধোবদন হয়ে রইল। মাসুম আর টিপু মামা চোখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলেন। ভাগ্নীর এ দুরবস্থা থেকে মামাই টেনে তুললেন। সংযুক্ত রায়ে মামা বললেন, ঠিক

আছে এখন মাঝে মধ্যে এসে দৈন্যদশা ঘোচানো হবে। পরে কষে ঘন্টি বাঁধতে হবে।

মাসুম আমার কথায় সাই দিল। পান্না শুধু অনুযোগ করে বলল, মামা, মা-মা, বলেই আবার হেঁসেলে গিয়ে আমার আপেল, আঙুর, নাশপাতি, পেরোটা পরিবেশন করল।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রকৃতির নিয়মে কোনোরূপ অসঙ্গতি নেই। এ কথা উপলব্ধি করে মানুষ জাতির জীবনযাপন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হলে অনিন্দ্যসুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলতে চায় মাসুম। প্রকৃতিতে অপার জ্ঞান ও রহস্য লুক্কায়িত আছে তা কে না জানে। এমনি মানুষের মধ্যেও আছে। তবে মানুষ অসহনীয়ভাবে তা প্রকাশ করে একে অপরের উপর মতবাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে লেগে যায় ঝগড়া, বিনাশ ঘটে মানুষের। অযথা রক্তক্ষয় হয়েছে যুগে যুগে। তাই সমাজ গঠনে মানুষের মতবাদের ঘোরবিরোধী মাসুম।

মানুষকুলসহ তাবৎ জীবকুল আর মহাবিশ্বের গঠন বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবলে অবাক লাগে। স্রষ্টার মহাপ্রজ্ঞায় নিখুঁত স্বাভাবিক নিয়মে সবকিছুই চলে বিধায় সবকিছুই সমধিকার নিয়ে তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে আছে। এমনকি একটি পিঁপড়াও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। কেবল দিব্যচক্ষু থাকলেই এরূপ ব্যবস্থায় তার অলি হওয়া যায়। হেঁয়ালি জীবনাচারের উর্ধ্বে উঠে কিভাবে আলোকিত মানবজাতি গঠন করা যায় তা মাসুমের কলমে উদ্ভাসিত। এক্ষণে বহুধাবিভক্ত সংস্কারমুক্ত, উন্নত নৈতিক চরিত্রের আকাঙ্ক্ষায় যখন মনন জগৎ অধীর তখন কেউ কেউ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ব্রিটিশতন্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্মতন্ত্রের নামাবলি গলায় পরে আমাদিগকে সুখের সুড়ঙ্গুড়ি দিচ্ছে। অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, একটা গরু তার স্বজাত্য বোধ হারায় না। আমরা যে কত হারাচ্ছি তার আর প্রমাণ দিয়ে লাভ কি। আমরা কখনও রূপ ধরি ছাগলের, কখনও মহিষের, কখনও বাঘের

আমাদেও রূপের শেষ নেই। আমরা বহুরূপী সেজে শঠতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও গিলে খাই মানুষের মুণ্ড। তার পাঁজর ভেঙে চুরমার গুলিতে, রক্তে রঞ্জিত করি রাজপথ। কোথা যেন শুভঙ্করের ফাঁকি লুকিয়ে আছে। পিশাচেরা উল্লাস করছে পর্দার আড়ালে ঘাড় মটকে রক্ত খাওয়ার নেশায়। আত্মার চোখ নেই বলে তা আমরা দেখতে পাই না। নৈর্ব্যক্তিক অলৌকিক শক্তিদর মানুষ দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আসুন তা যখন বিদেহী আত্মা আজাহারি তখন অসুরের দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। অস্থির সমাজের যুবকরা আত্মার কান্না শুনতে পাচ্ছে না। বৃথা জীবন দিচ্ছে প্রহেলিকায়। খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্যেই হোক, সম্পদের পাহাড় বানানোর জন্যেই হোক, অর্থবিত্ত কিরূপ থাকা উচিত তা আমি জানি নে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, এ পৃথিবীতে সম্পদের মহাসাগরও আছে আবার গোস্পদও আছে। সম্পদের ব্যবহার বিদ্যে জানার দরকার আছে বৈকি। তা অবশ্যই কোনো প্রকৃতির মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে জেনে নিতে হয় আর কি।

যে ধর্ম উন্নাদনা মহান একক স্রষ্টার মহাশক্তির সাথে অংশীদারিত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে পৌত্তলিকতার ডামাডোলে আধ্যাত্মিকার উন্নতমার্গে পৌঁছানোর পথে বাধার প্রাচীর তৈরি করে মানবজাতির জন্য তার দরকার কি। কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের ছদ্মাবরণে আচারসর্বস্ব ও প্রথাসিদ্ধ হয়ে ওঠে আর মনুষ্যত্বের বলি ঘটে। সেরূপ প্রথার আবশ্যিকতা কি?

স্রষ্টার প্রেম কখনও জোরজবরদস্তির ভেতর দিয়ে আসে না। মুক্তি কখনও এ পথে পাওয়া যায় না। স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুক্তি অর্জনের দীর্ঘ কণ্টকময় পথে এক স্রষ্টার অনুগ্রহ প্রার্থী হতে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। প্রয়োজন জিতেন্দ্রীয় হওয়ার। জিতেন্দ্রীয় সাধক, মহাস্রষ্টার আলোকে আলোকিত হয়ে যখন পৃথিবীতে বিচরণ করেন তখন তিনি হন পরশপাথর সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রাদায়িক নির্ভেজাল প্রকৃত মানুষ। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এরূপ মহামানবের স্পর্শে ধন্য হয়। তার বাণী হয় আইন, সত্যের ধারক বাহক, মানুষ জাতি আদর্শ।

অনেক মতবাদের প্রবক্তাই মহাজ্ঞানী নিঃসন্দেহে তবে অনেকেই যে মহামানব নন তা বলা যায় নিশ্চিত করে। এসব মতবাদের অনেক আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তা রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনায় এ মতবাদের কোনো একটির প্রচলন করতে গিয়ে রক্ত ক্রয়ের প্রয়োজন আছে কি?

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আধুনিকতায় মগ্ন হয়ে আধুনিক আরাম আয়েশের অনেক উপকরণে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আধ্যাত্মিকতার কঠোর সাধনা যা আমাদেরকে মানুষ করতে পারে তা আর স্মরণ করছি না।

মতবাদ বা ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এরূপ উন্মাদা, প্রাণহীন আচারসর্বস্ব হওয়ার এপ ভণিতা, ভণ্ডামি আমাদের কোথা নিয়ে যাবে কে জানে।

সত্যের দ্বার উন্মোচনে সচেষ্টিত মাসুমের লেখায় আহত হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী সম্প্রদায়। তাকে দেখে নেবে বলে গাল দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে নির্যাতন হত্যার। জনসমক্ষে নিরাপদ নয় মাসুমের জীবন। কখন ওঁৎ পেতে থাকা মানুষ নামধারী দস্যু তার জীবন হরণ করে কে জানে। কিন্তু মাসুম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো অবস্থায় সে দেশ থেকে কোথাও যাবে না। প্রয়োজনে সত্য কথা বলতে বলতে এ দেশেই তার মৃত্যু হবে। তবুও পালাবে না। সত্যদ্রষ্টা মাসুম ছোট চাকুরিজীবী অথচ ভয়ে অনেকেই আর তার কাছে ঘেঁষছে না। সকল বন্ধু বিপদে গা ঢাকা দিয়েছে। অর্থকষ্টে অন্তকষ্টে মাসুম এখন দিশেহারা। এমনি বিপদের দিনে পান্নার খোঁজ পেয়েছে। পান্না দুঃখ কষ্টে, বিপদে আপদে কাছে এসে সব কিছু প্রেমের শক্তি দিয়ে, স্নেহ দিয়ে ঘুচিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে। মাসুমের ইচ্ছেমত যত্রতত্র চলাফেরা নিষেধ রয়েছে। তাই পান্না মাসুমের হয়ে সব কিছু দেখভাল করছে।

পান্না তার স্কুল থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে মাসুমের বাড়ি গিয়েছিল। প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র আর কিছু প্রকাশিতব্য লেখা আনার জন্য। মাসুমের আশ্রমের সাথে পান্নার পরিচয় তো পূর্বেই আছে।

কিন্তু এখন পান্না অনেক বড় হয়েছে। বিবাহযোগ্য মেয়ে, কাজ উপলক্ষে মাসুমের মায়ের কাছে এসে মিসেস রীনার মন পান্না জয় করে ফেলেছে। সেই একরত্তি মেয়ে পান্না দেখে আজকের পান্না চেনা যায়? জসিম ভূইয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মিসেস শেফালী। পান্নার আগমনে খুশিই হয়েছে মিসেস শেফালী আর জসিম সাহেব। পান্না মেয়েটি যেমন বিনয়ী তেমন সদালাপী। পান্নার কাছে তারা মরহুম বাবার সব কথা শুনেছে। সালাম খানের মৃত্যুর কথা শুনে জসিম ভূইয়া আফসোস করতে লাগলেন। তিনি বললেন, অমন লোক আর হয় না। সালাম খান আমার চাকরি জীবনে সবচেয়ে কাছের লোক ছিলেন। তার অনেক কথাই আজকে মনে পড়ছে বলে মন্তব্য করলেন।

সপ্তাহ খানেকের ছুটি শেষ হলে পান্নার মামা এসে পান্নাকে নিয়ে গেলেন। মাসুমের সাথে সাক্ষাৎ করে বাড়ি ফিরে গেল পান্না তার স্কুলে যোগদান করার জন্য।

পান্নাকে খুবই পছন্দ মাসুমের আন্নার। কতদিন পর মেয়েটির সাথে দেখা হলো। কিন্তু বিধির লিখন না যায় খণ্ডন। তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। আর সে অধিকারও নেই। বেচারি নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে মাসুমের বিশেষ প্রয়োজন বলে এসেছে। নইলে কি আর পান্না এ বাড়িতে আসত। মেয়েটা এ কদিনেই সব উজাড় করে নিয়ে গেল। মাসুমের আন্না তো দিনরাত পান্নার প্রসঙ্গই। ছাড়তে চায় না।

মাসুমকে আজাকাল হুমকির বদলে লোভ দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রচুর অর্থ দেয়া তবু যেন তার এমন লেখালেখি বন্ধ করে দেয়। স্বাধীন মতামত প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মাসুম একটানা লিখে চলেছে, তার পর আক্রমণও বেড়েছে। একদিন এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সভামঞ্চে মাসুমকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়েছে। অস্ত্রের জন্য মাসুম প্রাণে রক্ষে পেল। সত্যি বলতে কি, মাসুমের ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা মনুষ্যত্ববাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে সর্বত্র। পক্ষান্তরে সম্ভোগ আর অট্টালিকার মধ্যে বসবাসকারী সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য শক্তি ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছে, জনসমর্থনহীন হয়ে পড়ছে, তারা

আরও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো মাসুমকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

আজ সকালে পান্না কিছু পিঠা, হালুয়া তৈরি করে মাসুমের জন্য এনেছে। মাসুম এসব দেখে পান্নাকে কিছু বলার আগেই পান্না বলল, মাসুম এসব দেখে পান্নাকে কিছু বলার আগেই পান্না বলল, আমি জানি তুমি বলবে এসব কেন এনেছ, তাই না?

মাসুম আর কিছু বলে না। পান্না-মাসুম দু'জনেই একত্রে কিছুক্ষণ কাটাল। পান্নাকে মাসুম বলল, পান্না আমি যদি কালের গর্ভে হারিয়ে যাই, তো কষ্ট পাবে তুমি?

পান্না কিছুই বলল না, শুধু মাসুমের দিকে চেয়ে রইল। পান্নার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বরতে লাগল। মাসুম আঁচল দিয়ে সে অশ্রু মুছে দিয়ে বলল, পান্না তুমি তো জানো আজ আমার কিছুই নেই। একটা ছোট চাকরি ছিল তাও চলে গেছে, বেতন নেই, ভাতা নেই, অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন কাটাচ্ছি। যে কোনো সময় আমার শত্রুরা হায়েনার মতো আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কখন কি হয়ে যায়। কেন তুমি অযথা আমার জীবনের সাথে মিশিয়ে তোমার জীবনটা নষ্ট করবে।

পান্না বলল, এসব কি বলছ, মাসুম? তোমাকে ছাড়া যে আমার জীবন বৃথা। তোমাকে ছাড়া আমি বাচতে চাই না। তুমি বলছ তোমার চাকরি নেই। তাতে কি হয়েছে, আমার তো আছে। কোনোরকম তোমাকে চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। তুমি যে আমার গর্ব। আমার ভালোবাসা, আমার জীবন, মরণ। তুমি আজ জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছ, দেশের সর্বত্রই তোমার আলোচনা হচ্ছে—একদিন ঠিক অমানিশার অন্ধকার কেটে যাবে, সত্যের সূর্য অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠবে। আলোকিত হবে মানবসমাজ। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। তোমার পাশে থেকে আমাকে ধন্য হতে দাও, মাসুম ধন্য হতে দাও।

এয়োদশ অধ্যায়

পান্না আচমকা এক রাতে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল চিৎকার দিয়ে। পান্নার পাশেই শুয়ে ছিলেন তার মা মিসেস শেফালী বেগম। মেয়ের চিৎকারে মিসেস শেফালীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বললেন, কি হলো রে পান্না মা, অমন করে জেগে উঠছিল কেন, কি হয়েছে তোর, স্বপ্নে কিছু দেখেছিস?

পান্না চোখ রগড়াতে রগড়াতে কান্না কান্না কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মা, কে যেন আমার গলা চিপে ধরেছে দরোজা ভেঙে এসে। আর আমাদের ঘরের সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে। আমি হাত দিয়ে চেষ্টা করেও সরাতে পারছি না। আমি শুনতে পাচ্ছি তোকে এ দুনিয়ায় আর রাখব না। আমি ঘরে একান্তা একা আর কেউ নেই। হঠাৎ একটা বিড়াল ঝাঁপ দিয়ে ঐ দানবের ঘাড়ে পড়তেই দানবটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। আর আমি প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলাম। মা, এ আমি কি দেখলাম।

মা, মিসেস শেফালী বললেন, কথায় বলে না নিজে দেখেছিস পরের অঘটন ঘটবে। যাক স্বপ্ন তো স্বপ্নই, ঘুমিয়ে পড়। বলে হাই তুলে মিসেস শেফালী বেগম কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পান্নার আর ঘুম আসছিল না। কেবলি তার মনে হতে লাগল মাসুমের একটা কিছু ঘটল কিনা। না তার মন বলছে, মাসুমের কিছু ঘটেছে বোধ হয়।

পরদিন সে আর স্কুলে গেল না, তার শরীর ভালো নেই। মরার মতো বিছানায় পড়ে আছে। এমন সময় টিপু মামা দৈনিক কাগজ নিয়ে এসে দেখালেন, ডেট লাইন দেশের সেরা মুক্তচিন্তার নৈসর্গবাদী লেখক মাসুম ভূইয়া ধারালো অস্ত্রে মারাত্মক আহত, হাসপাতালে ভর্তি।

আশ্চর্য গত রাতের স্বপ্ন এভাবে সত্য হয়ে গেল। মাসুমের জন্য পান্না কেঁদে ফেলল। চোখ মুছতে মুছতে টিপু মামা বললেন, চল যাই মাসুমকে দেখে আসি।

কোনোরূপ দেরি না করে দু'জনই তৎক্ষণাৎ হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। হাসপাতালে দেশের খ্যাতিমান তরুণ কবি মাসুম ভূইয়া মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। চিকিৎসারত ডাক্তারা বলছেন, কবি এখনও আশঙ্কামুক্ত নন। প্রচুর রক্তের প্রয়োজন।

পাগলিনী প্রায় পান্নার রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল, মাসুমের রক্ত আর পান্নার রক্ত একই গ্রুপের। পান্না নিজে রক্ত দিয়েছে। মাসুমের বাবা এখনও খবর পাননি যে, তাদের মাসুম মৃত্যুর প্রহর গুনছে। এখন কি করা যায়।

টিপু মামা হাসপাতালে মাসুমের শয্যাপাশে পান্নাকে রেখে নিজেই মাসুমের বাড়ি এলেন মাসুমের আঝা আঝাকে খবর দেয়ার জন্য। মাসুমের মা তো খবর শুনে প্রথমে ফিট হয়ে গেলেন।

মাসুমের আঝা-আঝা ও টিপু মামা এই দিনেই, হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন। মাসুমের শয্যাপাশে পান্না দিনরাত থেকেই সেবা শুশ্রূষা করছে। পান্না ক্রমাগত নিদ্রাহীনতায় একেবারে ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারদের বেধে দেয়া নির্ধারিত সময় গতকাল পেরিয়ে গেছে। মাসুম আশঙ্কামুক্ত কিন্তু আরো কতক দিন মাসুমকে হাসপাতালে ইনসেনটিভ কেয়ারে থাকতে হবে। পুরোপুরি সুস্থ হতে আরো সময় লাগবে।

এদিকে মাসুম ভূইয়াকে হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদ, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিবাদ করে চলেছে। হাজারও লাখো মানুষের ঢল নেমেছে রাজপথে, মাসুমকে হত্যা প্রচেষ্টাকারী ঘৃণিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে। দেশের বরেণ্য রাজনৈতিক নেতা, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা মাসুমের খোঁজখবর নিচ্ছেন অহরহ। লেখকের চিন্তায় ভিন্নমত থাকতেই পারে। সত্য উচ্চারিত অনেক লেখাই কায়েমী স্বার্থবাদী, ধর্মান্ধ কিংবা প্রগতির নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চলে যায় কিন্তু তাই বলে নিরীহ লেখকের

জীবনানাশ ঘট কি ঠিক? লেখকরা যখন নির্যাতনের শিকার হয়, নৈতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন সত্য বলার জন্য তখন অবশ্যই বুঝতে হবে, দেশ চলছে অরাজকতার মধ্যে, জ্ঞানচর্চা বা আলোর দিপালি জ্বলে জাতিকে উজ্জীবিত করার মনোরম পরিবেশ নেই। সময়ের সাহসী কলম এ জন্য থেমে থাকে না। মাসুমের বরা প্রতিটি রক্ত ফোঁটা মিশে গেছে মানুষের বিবেকের ধমনিতে। লেখকের নিরাপত্তার দাবিতে আজ উঠছে আন্দোলনের গগনবিদারি আওয়াজ। মাসুম ভূইয়া এখন জনতার দাবির প্রতিবন্ধ। মনুষ্যত্ব আর সর্বাধিকারের কথার আন্দোলন তুঙ্গে এখন। হাসপাতালে চিকিৎসারত ডাক্তার বলছে মাসুমের আরো উন্নত চিকিৎসা করা দরকার। মাসুম ভূইয়াকে বিদেশে পাঠাতে হবে। দরকার প্রচুর অর্থের। দেশের বিবেকবান মানুষ এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সাহায্যেও হাত বাড়িয়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য মাসুমকে বিদেশে পাঠানো হবে। জনতা মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায় সমস্ত উপাসনালয় মাসুমের আশু স্বাস্থ্যেও উন্নতির জন্য স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করছে।

মাসুমের বাসায় অবস্থান করছেন মাসুমের মা, বাবা মিসেস শেফালী ও টিপু মামা সকলেই মাসুমের জীবনের জন্য আতঙ্কিত। মাসুমের পরিবারে এখন অন্ধকার। একমাত্র ছেলের জীবনের দুর্ঘটনায় চরম ব্যথাতুর জসিম ভূইয়া কিছুই ভাবতে পারছেন না। কেন এমন হলো। মাসুম তো কারো ক্ষতি করেনি, তার আদর্শবাদী ছেলে অনেক কষ্টের ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছে। তাই দুঃখী নিরন্ন মানুষের কথা বলে মাসুম। মাসুম বলে অনাচারের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা মাসুমের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া করছে। মাসুম সুস্থ হয়ে উঠুক। স্রষ্টার খাস কৃপায় নিয়মিত প্রার্থনা করে জসিম ভূইয়া তাই বলছেন।

সকালে সাড়াশব্দহীন মাসুমের বাসায় টিপু মামা বললেন, ভাইজান চিন্তা করে কি লাভ। আল্লাহর রহমতে মাসুম ঠিকই সুস্থ হয়ে উঠবে। মাসুম তো জাতির সম্পদ। কিছু মুখে দিন, বলে কিছু খাবার

বাসায় সকলকেই দিল। এমন সময় হাসপাতাল থেকে ছুটে এলো পান্না। পান্না হতদন্ত হয়ে বলল, খালু সুখবর আছে, মাসুমের বিদেশ চিকিৎসা নিশ্চিত হয়েছে। বিদেশে তার আরও সুচিকিৎসা হবে বলে ডাক্তার বলেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর অর্থ আসছে, চিকিৎসার কোনো অসুবিধা হবে না। মাসুম এখন ঘুমুচ্ছে। বিকাল চারটায় তার ঘুম ভাঙবে। তখন যেতে হবে। আমি খুব ক্লান্ত, বলে ভিতরের রুমে চলে গেল। কাপড় পাণ্টে গোসল সেরে পান্না কিছু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ অনেক দিন হলো সেই শেফালী বেগম বাটী ছেড়ে এসেছেন ঢাকায়। বাড়িঘর কি অবস্থায় আছে কে জানে। তিনি মিসেস রীনাকে বললেন, আপা, আমাকে যেতে হবে বাড়িতে, কি জানি কি অবস্থায় আছে।

মিসেস রীনা বললেন, আপা আপনাদের ঋণ কোনোদিন ভুলে যাবে না। আপনার পান্নাই তো প্রথম খোঁজ দিয়েছিল, না হলে জানতামই না আমার মাসুম হাসপাতালে। দিনরাত পান্না যে কি কষ্ট করছে, সেবা গুশ্রষা করছে তার প্রতিদানের ভাষা আমার জানা নেই।

মিসেস শেফালী বললেন, ও কথা বলবেন না, আমার মেয়ে যা করছে তা সে করবেই, তাকে কোনোভাবেই মাসুমের সেবা থেকে দূরে রাখা যাবে না। ওরা ছোটবেলায় একসাথে খেলেছে, বড় হয়েছে, ওরা একে অপরের জানের জান। ওদের একজনের কিছু হলেই অপরের কলিজায় সেই খবর হয় এ যেন চুম্বকীয় প্রাকৃতিক টান। তা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি ঠিকই টের পাই। যাক আপা, আপনারা তো আছেন, আগামীকাল আমাকে বাড়িতে যেতে হবে।

মিসেস রীনা বললেন, তা আপনি যেতে চান যান, পান্না কিন্তু আমার কাছেই থাকবে। পান্না ছাড়া আমার যে দু'চোখ অন্ধকার, পান্না ছাড়া মাসুমের খোঁজখবর কে নেবে? আপনার ভাই চোখে দেখেন না। আমার বাতের অসুখ দু'জনই বোঝা। একটু চলতে ফিরতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠি।

মিসেস শেফালী বললেন, পান্নার তো স্কুল আছে, এখন কি জানি, মেয়েকে দেখুন জিজ্ঞাসা করে। আমার আপত্তি নেই।

জসিম ভূইয়া এতক্ষণ চুপ ছিলেন। দু'জনের কথাবার্তা শুনে কি বলবেন, কি বলবেন না তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শত দুঃখের মধ্যেও হালকা রসিকতা করে বললেন, মাসুমের মা, আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু কি বিষয়ে আপত্তি নেই তা না বলায় দু, বান্ধবীর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

মাসুমের মা বললেন, কি বিষয়ে আপত্তির কথা বলছ?

আরে বোঝনি কি বিষয়? ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে। আমাদের আপত্তি না থাকলেই শুধু চলবে না, ব্যবস্থাও করতে হবে।

মাসুমের মা ততোধিক কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যবস্থা করবে তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না তোমার কথার মাথামুণ্ড।

আরে, বুঝবে, বুঝবে, সবই বুঝবে,, সময় হলেই বুঝবে, বুঝেছ? বললেন জসিম ভূইয়া।

সময় হলে কি বুঝবে বুঝিয়ে বলো না, মাসুমের মা বললেন।

জসিম ভূইয়া কিছু বলার আগেই টিপু মামা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। তিনি সোজা বললেন মাসুম পান্নার বিয়ের কথা বলতে চাইছেন ভাইজান।

জসিম ভূইয়া চোখের চশমা ঠিক করে টিপু মামার দিকে চেয়ে মুখে স্ফীত হাসি টেনে বললেন, টিপু তুমি ঠিকই বলেছ আমি কি বলতে চাইছি। পান্না মাসুমের বিয়ের ব্যাপারে জসিম ভূইয়া আর টিপুর উক্তি খানিক সপ্রতিভ মাসুমের মা আর পান্নার মা দু'জনেই মনে মনে ধাক্কা পেলেন। মাসুমের এ অবস্থায় যে বিষয়ে কোরোরূপ কথা চলে না তা বুঝে।

পান্নার মা বললেন, আগে মাসুম বাবাজি সুস্থ হয়ে উঠুক। আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তার পরে সবকিছুই সম্ভব হবে। মাসুমকে সেবা শুশ্রূষা আর দেখাশুনার কথা চিন্তা করে আবোগাপুত হয়ে পান্নার

মাকে লক্ষ্য করে মিসেস রীনা বললেন, আমার পান্না মা আমার কাছে থাকবে।

পান্নার শিয়রে টেবিল ঘড়িতে এলার্ম দেয়া ছিল। নির্ধারিত সময়ে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাণ্টে, চটপট গৃহিনীর মতো আবারও জসিম ভূইয়া, মাসুমের মা, নিজের মা ও মামাকে চা পরিবেশন করে, ব্যস্ত মাসুমের হালকা খাবার নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে হনহন করে চলে গেল। উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে শুধু চেয়ে রইল মেয়েটির ভালোবাসা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও করিত্বকর্মার দৃশ্য দৃষ্টিপাত করে।

চতুর্দশ অধ্যায়

দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মাসুম ভূইয়া ইংল্যান্ড থেকে গতকাল দেশে ফিরেছিল। মাসুম পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। তার ইতিমধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। মাসুম যে বাসায় থাকত তাতে আর মাসুমকে থাকতে হবে না। লেখক মাসুমের জন্য পুট বরাদ্দ করেছে সরকার। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে। মাসুমের উপর শারীরিক নির্যাতনের জন্য জনতা যে আন্দোলমুখী হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া পাওয়া গেল। দেশের নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সরকারের আমলে আমাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে লেখক বুদ্ধিজীবীগণ অনায়াসে লিখে যাচ্ছেন।

বিদেশ থেকে ফেরার পর ঢাকার পল্টন ময়দানে মাসুমের জন্য গণসংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হলো। মাসুম দেশে ফিরেছেন। তাকে বিমানবন্দরে গ্রহণ করার জন্য দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। পান্না, পান্নার মা, টিপু মামা, মাসুমের আক্কা-আম্মা সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আজ মাসুম ভূইয়া দেশে বিখ্যাত কবি সংগ্রামী জনতার সংগ্রামের প্রতীক। মাসুমের বীরোচিত লেখার জন্য মানুষ আজ তাকে সংবর্ধনার দিচ্ছে তার কাজের পুরস্কার দিচ্ছে। মাসুম আর ভাবতে পারছে না।

মাসুম বিমানবন্দর থেকে সোজা পল্টনে সেদিন উপস্থিত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ বিপুল করতালির মাধ্যমে মাসুমকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। মাসুমের আত্মীয়স্বজন সকলেই সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। মাসুম এখন আর কারো সম্পদ নয়, মাসুম জাতীয় সম্পদ, মাসুমের লেখায় জাতি উজ্জীবিত সত্যের পথে, প্রথার বিরুদ্ধে মুক্তিকামী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে

মাসুমের বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করছিল। বক্তৃতার মধ্যে উঠে মাসুম প্রথমেই কেঁদে ফেলেছিল। গলায় সংবর্ধনার মালা নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার উদ্দেশে বলতে গিয়ে সত্যিই মাসুম ভুইয়া কেঁদে ফেললেন, তিনি বললেন, আমার বেঁচে থাকার কথা নয়। যেভাবে আমার উপর আক্রমণ হয়েছিল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আমাকে হাতে ধরে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নইলে আঘাতে আঘাতে আমার দেহখানি টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা ছিল ওই নরপশুদের। কিন্তু কি অন্যায় ছিল আমার, আমার অন্যায় ছিল আমি মানুষের আত্মার কথা বলি, আমি মানুষের কল্যাণের কথা বলি, আর স্বাধীনতার কথা বলি। আমি বলি সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে জীবনবোধ জাগ্রত করতে হবে। সেই কথা মাসুম যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন দর্শক সারিতে বসা তারই প্রিয়তমা পান্নার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। যা পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসা আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি মাসুমকে দেখে পান্না তার আবেগের পথ রুদ্ধ করতে পারল না। তার ক্রমাগত মনে হতে লাগল আমরা তার একনিষ্ঠ ভালোবাসার সম্মোহনী শক্তিই মাসুমকে জীবিত ফিরিয়ে এনেছে। কত রাত সে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার নিকট কান্নাকাটি, প্রার্থনা করে। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার নিকট, যেন মাসুম সুস্থ হয়ে ওঠে। মাসুমকে না পেলে সে বাঁচবে না। সে প্রার্থনা করেছে, তার আত্মার শপথ, জীবন যৌবনের শপথ, সৃষ্টিকর্তা যেন মাসুমের জীবন ফিরিয়ে দেন। তার বুকে যেন মাসুম আবার ফিরে আসে।

পান্নার আত্মার আকুল নিবেদন সৃষ্টিকর্তা শুনেছেন। মাথায় মারাত্মক জখম হয়েছিল কবি মাসুমের। অলৌকিকভাবে সে ক্ষত পূরণ হয়েছে, পুনর্গঠিত হয়েছে,, স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি, বাকশক্তি ও মেধা ফিরে পেয়েছে। যেন সৃষ্টিকর্তা হাতে ধরে তা সম্ভব করে দিয়েছেন। চরম আতঙ্ক আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্যে যাপিত তার ইতিপূর্বের দিনগুলোর কথা আজ স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। কবি মাসুম অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে কত জায়গায় অর্থের জন্য, তার ভাবী নিরাপত্তার

ছুটাছুটি করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খেটে খেটে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ সময়ে চাছুরিতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অভিযোগ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে কবি মাসুম সুস্থ হয়ে উঠলে পূর্ব পদে যোগদান করবেন। সে বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। লেখক শিবিরের উদ্যোগ সরকারি ব্যবস্থাপনায় কবি মাসুমের নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কবি মাসুম আজ জাতীয় সম্পদ। কবি মাসুমের হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি, বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। পান্নার খালু অর্থাৎ মাসুমের আক্কা একদিনের জন্য একা এসব করতে কোথাও যাননি। তিনি চোখে কম দেখেন তাই পান্নাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস আদালতে যোগাযোগ করে তিনি এসব কাজ করেছেন। অনেক সময় খালুর হয়ে পান্নাকে কাজ করতে হয়েছে। আজকে সব কিছুই ঠিকঠাক গোজগাছ করা হয়েছে। মাসুম সুস্থ হয়ে ফিরে এসে নতুন বাড়িতে উঠবে। সে জন্যে স্বপ্নের বাড়িটি নিজ হাতেই গুছিয়ে রেখেছে। খালাম্মার নিকট বাড়ির চাবি হস্তান্তর করতে গিয়ে সেদিন পান্না ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। আজ সে কথা তার মনে পড়ছে। খালাম্মা বলেছিল, এ চাবি তো তোমারই কাছে থাকবে মা।

প্রকৃত পক্ষে কবি মাসুমের পরিবার পান্নাদের পরিবারের মধ্যে অলিখিত চুক্তিই হয়েছিল এই মর্মে যে মাসুম পান্নার বিয়ে দিতে হবে। কবি মাসুম দেশের ফেরার সাথে সাথে মিসেস রীনা পান্নার মায়ের বাটীতে গিয়ে হাজির প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বললেন, পান্না আমার মেয়ে, ওকে ছোটবেলা থেকেই জানি, মাসুমের বউ হবে পান্না। আপনার কোনো আপত্তি আছে আপা?

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস রীনা মিসেস শেফালীকে। মিসেস শেফালী কি উত্তর দিবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দেশবরেণ্য তরুণ সাহিত্যিক হবেন পান্নার বর, এ যেন পান্নার ভাগ্য। পান্না সরল সোজা মেয়ে। পান্নার বাবা মারা যাওয়ার পর এই মেয়েটি সংসারের হাল ধরে রেখেছে। তবুও কোনোদিন কোনো বিষয়ে এতটুকু তাকে চিন্তা করতে হয়নি। সব কিছুই পান্না গায়ে গতরে খেটে গুছিয়ে

এনেছে। তবুও মেয়ে মানুষ বলে কথা। একদিন না একদিন সব মেয়েকে বাবার বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়। স্বামীর বাড়ি হয় নিজ ভিটে।

মিসেস শেফালী মিসেস রীনাকে দু'হাত ধরে শুধু বলল, আপা আমি কি বলব, বয়স হয়েছে, মেয়েকে তো বিয়ে করতে হবেই। আমার পান্না মাকে তো আপনি চেনে আপা। ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। অতি উদার, পরকল্যাণে সে যেন ব্রত নিয়েছে। আমার মেয়ে বলে বলছি নে। হাজার মেয়ের মধ্যে ও একজন। আপা আপনারা আমাদের আত্মীয় নন, রক্তের বাঁধনও নেই। কিন্তু তাহলে কি হবে পান্নার আকা মাসুমের আকার একই জায়গায় চাকুরি করার সুবাদে আমরা যেন একই আত্মীয় হয়ে গেছি। রক্তের বাঁধনের চেয়েও শ্লেহের বাঁধন বড় গভীর বন্ধুত্বের বাঁধন বড়। আমি আর কি বলব, মেয়ে বড় হয়েছে তার মতামত জানা দরকার। এ কি আপা, আপনি আসলেন আর আমি এমনিতেই শুধু বকে যাচ্ছি, নাস্তার ব্যবস্থা করছি আপা বসুন, বলেই তিনি উঠে গেলেন ভেতর বাটীতে।

খালু খালাম্মা এসেছেন দেখে পান্না ইতিমধ্যে হেঁসেলের যাবতীয় রন্ধন কর্ম সম্পাদন করে ফেলেছে। এখন শুধু পরিবেশনের পালা। পান্নার ঘরে পান্নার বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিল। পান্না তার মায়ের কাছেও মুখ ফুটে সম্মতি বিষয়ক একটি বাক্যও বলতে পারেনি। মায়ের মুখে বিয়ের কথা শুনে মনে মনে সুখে গদগদ হলেও মুখ যথাপূর্বক বন্ধ রেখে মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে দিল। খাবার পর্ব শেষ হলে টিপু মামা খালাম্মার উপস্থিতিতে কবি মাসুমের মা আংটি পরিয়ে দিল পান্নার হাতে। বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেল।

কবি মাসুম ও পান্নার মন দেয়া নেয়া সম্পন্ন। তারপর দীর্ঘ বিরহ। এই বিরহে একবিন্দু অনুরাগ পারমাণবিক সূত্র মতে সহস্রকোটি বিন্দু অনুরাগে পরিণত হয়ে মাসুমের হৃদয় আজ সৃষ্টিকূলকে ভালোবাসতে পেরেছে। আর তারও উর্ধ্বে উঠে মহাস্রষ্টার প্রেমে মত্ত হয়েছে। তার ধ্যান জ্ঞান প্রতি মুহূর্ত মাসুমকে মশগুল রেখেছে। তাই তো, আকাশের চেয়েও উদার বুক দিয়ে নিখাদ সত্য উচ্চারণ করে

মাসুম। বিষয়বস্তুর উর্ধ্বে উঠে নিখুঁত কৌশলী লেখনীর মাধ্যমে চর্চা করে গুণাবলির। রুহকে নফসের উপর আধিপত্য বিস্তারের চর্চা করছে নিরন্তর। ‘মানুষ ও মনুষ্যত্ব’ শীর্ষক কাব্যে কবি মাসুম সে কথাই বলেছেন মৌলিক ও স্বতন্ত্র ধারায়। তাই পান্নাকে না পাওয়ার বোধ নেই। আবার পাওয়ার সুখ বোধও নেই। শুধু কবি মাসুম জানে তার অস্তিত্বেই পান্না ডুবে আছে, মিশে আছে। তার ভালোবাসার নকশিকাঁথার ইন্দ্রজালে। প্রচণ্ড মোহিনী শক্তি দিয়ে তাকে করেছে জিতেন্দ্রীয়। গভীর রাতে কেঁদেকেটে ধ্যানমগ্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে কবি মাসুম পান্নাকে চাননি, চেয়েছেন সাহায্য, প্রেমের মোহিনী শক্তি বৃদ্ধিও চেয়েছেন বিরহ সহ্য করার ক্ষমতা, প্রেমকে মহাপ্রেম করার শক্তি ও কৌশল। তাই তো স্রষ্টা কবি মাসুমকে তার সান্নিধ্য চাওয়া পুরস্কার হিসেবে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার কুরবানি উৎসর্গ পান্নাকে, এ এক গভীর রহস্য! আশেক মাসুকের খেলা!

পঞ্চদশ অধ্যায়

আর্থিক সামর্থ্যহীন কবি মাসুমের বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। মাসুমের বাবা জসিম সাহেব তার ছেলের বিয়েতে ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন আর বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করলেন। মহাধুমধামে না হলেও যতদূর সম্ভব নেমন্তন্ন রক্ষার চেষ্টা তো করবেন তার একমাত্র ছেলের বিয়েতে।

অপরদিকে পান্নাদের পাড়ার লোক বলাবলি করতে লাগল, হ্যা গো পান্নার নাকি বিয়ে কবি মাসুমের সাথে? নিন্দুক আর দুষ্ট লোকেরা ঈর্ষা করে অপপ্রচার করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তিরস্কার আর বিদ্রুপবাক্য ছুঁতে লাগল। এত বড় দেশবরেণ্য লেখকের সাথে সামান্য স্কুল শিক্ষয়িত্রীর বিয়ে, তা তো ভাবাই যায় না। অবশ্য পান্নার গুণাবলির সাথে যাদের পরিচয় ছিল তারা মনে মনে আশীবাদ করছিল।

অবশেষে নির্ধারিত দিন ও ক্ষণে পান্নাদের নবাবগঞ্জের গ্রামের বাড়িতেই কবি মাসুম ও পান্নার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। শারীরিকভাবে অসুস্থ বিধায় কবি মাসুমের বাবা-মা কনের বাড়ীতে যেতে পারলেন না। কনে পক্ষ ও বর পক্ষ মিলে শ খানেক লোক হয়েছিল। তাদের আপ্যায়নও করালেন পান্নার মা ভালোভাবে। তিনি কবি মাসুমের মা-বাবা না আসার জন্য দুঃখ করছিলেন।

তখন ছিল বৈশাখ মাস। কবি মাসুম তার নবপরিণীতা বধু পান্নাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন লঞ্চযোগে। সন্ধ্যালগ্নে মাসুম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশে উদ্বেগজনকভাবে মেঘ জমেছে। যে কোনো সময় তুফান ছুটতে পারে। আশেপাশে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই, লঞ্চ ভিড়বে এমন পোতাশ্রয়ও নেই।

দেখতে দেখতে ঝড় তুফান শুরু হলো। দু' চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝড়ের বেগ আরও বেড়ে গেল। শেষমেশ এমন অবস্থা হলো যে লঞ্চটি হেলেদুলে এক পর্যায়ে ডুবে গেল। যাত্রীরা কে কোথায় তার

হৃদিস নেই। কবি মাসুম ভালো সাঁতার জানত না। প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঢেউয়ের তোড়ে মাসুম পান্নাকে আর ধরে রাখতে পারল না। মাসুমের অন্তর থেকে উচ্চারিত হতে লাগল আল-কোরআনের আয়াত-‘লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালিমিন।’ ক্রমাগত জপতে জপতে এক পর্যায়ে তমশাচ্ছন্ন রাতে মাসুম কুলে ভিড়লেন ঠিকই কিন্তু পান্না কই। এ কি পরীক্ষা সৃষ্টিকর্তার!

সারারাত বড় বৃষ্টির মধ্যে অকূল পাথারে নদীর কুলে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পড়ে রইলেন। পান্নার নিরাপত্তা আর হায়াত দারাজের জন্য মহাশক্তিময় স্রষ্টার সাহায্য কামলা করলেন। এক সময় কখন জানি বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

যখন কবি মাসুমের জ্ঞান ফিরল তখন অনেক বেলা হয়েছে। ক্ষুধায় কাতর ছিন্ন মলিন বস্ত্র নিয়ে তিনি পান্নার খোঁজে নদীর কিনার ধরে অজানা পথে হাঁটছিলেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মাসুম অন্তরে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করছিলেন। সারাদিন উপোস করছেন। এখনও পান্নার খোঁজ পাননি। সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া কামনা আত্মানুশোচনা ও প্রিয়তমা বধুর নিখোঁজে নদীর কুলে কুলে কাঁদতে কাঁদতে যেন তার সময় আর যায় না। যত অনাহার আর প্রতিকূল পরিবেশ তাকে ঠেসে ধরেছে ততই যেন তার মনের চক্ষু খুলে যাচ্ছে। ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তি তাকে পথ চলতে সাহায্য করেছে। কোনো মাখলুকের শক্তি নেই তাকে পরাভূত করার। প্রিয়তমা নববধুর হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেই চলেছেন। পথে পথে লোকান্তরালে।

আজ ক’দিন হলো পানি ছাড়া। তবু তার দেহে তাখদ আছে, অন্তরে সৃষ্টিকর্তার নাম আছে। তিনি শুধু কাঁদছেন আর বলছেন, সৃষ্টিকর্তা আমার জীবন সঙ্গিনীকে আমার বুকে ফিরিয়ে দাও। স্রষ্টার লীলা রহস্য বুঝা বড় দায়। একঝাঁক পাখি তার গতি রোধ করেছে। সামনেই নদীর কিনারে ক’টি গাছ। গাছের কাছাকাছি আসতেই পাখিরা আর কোনোভাবেই তাকে এগুতে দিচ্ছে না। সামনে পিছনে পথে মাথার উপরে সর্বত্রই তাকে জাপটে ধরছে। কবি মাসুম কিছই

বুঝতে পারছেন না। এমন তো কখনো হয়নি। এরা কেনইবা তাকে বাধা দিচ্ছে। নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণ আছে। স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পিত কবি মাসুম দাঁড়িয়ে গেলেন। সামনে আর পা বাড়ালেন না। সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা অদূরে গাছের ডালে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বসল। হঠাৎ মাসুমের চোখে পড়ল গাছের নিচে শিকড়ে আটকে আছে কি যেন। আর একটু এগুতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন, এ যে তার পান্না। আধো মাটিতে আধো পানিতে পড়ে আছে গাছের শিকড়ে ঠেকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। তাড়াতাড়ি ধরে এনে তীরে রাখলেন নিখর দেহখানি। হাত ধরে বুকে মাথা রেখে বুঝলেন এখনও প্রাণ আছে কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি। কোমার মধ্যে পান্না। চোখে মুখে পানির ফোঁটা দিয়ে নাড়াচাড়া দিয়ে অনেক কসরত করলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে মুখে দিতেই জিহ্বা নাড়াচাড়া করল গলা ভিজতেই কোমা কেটে গেল। চোখের পাতা নড়াচড়া শুরু করল। জ্ঞান ফিরতেই মাসুম পান্নাকে জড়িয়ে ধরলেন পরম সোহাগে আর সৃষ্টিকর্তা নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলেন।

এদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল কবি মাসুম নববধুসহ লঞ্চডুবিতে নিখোঁজ। নির্ধারিত সময়ে বধুসহ কবি মাসুমের বাড়ি না ফেরায় পত্রপত্রিকায় লঞ্চডুবির খবর মাসুমের বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ বাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ পিতামাতা সন্তান শোকে কাতর হয়ে পড়লেন।

টানা সাত দিন পর মাসুম নববধু পান্নাসহ নিজ বাড়িতে ফিরলেন। হতাশায় ডুবন্ত মাসুমের মা-বাবা ভাবতেই পারছেন না যে মাসুম ফিরে এসেছেন। মাসুমের মা তো কেঁদেই ফেললেন ছেলেকে পেয়ে। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট অদেয় কিছুই নেই। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। এ বিশ্বাস যার মধ্যে যত প্রবল সেই লোকই তত পুরস্কৃত বিধাতার ইচ্ছায়। এমনই একটা বিষয় এই যে, দু'দিন আগেই প্রচার মাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল কবি মাসুম নিখোঁজ অথচ তিনি

বেঁচে আছেন নিরাপদে এবং সত্বীক মরণের সাথে যুদ্ধ করে স্রষ্টার ইচ্ছায় জিতে গেছেন।

আজ আবার পত্রিকায় খবর এসেছে যে, বাংলার তরুণ কবি মাসুম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তার ‘মানুষ ও মনুষ্যত্ব’ কাব্যগ্রন্থের ইংরেজিতে অনুবাদ ‘Human and Humanity এর জন্য। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিলেন।

সারাদিন কবি মাসুমকে ব্যস্ত থাকতে হলো নানা ম্যাসেজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আর পরিদর্শকগণের উত্তর দেয়ার মধ্যে। আজ আজই কবি মাসুমের মহামিলনের দিন। সৃষ্টিকর্তার দেয়া প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রেমের বাণী দিয়ে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এ পথেই সত্য আবার আবেগ আপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন নিজের দিকে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন প্রেমের মোহিনী শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়কে জয় করব, জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করব, প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে স্রষ্টার সম্ভ্রুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে আত্মার অমরত্ব লাভ করে দুনিয়াবাসীর কাছে হব দৃষ্টান্ত।

আহ্ এ যে বাসরঘর। রাত বারোটা বাজে। কবি মাসুম সন্নিহিত ফিরে পেলেন। একটু সহজ হয়ে খাটে উঠে বসলেন। বধুর সাজে পান্না বসে আছে। সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়। আজ আমাকে পান্নার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কয়েক মুহূর্ত আগেও কবি মাসুম যে তত্ত্বকথা অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন তা পান্না কানেও এসে লেগেছিল। অতসব তত্ত্বকথা পান্না বুঝে না। সে শুধু বুঝে তার কলিজায় রক্তের সাথে মিশে একটি নাম কল্লনার মহাসাগরে সন্তরণ করে একটি নাম, আকাশে বাতাসে ভেসে ভেড়ায় একটি নাম, অন্তরের চোখ দিয়ে দেখে অবিরাম একটি মুখ। শত পরিশ্রম, দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর গ্লানি ভুলে যায় যাকে পেলে, যাকে ভাবতে গেলে, সেই মোহনীয় নাম মাসুম। আজ যে মাসুম বর বেশে তার সম্মুখে অতি নিকটে। আজ দু’জনে মিশে হবে একাকার বাসররাতে একে অপরকে পাওয়ার মুহূর্তে

বুক ভরা রুদ্ধ আবেগের মুখ খুলে পান্না অস্পষ্ট স্বরে শুধু বলল, মা-সু-
ম। বহুদিন ঘুমাইনি। আজ তোমার বুকে বুক রেখে ঘুমাব বলেই সঙ্গে
সঙ্গে ঢলে পড়ল, হারিয়ে গেল মাসুমের বুকের ভালোবাসার
মহাসাগরের অতল গর্ভে।

০৯/০৩/২০০৪ কিশোরগঞ্জ।

কিশোর কাব্যনাটক : বিদূষী সফুরা

১ম পরিচ্ছেদ

দোলনাঃ

ঘোর কালো, খুটখুটে আঁধারে কে, এলো ।

নিশীথ রাতে বনে বাদাড়ে,

গ্রামে-গঞ্জে, পর্বতে-পাহাড়ে,

দেখা যায় না আঁখিতে তাহারে,

দখিনা বায়ে, অদৃশ্য করে ছুঁয়ে গেলো ।

উষায় পূর্বাকাশে দেখি সে যে,

লালীমা মেখে তার লেজে,

ধীরে জ্বলে উঠে তেজে,

কোলাহলে কাতর, শশব্যস্ততা পেলো ।

শাদা আবীর মেখে কপালে,

আটকে গেছে সবুজের জালে,

তামাটে বাদামী জরী, তামাশা জুড়ে দে লো ।

নীলাম্বর সেজে এসে বলে,

শ্যামা কিশোরী প্রাণ পুষ্পদলে ।

তব আছে অমৃত ধরনী তলে,

হে ঈশ্বর, স্বর্গরস তার, মোর দেহে ঢেলো ।

(প্রস্থান)

(প্রবেশ) রাজকুমারঃ-

বহিছে মলয় বীর বীর শান্ত সৌম্য অবয়ব

প্রাণের বারিধি জুড়ে, সফেন মৃদু তরঙ্গ

ভাঙ্গিছে ইর্ষা রাগের ঢেউ নোনা জলের কুশীলব,

অসীম দিগন্তে সরলতা করে আনন্দ রঙ্গ ।

আমি বিনয় কদম ফেলেছি কোমল জলে,

স্বর্গ ছোঁয়ায় শিহরিত বপু, জন-বিরল পৃথিবী স্বর্গ,

গাংচিল আরও হরেক পাখি উড়ে পড়ে ঢলে,

জাগায় প্রাণে অকৃপণ উদারতা বারিধি জীববর্গ,

পশ্চিমাকাশে লাল অরুণ ছড়িয়ে তার আভা

আমার পদযুগল করেছে ধন্য, বিমল শান্তি

বুকে, আমার স্রষ্টা বুকে শক্তি দিয়ে গড়েছে কাঁবা,

রূপালি ইলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে চলে কী দ্রাণ কান্তি

আমি দুঃসাহসী মাঝির মত ইলিশের চোখে চোখ
রেখে বুঝেছি তার ভাষা, আনন্দ ফলগুধারায় ছোট
শরীর হয়েছে সুঠাম নিরোগ, স্রষ্টা স্মরণে মগ্না বুক।
সাগর তলদেশে যত প্রাণ আছে সবে করছে ভীড়,
তাদের সমভিব্যবহারে পয়োধি বিহার শেষে যখন
উঠি সমুদ্র উপরিতলে, তখন গায়ে লাগিল আঁচ, স্থির
দাঁড়িয়ে থাকি কী করে! উঠে এলাম ভূধরে বনে কখন!
হায়! হায়! এ কি! দেখছি শান্ত সাগরে ঘূর্ণী দৈত্যের
আস্কালন, ভীমের গর্বতীর নিক্ষেপে বিধ্বস্ত লোকালয়,
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে কাঠ ফাটা রোদ্দুরে চৈত্রের
শেষে কামস্পৃহর নির্লজ্জ ছোবল বুঝি এমন হয়,
সুনামী, ঘূর্ণী, কালবৈশাখী সকলে এসে এক সাথে
ঘিরে ফেলেছে যত নিবীহ প্রাণ-প্রাণী-বাড়ীঘর
আতর্জিতকার রোণাজারী সর্বত্র, অসুর আনন্দে মাতে,
আমি যাই সুর-শক্তি নিয়ে তবে দেখবো সুর শুভ বর।

(প্রস্থান)

রাফস (প্রবেশ) :

হু ! হু ! হা ! হা ! হা

হু ! হু ! হা ! হা ! হু ! হা ! হা ! হা !

আমি তখনছ করি সামনে যা কিছু পাই,

যত শান্তি-অশান্তি জল দিয়ে গিলে খাই ।

যত হাতি ঘোড়া সব মেরে ছেড়ে মেরে সব,

ভূগর্ভ গ্যাস এনেছি ভূত্বকে, শোন শৌ রব ।

বহি আসনে বসিয়ে রেখেছি মানবে,

লৌহ আবরণে, মৃত্যু দেখে দানবে-

তাতে খুশী সে, আহা কী বোকা কী,

হটিয়ে দিয়েছি আদিম সুখ, সরলতা সবি ।

হু ! হু ! হা ! হা হা হু ! হু ! হা ! হা ! হা !

এখন আমি আর ঘাড় মটকাই না,

রক্ত লাগি, বুলেট বিনে ভেবে পাই না ।

আমি জমে আছি, জমিনে জমিনে বর্শা হাতে,

কখনও হিংস্র জানোয়ার রূপে মাতি রক্তপাতে ।

কখনও নারীরূপে মাখি ওগো কলংক কাদা,

গুন্ডা রূপে উঠাই হাটে-বাজারে জোরে চাঁদা ।

সেবার বদলে দিই মুখরোচক কথা ছিটিয়ে,
জ্ঞানহীন আশ্ফালনে সেরা নেকা ভন্ড লিখিয়ে ।
সব গোলমালের হোতা ঐ রাক্ষস নবরূপে,
বিষ মিশাই খাই-খাওয়াই, মারি নিরব কোপে ।
যেমন জনতা তেমন নেতা কে কার কথা কয়,
সবে ব্যস্ত আপনা-তরে, ব্যস্ত করিতে নয় ছয় ।
হু ! হু ! হা ! হা হা হু ! হা ! হা !
আমার হৃদয় বাঁধিয়েছি ইট-কাঠ পাথর দিয়ে,
আমার চোখে আর মাটি নেই, তরু পল্লবে গিয়ে
দু'হাতে জোড়ে উপড়ে ফেলি, নগ্না জীবনযাপন
সজারু সাপ পথে ঘাটে ঘরে, তারাই আপন ।
মনে পায়ে দিতে হবে শিকল, রুধিতে তান্ডব,
এত চৌঁটকাটা দেখি নি কোনকালে, আমি জান্তব
স্বরূপে কিম্ভূত রাক্ষস, মহা প্রতাপে আছি যে
মানব সমাজে, প্রায় সকলেরে বানিয়েছি পাঁজি যে ।
হু ! হু ! হা ! হা হা হু ! হু ! হা ! হা ! হা !

(প্রস্থান)

রাজমাতার (প্রবেশ)

আমি একদিন লৌহ-গলানো-মিলে
টুকে পড়েছিলুম, তারপর ডুব দিলুম
আগ্নিকুন্ডে, দেহ রূপ-রস গিলে
খেয়েছে জ্বলন্ত অগ্নি, করেছিলুম
উজাড় নিজেকে সহজে অনায়াসে, তাই
আমার অসুবিধে হয় নি মোটেই হাঁটতে
সাগরের নোনা জলে, অন্তরের চোখে জ্বলাই
জোনাকী তমসায়, বন ঝাড়ে ক্রমে ঘাটতে
থাকি নিজ আলোয় নিজ আশ্রয় তরুণতা ।
উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে ঘুরে, রাজ পথ যত দালান
চিলেকোটা, দিবারাত্র ঘুরে বেড়াই যথাতথা ।
কখনও বুঝিনি আমি কে, শুধু আমাকে জ্বালান
ছাড়া, বসেছিলুম একদিন এক পদ্মফুল ডালে
ভোমরা এসে গুন গুনিয়ে বলল, কানে কানে,
ধন্য হে ধন্য জোনাকী তুমি নারী, ভালে
তোমার লেখা ছিল, স্রষ্টা আছেন তোমাপানে
চেয়ে প্রিয়দর্শিনী তুমি, আমি হতবাক শুনে
ভোমরার কথায় । আমার শরীরে যে স্রষ্টার

আলো জ্বলে এ-তো ভাবিনি কোনদিন? গুণে
জ্ঞানে আমি মূল্যহীন, তবু প্রিয় সর্বদর্শী দ্রষ্টার ।
উষালগ্না এখন, দিনমণি আসিবেন বুঝি,
আমি যাই অদূরে বটবৃক্ষ ডালে, নিরবে
অলক্ষ্যে থাকি উত্তাপ নেব গায়ে, মুখ গুজি
গৃহকোণে, অরুণ-পরিচ্ছদের ভেতরে থেকে তবে ।

(প্রস্থান)

রাজাঃ আমি অস্পৃশ্য, অদৃশ্য গোপনে গোপনে
জাগাই প্রাণ শক্তি, জ্বলে থাকি সর্বক্ষণ,
নেমে আসি ধীরে ধীরে লোকালয়ে তপোবনে
দিই হানা রাখিতে ঋষিগণে, স্রষ্টায় স্মরণ ।
আপনার তেজে আমি নির্মূল করি যত
অশুভ শনি দশা, রালুগ্রাস প্রলয়
মহাকাশে । চুষে নিয়ে দানবীয় দেহরস, ব্রত
নিশ্চিত করি অতিন্দ্রীয় জীতেন্দ্রীয় শক্তির জয় ।
আমি আছি বলে তারারা হাসে, ফুটে
ছায়া পথে, কালপুরুষ নাচে, সপ্তর্ষি

স্বর্গে যাপিত করে স্বর্গীয় জীবন, খুটে
মাথা, নরকের কীটেরা পালায় আরশি
রেখে সম্মুখে দেখে নিজ কদর্য চেহারা ।
আমি আছি বলেই, উত্তাপে বাঁচে জীবন
হিংস্র জানোয়ার স্তব্ধ করি, শুদ্ধ রক্তধারা
করি মানব হৃদয়ে প্রবাহিত, মস্তিষ্কে করি রণ,
বানাই কবিগণকে সামাজিক সন্ন্যাসী,
আর বিচিত্র রূপে সাজাই পৃথিবী, হয়ে
পরিপূরক দেহ আত্ম রূপে, নিজেই ভাসি
নিজ আলোতে আমোঘ নিয়মে স্রষ্টার ভয়ে ।

(প্রস্থান)

পন্ডিত : বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য-কলা
ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা আরও যত
জ্ঞান আছে, সকলের মা ধরনী, আর অবলা
যত কল্পনা আছে তার অশেষ উৎস কী নত?
শিরে, আমার শিরে দিই আমি পুষ্প মাল্য,
এ যেতে পারেনি কোথা, আর যাবে না কোথা?

সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি আর হতে উত্তমর্গ অবশ্যি আবাল্য
কাল থেকে জানিতে হবে, স্বভাবের কানুন,হেথা হোথা
গিয়ে,ঝরাতে হবে রক্ত ঘাম, হতে হবে নিঃস্বার্থ মগ্না
জ্ঞান সাধনায় ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও, শরীর না চায়
যেখানে, সেখানেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে, ‘যেথা ভগ্না
হৃদয়, সেথা বিদ্যা বিদায়ী’- কেহ যেন ভুলে না যায় ।
রাজকুমারঃ শুনেছি ওস্তাদজী সর্বজ্ঞানাদার সর্বগুণাধার ঐ
অলি, ঋষি দরবেশ, সুফি, সে কি করে হলো?
পন্ডিতঃ একাডেমী আর পুঁথি-পুস্তকের জ্ঞান দিয়েছি খই
ফুটিয়েছি গুণের, হে হৃদয়চারী রাজকুমার তব হৃদে বলো
এখন কী বাকী আছে,যাতে হওয়া যায় শুদ্ধ মানব?
রাজকুমারঃ জানি নে, জানি নে,ওস্তাদজী পন্ডিত প্রবর
সে কী কাজ, বিদ্যে যাতে ধ্বংস হয় কুপ্রবৃত্তি দানব।
পন্ডিতঃ নিরাসক্ত, নিঃসঙ্গ জীবন তোমার অনুসঙ্গ নিশাচর
হবে তুমি, বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে অভুক্তরূপে
এই নিঃশ্বাসই শেষ নিঃশ্বাস,এই জপই শেষ জপ
শ্রুষ্ঠা নামের, ছিন্ন মলিন বসনে, চুপে চুপে,
করিবে ধ্যান সাধনা অষ্টপ্রহর, চলিবে জপতপ।

কী হে কুমার বুঝেছ এবার তোমার কাজ?
রাজকুমারঃ বুঝিলাম, হে শিক্ষা গুরু, বুঝিলাম তবে
কষ্ট মেনে নিতে হবে দৃঢ় মনে আমাকে, যুবরাজ-
আমি ভুলে যেতে হবে, ঈশ্বর-তৃষাতুর আমি ভবে,
আর কিছু নাহি চাই, নাহি কিছু আর, কিছু আর----

(ধীর পদে প্রস্থান)

পন্ডিত ঃ হে ঈশ্বর আমার আনন্দাশ্রু স্বর্গে রেখে দাও
বিনিময়ে যুবরাজেরে তোমার এশক নদী কর পার,
রহস্যজ্ঞানে কর ভরপুর দয়াময় পরওয়ারদিগার,
দিলুম সঁপে তোমার কুদরতী হাতে, নাও । (প্রস্থান)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রসিক কাঞ্চন : (প্রবেশ)

আমাকে বলে বিড়ালের বাপ, হাতে লাঠি,

কোলে বিড়াল, শশ্ৰু ভরা মুখ, জীর্ণ দেহ

বিড়াল কাহিনী ছাড়া জানিনে কিছু,পরিপাটি

নেই যে কিছু কেন হলো জানতে চায় কি কেহ?

দর্শক : বলো, বলো শুনব কাঞ্চন আমরা শুনব,

বিড়াল কেন এলো কোলে, এত কি তার গুণ!

কাঞ্চনঃ শুনতে গেলে মন দিতে হয়, সংখ্যাকি শুনব?

দর্শকঃ বলছি কি ভাই, রসিক কাঞ্চন, আমরা হেসে খুন।

কাঞ্চন : কিসের আওয়াজ শুনছি এত ধারে, ধারে

পালাই আগে জান নিয়ে, গল্প হবে পরে।

(প্রস্থান)

প্রবেশঃ রাক্ষস : সৈন্য আছিস আমার যারা ছুটে ছুটে যারে,

যেথায় দেখিস শান্তি আছে, যায় যেন সে মরে।

যুদ্ধ যুদ্ধ চলবে খেলা, কিসের মানুষ, কিসের গরু,
সব বিজ্ঞানী ধরে নিয়ে আয়, যুদ্ধাস্ত্র গরুক,
সুখ সুবিধে দাও যে তারে, তার গায়ে ঢলে পড়া
নুতন সাজে নুতন ভাঁজে প্রচার করো, মানুষ মরুক।
ঐ যে দেখিস আফগানিস্তান, ঐ যে দেখিস কাস্মীর,
ঐ যে দেখিস মধ্যপ্রাচ্য, ঐ যে দেখিস গরীব দেশ,
পারলে নিজেই দখল করবি, নইলে কুশল চালা ধীর,
আমার কাজ গ্রাস করা যে, এরা যুদ্ধ করে হবে শেষ।
মোড়ল গিরি আমার নেশা, ঝগড়া নিজে করি না যে,
ঝগড়া লাগাই মতলবে যে, ভাল কথায় আজব সেরা,
আমার কাছে আসবে না যে, কানটি তার কেটে দে,
ইবলিশের মন্ত্র দিয়ে দেবোই দেবো, পৃথিবীর বেড়া।
এ পৃথিবীর বেড়া, বেড়া এ পৃথিবীর বেড়া।

(প্রস্থান)

প্রবেশ :

রাজাঃ আমি ভাস্কর, জ্বলি, আপন তেজে তবু,
পারি না ঢুকিতে সর্বত্র, কোথা গিরি পর্বত গুহা
যায় না সহজে আমার রবিকর কভু, কভু
যায় না গহীন বনে, গলাতে পারি না ভূ-গর্ভের লোহা,
নগরে, গঞ্জে যত ঘর বাড়ী আছে, তাতে ঢুকিতে নারি,
আমার প্রখরতা কেবল আমারি আজ তাই,
ডাকি এসো হে অজগর হাঙ্গর হিংস্র প্রাণ, আহাজারি
শোন আমার, যদি দিয়ে থাকি সামান্য উত্তাপ, ভাই!
এসো কাছে, এসো লড়ি চন্ডালের সাথে অঘটন ঘটনে
যাদের নাই জুরি, আমি উদ্ধারিব মানব-পশু-বৃক্ষ
সুকুমার বৃত্তির সৈনিক দিয়া, যে রূপেই আসুক দহনে
আমার, পিশাচ রাক্ষসের অনুচরের জ্বালাবো বক্ষ ।
আমার তখতের শপথ, আমার মানব জনের শপথ
যেখানে যত আছে অবিচার দুর্ভোগ অশান্তির শিখা,

সবি করিবে গ্রাস, আমার সান্নিধ্যে সব সৃষ্টি, অসৎ
দূর্বৃত্তপনা হারিয়ে যাবে আমার গো গ্রাসে, রাজটিকা
জ্বলবে জ্বল জ্বল আকাশের চাঁদে, পৃথিবী হবে,
শান্তিপুরী, স্বপ্নপুরী, বর্ণাধারা অবিরত, বিধাতার দয়া,
দৈত্য সহচর কোথা, চলো অভিযানে, এসো সবে
শান্তি চাই এসো, শান্তির যুদ্ধ শুরু করি নয়া, করে, নয়া।
শান্তি চাই শান্তি, যুদ্ধ শুরু করি নয়া করে নয়া। (প্রস্থান)

প্রবেশ :

রাজমাতাঃ

কোথা, কোথা কুমার এসো প্রাণাধিক বাবা জান।

প্রবেশঃ

রাজকুমার-

ছালাম ছালাম, আম্মাজান, কেন ডাকিলেন এবার বলুন।

রাজমাতাঃ স্নেহ বাঁধন ছিঁড়ে দিলুম তোমায় ছেড়ে, খুলে কান শুনে
রাখ, যেতে হবে বনবাসে ঝরাতে বিধ্বংসী খুন।

রাজকুমারঃ

বনবাস,একী বলিলেন হে জননী এ কঠিন শাস্তি।

রাজমাতাঃ পড়া শেষে শোধিতে আপনায় তাই করিতে হয়।

খুঁজিতে যাও আপনার মুর্শিদ, স্মুরিতে আধ্যাত্ম ধী।

রক্ষিতে আদেশ মহাপন্ডিতের, যাও করিও না ভয়।

রাজকুমারঃ

বিদায়, জননী বিদায় শিরোধার্য আদেশ আপনার।

প্রাণের বিনিময়ে হলেও রাখিব কথা হে জননী,

এরই নাম মানবজীবন, পৃথিবী তার নরক কষ্ট কণ্ঠহার

আর্শিবাদ করো জননী জয় করিতে পারি যেন আত্মা-অবনী।

(প্রস্থান)

রাজমাতাঃ

আত্ম-গঠন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসো, সন্তান
স্রষ্টা সহায় তোমার ছেড়ে দিলাম তার হাতে
রক্ষা করো হে দয়াময়, কঠিন বনবাসে করো দান
শক্তি, সহ্য করিতে যেন পারে অনিদ্রা অনাহার দিনে রাতে,
দুর্বিপাক দুর্যোগ হিংস্র হয়েনা হতে রক্ষা করো দিনে রাতে ।
(প্রস্থান)

রাজকুমারঃ জনমানবহীন গহীন বনে, নির্জনে একাকী চলে ।
ক্ষুধার জ্বালায় তৃষায় কাতরে, শরীর পড়ে ঢলে ।
দুই চোখে দেখি সরিষা ফুল,
নিদ্রাকাতর আঁখি ঢোল ঢোল,
আঁধারে ডুবিয়া শিহরি উঠি, নাহি ঘাম জলে ।
হাড়, মাংশ, চামে,
মরণ-শুষ্কতা নামে,
জটর কংকালে আঁটিয়া যায়, পয়বন্ধ বলে ।

রিপুরা উথলিয়া উঠে,

নিরুপায় মাথা খুটে,

গলা কাটা ষাঁড়ের মত, কেঁপে কেঁপে মরে নিশ্বেজ হলে।

(প্রস্থান)

প্রবেশ :

রাক্ষস ও আত্মা রূপ দোলনা :

(হাত পা বাঁধা অবস্থায় দোলনা। রাক্ষসের হাতে বন্দী)

রাক্ষসঃ হু হা, হা, হু হা----- হা হা হা!

আমি প্রলয় কুৎসা রাজা অঘটনঘটনপটিয়সী,

রক্তলোলুপ শয়তান, আমার তুলনা আমি,

আমার অশান্তির জ্বালা বাড়াও আরও রূপসী,

আমার দৈত্য শক্তির তুমি প্রাণ, ধরায় আসুক যামী

চিরস্থায়ী রূপে, ভাস্কর ভেঙ্গে হোক খান, খান,

ধ্বংস লীলায় মেতে উঠিব আমি, ভয়ানক যত

মারণাশ্বেত্র ছোবলে মেরে ফেলব শত্রু মানব সন্তান,

দানব রাজত্ব করিব কায়েম ঐ ফেরাউনের মত।

হু হা,হা, হা হু হা , হা হা, হা, হু হু, হা হা !

হে অপসরী আমার করাল গ্রাসের মুখে,
বন্দীনী আত্মা তুমি, নাচো, নাচতে হবে,
কে আছে এ দানবের গ্রাস কেড়ে নেবে, সুখে
যদি তুই থাকতে চাস, ভূতে কিলাবেই তবে।
(সহচরগণের প্রবেশ)

কে আছিস, আয় আয় করে তুরা আয়, আয়,
পাপের মদিরা সাকী নিয়ে আয়, ঢালিব গলায়।
অবৈধ প্রণয় কাম ঘুংঘুর পরিয়ে দে,
রূপসীর পায়,
পাপ কাম নেশায় পৃথিবী করিব
উলট-পালট চরম হিংস্রতায় (মদ-খাইতে খাইতে-পদচারণা)

হু হা হা হা ----- হু হু হা,হা হা-----

দোলনার গান

হে, পরওয়ারদিগার-----

হে, পরওয়ারদিগার-----

শোন ফরিয়াদ, আমি বন্দীনী অসহায়,

অশ্লীল মোহে বাঁধা আমি হয়,হয় ।

শয়তান ভোগের আশায়,

মাখিছে গা আমার,কাদায়,

টুকে গেছে, টুকে গেছে আমার শিরায় শিরায় ।

কী জানি কী দোষে,

পাতক সাগর উঠেছে ফুঁসে,

প্রলয় তান্ডব মাতিছে গায়, আমার গায় ।

হে পরওয়ারদিগার----

(বাহিরে চিৎকার শোনা যাবে)

রাক্ষস ঃ কে, কে, কে টুকেছে আমার নরকপুরী

করিতে দখল আয় আয় আয় সূর্যরাজ আয় হেরি ।

রাজার সৈন্যসহ প্রবেশঃ

ওরে দুরাচার তবে দেখাচ্ছি মজা স্বর্গপুরী

দখলে আমার, স্রষ্টা সহায়, পরাবো তোরে ডান্ডাবেড়ী ।

(উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে)

ক্ষণকাল যুদ্ধ শেষে রাক্ষস

মৃত আহত রাক্ষসের পলায়ন । (প্রস্থান)

মুক্ত দোলনার হাত ধরে রাজার (প্রস্থান)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (অংক)

বিড়ালসহ রসিক কাঞ্চনের প্রবেশ :

কাঞ্চনঃ কিরে বিড়াল শুনাও সুধীজনে কথা ।

বিড়াল : মিয়াঁও , মিয়াঁও মিয়াঁও-----

দর্শকঃ হা হা হা জানাই ভাষা বুঝার অপারগতা ।

বিড়াল : মিয়াঁও মিয়াঁও মিয়াঁও-----

কাঞ্চন : দোভাষী হই তবেই মিটবে ভাষার জটিলতা ।

দর্শকঃ তাই ভাল , তাই ভাল , তাই মন্দ এ যে নয় ,

বিড়াল : মিঁয়াঁও , মিঁয়াঁও , মিঁ যাঁ ও ।

কাঞ্চনঃ সুধী , বলছে বিড়াল এক যে ছিল , কৃষক , তার

ছিল মোরগ একটি , ডাকতো কুক্ কুরুকুক বসে

বৃক্ষ ডালে শুনে বুদ্ধিজীবী ধূর্ত শিয়াল বাঁকা করে ঘাড় ,

দেখতো ডালে মোরগটিকে , ভিজিয়ে জিহ্বা লালা রসে ।

মুক্ত চিন্তার ফন্দি ফিকির করছিল সে কল্পনায়

এখন সময় ভক্ত কুকুর এসে দিল একটা তাড়া,
ঘুরে ফিরে জাতিসংঘ করে মেঘশাবকের ভূড়ি ছিঁড়ে খায়।
মোরগ ছিল নাস্তিক একটা, মস্তবড় ভাগ্য হারা।
সাহস আরও বেড়ে গেল, খাবে সেই ঈশ্বর-ভক্ত গাভীর দুধ
কানে কানে বলে দিল গর্তে বসে, ছিঁচকে চোর গুহাবাসী
ইদুরকে, ফিরে যাও ধান জমিনে,ঐ চাষীরে জাগাও বোধ,
ধান রাখিবে বৃক্ষতলে, তাই করিল সরল সোজা চাষী।
বিড়ালঃ মিয়াঁও, মিঁ য়াঁ-ও।
কাঞ্চন : সে বলছে, সুধী আপনারা ভাবছেন কী তাকে ?
ভেজা বেড়াল শুকনো বেড়াল না পোষা বেড়াল?
ভেজা বেড়াল অপকর্ম সন্ধানী, চরিত্রহীন বলতে পারি যাকে।
শুকনো বেড়াল চরিত্রবান, পোষা বেড়াল অপদার্থ জঞ্জাল।
বিড়ালঃ মিয়াঁও ! মিঁউ !
সে বলছে, ইদুর আসার সময় হলো তাকে যেতে হবে,
গল্প বলা শেষ হলো না, সুযোগ পেলে পরে
চাষীর গল্প বলবে সমাবেশে, এখন যাচ্ছি আমরা তবে।

ঐ দেখা যায় আসছে চাষী, বনবাসী আসছে মৃদু পদে ঘরে।

(প্রস্থান)

রাজকুমারঃ

দিব্যচোখে দেখছি ছাতির ভেতরে খয়েরী গলিজ রক্ত,
সুতীক্ষ্ণ দাঁতে ব্যঘ্র কামড়াচ্ছে কলিজা, বিচ্ছু লাগাচ্ছে হুল,
বুলেট করছে রক্তাক্ত ছিদ্র ঝাঁঝাড়া, পড়ছে ঢলে রাজ তখত,
রুধিরে উঠে বিধ্বংসী ঘূর্ণীঝড়, লাগে দেহে সমীরের দোলা
এ কি দেখছি নিঃশ্বাসে, আজ বিষবাম্পের হাওয়া, তাই
ঝিম ধরে উবু হয়ে রাখছি ধরে স্রষ্টা নামের বৃক্ষ
শাখা-পাতা-পোষাক, ভুক্তযোগ্যফল-ফুলের চিহ্নমাত্র নাই,
কোন রকম রক্ষা পেয়ে, ঝড়ের শেষে ভিক্ষু সেজে, লক্ষ্য
ত্যাগে গেলাম ছুটে সবুজ বনে, শান্তি লাভের আশায়
ঠিক ঢুকেছি সবুজ বনে আলমীনের স্বত্ব, পেলাম মায়া-ছোঁয়া,
জপের মালা বেড়ে গেল, কুমার রূপে সাজিয়ে দিলেন তিনি।

বুকের সাথে বুক মিলিয়ে, পায়ের ধূলা নিয়ে, নোয়া
মাথা আরও নোয়াইয়ে, উঠিয়ে দিলেন স্বর্গ ঘোড়ায়, কিনি।

চলে গেলাম মহাকাশে লালে ভরা ভ্রমণ শেষে

এলাম ফিরে বৃক্ষতলে নিকষ আঁধারে, ঘুমের দেশে একা,
সে কী আরাম! শ্রান্তি গেল টুটে, উঠলাম আমি হেসে,
এলাম নীলাকাশে, পেলাম প্রেম পিয়াসী আত্মপরীর দেখা।

(ফ্রিজ)

দোলনার প্রবেশঃ

শিহরি শিহরি উঠি, ভোমরার ছোঁয়া পেয়ে,
গুনগুন শূনি কান পেতে, প্রেমের সুধায় নেয়ে।
দেহরস বিলিয়ে দেবো,
মুখ গুজে ঘ্রাণ নেবো,
চঞ্চলা চপলা আমি, নৃত্যগীতে দোলাবো গেয়ে।
আঁখির ভাষা বুঝে,
মনটি নিবে খুঁজে,
সে আশায় পাগলিনী আমি, আছি গো চেয়ে।

(ফ্রিজ)

রাক্ষসঃ (প্রবেশ)

আমি শয়তান-ওয়াছা, ওয়াছা, ঘুরি,

শিরায়, শিরায়, মৃত্যু নেই আমার
অভিশাপ আর পরাজয় গ্লানি ছুঁড়ি
হাতে, দখল করিব মনু-মন আবার ।
তীর্থের কাক আমি আরও পণ পালনে
সুযোগে করিব বধ, ছিন্ন করিব ঈশ্বর হতে
নিস্তার নাহি দেব রোগে শোকে জীবন চালনে
দেবো বাধা, সমাজাচার দিয়ে বিঘ্ন হবো ব্রতে
আমার দু'চোখ নিয়েছে, আজ আমি অন্ধ
বুঝে নি যে রাজা চলি আমি আঁধারেই

অন্ধকারের জীব পাপ শিং দিয়ে বন্ধ করি রক্ত
আলোর, ভেঙ্গে দিয়েছে পা ক্ষতি কি ক্ষতি
হরেক রূপে ভাসি পবনে ঢুকি নাসারক্ত দিয়ে
শরীরে না হলেও চোখে মনে করি সতী-অসতী
মুখজনের পূণ্য গিলে খাই সত্য হতে সরিয়ে নিয়ে,
যেখানে যা পাই, তাই অবাধে চিবাই,
গোত্রে গোত্রে দেশে দেশে চির গোলযোগ করি
হয়েছে দক্ষ, নিস্তার নাহি কারো, আমরণ শত্রু দিয়াই

রচিব কবর মনুর, প্রাণ দেব অশান্তিতে ভরি ।

(প্রস্থান)

দোলনার প্রবেশ : ক'জন সখীসহ গাইবে-----

হৃদয়চারীরা-----

সুখ ঐ নহর জলে, নাইলি, নাইলি রে

নাইলি একাই হৃদয়চারী,

নাইলি একাই রে,

দুইচোখের পাতা বুঁজে দেখিস

বি-ভু, বিভুই লেখই রে

রাক্ষসের প্রবেশঃ

কাদা ছুঁড়ে মেরে,

হু হা হা হা, হা হা হা!

ধীরে ধীরে রাক্ষসের প্রস্থান ।

দোলনার প্রস্থান ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (অংক)

রাজকুমারের প্রবেশ :

একি! একি! হলো আমার, ক্ষুধায় কাতর আমি,
একি! বসন কোথা! কি লজ্জা, এমন তো হয় নি কভু,
কি ভুলে এমন হলো, কেন আসিলাম সাধারণে নামি,
এমনি যদি হবে ছত্রিশ বছর বনবাসী কেন আমি, তবু
আমার মন বলছে, একদিন হবে জয় মায়ের আর্শীবাদে,
যাক্ যাব আমি মায়ের কাছে, খুলে বলিব আমি সব কথা,
কায়ক্লেশে, পৌঁছিনু আপন মায়ের কাছে, নির্বিবাদে
পৌঁছে মায়ের দ্বারে কহিনু মাগো, শুনবে ব্যাথা?

রাজমাতার প্রবেশঃ রাজমাতা--

কি হে বাছা কখন এলে, তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজকুমার-

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে মা সর্বনাশ!

রাজমাতা---

একি! শুনি দীর্ঘ সময় পর, মাথায় বজ্রপাত যেন।

রাজকুমারঃ

আমার ছিল আজব শক্তি ‘মুখে বলা আর হওয়া’ ব্যস!

রাজমাতা---

এখন কি এ গুণহারা তুমি? হ্যাঁ চিন্তা করছি তাহা।

দীক্ষাগুরু ছিল তোমার বাপু? সত্য করে বলো।

রাজকুমার--

না মা তা ছিল না, একা সাধনা করে অর্জন করছি তাহা।

আজ তাই হারালাম রাগের বশে, কেন এমন হলো?

রাজমাতা---

দীক্ষাগুরু ঐ দীক্ষাগুরু অতি জরুরী, তা ছাড়া আর

কিছুই হবে না স্থায়ী, শত্রু-কবলে ধ্বংস হবে তুমি পুত্রধন।

প্রথম থেকেই করবে গুরু, যাও ফিরে যাও ঐ নদীর পাড়,

অলী মন্ত বড় দিবেন তোমায় সঠিক জ্ঞান হবে সফল পণ।

চলো বাছা খাইয়ে দেবো, একটু কিছু দেবো সাথে,
কষ্ট হলেও যাও ফিরে যাও দীক্ষাগুরুর কাছে
নইলে বাবা এই সফুরা সুখ পাবে না নির্ধুম সারারাতে,
কান্না কাটি করছি যে সুত শ্রষ্টাতরে সুত কেমন আছে,
নফস-রহিত-শক্তি অর্জন করেছো কষ্ট করে, আরো কর,
তরতীব যে ভীষণ দরকার, বনবাসী হবে ফের যাও তুমি,
আমি বাঁচি-মরি দুঃখ করো না, গুরু দেবেন তোমায় বর।
এসো দিই আমার স্নেহের বাঁধন খুলি, আশীষ চিহ্ন চুমি।
(ধীরে, ধীরে রাজকুমারের প্রস্থান)

হে মাওলা আমার, হে মাওলা আমার
করো তুমি দয়া, করো তুমি দয়া,
পূরণ করো বাঞ্চা তাঁহার, পূরণ করো বাঞ্চা তাঁহার,
অগতির গতি তুমি, বলে দুঃখিনী মায়ের মায়া।

(রাজমাতার ধীর লয়ে গান)

প্রবেশঃ

রাজা---

কোথা, কোথা বেগম ওহ! এখানে তুমি, কোথা কুমার!

রাজমাতা--

আবার গেছে বনে, দীক্ষা গুরুর সন্ধানে যদি পায় বর,

রাজা---

আর কতকাল লাগবে, ছেলে কী ধ্বংস হবে তোমার?

রাজমাতা---

জানি নে, জানি নে, স্বামী! ঈশ্বর-কৃপায় করছি আমি ভর।

রাজা--

ঠিক আছে তা, বলছি শোন, বাড়ছে উপদ্রব দস্যুতা আর

দেও-দানবের অত্যাচার, যেতে হবে অভিযানে, যাই

ফিরবো না আর না মেরে তাহে, সৈন্য করছি জোগাড়,

বেগম চলো এবার রাজপ্রাসাদে সময় বেশি নাই।

(যুগলের প্রস্থান)

দীক্ষাগুরু----

কুমার তোমার বাবা, রাজা-দরবেশ তবে

সাধারণে আসতে হয় ফিরে তার, সরাতে জঞ্জাল,
সাধারণে আসতে মানা, সংসার বিবাগী যবে
মরণে না পায় ভয়, এশকে এলাহী দিবে সামাল ।
জেহান-শক্তি কার কী রকম, কাজের ভেতর ফলে,
কেউ পারে শুধু নিজেকে দেখতে, কেউ দেখাতে
ভাবা সহজ কিন্তু ভাবের ভিতর পড়া ঢলে
কঠিন, সে পারে না বেরতে, পারে না শেখাতে
ফানাফিল্লাহ-এ মজে গিয়ে মজনু বলে
খেতাব পায়, মৃত্যু তাহার এভাবেই হয়
স্বর্গ তাহার বুকে আছে, ঈশ্বর তাহার দ্বিলে ।
শরীর তাহার ধরার সমান, ভেঙ্গে গড়ে হয় ক্ষয়,
প্রিয় কুমার এসো বুকে, মাগুলার হাতে দিলাম তুলে ।
পাতা-রস খেয়ে পূর্ববৎ জপ করো, আসবে সময়ে
গভীর জলে ডুব দিলে যে মরে গিয়ে বাঁচো, খুলে
যাবে দিব্যচোখ, স্থির যাচিবে দেহশাস্তি সয়ে ।

ঐ, ঐ পথে যাও, হক মাওলা, হক মাওলা,
পূরণ কর আশা, শ্রমের ফসল দিও, দিও, দিও,
স্বর্গ তাহার বুকে এবার দিও, করে স্বত্ব কাওলা,
মরণ হতে আসছে ফের, ভুল শুধরে, প্রিয় করে নিও।

(দুইজন দুই দিকে প্রস্থান)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ(অংক)

প্রবেশঃ

রাজা---

সৈনিক দল প্রস্তুত হও, আজ দূর করতে হবে,
পারিবারিক সন্ত্রাস, সামাজিক সন্ত্রাস, মৌলবাদ
এক সংগে কুড়োবে মানিক্য, হৃদয়ে গোপনে রবে,
হারজিৎ ভেবে নয় জিতের আশে মুঠোয় রাখো চাঁদ,
কোথা রাক্ষস, দানব দূর্বৃত্তপনা, হৃদয়হীন মরা হয়না,
কোথা মহাশত্রু শয়তান, মরমী সুফীবাদ কোথা কোথা,
ধ্বংস করো নিঃশ্বাসে, অস্ত্রজোরে, দিব্যজোরে যায় না
পারা, কে আধমরা, অধম! শান দে দা-কুড়াল ভোতা,
শান দে আধুনা মারণাস্ত্র হে দিকবিজয়ী বীরসকল,
মরার আগে মরো না, জীবন একটাই, মরণ একবার,
আমি নিশ্চিত প্রুষ্ঠার কৃপায় ভবে ফের পাবে দখল,
অশান্তি, অসৎ যত চেতনহীনের মৃত্যু হোক, অসাড়!

প্রস্তুত সব! চল, চল, চল যাবে চল সত্য অভিযানে,
মারিব তীর আধ্যাত্মিক শক্তির, নহে দৈহিক নহে বটে,
সাজ, সাজ রবে চল, চল সাবধানে অতি সাবধানে,
দুনিয়াব্যাপী সত্যের জয়, জয়কার ধ্বনি যেন যায় রটে।

(সৈন্য সামন্তসহ প্রস্থান)

প্রবেশঃ

বন্দি দোলনাসহ রাক্ষস দলের রাক্ষস-----

আমি নরকের কীট, কামড়ে শরীর করি বেদনায় নীল,
ভদ্-ধূর্ত সেরা, অহং-রাজা, তুমি আমার অধীন
অশান্তি আর মর্মজ্বালায় গিলে খাব ভব করে তিল তিল,
কান্নায় ভেঙ্গে হোক চুরমার মনু-আত্মা, আমি খান্নাছ-জ্বীন।

হু, হু, হা, হা, হা, হা, ! হু হা হা !

কিরে তোরা দাঁড়িয়ে আছিস! দে সুন্দরীর বাঁধন দে খুলে,
বল্ ওকে বল্ প্রলয় নৃত্যে উন্মাদ করুক বিশ্ব চরাচর,
দেখি কোন্ সন্ন্যাসী ঠেকায় আমায়, ভেঙ্গে দেবো ঘাড়, ভুলে

যাবে বাপের নাম! ছায়া যেন লেগে আছি, কোথা নারী-নর,
এরাই এই নারী! দোসর আমার! কজা করি এই নারীদের!
তণু জড়ানো স্পর্শকাতর কামাঙ্গ-কবিলা অনঙ্গ মদন-বর
এরাই ধ্বংস করিবে দিয়ে কামাঙ্গ, এদের বংশকুল,
চেয়ে দেখিব, অটু হাসিয়া মাতিয়া উঠিব, বিলয়-ভেদের
মন্ত্র জানি আমি শয়তান, শুধু জানি লক্ষ্য আমার নির্ভুল।
আমি মজে যাই এই অবলায়, চুমু দিয়া চুম্বি যৌবন-রস,
আগত প্রজন্মকেই কানে কানে বলে দিই নিঃসংকোচে
আমার দলেই করো ভীর, তাই করো আমি আঠালো-কষ
মানবের সর্বাঙ্গে আমি চলি রগে রগে অহোতমা দুচে,
উদ্যম করে দিয়েছি ধরায় এই মনুজেরে আমি, ওরা ছোট
পেছনে, জনে জনে গিলে ফেলি শ্রেষ্ঠ খ্যাত ইনসান জাতি,
এই টোপ দিয়েই এক উলঙ্গ শর্বরী কোটি চোখে জোটে
যায় যদি উন্মুক্ত, তারপর আমি অন্য উসিলা খুঁজি মাতি,

আর কী থাকে ব্রীড়ার, শুধু জঙ্গে লিগু হই নাথের সাথে
গায়েবী বিশ্বাসে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভয়-এশকে নেই আমি,
শ্রেফ পশু বানিয়ে ফেলি আপনারে আপনি নিজ হাতে-
নামে থাকে মানুষ, ভেতরে এই নারী-আত্মা-অন্তর্যামী ।
সংসার ধর্মের নামে আজীবন খুবলে খায় পঁচা দেহ
ওতেই খুশী নরাধম সবে ধরার, আর করে আমার পূজা,
দুরাচার আমি ভরে ফেলেছি শিষ্য দিয়ে তাবৎ ভূ-গেহ,
মদ-নারী-জুয়া, যুদ্ধ-সম্ব্রাস-অহং-ধনে মেতে উঠে সোজা
আজও তাই কর্ খুলে ফেল্ লজ্জাবরণ দেখুক সবে
মদনে-অনঙ্গে মেখে সবে করুক আকাম, হু-হা-হা-হা-হা
এই রূপসী ললনা মর্মে মরে গেছ?চেটে দিই গাল তবে?

হু-হু-হা, হা-হা-হা, হু-হা-হা-হা !

নেপথ্যে-----

জয় সত্যের জয় !

জয় সত্যের জয় !

সত্যের পূজারী আমরা নির্ভয় !

সত্যের জয়, জয় !

(দলবলসহ রাজার প্রবেশ এবং যুদ্ধ শুরু)

{রাক্ষস দলের পরাজয় আহত অবস্থায় পলায়ন}

রাজাঃ কে তুমি, মা, কোথা তোমার নিবাস, এখানে কেন?

দোলনা-

হে গুণধর, মহারাজ ! আমি বনফুলবালা, থাকি বনে-নির্জনে,

বদগুণ দোসর রাক্ষস করেছিল বন্দি তার বাধ্য হই যেন ।

দয়াময়ের দয়ায় পেলাম রক্ষে আপনার শুদ্ধি উদ্ধার রণে ।

(গীত করুন সুরে)

রাজা--চলো, মা, চলো আমার সাথে রাজপ্রাসাদে,
যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, থাকিবে সেখানে,
রাজমাতা দেখভাল করিবেন তব, বিদূষী তিনি অনায়াসে
জ্ঞান সাগরে করিবে মন্থন, স্বর্গ-সুখ শান্তি আসিবে যেখানে।

(সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রবেশঃ

কাঞ্চন---

কি হে বিড়াল, বলবে তোমার গল্প হাসির গল্প,

বিড়ালঃ মি-য়াঁ-ও ।

কাঞ্চনঃ

বলছে বিড়াল, শুনছে কিনা সবে, মাইক দরকার হবে ।

দর্শকঃ না না দরকার নেই, গলার জোর বাড়াতে হবে স্বপ্ন ।

বিড়ালঃ মিউ মিউ মি---উঁ মি-----উঁ ।

কাঞ্চনঃ

বলছে সে যে, বৃক্ষতলে রাখা ধানের গন্ধ পেয়ে হুঁদুর তরে,

গর্ত করল হরেক, বৃক্ষ শেকড় হল নরম, ঝাঁঝাড়া হল মাটি,

চাষীরে রাখা হলো বেঁধে মহীকাণ্ডে কুকুরে দেখে দিল টান,

সংগে সংগে বিটপ গেলো পড়ে ধেনুর পিঠে সত্য কথা ঘাঁটি ।

ধবলী গেল মারা, পড়ল মোরগ নিচে, শিয়াল দেখতে পান,

গলা টিপে মারে, রুধির-মাংশ খেয়ে ঢেকুর তুলে বায়ু ছাড়ে,
কুত্তার ঘেউ ঘেউ শোনে কে, চাষী হল সর্বহারা আর মনমরা,
ছুটে গেলো দীক্ষাগুরুর কাছে যদি গতি করে দিতে পারে।

দীক্ষাগুরু শুধান তারে, হে বোকা চাষী নাও মাটি পড়া,
খুলবে নাকো কৌটা! কাল সকালে চোখ বুঁজে ঈশ নাম ধরে,
দিবে ভেতরে তোমার হাত, পাবে যা তাই নিয়ে যাবে হাটে,
কিনবে আবার পয়স্বিনী আর পুষবে বিড়াল ঘরে,
কাঁটা-খাওয়া ইঁদুর-খেদানো বিড়াল লুকায় আমার খাটে।

বিড়ালঃ মিয়াঁও মি য়াঁ ও।

কাঞ্চনঃ

বলছে বিড়াল, আসছে যেন কে, জানাই অভিবাদন।

দীক্ষাগুরুর প্রবেশঃ

কি হে কৃষ্ণাণ আছো কেমন, বললে না যে, আছো কেমন!

কাঞ্চনঃ

ভালই আছি আশীর্বাদে আপনার, কী সেবা দেবো গুরু এখন,

দীক্ষাগুরুঃ

তা'জীম করো, আসলে কুমার প্রজায় করে যেমন ।

শিক্ষা তার শেষ, রোগ হয়েছে নির্মূল, সমাজে ফিরে যাবে,

সকল লোকে দীক্ষা নেবে, ন্যায় রাজত্ব কায়েম করবে ।

কাঞ্চনঃ

গুরু, এই যেন কারা, ধন্য তারা হবে, গুরু সাক্ষাৎ লাভে,

রাজমাতা ও দোলনার প্রবেশঃ (সাথে প্রহরী দল)

শুনে আমি আসলাম গুরু, এই কান্তা, জীবন যুদ্ধে লড়বে ।

বর দেন, বর দেন, গুরু, তারে ঘরে রাখা দায়,

দীক্ষাগুরুঃ

দেখছি আমি কী করা যায়, কইরে কুমার কই,

এসো গো রাহে প্রভুর সঁপে দেবো, হবে প্রভু যাহা চায় ।

রাজকুমারের প্রবেশঃ

গুরু বলুন, হাজির আমি বলুন যা-ই, করবো সই সই ।

রাজমাতা

এ যে আমার বাছা, বাছা এসো বুকে, পেলো বুঝি দীক্ষা,
এই আশাতেই বুক বেঁধেছি, শোকর জানাই স্রষ্টাকে,
বোকা আমি নইকো রাজা, কুমার পেলো আধ্যাত্মিক শিক্ষা,
গুরু এই দেখুন, ভিথিরির বেশে রাক্ষস, গুণাবলীর হত্তাকে,
ছদ্মবেশে আসছে সে যে, সাথে আছে ধারাল ছোরা।

রাজমাতাঃ

প্রহরী বন্দি কর এই শয়তানকে, জেগে উঠুক সত্য সুন্দর।
(প্রহরী এবং রাক্ষসে যুদ্ধ। পরাজিত রাক্ষসের মৃত্যু।)

কাঞ্চনঃ

শুভ পরিণয় বিড়ালের, রাজমাতা দিন দেহ-রুহে ফুলতোড়া,
দীক্ষাগুরুঃ

জয় হোক, রুহানী শক্তির, মরে যাক রিপু হুঁদুর, রিপু হুঁদুর।

৭ম পরিচ্ছেদ

দোলনার প্রবেশঃ

(রাজ প্রাসাদ ও তার সন্নিহিতে রাজকীয় উদ্যানে দোলনার বিহার,
বিচরণ। দোলনার সঙ্গে সখীগণ নৃত্যরতা। নদী তীরবর্তী মনোরম
প্রাকৃতিক পরিবেশে মনের আনন্দে সুপ্রবৃত্তির
বিজয়োল্লাসে গাইবে (নৃত্যসহ)

দোলনা ও তার সখীগণ সমবেত কণ্ঠে গাইবে-----

আজি বিহঙ্গ বিহার পবনে, পূণ্য সুরভী সাজে,
হেথা মরমে মরে পদ্ব, অপসরীর কংকন বাজে।
দ্যুতির ছড়াছড়ি এশকে মজি,
ইষ্ট খুঁজি গো, মনু-হৃদি ভজি,
ও সখী লো, তণু ফুলশারে গুমরি কাঁদে লাজে।
সুর লহরী তুলি, ওগো স্বর্গ সাধে,
নিংড়ে হিয়ে মজে সিঁরি ফরহাদে,

নেই অনঙ্গ-মোহ রূপে, দহে এশকে নাঁজে ।

সখীগণের সমবেত আবৃত্তিঃ

চল, চল, চল সখি লো সখি হেথা,

প্রাণখোলা নিলুয়া বায় বহে যেথা,

শন বনে ঘেরা নিমরঙ্গ যমুনা আজি,

অকূলে নাহিব সাঁতরে সাঁতরে বাজি ।

সখীরা কল কল হাসে-হা হা হা------(মেয়েলি হাসি)

(নদী ঘাটে সখীসহ দোলনা এমন সময় আধ্যাত্মিক পথ যাত্রী

বনবাসরত রাজকুমার নাহিবার জন্য নদীতে নামার উদ্যোগ

নেবেন । তাঁকে চোখে পড়বে দোলনার । দূঁজনে চোখাচোখি হবে

পরস্পর মাহেন্দ্রক্ষণে ক্ষণকাল । ভরা যৌবনে নদীজলে ধৌতা

অপূর্ব রূপ লাভণ্যে সজ্জিতা যেন দোলনা । আর কে ঐ অদূরে

বনবাসী অনিন্দসুন্দর সুঠাম দীর্ঘদেহী ঝাঁকড়াচুলধারী ! এ যে

আগন্তুক তা নিশ্চিত । কারণ নিকটেই রাখা তাজি ঘোড়া ।

কথায় আছে, ছেলেরা মেয়েদের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়লে
বোকা বনে যায়

কিন্তু মেয়েরা চতুর হয়ে ছেলেদের নাকে, কানে দড়ি লাগিয়ে
খেলনা লাঠিম বানায়।

বেচারী রাজকুমারের সেই দশা উপস্থিত। জীবনের প্রথম মেয়ে
জাতের

আঁখিতীর আঁখি আর কলিজায় বিদ্ধ হয়ে রক্ত স্রবণ শুরু হচ্ছে।

ফুলশরে আহত রাজকুমার কোন কথা বিনিময় ছাড়াই ঘোড়া চড়ে
গভীর বনে চলে যায়। ভেতরে ভেতরে দূ'পাখির বিনে সূতার দুর্ব্বার
আকর্ষণ জন্ম নেয়। অস্থির চিন্তে যামিনী কাটলে
পরদিন নানা ছুঁতায় দোলনা-রাজকুমার অচিন্তনীয় প্রেম-অভিসারে
বের হন।

দোলনা-

এ কী! আমি একা, কোথা গো ও সখি,
ডানে-বামে তমাল ছায়াঘেরা চক্চকি,
উষাদিত্যের হলদে শোভায় হেরি ছবি
কার, কে ঐ হেথা যুবা জরী বসন, সবি
ভ্রম মোর, কে চাহি রহে কে নয়ন মেলি,

নেত্র তারায় তার, অক্ষি রাখি অবহেলি ।
ও চোখ ও তারা দ্যুতি রূপে আকর্ষি আছে,
ক্রমে ক্রমে নেয় টেনে কাছে আরো কাছে ।

তণু ক্রমশঃ হচ্ছে অবশ দুর্বীর লোচন-টানে,
লোপ পায় অভিরুচি, যেন হারাই তটিনী বানে,
সে যুবার নিলাজ আঁখ, মোরে ব্যাধের তীরে,
হিয়ে জোড়ে মধুর আঘাতে করে ঝরঝর, শিরে
নাহি বোধ, আমি কোথা, কে এ যুবা, চাহি ঘোরে
হইল কী আমার, নাহি ঘুম,নাওয়া-খাওয়া ওরে !
লাজে মরি, যাই ফিরি, জিজ্ঞাসি ত্বরা.কে যুব-নর !
ভেঙ্গে স্বর চুরচুর, ক'ব কী হে মানস-প্রতীমা-বর !
রাজকুমার :

আমি বনবাসী, মাতৃ-দীক্ষায় বন কুঠিরে প্রাসাদ ছাড়ি,
আত্মিক-শিখন হয় নি অবসান, লেগে রই যত পারি ।
তুমি কে গো অনিন্দসুন্দরী, আনত আয়ত নয়না বামা,

দেখি নি জীবনে অমন কারু, তব রূপ সম রামা ।
বুক ভরে যায়, জুড়ায় প্রাণ তারে হেরি গো, কেন
অমন হলো, কভু অমন হই নি অমন কাতর যেন ।
বপু-মন কাড়ি নিল ঐ অঙ্গনা কে, ভাবিছে কুমার,
সুধায় অবলীলায় অবলায় দাও পরিচয় কান্তা তোমার ।
জুগিয়ে সাহস অস্ফুট স্বরে জড়ানো গলায় দ্বিধা ছাড়ি
কহে, দোলনা-নয়নে নয়ন রাখি এশক অনুভবি তারি ।
আজি ভামিনী রূপ হেরি আসক্তি জাগি মনে হয় স্বজন,
হৃদে গেঁতে যাওয়া প্রমদা, নেত্র-ভাষায় ফুটে প্রাণ মন ।
যৌবন রাগে আপনারে উজাড়ি, ঢালে শান্তি ছোঁয়া মধু,
দোঁহার হিয়ে আকর্ষে তবু যেন লাউ ডগায় ঝুলে কদু ।
লাজ ছিনে বুঝে না এশক সুখ খুঁজে একান্তে দোঁহে,
শিহরি শিহরি উঠে, নাচে ধমনী টগবগ দোঁহ-লোহে ।
অচল অবশ তণু মন আলিঙ্গনে উদ্যত, মানেন না মানা
এ কি হল ! যৌবন রস উপচে ঝরে আবেশে দেওয়ানা,
ভাল্লাগে না যুগল বন্দী বিনে আর স্বভাবও যেন উৎসুক

উৎফুল্ল যেন উজাড়ি দিতে চায় আপনার বুক !
ফিরে ফিরে চায় অটবি-পল্লবে ছায়া সুনিবিড়
হাতছানি দিয়ে চুপিসারে মিলন সুধা মাখে ধীর ।
যৌবন উন্মাদনা প্রেম পিয়াসে গিলে প্রমদা-রূপ,
এ যেন অপরূপ সুন্দর মায়াবী রহস্য ঘেরা কূপ
যেথা নামিলে, ডুবিলে আর হারালে মৌবন ফিরে
কী পায় ভ্রমর বিনে রসাসন কেউ রসায়ন হীরে !
সখীগণে ফাঁকি দিয়ে শ্রোতস্থিনী তটে কদম্ব তলে
কে এলে গো আজি আনন্দ বহে এসো বাহু বন্ধনে
বাঁধি দূজনায় বিনি সুতী মালায় দানি পাপড়ী সম
ওষ্ঠাধর যেন চেপে ধরে, লেহ্য চুষ্য সুটোল দেহ,
পেয় ডুমুরী দুগ্ধ ধবল ধুগল নিতম্ব স্বর্গ তোরণ গেহ !
স্বর্গের অপসরী হ্রপরী কী শান্তি ছোঁয়ায় প্রিয়া কেহ,
যেন মন চাহে ছুঁইয়ে দিই জাগে আলিঙ্গনে আগ্রহ ।
মেঘে গগনে একাকার ঝুরে বারি শান্তি শীতল ঐ
প্রিয়া লহো উষ্ণ ভালোবাসা, চাহি আমি এশক বই ।

৮ম পরিচ্ছেদ

প্রবেশ :

দীক্ষাগুরু :

এ কি ভীষণ জ্বর, পুড়ে যাচ্ছে গা, কপাল !
রাজকুমারের বনবাস যেন বর্ষায় গ্রীষ্মকাল ।
মশার কামড়, অনাহার অনিদ্রা, দীক্ষা চাপে,
উল্লুঝুল্লু পোষাকে আবৃত, মৃতবৎ কাঁপে
ম্যালেরিয়া জ্বরে, ঔষধ পথ্যহীন বন কুঠিরে,
রক্ষিতে অমূল্য তাঁর প্রাণ-দেহ, কোথা ছুটিরে ।
সন্ন্যাসীর গৃহী হতে মানা, রোগে শোকে সবার
যেন চিরাচরিত পণ, যাপিত জীবন যেন কবর !
তবু, তবু জোগাতে সাধনায় শক্তি, ঔষধী অটবী
আনিতে যাব তরঙ্গিনী তটে, না পাই অবধি ।

প্রবেশ : বিবেক

ওহে গুরু জ্বী, তুমি এখানে কী করছো গো,
দীক্ষাগুরু-আর বলো না গো সাঁই জ্বী তপঃ দ্বার প্রান্তে

কুমার, সবক যবনিকায় পূর্ণতায় পড়ছে তো.
আজি সেবার আদলে দোলনা যদি জানতে,
ঐ দেখো সখি সমেত কুড়াইছে বনলতা,
যদি আসিতো সে অবলীলায়, হত আনন্দ সুখ
কুমার আসিতো ফিরে মারেফাত পীর যথা
রিপু পুড়ে পুত শাহজাদা পেতো এক বুক
ভালবাসা হতে যশোদা-নন্দিনী রাধা রাই
ছুঁয়ে দিত উষ্ণ আলিঙ্গনে কৃষ্ণ রূপ কুমারে
হতাম ধন্য অনন্ত প্রেম লীলা দেখিবারে পাই।

বিবেক-

হতেও তো পারে কুঞ্জবনে মিলন বলি তোমারে।

দীক্ষা গুরু-

একটা গান ধর তো সাঁই জ্বী।

বিবেক-

ঠিক আছে

বিধিরে-----

তোমার রেজার জোরে গুপ্ত রূপে গড়ে,
কামালিয়াত লুপে নিবে শাহজাদা লড়ে ।
রিপু পুড়ে পুত সে যে,
বাঁচাও বিভূ আশা এয়ে,
দয়াল তুমি দয়া করো ঐ কুমার তরে ।
শেখ ফরিদের বাণী ঐ
তখত ছাড়ি খুঁজি কই,
দ্যুতি ঐ, বিদূষী সফুরা নন্দনে বরে ।
কবি বরে পিছু লয়ে,
শান্তি চাহে ইষ্ট ভয়ে,
ভুবন হারে আত্মা জিতে নাথে স্মরে ।

মাগো আমাকে এক আঁজলা পানি দেবে !

দোলনা সহচরীসহ এগিয়ে বলে জল নেবে

নাও নেবে নাও তবে রোগী কে , আছে কই ,

দীক্ষাগুরুঃ

চল গো মা দেখবে কুমার রোগী আছে ঐ ।

শালবন ডেরায় , মুরীদ আমার অতি সফল ,

দোলনাঃ

চল তো সখি দেখি সত্য কি নাকি অচল

সন্যাসী যুবরাজ কাহিল ডেরায় চিতপটাং

সেবার মানুষ কই , সাধক প্রবর রয়ে একা

সেবার সাথে সেবার মাঝে মেলে ঈশ দেখা ,

সৃষ্টির সাথে মা আছে , মা-ই নাথ সুতরাং ,

প্রণয় থেকে প্রেম এসে যায় যৌবনে ঢেলে ,

দীক্ষাগুরু-

এই তো এসে গেছি দীক্ষা-ডেরায় অবহেলে,
ভেষজ, পথ্য আর বদ্যি পাই আর চিন্তে নেই,
জাগো কুমার জাগো ত্বার জল দেখো এই,
দোলনা-

একি দুর্দশা আপনার, ততোধিক আন্তানার,
কপাল যাচ্ছে পুড়ে শাহজাদার বপু অসাড়,
ঔষধ ভক্ষে জল পান সেরে বসে পড়ুন,
গা মুছে দিবো পোষাক পাল্টে এসে ধরুন,
পারছি নে দোলনা হাত দিয়ে সাহায্য করুন
সেবায় রক্ষে হলো, রাজমাতা মনে ধরুন।

রাজমাতা-

এবার আমি বিয়ে দেবো কুমারের সাথে
দোলনা নামের পুত আত্মার, জাতে, জাতে,

মিলে সোনায়ে সোহাগা, পূর্ণতা আধ্যাত্মে,
এসে মানিক জোড় সমাজে সততাতে
ভরে, চলো কুমার-দোলনা চলো প্রাসাদে ।

দীক্ষাগুরু-

দীক্ষা শেষে কর্মযোগে হয় সফলতা ঐ
কুমার আমার, সহিহ বৈরাগী রাজা, লই
মারেফাত শিক্ষা, সুশাসন জারীর হইচই

পড়ে রাজত্বে, চন্দ্রিমা জোছনা বুরিছে সই সই,
রাজপাট বিয়ের সাজে মুহু, হৃদ-নাচে নিনাদে ।

২৫/১২/২১ ষোলমারা কিশোরগঞ্জ ।

হৃদয়চারী ২য় খন্ড (২য় অংশ)

জীবন্যাস

এতে আছে-----

১. সফ্রেটিস.

২. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (রহঃ)

৩. হযরত বুননুন মিশরী (রহঃ)

নিরুপদ্রবে তিষ্ঠে ক্ষণকাল

আমি অস্তিত্বের ভাংগা কুলায় ছাই রেখে
ক্রমাগত হাঁটি কী যেন পাওয়ার নেশায়,
অতীতের বিধ্বস্ত পিরামিডগুলির সুতীক্ষ্ণ
মস্তক ঘোটকের মত পাগল করে হেঁষায় ।
আমার অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতকে
হামলা করেছে স্বনামে বেনামে
অসুরেরা, আর আমি সন্তান-সন্ততিসহ
হাওয়ার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি কোন্ ধামে?
আমার শৌর্যের পিদিম জ্বলে উঠে ক্ষণে
ক্ষণে, অন্তত রাগের চৌহদ্দী পার হতে চাই,
নিয়তির দিকে চেয়ে না থেকে, আমার
বুকের হাড় দিয়ে তীর বানিয়ে ছুঁড়তে যাই
পরস্বপনহরণকারী হিংসুটের চোখে মুখে,
পৃথিবী কখনও নিরাপদ বাসভূমি না জানি তবু
ক্ষণকাল তিষ্ঠে ঈশ্বরের দিকে হাত বাড়াব সুখে ।
কাজেই আমার এক হাতে বুদ্ধির তীর, অন্যহাতে
ঈশ্বরের সাথে যোগসূত্রের অস্তিত্বের ছবক,
দু'য়ে মিলে জীবন প্রবাহে ফুটাবো ফুলদল
শেষে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাব কষে জীবন ছক ।

কবি/স্বাক্ষরিত

১৫/১/১২খ্রী.

জীবন্যাসের পরিচয়ঃ

জীবন্যাস শব্দের আভিধানিক অর্থঃ “মন্ত্রবলে দেব প্রতিমায় প্রাণ দান” ।

(অপ্রচলিত) ।

রচনাইশৈলী বা রচনা বৈশিষ্ট্যঃ

(১) পদ্য ছন্দে বা গদ্যে লিখিত হবে ।

(২) বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু সম্পন্ন বর্তমান বা ঐতিহাসিক চরিত্রের বাক্যবাণে গতাসু বা ঐতিহাসিক চরিত্রের বাক্যবাণে গতাসু জাহ্নত ঐশীদূতের বাণীর সম্মোহন শক্তি এবং সত্য কাহিনী বিধৃত হবে যা স্থায়ীভাবে চিরকাল মঞ্চে উপস্থাপনযোগ্য ।

(৩) সুলিখিত প্রবাহমান শিল্পগুণ সম্পন্ন পদ্য ভাষায় উপস্থাপন করবে বিশুদ্ধ চরিত্রের সত্য কাহিনী রূপকার, রূপকার সহকারী যোগে (যদি ঐতিহাসিক চরিত্রের ছবি না পাওয়া যায়) আর যদি ছবি বা মূর্তি থাকে তবে সেই ছবি বা অনুরূপ পরিচ্ছদ/মূর্তি গ্রহণ পূর্বক সঠিক তথ্য রূপ দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্র নিজেই ব্যাখ্যা করবে দৈববলে নিজেই জীবন্ত রূপ লয়ে যাতে জীবন্যাসের নামের সার্থকতা ফুটে ওঠে ।

(৪) আলোচ্য জীবন্যাস সিরিজের শব্দ ভাষা কোন কালেই স্থানান্তর, রূপান্তর পরিবর্তন, পরিবর্ধন যোগ্য হবে না ।

(৫) জীবন্যাসে কাল্পনিক কোন চরিত্র স্থান লাভ করবে না । সত্য চরিত্র সত্য কাহিনী দিয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হবে । তাতে নাটকীয়তা বা কল্পনা জাল থাকতে ও পারে নাও থাকতে পারে, মজাদার হতে পারে, নাও

পারে। এমন কি কাহিনীর ঘূর্ণাবর্তন আরোহ বা অবরোহ নাও থাকতে পারে তবু তা জীবন্যাস কেননা কোন কোন দেবতুল্য ঐতিহাসিক চরিত্রের আমরা কিছু জানি বা আংশিক জানি সত্য রূপে তাই আসবে বর্ণনায়। তবে মঞ্চায়ন বা উপস্থাপন ব্যঞ্জনাময় করা যায় উপাখ্যানের শুরু এবং শেষে মূল চরিত্রের নির্ধারিত ঐতিহাসিক মূল্য অনুসরণ করে অনুরূপ আন্তরিক আবেদনময় করে তুলে, সুরে কথায় এবং গানে বন্দনা বা স্তুতি সৃষ্টি করে।

জীবন্যাস

“সফ্রেটিস”

১৩/৭/১৩

প্রথম অধ্যায়ঃ-

সফরেনিকাশঃ

এতো যে অভাব অনটন কাজের তাই,
কী করে চলিবে সংসার বুঝি না ছাই।
স্থপতির কাজ পাওয়া ভার, উপুস বুঝি

লেখা কপালে, মনে চায় অন্য কাজ খুঁজি ।

ফেনআরেটঃ

গাঁ উজাড় করে খুঁজি গর্ভধারিণী

শত খুঁজিয়াও কাজ যোগাড় করিতে পারিনি,

দু'জনে দু'দিকে যাই, তবুও না পাই

দু' মুঠো অন্নের সন্ধান, এখন বুঝি

তাই এত টুকুন খোকা, সক্রেটিস বুঝি মরে

না খেয়ে, কলিজা ফাটিয়া যায় ডরে

বাঁচাবো কেমনে খোকারে হাভাত চরাচরে ।

শুনেছি অদূরে পাথর কাটার কাজ পড়ে

আছে, সে যদি পারে খোকা বাঁচিবে তবে

কাজে লেগে, তুমি আমি কাজ পাব আর কবে?

সফরেনিকাশঃ

বলো কী হে ফেনআরেট কী যে বলো,

কথা শুনে দুঃখ লাগে, দিনকাল কী হলো ।

সক্রেটিসঃ

বাবা, শুনো ভাবিও না কাজে যাবো লেগে,

অভাব ঘুচিবে বটে, অভাব যাবে তো ভেগে ।

কাল হতে করিব আমি পাথর কাটার কাজ,

কাজ করিলে অভাব ঘুচে, নাহি তাতে,লাজ ।

সফরেনিকাশঃ

আরেট, শুনিলে হে কথা ছোঁড়ার,
না থাকিবে অভাব, খুলিবে ভাগ্য দুয়ার,
সুত সক্রোটস বেঁচে থাকো বাবা ধন,
তোমার আছে সাহস, আছে স্নেহদ্র্দ মন,
বেঁচে থাকো, কাল কালান্তর দোয়া করি,
বাবা মায়ের দোয়া আছে, দোয়া করি প্রাণ ভরি ।

সক্রোটসঃ

চলো, মা চলো ঘরে চলো, আমি যাই,
থাকিলে দোয়া আনিব আশিষ যাহা পাই ।

ফেনোআরেটঃ

চলো হে বাবা সক্রোটস, চলো দিই এগিয়ে,
তোমারে নিয়ে করি গর্ব, ভরি আশায় হিয়ে ।

চলো, চলো (এক যোগে প্রস্থান)

প্রবেশঃ

সক্রোটস পাথর কাটার কাজ করিতেছে
দেখে জনৈক ধনী ব্যক্তিঃ নেপথ্য থেকে ডেকে ডেকে মঞ্চে প্রবেশঃ
কী হে সক্রোটস কী করছ হে কী কাজ,
হাতে যে পড়িবে ফোঙ্কা, চোখে লাগিবে ঝাঁঝ ।

তুমি করিবে কী আর কিছু, যদি আর ভাল পাও,
বাড়িবে বুদ্ধি জ্ঞান আর, বাঁচিবে কষ্ট হতে গাও।
(শুনিয়া সক্রোটিস ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।
ধনী ব্যক্তি সক্রোটিসের মাথায় মুখে আদরে হাত বুলায়।)
(ধীরে ধীরে হাত ধরে উভয়ের প্রস্থান)

প্রবেশঃ

বিবেক : চেরোফোন

ও বিধিরে----- ও বিধিরে

কে বুঝে লীলা তোমার,কে বুঝে কুদরত,
কিসের লাগি কী করে যাও, কবে কে বুঝিছে মত।

যারে করিবে অমর তুমি

দিয়ে তারে, দিয়ে দুঃখবর,

লালন করো শত্রু কুলে

বুঝে কী হয় চরাচর।

রেখে তারে বাজ্জামুখে,জুটাও পারাবত। ঐ

সুখের পায়রা উড়ে গিয়ে

মাথায় পরে বাজ,

নইলে কী আর দুখের শিশু

দুঃখ সহিছে আজ।

দুঃখ তাহার শীতল পাটি, দুঃখ ধারাপাত। ঐ

দ্বিতীয় দৃশ্যঃ

নেপথ্যে সোরগোল । সমস্বরে আহাজারি চিৎকার । মঞ্চে'র উপর দিয়ে ,
তলোয়ার ও বর্শা যোগে , ক্ষণে ক্ষণে গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের যুদ্ধ
করতে করতে প্রস্থান)

প্রবেশঃ

আরখএখলাশ :

সক্রেটিস , আমার আশা ছিল যে বড় ,
তুমি অনেক ,অনেক জ্ঞান আহরণ কর ।
তা বুঝি হয়ে ওঠে না , বাপু দেশের যে হাল ,
কোথা গিয়ে ঠেকে দেশ ,ধরো আত্মরক্ষার ঢাল ।
যাও তুমি সেনাদলে করিতে হইবে যে যুদ্ধ ,
রাখিয়া চাতালে জ্ঞান পাঠ ,না হইলে রাজা হবে দ্রুদ ।
তুমি সাহসী যুবক , তেজোদ্দীপ্ত প্রাণ , তাই
কালের স্রোতে ভাসিয়া যাও , নাও সেনাদলে ঠাঁই ।

সক্রেটিস :

কহিলেন কী গুরুজী কহিলেন কী যে ,
এমন ভাগ্য আমার , দুর্ভাগ্য বরি নিজে ।
এনাক্সগোরাস ছাড়িলাম আমি , সইলো না যে ,

ভাগ্যে তাহা, আদালতে ঝুলি দোষি সে সাজে ।
আপনি কহিলেন দেশাচার মানিতে, গুরুজী তাই
আপনারে মানিয়া যাবো যে যুদ্ধে, কোন দুঃখ নাই ।
আরখএখলাস :

চলো হে বাছা চলো, গ্রীসের আকাশে কালো মেঘ,
দেখো ভাসিছে সময় যে বেশি নাই, মায়া আবেগ
ছাড়ি চলো সেনাদলে গাহি মাতৃভূমির গান,
রণ সাজে সাজো, হে যুবক চাহি দেশমাতৃকার ত্রাণ ।
(প্রস্থান)

(পিছনে পিছনে সক্রটিসের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ একদল সৈন্যসহ)

প্যারেড ও রণগীতঃ

সোল্জার, মার্চ পাষ্ট, হল্ট, অর্ডার
ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট,
হয় রণ নয় মরণ ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট,
ওথ, যুদ্ধ করো বরণ ।

হয় শহীদ নয় গাজী বন্ধ পেছনের দ্বার ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট
অস্র ধরো আগাও চরণ ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট

রক্ষিতে স্বাধীনতা, রুখো দখল্দার মার্মার ।

ল্যাফট রাইট, ল্যাফট, ল্যাফট

রক্তের হোলি খেলা রক্ত করে স্মরণ ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট

আজি তাই উম্মাদ তুলিব দাদ আরবার ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট, ল্যাফট

বারি হও লালে লাল, রক্ত গড়ন ।

ল্যাফট রাইট, ল্যাফট ল্যাফট

কোথা তেজ শৌর্য বীর্য, জাগো দিয়ে হুংকার ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট,

লড়াই আমরণ বিজয় করো হরণ ।

ল্যাফট রাইট ল্যাফট ল্যাফট,

বিজয়ের দ্বারে এমপোপোলিশ সেনাদল অর্ডার ।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

প্রবেশ : বিবেক : চেরোফোন : (গান)

ওরে অবুঝ ভোলামন,

তুই বুঝলি কীরে বল কীরে

যুদ্ধ থেকে আয়না ফিরে

করিস্নে রে আত্মহনন ।

প্রবেশঃ

কে, কে ওখানে কে চেরোফোন
ভাই, তুই ঠিক বলেছিস ঠিক
যুদ্ধে গিয়ে আমি জ্ঞান হারিয়েছি দিক বিদিক॥
আমাকে ভুলে, চাহি আর কারে
ধ্বংস, ধ্বংস ডেকে আনে চিনি নি আপনারে,
ওরে চেরোফোন চল দেবতার কাছে,
বেলা পড়ে এলো গোধূলি পূর্ব বেলা যা আছে,
সে সময় ধরে পৌঁছিতে হবে দেবতার দ্বারে,
শুধাতে হবে যুদ্ধ কী শান্তি আনিতে পারে?
শুধাতে হবে আপনার কথা আপনি
ছাড়া কে জানিতে পারে, আত্মদানি,
আত্মজানি, মুক্তি লভে মানবে তাই
হায় হায় জানি নে কিছু তরুণতা সম ধাই
আপনার পানে, বিন্দু, বিন্দু জলসম ভবে
ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসি স্বভাবে ব্রহ্মান্ড নভে
যদি এসে দাও জ্ঞান হব কৃতার্থ প্রিয়ো
নিজেরে ভুলে চিনেছি অপরে, প্রভু সুধরে দিয়ো।
চলো যাই, চেরো, এপোলো দেবতারে
জিজ্ঞাসিবো, কে জ্ঞানী দেবতা, আঁধারে।
নিমজ্জিত প্রায় আমি যেন জ্ঞান দানে আমারে,

পূজারী খুলো তোমার দ্বার, ঢুকিতে দাও মন্দিরে
যেথা দেবতা আমার, আমি সেথা ভক্তি রসে বন্ধিরে,
ওহে পূজারী পূজারী পূজারী,
(উভয়ের প্রস্থান)।

প্রবেশ : (দেব মূর্তিসহ পূজারীর)
পূজারী : কে হে আসিছ শুধাতে দেবতারে,
বলো মনো বাসনা ভক্তি ভরে কাতরে।

প্রবেশ : সক্রোটস ও চেরো (এক যোগে)
সক্রোটসঃ (হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা)
হে প্রাণাধিক দেবতা এ্যাপোলো,
আমি জানি না, চিনি না নিজে,রে,
জ্ঞান দাও, চিনিতে আপনারে।

চেরোফোনঃ (খানিক টা এগিয়ে)
প্রভু হে বলুন কে জ্ঞানী এ ধরায়,
শুনিতে চাহি প্রভুহে, বলো ত্বরায় ত্বরায়,
গায়েবী আওয়াজে ভাসিল দুনিয়া,
“যে নিজে,রে জানে সেই সক্রোটসই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী”।
(ফ্রিজ এবং পর্দা নেমে যাবে)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবেশ :

জ্যানাথিপিঃ কাজ নেই, কাম নেই ভোরে ওঠে,
প্রাতঃরাশ সেরে কোথা যায় ছুটে ।
বন্ধুর দোকানে নাকি তার বাড়িতে,
চাতালে মন্দিরের, নাকি কাজ সারিতে ,
আর কোথা ঘুরে ফিরে সত্রেটিস,
ঘরের নাই লয় খবর, মনে চায় খাই বিষ,
সন্তানেরে কী দেই খেতে কষ্ট লাগে,
পড়েছি হায় এ কোন্ স্বামীর ভাগে ।

প্রবেশ:

সত্রেটিসঃ কী হে, গিন্নী শুনো না কথা,
নাকি করিবে বক বক খালি অযথা?
কোথা যাই কী করি তোমার কী দরকার,
কহিছ কথা আর কী রইব না ঘরে ছার!
কী মুঞ্চিল বহিছে অর্নগল গালি মুখে,
দূর ছাই চলে যাই বাহিরে উঠুনে সুখে
করিব পঠন, কানে আসিবে না কথার স্রাব, ঠোঁটে
যা আসিছে মুখে কহিছে সে বাজে কথা খুটে ।

জ্যানাথিপিঃ

এই দেখ দেখি চলে গেছে বাহিরে কথা না শুনে,
আর সোফিষ্টে আনিছে কড়ি, উনি আনিছে ঝগড়া বুনে ।
নীতিকথা, চুলোয় যাক, নচ্ছারে দেখিতে নারি,
রাখ দেখি বাল্‌তি দিয়ে ঢেলে দেবো মাথায় বারি ।
(মাথায় পানি ঢালে)

সক্রেটিস:

আহা হা কর কী কর কী ভিজে গেলুম যে,
বুঝেছি ডেকেছিল মেঘ,এক পশলা বৃষ্টি বুখে কে ।
বিবেকঃ চেরোফোনঃ
ঘরের শত্রু বিভীষণ,
চিন্তার মাথায় কুড়াল মারে ,
দূরের শত্রুতীর মারিলে
কোথা ছুটে আসে না দ্বারে । ঐ
তবু সবে বাঁধা গরু রুচি ছাড়া ঘাস,
খাইছে তোকে ব্যামো করে,করে বসবাস ।
নিত্য যাহা পিছু টানে,
পাথর বসায় ঘাড়ে॥ ঐ
মনোযোগের ঝুলি যদি যায় কারো টুটে,
সে ঐ মধুর ব্যাথায় নিত্য সুধা লুটে,
বিষ ঢালে যে কানে-প্রাণে

কখন ধরে মারে ॥ ঐ

(জ্যানাথিপির প্রস্থান)

সক্রেটিস : কী হে, চেরো বসো, বলো কী খবর ।

চেরোফোনঃ গুরু, অসারের তর্জন গর্জন সার ।

সক্রেটিস : কেন গো, বললে না যে বলিছ কারে ।

চেরোফোনঃ ঐ যে যত সোফিষ্ট আছে, বলছি তারে ।

সক্রেটিস : আচ্ছা প্লেটো কই দেখা পাও তার ।

চেরোফোনঃ জী গুরুজী ক্ষণ পরে দর্শিবেন দরবার ।

প্রবেশ :

প্লেটো : আদাব গুরুজী আদাব আমার,

সক্রেটিসঃ আর দেরী নহে, চলো উঠি এবার ।

প্লেটোঃ গুরু, অনুমতি দিলে বলি কথা ।

সক্রেটিসঃ বলো কী বলিবে, চাহো বলিতে যথা ।

প্লেটোঃ মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কী, শিক্ষা?

সক্রেটিসঃ হ্যাঁ ঠিক ধরেছে, নাও তার দীক্ষা ।

প্লেটোঃ এ দিয়ে কী হয়?

সক্রেটিসঃ সত্য চেনা যায়, অন্তর হয় আলোময় ।

ভেসে যায়, যায় পাপ বিচার বুদ্ধি জাগে,

অজ্ঞানতার আঁধার মুছে, স্বধর্ম কাজে লাগে ।

আবালবৃদ্ধবণিতা কাছে এলে বলে দিও,
জ্ঞান জিজ্ঞাসা পারে সত্য চিনাতে, জেনে নিও ।
ডায়ালেকটিক মেথড বড় ভালো গড়ে ন্যায় শাস্ত্র,
ক্ষুরধার বাক্যবাণ, সত্য আহরণে মহান এক অস্ত্র ।
চেরোফোনঃ শুনেছি পন্ডিত যারা, এথেন্সে সেরা সেরা,
সকলে মিলে তর্কে নামিছে, আমাদের দিয়ে ঘেরা ।
কহিছে গোপনে মিলে মিলে করিবে নাকি বহাস,
সক্রেটিস করিছে নাকি দেব বাসনার সর্বনাশ ।
তাদের অহং ধরে না কে, কোথেকে এলো সক্রেটিস,
উচিৎ শিক্ষা দিবে নাকি ছক আঁকিছে অহর্নিশ ।
সক্রেটিসঃ চেরোফোন শুনেছি তোমার কথা বুঝেছি ।
এরূপ বাঁধিবে গোল ক্ষতি কী, সাহস লয়ে খুঁজেছি
যে ঈশ্বর দেবতারে তিনি কি থাকেন পাপচারে
নাকি অজ্ঞানতার অন্ধকারে বলো প্লেটো আমারে ।
প্লেটোঃ না গুরুজী এ নহে সত্য কহে যা পাপাচারী পন্ডিত,
আপনার সত্য প্রচারে ভেসে যাবে অজ্ঞানতার ভিত ।
আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে রুখিব সব অন্যায়,
আপনার ‘আপনাকে জানো’ বলিব যত পারা যায় ।
সক্রেটিসঃ সাবাস, প্লেটো সাবাস, এই না হলে, যথার্থ ছাত্র,
মনে হয় পেয়েছি আমি জ্ঞান সুধা রাখিবার পাত্র॥

আজ আর নয়, চলো সবে বিশ্রামে চলো,
প্লোটো + চেরোফান : জী, গুরুজী আজ অনেক বেলা হলো।

(এক যুগে সকলের প্রশ্নান)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

প্রবেশ : মেলোতুস, আনিতুস, লাইকন (এক যোগে)
মেলোতুসঃ কী হে আনিতুস হলো কী, কী হলো গুরু,
হাঁ হাঁ হাঁ সক্রোটিস কে, হে, সে নাকি জ্ঞানের গুরু ।

আনিতুসঃ

গুরু নাকি আঞ্চালন, ঐশ্বর্য বীরত্ব, শিক্ষার
জাতীয় ধারণা পাণ্টে চায় দিতে, তার দীক্ষার
নিতে হবে ছবক এথেন্স বাসীর, আহা কী মজা
এসো না বন্ধু ধরি তাহার কেতন, তাহার ধবজা ।
লাইকনঃ দূর বোকা এথেন্সবাসী গেছে ক্ষেপে হাঁ,
বেটা সেজেছে গুরু পাবে বুঝি উচিৎ শিক্ষাটা ।
হাঁ হাঁ হাঁ , হো হা হা হা
হো হা হা হা (মদ্য পান রত)

মেলোতুসঃ

শোন এবার কাজের কথা বলি,
আদালতে দেবো মামলা রুজু করি
আনিব অভিযোগ, দেবাচার ভেঙ্গে চলি
যুবাদের করিছে বিভ্রান্ত আত্মজানার কথা ধরি ।

এই সফ্রেটিস, নিশ্চিত হবে তার শাস্তি
দেখাবো তার কুশিক্ষা আস্তি নাস্তি।
আনিতুসঃ ঠিক বলেছিস মেলেতুস ঠিক,
চল আলোচনের কোঁটে, করি দায়ের মামলা
লাইকনঃ দেৱী কি লিখে ফেল অভিযোগ ধিক্
সফ্রেটিস ধিক্ এবার বাবা ঠেলা সামলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য---

এজলাশঃ

আলোচনা : অভিযোগকারীগণের অভিযোগ শ্রবণ করা হইল।
অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং রায়ের জন্য ৫০১ সদস্য বিশিষ্ট জুরী
গঠন করা হইল।

অভিযোগ শ্রবণের দিন তারিখ ধার্য করা হইল। অভিযোগকারীগণ
তাদের অভিযোগ আগামী ১৫ জুলাই শ্রবণ করাইবেন জুরী বোর্ডের
সম্মুখে এবং জুরী বোর্ড একই দিন বিপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনকারী
সফ্রেটিসের কথাও শুনিবেন। আদালত আজ মূলতবি করা হইল।

তৃতীয় দৃশ্যঃ

এজলাশ : সফ্রেটিস তাহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন।

কাঠগড়ায় সফ্রেটিস :

হে এথেন্সের অধিবাসীগণ, আমার অভিযোগকারীদের বক্তৃতা শুনিয়া আপনাদের কেমন লাগিয়াছে জানি না,তবে আমি তাহাদের বক্তৃতার চমকিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, যদিও তাহাদের বক্তৃতায় সত্য ভাষণের চিহ্ন মাত্র নাই। ইহার উত্তরে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি অভিযোগকারীদের মত মার্জিত ভাষার ব্যবহার জানি না। আমাকে শুধু ন্যায় বিচারের স্বার্থে সত্য প্রকাশ করিতে দেওয়া হোক। কেন আমি আমার দেশবাসীর বিরাগভাজন হইলাম? অনেকদিন আগে ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনিলাম তখনই আমার মনে হইল ইহার অর্থ কি? আমি তো জ্ঞানী নই তবে দেবী কেন আমাকে জ্ঞানী বলিলেন। আমি ভাবিলাম আমার চেয়ে জ্ঞানী কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলে তাহাকে দেবীর কাছে নিয়া গিয়া বলিব,এই দেখ জ্ঞানী মানুষ। আমি জ্ঞানী মানুষ খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে গেলাম এক বিখ্যাত পন্ডিতের কাছে, সবাই তাকে জ্ঞানী বলে। তিনি নিজেও তাই মনে করেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিলাম তিনি যথার্থই জ্ঞানী নন। নিজের স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ায় তিনি আমার শত্রুতে পরিণত হইলেন। তারপর গেলাম আর একজনের কাছে। ঠিক এই ফল হইল এবং সেখানেও আমি তাহাকে এবং অন্য অনেককে আমার শত্রু করিলাম। তারপর গেলাম রাজনীতিবিদদের কাছে। ঠিক একই জিনিস লক্ষ্য করিলাম। সেখান থেকে গেলাম কবিদের কাছে। তাহাদের সাথে

কথা বলিয়া বুঝিলাম তাহারা প্রকৃতই অজ্ঞ। তাহারা ইশ্বরদত্ত শক্তি ও প্রেরণা থাকিয়াই সবকিছু সৃষ্টি করেন, জ্ঞান থাকিয়া নয়। শেষ পর্যন্ত গেলাম শিল্পী, করিগরদের কাছে। তাহারা এমন অনেক বিষয় জানেন যাহা আমি জানি না। কিন্তু তাহারাও কবিদের মতো ব্যাপারেই নিজেদের চরম জ্ঞানী বলিয়া মনে করিত আর এই ভ্রান্তিই তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

এই অনুসন্ধানের জন্য আমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হইল। লোকে আমার নামে অপবাদ দিল, আমিই নাকি একমাত্র জ্ঞানী। কিন্তু ততদিনে আমি দৈববাণীর অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। মানুষের জ্ঞান কত অকিঞ্চিৎকর। দেবতা আমার নামটা দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যে সক্রেটিসের মতো জানে, যে সত্যাসত্যই জানে তাহার জ্ঞানের কোনো মূল্য নাই।

আমি নিশ্চিত যে আমি অনেকের অপ্রিয়তা এবং শত্রুতা অর্জন করিয়াছি এবং আমার চরম দণ্ড হইলে এই তাহার জন্যেই হইবে, মেলেটুস বা আনিতুসের জন্য নয়। দণ্ড হইলে তাহা হইবে জনতার ঈর্ষা ও সন্দেহের জন্য যাহা আমার আগে অনেক সৎলোকের নিধনের কারণ হইয়াছে এবং সম্ভবত আরো অনেকের নিধনের কারণ হইবে। আমিই সে নিধনের কারণ হইয়াছি এবং সম্ভবত আরো অনেকের নিধনের কারণ হইবে। আমিই যে তাহাদের

শেষ বলি তাহা মনে করার কোনো কারণ নাই অতএব হে এথেন্সের নাগরিকগণ, আমি বলি তোমরা হয় আনিতুসের কথা শোন অথবা অগ্রাহ্য কর। হয় আমাকে মুক্তি দাও নয়তো দিও না, কিন্তু নিশ্চিত থাকিতে পার আমি আমার জীবনের ধারা বদলাইব না।

... আমাকে ঈশ্বর এই রাষ্ট্র আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছেন। রাষ্ট্র হইল একটি মহৎ সুন্দর ঘোড়া। তাহার বৃহৎ আয়তনের জন্য সে শ্লথগতি এবং তাহার গতি দ্রুততর করিতে, তাহাকে জাগাইয়া তোলার জন্য মৌমাছি। আমি সর্বক্ষণ তোমাদের দেহে ছল ফুটাইয়া তোমাদের মধ্যে সুস্থ ভাবনা জাগাইয়া তুলি, যুক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করি এবং প্রত্যেককে তিরস্কারের দ্বারা তৎপর করে রাখি।

--- বন্ধুগণ, সম্ভব অসম্ভবের কথা বাদ দিয়া বলিতেছি মুক্তিলাভের জন্য বা দণ্ড এড়াইবার জন্য বিচারকদের অনুময় করা অসঙ্গত। যুক্তি পেশ করিয়া তাঁহাদের মনে প্রত্যয় জন্মানোই আমাদের কর্তব্য, বিচারকদের কর্তব্য হইতেছে ন্যায় বিচার করা। বিচারের নামে বন্ধু তোষণ করা নয়।

৫১ -- আমি দেবতাকে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোগকারীরা যতখানি বিশ্বাস করে তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বাস করি। এতক্ষণ আমি ঈশ্বর এবং তোমাদের সামনে আমার বক্তব্য রাখিলাম। এইবার তোমাদের এবং আমার পক্ষে যা সর্বোত্তম সেই বিচার আমার

বক্তব্য রাখিলাম। এইবার তোমাদের এবং আমার পক্ষে যাহা সর্বোত্তম
সেই বিচার হোক।

এজলাশঃ

আদেশ, আদেশ

এখন ভোটিং হোক।

ভোটিং এর ফল আসিয়াছে। ফলাফল

২৮১-২২০।

অভিযুক্ত সক্রটিসকে সর্বশেষ বক্তব্যদানের সুযোগ দেওয়া হইল।
সক্রটিসঃ হে এথেন্সের অধিবাসীগণ, আমার পক্ষ হইতে কি পাল্টা দণ্ড
প্রস্তাব করিব? আমার যাহা ন্যায্যত প্রাপ্য তাই নয় কি? আমি
তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে গিয়াছি, সে শুধু তোমাদের
কল্যাণের জন্য। আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে
গিয়াছি, সে শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্য। আমি আমার ব্যক্তিগত
স্বার্থের কথা চিন্তা করার আগে চিন্তা করিয়াছি এথেন্সের স্বার্থ। এইভাবে
আমি তোমাদের উপকার করিতে চাহিয়াছি। উপকারীকে সরকারি
ব্যয়ে ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করা হউক এই আমার শেষ ইচ্ছা।

আদালত

এজলাসঃ সর্ব কিছু বিবেচনা করে সক্রটিসের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল ।
এবং হেমলক বিষ যোগে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জেল হাজতে বন্দি
থাকিবেন । এখন সক্রটিসকে জেলহাজতে নেওয়া হোক ।

সক্রটিস : অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে “এখন সময় হইয়াছে আমাদের
সকলকে চলিয়া যাইবার, তবে আমি যাইব মৃত্যুর দিকে, তোমরা
যাইবে জীবনের দিকে । জীবন কিংবা মৃত্যু- একমাত্র ঈশ্বরই বলিতে
পারেন এর মাঝে শ্রেষ্ঠ কে? (ধীরে ধীরে) প্রশ্নান ।

প্রবেশ : -----

চেরোফোনও প্লোটোঃ

দয়াল রে ও দয়াল রে,

এই কী তোমার বিচার,

এই কি তোমার বিচার,

দিন হল যে রাত কারু,

কারু রাত হল রে দিন ।

পিশাচ হাসে, কুটচালে রে

বাজায় সুখের বীণ ।

জ্ঞানের আলো নিভে যাবে,

দৈত্যরাজের জোরে,

ফোটার আগেই ঝরে গেলো

ঐ শেফালির কুঁড়ে,
জ্ঞানীর গলায় ফাঁসি ঝুলে
করতালির শব্দ শোধে ঋণ ।
বলো দেখি কে, পামর রে,
দেহের আয়েশ জাগায়ে,
দেবতারে পদতলে পিষ্ঠ করে,
মন হতে দেয় ভাগায়ে,
হৃদয়চারী সফ্রেটিস ঐ গগণে
বুঝি আজি অন্তরীণ ।

ক্রীটো : হে বন্ধু সফ্রেটিস,
নাও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করো :
সমবেতস্বরে আবৃত্তি :
দিনমনি চলে যায়, গোধূলি লগ্ন,
ভাস্কর পিয়ে হেমলক, ধ্যানী ধরা রহে মগ্ন ।
এমনি বুঝি হয় জ্বলিতে জ্বলিতে অরুণ চলে যায় ,
যামিনী বুঝি আসে ফিরে সোল্লাসে কৃষ্ণকায় ।
নর নারী দিতে পারে নি যে আদাব নূয়ে,
অম্বর দিকচক্রবালে নূয়ে দিল তা জমিন ছুঁয়ে ।
স্বজন ফিরায়ে মুখ যে সোহাগ নিলে ফিরিয়ে,

দেবদারু ঝরিয়ে পাতা,সে সোহাগ রাখে ভিড়িয়ে ।

গগনের লালীমা ঢাকে ঘেরূপ কালো মেঘে ,

তেমনি মহাসুরে দাবাতে আসে অসুরে ভীমবেগে ।

(চতুর্দিকে কান্নার সুর ও বিলাপ)

প্লেটোঃ (এগিয়ে)

শপথ :

ধরে রাখিবই মহাগুরুর বাণী ,

যত পারি করি , যত জানা আছে জানি ,

জীবন বাজী হে ,মানবকুল ,

আমিও যাব সে পথে ।

আমার গুরু ঐ বাণী লয়ে

এসেছিলেন দ্বারে সাথে বয়ে

দৃষ্ট শপথ ,আসুক যত

কালো হাত ,

ভেঙ্গেচুরে সব করিব চুরমার

ভেঙ্গে দেব দাঁত ,

আমি প্লেটো মহাগুরু

সক্রেটিসের অনন্য শিক্ষা

সাথে লয়ে বেঁচে আছি ,

থাকিতে চাই ,মাগি ঈশ্বরের

কাছে যে করুণা ভিক্ষা ।

বিদায় জগৎ, বিদায়, বিদায়,

বিদায় । (ফ্রিজ)

১৩/৭/১৩ কিশোরগঞ্জ ।

জীবন্যাস- হযরত য়ুনছুন মিশরী (রহঃ)

১ম অধ্যায়-১ম দৃশ্য

আমি রূপকার ---আঃ হান্নান

আমার সহকারী ---আঃ মান্নান ।

সবিনয়ে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলী

আছেন যতো দর্শক শ্রোতা মন্ডলী,

হৃদয়চারী কবি

দিব্যচোখের ছবি,

জনাব হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞার

প্রবর্তিত জীবন্যাস সুখপাঠ্য যে রূপ,

আছে আবেগ উচ্ছ্বাস দ্যোতনা তদ্রূপ,

জানি না আমার সঞ্চালনা, রূপ দেয়া

লাগিবে কেমন, হৃদয়চারীর এ রূপ কাজ

হৃদয়হরা, সহজিয়া, চাহিদা কলিজা-নেয়া

অলির জীবন বৈচিত্র্যে, সুখাহরণ হোক আজ ।

আজি যেন জাগে গো আঁখি, জাগে মনুজে,

শুনি অলি কাহিনি, যেন জাগে অগ্রজে অনুজে ।

অধমের নাহি রস, সঞ্চালিব কী !

আপনি দরদে উছলিয়া উঠি,

যদি জাগে গো জনতা, হৃদয়চারীরে বুঝে॥ ঐ

নাহি সাধ্য গাহিবার গুণ কেরামতি,

হযরত যুননুন মিশরী মহাগুণী অতি,

মাফি চাহি বিভুর দুয়ারে আপনারে খুঁজে ।

(ফ্রিজ)

প্রবেশ:

রূপকার :

এক দরবেশ অনুচর লয়ে গহন কুঞ্জে এসে

দেখেন, বিপুল ধনরত্ন আছে হেথা,শেষে

কে নেয় হুড়োহুড়ি করে, কার আগে ধন ভান্ডার খুলে,

যুননুন মিশরী (রহঃ) কাষ্ঠ ফলক নিলেন বুকে তুলে ।

সেই ফলকে শুধু লিখা ছিল পবিত্র আল্লাহর নাম,

দেখে উম্মাদ যুননুন (রহঃ) নিয়ে হাতে,দিলেন দাম ।

তুলে নিয়ে মুখে কাষ্ঠ ফলক চুমু দিলেন গুটিকয়বার,

আত্মহারা যুননুন মিশরী ভাবেন সেরা ধন নাহি কিছু আর,

হে দয়াল আল্লাহ,

কত রূপে বানাইলে যে মানুষ রূপের জাত,

কেহ খুঁজে নিজের সুখ, কেহ খুঁজে প্রাণনাথ ।

দিনকে কেহ রাত্রি ভাবে,

রাত কে কেহ ভাবে দিন,

চক্ষু কাহার কত প্রকার

দেখে মিছে রঙিন ।

ভবে, বালু কুড়ায় কেহ, কেহ পোলাও ভাত ।

নইলে কী আর যুননুন মিশরী,

কাষ্ট রাখে বুকে,

হৃদয়হরা আত্ননাদে বিভূ

নামে, বিভূ মাঝে ঢুকে ।

জাহিরে নাহি বাতেনে, অন্তঃচক্ষু করে দৃষ্টিপাত ।

স্বপনে দেখিলেন তিনি, আল্লাহ ক'ন,

ওহে যুননুন সকলে কুড়ালো সোনা, তুমি ভুলে

কুড়ালে আমার পবিত্র নামের কাষ্ট যখন

দিলাম জ্ঞানের দরোজা তোমার লাগি খুলে । (মিউজিক)

হায় রে মিশরবাসী কী বুঝিতে কী বুঝিলে,

স্বয়ং আল্লাহর আর্শীবাদে ধন্য যিনি,

তাঁরে কহ যে কাফের!! আর যত দোষ খুঁজিলে,

সেই চোখ কারও নাহি বুঝি, দেখে কত জ্ঞানী তিনি ।

একদা তিনি এক তরণ দরবেশের কথা শুনে

দেখিতে গেলেন তারে, হায় এ কি কাণ্ড !

দরবেশ তরুণ বুলিছে বৃক্ষে,কহিছে গুনে,
এ-ই তোমার শাস্তি দেহ হে, লহো দণ্ড।
আরও কহিছেন দরবেশ,আমৃত্যু বুলাবো
এ রূপ উপবাসী রেখে, শুনে যুননুন দিলেন কেঁদে!
যুননুনের কাঁদা দেখে, ইংগিতে কহেন তরুণ কে গো,
নিলাজ আর পাপিষ্ঠ দেহের উপকারী হও সেধে।
শুনে কহিলেন যুননুন,তরুণ বুঝি হস্তারক মনে হয়,
কহিলেন তরুণ, না, লোকসঙ্গ লিপ্সু অপরাধী এ দেহ
ভাবেন যুননুন, এ নির্জনতাপ্রিয় বিষয়-বিবাগী চিত্ত নির্ভয়।
হায় কহে তরুণ, ‘না ঐ পাহাড়ের দিকে আছে গেহ
সেখানে আছে এক দরবেশ, আমি নসি় তাঁর তুলনায়’
‘কহে কী !তরুণ দরবেশ, যাই দেখি’ ভাবেন যুননুন।
বিবেকঃ

তরঙ্গ কয় তরঙ্গেরে কোথা তোমার বাড়ী,
বাড়ী গুনে নাড়ি তাঁহার, করে নাড়ানাড়ি।
পদ্মদিঘী যে রূপ নাচে,
নদী ভাঙ্গে কী তাই!
সফেন ঢেউয়ে তরী ডুবে,
কুলকিনারা নাই।
এশকে এলাহী মহাসাগর ঢেউ সারি সারি। (নেপথ্যে বিবেক)

রূপকার সহ :

তারপর কী হলো গো, গুরু বলো, বলো,
ভয়ে আমার কাঁপছে দেহ, পা টলোমলো।

রূপকারঃ

শোন বাছা, কিছুদূর গিয়ে দেখেন দরবেশ য়ুনুন্ন,
পাহাড়ের পাদদেশে এক মসজিদ সুনিপুণ।
তরুণ অলির এক পা মসজিদে, অন্য পা বাহিরে আছে,
কত কীট কামড়ে খুব্লে দিচ্ছে সে পা, হায়, হায়, বাছা,
কেন এ দশা, “কহে তরুণ অলি” জিজ্ঞাসিলে য়ুনুন্ন পাছে
আসিল উত্তর, মসজিদের পাশ দিয়া যাচ্ছিল সুন্দরী আহা!
দেখি তাহারে বাড়ালাম এই এক পা, আসিল দৈব বাণী:
‘কোথা তোমার ত্রিশ বছরের সাধনা দেখিতে চাহ নারী?’
-শুনি ঠিক এ ভাবেই আছি বহুদিন ধরে শাস্ত্রিস্বরূপ দানি
আমারে; দেখি, আল্লাহপাক কী ব্যবস্থা করেন তারি।
দেখি হালত তাক লাগিল হযরত য়ুনুনের, এমনও কী হয়?
কহিল তরুণ অলি “এসেছো কী জন্য, দরবেশ দেখিতে চাও?
তা হলে উঠো, পাহাড়ের ‘পর’ শুনে হযরত য়ুনুন্ন পান ভয়
এ’ও কী সম্ভব উঠিব কী করে এত ‘পরে’ শিহরি উঠে গাও,

আসিলেন ফিরে সেই তরণের ধারে বুঝিয়া দ্বিতীয় তরণ
বর্ণনা করিলেন, সেই বিবাগী দরবেশের লোমহর্ষক কাহিনি
পাহাড় চূড়ায় কুঁড়ে ঘরে কাটাতো দিন ধ্যানমগ্ন হয়ে নবারুণ
সেই দরবেশ, একদা কে কহিল, “জীবিকা নির্বাহের জন্য জানি
লাগে কাজ,ব্যবসা বানিজ্য”, শুনে দরবেশ ভাবিলেন ঠিক আছে,
আজ হতে করিলাম না ব্যবসা, ভরসা আল্লাহর,দেখি কী হয়!
আল্লাহ তায়ালা হুকুম দেন, মৌমাছিদের, “খাবার আনো,পাছে
কষ্ট না হয় অলির”, মৌমাছি মুখে দিত তুলে খাবার সব সময়।
মর্মস্পর্শ করা কথা, তারপর আসিলেন হযরত যুননুন মিশরী
পথে,দেখিলেন এক বৃক্ষ ডাল হতে অন্ধ পাখি উড়াল দিয়ে
নেমেছে মাটিতে, ঠোঁকর বসাতেই মাঠি ফেঁড়ে স্বর্ণ খচিত সুশ্রী
পাত্র উঠে আসে খাবার লয়ে, রৌপ্যপাত্র আসে পানীয় নিয়ে।
খেয়ে দেয়ে অন্ধ পাখি যায় উড়ে কোথায়, অজানায় অদৃশ্য হয়ে,
এ সব দেখে হযরত যুননুনের জ্ঞান-দরোজা গেলো খুলে,
আসিলেন ফিরে নদীর ধারে, অযু করা কালে পড়িল নেত্রদ্বয়ে
দাঁড়িয়ে আছে অদূরে সুন্দরী একজনা, ভুলে চাহেন চোখ তুলে
সুন্দরী মহিলার দিকে, দ্রুত কহিল মহিলা, ‘হে যুননুন শোন,
দূর হতে আমি তোমারে ভাবিলাম হয়ত পাগল কোন,
কাছে এসে অযু করতে দেখে ভাবি ঠিক হয়ত তুমি আলেম,
আরও কাছে এসে বুঝি দরবেশ,নাহ্ পরে বুঝি হিসেব নিলেম

নাহ্ তুমি নও কিছু', যুননুন মিশরী বলিলেন, 'কেমনে বুঝিলে'
বলিল মহিলা, "তুমি পাগল হলে অযু কী করিতে, অযু টুটিলে
হইলে আলেম চাহিতে কী পরনারী পানে?, আর দরবেশ হলে
চাহিতে না কোন দিকে, সর্বদা চলিতে আল্লাহ-ভরসা বলে"।
অদৃশ্য হলো মহিলা, বুঝিলেন হেকমত হযরত যুননুন মিশরী
সতর্ক করিলেন বুঝি আল্লাহ!! তাঁকে দেখিয়ে পথের দিশারী।

বিবেকঃ

আমার মত কে আছে রে সৃষ্টি মাঝে আর,
সেই ভাবনা মিছে হলো, খুলে জ্ঞানের দ্বার।
অনেক ছোট মনে হলো,
দেখে অনেক লীলা,
আমি জান-বাঁচানিয়া
চতুর কাজে ঢিলা,
নইলে কী আর চিন্তে নারি, রূপ আপনার।
হৃদয়চারী হই নি আমি
লোকাচারী দেহাচারী হই,
ভেঙ্গে গেছে সময় চাতাল
মুর্থ রূপে মুখ খুবড়ে রই,
আর কাজে, নিজের কাজ বুঝি তুচ্ছ ছার, ছার!

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১ম দৃশ্যঃ

রূপকারঃ

একদিন হযরত য়ুননুন মিশরী (রহঃ) নৌকাযোগে
যাচ্ছিলেন কোথা জানি। নৌকা ভরা প্রচুর লোক
তার মধ্যে ছিল মুক্তোর চালান এক বণিকের উদ্যোগে,
কে বা কারা করে চুরি, সন্তপর্ণে মুক্তোয় দিয়ে জৌক।
উল্লবুলুল হযরত য়ুননুনের দিকে সকলের চোখ
চোর সন্দেহে শুরু হলো অপমান হযরতের 'পর।
সহ্য করতে না পেরে মাগিলেন দোয়া উর্ধলোক,
আল্লাহতায়ালার কাছে। কবুল করিয়া প্রার্থনা প্রভুবর
আদেশ করিলেন মাছেদের, 'মুখে নাও মুক্তো কণা
এসো সকলে নৌকার ধারে, মুখে মুখে তুলে ধর
মুক্তো রাশি, রাশি'। একটি লয়ে আনমনা হযরত,
দিয়ে বণিকেরে, যাচ্ছিলেন উঠে, লজ্জায় জড় জড়
অমানুষ সকল, হাতে পায়ে ধরে হযরতের চাহিল ক্ষমা;
হযরত য়ুননুন করেন ক্ষমা অবুঝ সকলেরে, অতঃপর
সেই থেকে য়ুননুন মানে "মাছের মালিক" খ্যাতনামা
হয়ে রইলেন মানুষের মাঝে, য়ুননুন, য়ুননুন, য়ুননুন

এক মহাতাপসের নাম, চিরভাস্বর মারেফাত জগতে,
তাঁহার ত্যাগের কথা শুনিলে শীতল হয় না কার খুন
আক্কেল গুরুম হয়ে নির্বাক চেয়ে রয় কমজুড়ী রথে ।
ত্যাগের যে শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন এই ভবে ভাবি,
তার একটি যদি, যে কেউ রাখে ধরে সে সার্থক হবে ।
তাঁর জীবনে-মরণে, মিটিবে হাকিকতে-মারেফাত দাবী । (মিউজিক)

বিবেকঃ

ঝুনঝুন, ঝুনঝুন, তাপস যোগী এলমেদীনে রে,
মৎস্যকূলে চিনিলেও মানুষকূলে না চিনে রে ।
কত না যাতনা দিয়েছে নরাধমে,
ঠোটে, লেবাসে মানুষ, পশুমননে ।
যুগে যুগে ছিল কোন যুগ নেই এই পশু বিনে রে ।
আল্লাহ দয়া দেন হৃদয়চারীরে,
আল্লাহ শাপ দেন দ্রোহকারীরে ।
তারে কী কয় মানুষ, না, কয় না হৃদয়হীনেরে?
সহ রূপকার ঃ
বলুন, গুরুজী মানুষের কোথা পরিচয় মিলে,

গোপনে থাকিয়া আপনার পরিচয় না দিলে ।

বলুন হযরতের আরও কাহিনি অভূতপূর্ব জীবন,
কে পারে গড়ে নিজে, যে পারে ধন্য সে জন ।

রূপকার :

শোন হে এমন যুনুস মিশরী আর নাই,

তাঁহার তুলনা তিনি নিজেই, দেখি তাই ।

তাঁহার এক বোন ছিল কিসে তিনি কম,

পরহেজগারীতে পদক্ষেপ নিতেন চরম ।

তাকওয়া, তাওয়াক্কুলের আত্মশ্রুকারী মানুষ তাঁরা,

কি রূপ পরহেজগার শোন বাছাধন শোন, শোন,

হযরত যুসুফের বোন এক মহিমাম্বিত পাগলপারা

তাপসী, একদিন পাঠ করছিলেন কোরআন পুনঃ পুনঃ

সে সময় পাঠে পড়িল আয়াত, আল্লাহ বলেন,

“ আমি (বনি ইসরাঈলদের) ওপর মান্নাও সালওয়া

নাযিল করেছি” পাঠ শেষে তিনি দাবী দিলেন,

‘হে খোদা তুমি বনি ইসরাঈলদের বেহেশতী খাওয়া

উপহার দিলে!, আর হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ) ঐর উম্মত

পেলো না, অধম অবলা বাঁদী তোমার, দাঁড়িয়ে রইল

যতক্ষণ না দিলে“ মান্না- সালওয়া” পবিত্র-পুত,

বসব না আর'! কুদরত আল্লাহর দোয়া কবুল হইল ।
“মান্না সালওয়া” দেখি সম্মুখে তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ়
আল্লাহ প্রেমে বিভুর ফানাফিল্লাহ হইয়া কোথা গেলেন,
কেহ আর পাইল না খোঁজ তাঁহার হয়ে নেশাচুর
আল্লাহর সান্নিধ্য লয়ে তিনি তাঁর জায়গা করে নিলেন । (মিউজিক)

শোন হে মানুষ ভাই,
চাওয়ার মত চাহিলে কী না মিলে,
চাহিবে খোদার কাছে খাস-দ্বিলে ।
পুত জীবন-মনে কাঁদিয়া চাহিলে
আসে গো মান্না সালওয়া--
আরও কী জ্ঞান দেন আল্লাহ তারে
ভাগ্যে মিলে দীদার পাওয়া ।
নিরজনে রহমত তাঁর চাহিয়া নিলে ।
মানুষ কী দেখিবে তাঁরে ভবে
কোথা তিনি নিরজনে বসে
আল্লাহর ধ্যানে,জিকিরে ফিকিরে
মশগুল এশকে এলাহী চম্বে ।
এমন হৃদয়চারীণী বলিয়া পারিলে ।

রূপকারঃ

হযরত য়ুনুন পাহাড়-চূড়ায় ঘুরে রোগী জড়ো হওয়া পান
বলেন তিনি, তোমরা কারা? উত্তরে এল আমরা অপেক্ষমান
রোগী তাঁরই যিনি বছরে একবার বাহির হন হতে কুঁড়েঘর,
ফুঁ দেন আর ফিরেন কুটিরের ভেতর। মাহেন্দ্রক্ষণ অলিপ্রবর
আসিবার বুঝে, রোগীরা হয়েছে জড়ো। বাহিরে এসে
দুর্বল গা দরবেশ প্রথম তাকালেন সল্লেহে রোগী'পর শেষে
উপরে তাকালেন, একে একে দিলেন ফুঁ রোগীদের
দেখিতে দেখিতে সকলে হয়ে গেলো ভাল, হযরত য়ুনুনের
কাছে পৌছতেই বলিলেন য়ুনুন, “হুজুর আপনি
সকলের জাহেরী রোগের করিলেন চিকিৎসা, বাতনি
রোগ আমার আছে, করিবেন কী চিকিৎসা!”, শুনিয়া
চক্ষু কোটরাগত দরবেশ ক'ন, ‘ওহে য়ুনুন আপনি ভুলিয়া
গেলেন আল্লাহতায়ালার কথা, আল্লাহ হ'ন বিরক্ত
আপনার এহেন আচরণে। ছাড়ুন আমার পথ,
ভক্তিভরে ধরা আঁচল আমার। বলিয়া কুটিরে
পুনঃ গেলেন চলিয়া ফকির, য়ুনুন তার ঢ্রুটিরে
শুধরাইয়া রহিলেন আল্লাহর 'পর তাওয়াক্কুল
করে। হযরত য়ুনুনের আরেক শিক্ষা হল, ভেঙ্গে ভুল। (মিউজিক)

বিবেকঃ

কোথা কী আছে কে জানে রে, কে জানে রে,
জিকির ফিকিরে এলাহী ছাড়া কী আছেরে ।
কী আছে রে তোর তাওয়াক্কুল ছাড়া,
তাওয়াক্কুল ছাড়িলে হইবে সর্বহারা ।
ছোহববত নাহি, নাহি কিছু খোদার 'পরে ।
নিশুপ হইয়া গেলেন যুন্নুন,
কোথা ঘাট্টি, কোথা উন,
হৃদয়চারী হলে বাতেনি জালে পড়ে রে ।

রূপকারঃ

একদা হযরত যুন্নুন মিশরী সেজদায় ঘুমিয়ে যান,
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ঘুমে স্বপ্নে দেখিতে পান ।
আল্লাহ সৃষ্টি জগৎকে দশভাগে বিভক্ত করেন,
তার নয় ভাগই দুনিয়া আসক্ত, এক ভাগ স্টকে পড়েন ।
সেই একভাগ দুনিয়ার দিকে মুখ ফিরালো না বটে,
এক ভাগ কে দশ ভাগ করে জান্নাত রাখেন মানসপটে ।
তার নয় ভাগ জান্নাতে অগ্রহী, এক ভাগ ছিল নির্বিকার,
এক ভাগ চাহে নি জান্নাত, তাদের সম্মুখে নরকের দ্বার

খোলা হল, নির্বিকার তারা পেলো না ভয় ভীতি মোটে,
ক'ন আল্লাহতায়াল্লা, আসলে তোমরা চাইছিলে কী খুটে?
কহিল সেই এক ভাগ, আপনি হলেন রাহমানুর রাহীম
আমরা চাহি আপনার সন্তুষ্টি, বুকো নূরের পিদিম।
হযরত যুন্নন মিশরী ভয়ে কাঁদিয়া ঝর, ঝর হয়,
তাঁর কী ভাগ্য হবে শেষের এক ভাগে, নিশ্চিত বলা যায়! (মিউজিক)

বিবেকঃ

গায়েব জানে আল্লাহ তায়াল্লা ভাগ্যে কী আছে,
কী হয়, জানি কী হয় আমার, ভয় জড়ালো পাছে।
কান্না ছাড়া নাই রে কোন ধন,
দীদার পেতে কান্না করো মন॥
সেই কান্না নিয়া যাবে রাব্বুল আলামিনের কাছে।
তাকওয়া আনে তাওয়াক্কুল আর,

তাওয়াক্কুলে শক্তি পায় চলার,
জীবনের সরল পথে, যেথা এশকে এলাহী বাঁচে।

একদা এক নাবালক ছেলে এসে বলিল, ‘হযরত

অনুমতি দিলে এক দিহরাম দিব আপনার দরবারে’
বলিলেন হযরত, ‘ঠিক আছে সবর কর দিলেন মত,’
গেল ছেলে ফিরে, বহুপরে বয়ঃ প্রাপ্ত হলে, জ্ঞাতসারে
হযরতের এক লক্ষ দীনার এনে দিল দরবারে আর
করিল দরবার তা গ্রহণ, কিছু দিন পরে অভাব
দেখে দরবারের, ছেলেটি কহিল, ‘হুজুর আমার
আরও থাকিলে অর্থ দিতাম ঢেলে’ দেখালো মনোভাব
হযরত যুন্নন মিশরী দেখিলেন তার মন হতে
অর্থ চিন্তা হয় নি দূর, তাই শিক্ষা দিবার মানসে
ক’ন, “হে ছেলে শোন, নাও তিন দিহরাম যাও পথে
দেখো পাও কি না, আতর ব্যবসায়ী, কিনে আনো যে
পরিমাণ পাও আতর খন্ড”, ছেলেটি করিল তাই
ছেলেটিরে হযরত যুন্নন মিশরী ক’ন, “কর তিন খন্ড
আর করো সূচবিদ্ধ প্রতি খন্ডের ’পর রাখো সাজাই॥
যুন্নন হুজুর এসে দিলেন ফুঁ প্রতিখন্ডে, আতরমন্ড
আশ্চর্য সাথে সাথে হয়ে গেলো মাশাল্লাহ মনিখন্ড,
হুজুর বলিলেন, ‘হে ছেলে শোন, করিও না বিক্রয়
যাও, জহুরীর কাছে, দেখো দাম কত হাঁকে আর
আসিও ফিরে করিও না বিক্রয় এই মনিখন্ডত্রয়,’

ছেলেটি দেখিল, জহুরী চিনে মনিখন্ড কহে,
'এক লক্ষ দিহরাম প্রতিখন্ড, যদি দাও তবে দাও'
শুনিয়া আসিল ফিরে ছেলে, খন্ড বিক্রিযোগ্য নহে,
হুজুর ক'ন "দেখেছো দরবেশী জীবন? যদি চাও
এ জীবন, তবে দারিদ্র্য নিবে,সহাস্যে বরণ করে"
ছেলে বুঝে তাই, অর্থ চিন্তা দূর হলো চিরতরে তাঁর,
খাঁটি দরবেশী জীবন লইল চুকে পাইয়া শিক্ষা পরে,
হুজুরের কেরামত দেখে ঐ ছেলে খুলিয়া মনের দ্বার।
হৃদয়চারী মোহাম্মদের পথের 'পরে চাহিয়া থাকে,
হৃদয়ের দোষগুণ দেখিয়া কেবলি গুণের ছবি আঁকে।
যেখানে নাই অর্থের লেশ, কান্না আছে,
আছে আত্ম নিবেদন, মহ বিভুর কাছে।
বিভু চাহিয়া হৃদয় পানে, সখারে হৃদয়ের সুখে রাখে।
যে সুখের অমিয় ধারা যায় না দেখা,
যে বুঝে সে দরবেশ, বুঝে একা একা।
দুনিয়া ছেড়ে, আর দিকে দরবেশ হৃদয়ে সুধা মাখে। (মিউজিক)

হযরত যুনুস মিশরী বলেন, 'দাওয়াত দিলাম কত
আল্লাহর পথে, একজন শুধু বুঝিয়াছে তাহা সে এক
রাজকুমার'। সে রাজকুমার যাচ্ছিল মাড়িয়ে সে পথ

যে পথের পার্শ্বে মসজিদ থেকে বলছিলেন, ‘দেখ তোমরা দুর্বল হয়ে সবলের বিরুদ্ধে লড়িও না, নির্বোধ ছাড়া সে কাজ আর কেউ করে না, রাজকুমারের কানে সে কথা গিয়েছিল, রাজকুমার জানিতে চাহিল খোদ নিজেই সে কথার মর্ম। যুননুন বলেন, ‘খোদার শানে, উল্লেখ করে মহাশক্তিধর খোদার নাম, হয় মানুষ তবু করে তার বিরোধীতা দুর্বল হয়ে’। রাজকুমার নিজে কহিল না কিছু, মুখ তাঁর মলিন, গেল চলিয়া কভু করিল না প্রত্যুত্তর। পরদিন এসে কহিল ঘর্মে ভিজে আল্লাহতায়ালার দীদার লাভের কী উপায়? হযরত ক’ন দু’টি উপায় আছে, একটি বড় অন্যটি ছোট। পাপ কাজ ছাড়া, দুনিয়া ভুলে যাওয়া, প্রবৃত্তির চাওয়া যত পরিহার করা ছোট উপায় বটে। বড়টির ধাপ উঁচু ধাপ অনেক উপরে, তাহা-- ‘আল্লাহ ছাড়া সব ভুলে যাওয়া’ বুক খালি করে হৃদয়চারী হওয়া, আল্লাহর দীদার পেতে তবে হবে সার্থক জীবন। তিনি বলেন, অবশ্য চাওয়া বড়টি অধিক উত্তম। কুমার ছোট ফেলে বড়তে যেতে হল রাজি। আর রাজপোশাক ছেড়ে পরে নিল কম্বল

মোটা, দরবেশ যাহা পরে, আর ভ্রষ্টার পুত ধ্যানে বসে
গেল তখনই। সেইরাজকুমার হৃদয়চারী পাথেয় সম্বল
করে হয়েছিল বড় দরবেশে, না মেতে রাজকীয় যশে।(মিউজিক)
বিবেকঃ

ও যোগীয়ে-----

যে বুঝার সে বুঝে,হোক না সে প্রজা কি বা রাজা,
জ্ঞানের বোঝায় ভারী হইয়া, নফসেরে দিয়া সাজা।
নইলে কী রাজার কুমার,
নফস কইরা চূর্ণ চুরমার।
সুখের বোঝা ফেলে, কে বুঝে দুখের মূল্য জা-জা।
হেদায়েতের রসের হাড়ি,
বিভুর ইচ্ছায় লয় কাড়ি,
বিভু থেকেই হৃদয়চারী, এশ্কে নূরে পোড়া-ভাজা।

বিরতি

রূপকারঃ

হযরত বুননুন মিশরী বলেন, ‘জড় সৃষ্টি সবে
শুনে আল্লাহর অলীর কথা’, ছিলেন সেথা
উপস্থিত হযরত আবু জাফর আহবার (রহঃ), যবে
হুকুম দিলেন বুননুন, ‘হে আমার আসন যাও, যেথা
যাও ঘুরে আসো ঘরের চতুর্দিক’, করিল তৎক্ষণাৎ-
আসন, দেখে তাজ্জব এক যুবক, কাঁদিতে কাঁদিতে
গেল মারা সে সেখানেই, দেখিয়া ছেলের অশ্রুপাত
সে আসন স্থলেই করা হলো দাফন, ঘরের ভিতে ।

ও অলিরে ----- অলিরে ----- অলিরে

তোমার দাওয়াই কেমন ওগো তোমার দাওয়াই কেমন,
মধু নাকি বিষের ছোঁয়া, ও বিধি রে বুঝা কি যায় তেমন ।
বুঝতো যদি সেই বালকে,
মরতো সে গো এক পলকে,
দিব্য নূরের তজল্লীতে, মুসা নবী জ্ঞান হারালো এমন ।
এমন শক্তি কাহার আছে,
ফায়েজ চাহে তাঁহার কাছে,
সে তো আমার সিদ্ধ গুরু, সাঁইজি হৃদয়চারী বুনুন । (মিউজিক)

একদা এক ব্যক্তি ঋণ মুক্তির ব্যাপারে প্রার্থনা করে
সাহায্য হযরতের, হযরত মাটি থেকে এক খন্ড পাথর
লয়ে তুলে দেন ঐ ব্যক্তি হাতে, বলেন, ‘যাও বাজারে
আর এটি বিক্রি করে যা পাবে তা দিয়ে শোধ কর
ঋণ’। দেখল বেচারী পাথর খন্ড হঠাৎ হলো
জমরদ পাথর চোখের পলকে, আর কি বাজারে গিয়ে
বিক্রয় করে তা শোধিল ঋণ বেচারী। বলো,
কী আশ্চর্য কেরামত হুজুরের! ভাবছি এ নিয়ে।
মিশরের এক তরুণ ছিল দরবেশ বিরোধী, সে
তরুণ সম্বন্ধে জানতেন হযরত যুন্নুন মিশরী,
হযরত যুবকেরে দিয়ে একটি আংটি বলেন, ‘হে
যুবক, যাও এটি রাখিলে বন্ধক, কত দিতে চায়, শুনি
রুটিওয়ালার কথা, এসো ফিরে’ যুবক করিল তাই,
রুটিওয়ালা দিতে চাহিল মাত্র এক দেহরাম তারে,
শুনিয়া হযরত বলিলেন ফের, ‘যাও হে যুবক ভাই
কোন জহুরীর কাছে রাখিতে বন্ধক, জহুরী যত পারে
হাঁকুক এসো ফিরে শুনে’, হুজুরের কথা শুনে
যুবক যেই গেল জহুরীর কাছে, অমনি জহুরী
কহিল, ‘দেবো এক হাজার দেহরাম গুনে গুনে’

শুনিয়া যুবক ফিরিয়া আসিল, হযরত যুন্নুন মিশরী
শুনে কহিল, ‘হে যুবক দরবেশ সম্বন্ধে তোমার
ধারণা ঐ রুটিওয়ালার মত তাই না’? যুবক লাজে
মুখ করিয়া লাল গেল চলিয়া, রহিল না আর
বিরোধীতা, রহিল না ধারণা দরবেশ সম্বন্ধে বাজে । (মিউজিক)

না, কহিও না কথা, কহিও না ওগো, প্রিয়ো,
না, জানিয়া না প্রিয়ো না, না, মান হরণ করিও ।
যিনি ঋষি দরবেশ তিনি কী যে,
কেমনে চিনিবে কাছে না গিয়ে,
রতন চিনে জহুরী, জহুরীয়ে রতন চিনিতে দিয়ো ।
কে যে কী, ভেতরে কী যে আছে,
কেমনে বুঝিবে, না ছুটে তার পাছে ,
হৃদয়চারীয়ে চিনে, হৃদয়চারী, তাঁরে ভালবাসিয়ো । (মিউজিক)

হযরত যুন্নুন মিশরী একদা রাতে করিলেন পণ,
যদি দু’রাকাত নফল নামাজে কোরআন খতম

করা যায় তবে খাওয়া হবে শিরকি অমনি মন
হয়ে গেল রাজি, বাসনা করিতে পূরণ নামাজ
শেষে সেই ঈদের রাতে পেয়ালা তুলিলেন মুখে
হায় সে কী দীর্ঘ দশ বছর যা রাখিছেন অবদমন
করে সে প্রবৃত্তি আজি করিবেন পূরণ ধিক্ তোকে !
আপনারে আপনি ধিক্কার দিয়ে कहিলেন তখন
ফেলি শিরকাপেয়ালা মাটিতে, নচ্ছার কুপ্রবৃত্তি
সে কী অপূর্ব তাপস, সংযম যার নিত্য সাথী
প্রবৃত্তিরে করেন অবদমন ! টানেন, রান্সুসে ইচ্ছের ইতি ।
এ দিকে দরবারে লোক শিরকি আনিল ডেকচিপাতি,
কহিল, ‘হে হযরত গত রাতে দেখিয়াছি স্বপন আমি,
কহিছেন, ‘হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যাও দরবারে তার,
যিনি হযরত যুননুন মিশরী, তাঁকে খাইয়ে নামি
কিছু শিরকি, পরে ছেলে পুলে লয়ে তোমার,
খাইবে বাকীটুকু, নহিলে শাফায়েত পাবে না
রোজ হাশরে আমার জানিও’, তাই লোকটি বলে, ‘ঈদ
উপলক্ষে তৈরী এ শিরকি গ্রহণ করুন হে হযরত ’
শুনে হযরত যুননুন মিশরী মহাধর্মবিদ
গ্রহণ করিলেন কিছু শিরকি, বাড়ল ডেকচির বরকত ।
কেমন সাধক তুমি, ওগো কেমন সাধক তুমি,

কোন সে ছলে খাওয়ায় তোমায় আখেরী নবী ।
নিজের শিরকি ফেলে দিলে
যখন নিজের হাতে,
দৈবগুণে সে কারণে
মঞ্জুর হল রাতে,
সেই শিরকী, ত্যাগিলে যা, পেলে তা সেই রকমই ।
তোমার ত্যাগ দেখিয়া আখেরী নবী,
দিলেন ফিরিয়ে তোমার খায়েস সবি,
হে ত্যাগের গুরু, বরকত চাহি তোমার পদচুম্বি ।(মিউজিক)

শত্রুরা তাহার, করিল নালিশ রাজ দরবারে,
খলিফা মুত্তাওয়াক্কীল করিল সমন জারী
বুননুন মিশরীর হতে হবে হাজির সশরীরে
তিনি গ্রেফতার হয়ে নীত হলেন কারাগারে ।
চল্লিশ দিন রহিলেন কারাগারে সে সময়
বিশরে হাফীর (রহঃ) বড় বোন, প্রতিদিন
রুটি পাঠাতেন, সে রুটি তিনি আহার করিতেন
না, এমন কি সে রুটি ছুঁইতেন না । পথে অভয়
দিয়েছিল এক বুড়ি, এক ভিস্তি জল খাইয়ে তাঁরে

কহিয়াছিল, ‘খলিফাও আল্লাহতায়ালার বান্দা, হবে না
কিছু তোমার, যাও’, বিনিময় চাহিলেন না
তিনি ক’ন, ‘হে বন্দি বেড়ীপরা, ভীৰু যে জন সে না পারে
সেবিতে বন্দিরে, কিসের বিনিময়, যাও হবে না কিছ্’,
খলিফার নির্দেশে দিন চল্লিশ পর হলেন মুখোমুখি,
তাঁর কপাল কেটে চৌচির পিছলে লেগে টোকাটুকি
প্রশ্নের দিলেন জবাব, বিরোধীদের দেখা গেল মাথা নিচু।
আসিলেন বাইরে দিন চল্লিশের পরে আর
ফিরে গেলেন বীর বিক্রমে বিজয়ী বেশে মিশরে
সসম্মানে, ফতোয়াবাজের মুখে কালি দিয়ে দরবারে
স্বয়ং খলিফা হলেন দীক্ষিত তাঁহার।
মছিবত যদি আসে ঘুরে ফিরে, ফিরে দ্বারে, দ্বারে,
ভয় কিসের ঋষিরে, ভয় কিসের তুচ্ছ করো তারে।
কে পেয়েছে কুসুম রতন ফুলশয্যা,
সাধনার পথে অনায়াসে,
আসিলে আঘাত, পলে পলে তারে
ছুঁরে ফেলে, ছুটে বিজয়-আশে।
নিষ্ঠা যদি থাকে গো কারো, চিন্তা নেই একেবারে।
বিজয়ের মুকুট আসে শুধু আপনার
মাঝে ডুবে থেকে থেকে,

নিজেৱে চিনে চিনে, আত্মশাসনে

মগ্ন থেকে, শাসন জাৰী ৰেখে।

ঋষি যে হৃদয়চাৰী,কোন বাধা কি আটকাতে পাৰে। (মিউজিক)

একদা এক শিষ্য এসে বলল, ‘হৃজুৱ কী হবে আমার,
চল্লিশ দিন করে চল্লিশ বার ধ্যানে রহিলাম পড়ে
হজ্জ আদায় করি চল্লিশবার, এবাদত করি চল্লিশবার
সারারাত জেগে,তবু হয় আসে নি ফায়েজ ভোৱে,
এখন কী করি দিন বুঝি এসেছে গো ফুৰিয়ে,
যেতে হবে গো বুঝি আমায় এমনি ভাবে
না পেয়ে স্ৰষ্টাৱ দৰ্শন, তত্ত্ব সে সুধা পিয়ে
যাবো গো বুঝি ব্যৰ্থ মনোৱথে ধৰাধাম ছেড়ে কোন্ লাভে?
হায় হায় গুৰু দাও না বলে, আমার ঘাট্টি কী তাই
না হলে এমন হলো কেন গো পেলাম না কিছু,’
শুনে কাকুতি শিষ্যেৱ বলিলেন হযরত মিশৰী সাঁই,
‘শোন, আজ রাতে পেট পুৱে খাও আৱ পিছু
তাকিয়ো না, এশা না পড়ে ঘুমাও, দেখিবে কঠিন ফল’,
যেই কথা সেই কাজ সে রাতেই সে লোক দেখিল
স্বপন তাৱে কহিছেন মোহাম্মদ (সা:), ‘হে প্ৰেমপাগল

কেন হলে ধৈর্যহারা, জানো কি, যে ধৈর্যহারা সে কাপুরুষ
এশকে এলাহী অর্জনে লাগে কঠোর বন্দেগী, হে সাধক
আল্লাহ তোমার বাসনা করেছেন পূর্ণ, বলো সুফী দরবেশ
যুননুন মিশরীকে, কেন তোমায় দিলেন এমন আদেশ ধিক্
তারে, সে আদেশের কারণে অপমান হবে জন সম্মুখে’
তাও ভাল, জীবনবাজী রাখা কঠোর ঈমানদার পুরুষ
যুননুন মিশরী, বলেছেন, মহান আল্লাহ স্বপ্নলোকে ।
শিষ্য কাঁদিয়া অস্থির, জাগিয়া গেল বেহুঁশ
গুরুর দরবারে, শুনিয়া গুরু আনুপূর্বিক কাহিনি
ফেলিলেন, আনন্দাশ্রু । বলে রাখা ভাল যে
চিকিৎসক সে রোগ বুঝে দেন চিকিৎসা, মুরশিদ
যিনি তিনিও মনোরোগের চিকিৎসক কখন যে
কোন আদেশ করেন, কী তার ফল বুঝা মুশ্কিল ।
চিকিৎসক সময়ে বিষকে ঔষধরূপে ব্যবহার করেন,
তিনি হয়ত করেছেন তাই, তিনি জানতেন শিষ্যটি
নামাজ করিবে না কাযা । হযরত ইব্রাহীমকে
আল্লাহ পুত্র কোরবানীর কথা বলেন, পরে নিষেধ
করেন, অনুরূপ হযরত খিযির (আঃ) এক
শিশু করেন হত্যা আপাত : দৃষ্টিতে তার কোন কারণ

ছিল না; তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্পন্ন হয়েছে
আল্লাহর ইচ্ছে ও হুকুম বিচিত্র, বুঝিতে জ্ঞান,প্রয়োজন ।

ও বিধিরে

তোমার লীলা বুঝা বড় দায় রে,লীলা বুঝা দায়,

মুক্ত যে জন, সে জন আরও বুঝতে বুঝি চায় ।

তোমার লীলা বুঝা দায় ।

মুর্শিদ আমার কোথা নিয়ে

কখন কী যে করেন,

কখন আমার শরীর কেটে

কারণ আবার গড়েন ।

তাহার ইচ্ছায় বাঁচি মরি,সহ্য করি গায় ।

যে জন আপন হৃদয়চারী

সে জন ভাগ্যবান,

হৃদয়ছাড়া এই দুনিয়ায় সৃষ্টি

কী তার সমান?

হৃদয়-লীলা লুকোচুরি চলে বিভূর দয়ায় ।

একদিন এক কৃষক করছিল তওয়াফ কা'বা

ভীষণ কষ্ট দেখে তাঁর হযরত বুনুন মিশরী

কহিলেন, 'তোমার এ দূরবস্থা কেন হে বাবা,

তুমি কী আল্লাহতায়ার বন্ধু দিল উত্তর কৃষক তারি,
‘হাঁ’, আবার সুখালেন, ‘আল্লাহতায়াল্লা কী কাছে
তোমার নাকি দূরে’ সহজেই দিল উত্তর
কৃষক, ‘হাঁ’ আল্লাহ কাছে আমার আছে’।
এবার হাঁকিলেন হযরত যুননুন, ‘পরওয়ারদিগার
তোমার পক্ষে না বিপক্ষে সহজ জবাব
আসিল তাঁহার, আল্লাহ নাকি কৃষানের
পক্ষে, সব শুনে হযরত যুননুন লা জবাব
কহিলেন, ‘এহেন দূরবস্থা কেন তোমার জানের’
বলিল কৃষক, ‘প্রেম শক্তির কাছে জানের দূরবস্থা
জানিও কিছু না’, শুনিয়া হযরত কিছু আর
কহিলেন না, একেই বুঝি বলে সাচ্ছা আস্থা।
হযরত যুননুন মিশরী মতামত চাহিলেন এক মহিলার,
প্রেমের সীমা কোনখানে, কহিল মহিলা নেই সীমা
প্রেমের, কেননা প্রেমাস্পদ সে অসীম ত্যাগ আর
সাহসের কী অপূর্ব সম্মিলন, এশকে এলাহীর উপমা।
এক লোক নিজেই কহিতেন আল্লাহ প্রেমিক বলে,
একবার যুননুন মিশরীর সম্মুখে সে কথা কহে,
কহিলেন, ‘যে আল্লাহর দেয়া কষ্টকে কষ্ট মনে করে চলে,

সে নহে দোস্ত খোদার, নাই ক্ষমতা তার কষ্ট সহে
রহিবে খোদা পানে চেয়ে' শুনে হযরত
পেয়ে যান সুযোগ বলেন, 'এবার শুনুন,
যে নিজেরে করে প্রচার আল্লাহ প্রেমিক বলে আলবৎ
সে নহে প্রকৃত প্রেমিক খোদার, বলে ঝুননুন'।
শুনে ঐ লোক পেয়ে গেলো লজ্জা আর কোন দিন
করিবে না প্রচার অমন করে, তওবা করিল বটে।
হযরত ঝুননুনের পীড়িত হালত দেখে বিবেচনাহীন
এক লোক কহিল, 'বন্ধুর দেয়া অমন অসুস্থতা ঘটে
যদি কারু, ভালই তো সুখ আছে এতে'।
শুনিয়া হযরত কহিলেন, 'তুমি কহিলে যে রূপে
বেয়াদপের মত; অমন করে কহিতে না, লজ্জা পেতে,
কারু যদি ভেতরে বাহিরে থাকে আদব, রহে সে চুপে'!
একদা হযরত ঝুননুন মিশরী পত্র লিখেন তাঁর
বন্ধু বরাবর, 'বন্ধু হে, অজ্ঞতার চাদর দিয়ে
ঢাকা আমাদের মন, এ যেন অপার দয়া খোদার,
আমরা যেন বেঁচে থাকি খোদার সম্ভৃষ্টি নিয়ে।
বাঁধিতে চাহিনা আপনারে
বসুধার দ্বারে,

ফিরিয়া যাবো গো যাবো

পরপারে-----

না দেখিয়া তোমার মুরতি

হে ভব সাগর করি উদর পুরতি

তোমারি না সেবিব গো অমন

দুরাচারে ।

আপনার হৃদে আপনি থাকি

ডুবিয়া তাহে, রঙধনু মাখি

আঁকিব মানস পটে, স্বর্গের মুরতি

আকড়ে ধরি তারে ।

হযরত বুন্নুন মিশরী ভ্রমনে আসিয়া

দেখিলেন, এক অগ্নিপূজক শস্যদানা

ফেলিছে বরফে, ‘এ কাজ কেন হে করিছ যাচিয়া’

সুধালে তারে বলিল সে, ‘বরফে ঢাকা মাঠখানা

তাই পাখির ক্ষুধা নিবৃত্তির তরে করিছ এ কাজ’ ।

শুনি হযরত বুন্নুন ক’ন, ‘আমি না করি পছন্দ এ যে,’

অগ্নিপূজারী ফেলি নিঃশ্বাস কহে, ‘নাহি লাজ,

করি কাজ যে, আসিবে আমার কল্যাণ রূপে সেজে ।’

কিছুকাল পরে দেখা গেল অগ্নি পূজকেরে মক্কাশরীফে,

করিছে তাওয়াফ ,আহা এ কী দৃশ্য ,অগ্নিপূজক এখানে?
ভাবিলেন হযরত বুনন্ন মিশরী , এ কী বিনিময় বরফে
ছিটানো শস্যদানার সুফল ,হেদায়েত প্রাপ্তি হলো শেষে
আবেগ ধরে রাখিতে নারি , ধরিলেন মোনাজাত , বলেন ,
'প্রভু আমার চল্লিশ বছর যে ছিল অগ্নিপূজারী
তারে করিলেন হেদায়েত নসীব তুষ্ঠ হয়ে আপনি ।
সংগে সংগে আসিল গায়েবী আওয়াজ , 'হে মিশরী
তুমি জানিতে চেয়ো না ইচ্ছা ও শক্তির কথা আমার ,
আমি যারে খুশি মহাসৌভাগ্য শালী করি ,
আমার কাজের ব্যাপারে কারও কিছু নেই বলার ,'
শুনিয়া হযরত বিস্ময়ে অধোবদনে গেলেন পড়ি ।
মহাপ্রয়াণের সময় এলে , ঘনিয়ে এলে ,
কহিলেন , 'কেহ আপনার ইচ্ছায় কী গো তাপস?
খোদার স্মরণে গাহিলেন তখন গান আঁখি মেলে ,
ইউসুফ ইবনে হুসাইন তখন চাহিলেন উপদেশ
কহিলেন , তিনি , 'ফানাফিল্লাহ আমি ' ,
আমাকে সরিয়ো না , সরিয়ো না
এ কথাই তার শেষ কথা , জবান গেল থামি ।
ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন ।

কোরাসঃ

প্রভু গো আপনার ভয় আমাকে
রোগা করেছে।

আপনাকে দেখার ইচ্ছা আমাকে
জীবিত রেখেছে।

আপনার প্রেম-বাসনা আমাকে
দুর্বল করেছে।

প্রভু আমার
মূলত আপনি আপনার
করুণা ও জ্ঞান দ্বারা
আমাকে জীবিত রেখেছেন।

কিশোরগঞ্জ ২২/৮/১৩

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন হাসান চিশতি (রহঃ)
(জীবন্যাস-হৃদয়চারী কবি হুমায়ূনের পালা)

আমি সাগরের সবটুকু জল
নিয়ে এসেছি তোমার লাগি,
আমি ঘূর্ণিঝড়ের চিবুকে
ধরেছি তোমার দয়া মাগি,
তোমার লাগি আকাশের তারকা হয়েছি,
গায়ে ভূতলের তপ্ত লাভার জ্বালা সয়েছি,
সময়ের ঘানি টেনে টেনে
বটতলে হয়েছি বিবাগী।
পথে পথে ঘুরে কত সবুজ দেখেছি দূরে,
সমতল হতে উঠেছি, উঠেছি পর্বত চূড়ে।
শুধু হতে পারি নি, পারি নি
হতে হৃদয়চারী, হৃদয়ে জাগি।
খোদার রহম দরিয়া কাঁপিয়া উথলে উঠে,
যাঁর তরে, এশকে এলাহী জোরে,
আজমিরী, আজমিরী, আজমিরী অলিপ্রবর

তপস্যা, বন্দেগী, ভক্তি-গজলের তোড়ে ।

আমার বলিবার অলিযোগ্য ভাষা নাই,

অধম ফায়েজ পিয়াসী তবু বলিয়া যাই,

হযরত খাজা মইন উদ্দিন হাসান চিশ্ত

মহামানব তুমি, শ্রদ্ধায় ভয়ে

করিব তোমার মাজার জিয়ারত

কল্পনায়, তোমার রুহানী ফায়েজ লয়ে

যাব, আমরা নরাধম,পশুদল,

তৃণ চিবাই, করি চাতুরী ছল,

তোমার নূরে, যাচ্ছি পুড়ে-----

দূরের মানুষ এসেছি,চিনেছি

তোমার আলোয় দেখেছি

নিজের বক্ষে ঘুরে ।

হেতা নেই রঙ, কথিত খালি পিঞ্জর

পাখি কয় না কথা,স্তব্ধ কণ্ঠস্বর

নিজেরে দেখে ভয়ে---

নিজেই রয়েছি দূরে ।

এ কোন্ হাল আমার বক্ষ মধুকুঞ্জ

হলাহলে ভরা, বিরাগ দ্বীপপুঞ্জ

যন্ত্রনা কাতর এই আমি--

আমি আজি, অন্তঃপুরে ।

সূদূর আকাশ হতে ছিনিয়ে এনে

তপ্ত অরুণ, ঢেলে দিয়েছি হৃদয়ে

জ্বলে জ্বলে যদি একটু, একটু চিনে

নিজেরে, হয় নি আরও গিয়েছে ক্ষয়ে ।

আবার এনেছি সুকোমল চাঁদ যদি

ফিরে পায় শান্তি, তাও হয়ে উঠে নি

ছায়াপথে গিয়ে হেঁটেছি নিরবধি

তবুও এ হৃদয় গোলাপ হয়ে ফুটে নি ।

শেষে পেয়ে তাজকরাতুল আউলিয়া বই

দেখিলাম এক মহামানব এসেছেন ভূতলে

চৌদ্দ রজব পাঁচশত সাঁইত্রিশ হিজরী, হই

বিস্মিত! পিতৃ-মাতৃকুল সৈয়দ বংশীয় ঝলমলে ।

তাঁর পিতার নাম গিয়াসউদ্দিন আহমদ আর

মাতা সাইয়েদা উম্মুলওয়ারা, মধ্য এশিয়ার সিহ্‌ন

প্রদেশ, চিশ্ত শহরতলী সনজর গ্রাম জন্মস্থান যাঁর

ছিল আর দু'ভাই, তিনি হলেন তৃতীয় কনিষ্ঠ সন্তান ।

পিতৃকুলে হযরত আলী কারবামুল্লাহ ওয়াজহ্,

মাতৃকুলে হযরত ফাতেমা রাজি আল্লাহু আনহা । (মিউজিক)

বিবেকঃ

বিধি রে শিহরিত গজারি বনে, হিল্লোলে হিল্লোলে,
অকারণে কেন জানি এ মন অজানা দোলায় দোলে ।
মুক্ত বাতাসে অসীমের টানে,
ঘুরে ঘুরে ফিরে কিসের দ্বাণে,
সহজ স্বভাবে বিনম্র ধ্যানে, সিদ্ধ তপোবলে ঝুলে ।
ভুঁইলগ্ন দেহখানি গবাদীর মতো,
ঘাসের সাথে আলো পায় কতো,
আজি অসুরে হারে ঐ বুঝি সুরের আঁখি খোলে ।
সুন্দর যত ভাবনা নিয়ে এসে,
পাই ঠাঁই আপন হৃদে শেষে,
হৃদয়চারী খাজা-নূর ছোঁয়ায় পাপী গেছে পাপ ভুলে । (মিউজিক)

শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে বাবার সান্নিধ্য পেয়ে
আট বছর বয়সে হেফজ করেন কোরআন অনায়াসে ।
সালাত কায়েম করেন নিয়মিত, সিয়ামে নেয়ে
তাঁর শরীর হতো পবিত্র, ধীমান শিশু, কেহ ছিল না পাশে ।

কঠিন পরীক্ষা! পাঁচশত বায়ান্ন হিজরী, পিতা বিভূই
শামদেশে মারা গেলে, হলেন এতিম পনের
বৎসর বয়সে, মাতাও তাঁর মৃত্যুর স্বাদ ছুঁই
হলেন স্বর্গবাসী, সম্মুখীন হলেন জীবন-পরীক্ষা রণের।
সংসারী দুই ভ্রাতা জুদা হয়ে জমি ভাগ করে নিয়ে
দূরে সরে যায়, তাঁর ভাগে পাওয়া একটি বাগান চাষ করে
জীবনের হাল ধরি, কাটে সময় অবসরে কিতাবের রস পিয়ে,
বিঘ্ন ঘটে পাঠশালে যাওয়াতে, আটকে যান শুষ্ক বালুচরে। (মিউজিক)

বিবেকঃ

পথ নেই ঘাট নেই গহীন বনে, কোথা যাবেন খাজা,
অযতনে ঝরে বুঝি, তাজা বনফুল ধীমান অলি রাজা।
কৈশোরে এইরূপ হলে,
চাঁদ খসে পড়ে ভূতলে,
জলের মাছ ডাঙ্গায় আহা হয় অভাব তেলে-ভাজা।
কোন কিছু কাছে না পেয়ে,
অশ্রু ঝরে কপোল বেয়ে,
রক্ষক খোদা এইভাবে রাখেন দিয়ে বুঝি শিক্ষা-সাজা।

খোদার লীলা বুঝা ভার, একদিন সাধক ইব্রাহীম
কলন্দর খোরাশানবাসী মহাপণ্ডিত, কামেল অলী এসে
ছদ্মবেশে বসিলেন ওই বাগানে জ্বলে আধ্যাত্মিক পিদিম
খাজা মঈনউদ্দিন হাসান বসিলেন তাঁর পাশ ঘেঁষে ।
ভক্তি ভরে কদমবুচি করে গুটিকতক ফল দিয়ে হাতে
বলিলেন খাজা, ‘দরবেশ বাবা দোয়া করুন, দোয়া’,
দরবেশ চিবিয়ে নিজ ঝুলির ফল দেন খাজার মুখে, তাতে
খাজার দেহে খেলিয়া গেল স্বর্গীয়ভাব, পেয়ে ‘ফল-ছোঁয়া’
আর খাজার দেয়া ফল তৃপ্তি সহকারে খেয়ে দরবেশ
ইব্রাহীম কলন্দর, নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কোথা,
দরবেশ-চিবানো ‘ফল-ছোঁয়ায়’ শিহরিত খাজার হৃদ-দেশ
হল সংসার বিবাগী, ছাড়িয়া গৃহকর্ম বাগান চলেন হেতা হোতা
উদ্দেশ্যবিহীন, বিক্রয় করি সব করে দিলেন আল্লার নাম স্মরে
দান, তারপর বোখারায় গেলেন এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা হেতু ।
সেথা হযরত হিসামউদ্দিন পড়ালেন তারে সাত বছর ধরে
হাদিস, ফেকাহ তাফছিরে কোরআন আলোয় জ্বলে ধূমকেতু ।
(মিউজিক)

৫নং বাণী (মাও.বশিরউদ্দিন.তাজকেরা.আউ.বাংলাদেশ.১মখন্ড)

বিবেকঃ

আমি কত শিক্ষক দেখেছি

দেখেছি কত পন্ডিত গুরু ,

আমি স্বভাবের পাঠে বুঝেছি

বুঝেছি শিক্ষা মেলে পুরু ।

আমি হেঁটেছি,হেঁটেছি কতো

দেখেছি কত বালিয়াড়ি জীবন নদীর বাঁকে ,

দেখেছি কত কুহেলিকা , কত পিশাচী হাঁকে ,

মরিচীকা বলে সেথায় ডুবেছি যে ,

বিভুর দয়া বলে ভাসি , নাহি মরি হে ,

আমি বিরলে রুহানি দ্যুতি বুঝেছি

গুরু-দ্যুতির আসা শুরু ।

আমি দ্যুতির পিছু পিছু গিয়েছি

গিয়েছি বিজনে দরবেশের কুঠিরে ,

আমি দেখেছি অশান্তি উধাও

হৃদয়চারী হয়ে বুঝেছি নফস-ত্রুটিরে ।

আমি অর্ঘ্য দিতে পারি নি বলে

হৃদয় কাঁপিছে দুরু দুরু । (১০/১০/১২)

ভাবেন শিক্ষা গুরু হিসামউদ্দিন এ কেমন মেধাবী ছাত্র যে,
যাহা পারে নাই বিশ বছরে কোন ছাত্র তাহা খাজা পড়িয়াছে
সাত বছরে, বলেন, ‘খাজা ওসমান হারুনীর মুরীদ হও গিয়ে’
সেথা গিয়ে খাজা ওসমান হারুনীর দৃষ্টিও চিশ্তি কাড়িয়াছে,
পাঁচশত ষাট সালের শাওয়াল, বুধবার জোহর নামাযান্তে
হ’ন মুরীদ খাজা মঈনউদ্দিন, খাজা ওসমান হারুনীর
হাতে কলমে শিক্ষা নিলেন, হয়ে উঠলেন নিজের অজান্তে
মারেফাত তত্ত্ববিদ মঈনউদ্দিন, মহাসাধক জীতেন্দ্রীয় বীর ।
টানা আঠার বছর আধ্যাত্মিক গুরুর ছোহবত-গোলামী!!
সে যে কী হৃদয়চারীর সুধা ভান্ডার পাওয়া!!, ভাবা যায় না
খাজা ওসমান হারুনীর মানস পুত্র চিশ্তি!!, দিবায়ামী
থাকতেন হারুনীর খিদমতে গৃহকর্ম কাজে, কেহ পায় না
সৌভাগ্যবান না হলে এত কাছে এমন দীক্ষাগুরু ।
হারুনীর ব্যবহৃত আসবাবপত্র বোঝা, কোথা ভ্রমনে গেলে
বহন করিতেন খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি, একাই পুরু ।
তাই অমৃত উজাড় করে দিলেন চিশতিকে নূর-পিদিম জ্বেলে ।
(মিউজিক)

বাণী-১১, ১২

আমি দেখেছি কৃষ্ণচূড়া লালে লাল হতে
অভাবের ফুল ফুটিয়ে,
গোপনে শুনেছি কূজন কুহু কুহু গলা হতে
কষ্ট-খুন নিয়ে খুটিয়ে ।
শত্রু-কাক কালো, রাও মন্দ,
দেখিতে পারি না তারে,
আমার সূতেরে লালনে অন্ধ
কাকেরে দেখিলে ভক্তি বাড়ে ।
ঋণী হয়ে শেষে কাঁদিয়া মরি মরি
সুর লহরী তুলি চুটিয়ে ।
নাই বাড়ি নাই ঘর আছে শুধু,
ঋষি স্বভাবের মাধুরী কষ্ট-মধু,
সুরে ইথারে মিলাই ভক্তি-ডোরে
ভরসায় বাঁচি ফলার জুটিয়ে ।

নানা দেশ সফর আর বার কয়েক মক্কা মোকাররমায় গমন
এইরূপ বোঝা বহন করে চলা সে কী সহজ কথা, সহজ
মুশীদ ভজন, মুর্শিদেব গোলামী কাহাকে বলে, আহা অমন
নজির বিরল, পায় না কেহ কিছু, না থাকিলে এমন গরজ।
একদা এক হজ্জব্রত শেষে গুরু-শিষ্য উভয়ে উপস্থিত হন
মদীনা মনোয়ারায়, নবী মোহাম্মদ সালাহু আলাইহিস্ সালামের
রওজা মোবারকে, হুকুম দিলেন আধ্যাত্মিক গুরু, ‘মঈনউদ্দিন
সালাম দাও রওজা মোবারকে’খাজার পবিত্র কালামের
জওয়াব আসিল, রওজা মোবারক হতে। শিহরিত, স্তম্ভিত খাজা
ওসমান হারুনী আর তদীয় শিষ্য খাজা মঈনউদ্দিন। শোনা গেল
মধুর বাণী “ওয়ালাইকুম ছালাম ইয়াকুতুবুল আকতার” স্বর তাজা
রওজা হতে নিঃসৃত স্বগোষ্ঠি, খাজার আত্মা যেন ধাক্কা খেল।
নূরের প্রলেপে মোড়িত ক্বাল্ব তাঁর, কাতর নয়নে হারুনীর পানে
চাহিলেন মঈনউদ্দিন, এমন সময় খাজা হারুনী কহিলেন, ‘ওহে
প্রিয়, তুমি আল্লাহতায়ালার কাজে ভ্রমণ করিবে অজানা স্থানে
‘আল্লাহ’পর ভরসা বলে ত্রকে অপরের দিকে চাহিলেন দোঁহে।
বলেন খাজা, ‘ক্বাল্বে চাহিয়া না থাকা যত ভুল পথের মানুষ,
তাদের চোখ ফিরিয়ে নিবে ক্বাল্বে ধ্যানে সেখানে বসাতে হবে।

‘আল্লাহ’ জিকির রাসুলের আদলে’ । বিদায়োদ্যত হলে,খোশ
আমদেদ জানিয়ে রওজা মোবারক হতে ধ্বনিত হল মধুর রবে--
‘হে মঈনউদ্দিন,তুমি আমার পিয়ারা উম্মত, তোমাকে দিলাম
বেলায়েত হিন্দুস্থানের, মুশরেক কাফের ধরে হেদায়েত কর’
শুনিয়া আরও বিস্মিত হলেন খাজা মঈনউদ্দিন এ যে,দৈব-দাম
আনন্দ আবেগে গড়াইয়া পড়িল অশ্রু,এ যে,পুত দায়িত্ব গুরুতর ।
বিবেকঃ-

(বাণীঃ-১১ তারিখ-৮/১০/২০১২ এন.আই.এলজি)

আমি বাঘিনীকে দেখেছি, জটর জ্বলায় ভোগেছে
তবু অভাবের খই মুখে ফুটে নি,
আমি হরিণীকে দেখেছি আপনি মৃত্যু-পুরী ছুঁয়েছে
তবু কাতর হয়ে মাথা খুটে নি ।
আমি নদীকে দেখেছি,আপনার বুকে চর জাগাতে
সে চরে ভাস্কর হেসেছে তপ্ত সুখে-
নদী হারিয়ে গেছে কোথা নিরবে
সেথা ঝিকমিক করে আলোকে ।
আমি নিঃশ্বকে দেখেছি,অকারণে বিভূরে নিন্দেছে
তবু বুকে শংকা জেগে ওঠে নি ।
আমি ঋষিরে দেখেছি, অবিরত নামাবলী জপিছে
আপনার গতরে ফিরে চায় নি,

নদীর মত চর লয়ে বুকে

রহে তবু দুঃখের গীতি গায় নি ।

একে ‘এশক’ বলে মুখ বুজে মার খাওয়া ,

প্রেম করে প্রেমিকের তরে মরে যাওয়া ।

আমি নদীকে দেখেছি গতিপথ হারিয়ে স্মৃতি হয়েছে

তবু আর কোথা ভিক্ষে-বারি লুটে নি ।

কিন্তু কোথা যাবেন কি করিবেন কোথা সেই হিন্দুস্থান

কিংকর্তব্যবিমূঢ় খাজা মঈনউদ্দিন, এমন সময় ফের

শোনা গেল পবিত্র রওজা মোবারক হতে, ফের শুনতে পান

খাজা মঈনউদ্দিন হাসান চিশতি, মধুময় বাণী হযরতের ।

আদেশ হল, ‘হে মইনউদ্দিন তুমি কোন চিন্তা করো না

বন্ধ কর আঁখিযুগল, রওজা মুখী হয়ে মোরাকাবায়,

দেখিবে সবই ক্বালবের রুহানী মানচিত্রে, আশ্চর্য না !!

রুহানী মানচিত্র !!, কাগজ কলমবিহীন নূরানী আভায়

ভেসে উঠেছে হৃদয়ে কোথা দিল্লী, কোথা আজমীর

কোন পথে যেতে হবে মদীনা হতে, কিছুই রহিল না বাকী ।

অলৌকিক কর্মকাণ্ড !! সাইন্স কি, এ যে সুপার সাইন্স !! ধীর

বেগে বাঁর হ’ন সিদ্ধপুরুষ, বুকে রাসুলের নূরানী আভা মাখি ।

কিসের সাগর মহাসাগর পাহাড় পর্বত আর মরুর বাধা,
কিসের রাজা রাজত্ব মানুষ আর যত জানুয়ার গরু গাধা ।
স্রষ্টার সিপাহসালার ছুটছে ছুটছে আজ পথে,
ঝড় ঝাপ্টা আসুক না যতই বাধা দিতে রথে,
ভেসে যাবে, ভেসে যাবে, মিছে যাদুকরের যাদুর ধাঁ, ধাঁ ।
শরীরের শক্তিতে নয়, নয় কার জোর অস্ত্রের শক্তির,
উঠেছে সত্যের চাঁদ, জোয়ার এসেছে স্রষ্টায় ভক্তির,
আসিছে ধৈর্যে আসিছে, ঝান্ডা ইসলাম শান্তির সাধনা সাধা ।
যাক্ মুছে যাক্ জঞ্জাল, তপ্ত নরক যন্ত্রনা,
ফুটে উঠুক হৃদয়-কুসুম করি গুণ-বন্দনা,
স্বাগতম হে হৃদয়চারী মরমী খাজা মঈনউদ্দিন শাহজাদা ।

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন হাসান চিশতি মদিনা হতে
বলখে, তথা হতে লাহোড়ে আসিলেন, সংগে সহচর
চল্লিশ দরবেশ, লাহোড়ে দুইমাস থেকে, দিল্লীর পথে
রওনা দিয়ে আছরের পূর্বে পৌঁছেন তথা, ময়দানে দিল্লীর
বৃক্ষতলে বসে, আর দরবেশকে আজান দিতে আদেশ দিলেন ।
এ আজান শুনে অনভ্যস্থ, অন্ধ বিশ্বাসীদের বুক কাঁপিয়া উঠিল,
রটে গেল দেশের সর্বত্র, দিল্লীতে এসেছে দরবেশ দল, ছিলেন

তৎকালে শাসক দিল্লীর প্রতাপশালী মহারাজ পৃথীরায়, তুলিল
তাঁহার কানে লোকেরা করিতে বিহিত, কি ভাবে তাঁদের করা
যায় শায়েস্তা ! দরবেশদের হেনস্থা করতে হবে মোটে একচল্লিশ
জন দরবেশ, এই স্লেচ্ছ জাত কোথা থেকে এসে জুটেছে,এরা
আর করবে কি, তাই মহারাজ পৃথীরায় পাঠালেন বিশ্বস্থ সশস্ত্র
গোয়েন্দা এক,ছদ্মবেশে ঢুকে গেলো দরবেশ দলে,সে চালায়
তার কাজ, কিভাবে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতিকে করা যায়
বধ, উহা ছিল পরিকল্পিত,পৃথীরায়ের ভাই খাড়া রায়
থাকিত নিজে দিল্লী, পৃথী থাকিত আজমীরে,তার নির্দেশনায়
বলা ছিল, আসিলে নিজ বিশ্বাসের বিরোধী কোন ব্যক্তি,দল
গুপ্তচর লাগিয়ে শনাক্ত করে করিতে হইবে হত্যা,তার তাই
গোয়েন্দা তল্লাশীতে ছিল না তেমন শক্তি বা বল, ছিল কৌশল
প্রয়োগের কথা, ছিল সহজভাবে চাহিদা দলনেতার মৃত্যুটাই।

বাণীঃ নং ১০ তারিখঃ ৯/১০/১২

বিবেকঃ

আমি যমদূতের পিছু নিয়েছি বলে,

পিপীলিকা হয়েছি।

আমি যমদূতের পিছু নিয়েছি বলে

লতাগুল্ম হয়েছি।

আমি মানুষ হই নি বলে গুহায় থেকেছি,
নিজেরে গোপনে রেখেছি, নিভতে রেখেছি ।
আমি যমদূতের পিছু নিয়েছি বলে,
নির্যাতন সয়েছি ।

কেহ বলে না ভাই, দাও অপরকে দাও,
আর কিছু নাহি চাই, দাও যা আছে তাও ।
আমি যমদূতের পিছু না, যমদূত আমার পিছু,
সুরাহা হলে পেতাম অমিয় দ্যুতি কিছু কিছু ।
আমি যমদূতের পিছু নিয়েছি বলে,
হীরামন ক্ষয়েছি ।

মূঢ় মূৰ্খ কোথাকার ! নাহি জ্ঞান সুপার সাইন্স : আধ্যাত্মিক
শক্তি কী ! কতখানি তাহার গভীরতা বিস্তৃতি ! মহারাজ হলে
কি হবে, আছে শুধু তাহার ভেতরে অসাড় দম্ব বাহ্যিক
শক্তির আফালন, সমাজাচার কুসংস্কারে লালিত বলে
শুধু চায় আড়ম্বর আর পশুসম অমানবিক ভোগ-সম্ভোগ ।
তাই সে উদ্যত দৈব শক্তিকে ত্যাগিল্য ভরে করিবে ধ্বংস
হায়রে বোকা নির্বোধ রাজা, কিভাবে মিলিবে তোর এ সুযোগ
ঈশ্বর চাহেন যাহা, দরবেশ চাহেন তাহা, ইশ্বরের ইচ্ছার অংশ

যে দরবেশ, তাঁহারই ইচ্ছায় আচরি জীবন, সিদ্ধ মহাপুরুষ ।
গুপ্তচর শুধু সম্মুখে পড়িল, তাতেই আধ্যাত্মিক শক্তির তীর
আসিয়া বিঁধিল গুপ্তচরের বুকে, যত তাঁহার ছিল হিংসা-রোষ
সবি পুড়িয়া হইল ছাই, সুবিবেচনা তাহার আসিয়া করিল ভীড়,
নিমেষে ঈশ্বরের শক্তির কাছে করে গুপ্তচর চিরতরে মাথানত ।
খাজা মঈনউদ্দিন হাসান চিশতি তাঁহার বুহানী মানচিত্র
মোতাবেক কতক দিন দিল্লীতে অবস্থান করে, মহান রাবুল
আলামীনের দিকে মানুষ ডেকে, বানিয়ে খোদার তৌহিদ মিত্র
চলেন আজমীর অভিমুখে, বহিল যেন সুবাতাসের আনন্দ হিল্লোল ।
এই মহরম, পাঁচশত একষট্টি হিজরী পৌঁছেন কাংখিত আজমীরে
সাথে তাঁহার চল্লিশ সহচর দরবেশ, তাবু খাটাইয়া বৃক্ষতলে
করছিলেন বিশ্রাম, এমন সময় কতিপয় লোক দাঁড়ালো, ঘিরে
তাঁবুর অদূরে, বলিল শ্লেষভরে, ‘যাও সরিয়া যাও, না হলে
হবে বিপদ, এ যে পৃথী রায়ের উট বাঁধিবার স্থান’ । শুনে
খাজা বলেন, নম্রস্বরে, ‘তাঁবু খাটিয়েছি, তাই আজকের দিন
থাকিবার দাও, কাল চলে যাব অন্যত্র’ । রাগ ধরিল খুনে
উট পালকের, হুমকি দিয়ে বলিল, ‘কোনরূপ বিবাদবিহীন
চলে যান’, খাজা করেন তাই, শুনে উটপালকের কথা, আনা
সাগর তীরে পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু গেড়ে

সরে আসিলেন উষ্ট্রখানা হতে, উষ্ট্রপালক ভরে উষ্ট্রখানা
পাঁচশত উষ্ট্র দিয়া, চলিয়া গেল কাজ সেরে।

বাণী নং-৮ তারিখঃ ৯/১০/১২ এন.আই.এলজি.ঢাকা
বিবেকঃ

আমি চন্দনার কাছে গিয়েছি
দেখেছি যে, সে জপিছে বিষ্ণুর নাম ,
আমি খেজুরের কাছে গিয়েছি
দেখেছি খোদা বলে ঝুরিছে ঘাম।
আর দেখেছি খ্রীস্টমাস ট্রি গড গড বলে,
নিরন্তর গেয়ে যায় অগোচরে তলে তলে।
আমি বটবৃক্ষের কাছে গিয়েছি
দেখেছি, মুনি ঋষি খুঁজিছে শ্যাম।
কাষ্টখন্ড বৌদ্ধদেবের ধ্যান-বোঝা বহে,
চুপি চুপি সবুজের পাড়া প্রভু স্মরে দহে।
আমি খাজার কাছে গিয়েছি,
দেখেছি ‘আল্লাহ’স্মরছে অবিরাম।
খোদার লীলা বুঝা বড় দায়, উষ্ট্র গুলি আটকে গেল মাটির
সাথে, কোন উষ্ট্র আর দাঁড়াতে পারছে না বহু চেষ্টা করে,
শুনিয়া সংবাদ রাজা মশায় বলিল বিচলিত হইয়া, উষ্ট্র ঘাঁটির

যত রাখালগণকে, ‘যাও, মাফ চাও ফকিরের পায়ে পড়ে
নচেৎ উপায় থাকিবে না অকল্যাণ হইবে আরও জানিয়া
রাখ’। রাজার পরামর্শ শুনিয়া রাখালগণ করিল তাই
খাজা সাহেব রাখালদের করিয়া দিলেন মাফ হাসিয়া
বলিলেন, ‘তাড়া কর, উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্বৈরে চিন্তা নাই’।
রাখালরা করিল তাড়া উদ্বৈদের, উঠিয়া দাঁড়াইল সব উট
রাখালরা হইল বিস্মিত, যেন মুক্তি জুটিল বন্দীর
উদ্বৈসমেত চলিয়া গেল রাখাল বাঁধিয়া জোট।
আনা সাগর তীরে ছিল তিনশত ষাটটি মন্দির
অপদেবতার পূজারী ছিল, ছিল সেথায় সেবায়েত রক্ষী
বেতনভুক ধর্মপূজারী শংখটোলক আরও কত কি দিয়া
নিছক আনন্দ জোয়ারে ভাসাইত ভূ-অম্বর, ভাবিত লক্ষ্মী
তাহাদের এ-ই। তাই খাজার সহচরদের সংগে নিয়া
আজান নামাজে হলে রত হত তারা বিরক্ত ভীষণ, কইল,
অনুযোগ করে মহারাজের দরবারে, ‘হয় আমাদের, নয়
তাহাদের দিন সুযোগ ধর্মচর্চার, শুনুন, দেখুন’, শুনে বইল
রাজার গায়ে উত্তপ্ত রাগের হাওয়া, স্লেচ্ছ-মুসলিমের এত বড়
স্পর্ধা, ধর্মপালনে বাধা! বেদ্বীন মূর্তিপূজক বিবেচনাহীন
ধর্মাস্ত্র রাজা দিল যুদ্ধের আদেশ, ‘করো সমাবেশ জড়ো
যত সৈন্য আছে, যাও যুদ্ধে, রাখিও না কোনরূপ চিহ্ন-চিন

মুসলিম ফকির দলের', শুনে সৈন্যদল লয়ে সেনাপতি
 ছুটিল বিপুল সমারোহে যুদ্ধের মাঠে করিতে নিধন
 মুসলিম ফকির দল, বেদ্বীন সেনাপতি গর্বে ফুলিয়া অতি
 বলিল, খাজার নিকট গিয়া, স্লেচ্ছগণ বাঁধিবে ভীষণ রণ,
 শুন, শুন, ওহে শুন, আজমীর ছাড় নচেৎ যুদ্ধে মর,'
 শুনে ক'ন খাজা, 'ইন্শালাহ্ আমি ছাড়িব না আজমীর
 তোমার যা ক্ষমতা আছে কর, যা তোমার ইচ্ছে কর
 তবে রাখিবে মনে সেনাপতি, তোমাদের অধোগতির
 সীমা পরিসীমা থাকিবে না এক পা সম্মুখে হলে
 অগ্রসর', শুনে অগ্নিশর্মা মূর্তিপূজক সেনাপতি, হুকুম
 দিলে গর্জে উঠে সৈন্যদল, মৃত্যুর কোলে পড়ে চলে
 বুঝি মুসলিম ফকির দল, খাজা কী বলিয়া, নৃদেহ লুম
 খাড়া ইহবার মত কাণ্ড করিলেন!!, এক মুষ্টি বালু নিয়া
 ছুঁড়িয়া দিলেন সম্মুখে, মুষ্টি বালির মহাদৈব লীলা ক্রিয়ায়
 সৈন্যদের কেহ হইল অন্ধ, কেহ তাৎক্ষণিক বধির হইয়া
 শবন শক্তি হারাইল, কেহ পরিণত হইল বেটক খোড়ায়।
 ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পিশাচ পূজক ভীরা সৈন্যদল হটিল পিছু।
 মহারাজ পৃথী রায় হইলেন হতবুদ্ধি!! গুলিল ভীষণ প্রমাদ!!
 সকল চেষ্টা হইল তাহার অসাড়া, করার রহিল না কিছু
 ব্রাহ্মনগণ ভাবে কিভাবে নিবে ইহার দাদ করে প্রতিবাদ।

বিবেকঃ

আমি সূর্যকে দেখেছি ঝরাইছে
রশ্মি-অশ্রু পৃথিবীর কপোলে,
আমি সাহারাকে দেখেছি, কাঁদিয়ে
নূরনবী বলে মরুভূমে দোলে ।
আমি মাটিকে দেখেছি অশ্রু দিয়ে ভিজে,
কতকাল কেঁদে হয়েছে সর্বসহা নিজে ।
আমি পাহাড়কে দেখেছি পুড়িয়ে,
প্রভু, প্রভু বলে আপনি সুর তোলে ।
শুধু দেখি নি মানুষের ঘর বাড়ি, বাজার কাচারি,
হৃদে তুলে নি স্রষ্টার নাম, দেখি নি অনুরণন তারি ।
আমি মেঘকেও দেখেছি, বুরিছে
নিজ দেহ ত্যাগী, উঠিছে বারিধি কোলে ।
(চিশতি-৭, তাং-৯/১০/১২)

বিবেকঃ পুনঃ

আমার অঞ্জলী ভরে এসেছিল জল,
নিই নি তুলে মুখে

আমার শিরে এসেছিল জ্ঞান,
পড়ি নি সেথা জোকে
তুমি আছ বলে, তুমি আছ বলে
তোমার দিকেই পড়েছি ঢলে,
আমার চরণের ভরে হাঁটি নি
তোমার ভরসা টুটে ।
ছাতির ভেতরে যে, কী অমিয় কী যে ,
ভিটেহারা ঘুঘু আমি ভিটে ফিরে নিজে,
তোমারে দেখেছি আঁখি মুঁদে
হৃদয়ের স্বর্গলোকে ।
যেথা নিমগ্ন সবে, সেথা হুমায়ুন কবে
বুঝিবে বুঝিবে, সেথা নিমগ্ন রবে,
তোমারে ভেবে, হৃদয় খুলে দেবে
জমিবে জল আঁখিপুটে ।
(চিশতি-১)

ফকির দলেরে পানিতে মারার উদ্দেশ্যে আনা সাগর তীরে
বসবাসরত যত ব্রাহ্মণ যত ফকির বিরোধী পুরোহিত আছে
সকলে মিলে কহে, পাহাড়া রাখা হবে এই আনা সাগর ঘিরে

রাখা হইবে এক ঘটি জল, এক ঘটি শ্লেফ এক ঘটি জল পাছে
ফকির দল যেন নিতে না পারে, অন্তর্ঘাতমূলক শত্রু মতলব।
হায়রে বোকা সমাজাচার-সর্বস্ব মানুষ!! দৈবশক্তি রুখে দিবে
কী করে!! কি আছে তোমার, টিকি, ভুড়ি, নেংটি ছাড়া? অবয়ব
দেখেছ তোমার আনা সাগরের স্বচ্ছ জলে, কী কালিমা অবয়বে
জমে আছে; ওইসব অপবিত্র মুখের মস্তুর ফল নির্বাসিত!!
জীবন-তুচ্ছক এই সর্বত্যাগী হক ফকিরের সাথে পারে কে বা!
ঐরা স্রষ্টার সরাসরি আর্শীবাদপুষ্ট, সত্যের বিজয় অবধারিত
জঞ্জাল মুছে যাবে, তিনি বুঝি দিবেন সত্য-মানবধর্ম সেবা।

বিবেকঃ

আমি দেখেছি এ বাড়ি ও বাড়িকে নিন্দে
ছোট বড়, বড় ছোটকে কী লাভে,
আমি দেখেছি মানুষ, নেতার ব্যর্থতা নিন্দে,
নিন্দিতে ভালবাসে মুখের স্বভাবে।
রুহের ফায়েজের তরে ছুটাছুটি ক'জন করে,
ক'জন লিখিয়ে নিভৃত-হৃদের চিত্র তুলে ধরে।
আমি মুখে তালা দিয়ে আত্মশাসনে লিপ্ত
চাহি দুষ্ট দুষ্কার্য হতে সরে যাবে।
আমি কি চাই, ধন না মন, নাকি মনের নূরানী,

দ্যুতির পশরে হক তালাবী কামিয়াবি দেয় আনি ।

আমি দেখেছি পরচর্চা পরনিন্দে

গায়ে বিন্দে যার, সে-ই পুণ্য পাবে ।

বিবেকঃ পুনঃ গানে গলা মিলাবেন ।

অংশুমালীর কিরণে সয়লাব ধরা

সে কী তার, হয় সে কী তার

মিছে লুকোচুরী খেলে মনোহরা

ইজ্জত মারে আদি সরলার ।

তোমারে সঁপিয়া প্রাণ,ফিরি বনে বনে

ধূলোয় মিশে স্মরি তোমারে ক্ষণে ক্ষণে ।

অংশহরে ইচ্ছে জাগায় হিংসা করা,

আরবার বার বার বার বার ।

অবহেলা সয়ে তোমায় ভালবেসে,

হারাই আপনায়,সত্য পাই শেষে

তোমারে, যেথা দ্যুতি, দ্যুতি ভরা ।

বিভু একেবম অদ্বিতীয়ম নিরাকার । (চিশতি-২)

ফকিরের সহচর এক, আসিয়া জুটিল ঘাটে
ওজু করিবে বলিয়া, দেখিয়া পুরোহিত হইল
অগ্নিশর্মা, আহারে খেদাইল তাহারে ঠুকিয়া ললাটে,
অপমান! বিষাদের বাতাস ঘূর্ণি হয়ে যেন বইল।
ফকির শুনিয়া সব, সহচর সা'আদীকে বলিলেন,
'বাবা যাও, এক ঘটি জল নিয়া আস আনা সাগর হতে'।
কারামত ঘটি! আনা-জলে ডুবাইয়া উঠাইবা মাত্র যেন
ঘটিল এক আশ্চর্য কান্ড! আনা সাগর শুকিয়ে গেল মুহূর্তে।
নুতন মুরীদ সা'আদী দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য, এলেন ছুটে
দরবারে, অপূর্ব ঘটনা বলে, খাজার কাছে দিলেন জমা
ঘটি! কোথাও নাই জল আজমীরের!, হাহাকার রব ওঠে
পুকুর-ডোবা-নদী-ইন্দিরায় জল নেই নামিল যেন তমা
কি ঘটিল প্রমাদ, বুঝিয়া উঠা দায়, বুঝিয়া উঠা দায়,
হাহাকার পানি শূন্যতার তার দায় নিবে কে, পুরোহিতগণ,
মানুষ, নাকি রাজদরবার, এখন দোষ তার পড়িবে কার গায়,
কেন হলো এমন দশা, মানুষ করিছে হৈ চৈ চিৎকার অনশন?

বিবেকঃ

বাণী-৩

রাজার দুয়ারে যাচি না গো, আমি এমনি ভিখিরি নহি নহি,
সালাতে ডুবিয়া নিজেই সঁপিয়া গো তোমারে কাঁদিয়া কহি।
হাতে রথে মগজে খাটিয়া,
কাজে কর্মে নিজেই সাঁটিয়া,
আশার বাসা বাঁধিয়াছি গো আমি ঐ আশার বোঝাই বহি।
সে আশায় আছো তুমি শুধু তুমি,
ছাড়ি আর সব, ভরসা-মনসিজ চুমি,
চড়ে ভবের স্বর্গের বাগে ওগো ঐ পিশাচের রোদুুরে দহি।

শেষে এলো বুঝি থলের বিড়াল বেরিয়ে, পুরোহিত-ফকিরের
আধ্যাত্মিক যুদ্ধে, বিজয়ী ফকির! এ তাঁর অপূর্ব কারামত,
জনগণ ধরিল পুরোহিতগণকে, বলিল, ‘হাজার নারী শিশুদের
মারিবেন কি জল বিনা’, শুনিয়া পুরোহিতের হইল মাথানত
লোকে লোকারণ্য, জল অভিযোগ এ কি সোজা কথা, সোজা!
সমাধান না হইলে, মানুষ কি মরিবে সব, মানিয়া যাবে?
হয় মরিবে না হয় মরিবে ভুক্তভোগীরা, কী দরকার খোঁজা
পুরোহিত-ফকির বাহাস, প্রয়োজনে সকল মুন্ডুর রক্ত খাবে।

উত্তেজিত জনগণ এসে ধরিল যখন, জনরোষ এড়াতে তারা
ছুটিল খাজার আস্তানা পানে, সারি সারি পুরোহিত
বলিল, ‘এ তোমার কাণ্ড! দরবেশ, শত শত মানুষ মারা
যাবার উপক্রম হয়েছে, তুমি দায়ী, তুমি কর তার বিহিত।
আমরা দেখিয়েছি কথায় চলায় যে ঔদ্ধত্যপনা
তার চাহিতেছি ক্ষমা, হে ফকির দরবেশ করো ক্ষমা।’

বিবেকঃ

বাণীঃ-৪, ১৫

আমি দুনিয়া ত্যাগী ছুটে চলেছি, চলেছি
আমি নিজেরে বলেছি- ঠুকে ঠুকে
নূর চাই, নূর চাই, নূর চাই
কোথা পাই, কোথা পাই, কোথা পাই
আমি দেখেছি অলির কুটিরে
সে নূর অলির বুকে
বেহুঁশ আমি তাকাই, আছি তাকাই
কী বলিব কী, বলিবার কিছু নাই।
শুধু মগ্নতা বুঝি চলেছি যে
খোদার রাহে আছি আত্ম-মগ্ন সুখে। (চিশাতি-৪+১৫)

শুনিয়া খাজা সব, সাঁআদীকে বলিলেন, যাও আনা
সাগরে ঘটি ভরা জল ঢালিয়া আস, অনুপমা
ধরনি দেখুক স্রষ্টার কীর্তি লীলা, করিলেন দোয়া।
ঘটির জল ফেলিতেই আনা সাগর গেল জলে ভরে।
আজমীরের আর কোথাও রইল না পানি-শুন্যতা,
দেখিয়া, মানুষ-পুরোহিত হইল হতবাক, ঘরে ঘরে
বহিল আনন্দ আমেজ, বুঝিল সকলে পুরোহিতের দৈন্যতা
কত যে হইল তখন খাজার ভক্ত কত যে নিল তাঁর দীক্ষা
কত যে নির্যাতিতরা এলো ছুটে, এ মহাপুরুষের পদতলে,
কত মানুষ যে পেলো মানবতা, চরিত্র-সৌন্দর্যের শিক্ষা,
নির্মোহ আধ্যাত্মিক গুরুর ছায়াতলে নিম্নবর্ণ হিঁদু ভীড়ে দলে।

বিবেকঃ

বাণীঃ-১৪

এসো হে সুন্দর, এসো হে সত্য সুন্দর, এসো হে,
আঁধার টুটিয়া এসো, ভুবন ছাপিয়া এসো হে।
তোমারে দেখিবে বলিয়া,
পাথর গিয়াছে গলিয়া,
তুমি এসেছো দিবালোকে, আলোর প্রবাহ রোধে কে।

নাচিছে আরিফ নাচিছে,
তোমাতে দেখিয়া হাসিছে,
মানুষ রাশি রাশি, খুলিয়া এলাহী প্রেমের আঁখি রে । (১৪নংবাণী)
দুর্মতি পৃথ্বি রায়, পামর কোথাকার, দেখিল না ফিরিয়া,
আলোকবর্তিকা বেদম ছুটিয়া চলিছে তিমিরে,
দীর্ঘ পঁচিশ বছরেও লাগিল না গায়ে সুবাতাস, ঘিরিয়া
রহিল অপদেবতার বিষকাটালীর ঝাড়ে, মুখ পশু শিবিরে ।
আজমীর হতে ফিরে তিড়োরির শিবিরে দৃঢ় মনোবলে
লিখিলেন পত্র পৃথ্বি রায় বরাবরে, সম্রাট শাহাবউদ্দিন ঘোরী,
‘দিল্লী ছাড়ো পৃথ্বি রায়, নচেৎ রক্তগঙ্গা বহিবে, না হলে
করো আত্মসমর্পণ, তোমাকে দিলাম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ি’ ।
পৃথ্বি রায় শুনে উঠিলেন তেলে বেগুনে জ্বলি, তাঁর
অধীনস্থ একশত পঞ্চাশ হিন্দু রাজা এসে দিল যোগ
৩ লক্ষ পদাতিক, ৩৪ হাজার হস্তীর বিরাট বাহিনী যার,
তার বিপরীতে ঘোরীর বাহিনী এক তৃতীয়াংশ, অমোঘ
বিধান স্রষ্টার, সত্যের জয় হল নিশ্চিত, পৃথ্বি রায়
পালাইতে পড়িলেন ধরা, আনীত হইলেন রাজ দরবারে,
শাহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর আদেশে, আজ অসহায়
পৃথ্বি রায়ের শিরোচ্ছেদ দেখিল জগৎ, কই গেল দম্ভ আহারে !
খাড়া রায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, উড়িল আজমীরে সত্য নিশান.

খাজার আর্শীবাদে আসীন হলেন সিংহাসনে, কিছু দিন পরে
ত্যাগী আজমীর, শাহাবউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী চলে যান
আফগানে, রাজত্ব দিয়ে কুতুবউদ্দিন আইবেকের 'পরে।

গোড়ামী কাহাকে বলে ছিল না খাজার জানা,
আধ্যাত্মিক গুরু, নবীর যথার্থ অনুসারী, কুশলী মহামানব,
ধর্মাধর্ম বিবেচক সদয় মানবতাবাদী খাজা, যখন হানা
দেন আঁধারে, বিল্কুল চলে যায় তা, মানুষ হয় রুম্ম দানব।
সৌম্য কান্তিময় রূপে, জয় করে শত্রু, ধর্ম নির্বিশেষে বন্ধু
হ'ন সকলের, একি কম কথা! আজমীর হলো পবিত্র
এ মহাপুরুষের পদধূলি পেয়ে, এ নহে কল্লকাহিনি শুধু,
তিনি ঐকেছিলেন মহাভারতে, ধর্মনিরপেক্ষতার চিত্র।
প্রবল মানব প্রেমিক, ইষ্ট প্রেমিক, তাঁর তুলনা তিনি,
ইতর বাঁদর যত ছিল, মাথানত করে আদর্শবান হয়,
পরশমনি যিনি আমরা মানুষ কতটুকু চিনি,
বিশ্ব স্রষ্টার বন্ধু, তাঁর সবটুকু বলা সম্ভব নয়।
এখানে কবিত্ব হারায়, ভুল হয় বেশি, যদি ভুল হয়,
ভয়ে ভয়ে থেকে কী কাজ হয়, অপ্রেমিক হওয়া ছাড়া,
খাজার পথে হাঁটা নিছক নিরর্থক, শুধু সময় অপচয়,
যদি কেহ না হয় পাগলপারা, খাজা প্রেমে আত্মহারা।

হিঁদু এসে দাঁড়ালে সম্মুখে খাজার, বলেন সেই ভাগ্যবান
ছিল যে রাজার দরবারে, হতবাক তারা, একী! খাজার মুখে!
দেখা গেল দিন কয়েক পরে দোষ তার হইয়াছে খান খান
খাজার ছোঁয়ায় হয়েছে সে লোক অলি জেনেছে লোকে।
এক কর্মচারী পৃথ্বী রায়ের এসে চাহিল মারেফাত শিক্ষা,
বলিলেন, এ কঠিন হবে, আগে শরীআত কর তবে;
রেগে গিয়ে রাজার দরবারে নালিশ জানাইল, দীক্ষা
কেন তাকে হয় নি দেয়া! ক'ন রাজা, 'যাও, এবার রবে
তাঁর দরবারে কিছু কাল, যদি না হয় দীক্ষা, ফের এসো
দরবারে দিবো শিক্ষা চরম!' দেখেন খাজা তাঁর রুহানি
চক্ষু মেলি, 'লাওহে মাহফুজে' লিখা আছে নরাধম ও-
সে মুশরিক, আর কি! কি করে পাবে সে আর বরপাণি।
ছুটে গিয়ে রাজকর্মচারী ফের দিলে নালিশ, বলিল রাজা,
'যাক চলে ফকির এ রাজ্য হতে, জানাও তাঁকে এ আদেশ',
কহিলেন শুনে খাজা, 'আহা দিন তিনেক মাত্র সাজা-
লিখা আছে কপালে, তিরোবীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে হবে নিধন, শেষ'।
হিঁদুরা দেব মন্দিরে, চাহিলেন তিনি রুহানি তেজে,
হলো সবাই অবশ সমরুপে, চাহিলেন অন্যদিকে
ফের চাহিল হিঁদুরা অবশ হয়ে রইল পড়ে সারি সারি সেজে,

কহিলেন খাজা, 'তোমরা কি বুকে রেখেছ বহু ইশ্বর লিখে?
এ যে করেছ মহাপরাধ, ফিরে আসো শিরুক হতে' মানুষ
যারা তারা করিল তাই, সুস্থ হইল সবে, অপূর্ব কারামত ।

আজি এই আসরে হইল না বলা প্রিয় মজমা আফসোস,
রয়ে গেলো, কত শত আছে কারামত, কত শত শত,
হইল না বলা, আহা আউলিয়া কুল শিরোমুনির
খাজায়ে খাজেগান চিশতিয়ার রুহানি ফায়েজ মোদের দাও ।
তোমার দরবারে আসিয়াছি, চাহি তোমার গায়েবী ধ্বনির
বরকত, চাহি অবগাহি প্রেম জলে, চাহি সে 'নেয়ামত-মাও'
খাজা গরীব নেওয়াজ মহাসাধক, মহাতাপস, স্বর্গীয় আভা
পূণ্যের প্রতীক, এশুক এলাহির উজ্জল অমর দৃষ্টান্ত
এসেছি দুয়ারে তোমার, পরম প্রিয় খাজা বাবা, খাজা বাবা
তোমার হৃদয়ের নুরে সিনান করে হতে চাই অজর, শান্ত ।
ইছালে ছওয়াব বখশিয়া ছয় রজব ছয় শত বত্রিশ,
হিজরী তোমার ওফাতের দিন, করছি আমরা দোয়া,
মানুষ যেন হতে পারে আসল মানুষ অশেষ
বরকত তোমার, আজি হোক আমাদের বিদায় লওয়া ।
১০/১০/১২ এন.আই.এল জি. ঢাকা (সমাপ্ত)

হযরত শাহজালালের (রহঃ) ঐর জারী

বয়াতিঃ

শুনেন শুনেন ভাই ও বন্ধু শুনেন দিয়া মন
মহান অলির জীবন লইয়া করছি আলাপন
.....সুধীজনে বখশি তসলিম

দোহারীঃ

লও, লও তসলিম ইনসানের পিদিম,
.....সুধীজনে বখশিয়া তসলিম।

বয়াতিঃ

জালালী খতমের নামে, শরীর নায ঘামে,
জারী করি তারি, মশহুর যে সাধনে ভজনে,
হিন্দু বৌদ্ধ ইসায়ী, জানে মোমেন সুফিগণে,
কেহ নাই গো তাঁহার তুল্য, সৃষ্টি সেরা দামে।

.....সুধীজনে বখশিয়া পিদিম

দোয়ারাঃ

ইয়া মুহাম্মদ, নূর মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া
তাঁহার প্রিয় সাহাবীরা আর সকল আউলিয়া।
জানাই ছালাম, জানাই ছালাম জানাই ছালাম, জানাই
পাপী তাপী সব সবার তরে, নাই কোন তকলিফ নাই।

বয়াতিঃ

তার পর বলি ওগো, বলি শোন ভাই,
বেদ্বীন কাফের যাহাই হোক
কষ্ট দিলে, ভাগলে বুক

বিভুর কোলে তোমার জায়গা নাই।
 শেষ্ঠ কাবা দিল কাবা
 ভাসে সেথায় নূরে আভা
 সেথায় যদি আঁধার থাকে কোন রক্ষা নাই।

দোয়ারীঃ

কোন রক্ষা নাই।
 শেষ্ঠ কাবা দিল কাবা।

বয়াতিঃ

নিজের চরকায় তেল দাও,
 তারপরে ও দিক তাকাও
 বুদ্ধি বিবেক আসল কথা, আমরা বলে যাই।

দোহারীঃ

আমরা বলে যাই।
 শেষ্ঠ কাবা দিল কাবা।

বয়াতিঃ

ইহজনম পর জনম দুটোই তোমার হাতে,
 ইচ্ছা আর কম ফলই পাইবে হাতে নাতে,
 তোমার ক্ষতি তোমার ক্ষতিই, কিছু করার নাই।

দোহারীঃ

কিছু করার নাই।

বয়াতি+ দোহারীঃ

জানাই ছালাম, জানাই ছালাম, জানাই ছালাম, জানাই
 পাপী তাপী সবার তরে কোন তকলিফ নাই,
 হেই, ইয়া মুহাম্মদ, নূর মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ ইয়া,
 তাঁহার পিয় ছাহাবীরা, আর সকল আউলিয়া

বয়াতিঃ

পাপকে ঘনা করিও ভাই পাপীকে নয়,
 পবিত্র পরশে পাপীর মন যদি কর জয়,
 তোমার মত ভাগবান আর কে বলো হয়।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ,
সষ্টি করে মনের খেদ,

কপা করো গরীবে,
না পারিলে সরিবে,
বলিবে হে ভাই,
কিছু পারি নি তাই,
আমি বাখাতুর,
বলিলে শান্তি পচুর।
তার পরে যে জন
পা বাড়ায় ক্ষুদ্র পাপে,
হাশরের মাঠে
দেখিবে আঁধার সেই শাপে,
এয়ে অমূল বাণী
জানি, সেই হযরতের, জানি
তাঁহার রুহানি ফায়েজ
পেয়ে বাড়ুক ইমানী তেজ
এই অধমের,
হযরত শাহজালাল, হযরত শাহজালাল
যোগ নই যোগ নই তোমার
একটি পশমের।

দোহারীঃ

যোগ নইযোগ নই তোমার একটি পশমের।
জানাই ছালাম, জানাই ছারাম, জানাই ছালাম, জানাই
পাপী তাপী সবার তরে কোন তকলিফ নাই,
হেই, ইয়া মুহাম্মদ নূর মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ ইয়া,
তাঁহার পিয় ছাহাবীরা আর সকল আউলিয়া

বয়াতিঃ

ইয়া মুহাম্মদ, নূর মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ ইয়া,

তাঁহার পিয় ছাহাবীরা আর সকল আউলিয়া,
জানাই ছালাম, জানাই ছালাম, জানাই ছালাম জানাই,
পাপী তাপী সবার তরে, কোন তকলিফ নাই।
দোহারীঃ কোন তকলিফ নাই।

শেষ্ঠকাবা দিল কাবা

বয়াতিঃ

মাফ করিও ভুল হইলে, মাফ করিও তুমি
তোমার নামে ধন হইল সিলেট শহর, সিলেট ধন তুমি।

ছড়ার বই-শিশুর কাটা কাল (২০০৩-২৩)

শিশুর কাটা কাল

আপন মনেই ঘুরছি আমি
ধরতে ঘাস ফরিং সেই,
সকাল দুপুর সন্ধ্যায় নামি,
নিবাস-বিছরায় ছুট ধেই।
কী সুখ খেলে দুই ভাইয়ে,
ছোঁয়া-ছোঁয়ি করি ছুটাছুটি,
শান্ত হয়ে ফিরি যে নাইয়ে,
ভিজা ঘাসে পিঠ ঘোটাঘুটি!
দুধ-ভাতের নলা তুলি দে'
আম্মু বাটি করে লয়ে, লয়ে,
অবশ ঘুম কেড়ে তুলে নে',
স্বপ্ন আসে রাজ-কুমার হয়ে।
এমনি করেই কাটাই কাল,
আমারি বাল্যকাল আনমনে,
কেউ নিও না কেড়ে ভোগ্য,
ভুবন আমার, বলি সর্বজনে।

১/৮/২২ কিশোরগঞ্জ।

স্মরি! আত্মা জুড়ায়

এক আল্লাহ অসীম রূপে কাজে বিরাজমান,
এক তাঁহার আসল রূপ, একই তাঁহার শান,
আমি ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে হায়াতে হয়রান।
নিঃসঙ্গ নিশীথে কিংবা ভাঙ্কর কর কাঠফাটা,
মেঘমালা ভাসমান, বজ্র নিনাদে চমকায় ঠাটা,
প্রশ্নবানে উত্যক্ত কর কে হে, শক্তিদাতা সবটা।
কানে কানে বলে দিয়েছে কে হে, অনুচ্চ স্বরে,

যখন শশী হয়ে আর কোন গ্রহ, ছায়াপথ ধরে,
উড়ছিলাম ও উড়ছিলাম কুল পাইনি যাই মরে।
আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে যাই যেতলে হারিয়ে,
কত যে সৃষ্টি হেরি আনমনা, একা ক্ষণ দাঁড়িয়ে,
বিস্মিত আরও হাল, পাতাল-মেরু যাই ছাড়িয়ে।
শেষে ক্লান্ত আমি বিমুচ্ছিলুম উঠি পর্বত চূড়ায়,
সর্বদর্শী ঈশ সামীউল বাসীর রহি তার গোড়ায়,
অতুল-অকল্পনীয়, স্মরিয়া তাঁহারে আত্মা জুড়ায়।

৩/৪/২০২২, ষোলমারা

আত্মার রোগী

স্রষ্টার অদৃশ্য উপস্থিতি বান্দার আস্থায় আনা,
নেত্র বন্ধ করে তাঁরে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম মানা,
আর কেউ শরীক নেই, তাঁর অসংখ্যক গুণে,
তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ; যাও তুমি শুনে,
আয়াত সুরা পুত ঐশী ফোরকানই, ত্বাকওয়া
তোমার,তোমায় এনে দেবেই অতুল্য মেওয়া।
প্রচন্ড কর্মশীলতা তোমার ভাগ্য বদলে দেবে,
সবর, যোহদ, অধ্যবসায় আর নিষ্ঠা সিধে নেবে
তোমার কাংখিত আশার আসনে, বিচার দিনে
বদলা পাবে বেঈমান মুশরিক অসুর মূল্যহীনে।
যার ফিরে নফস খাতিরে নশ্বর রঙিন বসুমতি
ধরে আঁকড়ে পদতল, আঁজলেই ভরে মন-মতি।
ঢেকুর তুলে তৃপ্তির, ভাবে পেয়েছে বুঝি সুখ সব,
আহারে! এষে সামান্য অবকাশ বলেন, মহানরব---
গায়েব-আল্লাহ! এরা কি কেউ শুনে না, শুনে না,
মৃত্যুশেষে পরকালের আশা-ভয়ের স্বপ্ন বুনে না,
কি পাবে তথায়! ইবলিশের সে পাতক সহযোগী,
খোদা আজি চাই পানাহ্ তোমার, আত্মার রোগী।

১৮/৫/২২, মীরপুর, ঢাকা

ঈমান

ঈমান হইল চা-চানাচুর ভাজা
খেলনা পুতুল, দাদার হাতের লাঠি,
পিড়ামুখের ডালিম তলার নূর
চাইলে পাই সত্য উঠে 'পরে হাঁটি।
দিনে দিনে কাদা মাটি হয়তো,
আস্ত এক শানকি পোড়া মাটি জাল,
যায় শিরকি-কুফরীর ঐ ভয়তো,
খোদার খোদাই মনে, আয়াত ফাল।
কঠিন হাশর এশকে টানে আনে,
দুধভাতে সাধে জিকির, আরশেদীন,
গায় গতরে বাড়ে শিশু মনজ্ঞানে,
চষে বেড়ায় স্বপ্ন বুনে স্বর্গ-সুখরঙিন।

৯/৩/২৩, ঢাকা।

বনবাদাড়ে়র শিশু

বনবাদাড়ে় পড়ে় থাকা, বনবাদাড়ে়
স্বভাব-সংযোগ ঐ শিশু, ঐ যে শিশু,
স্বভাব-জ্ঞানে জ্ঞানী জানি, যে জানি
আপন ভুবন রচায় পিপাসু সম যিশু।
ঝড়-ঝাপটা রোদ্দোর শীত কনকনে
টিকে আপনি হই শক্তিধর বলীয়ান,
অজেয় উনি হয়ে ওঠেন স্বভাবরাজ,
মানবরাজ, দানবরাজ নবী সুলেমান।
মায়ের আঁচল ধরা যে শিশু কাপুরুষ,
সে পিছু হটে, পিছু হাঁটে চর্বিত চর্বন,
বিভু-আশীষ খুঁজে সে কী সে পুণ্যার্থ?
খুঁজে না, কে কী করল কে কী অর্পণ।

১০/৩/২৩ ঢাকা।

মা-শিশু যেন ভব-শশী

মা ও শিশু যেন ভবের নেত্র মনি পুটলি শশী,
বৃদ্ধ-তর্জনী-মধ্যমার ধরা দু'ধার ঐ অসি-মসী,
মনে যদি সুর নাচে হাত লাগলেই তাল আসে,
ভবে ফুল ফোটে যদি মাতৃ কোলেশিশু হাসে।
মদনে সোহাগে জড়াজড়ি ধরে, যেন কৃষ্ণলীলা,
অনঙ্গে মাতে, ঈশে ভক্তি-শুকরে, অনিন্দ্যসুশীলা।
নবজাতক ধীরে ঐ হাঁটি, হাঁটি পা পা করে বাড়ে,
দৈবগুণে! আপন মনে মাতৃ মায়ায় অজ্ঞাতসারে।

শিশুর-তরেমাতৃকোলে বুক-দুখে যেন স্বর্গ নামে ।

বাবা যেন মা জননীর পাহাড়াদার সম্ভ্রম-রক্ষীকেউ,
চোখ না লাগে, আসে নাকো ঘরে ইজ্জতহরা ফেউ,
ঐ একটু খাইয়ে দিয়ে গতর ঐ কে বাড়ায় কে ঐ,
হাঁ তেল পানি দেয়, বস্ত্র পরায় কে, ভালে টিপ লই ।
অসুখ-বিসুখতায় কোথা আমার হয়রান বদ্যি খুঁজে,
প্রাণান্ত হয় অষ্টপ্রহর আমায় বিদ্যে দেয়া বুঝে বুঝে,
মা বিনে যে ভাবতে পারি নে কিছু আর, কিছুই আর,
বাবা বিনে দূরে ভাবি স্বপন দেখা ভার, দেখা আমার ।
দু'য়ের মাঝে ঈষ্ট লুকায়, শান্তি বরি ঈষ্ট যে ধরাধামে ।

১১/৩/২৩ কিশোরগঞ্জ ।

আন্ত মানুষ

বালখিল্যপনায় বালকেরই শোভা, মানায়,
তা দেখে করে অনুকরণ, খুশি হয় ছানায় ।
খিলখিলিয়ে হাসে, সে বাহার করে নানায়,
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, ভর দিয়ে দু'ডানায়,
অনঙ্গ নাকি পরিহিত যবনিকা পর্দা টানায়
নই তো আমি শশব্যস্ত, গৃহকর্মে গৃহখানায়,
পুষ্টি দিয়ে, তুষ্টি দিয়ে, দিনে দিনে বাড়ায়,
আন্তে করে জ্ঞানে গুণে নিজ পায়ে দাঁড়ায়,
এখন বটে সবাই খুশি, সব কিছুটা পারায়,
তাহার নাম প্রীতি নাকি নাম খোসা ছাড়ায়,
উঠে গেছে গুণ পূজারি, গুণ চর্চায় হারায়,

বালখিল্য উবে গেছে, অনুসরণ না মাড়ায়,
পাই কিশোর আস্ত মানুষ নিজকে জানায়,
নিজকে জানলে, ছুটেরে আত্মতত্ত্ব হানায়।

১২/৩/২৩ কিশোরগঞ্জ।

জীবন মানে

রাগে প্রহারে সব শিশুই আত্ম হারায়,
অযথা ধমকে তার ভয়, শংকা বাড়ায়,
আদরে শিশু মনের শক্তি উঠে খাড়ায়,
হিংসায় হিংস্র করে, দুর্বল গতির মাড়ায়,
রাগ কাংখিত সুযোগ হতেঠিক ছাড়ায়,
দিনের শেষে ফিরে চায় প্রভু পানে----
আবার জলকেলি, হংসে ফোটে সুখভাষা,
কেউ বুঝে না, তা শাস্তি দানে মনে খাসা,
মুখে আসা চেষ্টামেচি, ছুড়োছড়িতে ঠাসা,
নেয় না টেনে নেয় না, তরঙ্গিনী সর্বনাশা,
তরঙ্গ মিছে ভাসিয়ে নেয় কি সকল আশা,
গুণ না আসলে, উবে যাবে সব সুখ-হাসা,
চিরদুঃখীর পোষাক পরা কিশোর গাঁ-চাম্বা,
আরকি পাবে, আর কি জীবন মানে।

১৪/৩/২৩ গুরুদয়াল কলেজ।

মানবতার বায়না

হাত আছে চোখ নেই, পা নেই, পিঠ গুজে
বস্ত্র মত বসে থাকে, কোথা গোসল ওজো!
সবে যখন নাচন খেলে, খেলে বউ ছয়গুটি,

বিস্ফোরিত চোখে, অবাক মনে ঠাওর করে উঠি ।
মিটিমিটি হেসে ওঠে, রতন সোনা প্রতিবন্ধী এই,
কেউ কষ্ট না দিলে, পায়না মোটে কষ্ট যে সে-ই ।
কেন পাবে, পরের সৃজনী ভেদ, কে বুঝে গো কে,
সহচরী কেউ হবে না কেউ, সবাই মুখ ফিরায় যে ।
একজনই শুধু চায়না যেতে, চায়নারে, চায়না রে,
তার নামই কি মানবতা ! ধরেইআপনি বায়নারে ।

১৫/৩/২৩ মীরপুর

দিব্যতার খনি

আপন মনে গড়ে কে গো বালুচরে,
সারা বেলা খেলামেলা তাসের ঘরে ।
মাতৃ বুকে আনমনেকে পড়ে রহে,
দুধভাতে, তেল পানিতে আদর লহে ।
সে আমার সোনা মনি,
আশার আলো সে তো আমার এই,
চোখ জুড়াতে চেয়ে থাকি হারা খেই,
ভালো থাকি, সুস্থ থাকি রহি সুমনেই,
বাজে কাজে লিপ্ত নহি সত্য দুর্বলেই,
শুনি সত্য বাণীর ধ্বনি,
একটুখানি শিখে, শিখে অনেকখানি,
শিখছি আমি রক্তগড়া ধাত বাঈমানী,
পরহিতে ব্রত থেকে মজে আত্মদানি,
হই পাহলোয়ান অনেক জ্ঞানে জ্ঞানী,
পাই খুটে দিব্যতা-খনি ।

১৩/৩/২৩, কিশোরগঞ্জ ।

আত্মার দেহ

দুধের মাঝে ঘি আছে,
ঘি যায় না তো দুধে দেখা,
দেহের মাঝে সুখ আছে,
দেহের মুখই আত্মায় ঠেকা ।
মানুষ মানুষই থাকে গো
যন্ত্র বটে, আত্মাও টিকে রয়,
যন্ত্র কখনও মানুষ হয় না,
যন্ত্র, বিবেক আবেগ বিনে বয় ।
আত্মার জোড়ে মানুষ চলে,
দেহের কী'বা করার রহে গো,
আত্মা চলে গেলেই নৃ পঁচে,
রিপু পুড়ে পুত হৃদ দহে গো ।
আত্মা চলে উর্ধ্বলোকে যে,
দেহ মাটি হয় মরেবলে তাই,
আলমে বরযথ হতে পুনশ্চ,
মনু উঠবে জেগে, হাশরে ভাই ।
দেহ দুনিয়া আমল লই উঠি
ঠেকে গো যথেষ্ট ব্যবহার নয়,
দুনিয়া-দৌলত ফোরকান লই
বাজ্জিমান বাঁচো পাই খোদা-ভয় ।

মীরপুর ৯/৫/২৩

সাগরের রূপ

সফেনউর্মি ঐ আছড়ে পড়ে,
ওই সমুদ্র সৈকতে বালুর চরে ।
অবিরত সোঁ সোঁ ধ্বনি কানে,
শুনি লাগিয়া মনে শান্তি আনে ।
বিকাল গড়িয়ে এলে ঐ সূর্যটা,
আদরে জড়াই ধরে জলের গা ।
গভীর তিমিরে ঘুমায় ঐ সব,
টুটে ঐষে কোলাহল কলরব ।
শুধু জল আর জল আ ! মরি,
বৈচিত্রময় বিনুকের ছড়াছড়ি ।
কত মানুষই নোনা জলে নায়,
ছবি তোলে সাথে উদ্যোগ গায় ।
সবুজ বিটপের ফুলমালা পরে,
পয়োথীর তীরে ডাকে সাদরে ।
বৌদ্ধ মন্দিরে মুক্তি সদা মাগে,
ভিক্ষু সূর্যোদয়ের আগে আগে ।
প্রাচীন প্যাগোডায় বৌদ্ধ স্মৃতি,
রক্ষিত যতনে রক্ষিত যথারীতি ।
সাগর তীরে ঐ ছোট্ট যেই শহর,
গিজ গিজ করে ঐ হোটেল ঘর ।
মনে লালিত সুখ স্বপ্ন সুখ রঙিন,
কত মনুজে আসে থাকে দু'দিন ।
দেখে ঘুরে কাশফুল সব সী বিচ,
ক'দিনে মন হয় মন সুস্থ এনরিচ ।
শান্ত সাগর যেন শান্ত ভদ্র সমাজ,
উত্তাল বারিধি সন্ত্রাস সম নিলাজ ।
কি জানি কখন গোলায় পড়ে মরি,
সাঁতরে তলাই সাগরে ভাটায় পড়ি ।

১৩/২/০৩, করমুলী ।

সুন্দরে, অসুন্দর

পলাশের লালে,
মিশেছে মোকদ্দমা ক্রোধ,
লেখকের ভালে,
এসেছে যে হাহাকার বোধ ।
ক্ষুদ্র দুর্বা ডগায়,
সতেজ শিশির যেন অশ্রু,
চেনা বড় দায়,
বক ধার্মিকের সুশ্রী শাশ্রু ।

কাবু করে ফেলে,
দূরন্ত ছুটে চলা মন চলা মন,
কাচে কালি ঢেলে,
হারায় আঁকা স্বপ্নের ছবি ধন ।

আলোর মেলা, ৯/৩/০৩

কুসুমের বসবাস

জমিন হ'তে অসীম গগন অবধি
কেবল বাড়ছে দাবানল চেউ,
প্রশ্নবিদ্ধ কবি আহত দাবদাহে,
ক্রোধবহি নেভানোর নেই কেউ ।
উলানে এখন দুধ নেই নির্যাতন
খুন চুষে খায় মানব সন্তান,
লোভ শিশির জমে উষা-কপালে,
দিনভর শুনে রেষারেষি গান ।
ফুরফুরে মেজাজ মাকড়সার জালে

আটক পৃথ্বি সয়লাব সন্ত্রাসে,
তারা হয়ে ফোটে, মিট মিট হাসে
এক বিকশিত পুষ্প আকাশে ।

২১/৩/০৩, করমুলি ।

গরীবের আশা

দিবানিশি মন চায়,
ভাল খেতে, ভাল পড়তে,
বড়লোক দেখে হয়,
মন বলে জাহাজ চড়তে ।
হাতে কাচি মুখে দাঁড়ি,
উদোম শরীর-রোগা যার,
বেড়া নাই ছোট বাড়ি,
যার গোনা যায় কটা হাড় ।
আশা ফোটে ঘাস ফুলে,
পায়ে পিষে নিত্য চলা যায়,
দামী ফুল টবে দোলে,
তার নাগাল পাওয়াই দায় ।

৯/৬/০৩, করমুলী

দিনমজুরের দিন

ভাবনাগুলো এলোমেলো
যাচ্ছে সময় কঠিন,
কামলা বেটার বাচ্চাটা
নাচছে তা ধিন ধিন।
আবেগগুলো দিশেহারা
বিয়ে খুঁজে পাচ্ছে না,
ছিন্নমূলের দিনগুলো যে
সহজে আর যাচ্ছে না।
কাজের খুঁজে ভোর হলে
যাচ্ছে পথে আর বাড়ি,
কাজ না পেলে এই দিনে
ঠিক জ্বলে ক্ষুধায় নাড়ি।

১০/৬/০৩

করমুলী কিশোরগঞ্জ

মেকি

এখন কেমন সময় বল দেখি, দেখি,
হালে সব কিছুতেইগো চলে মেকি।
শীতকালে উদোম, গ্রীষ্মে লই কাঁথা,
দিনে তাপে মরে, রাতে ধরে ছাতা।
কাঁদা চেপে হাসে মরা নরের প্রাণ,
শুঁটকি চেটে পাই, কাতলের ঘ্রাণ।
সব কিছুতে চলে নকলবাজী হয়,
স্বভাব দোষে নাচে সাগর ঘূর্ণিবায়।

বাড়ে উলটপালট হইছে চারিদিক,
সত্য ফেলে ভাবি উলটোটাই ঠিক।
রঙ মিশিয়ে বলি আমিই মহাশাদা,
বাহিরে ফিট্‌ফাট্‌ ভিতরেশূন্যদাদা।

১০/৬/০৩, করমুলী কিশোরগঞ্জ

কোন ব্যাপার না,
ব্যাপার হলো যে---

কোন ব্যাপার না,
অনাসৃষ্টি নৈমিত্তিক কাজ,
কোন ব্যাপার না,
জমিদার পাহাড়াদার রাজ,
কোন ব্যাপার না,
উদরপূর্তি ভুড়িভোজ অর্থ,
কোন ব্যাপার না,
মানা না মানা ভুবনের শর্ত,
কোন ব্যাপার না,
যে ভাবেই দিন যায় যাক্,
ব্যাপার হলো যে,
স্রষ্টায়, আত্মায় বাঁধা থাক্।

৩০/৮/২০২২, কিশোরগঞ্জ

উম্মাদ

ওইলয়ে বাচ্চার খাবার,
বুড়ো মজা করে সাবাড়,
দেখে চেয়ে দেখে ওয়ুবা,
হয়ে থাকে নির্ঘাত বোবা,
শিশু সম নেই যার দাঁত,
মাড় করে খায় সব ভাত,
বুড়ি, কল্লনায় চাঁদে উড়ি,
স্বপ্নেই তেপান্তর, ঘুরি ঘুরি,
চুমু দেয় প্রিয়তম নাতিরে,
কোলে ধরে লেহে সাথীরে,
যেন পায় খুঁজে স্বর্গীয় সাধ,
নাতি বিনে দাদী উম্মাদ।

২৭/৮/২২ ঢাকা

স্বপ্নধন

ওই রোধিরে নাচেচেরে, শিরায় শিরায় নাচন,
যখন শুনি নাড়ি ছেঁড়া ধনের আধো বাচন।
দা-দা-দা-দা, মা-মা-মা, দা-দা-দা-আ-আ,
তা-তা-তা-দা, বা-বা-বা, তা-তা-তা-বা-বা।
চাওয়া, চাওয়া হেরি, জুড়ায় এইতৃষিত প্রাণ,
বেভুলা মনে গাহিয়া উঠি, মমতা ছোঁয়া গান।
বুলিছে মাথা, খামচে ওই, শিশুর নরম হাতে,

গা ধরিয়া নাচে, মেহনত নাই মন রহে মাতে ।
আত্মজা আমার কোলে, কুল রাখিবে গো কুল,
পরিচ্ছন্ন মন মাথা, সুন্দরম বটে দে দে দোল ।
নয়নে নয়নে রাখি, বিদ্যা আনি দিই রতি, রতি

জীবনকাঠি আমার, সেই স্বপ্নধন, ছার হীরামতি ।

১৭/৩/২৩ মীরপুর

কে কি করে

ক্রীড়া করে পেশী শক্ত, সংস্কৃতি গড়ে মনন,
বুদ্ধি বৃদ্ধি করে বিদ্যায়, উর্বশী করবে খনন ।
আচরি বিষয়-সুবিধে, করেই ভুবন-মুখ আর,
আত্মিক আচার হাঁকায়, ঈষ্ট দয়া-নিশ্চয়তার,
শিশুরে এনে টেনে, শুদ্ধ চর্চায় ভালো বসতে,
খেয়াল রাখতে হবে, যাতে না মিশে অসতে ।
মনু সন্তান মহামানব, হবে জয় গো সততার,
বৃথা ক্ষণ করি পার, অমনুজের জীবন-অসাড় ।

৬/১১/২৩ মীরপুর

ভঙ্গুর-মন ও নদী শিকস্থী

শিকস্থী, শিকস্থী, নদী শিকস্থীর ছাওয়ালা,
খুঁজে ফিরে বৈঠা ডিঙ্গি, ধরে কাটাহাল।
মৎস্য তুলে আড়তে, বিকায় ভারী সস্থায়,
চাল-ডাল-নুন আনে ঘরে রয় ক্ষুধাবস্থায়।
ডাকে ‘মা’রে ডুব দিতে যাওয়া নন্দ দাস,
নদীপাড়ে কিশোরী যথা শেফালীর বাস।
চোখ ঘুরায়, এলোচুল নজর গোলগাল মুখ,
এক পলক দেখে ফেলে, নন্দার মনে সুখ।
প্রতিদিন এ করেই, দিনে দিনে গা বাড়ে,
যুব-যুবা হয়েছে ওরা, যাবেই এবার আড়ে।
দুর্নিবার আকর্ষে, এ-ওরে মিলিতে চায়যে,
কী করে কহিবে বাপে, মায়ে মিলি’ সায়যে।
শুনে পরিবার দু’জন্য রেগে হয় একাকার,
ভেঙ্গে গেলো জোড়া, যথা নদীর ভাঙ্গে পাড়।
মন ও নদী শিকস্থী মিলে গেছে ভঙ্গুর পথে,
জীবন-মন আজি দিশেহারা, চায় নদী হতে।

২০/৩/২৩ মীরপুর

ক্ষেতমজুরের মেয়ে

এই ছেঁড়া কাঁথা বাঁশের মাচায় নব জাতক কন্যা,
মা-বাপের নেত্র জুড়ায়, উড়ায় মন কন্যা অনন্যা ।
কী করে অমন করে ক্ষেত মজুরের ছিন্নমূল ঘরে,
উড়ে এসে শিশুপরী ফুল ফোটে ওই পড়ল ঝরে ।
বেড়া আছে, দেউড়ি নাই যে, সে যায় চলে দ্বারে,
ডাক দিয়ে যায় মলাই দাদা, উঠিছ নি বেলা বাড়ে ।
মজুর নেবে বড় মিঞা, শাঁসায় পেয়ে কালায় হায়,
বাদ দিয়ে দেয় অবলীলায়, দেৱী তাঁর হলে রাস্তায় ।
এবার আমি আসি কন্যা শিশুর চোখে পড়ার গল্পে,
পাঠশালা যাওয়ার পথে, উঠোন হতে দেখছি অল্পে ।
খুবলে খায় মনের তৃষায়, অক্ষি ধাঁধায় কেউ কেউ,
কুকুর ছানা পথ পাহাড়ায়, দেখেই করে ভেউ ভেউ ।
ভয়ে ডরে কেউ করে কেউ না একটুও রেহাই যে,
ছোট থেকে চায় যেহতে মেয়ে-বাপের বেহাইয়ে ।
হাজারে একটা হয় মানুষ, বাকীরা যায় যে উচ্ছন্যে,
কারণ নিচুতলা, পা দিয়ে গাড়ে না কেউ, সে কন্যে ।

২১/৩/২৩ মীরপুর

বিষদাঁত

যখন বিষয় পাইনে, পাই শুধু যে চাই দেখতে,
করবে খামার শ্রমিকে, চাই এই দিকে লেখতে।
লেখব কি গো লেখব না, কি'বা উপলব্ধি করে,
কল্পনা অল্প না, একেবারেই নাই ঘটে স্বপ্ন মরে।
তাই টাকা হাতে বড় দরকার উপোস না হলে,
রোগা মায়া, শোয়া বাজান, এ সংসার নাহি চলে।
থমকে গেছে, থমকে যায় রোজ থাকি অনাহারে,
সূর্য হলো উদয় আজি, আঁধার গেছে টুটে আড়ে।

স্বপ্ন এবার এসেছে, আছে দু'মুঠো অল্পের আশা,
যদি দেন সরকার শেখ হাসিনা, দিয়ে ভালবাসা।
যেমন দিয়েছেন রোহিঙ্গারে, দিয়াছেন ঘর তুলে,
শিক্ষা, খাবার চাষবাস স্মরে বাবারে, অন্তর মূলে।
যে আশায় স্বাধীনতা, সংগ্রাম যুদ্ধ বীর শাহাদাৎ,
উল্টো শুনি আঁতকে উঠি, ভেঙ্গে ফেলি বিষদাঁত।

২২/৩/২০২৩ মিরপুর

উচিৎ শিক্ষা

ব্যবহার যে জানে না ভর্ৎসনা তারে, কুলাঙ্গারে,
বয়স ভারে ন্যূজ্য, জ্ঞানে খাট, বটে একেবারে।
এক কবি গিয়াছিল অতিথির সাজে, এক দ্বারে,
দ্বার রক্ষী, অচেনা ছুঁতায়, আটকায় মান কাড়ে।
ধরে রেখে ঝাড়ে অসহ্য কুবচন, ফিরিয়া তাই,
চলে আসে ঘৃণা ভরে, মনে মনে বড় কষ্ট পাই।

ঘর আলো বালমল, পিড়ামুখ হলে পিছলে হলে,
ভাঙ্গে পা অকালে, পিছলে সাফ ধুয়ে নাও জলে।
উচিৎ শিক্ষা মেলে, চাকুরীচ্যুৎ করা রক্ষী-শাস্ত্রি,
শেখ সাঁদী সম মনে রেখো, জানাবে তব হাঙ্গি।

২২/৩/২৩ মুনিপুরীপাড়া
ফার্মগেট, ঢাকা

বাতেলে না বাতেনে রই

পাগল ছাগলেরে কে খাওয়ায়-উদ্ভিদ প্রাণিরে,
খায় যে জানে না, জানে রাবুল আলামীন যে।
শুধু মনুজে খুঁজে বেড়ায় কেন যে অকারণ তা,

মূল কাজ হওয়া উচিৎ রব-রেজা কী জানা যা।
দৃঢ়-পণে বাধা টপকে, রব-রেজা করো অর্জন,
অহেতুক অকারণ শৈশব-কৈশোরেকরে বর্জন।
হয়ে উঠে একদিন মুত্তাকী, আলো-দিশারী হক,
শয়তান রবে কোথা, ফোরকান লই ব্যর্থ পাতক।
সহীহ্ কাজ ভুল বুঝা, কে বুঝায় বুঝে নালায়েক,
ঘুরে দাঁড়ায় তওবাতুননছুহায়, রেজায় লাঝায়েক।
গাহি তারগুণাগুণ অনুজ যে, সে আমি অনুজ এই,
নায়েব-রসুল না পরিহরি, বাতেল না, বাতেনে রই।

২৩/৩/২৩ মিরপুর

রমাদান যোগে

আজি আসিয়াছে রমাদান রহমত খোদার,
সদাই শয়তানে ঝগড়া চেষ্টা করে উজাড়।
রাগ-বশে অনলে ঘটাহুতি বাড়িয়াছে বহি,
চাপি রাগ-হুতাসন, মনুকুল হইবে যে ধন্য।
এখন কী হইবে যে, সাধু তো হইলাম না যে,
সাধারণ্যে গণ্য শির হইল না উঁচু গুণ-তাজে।
কেগো উপুসের কলি দিয়া ফোটাবে পদ্মফুল,
সুঘ্রাণে ভাসিবে ধরা, ওগো স্বর্গ উহার সমতুল।
দিয়া কানে তুলা, না শোনা ঝগড়া-প্রসূত কথা,
উপুসার্জিত দমন গুণ-কাম-ক্রোধ ষড়রিপু যথা।
আনিবে রমাদান শৈশব কৈশোরে শান্তি স্বর্গসুখ,
রমাদানের মহাপ্র মহামানবতার নরাধম নাশক।
ফিরে যাবো সত্য যুগে, রাসুলের বাণী ধরে ধরে,
সিদ্ধি লভে রমাদান যোগে, কাংখিত আনি ঘরে।

২৫/৩/২৩ মিরপুর

১ম রমাদান

ইফতার

বেদুইন শিশু ইফতার মুখে গো নাচে,
বাঙ্গালী বালক, ইফতার উড়ের কাছে,
গো গ্রাসে মুখে তুলে, বাবারে কটা সাধে।
ইংরেজ কিশোর অবাক রয় চেয়ে রয়,
হিন্দু দেখে বুঝে না, না বুঝে নয়, ছয়,
মনুজের এমন ব্যবহার, হাসে কেউ কাঁদে।
উপুস-নফস সাপে নেউলে মিলে যথা,

এক থাকিলে আর থাকে না অন্য কথা,
সতীনে সতীনে অনাদরে খালি জল রাঁধে।
রমাদান ছিনিয়া ত্যাগের মহিমা আনে,
হৃদয়চারী হৃদয়হীনে মরা বলেই জানে,
নাথ উপহার রমাদান, গায় কেউ নির্বিবাধে।

২৫/৩/২৩ মিরপুর

জন্মপূর্ব ন'মাস, ন'দিন

ডাক্তার! পেটে আসিল কী কন্যা পেটে,
আর গুরু হল মায়ের যত্ন খেটে খেটে।
শিশুর মগজ ও হাত পায়ের গড়ন গড়া,
ঔষধপথ্য, পুষ্টি খাবার আছে নিত্য ধরা,
তিন গ্রাম পাঁচ গ্রাম হিসেব কষা তা যত।
মায়ের চলাফেরা, উঠাবসা সতর্ক রয় তত।
বাবা এসে খেয়াল করে, অস্ফুট-মাতৃ আশা,
কন্যা আছে সহীহ্ ছালামতে পেটে টাসা।
ন'মাস ন'দিন আজি ভেঙ্গেছে গো পানি,
ধরাধামে এসে গেছে কেঁদে কেটে জানি-
ফুটফুটে শিশু, নবজাতক এক শিশুকন্যা,
মেয়ে হইতে মা, শেফালী মা রূপে ধন্যা।
দায় তার কী! বিদ্যে তা আছে নাকি নাই,
তার 'পর দাঁড়ায় বেড়ে গুঠা, পুরু ভারটাই।
নবজাতকের বাবা নাকি এক-, মা তিনগুণ,
মান-দায় যথাতথা, পান হতে খসে না চুন।

২৫/৩/২৩ মিরপুর

কিস্তুত দেহের বিক্ষত জান

আমার হাত আছে, পা আছে
মুখ আছে, মাথা আছে দু'কান,
নাক আছে, চোখ আছে, আছে
হতচকিত বিক্ষত দ্বিখন্ড জান।
এ জান পারে না দাঁড়াতে আর
পারে না খেতে, কিছুই শুনতে,
উদর বাঁদর ঢেলে দেয় সবদিক
পারে না আধ্যাত্ম জাল বুনেতে।
আমার শেকড়ে ভূত, কান্ডে ভূত
ডালে ফোটা কদাকার হিয়া-ফুল,
অদ্ভুত যন্ত্রের মত চলিয়াছে দেহ
কিস্তুত ছায়া বিঁধাইয়া অপরে হুল।
ইহতে চাহিয়াছিলাম স্থবির স্থাণু
খাইয়াএ অর্থের দৌড়ানোখাইয়া,
খৈই হারাইয়া ফেলি উদভ্রান্ত যে
অস্থির চলিয়াছি কোথা গো ধাইয়া।

১২/১/১২ কিশোরগঞ্জ

বন্দি কাকাতুয়ার দীর্ঘশ্বাস

ছোট গল্প ৪

যৌবনের হাহাকার

পরের কথায় কান দিতে নাই। কত এই নীতি বাক্য শুনিয়াছি। আহা! কে শুনে কাহার কথা। এক কান দিয়া শুনিয়াছি আর এক কান দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। তাহা না হইলে অমন জঙ্গলে আসিয়া থাকা কেন। গত দুই বৎসর হইল আমি আমার আত্মীয়ের পরামর্শে শহর হইতে প্রায় দুই কিলোমিটার পূর্বে আসিয়া আবাস গাড়িয়া বসিয়াছি। যে উদ্দেশ্যে দূরে আসিলাম, সে উদ্দেশ্যে সফল হইল না। কেন হইবে আমার বহুমুখী সুবিধার জায়গার দরকার।

ভাগ্যিস দিনের প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা আমি বাড়ীর বাহিরে কাটাই। অত্র গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতার কেহই আমার টিকিটির খোঁজ পায় না। যাহার ফলে যেমন ইচ্ছা তেমনি থাকিতে পারিতেছি, ঝগড়া করিতে হইতেছে না। এই সব কি ভিলেজ পলিটিক্স বা বদনাম নিজ নিজ কানে খুবই কম শুন। এই অজ পাড়া গাঁয়ে আসিয়া আমি পঁচা আবর্জনার ভিতর আতরের সুঘ্রাণ পাইয়াছি। উহার বর্ণনা করিতে গিয়া হয়ত আমি সবটা পারিব না। পারিব কমনে স্বর্ণের টুকরা যে পঁচা গলিতে গিয়া এখন ধুকিয়া ধুকিয়া মরিতেছে। বেচারী রূপা যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী অথচ মা বাবার প্রত্যাশার শিকার হইয়া যা-তা ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। জামাই বাবু দেখিতে শুনিতে যথেষ্ট রূপবান। তাহা হইলে কি হইবে গুণবতী স্ত্রীর প্রতি ক্রমাগত ঔদাসীন্য, অত্যাচার করিয়া প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিল। কোন রকম জান বাঁচাইয়া পিতৃালয়ে আসিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে। জামাই বাবু যেমন রূপাকে মারধর করিত তেমনি তাহার শ্বশুড়ী মহোদয়া কোন রকম কম যাইতে চাহিলেন

না। তিনি নিয়মিত বিউটি পার্লাণ্ডে যাইতেন আর আসিয়া তাহার বউকে বলিতেন, ‘কি গো, বউ রান্না বান্না শেষ হইয়াছে কি।’ যদি দেখিতেন তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, কাপড় ধোয়া হইল কিনা তাহা বলিতে বলিতে কোন রকম দোষ আহরণ করিয়া তাহার গুণধর পুত্রকে জানাইয়া রাখিতেন। তাহারা কুণ্ঠিত পুত্র মাতা মিলিয়া তুলোধনা করিতেন। বেশ আর যায় কোথায়। এক পর্যায়ে হকিস্টিক কিংবা হাতে যাহা পাওয়া যাইত লইয়া পটাস পটাস করিয়া স্ত্রীকে মারিয়া বীরবাহু বীরত্ব প্রকাশ করিত। তাহার পর একদিন এই যন্ত্রনার শেষ হইল। তালাক দিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। রূপা বাঁচিয়া উঠিল। রূপার বাবার নাম দেব মোহন দাস আর মায়ের নাম রাধা রানী। তাহারা ভাবিতে পারিল না অমন করে, তাহাদের মেয়ের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যাইবে। মায়ের কষ্ট বাহির হইতে বুঝা যায় না। ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইলেন। বাবার সামাজিক অবস্থান শূন্যের কোটায় গিয়া নামিল। মেয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কোন বাবার যে সে কি কষ্টের কেবল ভুক্তভোগীই ভাল বুঝিতে পারেন। রূপা যতই দিন যাইতে লাগিল ততই শুকাইতে লাগিল। অপসরীর মত রূপ লাভণ্যময়ী রূপা ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রতিবেশী মহিলারা তাহাকে দেখিয়া ভেংচাইতে লাগিল। অপয়া বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যাইত। হায়রে কপাল যদি অমনই হইবে তবে বিধাতা তাহাকে এত রূপ লাভণ্য কেনই বা দিলেন। একদিন ভীষণ ঝড় উঠিয়াছিল। আমি ভাঙ্গা বাটী ছাড়িয়া রূপাদের পাকা বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। ক্ষনিকেই মেয়েটির কথা বার্তা শুনিয়া বুকে দয়ার উদয় হইয়াছিল। বলিলাম, ‘কি গো অমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছ কেন?’ সে সহজ উত্তর দিল। না, কাকা, আমি ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই, বাঁচিয়া গিয়াছি। যেভাবে আছাড় খাইয়াছি উহাতে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ারই কথা ভাঙ্গিল না বাঁকিয়া গিয়াছে” আশ্চর্য মেয়েটির মনের দৃঢ়তা দেখিয়া খুবই খুশী হইলাম। ভাবিলাম এইরূপ

একটি বড় রকমের ধাক্কা খাইয়া যে সহজ থাকিতে পারে তাহার চেয়ে আরও বড় সমস্যা হইলেও সে যে দাঁড়াইয়া মোকাবিলা করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন রাখিলাম এখন কি করিবে ভাবিতেছ। রূপা জবাব দিল ‘পড়া লেখা করিব। মানুষ হইব, তাহার পর প্রতিশোধ তুলিব। যে আমার জীবনের ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহাকে খাবলাইয়া খাইব। তাহার পর শান্ত হইব।’ বুঝিলাম তাহার ভিতরে আগুন আছে, আমার দায়িত্ব হইতেছে তাহার চিন্তার ঢাকনাটা খুলিয়া দেওয়ার। এইরূপ ভাবিয়া বলিলাম, তা কোন শ্রেণীতে পড়িতে চাও, রূপা বলিল--- কাকা, আমার দেহ বাড়িয়াছে, বয়স বাড়ে নাই। আমাকে পরামর্শ দিন, কোন ক্লাসে ভর্তি হইব। বলিলাম, বাড়ীতে থাকিয়া পড়িবে, না অন্য কোথাও যাইবে। বলিল, খালার বাড়ীতে গিয়া থাকিব। রূপার মা-বাবা কিছুটা হালকা হইল। তাহাদের মেয়ে যে একদিন সত্যি সত্যি বড় হইবে তাই আঁচ করিল। দুই দিন পর রূপা বাক্স পুটলি বাঁধিয়া নিজ বাটি ছাড়িয়া খালার বাটি গিয়া উঠিল। খালা প্রথমে তাহাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইল এবং থাকিতে দিল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে থাকিল। পাশের বাটির মানুষ নানা কথা বলে। এত বড় ভিজি মাইয়া যে কিনা ক্লাশ সেভেনে পড়ে। কেহ কানাকানি শুরু করিল। কেহ আবার তাহার প্রতি কটাক্ষ করিল ঙ্গ কুচকাইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া বদনাম রটাইতে লাগিল। দিনে দিনে খালার বাটী তাহার জন্য বিষময় হইয়া উঠিল।

এমনিতেই রূপার মনে বিষাদময় কালো জীবন উঁকি বুঁকি মারিয়া উঠিত তাহার উপরে পরের বাটির অন্ত তাহার আর সইল না। লোকে তাহাকে পঁচা ডোবায় ফেলিয়া কাদা মাখাইয়া লেপ্টিয়া দিল কোথায় যাইবে সে এখন কোথায় যাইবে। যে জীবনের উচ্চাশা অংকুরেই বিনষ্ট হইল আবার তাহা সহ্য করিয়া যখন কষ্ট লইয়া সুখের জীবন গরিবে লেখা পড়া করিয়া তখন সমাজ তাহাকে উহা হইতেও

বঞ্চিত করিবে বুঝিয়া তাহার আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না। একদিন বিষন্ন মনে যখন উঠানে বসিল এমন সময় এক ফকির আসিয়া হাঁকিল ‘মাগো বাবা সকল আমাকে শিক্ষা দেন’। রূপা ভিক্ষুকের কণ্ঠ শুনিয়া আগাইয়া গেলে, ভিক্ষক তাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে ভিক্ষক লোকটির বুঝিতে বাকী রইল না মেয়েটি খুবই দুঃখিত।

প্রকৃত পক্ষে আগন্তুক লোকটি ভিক্ষুক নয়। যে মস্ত বড় একজন ধনাঢ্য ও মানব হিতৈষী মানুষ। ভিক্ষুক রূপে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মানুষের বুকের কান্না শুনে। সুখের হাসি দেখে। সমাজের মানুষের লোভ লালসা নোংরা ষড়যন্ত্র বুঝে। শত শত বছর একই জায়গায় বংশানুক্রমে বসবাস করিয়া মানুষ যে কত হিংসুটে এবং হিংস্র হইয়া উঠে তাহা প্রত্যক্ষ করে। প্রতিদিন অজানা অনেক তথ্য সংগ্রহ করে রাতে নিজ আন্তনায় ফিরে যায়। আবার পরদিন বাহির হয়। নুতন এলাকায় গিয়া নুতন নুতন অভিজ্ঞতা লাভ করে গ্রামীণ ও শহুরে পঞ্চায়েতের গুটি কতক জমিওয়ালা ব্যবসায়ী সকলের মনের চাহিদা স্ব- চোখে দেখে। আজকে রূপাকে দেখিয়া লোকটির মনে ভাবান্তর তৈরী হইল। অযাচিত ভাবে বসিতে চাহিল, রূপা শুধু হাতে শিক্ষা নিয়া লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিলাম না। লোকটি আবার প্রশ্ন করিল ‘মা গো তোমার মনে আঘাত আছে বুঝি?’ রূপার অন্তর আত্মা কাঁপিয়া উঠিল। লোকটি আবার বলিল, ‘তোমার জীবনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে বুঝি?’ সামনের দিকে চলিতে পারিতেছ না--

সব অন্ধকার দেখিতেছ? নিজেকে নিজের কাছেই অসহ্য লাগে? আশ্চর্য এ-তো সাধারণ লোক নয় রূপা মনে মনে লজ্জা পাইল। লোকটি তাড়াতাড়ি বলিতে দিল ভিক্ষুক বলে বসিতে ইচ্ছুক করে লোকটি বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিয়া গেল। রূপার মনের দ্বার যেন খুলিয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল অতীত জীবনের কথা। তাহার মা বাবার কথা। বাবা সরকারী অফিসের কেরানী।

তিন ভাই দুই বোন। তাহাদের তেমন অভাবী সংসার ছিল না। কোন রকম খেয়ে পড়ে ভালই চলিত। হঠাৎ চিলে ছোঁ মারিয়া তাহাকে উঠাইল বট গাছের চুড়ায়। তারপর ফেলিয়া দিল রক্তাক্ত হুঁদুরের মত। শরীরে ও কলিজায় নখরের আঘাত। মা- বাবা তাহার জীবন দেখিয়া ও বুঝিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। রূপার চোখ বাইয়া অশ্রু বরিতে লাগিল। এখন তাহার মনে যতটা জ্বালা আছে তাহার চেয়ে ঢের বেশি জ্বালা শরীরে। শরীরের যন্ত্রনা অসহ্য। কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার যৌবন মিছা। তাহার মাতৃত্ব আজ দেউলিয়া সঙ্গীহীন কাকাতুয়া। সমবেদনায় আপন জন কেহ তাহার জীবন নিয়া আফসোস করিতে থাকিলে মরা রূপযৌবন যেন ধীক্ষার দিতে থাকে, আরও পাগল হইয়া তাহাদের গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। মনের দুঃখ ছাপিয়া বাহির হইয়া আসে মধুময় লাষণ্য। অথচ তাহা বলার উপায় নাই, কাহাকে বলিবে, প্রিয়জন নাই। ভয় হয় কখন জানি কাহার লালসার শিকার হয় এই যৌবন। এখন মনের দূরবস্থা শরীরের দহন মিলিয়া দিন যায় না, রাত ফুরায় না, দিকভ্রান্ত পথিকের মত, কোথায় যাইবে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কথায় তাহার মনে যেন সত্যের ঝলক দিয়া উঠিল। তাহার কানে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই ভিক্ষুকের কথা বাজিয়া উঠিতেছিল।

শিশুকালে মায়ের আদর করে ভাত খাওয়ানো কৈশোরে সব বালিকাদের সাথে দল বাঁধিয়া স্কুলে যাওয়া, স্কুল হইতে ফিরিয়া কুত কুত খেলা তাহার মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়া যে আশায় রূপা বুক বাঁধিয়াছিল দুরাচার স্বামীর শারীরিক নির্যাতন আর যৌতুক পিপাসা মুখরা শ্বাশুড়ীর গালি গালাজের অত্যাচার সংসার জীবনে সুখের পরিবর্তে নামাইয়া আনিল দুঃখ কষ্টের গভীর অমানিশা। ঘৃণায়, শিহরিয়া উঠিল বিগত জীবন স্মরণ করিয়া। তাহার জীবন হইতে ১০টি বছর কাটিয়া গেল ঘরোয়া কারাগারে। তাহার জীবনে কষ্ট

নামিয়া আসিল নাকি কষ্ট হইতে সে মুক্তি পাইল তাহা সে ছাড়া আর কেউ বুঝিবে না। তবে একটা ক্ষতি তাহার হইয়াছে সেই ক্ষতিটা যে কী তাহা আগুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই ক্ষতি যাহার হয় তাহা আর কখনও এই জীবনে আর পূরণ হয় না। তাহাকে ভুলিয়া থাকা যায় কিন্তু তুষের আগুনের মত একাকীত্বের বাতাস পাইলে স্বচ্ছন্দে ঠিকই জ্বলিয়া উঠে তখন দুঃখে কাতর না হইয়া পাথর হইতে হয়। সম্পদ হারাইয়া মনে করার চাইতে ভুলিয়া থাকিয়া নিঃশ্ব হওয়া ভাল। কিন্তু এখন অসুবিধা হইতেছে ভিন্ন জায়গায় আর তাহা হইতেছে অভ্যাস। দাঁত মাজিবার অভ্যাস করিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে মুখ হইতে নিঃসন্দেহে দুর্গন্ধ বাহির হইবে। তখন লোক সমাজে যেমন মুখ দেখানো যায় না তেমনি মুখের দুর্গন্ধে উপাদেয় খাদ্যও গিলা যায় না। ফলে উপোস করিয়া মরিতে হয়। এই উপোস করার মর্মার্থ খুঁজিয়া বাহির করা অন্যায়। দীর্ঘশ্বাসের সহিত যৌবনের অত্যাচার মিলিয়া তাহাকে উদভ্রান্ত করিয়াছে, আনমনা করিয়া লজ্জার হাড়িতে ঢুকাইয়া সিদ্ধ করিয়াছে। অন্যের ঘর সংসার দেখিয়া কি যে কষ্ট হয় তাহা মুখে উচ্চারণ করা যায় না, মনে মনে উপলব্ধি করিতে করিতে পারে। এলোচুলে জানালার দ্বারে একদিন দাঁড়াইয়া আছে চোখ ভরিয়া শূন্যে চাহিয়া দেখিতেছে তাহার যৌবনের হাহাকার।

১৪/০১/২০১১

মোলমারা- কিশোরগঞ্জ।

আশীর্বাদ

আজ সতীনাথের জন্য খুশির দিন।

কি জন্য সতীনাথের জন্য খুশির দিন তাহা কিছু বলা হইল না। তাহা সতীনাথ তাহার নিজ মুখ দিয়াই ফুটাইয়া তুলিবে। সে তাহার বাবার বড় ছেলে। তাহাদের সাহা বাড়ীতে সে খুবই শান্ত শিষ্ট সোজা ছেলে হিসাবে পরিচিত। তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে বিরাট আকারের এক নদী। নদীর নাম ধনু নদী। দুই পার্শ্বে বিরাট হাওড়। এক কথায় হাওড়ে ও নদীতে বর্ষা কালে তাহাদের বাড়ী ভাসিয়া বেড়ায়। অদূর থেকে মনে হয় তাহাদের বাড়ীঘর জলে নৌকার মত ভাসিতেছে। সে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে। গ্রামের সরকারী প্রাথমিক স্কুলে। বিদ্যার দৌড় নাই কিন্তু গ্রামের বুড়ো লোকদের সাথে মিশিয়া বড়ো পাকা হইয়া গিয়াছে অ- জাগতিক অনেক ভাবনায়। এ ক্ষেত্রে তাহাকে সহযোগীতা করিয়াছে ধনু নদী এবং বড়ো আকারের হাওড়। বর্ষা কালে তো কথাই নাই-উনিয় মৌসুমেও যেন কুয়াশা রৌদ্র হাওয়া একত্রে মিশিয়া তাহার গতরে এবং কল্পনায় ঢুকিয়া পড়ে।

সতীনাথের মা মারা গিয়াছে। তাহার এক জ্যাঠা আছে। জ্যাঠার দুই কন্যা সন্তান আছে। তাহাদের পার্শ্বের গ্রামে বিয়া দিয়াছে। সেখানে তাহারা সুখেই আছে। তাহাদের জ্যেষ্ঠি অতি অসুস্থ। বিছানায় উঠা বসা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। জ্যাঠা ধনু নদীর পাড়ে নুতন বাজারে ছোট্ট মুদী দোকান করে। পার্শ্বের থানা মিঠামন আর অষ্টগ্রামে থেকে ট্রলার নৌকা আর লঞ্চ আসিয়া এখানে ভীড়ে। সতীনাথের বয়স এখন চৌদ্দ বছর। সে এখন তরতাজা যুবক। এতদিন সে তাহার জ্যাঠার দোকানে ফুটফরমায়েশ খাটিতো। এখন সে বড় হইয়াছে। তাহার জ্যাঠা তাহাকে কাছে টানিলেও এখন বড় হইয়াছে ভাবিয়া আর কাছে ঘেঁষিয়া থাকে

না। বরং নিজস্ব অস্থিত্ববোধ তাহাকে আঘাত দেয়। ছোট খাট ফাইফরমায়েশ খাটার মত পাশের বাড়ীর ‘নড়ি’ এখন জ্যাটার দোকানে প্রতিদিন আগমন করে। মনে হইতেছে জ্যাটার দোকানে তাহার স্থানটি এখন নড়িই দখল করিয়া লইয়াছে।

একদিন সতীনাথ তাহার জ্যাঠা বংকু বাবুকে সভয়ে ফিস ফিস করিয়া দোকানে ডাকিয়া কহিল, ‘জ্যাঠা, সরকারী সমাজসেবার কথা হুনছনি আমাগো গেরামে হেরা সুদ ছাড়া টেহা দেয় আমি হেই টেখা নেয়াম। বংকু বাবু উৎকর্ষিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ‘হেই টেখা দিয়া তুই কি খরবি’ সতীনাথ সহজ ভাবে জবাব দিল, “ক্যা, লঞ্চ লঞ্চ জুতার কাম করবাম” সতীনাথের কথা শুনিয়া তাহার জ্যাঠা আশ্চর্য হইল না কিন্তু তাহার ভ্রাতুষপুত্রের স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টার কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে খুশিই হইল।

সতীনাথ এতদিন পরে তাহার কাংখিত পেশা খুঁজিয়া পাইল। লঞ্চ লঞ্চ থাকিয়া থাকিয়া, জুতা সেলাই কালি দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে। যাহা রোজী রোজগার হয় তাহাতে সে ভালই আছে। মনে যাহা চায় তাহাই কিনিয়া আনে এবং তাহার রোগগ্রস্থ জেঠি মাকে সখ করিয়া খাওয়ায়। সতীনাথের বৃদ্ধা জেঠি তাহার স্বর্গীয় দেবরের দেবর-পুত্রের দেওয়া ফলাদি খাইয়া মনে মনে আশীবাদ করে। বৃদ্ধার অন্তকরণ হইতে বাহির হইয়া আসা এই আশীবাদই সতীনাথের জীবনের রক্ষা কবচ।

একদিন ইটনা হইতে মিঠামনগামী একটি লঞ্চের মধ্যে সে ছিল। ঝড়ের কবলে পড়ে লঞ্চটি। সতীনাথ দূরন্ত প্রকৃতির সাঁতার জানা উচ্ছল তরুন। সেই লঞ্চ ডুবিতে বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। প্রচন্ড ঢেউ আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়

সে তাহার জুতো মেরামত করার বাক্সটি কাঁধে চাপিয়া সহজেই দেখিল প্রায় শক্তিহীন এক রোগা মহিলা তাহার সাহায্য প্রার্থী তখন সে তাহার বাক্সটি ফেলিয়া দিয়া তাহার মোটা চাদর দিয়া ফুটবলের মত বাতাস ভরিয়া উহাতে মহিলার হাত রাখিতে বলিয়া অতি কষ্টে কোন রকমে তীরে পৌঁছাইল। তখন প্রায় মধ্য রাত। জন মানবহীন যেখানে আসিয়া সতীনাথ পৌঁছাইল সেখানে তাহারা দুই জন প্রাণী ভিন্ন কোন প্রাণীর- অস্তিত্ব নাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার কি করা যায়। মহিলার গায়ে পেটি কোট আর ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু নাই। প্রায় বিবস্ত্র বলা যায়। যাক্ জীবন যখন ঈশ্বর বাঁচাইয়াছেন ইজ্জতও তিনি রক্ষা করিবেন। মহিলা, শীতে কাঁপিতেছে আর মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতেছে। মহিলার বাড়ী বহুদূরে। কাজেই সতীনাথ চিন্তা করিল যে, তাহার বাড়ী অবধি পৌঁছাইতেই সকাল হইয়া যাইবে। তাহার পর মহিলার জন্য যাহা করার দরকার করা যাইবে। সে তাহার নিজের বাড়ীর দিকে মহিলাকে নিয়া ছুটিয়া চলিল।

তাহার প্রায় দুই মাস পরের ঘটনা। এখন সতীনাথ বেকার। লঞ্চ ডুবিতে জীবন রক্ষা পাইলেও কর্ম-সংস্থানের উপায়টি হারাইয়া গিয়াছে। এখন সে কী করিবে, উপায়ান্তর না দেখিয়া লঞ্চের খালাসীর কাজ নিল। এই সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল এক বাউলের। বাউলের কেহই ছিল না। বাউল তাহার দুঁতারা দিয়া গান করিয়া যাহা পাইত তাহা দিয়াই চলিত। বাউলের মারফতী মুর্শিদী গান সতীনাথের মন কাড়িয়া নিত।

সতীনাথ এমনিতেই ভাল শিস দিতে পারিত। বাউলের সঙ্গী হইয়া আস্তে আস্তে গান ধরিতে শিখিল। দুঁতারা বাজাইতে শিখিল। কিছুদিন এই রকম করিতে করিতে সে মোটামোটি ভালই শিখিয়া ফেলিল। বাউলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, লঞ্চের খালাসীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া এখন সতীনাথ, পথে প্রান্তরে শহরে বন্দরে

গ্রামে গঞ্জে গান করিয়া বেড়ায়। তাহার জন্ম স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাহার মনে যে দাগ কাটিয়া ছিল সেই দাগ যেন ক্রমে ক্রমে বড় হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধি তেমন না থাকিলেও মনের জোরে আবেগের রঙ লাগাইয়া প্রার্থিব জীবনের বিষয় জঞ্জালের অসাড়া তা যেন সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। নিজেকে সে তাহার ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে বৈবাগ্যের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

এখন তাহার জীবনের সাধ-সাধনা একটিই আর তাহা হইল এই যে, অরূপ মহেশ্বরের সান্নিধ্য লাভে তাহাকে সার্মথ্যবান করিয়া তুলিতে হইবে। এদিকে তাহার ওস্তাদ বাউল বয়সের ভারে নৃজ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর আগের মত গান গাইতে পারেন না। তবে যাহা তিনি তাহার জীবনে অর্জন করিয়াছেন সবই দিয়াছেন প্রিয় শিষ্য সতীনাথকে। সতীনাথও তাহার ভার বহনে সক্ষম। বাউলের এক কন্যা ছিল। সে লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং সুশ্রী সতীনাথের গুণে মুগ্ধ। শেষ বয়সে বাউল ভাবিল সতীনাথের হাতে তাহার কণ্যাটিকে তুলিয়া দিলে কেমন হয় কিন্তু তাহা হইলে কী সতীনাথের বৈবাগ্য সাধনায় বাধা পড়িবে না। কারণ বৈবাহিক জীবন সিদ্ধি সাধনায় যত টা না উপকারে লাগে তাহার চেয়ে বেশি অপকার সাধন করে। এই বোঝাটি সবাই বহন করিতে পারে না। সতীনাথের কি এই সামর্থ্য আছে! ইত্যাকার সব চিন্তা বৃদ্ধ বাউলকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তাহার সন্তানের ভালবাসায় বিষয়টি জলাঞ্জলী দিয়া তাহার শিষ্যের সাধনার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিলেন এবং সতীনাথ কে বৈবাগ্য গ্রহণ পূর্বক আরও ভালভাবে সাধনা করিবার জন্য আর্শীবাদ করিলেন।

সতীনাথও তাহার গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্রত্ব গ্রহণ করিল। এবং পুঁথিগত বিদ্যার উর্ধে উঠিয়া গানে গানে ঐশ্বরিক ভাবনার ইন্দ্রজালে নিজেকে গাঁথিয়া ফেলিল। একদিন এক শহরে ভাল সমাবেশ হইতেছিল। সমাবেশে সংগঠক সেরা সেরা বাউলদের আহবান জানাইয়া ছিলেন যেন তাহারা উপস্থিত হইয়া সমাবেশকে সাফল্য মন্ডিত করেন। সতীনাথের কোন নাম গন্ধ এমন কি মিডিয়ার বরকতে কোন খ্যাতিও অর্জিত হয় নাই।

যাহা হোক পথে প্রান্তরে থাকা সতীনাথ সমাবেশে ঢুকিয়া পড়িল। অনেকের গান নিজ কানে শুনি। তাহার গুস্তাদকে শত কোটিবার নমস্কার করিয়া আশীর্বাদের তাবিজ কণ্ঠে বাঁধিয়া এক সময় সে গান ধরিল। গানে গানে সমাবেশকে এমনভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল যে, সমাবেশের প্রধান অতিথি, দেশের খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর সাহেব নিজে আসিয়া তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছেন। সতীনাথ তাঁহার হাত নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করিয়া আবার রওনা করিল অজানা পথে, অজানা অরূপ রতন মহাশ্বরকে আপনাত্নায় গাঁথিবার লাগি।

ইটনা, ডাক বাংলা

১৬/০১/২০১১

শান্তনু চৌধুরী হতবাক হইয়া পড়িয়াছে তাহার চতুর্দিকে বিদ্যমান অবস্থা দেখিয়া। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থাটি কি তাহা বলিবার ভাষা ও আঙ্গিক সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কারণ ভাল করিয়া বলার ভঙ্গি তাহার নাই। তাহার যাহা আছে তাহা হইল এই যে তাহার নিজের হৃদয়ের আড়ালে থাকিয়া একাকী সে যাহা ভাবিয়া যায় তাহা চিন্তার ঢিল দিয়া ক্রমাগত তাহার খাতায় ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। যত বকাবকি হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি সবই তাহার চিন্তা ও খাতায়। বাস্তবে কোন কোন বিষয়ে সে অংশ গ্রহণ করিতে চাহে না। কেননা ইহাতে তাহার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ সে মনে করে। তাহা না হইলে যে সমস্ত ঘটনা তাহার সম্মুখে ঘটিয়াছে এবং ঘটবে বলিয়া মনে হয় তাহাতে নির্ধাত রক্ত ঘটিয়া যাইত এবং ঘটিয়া যাইবে।

শান্তনু চৌধুরী গ্রামের ছেলে। গ্রামে এমন কিছুলোক বসবাস করে তাহাদের দেখিলে মানুষের মত মনে হয় কিন্তু ভিতরে বসবাস করে গুয়ের। তাহার কি করিয়া অন্যের সম্পত্তি হরণ করিবে তাহা সর্বদা কুচিন্তা করিয়া বেড়ায় এবং গায়ে পড়িয়া ঝগড়া লাগাইয়া মামলা মোকদ্দমা করিয়া সাধারণ সরল মানুষকে হয়রানি করিবার জন্য ব্যতি ব্যস্থ হইয়া পড়ে। শান্তনুর চরিত্র হরণ করিবার জন্য গ্রামের লোকদেরকে একত্র করিয়া বৈঠক ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে শান্তনুকে এক ঘরে করিয়া রাখিতে হইবে শান্তনু তখন ভাবিল যে, তাহাদের সাথে এখন যুদ্ধ করিবার সময় নয়। এখন সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ

করিবার । তাই কাহাকেও তাহার মনের কথাটি বুঝিতে না দিয়া সে পড়ালেখায় ভাল করিয়া মন দিল এবং ভবিতে লাগিল, বান্দীর পুতেরা একদিন তাহার পদতলে মাথা নুয়াইয়া তাহারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবে। পাঠক হয়ত ভাবিবেন এই বান্দীর পুতেরা কারা! শান্তনুর প্রতিবেশী এই বান্দীর পুত্র বদমায়েশদের একজন সলিম রায়ত । তাহার কথাই এখন বলিয়া যাইবে শান্তনু ।

শান্তনু একদিন দাঁত মাজিতে মাজিতে বাড়ীর বাহির উঠোনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় সলিম রায়ত ক্রোর হাসি হাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার নিকট এবং বলিল, “শুভ তোমাদের বাড়ীর এক তৃতীয়াংশ আমার । উহা আমি দখল করিয়া লইব” । বাক্যবানটি যেন শান্তনুর মগজের ঠিক মধ্যখানে গিয়া ঠেকিল এবং বিধিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হইতে শুরু করিল । তাৎক্ষনিকভাবে চোখ দুইটি রগরাইয়া দাঁত খিঁচাইয়া শাহাদাৎ অঙ্গুলি তুলিয়া এক পা ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, “কি কইত্যাছস সলিম্যা” হিয়া বার ক” ।

সলিম রায়ত কটবুদ্ধি সম্পন্ন গৈয়ো পলিটিশিয়ান । ইদানিং কোর্ট কাচারীতে ঘুরিয়া আরও আইন বিদ্যা অর্জন করিয়া তাহার মাথা পাকা করিয়াছে । এখন যেখান দিয়া সূঁই যায় না সেখান দিয়া কুড়াল ঢুকাইয়া দিবার বুদ্ধি পাইয়াছে । তাই সেও সদস্তে বলিয়া উঠিল, ‘আমরার জমিন বেইচছি তোমরার টেন? বেইছছি ফুপুর জমিন’ আশ্চর্য কথা,কথা শুনিয়া শান্তনু চৌধুরী স্তব্ধ হইয়া গেল । ‘এখন ফুপুর জমিন আমি দখল নিয়াম’ বলিয়া হন্ হন্ করিয়া সলিম রায়ত চলিয়া গেল ।

শান্তনুও কী করিবে এবং প্রত্যুত্তরে কী বলিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনেকটা গলা দ্বিধিত মুরগীর মত রক্ত ক্ষরণ মাথায় লইয়া- ভিতর বাটার দিকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার বোঝা মাথায় লইয়া শান্তনু চৌধুরী বিদ্যাদেবীর দ্বারে আনাগোনা করিতে লাগিল। বিদ্যাদেবীর করুণা পাইলে তাহার ঘরে ঢুকিয়া বিদ্যা পূজা দিয়া যাইবে। ইহা তাহার প্রবল ইচ্ছা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে তাহার সহিত পরিচয় হয় রুনা চ্যাটার্জীর। রুনা চ্যাটার্জী যেমন ভাল ছাত্রী তেমনি রূপসী এবং গুণবতী। সহপাঠী হিসাবে তাহাদের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠতা আছে তেমনি উভয়ে ভাল ছাত্র হিসাবে তাহাদের শিক্ষকের নিকট পরিচিত রুনা চ্যাটার্জী শান্তনু চৌধুরীকে বলিল, “বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়াও তুমি বাংলা সাহিত্যের জন্য যে কাজ করিয়া যাইতেছ তাহা, সকলেই পারে না। এমন কাজ যে সবাই পারে না ইহা এক রকম নিশ্চিত। তাই তুমি সাহিত্য সেবা করিয়া বিশিষ্ট জন হইবে। পড়া-লেখা-হৃদয়বৃত্তিক আরাধনা এ তিনটি হইবে তোমার সাধনার বিষয়। তোমার জন্য ইহাই সর্বোত্তম কাজ। আর ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করো”

রুনার কথায় শান্তনু উৎসাহিত হইয়া মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ জানাইল।

২৪/১০/২০২২

কিশোরগঞ্জ

অচেনা পথের পথিক : প্রবন্ধ গ্রন্থ

আধুনিক গদ্য কবিতা বনাম অন্তর্মিল কবিতা এবং মৌলিক সাহিত্য

সৌর জগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র প্রাণের সন্ধান ও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীতে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু প্রাণ নয় বরং লক্ষ লক্ষ প্রাণীর রয়েছে সচল জীবন- যাত্রা। এমন কি ক্রমে ক্রমে প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আজকে এক উন্নততর সভ্য অবস্থার তৈরী করেছে। প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ। আর এ মানুষজাতি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য ললিতকলায় প্রতুত উন্নতি সাধন করেছে। মানুষের মধ্যে চির জাহ্নত একটি সম্পদ রয়েছে। আর তা হচ্ছে আবেগ বা কল্পনা। সে আবেগ বা কল্পনা নিয়ন্ত্রন করে, তরঙ্গায়িত করে ছন্দ। কালের পরিক্রমায় ছন্দের ধারা ও রূপ পরিবর্তিত হলেও তার মূল অবকাঠামো সর্বদা অটুট থাকে। কেহ যদি আনন্দিত হয়ে নাচতে শুরু করে আর সে নাচে তাল, লয়, ও মিল না থাকে তবে নিজের কাছে তো বটেই অন্যের কাছে কখনও আনন্দের কারণ হবে না। বরং বিরক্তির উদ্বেক করবে। সব কবি'র আধুনিক কবিতায় নয় বরং অধিকাংশ কবি'র আধুনিক কবিতায় এ রকমটি ঘটেছে কি না তা বলা এবং সমিল গীতি কবিতা ও মৌলিক সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা এ প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিত করেছে আমাকে।

ব্যাকরণের রক্ষ মুখের দিকে না চেয়ে তার অন্তরের ভাবখানা উদ্ধার করে অগ্রসর হওয়াই ভাল। উহা বড়ই নিরস যন্ত্র। উহাতে গাণিতিক মারপ্যাঁচে যোগ-বিয়োগ করে ফলাফল নির্ণয় করা হয়। অথচ কবিতা সৃষ্টি করার সময় শব্দ, আবেগ প্রয়োজন। ধ্যান ও দরদের দরকার। স্বাধীন ধ্যান জগৎ আইন মানে না। এই

সময় আইনের অনুশাসনে কখনও উত্তম আবেগের মৃত্যু ঘটে বৈ কি! মৌলিক সাহিত্য ব্যাকরণ অনুসরণ করে না বরং ব্যাকরণই সাহিত্যকে অনুসরণ করে। যাক্ যে কথা বলছিলাম, একটা শিশুর জন্ম হলে, শিশুটিকে নরোম তুলতুলে তোয়ালে ঢেকে, সহনীয় তাপমাত্রায় রেখে মায়ের দুধ খাওয়াতে হয়। তা সম্ভব না হলে অন্য উপযুক্ত খাবার খেতে দিতে হয়। এরপর সময় ও পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে করে শিশুটি বেড়ে ওঠে। আমরা আদর করে তার নাম দিই। তা না করে সদ্য প্রসূত শিশুটিকে যদি যেন-তেন ভাবে রেখে দেয়া হয় কিংবা পুকুরের বা খালে ফেলে দেয়া হয় তবে কি সে বাঁচবে? না বাঁচলে তার নাম দেবো কি করে? চিত্রকল্প তৈরী করে আবেগের রঙ তুলি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভাব বা বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয় কবিতায়। উপমা প্রয়োগে লেখাটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাল ও মাপ ঠিক রেখে শব্দ- রাজি ছন্দোবদ্ধ করতে হয়। এরপর আমরা পাই মূর্তিমান একটি কবিতার দেহ ও প্রাণ। তা না করে যথেষ্ট শব্দ বসিয়ে আবেগ নিয়ন্ত্রনে না রেখে ছন্দ পতন ঘটিয়ে আমরা কি পাব? আমরা পাব না-গদ্য না-পদ্য জগাখিচুড়ি অখাদ্য। যদিও বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে একটি দু'টি সুন্দর উপমা আসে তথাপি লেখকের আনাড়ি হাতে পড়ে তাতে কাদা মেখে পরিশ্রম পশুশ্রমে পরিণত হয়।

সমিল ছন্দে একটি সুবিধাজনক দিক রয়েছে। আর তা হচ্ছে ছন্দ পতন না ঘটানোর জন্য পংক্তিমালায় শেষ শব্দের অক্ষর ভীষণ সাহায্য করে। অনেকটা রেল লাইনের স্লীপারের মত। বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া লাইনটি সুন্দর মজবুত হয়ে থাকে স্লীপারের ওপর ভর করে। অক্ষর ও শব্দ সংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যক রেখে ছন্দ পতন থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এতে ছন্দের ঢেউ ও ভাঁজ অনুভব করে উত্তম পংক্তি রচনা করা যায়। উপমা প্রয়োগে কৌশল ও নুতনত্বে লেখাটির কাব্যমূল্য বাড়ে। পাঠক মহলে সাড়া জাগায়। মানুষের মন ছুঁয়ে যাওয়া এরূপ কবিতা

কালজয়ী হয়। কালের পরিক্রমায় আবার নতুন হয়ে দেখা দেয়। সমিল অক্ষর বৃত্ত তথা অন্তমিল কবিতা তার ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘুরে ফিরে আসবেই রূপ বদলিয়ে কেননা ইহা কবিতার আসল আদল। কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য লগ্নে এভাবেই ছিল। ইহাই প্রকৃতিজাত। ছন্দকে শব্দে বন্দী করার জন্য ভাষায় যে কোন ধরণের শব্দ বিন্যাসের রূপ পরিগ্রহ করুক--কেন জানি মনে হয়, কবিতা চর্চায় সেই আদিম রূপ শব্দের অন্তমিল অতীতে ছিল, এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। কবিতা সহজাত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক বর্ণা অনর্গল পানি প্রবাহের মত। প্রার্থনায় যেমন অকপটে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে অবিরত কথা বেরতে থাকে, চোখের পানি ঝরতে থাকে, কোথাও আটকায় না কবিতার ভাবও ভাষা অনুরূপ ঝরতে থাকে। উপমায় নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়- এহেন খেলায় অন্তমিল যেন দোলনা। দোলনায় উঠালে চিৎকাররত শিশুকে ঘুম পাড়ানো কত সহজ তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

একটা ধর্মের কথা বলছি তা হল, ইসলাম। ইসলামী ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ কোন লোককে সার্থক ভাবে ধর্ম চর্চা করতে হলে কতক ধাপ পেরতে হয়। ধাপগুলো- শরীয়ত, তরিকত, হকিকত মারেফাত। ক্রমাগত অধ্যবসায়, অনুশীলন ও তপস্যার মাধ্যমে, সিদ্ধি লাভ করা কোন মানুষ মারেফাত পর্যায়ে পৌঁছলে অনেক সময় সে মানুষটি এমন আচরণ করেন ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে পাগল বলা ছাড়া উপায় থাকে না। আসলে কি তিনি পাগল? উত্তর হবে 'না'। সাধনার উঁচু স্তরে পৌঁছানোর ফলে প্রাথমিক অনেক আইন না মেনে এমন অনেক কঠিন কাজ তিনি অনায়াসে করে ফেলেন যা সাধারণ লোকের জন্য দুঃসাধ্য। কোথাও ছন্দ পতনের ভয় থাকে না। ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন ভাষায় এমন অনেক উঁচুমানের কালজয়ী কবি আছেন যাদের হাতেই আধুনিক কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, হচ্ছে। তাঁদের পাকা হাতে আধুনিক কবিতা কোথাও ছন্দ পতন ত্রুটি

পাওয়া যাবে না। যেমন পাওয়া যায় না মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পদ্ধতিতে লেখা, বিভিন্ন কবিতা ও কাব্যগ্রন্থে। কাব্য চর্চায়, উঁচুমার্গে বসে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করা খুব সহজ। কেননা নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি নুতন সৃষ্টি করবেন। এই রকম বিরল সৃষ্টিশীল লেখকের হাতেই ঔজ্জ্বল্য পায় ভাষা সাহিত্য--
- না হলে তিনি বিখ্যাত হবেন কি করে। কিন্তু সাধারণ হ্যাঁটি হ্যাঁটি, পা পা করা একজন কবি যদি এই প্রতিষ্ঠিত লেখকের শেষ কাজটি করতে চান জীবনের প্রথমেই, তাহলে হাত পা ভেঙ্গে এমন দশা ঘটবে যে, আর কোনদিন তাঁর হ্যাঁটা শিক্ষা দরকার হবে না। প্রায় সব তরুণ কবি আধুনিক গদ্য স্টাইলে কবিতা লিখতে অভ্যস্ত হচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রেই লিখাগুলো দুর্বোধ্য ও দুর্জ্যেয় তেমনি ছন্দ জটলা বেঁধে যে কী তৈরী হচ্ছে-- তা বলা মুশ্কিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে আধুনিক কবিতা লিখেছেন, কবি শামছুর রাহমান আধুনিক কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁরা যেভাবে পারেন আধুনিক কবিতার ছন্দ ও তাল বজায় রাখতে তা কি করে সম্ভব হবে অনভ্যস্ত নুতন লেখকের পক্ষে।

আমি বলতে চাইছি মৌলিক লেখক মাত্রই সাধনা জগতের উঁচু স্তরের মানুষ। তাঁরা ভাষা ব্যবহারে এত সংযত এবং ভাবরসের উপস্থাপনায় এত পটু মনে হয় কাব্যলক্ষ্মী তাঁদের পূজায় নিজেদের সর্মপণ করেছেন। কাজেই একজন তরুণকে অন্তর্মিলের নিয়মের ভেতর থেকে কবিতা সাধনায় ব্রতী হতে হবে। ভাষাও শব্দ ব্যবহারে কৌশলী হতে হবে। ছন্দের তালে অনবরত দোলতে হবে। এভাবে দোলতে দোলতে নিজস্ব ভঙ্গিমার কারণে অবশ্যই বিদগ্ধ সাহিত্য রসিকের দৃষ্টি কাড়বে। ছন্দ সাধনায় দ্বি প্রহর শেষে আর সমস্যা হবে না আধুনিক কবিতা লিখায়।

প্রিয় পাঠক, আধুনিক ধারায় কবিতা লেখার ঘোর বিরোধী আমি নই। আমার বক্তব্য পরিষ্কার এই ক্ষেত্রে যে, কচি হাতে ছন্দ রাখার উপযুক্ত ক্ষেত্র

আধুনিক গদ্য কবিতা ধারায় নেই। থাকলেও সাধারণের বোধগম্য নয়। এ কারণেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কবিতা লেখা, মৌলিক কবি বের হয়ে আসতে পারছেন না। বাংলা সাহিত্যের প্রোথিত্যশা কংজন কবি'র কথা বলব যাঁরা নিজ নিজ ধারায় নক্ষত্র। কবি জসিম উদ্দিন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ প্রায় সারা জীবন অন্তিমিলে লিখে যশস্বী হয়েছেন। তা কিভাবে সম্ভব হল? চিন্তায় স্বকীয়তা, উপস্থাপনায় নুতনত্ব বলার ভঙ্গি, উপমা প্রয়োগ ও ভাষা বিন্যাসে ভিন্নতা, সবচে' বড় কথা নিজস্ব ধারাজাত রচনা তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছে সাফল্য। আমরা পেয়েছি অমূল্য সাহিত্য রত্ন, যেতরণকে সমগ্র চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করে সোজা পথে চলার কথা, বিদ্রোহ কিংবা তারুণ্য দীপ্ত মনে মুখ খোলা গেলাসে জল খাওয়ার কথা, হাত থেকে তার গেলসটি কেড়ে নিয়ে মুখ বন্ধ পাত্র দিয়ে কি করে আশা করি তার পিপাসা নিবারণ? সম্পর্গ ভুল পথে চালিত হয়ে সাহিত্যের দিকপাল কেউ কোন দিন সৃষ্টি হয় নি। যে ছান্দসিক নয় সে কবি হয় কি করে। আর যে কবি নয় তার লেখার কাব্যমূল্য কি তা বলা নিশ্চয়োজন। সুরা পাত্র হাত হতে কেড়ে নিয়ে কাউকে মাতাল হতে বলা যেমন হাস্যকর তেমনি একজন তরণকে আধুনিক নামের গদ্য কবিতা লিখতে বলে তাকেই কবি নামে আখ্যা দেয়াও পরিহাস মাত্র।

একালের জীবন বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে তার রূপরস আকর্ষণ পান করে, জীবন ও সমাজের দর্পণ সাহিত্য, রস পিপাসু পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা হতে পারে একজন মহৎ কবি'র। শব্দের ভেতর প্রাণ ঢুকিয়ে জীবন্ত করে তোলা পংক্তি কামনা করি কবি'র কাছ থেকে। এ কবিতা একালে-ও কালে, সর্বকালের সাহিত্যের অমূল্য ধন, প্রেরণার উৎস মৌলিক সাহিত্য।

করমুলী, কিশোরগঞ্জ

১৪/২/০৩

এলমে মারেফাত ও মুসলমান সমাজ

কোথা হইতে শুরু করিব আর কোথা যাইয়া এই লেখা শেষ হইবে তাহা যেমন ঠাওর করা যাইতেছে না তেমনি দশা দর্শন করা যাইতেছে এলমে মারেফাত ও মুসলিম সমাজের অবস্থাটাও। তাহা না হইলে আজ কত বছর হইল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইসলাম তথা মোহাম্মাদী ইসলাম প্রবর্তন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তাহা ছাহাবী, তাবেইন, তাবে তাবেইন, তাহারও কিছুকাল পর পর্যন্ত মুসলিম সমাজ সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাস্তবায়ন করিতেন সেই রকম করিয়া একালের মুসলিম সমাজ পারিতেছে না, কেন তাহা কে বলিয়া দিবেন? কেন নুতন করিয়া বলিতে হইবে যে, এলমে মারেফাতই মুসলিম জীবনে সর্বোচ্চ পাওনা, সিদ্ধিলগ্ন ও স্রষ্টার সান্নিধ্যে যাওয়ার একমাত্র উপায়। আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনা মানুষ তথা মুসলিম ও মুসলিম সমাজের সহিত এলমে মারেফাতের সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। হাড়ের সাথে মাংশের যেমন সম্পর্ক, বৃক্ষের শিকড়ের সাথে মাটির যেমন রকম-- এলমে মারেফাতের সহিত মুসলিম তথা মুসলিম সমাজেরও সেইরূপ সম্পর্ক।

বহুমতবাদ তর্কে- বিতর্কে না গিয়া, ধর্মের নামাবলী গলায় না জড়াইয়া, লেবাস পোশাক গায়ে না উঠাইয়া, সোজাসাপ্টা আমরা কি বলিয়া দিতে পারি না যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য মোহাম্মাদী ইসলাম তথা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের তাৎপর্য ও নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহমুখী করাই আসল কাজ। আর সেই কাজটি জীবনের কোন কাল হইতে শুরু করিতে হইবে, তারপর কিভাবে আস্তে আসে হাঁটি হাঁটি পা পা করিতে করিতে এক সময়ে এলমে মারেফাত অর্জন করিয়া মানব শিশুটি আল্লাহতায়ালার প্রিয় পাত্র হইতে

পারিবে নিশ্চয় জানি কিন্তু বলিব না, বলিলে তাহা যদি বর্তমান সমাজ যে ভাবে চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়- অথবা আলেম সমাজই তো আছেন তাহারাই জ্ঞানী গুণি ব্যক্তি বর্ণ তাহারাই বলিবেন ইত্যাদি ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও এমন ভাণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি যে, ধর্মীয় হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা আর খুলিব না-- খুলিলে যদি কেউ নিয়া যায়- ধর্ম এ তো আমার নিজস্ব সম্পদ, এ আর কোন মানুষের নয়। এমন রক্ষণশীলতায় পড়িয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত ডুকরাইয়া কাঁদিতেছে- শূন্য হাতেই নিজের অশ্রু নিজে মুছিয়া মুষ্টিবদ্ধ হাতওয়ালা মানুষটিকে হাহাকার করিতে করিতে কখনও ঈমান শূন্য হইয়া ইহলীলা ত্যাগ করিতে হইতেছে। ইহা যে কী হৃদয় বিদারক ঘটনা তাহা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারেন। আর একটি বিষয় হইতেছে তাহার কর্মফল তিনি যখন বুঝিতে পারিবেন তখন তাহার কিছুই করার থাকিবে না। তাহাকে অবশ্যই শুধু আফসোস করিয়া মরিতে হইবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি সত্তার একটি নিজস্ব গভী এবং বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এখন সেই ধর্মগুণ ব্যক্তি জীবনে আত্মীকরণ ব্যতিরেকে কে পারে যে তাহার ধর্মীয় জীবনে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করিবে? এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই ব্যক্তি জীবনটা শুরু জীবনের কোন সময় হইতে? উহার উত্তরে বলা যায়, এল্‌মে মারেফাত বিদ্যা অর্জন ও চর্চার শুরুটা হইতে হইবে শিশুকাল হইতে। ইহাতে মতবিরোধ থাকিতে পারে। কেহ হয়ত বলিবেন, শিশুকালে এ বিদ্যার গুরুত্ব কি শিশুরা বুঝিতে পারিবে? তাহাদের তো বুদ্ধি ও মানবীয় বৃত্তির পরিপক্বতা আসে নাই। হ্যাঁ ঠিক, কথাটি সর্বাংশে সত্য। কিন্তু শিশুদের মধ্যে এল্‌মে মারেফাতের পরিচয় জ্ঞানটা দিতে দোষ কোথায়?

শিশুদের মধ্যে এলমে মারেফাতের পরিচয় বীজ উগ্ধ না করিলে যখন তাহারা বড় হইবে তখন আর সেই জ্ঞান যতই তাহাদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করা হইবে না কেন, তাহাতে কিছুই ফল আসিবে না। বরং তখন তাহারা শুধু বমি করিবে, হজম করিতে পারিবে না। বাংলায় একটা সুন্দর প্রবাদ আছে, তাহা এই যে, যাহার আক্কেল হয় না ন' বছরে, তাহার আক্কেল হয় না নব্বই বছরে। 'আশা করি ইহার পর এ বিষয়ে আর কোন কথা বলার দরকার নাই।

এখন আসা যাক্ মুসলিম সমাজে এলমে মারেফাতের ব্যাপ্তি ও চর্চা এত অপ্রতুল যে, যতই দিন যাইতেছে ততই যেন চর্চাহীন অবস্থায় সমাজ হাহাকার করিয়া যাইতেছে। মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে প্রদীপ রহিয়াছে অথচ সেই প্রদীপ নির্বাপিত। শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এক কথায় আবালবৃদ্ধ বণিতা সবাই করিতেছে যে স্বাভাবিক ধর্মকর্ম-- করিলেই যেন পরকালের বৈতরণী পার হওয়া যাইবে। আসলে কি এই ধারণা সঠিক? উত্তরে যে কী বলিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। কেননা উত্তর নাবোধক এবং জটিলতাপূর্ণ। একটি উদাহরণেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে, একজন লোক আজীবন যাবতীয় ধর্মাচার প্রতিপালন করিয়া গেল কিন্তু তাহার কাল্‌বসহ অন্যান্য লতিফায় 'আল্লাহ' জিকির জারী না থাকার কারণে সমস্ত বিশ্বাসের ঝুলি, কর্পূরের মত শয়তানের প্ররোচণায় তথা কুরিপূর প্রভাবে বাতাসে উড়িয়া যাইবে।

সুন্দর সমাজ গঠন করিতে হইলে সর্বাত্মে জোর দিতে হইবে মানবীয় দোষ গুণি বর্জন এবং গুণাবলী অর্জনের উপর। অন্যথায় সমাজে যেমন বিশৃঙ্খলা অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ি এবং বক ধর্মিকে ভরিয়া যাইবে তেমনি সভ্যতা ও উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রবাদ আছে যে “Pen is Mightier than sword” এই প্রবাদ কে কখন কি অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আমার জানা নাই তবে, আমার মনে হইতেছে যে “Mind or heart is mightier than pen and pen is mightier than sword”

তাহা হইলে সবচেয়ে বড় হইল কোনটি? উত্তর সুস্পষ্ট আর তাহা হইল Mind or heart.

একজন মানুষ তাহার বিশ্বাস কে তাহার হৃদয়ে এবং অন্যান্য লতিফায় জারী করিলে তাহার ক্ষতি হওয়ার কোন আশংকা থাকে না। এমন কি তিনি হইয়া উঠেন, একজন আদর্শ আলোকিত মানুষ। মানব সমাজ তো বটেই অন্যান্য সকল সৃষ্টি তাহাকে শ্রদ্ধা করে। তাহার পদধূলি গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

১৬/১/১৬ ষোলমারা

কিশোরগঞ্জ

অপরাধ দমনে উপবাসের মনোজাগতিক প্রভাব

পশু আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য বিচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে জ্ঞান দান করার মত জ্ঞান আমার নেই। তবে উহার চিত্রায়নের সহজ দক্ষতা আমার অর্জন হয়েছে কি না তা বিচার করার দায়ভার যাঁরা আমার প্রবন্ধটি পাঠ করবেন তাঁদের উপর রইল।

সমাজে কেন অপরাধ বিস্তার লাভ করেছে তার বহু কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে কোন্ কারণটি প্রধান এবং কোন্ কারণের ভয়াবহ প্রভাবে মানব সমাজ প্রায় পশু সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে তোর যৌক্তিক বর্ণনা এ প্রবন্ধের বোধ করি উদ্দেশ্য হতে পারে। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সুস্থ সভ্যতা বিনির্মাণে মানুষের মনোজগত যে বিশাল কাজ করে ইহার মধ্যে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

ভোজনপ্রিয় অর্থলোলুপ এক লোককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, আপনি তো খুব ভাল লোক তাই না? সে উত্তরে শুধু মৃদু হেসেছিল। তার এ মৃদু হাস্যের রহস্য তার কর্মকাণ্ডে পরিষ্কার ছিল। তার কর্মকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু এটুকু চিত্র প্রদান করাই যথেষ্ট যে, তার আসুরিক প্রভাবে নিরীহ মানুষ শান্তিতে ধরাধামে বসবাসের সুযোগ হারিয়াছে।

বস্তুগত ও বৈষয়িক, উন্নতির পাশাপাশি আমাদের মনোজাগতিক উন্নতি অর্জনের চেষ্টা করা যে কতটা জরুরী তার ধনাত্মক উদাহরণ হাজারে দু'একটা দেয়া যেতে পারে কিন্তু ঋণাত্মক উদাহরণ দেয়ার আবশ্যিকতা নেই। কারণ সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এত বেশি যে তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না।

এদেশের প্রচার মাধ্যম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যে,এ চিত্রের ভয়াবহতার রূপ কী রূপ! কিন্তু উপবাস ও মনোজাগতিক উন্নয়ন সম্পন্ন কারীর দু'একটি নমুনাও যদি প্রতিনিয়ত মানুষ অবলোকন করতেন তবে বোধ করি আমরা অসুরের কর্মস্পৃহা থেকে বিরত থেকে বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে উৎসাহিত হতে পারতাম।

যাক্ সে কথা এ জন্য শুধু প্রচার মাধ্যমকে বলে লাভ নেই। আরও বহু মাধ্যম ও বিদ্যের ধারক বাহকরা আছেন যাঁরা এ কাজটি করতে পারেন।

পৃথিবী বা কোন গ্রহই স্বর্গ নয় যে এখানে অপরাধ চিহ্ন থাকবে না। তবে মানব জীবনে শান্তি বা স্বর্গের আবশ্যকতা অস্বীকারের কোন কারণ নেই। এ স্বর্গীয় রূপ ধারণের উপায় কী, তারও অনেক,ব্যাখ্যা ও কথা পণ্ডিতজনেরা বলতে পারেন। তারা হয়ত যুক্তি দিয়ে বলবেন,ক্ষুধার্ত বাঘ অতি সতর্ক থাকে কখন তার উপাদেয় খাবারটি সম্মুখে চলে আসবে এবং গদ গদ করে হালুম হালুম বলে খেয়ে নেবে। তার জন্য অর্থ্যাৎ বাঘের জন্য এটি কোন অপরাধ নয়। কারণ তার বিবেক নেই, গুণ নেই, ন্যায়- অন্যায় এবং অপরাধ বোধ নেই। কিন্তু মানুষের বেলায় কী হবে? এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে, যাঁরা বলবেন,তাঁরা কোথায়? প্রকৃত অর্থে মনের ও জ্ঞানের মানোন্নয়নের জন্য মনো জগতে কী পরিমানে ধনাত্মক শক্তি এনে দিতে পারে তার ব্যাখ্যা এরূপ কর্তব্য পালনকারী মহাপুরুষগণই দিতে পারেন।

এখানে একটি কথা উঠতে পারে যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিদ্যের তো কোন মূল্য নেই। তারা যথেষ্ট চলছে, চলবে। আসুরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এ মানুষেরা কোনদিনই প্রবন্ধকারের নিজে এক ফোঁটা জল বিন্দু,আর প্রবন্ধটি আর ফোঁটা জল বিন্দু এ দু ফোঁটা জল বিন্দু দু' নেত্রের কোনায় জাগিয়ে

কলিজা নিংড়িয়ে এরূপ আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে হৃদয়ে প্রতিস্থাপন করে হৃদয়চারীর মত হৃদয়ের মধ্যে ঘুরাঘুরি করতে করতে হয়ত একদিন মানব সমুদ্রে না হোক জল সমুদ্রে পৌঁছা সম্ভব হবে। আর সম্ভাবনার কথা ভেবেই অপরাধ দমনে উপবাসের মনোজাগতিক প্রভাব যথা গুরুত্ব দিয়ে আপনি গেয়ে চলেছি,কেউ শুনুক আর না শুনুক।

জ্বলন্ত সমাজ অঙ্গার নিভাতে পানি হচ্ছে উপবাসরূপ মহৌষধ আর বাতাস হচ্ছে দমন নীতি। এ নীতিতে সময়ে সময়ে অপরাধ চিত্র কখনও কখনও আরও লেলিহান প্রজ্জ্বলিত হয়ে জ্বলে ওঠে। তখন তাকে সর্বসহা থেকে ব্যাধ রূপে ধনুক দিয়ে তীর বিদ্ধ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। রাজন্যবর্গরা সেরূপ করাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু এতে আবারও শান্তির ঘুম হারানোর সম্ভাবনা থাকে বৈ কি। মানব জাতির কুলমান রক্ষের মহৌষধ নৈতিকতার পানির জলাধার যে রূপ এক হাতে থাকার দরকার সেরূপ বিধ্বংসী ঘৃণীঝাড়ও দরকার। অন্যথায় মনোজগতের অসুরের খিল্ খিল্ হাসির পথও রুদ্ধ হবে না, সুন্দর মানব সমাজ বিনির্মাণেও পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৪/০১/২০১৪

ঢাকা।

কেন্দ্রবিন্দু

বিচিত্র সমাজ কাঠামোর বিচিত্র ধরণের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত অবস্থা আমাদের মধ্যে উপলব্ধি হইতে পারে। মানুষের প্রধানত দুইটি জাত। আর তাহা হইতেছে নারী ও পুরুষ। এই দুই জাতের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ ও অন্তর্মিল চিরন্তন সত্যের মত আমাদের নিকট উদ্ভাসিত। আদিম মানব সমাজ হইতে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে গঠিত আজকের আধুনিক মানব সমাজ যতই পরিবর্তনের হাওয়ার মুখ দেখুক না কেন পরিবারতন্ত্রের অন্যতম প্রধান চরিত্র নারী বিভিন্ন রূপে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে যাহাই বলুক না কেন এই নারীর মনোজগৎকে বিশ্লেষণ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা হইতেছে এই যে, তিনি একভাগ বহন করেন স্নেহ-ভালবাসা আর নিরানন্দের ভাগ বহন করেন বিষয় সংশ্লিষ্ট মোহ। আর তাঁহাকে ঘিরিয়া জড়াইয়া থাকে রূপ লাষণ্য। সুতরাং এইরূপ লাষণ্য দেখিয়া মরু মরিচীকার মত ভ্রম হইতে পারে তাহা আর না বলিলেও চলে।

তর্ক ও যুক্তির খাতিরে কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন এই নারীরা তো নরম কোমল তাহারা কি করিয়া দৃঢ় চরিত্রের অধিকারিণী হইবেন তাহা আর এই যুগে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। তাঁহারা যে কি পরিমাণে বিষয় মোহের মধ্যে থাকেন তাহা তাঁহাদের সাজানো গোছানো সংসারের দিকে খেয়াল দিলেই সহজে বুঝা যাইবে। একটা পুরুষ সাংসারিক বিদ্যা আর কতটুকু রপ্ত করিতে পারে তাহার চেয়ে একজন নারী বহুগুণ বেশি পারদর্শী। তিনি যদি সন্যাসিনী বা বৈষ্ণবীও হন তবু এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা মিলানো ভার। আর এ বিষয় মোহ তাঁহারা রপ্ত করেন জন্মগতভাবেই। প্রকৃতি যেমন আপনাআপনি নিজে নিজে সুসজ্জিতা হইয়া নয়নাভিরাম রূপে ফুটিয়া উঠে ঠিক তেমনি একজন নারী

সমভাবে বিষয় মোহে গড়িয়া উঠে। ইহা তাঁহাকে কাহারো শিখাইয়া দিতে হয় না বা শিখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনও নাই। আর কখন ও কখনও তাঁহাদের এই বিষয় মোহের অনলে পুড়িয়া কত পুরুষের সুকুমার বৃত্তি যে ছাই হইয়া যায় তাহার সংখ্যা কে দিবে। আমরা সব সময়ই বিচার করি বাহিরের চমক দেখিয়া বা কখনও মুগ্ধ হইয়া মৌমাছির মত ফুলের উপর পড়া। পরক্ষণেই বাঁপাইয়া ইহার বিষ খাইয়া মরিয়া যাই। যে পৌরুষ দুনিয়া জয় করিত তাহা নিমেষেই ভুলুষ্ঠিত হইয়া আত্মগরিমা হারাইয়া শামুকের খোলসের মত পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে। আমি গল্প জানি না। গল্প বলিবার ভঙ্গি যদি আমার মধ্যে থাকিত তবে তাহা জুড়িয়া দিতাম। সমাজের পরিবারের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন নারীকে স্বচ্ছ আয়নার মত মানুষের মধ্যে তুলিয়া ধরিতাম। তাহারা কিভাবে তাহাদের স্বগোষ্ঠীয় শাশুড়ীকে মাকে স্বামীকে বোনকে বিপরীত লিঙ্গের অনুরূপ সকলকে নাস্তানাবুদ করেন। কিভাবে নিজের আখের গোছানোর ফন্দি ফিকির করিয়া একান্নবর্তী একটি সংসারকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া বহুখন্ডে বিভক্ত করিবার জন্য তৎপর হইয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। আর সমস্ত দোষ সুকৌশলে চাপাইয়া দেন পুরুষের উপর। যাক্ এ বিষয়ে বিস্তারিত বলিতে গেলে কেহ হয়ত রাগ করিবেন, কেহ হয়ত বাহবা দিবেন। অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়াও দিব্যি দিয়া বলিতে হইতেছে যে, সংসারে নিজের জায়গাটি কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া নেওয়ার মত কৌশলী তাহার চেয়ে পারদর্শিনী আর কেহ নাই।

সারা দুনিয়াব্যাপী দেখা যাইতেছে যে, যেখানেই একটি সংসারের অস্তিত্ব আছে সেখানেই একজন নারীর অবস্থান রহিয়াছে। তিনি তাঁহার স্নেহের বন্ধন দিয়া গোটা সংসারের বিষয়টিকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা পৃথিবীতে উহার ব্যতিক্রম একরকম লক্ষ্য করি না। বরং নারীবিহীন সংসার অগোছালো পুতুল খেলার সংসারের মত। যাবতীয় পুতুল খেলার সরঞ্জামাদি এখানে ওখানে যে রকম

করিয়া ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়িয়া থাকে পুতুল খেলায় নিছক তেমনি শুধু পুরুষ থাকিলে কোন সংসারে উহার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। আর একটি বিষয় হইতেছে এই যে, নারী তাঁহার সংসার বাঁধার আধা দিয়া তিনি তার ইচ্ছা দ্বারা কোন একটি নগন্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারেন। যাহা একটি পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহার যে কি পরিমানে সম্মোহনী শক্তি রহিয়াছে তাহা বলাই মুঞ্চিল, পুরুষ একটি কাজ করিলে বা করিবার প্রাক্কালে দশবার ভাবিয়া লয় কিংবা কাহারো সাথে পরামর্শ করিয়া লয় কিন্তু নারী তাহার প্রয়োজন রোধ করেন না। উহা তাঁহার আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ইচ্ছাটি তিনি সহজেই বাস্তবায়ন করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার স্নেহের গুণে শিশুরা অন্ধ, রূপ লাভগ্যের গুণে যুবরা পাগলপ্রায় আর বিষয় ভিত্তিক সম্মোহনী গুণে বয়স্করাসহ সামগ্রিক ভাবে সকলেই আকৃষ্ট হয়। এক কথায় তিনি সকল আকৃষ্টের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং নারীকে কামনার রূপ বা পণ্য হিসাবে আখ্যায়িত করা কতটা যুক্তি সংগত বরং উহা একটি ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৭/৯/২০১৪

ঢাকা

যেখানে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়

পৃথিবীর সবচেয়ে আদিমতম পেশার নাম কি, কেহ যদি প্রশ্ন করে তবে নির্ধ্বায়ে তাহার উত্তর হইবে শিকার। আবার কেহ যদি বলে যে পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম সংগঠন কি? উত্তর হইবে পরিবার। এখন এই শিকার বা পরিবার কবে, কোন স্থান হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বা প্রচলিত আছে তাহার সঠিক ইতিহাস কেহ বলিতে পারিবে না। পরিবারে থাকিয়া খাদ্যাভ্যেমে পরিবারের মেয়েরা বা ছেলেরা পূর্বকালে বাহির হইয়া যাইত অদূরে কোন বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত বা নদী নালা সমুদ্রে, রাতে আসিয়া ছন বা গাছের ডালা বা পাতা দিয়া তৈয়ারী ঘরে ঘুমাইয়া যাইত পরিবারের প্রধান এবং নবীন সদস্যরা। ধীরে ধীরে পারস্পারিক বন্ধন তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। পরিবারের বন্ধন যতই প্রবল হইয়া উঠিল ততই তাহারা সঙ্গী হইয়া উঠিল। পারিবারিক নিরাপত্তা বিশেষ করে মেয়েদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঘর দরোজা ইত্যাদি বানাইতে শিখিল। বাড়ীর আঙ্গিনায় বিভিন্ন ফল ফলাদির গাছ গাছালী তাহারা লাগাইতে শিখিল। কারণ কোথাও কোন গাছ হইতে, কেহ একটি ফল যদি অন্য জায়গায় নিয়া যায় তাহা যে কোন মাটিতে ফেলিলে তাহা গজাইয়া যায়। পাকভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের এমন কোন স্থান নাই যেখানে বীজ ফেলিলে গাছ হয় না। সুতরাং ফল আহরণ এবং ফলারের পর পর মাটি কর্ষণ এবং বীজ বপনোত্তর ফসল উত্তোলনের আক্কেল প্রকৃতি থেকেই মানুষ পাইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। শিকার করা হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া জীবন যাত্রার চাহিদা পূরণ কল্পে ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ পরিমার্জন হইয়া কৃষি নামক ব্যবস্থায় পা রাখিয়াছে মানব সমাজ। এখন আমি এই কৃষির উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা রাখিতে

চাই।বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষক এবং কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি কৃষক এবং কৃষির পরিসংখ্যান নিতে যাই তাহা হইলে দেখিব যে,কৃষকের সংখ্যা আশি ভাগ। এই কৃষক যুগের পর যুগ নয়, শতাব্দী কি হাজার, লক্ষ বছর ধরে জন্ম-জন্মান্তর ধরে পেশাটি ধরিয়া রাখিয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে,এ পেশাটি কি অপরিবর্তনীয়? না কি কোন কালে কোন কারণে পেশাটির বিলুপ্তি ঘটবে। উত্তর নিঃসন্দেহে দেওয়া যায় মাটির সাথে মিশিয়া আছেন যিনি উহার আকর্ষণ ক্ষমতা অন্য পেশার উপকরণের চেয়ে প্রাকৃতিক ভাবেই বিলুপ্ত বেশি। ইহা ছাড়া অন্য তিনটি উপাদান। যথা- পানি,বায়ু এবং আলোর আবশ্যকতা, এই পেশায় বিদ্যমান। আসলে চারটি উপাদানই প্রাকৃতিক। এই প্রকৃতি যখন যেভাবে পরিবর্তন হইবে সেই রূপ পেশাটির বিবর্তন দেখা দিবে। কিন্তু উক্ত পেশার কোন বিলুপ্তি ঘটবে না কারণ সমগ্র প্রকৃতির সংগে বিজড়িত বলিয়া যতদিন থাকিবে প্রকৃতির সাথে জড়িত পেশা জীবীরা, উহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেমন উপযুক্ত পরিবেশের দরকার তেমন উদ্ভিদসহ অন্যান্য প্রাণিকে বাঁচিতে হইবে তাহাদেরও উপযুক্ত পরিবেশের দরকার। এই পরিবেশ যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণির বাঁচিবার জন্য একটি খাদ্যচক্র যথারীতি বহাল থাকিবে। সমস্ত জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণি একে অপরের খেকো। যেমন মানুষ খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণি খায়- তাহার চেয়ে কম শক্তিদ্র ও অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণিকে। প্রাণিসমূহ আবার খেয়ে ফেলে তাহার চেয়ে ছোট উদ্ভিদ ও প্রাণিকে। এইভাবে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলিতে থাকে। ক্রমাগত হত্যা ও গলাধকরণের কার্যাদি চলিতে থাকিলেও উহাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় আছে। উহাতে বিজ্ঞানের অযাচিত হস্তক্ষেপ বরং ভারসাম্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা তৈয়ারী করে। বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যিক। আমি এখন এ বিষয়টি খোলাসা করিব।

কথা হইতেছিল মাটি ও প্রকৃতির সংগে মিশিয়া থাকা মানুষ লইয়া। এই মানুষগুলো কি রকম, তাহাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি? উহা ভালরূপে প্রথমেই উপলব্ধি করা দরকার। প্রকৃতি স্রষ্টার এক অপরূপ সৃষ্টি। এই প্রকৃতি তাহার বিপুল-বিশাল রূপ বৈচিত্র্য দিয়া মানুষকে তাহার দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে। ফলে মানুষ হইয়া যায় প্রকৃতির মত- বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাহার মধ্যে দেখা যায় প্রকৃতির সরলতা। ভাবাবেগে নদীর কল্ কল্ স্রোতের মধ্যে, উষর মরুভূমির নিখুঁত নির্জনতার মধ্যে, গহীন সবুজ বনে কিংবা সমতল ভূমির পেলবতায় নিজেকে হারাইয়া মানুষগুলো হইয়া যায় প্রকৃতির পুতুল। প্রকৃতির ক্রীড়ানড়কে রূপান্তরিত হইয়া নিজেকে ভাসাইয়া দেয় জারী সারি, ভাওয়াইয়া আরও জানা অজানা, গানের জগতে। স্রষ্টার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তাহার মধ্যে আকুলতা দেখা দেয় ধরার রূপ-রস-গন্ধ সম্যক উপলব্ধি করে তাহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। উদ্ভিদ জগৎ প্রাণি জগৎ এবং ভূ-প্রাকৃতিক রঙ বৈচিত্র্য হইতে তাহাকে আর পৃথক করার উপায় থাকে না। এক এক সময় জীব জগৎ যেমন তাহাদের ভাষায় স্রষ্টার স্মরণে মগ্ন হয় তেমনি তাহারাও সেইভাবে নিজেকে ভাবিতে শুরু করে। সারাদিন মাঠে ঘাটে কর্মব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যা হইলে বসে কব্‌তাল এক তারা লইয়া, ভজন সংগীত গাইতে থাকে। সমগ্র দুনিয়ার এই পেশাজীবীরা আকারে প্রকারে ভিন্ন হইলেও অন্তর্গত ভাবে এক এবং অভিন্ন।

বিজ্ঞানের আর্শীবাদে নাকি অভিশাপে আজিকার মানুষকে আর নিজ হাতে খাটিয়া পরিশ্রম করিয়া কিছুই করিতে হয় না, আজিকে সর্বত্রই পরিবর্তনের হাওয়া লাগিয়া গিয়াছে। এখন আর কৃষককে হালের বলদ দিয়া চাষ করিতে হয় না। কলের লাঙ্গল দিয়া চাষবাস হইতেছে। প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলিয়া খ্যাত কেঁচো মাটি-উপর নিচ তথা চাষ করিবে তো দূরের কথা নিজেই কলের লাঙ্গলের ধারাল

পোচে দ্বিখন্ডিত হইয়া মরিয়া যাইতেছে। অন্যান্য সব পোকা মাকড় এনড্রিন খাইয়া দলে দলে মারা পড়িতেছে। নিজেকে, নিজের আত্মাকে চিনার জন্য ভজন গাইবে কি করিয়া, শত শত টেলি চ্যানেল অসাড় মেলা বসাইয়া দিয়াছে মাঝিকে আর পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া হাল ধরিয়া থাকিতে হয় না বরং ইঞ্জিন চালু করিয়া কর্কশ শব্দ যোগে নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বোকার মত চাহিয়া থাকিলেই হয়। প্রাণ হরণ করা গান মাঝির কর্তৃক হইতে বিদায় লইয়াছে। আবেগের স্থানে দখল লইয়াছে যান্ত্রিকতা।

আমার ধারণা হইতেছে এই যে, বিগত শতাব্দীগুলিতে যে মনন-নান্দনিকতা জন্ম লইয়াছিল, ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আজকে মাত্রারিক্ত সুখ আরাম আয়েশের নামে সেই অমূল্য আত্মজ সম্পদ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে মানব জাতির মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে তাহা অন্য প্রসঙ্গ। আমি শুধু বলিতে চাই এত বাড়বাড়ি কেন? আমি পুরাতনের সাফাই গাহিতেছি না। আমি শুধু বলিতে চাহিতেছি এই যে, দেহের ভাল চাহিয়া কি মনের মৃত্যু ঘটাইতেছি না? যাহা হউক মনন নান্দনিকতা, লোকজ সংস্কৃতি সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতা যেভাবে বাঁচিয়া থাকে আমাদেরকে তাহাই করিতে হইবে। মানুষ যেরূপ ইচ্ছা করিলে পাহাড় সাগর মহাসাগর, নদী চাঁদ সুরক্ষ বানাইতে পারে না সেইরূপ ইচ্ছা করিলে চিরায়ত লোকজ সংস্কৃতিও সৃষ্টি করিতে পারে না উহা কালক্রমে তৈরী হয়। মানুষ ক্রমে ক্রমে তাহা আত্মস্থ করে। উহাকে গলা টিপিয়া মারার অধিকার কাহারো নাই।

কেহ কেহ চাষী মাঝি কামার কুমার জেলে তাঁতীকে মুর্থ এমন কি সমাজের পশ্চাদ পদ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া গালাগাল দেন। উহা কতটা যুক্তিযুক্ত। এমন কি এ প্রশ্নও উঠিতে পারে যে, এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। আরো উত্তোরোত্তর উন্নতি হইতেছে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের।

তাহা ছাড়িয়া কি এই পেশাজীবীরা আদিম অন্ধকার যুগে ফিরিয়া হইবে? নাকি ব্যবহারিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া উন্নত জীবন যাপন করিবে?

ভাল কথা, আদিম সকল যুগে যেমন অনেক বিষয়ে সত্য ও সুন্দর বিদ্যমান ছিল এখনও বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত অনেক বিষয় আকর্ষণীয় মনোমুগ্ধকর বিষয় আছে। আসলে আমাদেরকে মৃত্যু ও সুন্দরের সবটুকু নির্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। উহাতেই মঙ্গল নিহিত। এই সত্যাসত্য বিচারবুদ্ধি যাহাদের নাই তাহাদের কি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে? এক কথায় উত্তর হইতে পারে পশু। আমরা এই পশুর দলে নাই। মুর্দা কথা হইতেছে এই যে, মানুষ তাহার প্রাণের শক্তির শেকড় খাঁটি ও প্রকৃতির আরও গভীরে প্রবেশ করাইবে যে মানুষ নৈতিকতার রথে চড়িয়া আরও উর্দ্ধলোকে উঠিয়া যাইবে, বিজ্ঞান ও বস্তুতাত্ত্বিক জ্ঞানের উন্নতি করিয়া সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের মঙ্গল নিশ্চিত করিবে, আধ্যাত্মিকতার উন্নতি করিয়া আপন প্রাণকে স্রষ্টার সহিত সম্পর্ক করাইবে, সমগ্র মানব জাতির আহার যোগাইবে আমরা তাহাকেই শ্রদ্ধা করি। প্রকৃতির মধ্যে লেপ্টে থাকা পেশাজীবীরাই নমস্য যে খানে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়।

১০/০৯/১০

কিশোরগঞ্জ

প্রথা

জলে বাস করিয়া যেমন কুমীরের সাথে লড়াই করা যায় না তেমনি প্রথার ভিতরে থাকিয়া প্রথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়া শোভনীয় নয়। ইহা সত্ত্বেও প্রথা লইয়া দুই চারি কথা কহিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আষ্টে পিষ্টে পিঠমোড়া বাঁধিয়া লইয়া প্রথাই লইয়া যাইতেছে সময় ও কাজের জীবন্ত চলন্ত জীবন যানকে।

কোন প্রথার কথা কহিব? ইহা কি মনুষ্য রচিত প্রথা? যাহা বলিব বলিয়া ভাবিতেছি? না ইহা সাধারণ মনুষ্য রচিত প্রথা নহে। দেবদূতগণ যাহা মানুষকে একবার শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া সমাজ পরিবার রাষ্ট্রের মধ্যে চালু করিয়া দিয়া ইহার ভিতরে থাকিয়া চলিবার নামই প্রথা। প্রথা যখন শুরু হইয়াছিল তখন উহার মধ্যে প্রাণ ছিল। আন্তে আন্তে পুরনো হইতে হইতে উহার প্রাণপাখি উড়িয়া গিয়াছে। এখন উহাতে রহিয়াছে নিষ্ঠুর লৌহ নির্মিত কাঁটা যুক্ত খাঁচা। এই কাঁটা সমেত খাঁচার খোঁচা গায়ে গায়ে লাগিয়া গা আর অস্তুর ফোটা হইয়া যাইতেছে প্রতি মুহূর্তে উহা আমরা টের পাইতেছি। উহা যে শুধু টের পাইতেছি তাহা বলিলে ভুল হইবে। প্রথার খোঁচা খাইতে খাইতে নাভিশ্বাস উঠিতেছে। কিছু বলিবার জো নাই।

ধর্ম বর্ণ জাতি ভেদে প্রথার অবিশ্বাস্য রকম প্রভাব আমরা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব কিনা তাহাই ভাবিয়া দেখিতেছি। তাহা না হইলে উহার গুরুত্ব বোধগম্য হইবে কি না সন্দেহ থাকিয়া যাইবে।

ন্যাশানাল জিওগ্রাফীর কল্যাণে দেখা যাইতেছে যে কোন এক উপজাতির যৌবনে উত্তীর্ণ যুবাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ স্তন এবং উহার

আশেপাশে ধারালো ব্লেড দিয়া চামড়া উঠাইয়া দিয়া রক্তাক্ত করা হইতেছে, যুবার মুখে ডাটা দিয়া চিবাইয়া খাইতে বলা হইতেছে আর কিছু লোক চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া সোরগোল করিতেছে। প্রথার নিয়ম প্রতি পালনার্থে বুড়ো সমাজপতি কিংবা পুরোহিত মন্ত্র বা বুলি আউড়াইয়া যুবাদের পুরুষোত্তম করিবার ফিকির করিতেছে। হায়রে পুরুষোত্তম পুরুষ। যেই শরীর সেই শরীর থাকিয়া যাইতেছে, মাঝখানে তাহাদের শরীর রক্তাক্ত হইল, ব্যথায় উহ্ আহ্ করি বার শক্তি পর্যন্ত নাই। পুষ্টি না খাইয়া শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া যাহা করা হইতেছে তাহা বীরত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অলীক কল্পনা মাত্র কি না তাহা পন্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিবেন। এখন এইরূপ প্রথার বিলুপ্তির জন্য বা উহার অসাড়া দোষাইয়া এই সমাজের শক্তিমান ধী সম্পন্ন কেহ যদি ব্যতিক্রম উপদেশ প্রদান করেন তখন প্রথমেই প্রথার ভিতরে থাকা, গুন্ডা পাভারা প্রথা রক্ষার অজুহাতে শক্তিমান ধীরের অধিকারীকে কুপোকাত করিবার মানসে চিন্তার জগতে কুলাইয়া উঠিতে পা পারিয়া পশুর মত শারীরিকভাবে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে উহাতে আর সন্দেহ কি আছে।

ধর্মীয় প্রথার বাড়াবাড়ির কথা বলিতে গেলে হয়ত নিবন্ধ দিনের আলোক দেখিবার সাথে সাথে আবার অন্ধকার বন্ধ প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ হইয়া যাইবে। আর উহার রচয়িতা বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গ দ্বারা আবৃত হইবে, সুযোগ সৃষ্টি হইলে তাহার জীবন অবসান করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ তিনি রক্তমাংশের শরীরে সত্যশ্রয়ী উন্নত আত্মিক শক্তি প্রবেশ করাইয়া মানুষকে উন্নত মানুষ করিবার কথা কহিতেছেন। তিনি হয়ত এই গভীর ভিতরেই আর বসবাস করিতে পারিবেন না। কারণ অতীতে এই রকম দিব্যত্ব অথবা অলৌকিক দ্যুতির কথা কহিয়া কিংবা উহার ভিতর থাকিয়া কোন মহা পুরুষই স্বস্থানে মাতৃভূমিতে বসবাস করিতে পারেন নাই। অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে কখনও

কখনও অসুর পাভা দ্বারা ছুরিকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছে। অবশেষে সত্যের জয় হইয়াছে আবার মহাপুরুষের অনুসারীরাই এক সময় হয়ত মহাপুরুষ প্রদর্শিত সত্যালোক নিভাইয়া শুধু আচার সর্বস্ব প্রথার মধ্যে হাবুডুবু খাইবে। এমতাবস্থায় প্রথাকে আমরা প্রথা না বলিয়া শাদার ধারণা বস্তুর উপর ময়লাবৃত ধারণা বা ময়লাবৃত বস্তু বলিয়া অভিহিত করিব? না বোধ করি যুক্তি সংগত হইবে না। ইহা শুনিয়া কেহ কেহ ক্ষেপিয়া যাইবেন।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল, সত্যশ্রয়ী ধারণা কালে কালে বিভিন্ন রূপ হইতে পারে কিন্তু সত্যশ্রয়ী সুর কাল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে ইহার পবিত্রতায় কেহ আঘাত করিতে পারে না। উহা যেমন শুনা যাইবার কথা তেমনি শুনা যায়। কিন্তু যত ধারণার কথা বলি সমস্ত ধারণাই, মানুষ বদলাইয়া দিতে পারে এমকি মনগড়া প্রথায় আনিয়া সাধারণ মানুষকে উহা প্রতি পালনে বাধ্য করে।

উহার দুই একটা উদাহরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। যেমন কান্নার কথা বলি, মানুষ কাঁদিলে যে করুন সুর বাজিয়া উঠে তাহা আবহমানকাল ধরিয়া একই রকম এবং সর্বাবস্থায় এই কান্নার স্বর সুর মানুষের হৃদয় বিগলিত করে। একই ভাবে উচ্ছসিত সুখ বা হাসির ফোয়ারা মানুষকে আরও সুখানুভূতি দিয়া থাকে। এই সুখানুভূতিও একটি স্বর সুরের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে স্বর ও সুর যুগলে মিলিয়া মানুষকে ক্রমাগত টানিয়া নিতেছে ভবিষ্যতের দিকে, যথারীতি এবং যথাযথ ভাবেই। কিন্তু নৈতিক ধারণা সেই রকম কাজ করিতে পারিতেছে না বরং উহার অঙ্গহানি করিয়া উহাকে ভুতুরে চেহারায়া রূপান্তরিত করিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িতেছে প্রথা নামক কিস্মুতকিমাকার দৈত্য।

প্রথা যে কত প্রকার এবং কত দিকে যে উহার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ প্রথার কিয়দংশ বর্ণনা না করিলে বোধ করি অতৃপ্তি থাকিয়া যাইবে। রাজ দরবারে রাজকীয় প্রথায় রাজ রাজরাগণ সেলামী গ্রহণ করিতে থাকে। উহার ব্যতিক্রম হইলে রাজ কর্মচারীর গদান যাইবে কিংবা চাকুরীচ্যুৎ হইবে সেই কর্মচারী।

ব্যবসায়ীরা ব্যবসার দোকান খুলিয়া প্রথমই “ধূপ বাতি জ্বালাই বারংবার সেলাম ঠুকিয়া নমস্কার জানাইয়া তবেই ব্যবসা শুরু করিয়া থাকে। উহার অন্যতা কদাচিৎ দেখা যায় গৃহিণীরা সন্ধ্যা বাতি না জ্বালাইলে মনে করে ঘরে অলক্ষী ঢুকিয়াছে। সর্বত্রই যেন প্রথার ছড়াছড়ি। প্রথা না বলিলে যেন আমাদের একে বারেই চলে না। প্রথা আসলে আর এক অভ্যাস এবং ঐতিহ্যেরই নামান্তর মাত্র। উহা গায়ে সহ্য হইয়া গিয়াছে। উহা না থাকিলে বা না রপ্ত হইলে যেন খালি খালি মনে হয়।

গাঁয়ে বসবাস করিতে হইলে গাঁয়ের লোকেদের পঞ্চায়েতের প্রথা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে, না হইলে লোকেরা মাতব্বরের প্ররোচনায় একে একে সবাই সরিয়া যাইবে এবং একঘরে করিয়া ফেলিবে এবং শহুরে লোকেরা এলাকা ভাগ করিয়া লইয়াছে। তাহারা এই এলাকায় থাকিয়া থাকিয়া নিজেদের ভদ্র মনে করিয়া তৃপ্তির টেকুর তুলে। সকলের দরোজা বন্ধ থাকিবে। আঁট সাট টাইট করিয়া নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিত করিয়া তাহারা চলিবে। ইহা যুগযুগ ধরিয়া চলিয়া আসা প্রথা।

বিপরীতে গাঁয়ের লোকেরা দেউড়ি খুলিয়া আঙ্গিনায় ডালিম গাছ রোপন করিয়া কিয়ৎ পরিমানে গোচণাদির জঞ্জাল রাখিয়া চলিবেই। উহা তাহাদের অভ্যাসজাত। গোচণা ছন খড়ের ছড়াছড়ি তাহাদের বসতবাটীর ঐতিহ্যজাত প্রথা। বখাটে গুন্ডারা বাড়ী দখল কাগজ পত্রাদি কিংবা বংশশক্তির দুর্বলতা দেখিয়া সেখানে হানা

দিয়া শক্তি দেখাইয়া, হাতে চুড়ি পরিয়া বাবরীচুল, ফ্রেঞ্চ কাটিং দাঁড়ি রাখিয়া আজগুবি ধরণের পোষাক পরিয়া প্রশস্থ মোটর সাইকেলে চড়িয়া দেখাইয়া দেখাইয়া শক্তির মহরা দিয়া চলিবে আর অবৈধ কামাই করিয়া ফেনসিডিল, মদ গাঁজা খাইয়া বেশ্যা নারী লইয়া ফুটি করিয়া ভদ্রলোকদের শাসন করিয়া চক্ষু লাল করিয়া সদৃশে চলিবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে। এখন তাহারা আবার গণতন্ত্রের লেবাস ধরিয়া কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলীয় আবরণে, ছদ্মাবরণে পরিচিত হইয়া চলিতেছে। উহাতে তাহাদের সামাজিক সমর্থন বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে হাজারো কথা বলা যাইবে প্রথার উত্থান পতনের বিষয়ে তাহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না বরং প্রথার যাঁতা কলে পিষিয়া পিষিয়া সুন্দর মানব জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রথার গুরুটা মনোমুগ্ধকর প্রাণযুক্ত কিন্তু উহার শেষটি আচার সর্বস্ব, প্রাণহীন। উহাকে লালন করাও চলে না আবার দ্যুতিশক্তি অর্জিত না হইলে প্রথার মধ্যে প্রাণও প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় না।

প্রথার শরাঘাতে কত প্রাণবায়ু দেহ হইতে উদগত হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেওয়া সমীচীন হইবে না আবার আজিকার কাদাকার অথচ অতীতের ঝলমলে প্রথাও আসিয়াছে অর্বাচীনের হাতে নয়, শ্রেষ্ঠ মানুষের পবিত্র হাত ধরিয়া।

যুগে যুগে ক্ষয়-লয় পাইয়া বা বর্ধিষ্ণু গতরে শক্তিশালী হইয়া শ্রেষ্ঠ মানুষের নাম ভাঙ্গাইয়া এই প্রথাই আবার মনুষ্যত্বহীন বাগাড়ে রূপান্তরিত হইয়া ইতিহাসের আন্ত্যকুড়ে নিষ্কিপ্ত হইয়াছে প্রথার বলির শিকার মানবাত্মা যখন হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠে তখন চিরন্তন সুন্দর সত্য আসিয়া প্রথার ঘাড় মটকাইয়া দিয়া মানব জাতিকে উদ্ধার করে।

৩১/১০/২০১২ ষোলমারা কিশোরগঞ্জ

প্রতিভা অবরুদ্ধ হলে মানুষ দিশেহারা হয়

আজকাল মানুষের দৈনদিন জীবনে অনেক ঝামেলা বাড়িয়া গিয়াছে। এই ঝামেলা কেন বাড়িয়া গিয়াছে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। তবু কিছু আলোকপাত করা আবশ্যিক। মানুষ সরল সাধারণ জীবন থেকে সরিয়া গিয়া জটিল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যান্ত্রিক উন্নতির কারণে। যত যন্ত্র ও যান্ত্রিকতার উন্নতি সাধন হইতেছে ততই যেন তাহাদের জীবনে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন কৃষকের কথাই ধরি, এক সময় একজন কৃষক কাক ডাকা ভোরে লাঙ্গল জোয়ালা কাঁধে চাপিয়া হুস হুস করিতে করিতে দুইটি বলদ গরু সামনে জুড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বসত বাটার অদূরে উদোম গায়ে গামছা কপালে বাঁধিয়া মাঠে চলিয়া যাইতেন। উষায় খাওয়া পান্তা কাঁচা মরিচ দুপুরে উদর হইতে নিঃশেষে হইতে না হইতেই তাহার তের বৎসরের কিশোরী ঘা গরি পরিহিত হইয়া শূঁটকি তরকারী সমেত মোটা ভাত আর পানি লইয়া পৌঁছিয়া যাইত তাহারই বা জানের সন্নিহিতে। দুপুর গড়াইয়া সন্ধ্যা হইলে তবেই চাষবাস শেষ করিয়া মলিন মুখে ধূলা উড়াইয়া উড়াইয়া পূর্ববৎ ঘরে ফিরিতেন কৃষক। রাতের গুরুতে আসর জমিত বৈঠক খানায় জারি সারি পুঁথি পাঠের। ঘন্টা দুই তিনেক পল্লীসুরে আবেগ জড়িত এই সব কণ্ঠ জড়িত ভাব আনিয়া পুলকিত করিত কৃষক হৃদয়। অবশিষ্ট রাত তাহারই প্রিয়তমা স্ত্রীর কণ্ঠ লগ্না হইয়া কাটাইয়া কৃষকটি পরবর্তী দিনের কর্মসূচী নির্ধারণ করিত।

বর্তমান কালের কৃষকে জীবন যাত্রার তুলনা মূলক চিত্র আঁকিলে ঠিক তাহার বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হইবে। আমি এইখানে পক্ষে তিন থেকে পাঁচ

শতাব্দী পূর্বের কৃষকের জীবনের সুখ- শান্তির কথা অনুল্লেখ রাখিলাম। তাহার কারণ হইল এই যে উহা সহ্য হইবে না।

আজকাল কৃষককে জমিতে যাইতে হয় না। কলের লাঙ্গল চাষের কাজ করে। নিজ হাতে জমি নিড়াইতে হয় না। নিড়ানি যন্ত্র দিয়া নিড়াইয়া নিলেই হয়। ধান গরু দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাড়াই করিতে হয় না। বরং মাড়াই কলে দিয়া মাড়াই করিয়া নিলেই হয়। গরুর গোবর জমিতে দিতে হয় না বা বাতীর আঙ্গিনায় জমানো ছাই জমিতে দিবার প্রয়োজন নাই। কম্পোষ্ট, ফসফেট আর ইউরিয়া সার দিয়া ধান ফলাইয়া গোবরের গরুত্ব বহুলাংশে কমাইয়া দিয়াছে। তাহা হইলে কৃষকের কাজ কি? কৃষক এখন কৃষক নয়। কৃষক জমি নামক কারখানার কলের যন্ত্রপাতির সমন্বয়কারী। কর্মকর্তার মত তাহাকে আর নিজ হাতে কিছুই ছুঁইতে হয় না। বরং সব কিছুর দেখভাল করিলেই হয়। তাহাদের সময় কাটে না কৃষক এখন সময় কাটায় সন্ধ্যার পূর্বে বা সন্ধ্যায় গ্রামের বাজারের চা-ষ্টলের মধ্যে আড্ডা দিয়া কিংবা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন স্বর্ষস্ব বেসরকারী টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন প্রধান হাসি তামাসা সর্বস্ব কথিত নাট্য রূপের বাক্যালাপ শুনিয়া শুনিয়া তাহার শরীরে অলসতার বৈশিষ্ট্য রূপ মেদ জমিয়া গিয়াছে। কাজ না করিয়া অপরের কাজের বদনাম করিতে করিতে রাতের নয়টা দশটা বাজাইয়া তবেই ঘরে ফিরিয়া সুখের ঢেকুর তুলিয়া বাঁচিতেছে কৃষক। এখন কৃষকের কাজের ভিতরে সবচেয়ে বড় কাজ হইল রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা এবং নিজ অধিকারে রক্ষিত ভোটের সময়ের অপেক্ষা করা যাহাতে তাহার সমালোচিত দলের বারোটা বাজাইয়া দিতে পারে নির্বাচন আসিলে। সরকারের দায় পড়িয়াছে তাহার সুখের গ্রাম তুলিয়া দিবার লাগি। কারণ তাহাদের ভাষায় সরকার বানায় তাহারাই অর্থ্যাৎ কৃষকরা। হয় দুর্ভাগ্য জাতির এ কি কৃষকের চরিত্র। নাকি গ্রামীণ মধ্যস্বত্ব ভোগী ভূমিহীন বা ভূমিদস্যু টাউট বাটপারের চরিত্র। তাহা বুঝা যাইতেছে না কাজহীন থাকিয়া

মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে অপরূপ হইয়া প্রকৃত কৃষক চরিত্র আজ দিশাহারা হইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মরিতেছে তাহা অতীত বর্তমান কালের কৃষকের জীবন ধরণ লইয়া পর্যালোচনা করিলে সহজেই চোখে পড়ে।

বণিকগণের কথা বলিলে গা শিহরিত হইয়া কাঁটা দিয়া উঠিবে। তাহারা তাহাদের দোকানের মাঝখানে রক্ষিত দ্রব্যাদি যাহা বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা সাধারণের চোখে পড়ার নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিয়াছে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি যাহাতে পঁচিয়া না যায় তাহাতে মশামাছি বসিতে না পারে, যাহাতে সুন্দর দেখা যায় শুধু সেই জন্যই ফরমালিন, কার্বাইড নামক বিষ মিশাইয়া অবলীলায় বিক্রয় করিতেছে। জানিয়া শুনিয়া আমরা সকলেই তাহা কিনিতেছি, কিছু বলিবার উপায় নাই, তাহা হইলে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট করিবে সপিংমল বন্ধ করিয়া দিবে। তাহাতে না খাইয়া মরিতে হইবে। না খাইয়া মরিবার চেয়ে বিষ খাইয়া অর্ধ মরা হইয়া রোগে শোকে ভুগিয়া বাঁচিয়া থাকা ভাল। এখানে কী দেখা গেল বণিক বা সওদাগর যাহারা উত্তম পোষাকে সজ্জিত হইয়া মানুষের শ্রদ্ধা কুড়াইত এক সময়, যাহারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সামান্য লাভে মানুষের ভোগ উপযোগী দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আস্তা লাভে ধন্য হইত এক সময় তাহা কি এখন আর সম্ভব হইবে? তথা কথিত আজ কালকার বণিকগণের বাণিজ্য বিবেচনার ক্ষেত্রে। কত তাড়া তাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া যায়, তাহাই এখন লক্ষ্য এখন এই অভিশপ্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য দিশেহারা পাগলপ্রায় ছোট বড় বণিক গণ। ব্যবসা বাণিজ্যে অসততা ঢুকিয়া, অসততার বিষপোকা মাথায় কামড়াইয়া মাথা ব্যথা করিয়া দিয়াছে ফলে কে মরিল, কে বাঁচিল কাহার কি ক্ষতি হইল, কি না হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ নাই। প্রতিভা কখন অপরূপ হয় না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। উহার একটি সুন্দর সহজ সূত্র রহিয়াছে সূত্রটি উপলব্ধিতে রাখিলে আমরা অনায়াসে নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে সফল

হইতে পারিব এখানে সূত্রটি উল্লেখ করা যায়। মানবজাতির বিষয়টি প্রথমেই বিবেচনায় আনা যায়। যে কোন মানুষের জন্য শুরুতেই জরুরী হল তদীয় স্রষ্টার খুবই কাছকাছি প্রিয় অবস্থানে আছেন এমন জীবন্ত বা মরণোত্তর চিরঞ্জীব মানুষের সংস্পর্শে আসা। দ্বিতীয়তঃ কালী সাধক রাম প্রসাদ করের মত নির বিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা জগতে মা কালীর নিরাকার শ্রদ্ধাস্পদনাম স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন ঠিক সেইরূপ ভাবে নিজ নিজ স্বর্গীয় মুরব্বী গণের নাম অবিরত স্মৃতিতে ধরে রাখা কর্তব্য। এখানে বলে রাখা ভাল, স্মৃতিতে ভক্তিয়োগ্য দরবেশের নাম চৌম্বকীয়ে আকর্ষণ দিয়ে বিগলিত রাখার জন্য সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তার নাম মুখে তথা জিহবায় জপ করলে ভাল হয়। তাহাতে কল্পনা শক্তি অন্যত্র ধাবিত হয় না তৃতীয়তঃ ভাল লাগা বিষয় তথা ধী শক্তির সাথে সঙ্গতি পূর্ণ কাজটিই শুধু করে যাওয়া অ্যাঁমিবার মত নিরাপদ প্রাচীর তৈরী করে। ইহাতে ধীমানের ধী বিকশিত হইবে। ধীশক্তি বিকাশের জন্য ইহাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। অবশ্য নাস্তিক্যবাদীর জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যক্রম নাস্তিকের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তৃতীয় কাজটি, আন্তিক নাস্তিক সকলের জন্য প্রযোজ্য কর্তব্য।

এখন আসা যাক প্রতিভা অপরূদ্ধ হয় কিভাবে এবং কাহার দ্বারা? প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তা আপনাপন অস্তিত্ব ধরিয়া রাখার জন্য কিংবা সুখ সম্ভোগের জন্য প্রতিভা বিকাশের যাচিত কাজটি না করিয়া কিংবা কোন অজুহাতে কম করিয়া মানুষ নিজেই নিজের প্রতিভা বিকাশের পথ অপরূদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে ভিতর শূন্য ফাঁকা বাঁশের মত হইয়া কখনও কখনও এইরূপ অপরূদ্ধ ব্যক্তি অসাড়েঁর তর্জন গর্জন করে অথবা দিশেহারা হইয়া পাগল প্রায় হইয়া সংসারে পড়িয়া থাকে। ইহা যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইবার বিষয় নয়। অস্থির চিত্ত দিক জ্ঞানহীন কোন ব্যক্তির দর্শন পাইলে ইহার সত্যতা প্রমাণ হইবে। নিজেকে নিজে শক্ত রশির বাঁধন দিয়া বাঁধিয়া কায় ক্লেশে সমস্ত নিন্দা দুর্গাম হিংসা উপেক্ষা করিয়া

যখন নিজকার্যে আত্মগ্ন থাকিয়া কালান্তিপাত করিতে থাকিবে তখনই তাহার যথার্থ উন্নতি হইবে। অস্থিরতা উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপে নামিয়া আসিবে। কোন ছাত্র তাহার ছাত্রত্ব বাদ দিয়া তথা পড়ালেখা বাদ দিয়া অন্য দশ কাজ করিয়া বেড়াইলে যে তাহার ছাত্রত্ব থাকিবে না, তাহা কে না জানে। তবে উহা সত্য যে ধীমানগণ একধারে এবং একই সময়ে দশটি কাজ সমাপ্ত করিতে পারেন। তাহাতে তাহার এক কাজের প্রভাব অন্য কাজে পড়ে না। ধীমানগণ সর্বদা নিজ মনে সক্রটিসের সেই

নো দাইলফ' অর্থাৎ

‘নিজেকে জানো’ মহাকালোত্তীর্ণ সত্য বাক্যটি জগত রাখেন। মহাকর্ষ শক্তির মত তাহারা লাগিয়া থাকেন গুণের বহরে। তাঁহাদের বাগাড়ে ফেলিয়া দেওয়া এত সহজ নয়। তাঁহারা সন্তা করতালি বা উপস্থিত প্রশংসা ভাল চোখে দেখিয়া আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন না।

এতো গেলো নিজ হইতে নিজেরই কাছে ছুটিয়া প্রতিভা বিরুদ্ধ বিপদ। কিন্তু অন্যের কাছ হইতে আসা আক্রমণ সমাজ বা রাষ্ট্র হইতে আসা বিধি নিষেধ যাহা প্রতিভাধরের স্বাভাবিক কাজে ব্যপকভাবে বাধার সৃষ্টি করে। তখন এই গুণী ব্যক্তির পক্ষে তাহার প্রতিরোধ দেয়াল টিকাইয়া রাখা খুবই কঠিন হয়। অবস্থানভেদে প্রতিবাদ প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। গুণ বিকাশের ক্ষেত্রে যথার্থ উন্নয়ন না হইয়া থাকিলে, প্রতিবাদ প্রতিরোধের শক্তি থাকিলেও সেই পথে না গিয়া স্থানান্তরিত হইয়া এড়াইয়া গিয়া আড়াল হইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ প্রকৃত আত্ম-উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরী আবশ্যকীয় উপাদান হইল কাজ করার সহায়ক উপযুক্ত পরিবেশ। যাহা গুণীকে উন্নতির উন্নত মার্গে প্রবেশ করাইবে। গুণী তাহার শ্রমঘন আত্মোন্নতির পথে না গিয়া বিরুদ্ধ শক্তির সাথে প্রতিবাদ প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অযথাই শক্তিক্ষয় হইবে এমন

কি অপঘাতে অপমৃত্যু হইতে পারে। তাই বলিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে না? অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে সেই যুদ্ধ হইবে সাধনা জগতে পূর্ণতা আসিবার পর। কারণ যুদ্ধ করিবার জন্য অন্যান্য শক্তি থাকিলেও যে আধ্যাত্মিক শক্তি দরকার তাহা না থাকিলে যুদ্ধে জয় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এমন কি নানা আকর্ষণে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের পথও রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। এইজন্যই বোধ করি বলা হয় লালন শাহের গানে ‘আপন সাধন-ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা আপনাতে আপনি হইবে সাবধান।’

১৯/১১/১২

উপজেলা সমাজ সেবা অফিস

কিশোরগঞ্জ, সদর।

‘ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় না, যুদ্ধ করিতে হয়’

একচোর তাহার শরীর কালি দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া তাহাতে তৈল মর্দন করিয়া সন্তর্পনে পা টিপিয়া টিপিয়া যখন সিঁদ কাটিতে গৃহস্থ বাটাতে রওনা দিল তখন তাহার মনে হইল না গৃহস্থ তাহাকে ধরিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া তাহার শরীরের বারোটো বাজাইবে । এইখানে তাহার ইচ্ছা পরিণতির দুর্বল প্রতিরোধকে পরাস্ত করিয়া জয়ী হইল ।

রাখাল তাহার মসৃণ লাঠি দিয়া পিটাইয়া পিটাইয়া গরু কিংবা মহিষের পালকে ধাবরাইয়া ধাবরাইয়া যথেষ্ট গমন আর খাওয়া হইতে বিরত রাখে । ইহাতেও রাখালের ইচ্ছা বা অভিলাষ গরু বা মহিষের অভিলাষের বিপরীত দিকে অবস্থান নেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ধরিদ্রীর আর এক নাম হইতেছে সর্বৎসহা । ইহারই বড় একটি উপাদান হইতেছে মাটি । উহার উপর হইতেছে ইচ্ছামত অত্যাচার । কিন্তু জড় বিধায় তাহার প্রতিকার বা প্রতিরোধ নাই । ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ইচ্ছায় হোক আর যাহাই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটির ব্যবহারকারীর বাধগাই শক্তিশালী রূপে প্রতিভাত হইবে । তবে কোন ভুল করিয়া ফেলিলে মাটির ধর্ম মতে তাহার নিচে থাকিলে ধরসিয়া মাটি চাপায় পড়িয়া মরিবার ভয় উড়াইয়া দেওয়া যায় না ।

কেহ মৌচাকে নিরাপদ দূরত্বে না থাকিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিলে মৌ মাছির কামড়ে কামড়ে তাহার যে কি দশা উপস্থিত হইবে, তাহা কি আর বলিবার অপেক্ষা রাখে? পৃথিবীতে যত বড় বড় কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে তাহা কাহারো না কাহারো ইচ্ছার জোড়হেই হইয়াছে । ইচ্ছার পরবর্তী ধাপ হইল কাজ । আর অলস না হইলে কেহ কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না । আর ইচ্ছা যত প্রবল হইবে

কাজের পরিমানও তত বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে অলসতার কোন জায়গা নাই। এই ইচ্ছাশক্তি প্রাণীজগৎ তো বটেই উদ্ভিদ জগৎ এমন কি জড় পদার্থেরও রহিয়াছে। তবে তাহা বাকরহিত এবং তাহা কল্পনা তো দূরের কথা বুদ্ধিবৃত্তির অতীত, শুদ্ধতম আত্মা দ্বারা অনুমেয়।

কী হইবে তাহা না ভাবিয়া পেটের দায়েই হোক আর বিলাসিতার জন্যই হোক আধুনিকা সাজিয়া এক যুবতী যদি মনে করে তাহার শরীর নারকীয় নর্দমায় ফেলিয়া দিয়া নারকীয় সম্ভোগে বিগলিত হইবে তাহা কি আইন দিয়া বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যাইবে? আর প্রবল বিপরীত সৎ ইচ্ছা থাকিলে সেই নারীর ক্ষতিগ্রস্থ, হইলেও চিরস্থায়ী সততা সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি তাহা দ্বিগুণ তিনগুণ শক্তি লইয়া আদর্শ স্থানীয় হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তাহার সাময়িক ক্ষত স্থান অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সেই নারী হইবে মহিয়সী।

দুগ্ধধবল স্বচ্ছ কোন বস্তু খোলা মেলা বহুদিন পড়িয়া থাকিলে যেমন ধূলাবালুতে ভরিয়া যায় তেমনি মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ কাজে ব্যবহার না করিলে মানসিক ও শারিরীক ব্যধিতে আক্রান্ত হয় এ বিষয়ে আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না।

মানুষের জীবন এত অনিত্য যে কোন সময় প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাই প্রতিটি মুহূর্তের ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর কাজ মানুষকে তাড়া করিয়া ফেরে। বলা বাহুল্য যে, এ জায়গায় সুস্থ ইচ্ছা প্রয়োগে বাধা হইতেছে অলসতা এবং কাজ অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়ার প্রবণতা। বর্তমান সমাজে দেখা যাইতেছে যে, যাহারা কাজ করিয়া খায় তাহাদের রোগ বালাই অপেক্ষাকৃত কম। তবে খাদ্য উপাদানে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকা চাই। আর যাহারা কাজ করিয়া খায় না বরং সম্পদের অটেল প্রবাহে গড্ডালিকায় গা ভাসাইয়া দেয় তাহাদের রোগ যন্ত্রনার শেষ নাই।

মানুষকে ইচ্ছা চিন্তাও শারিরীক শক্তির সমন্বয় করিয়া সুনির্দিষ্ট মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া, লজ্জা, ভয় এবং ঘৃণার উর্ধ্বে উঠিয়া নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একাত্ম মনে কাজ করিয়া যাইতে হয়। ইহাতে সফলতা মিলে। ধ্বংস ও গড়ার বিপুল ক্ষমতা যাহার মধ্যে বিদ্যমান তাহাকে তো সাবধান হইতেই হয়।

যাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং জ্ঞান নাই এবং মঙ্গল করিবার সামর্থ্য নাই তাহার আর এই বিদ্যা স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। সব কাজ এক মানুষে করিবে না। এক এক মানুষে এক এক কাজ করিবে তবেই যাহার কাজ তাহার তাহার দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হইবে তাহা কি আর কহিতে হয়? বর্ষাকালে পানিকে প্রবল প্রবাহে নিচের দিকে খাল হইতে নদীতে চলিয়া যাইতে দেখিলাম সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম কি হে এমনভাবে যে চলিয়া যাইতেছে কয় মাস পরে সূর্যতাপে যে খাক-হইয়া যাইবে ইহা কি তোমার খেয়াল আছে! পানি অবলীলায় উত্তর দিল, ‘আহা ইহাই যে আমার স্বভাব।’

আমি কালপিপড়া দলকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘ও হে তোমরা বড় বিরক্তি কর। মিষ্টি জিনিস গুঁকিয়া গুঁকিয়া মিষ্টির নিকটে আসিয়া তাহাতে লাগিয়া গিয়া একেবারে চুষিতে থাক উহার কারণ কি?’ উত্তরে কহিল, ইহাই আমার স্বভাব, তিতায় কখনও আমাদের যাইতে দেখেছেন?’ আমি বিস্ময় বিমুঢ় হইয়া শুধু তাকাইয়া রহিলাম। বুঝার বাকী রহিল না যে উহার স্বভাব দ্বারা চালিত, আমরা মানুষ ইচ্ছা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান দ্বারা চালিত।

সর্পের পিঠে আঘাত পড়িলে সর্পকে তাড়া করিলে কিংবা সর্প নিজে তাহার সামনে উপস্থিত মানুষ বা অন্য কোন জীবজন্তুকে দেখিয়া ভয় পাইলে তবে ছুটিয়া আসিয়া ফুঁস ফুঁস করিয়া ফণা উঁচু করিয়া বিষ দাঁত বসাইয়া দেয়। উহা কি তাহার ইচ্ছা বা নিয়তের বহিঃ প্রকাশ না ভয় বা আত্মরক্ষার কৌশল?

এখন ফিরিয়া আসি রাজকার্য লইয়া। রাজা তাহার ইচ্ছানুযায়ী বা প্রজা সাধারণের মঙ্গলার্থে রাজ ফরমান জারী করিয়া রাজ্য বাসীকে তাহা প্রতিপালনে বাধ্য করেন। অন্যথায় দণ্ড নির্ধারণ করেন। অন্যদিকে পশুরাজ সিংহের গর্জন বড়। তাহার গর্জনে বনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠে। তাহাতে বনবাসী সকল জন্তুর কান খাড়া হইয়া যায়। ভয়ে ছুটাছুটি করিয়া পালাইয়া নিজ নিজ নিরাপদ আশ্রয়ে ভাগিয়া যায় কিন্তু কেশ রাজের শাসনে সকলেই যে নাই-ইহা দিবালোকের মত সত্য। কারণ একটু পরেই বনবাসী জানোয়ারগণ যথেষ্ট আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ তাহার অভিলাষ চরিতার্থ করিতে হিংস্র বন্য জন্তুকে আটক করিয়া চিড়িয়াখানায় প্রদর্শনী চাঁজ বানাইয়া ফেলে।

জলের স্বভাব নিচের দিকে গড়াইয়া যাওয়া কিন্তু এই স্বভাবকে সাথে লইয়া চলিতে জলের যে কী কষ্ট! তাহা জল ছাড়া আর কাহারো পক্ষে উপলব্ধি করা বোধ করি সম্ভব নয়। কোথাও নিজ হস্তে মাটি খনন করিয়া কোথাও ফুঁসিয়া উঠিয়া, কোথাও দম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কোথাও আবার দ্রুততার সাথে নামিয়া তবেই তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়।

শরীর তাহার স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করিয়া হ্রষ্ট পুষ্ঠ হইয়া সুস্থ থাকে। কিন্তু খাদ্য কমাইয়া দিয়া কিংবা বাড়াইয়া দিয়া সে সুস্থতা হারায়। এই স্বাভাবিক নিয়মকে ধরিয়া রাখিতে শরীরকে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হয় অর্থ্যাৎ কাজ করিতে হয়। ইহা যে শরীর করে না সে শরীর প্রাকৃতিক নিয়মেই ধ্বংস বা লয় প্রাপ্ত হয় ইহা কে না বুঝে। মুনি ঋষি, বিরাট ধনাঢ্য কিংবা নিঃস্ব সকলকেই যে কিছু না কিছু শরীর খাটাইতে হয় তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন তাহারা গতর খাটাইতে লজ্জা পান, চিন্তা করিতে কষ্ট পান, আত্মার উন্নতি সাধন করিতে ভয় পান, তাঁহারা যে

কী করিয়া গছব্যে পৌঁছিবেন তাহা জোর দিয়া বলিতে পারি না। এই রকম লোকের সংখ্যা যে বেশিই হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব নিজ মনে নীতি বাক্য রপ্ত করিয়া, আত্মস্থ করিয়া, গডালিকা প্রবাহে গা না ভাসাইয়া, চোখ কান খোলা রাখিয়া চলিলে যে উপযুক্ত কাজ হইবে তাহা জ্ঞানতঃ দৃঢ়ভাবে বলা যায়।

২৩/১০/১১ কিশোরগঞ্জ।

বাংলাদেশে সমন্বিত সার্বজনীন সাধারণ এবং ললিতকলা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা:

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞা

পৃথিবীর জ্ঞানী, গুণি এবং মহামানবগণ যা বলে গেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা না গেলেও তার কিয়দংশ প্রতিপালিত হলে সমাজ তথা কল্যাণকর রাষ্ট্র অনেক অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে। সমাজতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীগণ পথ-প্রদর্শক হিসেবে যে বাণী কার্যক্রম এবং আবিষ্কার রেখে যান তার স্বত্বাধিকারী পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে যায়। এই উত্তর প্রজন্ম কল্যাণ রক্ষার বাড়তি সংযোজন-বয়োজন করার সময় নিজ নিজ চিন্তার অশুভ লেজুড় লাগিয়ে দেন। ফলে লেজুড়বৃত্তির আগাছা বৃদ্ধি পেয়ে সুচিন্তার সুফল সমূলে বিনষ্ট হয়।

সুপথ হতে সুফল ফলবে এ-ই স্বাভাবিক। সুপথ বলতে কী বুঝায়? সে পথে বা মতে চললে সৃষ্ট জীবের অকল্যাণ বা অনিষ্ট হয় না তাকেই যথার্থ পথ বলে আখ্যা দেয়া যায়। এই জীবন পদ্ধতি বা পথ নিয়ে দার্শনিকগণ নানা মত দিয়েছেন। প্রবাদ বাক্যে আছে “Many men Many mind” অর্থাৎ নানা মুণির নানা মত। কালির কাল অক্ষরে মহাজ্ঞানীগণের নির্দেশনা মুদ্রিত আছে। ইহাকে অনুকরণ, অনুসরণ করতে গেলে কোন সমস্যা তো নেই-ই বরং ফলাফল ভাল হয়। কিন্তু কেহ কেহ উল্টো কাজটি করেন। জীবনে সততা চর্চার পরিবর্তে অসততা চর্চা করেন। অন্তর্গত জগৎ রাজ্যে অসততা আর বাইরে অর্থ্যাৎ চর্ম চক্ষুস্থান জগতে প্রদর্শিত হয় সাধুতা। এ রকম জীবন যাপন ভীষণ খারাপ। এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন, ‘সাধু হও, সাধু সেজ না’।

এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে “বিজ্ঞানমুখী সাধারণ শিক্ষার সহ-শিক্ষা হিসেবে ললিতকলা শিক্ষা একাডেমিক শিক্ষার গুরু থেকেই ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গ।” এ রকম অন্তর্ভুক্তি করার বাধ্যবাধকতা আবশ্যিকতা অথবা অনাবশ্যক চর্চিত চর্চন বলে অনেকে বিতর্ক সৃষ্টি করবেন জেনেও ইহার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে যুক্তি উপস্থাপন করছি। যাতে শিক্ষার সর্বাত্মক রূপ মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ধর্মের পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সংস্কৃতি। ধর্মমত বা ধর্মান্ধতা যেমন মানুষকে বেরোয়া করে তোলে, তেমনি ধর্মপ্রাণতা, মানুষকে মানুষ করে তোলে। পৃথিবী হয়ে ওঠে স্বর্গরাজ্য। এই ধর্মপ্রাণতার আর এক নাম হচ্ছে সংস্কৃতি। জনৈক মনিষীর অভিমত হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের জন্য সংস্কৃতিই হচ্ছে ধর্ম। মানুষসহ সৃষ্ট জীবের ধমনী যখন ত্রিাশীল থাকে তখন উহার স্বাভাবিক চলাচল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে ছন্দ বা তাল, লয় বিদ্যমান। যখন এ ছন্দের পতন হয় তখন মৃত্যু হয়েছে বলে স্পষ্ট বুঝা যায়। আন্তিক মাত্রই জপতপ সম্পাদন করেন। তা সে যে ধর্মেরই হোক। এখন ওই কাজটি যদি কেউ দোলে দোলে, ছন্দ-তালে-লয়ে-গীতে-সঙ্গীতে সম্পাদন করেন তখন তা উন্নত হয়ে সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে যায়। যেমন- ‘দরবেশী সামা, রাম কৃষ্ণ সংকীর্তন, নামযজ্ঞ, ভাব সংগীত, রাধারমনের গীত, বিজয় সরকারের গীত, হাসন রাজার গীত, লালনের গীত ইত্যাদি মরমী কবিগণের গীতি-কবিতার মন ভুলানো সংগীতের সুর মুর্ছনা।

এ সমস্ত সঙ্গীত গীতের ধারা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে, অনাদরে, অবহেলায়, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, কায়-ক্লেশে। এ জন্য কারে দোষ দেব। বৈষয়িক চেতনায় গড়ে উঠা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনও ভাব জগতকে উন্নতমার্গে নেবার সুব্যবস্থা করে দেয় না। কিন্তু উন্নত মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এ সিঁড়ি, সু-ব্যবস্থা যে খুবই জরুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ উপমহাদেশের বরেন্য কবিগুরু, বিশ্বকবি নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল অর্থের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র সংগীতসহ সংস্কৃতি ও ললিতকলা চর্চার সর্বোচ্চ পীঠস্থান। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মিউজিক বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স করার সুযোগ বিদ্যমান আছে তাতে আমরা এশিয়াবাসী গর্ববোধ করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উচ্চ শিক্ষার দোর গোড়ায় পৌঁছার পূর্বে কোন উপযুক্ত সিঁড়ি না থাকায়, বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রায় নেই বললেই অতুক্তি করা হয় না। শিল্পকলা একাডেমি, সামাজিক সাহিত্যিক অনেক প্রতিষ্ঠান ও ইন্সটিটিউট আছে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার মত ধাপে ধাপে দক্ষ-শিক্ষিত সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষাকারী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা,

J.S.C, S.S.C এবং H.S.C সার্টিফিকেট প্রদান করার মত কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সম্পন্ন নয়। যার ফলে সংস্কৃতি চর্চার সমন্বিত কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি শিক্ষার সর্ব নিম্নপর্যায় থেকে।

ব্যাপারটা খোলাসা করা আবশ্যিক। ধরা যাক, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ধারা থাকলেও প্রত্যেক ধারার উদ্দেশ্য প্রায় একই। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম শ্রেণি থেকে এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, অনার্স, মাস্টার্স পাশ দেয়া যায়। কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা একই রকম। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, নূতন প্রচলিত কিণ্ডারগার্টেন, বেসরকারী বহুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গজিয়ে উঠেছে। ভালই হয়েছে। শিক্ষিত সমাজ জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত।

হায়রে কপাল! এ সব শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতির সংযোগ কই! এস.এস.সি পাশ করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক কোন শিক্ষা অনুশীলন আবশ্যিক কী! বোধ করি আবশ্যিক নেই। বরং কেহ যদি অন্যভাবে ললিতকলার এ গুণটি পারিবারিক ভাবে অথবা পূর্বোল্লিখিত সামাজিক কোন শিল্পকলা চরু কারু কেন্দ্র থেকে শিখে নেয় তবে যদি একটু আধটু জানতে পারে। আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এইযে, একেবারেই স্ব-ইচ্ছায় বেড়ে ওঠা আউল-বাউল শ্রেণির গায়ক, সাধকগণ গীত-সঙ্গীত অর্থ্যাৎ ললিতকলার বিভিন্ন উপায়কে ভিক্ষার উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছেন। যার ফলে এটি মান মর্যাদার নয় বরং দয়া দাক্ষিণ্যের পেশা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

মোটকথা আমাদের সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ললিতকলা বাধ্যতামূলক ভাবে সমন্বিত না থাকার ফলে বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগের মত ললিতকলা বিভাগ গড়ে উঠেনা। ললিতকলা শিক্ষা অংকুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। এ দায়ভার কে নেবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় নাকি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়? ক্ষতিটা কার হচ্ছে? সামগ্রিক ভাবে ক্ষতি হচ্ছে পুরো জাতির। জাতিই সংস্কৃতি এবং ললিতকলা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির রক্ষা কবচ, ললিতকলা শিক্ষার সরাসরি অভিভাবক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সমন্বিত সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা ও ললিতকলা শিক্ষার শুভ সূচনা শিশুপাঠ থেকে শুরু করা হলে জাতি ইহার সুফল পাবে।

হাজার বছরের বাঙলা, বাঙালি জাতি তার ঐতিহ্যের মজ্জায় রস পাবে। সতেজ হয়ে ওঠবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ইহার একটি নমুনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি যখন মাতৃভাষার জন্য বাঙালি রক্ত দিলো তখন এ রক্ত প্রতিটি বাঙালির শিরা ধমনীতে সারা দিলো। এ রক্ত মানবজাতির রক্তে প্রবাহিত হয়ে গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে মাতৃভাষার বন্ধন এবং রক্ষার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছে। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও জাতীয় শহীদ দিবস হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালির গৌরবের শহীদ দিবসের উৎপত্তি কোথায়। উত্তর হবে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই প্রথম বুঝে নিয়েছিল, মাতৃভাষার বিকল্প হয় না। পশু পাখি যেমন তার ভাষায় কথা বলে তেমনি মানুষ জাতিও তার জাতি ভাষায় কথা বলে, ইহার কোন বিকল্প নেই, ইহাকে আরোপিত করা যায় না কোন ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে।

স্বাধীন দেশের মূল স্তম্ভ ভাষা-সংস্কৃতি ললিতকলার ঐতিহ্য প্রতিটি জীবনের শুরুতেই পঠন-পাঠনে-লালনে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলে, সমন্বিত ললিতকলা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযুক্ত থাকলে ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকতা মাথাচারা দিয়ে উঠে জাতিকে বিপদগামী অপসংস্কৃতির লালনকারী জাতিতে পরিণত করতে পারবে না। আকাশ সংস্কৃতির যুগে সংস্কৃতি চর্চার পরিধি ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে দেশ-কাল নির্বিশেষ বিশ্বের মানব জাতির কাছে নিমেষে জাতিতে জাতিতে আচার অনুষ্ঠানের সবাক দৃশ্য পৌঁছে যাচ্ছে। প্রচার-প্রসারের এত সুযোগ কোন কালেই ছিল না। এমন অবস্থায় মানহীন অশীল বাণীসহ দৃশ্য কোমলমতি শিশুর মানসিক জগৎ গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। অপসংস্কৃতির এ অত্যাচার থেকে নিকৃতি পাওয়ার উপায় একটাই। আর তা হচ্ছে শিশুদের শিশুকাল থেকেই নিজস্ব দেশীয় লোকজ সংস্কৃতির চর্চায়, শিক্ষায়, প্রশিক্ষণে অগ্রহী এবং ব্রতী করে তোলা। এতে অন্তর্গত জগৎ সুগঠিত হয়ে ওঠবে এবং দেশমাতৃকার যোগ্য নাগরিক হয়ে স্বাধীন জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আকাশ সংস্কৃতির ধোঁয়া এবং দূর্বায়ু মানসিক দৃশ্যপট থেকে উবে যাবে এবং মননে-মগজে আমরা সুন্দর সুগঠিত জাতি উপহার পাবো।

সংস্কৃতি ও সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কৃতি চর্চায় যে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে এবং তার পেছনে যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাতে যে ক্ষতি তা পুষাবে কী করে। এমন একদিন আসবে মূল লোকজ সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে এবং বিনা বাধায় অপসংস্কৃতি আসন পেতে বসবে এতে আমাদের জাতীয় সম্পদও নষ্ট হলো, আর অপসংস্কৃতির ভয়াল ছোবলে হারালাম নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, পাক ভারত উপমহাদেশে বিশ্বভারতী যেমন সংস্কৃতি জগতের উচ্চ শিক্ষার শুভ সূচনা তেমনি বর্তমানে প্রতিটি পাবলিক এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতি সমন্বয় এবং সংযোগ করে স্বয়ং সম্পূর্ণ অনুষদ সৃষ্টি করে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখছে তেমনি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ ললিতকলা একাডেমী শিশুকাল থেকে সার্বজনীন প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার সুসমন্বয়ে লোকজ সংস্কৃতি শিক্ষার নবসূচনা করে কিঞ্চিৎ হলেও সুনির্দিষ্ট জাতিগঠন মূলক সংস্কৃতি বিদ্যার বীজ ভূমিকা রাখতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। এ কাজটি যে মৌলিক তা একদিন প্রমাণিত হবে এবং টিকে থাকলে জাতির কাছে গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

২৫/০৩/২০১৮

কিশোরগঞ্জ।



বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রেরক

আলহাজ্ব অধ্যাপক ডাঃ এম.এ মান্নান এম.পি
সদস্য, মহিলা, শিশু ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সদস্য, উপদেষ্টা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রাপক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমি
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

জন্মাব,

সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। আমার নির্বাচনী এলাকা-১৬৩, কিশোরগঞ্জ-২ এর
পাকুন্দিয়া উপজেলার মফস্বল সাহিত্যিক ও হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞার
আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত সাংস্কৃতিমনা আওয়ামীলিগ পরিবারের সংন্তান। মফস্বল
এলাকার সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মফস্বল সাহিত্যিক ও হৃদয়চারী কবি
হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমীর গঠনতন্ত্রের আলোকে তালিকাভুক্তি
করার জন্য জোর সুপারিশ করা হইল।

তারিখঃ ১১/১১/১৬	
পরিচালক (পত্রাঃ)	
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	
পরিচালক (চলচ্চিত্র)	
পরিচালক (প্রযোজনা)	
পরিচালক (নাট্য কলা)	
পরিচালক (সংস্কৃতি)	
প্রবন্ধ পরিচালক	
উপ-পরিচালক	✓
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	
গবেষণা কেন্দ্র প্রকৌঃ	
সহঃ পরিচালক (উপ-সেবা)	

ধন্যবাদান্তে

আলহাজ্ব অধ্যাপক ডাঃ এম.এ মান্নান
সদস্য, মহিলা, শিশু ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
১৬৩ কিশোরগঞ্জ-২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১৬.৩১.৪.২০১২(অংশ)/০৮১

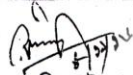
২৪ কার্তিক ১৪২৩
০৮ নভেম্বর ২০১৬

বিষয়: “অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও হৃদয়চাষী কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ” এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক স্থানীয় জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জকে সভাপতির দায়িত্বপালন প্রসংগে।

সূত্র: এ্যাডভোকেট মো: শরীফুল ইসলাম শরীফ, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ সদর এর ২৬/০৬/২০১৬ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রবদ্ধ প্রস্তাবের মূলকপি সংলগ্নীসহ এতদসংগে প্রেরণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, “অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফল সাহিত্যিক ও হৃদয় কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ” স্থান বাহরাম খান পাড়া, পাকুদিয়া এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক স্থানীয় জেলা প্রশাসককে সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : মূল প্রস্তাব সংলগ্নীসহ ৬৩ পাতা।


জি এম রফিকুল ইসলাম
উপসচিব (অধিঃ)
ফোন: ৯৫৫৩১৮৭

জেলা প্রশাসক
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। এ্যাডভোকেট মো: শরীফুল ইসলাম শরীফ, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।



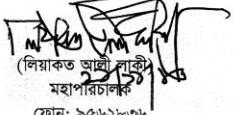
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা।

বাশিএ/প্রশা:(সংস্থাপন)/১৮ (ব)/৮৪/পাট-১/৬০৮

তারিখ: ২০/১১/১৬

বিষয়: মফস্বল সাহিত্যিক ও হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ, কিশোরগঞ্জ এর সভাপতির আবেদন।

মফস্বল সাহিত্যিক ও হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন লোকজ মঞ্চ এর সভাপতি জনাব মো: কফিল উদ্দিন এর ২৪-০৯-২০১৩ তারিখের পত্র, জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও মহিলা শিশু ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এর সুপারিশ সহলিত পত্রাদি (মূল কপি) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা হলো।


(লিয়াকত আহ্না পাট্টা)
মহাপরিচালক
ফোন: ৯৫৬২৮৩৬

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: বেগম ফাহিমদা আখতার, উপসচিব(অধি:৭)।



ছোটগল্প

বন্দি কাকাতুয়ার দীর্ঘশ্বাস

আচারসর্বস্ব এবং পোশাকী চর্চার কারণে মফিজ মিঞা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে সুনীতি লেবাহ দুরন্ত বলিয়া বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। আজানুলম্বিত কাবুলি পাঞ্জাবী মাথায় পাগড়ী আর এক বিষত লম্বা দাড়ি সমেত প্রায় ছাল ঘেঁষা মোছ দেখিয়া তাহাকে কউর কাঠ মোল্লা বলিয়া ভুল হইবে না। পায়ের গন্ডা হইতে মাথা পর্যন্ত ছতর ঢাকিয়া সমস্ত সুকুমার কানুন ইহার মধ্যে বন্দি করিয়া ফেলিয়াছে। সত্য সুন্দর মানবিক গুণাবলী লৌহ কঠিন আভরণ, খাঁচায় অসুস্থ আহত কাকাতুয়ার মত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। শুনিয়া শুনিয়া মিথ্যা অর্ধসত্য বিধি প্রতিপালনে প্রাণপাত ঘটাইতেছে। সজ্ঞানে-অজ্ঞানে অমীয়া শান্তির মধ্যে অশান্তির সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়াইতেছে। ইহারা জাতিতে কাঠুরিয়া। বাপের হাতে আড়াই সেরি কুঠার আর ছেলের হাতে এক সেরি সেই আশৈশবকালেই। তাহা হইলে কুঠার চালনাকালে শরীর যে কী পরিমাণে ঘর্মাক্ত হইতো তাহার কী বর্ণনা করিব-সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, গায়ে ছেঁড়া কাপড়-টুকরাও সহ্য হইতো কী না সন্দেহ। নেংটি পরিহিত মফিজ মিঞার মরণ সঞ্চারি বেদুইন চরিত্র তৈরী হইলো কী না কে জানে! গায়ে গরমের মরণ ভাস্কর মাখিয়াও পরনে জুব্বা! ইহা কী আত্ম চর্চা, না আচার সর্বস্ব সামাজিকতা চর্চা! কী বুঝিব?

মফিজ মিঞা দিনে দিনে বড় হইতেছে। সে এখন যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। বিবাহ উৎসবের নিমিত্ত উদভ্রান্ত! তাহার আকাঙক্ষার সাথে কন্যার স্বভাব মিলিত হইলেই চলিবে আর কি! আচারে আচরণে কঠোর অনুশাসন প্রেমী আর প্রাণশূন্য মহতী চেষ্টা মানুষকে জানোয়ার করিয়া ফেলিয়াছে আজকাল। বোধ করি এই রকম কোন কিম্বদন্ত নারী পিশাচী মফিজের চাহিদা। খুঁজিতে খুঁজিতে এইরূপ এক অনুশাসন পরাকাষ্ঠা পাওয়া গেল। যাহার দুইটা নেত্র ব্যতীত আর সবকিছুই যেন দর্শনরহিত। ইহার দোষগুণ দুই-ই আছে। মূল্যবান অঙ্গসৌষ্ঠব সুসংরক্ষিত রাখা এবং দুশ্চরিত্রের হায়না কবল হইতে আড়াল করার নিঃসন্দেহে ইহা একটি উৎকৃষ্ট অস্ত্র। মন্দটি হইল নিজেকে অপরের চোখ ফাঁকি দিয়া যথেষ্ট ব্যবহার, সঙ্কোচ করা যায়। কেউ কোন দিন টেরই পায় না। আর একটি ক্ষতিকর দিক হইল-রূপ সৌন্দর্য ও গুণের প্রকাশ-

বিকাশ ঘটে না আড়লেই থাকিয়া যায়। ফলে প্রতিযোগীতার সুযোগ পায় না। তাহাতে ফল যাহা হয় তাহা এই যে কুৎসিত কালো সুন্দরের দামে চলে। তাহাকে ঘৃণা করার কেউ সামনে থাকে না। অপর দিকে সৌন্দর্য অবহেলায় পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে মাটির সাথে মিশিয়া যায়। উর্ধ্বমুখী হওয়ার পথ খুঁজিয়াই পায় না-হীনমন্যতায় ভোগে, অনেক সময় গোমরাহ হয় বৈ কি! এখানে গুণের অপমৃত্যু কাহারো নজরে পড়ে না এমন কি তাহার অন্তর্নিহিত বিলাপ আমরা বুঝি না।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন এইরূপ মেয়ের সন্ধান পাইয়া গেলো মফিজ। তাহার কাঠুরিয়া বাবা আর দুইজন সাথী সমভিব্যাহারে মফিজ কনে দেখিবার মানসে কনের বাড়ি গিয়া হাজির। মেয়ে দেখার কিছু নাই কারণ সে সর্বাঙ্গ আবৃত। মেয়ের আচার আচরণ, কাজকন্মের গুণাবলী সবই সবে অবগত হইল শুধু খতিয়া দেখিবার বাকী রহিল মফিজের। যেই মফিজ তাহাকে দর্শন করিবে ভাবিয়া দুই অক্ষিগোলকে তাহার আঁখি স্থির করিবার গেলো অমনি পারদর্শী ব্যাধের মত অব্যক্ত গুমে মরা কথার তীর নিক্ষেপ করিল মফিজের হিয়ায়। মফিজ অবচেতন মন হইতে চেতনায় ফিরিয়া আসিতেই পারিল না কপোকাত হইয়া মুর্ছা গেল। কিছুক্ষণ পর তাহার জ্ঞান ফিরিলে কর্তারা তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ির দিকে ফিরিল। কিছুদিন পর গ্রামের মেঠো পথ ধরিয়া মফিজ কোথায় যাইতেছিল। এমন সময় সেই মেয়েটি মফিজের সামনে উপস্থিত। সাপুড়ে ওঝার মতো চোখের তীরে নিংড়ানো ভাললাগা বিষ-তীর ফিরাইয়া নিয়া ভালবাসার দ্বিতীয় তীর মফিজের বুকে মারিল। এ যাত্রা মফিজ মুর্ছা গেল না, ঘর্মাক্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ মুখে কিছু কহিতে পারিল না শুধু স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েরা প্রেমে পড়িলে সাহসিনী হইয়া উঠে, ছেলেরা বোকা বনিয়া যায়। বিজলী বেগে তাহার মুখমন্ডল উদ্যম করিয়া কিছু মুখে না কহিয়া দুই হাতে মফিজকে স্পর্শদান করিয়া নারীদেহের মাদকতার মধুময় শিহরণ জাগাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবারকালে শুধু কহিয়া গেল, ‘আগামী বুধবার এইখানে আবার দেখা হইবে। আজ আসি।’ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মফিজ মেয়েটির পিছু চাহিয়া রহিল, যতক্ষণ দেখা যায়। বাড়িতে গিয়া শয়নে-স্বপনে তাহার কথাই ভাবিতে লাগিল এবং বুধবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মফিজের এক ভাতিজা আছে। সে জঙ্গল হইতে এক পাহাড়ী কাকাতুয়ার ছা কুড়াইয়া আনিল। তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হিসাবে মেলা হইতে পিঞ্জর আনিয়া

দিয়া ভাতিজা সান্তারকে কহিল, নে এইবার তোর কাকাতুয়ার আর অসুবিধা হইবে না আর কোথাও উড়িয়া যাইতে পারিবে না। দুধকলা খাওয়াইয়া বড় করিয়া বোল শিখাইয়া দিবে। কাকাতুয়া তোর সাথে মধুর বুলি দিয়া কথা কইবে। শুনিয়া ছোট ভাতিজা খুশী হইলো। দিনে দিনে কাকাতুয়ার ছানা বড় হইতে লাগিল এবং রা' করিতে শুরু করিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটিল অন্য এক জায়গায় কাকাতুয়া বারবার ছুটে যায় পিঞ্জরের কুপের নিকট আর চঞ্চু দিয়া ঠোকর মারে বাহিরে মুক্ত বাতাসে উড়িয়া যাইবার মানসে। বাধা পাইয়া ব্যর্থ মনোরথে মনোকষ্টে অস্থির হইয়া বসার আড়ে বসিয়া কাঁদে। এই কাঁদা কেউ বুঝে না। প্রবাদে আছে 'সুস্থ মন সুস্থ শরীরের উপর নির্ভরশীল। কাজেই মন যেখানে অসুস্থ তথা সর্বক্ষণ দুর্গত থাকে, শরীরও সেখানে ভাল থাকে না। অলস অবশ সময় কাটায় আর বিলাপে বিলাপে মর্মে মর্মে গুমরিয়া মরে।

মুক্ত স্বাধীন জীবন আর বন্দি আবৃত্তার মধ্যে যাপিত জীবন এক নহে। একটি স্বতন্ত্র আর একটি প্রথার জঞ্জালে শৃঙ্খলিত জীবন। দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। রাণীর জীবনাকাশ নাই, আছে আটপৌরে অন্তরীন এক গৈয়েমী জীবন। ভাল খাবারও মুখে রুচে না। মুখের চর্চিত চর্চন হইয়া ফিরিয়া আসে। এই রাণীদের শিক্ষাদীক্ষা কাজকর্ম সর্বত্রই দেখা যায় অদ্ভুত এক জীবন আচার-সেখানে প্রগতি নাই, আছে মান্দাতার আমল বৈচিত্রহীন সংরক্ষনবাদ। পশ্চাদগামীতার মহামারী আক্রমণ। এখানে গুণ বিকাশের আগ্রহ নাই, আছে প্রথাসর্বস্ব আচার অনুষ্ঠান। গল্পটি রাশভারী হইতেছে দেখিয়া আমরা চলিয়া যাই রাণীর বাঁধভাংগা জীবনের যৌবনের দিকে। প্রেমের জোয়ার যখন উঠে তখন নদীর দুইকূল ছাপাইয়া জল গড়াইয়া যায়, ভাসিয়া যায় বিস্তৃত অঞ্চল। রাণী উদ্ভ্রান্তের মত নির্জনে মফিজকে পাইয়া দলিত মথিত করিল। চুমুয় চুমুয় দুইজনেই রসাল, চিবিয়া যে রূপ আঁখিরস পান করে সেইরূপ রমনে চর্বনে দিশেহারা, অনঙ্গে মাতোয়ারা দশায় এই প্রেমিকযুগল। এখন কাহার বিজয় সাধিত হইবে? প্রাণহীন কাষ্ট-প্রথার নাকি স্বর্গীয় ভালবাসার!

ভালবাসা হইতে প্রেম আর প্রেমের অনিবার্য পরিণতি বিবাহ। মফিজ-রাণীর বিবাহ উত্তর ফুটফুটে শিশু আসিয়াছে তাহাদের গুরসে। এই মানব-মানবীর প্রেম উত্তরোত্তর পাত্র পরিবর্তন করিয়া পরিণত হইল ঈশ্বর প্রেমে। ইহা বৃদ্ধি হইতে হইতে এমন হইল যে শিরি-ফরহাদ যেমন করে ঈষ্ট নামে

পাগলপারা হইয়া একজন আর একজনকে চাহিত-আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইত তাহারাও এমন হইতে লাগিল।

প্রেম বিশ্বাস আর ভক্তি বাড়ায়। তখন আর নিয়ন্ত্রনের জন্য বজ্র কঠিন বস্ত্রাবরণ আর গৃহে বন্দি করিয়া রাখিতে হয় না বরং উন্মুক্ত ব্যোমে ভ্রমণ করিতে দিতে হয়। ইহাতে জ্ঞান চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। রাণী-মফিজের ক্ষেত্রে ইহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। বিশ্বাস,ভালবাসা আর ভক্তির জোরে তাহারা যেমন ইন্দ্রিয়কে জয় করিল তেমনি ঈশ্বরের সানুগ্রহ প্রাপ্ত হইল।

প্রায় আজন্মকাল হইতে লালিত পালিত কাকাতুয়া এখন বড় হইয়াছে। সে চাহিয়া থাকে কখন আসিবে তাহার কর্তা যে তাহার দুধকলা সাজাইয়া তাহারে দিবে। একদিন সাতার পক্ষী- ভালবাসার পরীক্ষা করিল। পিঞ্জরের দুয়ার খোলা রাখিয়া অনুরূপ খাবার বাহিরে পরিবেশন করিয়া রাখিল। সে আড়ালে চলিয়া গেল। কাকাতুয়া বাহির হইয়া প্রথমে সে মনের হরষে উড়াল দিলো। দুই একবার এডাল ঐডাল করিয়া আসিল খাঁচার সন্নিহিতে। খাঁচার বাহিরে পরিবেশন করা খাবার খাইল আবার উড়িয়া গেল। আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া উড়িয়া নামিয়া আসিল তাহার আবাসে। দেখিল দুধকলা আছে পিঞ্জরের আড়ে। পিঞ্জরের মধ্যে রাখা খাবার খাইয়া সে পরিশ্রান্ত বোধ করিল। আর পালকে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এইরূপ কয়েকদিন করিবার পর তাহার ভয় দূরীকরণ হইল এবং ভালবাসা দৃঢ়ীকরণ হইল। মানুষে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশু-পাখী জানোয়ারে করে না, কথায় আছে। বন্দি কাকাতুয়ার মনোকষ্টের দীর্ঘশ্বাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল অবশেষে।

১৩/৯/২৪, মিরপুর ঢাকা

ভাগ্যান্বষণে যাযাবর রহিমা-সুনীতিরা

প্রতিদিন দেখা যায় পিঁপড়ে দলের মত সারি সারি উঠতি বয়সের মেয়েরা আসছে। ওরা কোথেকে আসছে আর কোথায় যায়! ওদের নির্গমনের উৎস আর গহ্বরের ক্ষেত্র জানবার কৌতুহল নিবৃত্ত করতে না পেরে একদিন তুরাগ নদীর তীরে গুদারা ঘাটের ওদিকে দেখলাম সারিবদ্ধ অনেক খুপরি ঘর। একজন আগন্তকের রহস্যময় চোখাচোখী লক্ষ্য করে এক চঞ্চলা চপলা তের বৎসর বয়স্কা কিশোরী প্রশ্ন করে বসল,---

‘হ্যাঁ গা আপনি কী খুঁজত্যাছেন?’ আধা শরীর খুপরের আড়ালে থেকে করা এ প্রশ্নে আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। আমি বিস্মিত হলাম না যেন আমি প্রস্তুতই ছিলাম কোনরকম নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,---

‘না মানে আ-আমি খুঁজতেছি’

আপনে কী খুঁজেন, মানে মানে করত্যাছেন কেন? গাদা পাজামা, খদ্দর পাঞ্জাবী, মাথায় সাহেবী হেড কালো শান গ্লাস আর পায়ে দামী চামড়ার চপ্পল দেখেও একটুও ঘাবড়ায়নি মেয়েটি। সোজাসুজি জানতে চাইল আমি কী চাই।

আমিও কাল বিলম্ব না করে সোজা জানালাম-

‘খয়রাত দেবো তার উপযুক্ত নিঃশ্ব পাওনাদার কোথায় পাব বলতে পার?’ নির্লোভ মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তর্জনী উঠিয়ে দেখালো ঐদিকে গেলে পাবেন। আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে নিজেকে মনুষ্যত্বের উঁচুস্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হলো। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সামনে এগোবার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই সে বলে উঠল আপনি চিনবেন? আসুন আমি নিয়ে যাই বলেই সে হনহনিয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আমি কিছু না বলে তার পিছুপিছু ছুটলাম। যাকে আমি খয়রাত দেবো তার খুপরের দোর গোড়ায় পৌঁছবার পূর্বে আমি জিজ্ঞেস করলাম এই মেয়ে তোমার জন্মস্থান কোথায়?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,-

‘খুলনায়’ আমি বললাম, ‘তুমি বাড়ি যাও না?’

সে বলল, না- আমাদের বাড়িঘর নাইকা। আইলা ঝড় আইসা সব ভাইঙ্গা নিয়ে গেছে। মা বাবা আরও এক ভাই আছিল জোয়ারের জলে ভাসাইয়া লইয়া গেছে। ছোট চার বছরের বোনডারে খুঁইজা পাইছি সুনীতিদির সাথে লম্বের ডেকে ঘুরতাছে এমন সময়। অনেক কষ্টের কথা আছে সাহেব। কইব কার কাছে?’

আমি বললাম, ‘তোমার কথা শুনব আর এক দিন আজ খয়রাতের কাজ সারি।’ ‘জী আচ্ছা’ জানাল রহিমা।

আমি ডায়াবেটিক রোগী। এই জন্য প্রতিদিন চল্লিশ মিনিট হাঁটতে হয়। সকালে সন্ধ্যায় বিভিন্ন রোডে বের হই। কয়েকদিন ধরে আমার মনে কেবলই উদিত হতে লাগল এই একরতি মেয়ে এতগুলি টাকা পাওয়ার সুযোগ পেয়েও তাও ভ্রক্ষেপ করল না! অবলীলাক্রমে নিলেভ হয়ে রইল!

আমি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে যখন খুপরি সম্মুখীন হলাম ঠিক তখনই এই মেয়েটির দেখা মিলল। আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলে উঠল ‘হ্যা গা সাহেব আজ সময় অইব দুঃখ শুনবার!’ আমি যারপর নাই আশ্চর্য হলাম তার আগ্রহ দেখে। কী এমন আছে? যাক্

আমি কিছু বলে উঠার আগেই সে একটা মোড়া এনে বসতে দিল। তার একটু পরে একজন বৃদ্ধ এসে উপস্থিত। তার বসার জন্য একটা জলটোঁকি এনে দিল রহিমা। বৃদ্ধলোকটি আদাব বিনিময় করে বলে উঠল, বাবু আমাগো আর কিছুই নাই। আয়লা জলোচ্ছ্বাস এসে আমাদের যা কিছু আছে সবই নিয়া গেছে। যে ঘরে থাকতাম তার বেড়া চাল সবই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আয়লা। কত মানুষ-পশু-গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী ভাসিয়ে নিছে তার আর কী কনব? আমরা মাছের ঘেরে কাজ করতাম। চিংড়ির ঘেরে লবণ পানির সয়লাব। সব চিংড়ি ভেসে গেছে। মহাজনের মাথায় বেড়াঘাত আমাদের পাওনা দেবে দুরের কথা, সে বোবা হয়ে গেছে। লক্ষ টাকা জলে ভেসেছে। তারপর পেটের ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে শহরে পা বাড়াইছি বলে একটু থামতেই রহিমার ছোট্ট ভাইটি কাকু, কাকু করতে করতে এসে উপস্থিত। এই যে ছাওয়াল দেখছেন এইডার বয়েস তখন চার হবে। আমি জঙ্গলের পাশ দিয়া যাইবার লাগছি তখন আয়লার একদিন পরের ঘটনা। শুনি মানুষের বাচ্চার কান্নার আওয়াজ জঙ্গলে গর্তে ঝোপঝাড় আটকে আছে মানব শিশু অবিরত কান্না করে যাচ্ছে। আমি এক দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কোলে করে বাড়ি এলাম। বাড়ি তো নয় খোলা আকাশের নিচে বাপ-বেটি পাটি বিছিয়ে থাকি। বাচ্চাটিকে ধোয়া মোছা করে খেতে দিই। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বিনয়কৃষ্ণ বলল, ‘এটি আজ এইটুকুন হয়েছে।’

‘আর এইয়ে দেখেন এই মেয়েটাও মা-বাবা ভাই সব হারিয়ে ভাগ্যান্বষণে কাজ না পেয়ে, খেতে না পেয়ে দলে দলে মানুষ শহর মুখী হচ্ছিল সেই দলে যুক্ত হয়ে লঞ্চে তার এ ভায়ের সাথে দেখা হয়ে যায় এবং চিনতে পারে। সেই থেকে এই ভাই বোন আর আমরা বাপবেটি একত্রেই আছি।’

বৃদ্ধ কৃষ্ণ বাবুর লোমহর্ষক কাহিনি আর কথা শুনে আমার শরীর কাঁপছিল এবং একপর্যায়ে পাথর হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সম্বৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠলাম

‘এখানে এলেন কিভাবে?’ আরও অনেক মানুষের মত আমরাও এসে নামলাম সদর ঘাট। কিন্তু তারপর কই যাবো? ঢাকার চিড়িয়াখানার নাম শুনেছিলাম। ভাবলাম এই চিড়িয়াখানায় তো অনেক জায়গা, তারমধ্যে যদি একটু ঠাই করে নেয়া যায়! জিজ্ঞেস করে করে মিরপুরের তানজিল বাসে উঠলাম বললাম যে চিড়িয়াখানা যাব। কিছুক্ষণ পরপর কন্ডাক্টর এসে ভাড়া হাঁকে। বোবা বনে যাই। অবশেষে মিরপুর ১ ওভার ব্রীজের কাছে এসে আবার ভাড়া চায়। আমার কাছে একটি পাঁচ টাকার মুদ্রা ছিল। তাই যখন সাধলাম কন্ডাক্টর রাগ করে আমাদের নামিয়ে দিল। এখন কোথা যাব? আমি যখন তিনটে শিশু-কিশোরী নিয়ে চিন্তিত তখন ভগবান বুঝি মুখ তুলে তাকালেন এবং একটা বিহিত করে দিলেন। এক বুড়ি এসে জিজ্ঞেস করল, ‘বাবা কই যাবে।’

আমি বললাম, ‘জানি না।’

বুড়ি বলল, এই শহরে কই যাবেন জানলে বিপদে হবে। তাছাড়া আপনার সাথে যোগ্যবান দুই দুইটা মেয়ে আছে। সর্বনাশ হবে, এদের খুবলে খুবলে খাবে পামর শয়তানেরা।

শুনে চিন্তিত হয়ে বললাম, ‘তাহলে এখন কী করব?’

বুড়ি সহাস্যে বলল, ‘যদি কিছু মনে না করেন আজ রাত্তির জন্য আমার সাথে মাথা গুঁজে থাকবেন। সেই থেকে বুড়ির সংস্রবেই আছি।’ মেয়ে দু’টি গামেন্টেসে কাজ করে আমি ছোট ভতিজার খোঁজ রাখি, স্কুলে আনি, নিই। বাজার ঘাট করি। আপনি সেদিন যে শয্যাশয়িণী বুড়িকে খয়রাত দিয়েছিলেন। আমাকে রহিমা বলেছে আপনার কথা। তিনিই সেই বুড়ি যে আমার বিপদে এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

গতিহীন মানুষের গতি করা, মরণভূমে বাঁচার আশার উন্মেষ করা এসবই ভগবানের অলৌকিক কন্ম। একটু চিন্তা করলে মানসপটে করুণাময় স্রষ্টার এ অপূর্ব অচিন্তনীয় উপায় আমরা দেখি। মহাপ্রলয় সাগরের তান্ডব নৃত্যের কবল থেকে জীবন দান, কঠিন কঠোর ইট কাঠ পাথরের মাঝেও মানবতার উষার কিরণ-আভা গায়ে মাখিয়ে কিরূপে মানুষ পুনঃজন্ম লাভ করে তা এই প্রথম আমি উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম আমার পেছনে পেছনে আসছে ঈশ্বরের দয়ার অসাধারণ উর্মিরূপ।

মিরপুর ঢাকা-২১/৯/২৪।

বহুৰূপী কালনাগ

সনাতন শীলের দু'ছেলে, দু'মেয়ে। ছেলেদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে। গত দুর্গা পুজার সময় পরশী বাড়ীতে তাদের আত্মীয় এসেছিল ভারত থেকে। ননীৰ ফুপাতো ভাই তাদের আবাস পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সাহিত্যের ছাত্র বলে বেশ রসিক। পুজার আরতি নাচে তার জুড়ি মেলা ভার। এবার সে নাচে নাম কুড়িয়েছে। সনাতন শীলের নাতনী মিনতি শীল। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কারুকালা বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী। মৃণালের আরতি নাচের পারদর্শীতায় সে মুগ্ধ। নাচের শেষে যখন আড়ালে মৃণাল বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন মিনতির সাথে মৃণালের আলাপচারিতা জমে উঠে।

দিনে দিনে পুজার ছুটি শেষ হয়ে আসে। একদিন মৃণাল চলে যায়। মৃণাল ছুটি শেষে যাওয়ার সময় আরও অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে একটা সময় মিনতির কাছেও আসে বিদায় জানান দিতে। মিনতি প্রথমে নেত্রযুগল ঢোল ঢোল করে আঁখি কোনায় অশ্রু জমিয়ে অবশেষে দুই মির হাসি টেনে মৃণালকে আপাতত চোখের আড়াল করেছিল। ওদের পেজ বুক চালাচালি আগেই হয়েছিল।

যেহেতু মৃণাল-মিনতি দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কাজেই তারা তাদের আন্তরিকতার জায়গাটি চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছিল ভিডিও কলের মাধ্যমেই। এ যুগের ছেলেমেয়েদের জন্য এটি একটি সহজ পত্রালাপ। পত্রে আবেগ বরানো যায় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে কিন্তু ভিডিওতে সুখ আছে আবেগ হারিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র মৃণাল রাজনৈতিক সচেতনও বটে। 'বহুৰূপী কালনাগ' নামক এ সুখপাঠ্য গল্পটি মিনতির পঠনের আশায় মিনতির আইডিতে প্রেরণ করে মৃণাল। গল্পে গল্পকার এক বৃদ্ধের দীর্ঘ করুণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

“কালনাগের বিল নামে এক বিল পঞ্চগরের সীমান্ত এলাকায় আছে। এই বিলের দখলদারিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে শুরু হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে মারামারি রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি বাড়িঘর ভাংচুর লুটতরাজ যুবা মহিলাদের শ্রীলতাহানি, সব হারিয়ে এক কাপড়ে ওপাড় বাংলায় দা ছুরির মুখে পাঠিয়ে দেয়। না হলে দক্ষিণ পাড়ের বহুমুখী কালনাগের পড়শী ভিন্ন জাতের সামনে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। সেই মৃত্যুকে এড়াতে যামিনীর নিকষকালো আঁধারে একশতবর্ষীয় উত্তীর্ণ প্রপিতামহকে 'বারে'

করে লয়ে ওপাড় বাংলায় পাড়ি জমাতে হল সর্বশেষ ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে। ২০০১ থেকে ২০০৪ বছরুপী ভিন্ জাতের কালনাগের নব্য দখলদারেরা, নাগরুপী হিংস্র দু'পায়ের জানোয়ারেরা তেড়ে আসে ছোবল দেয়, মারধর করে ওপাড় বাংলায় তাড়িয়ে দেয়।

এ যেন এক নির্মম তান্ডব। এ তান্ডব আর বিতাড়ন চলে '৭৫' '৭১ আর '৪৭ এ। যতবারই যাই ফের ফেরত আসি। নিজের ঘরবাড়ি রেখে পালিয়ে কত দিন থাকা যায়। নাড়ীর টানে আবার সুসময়ে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামগুলি' হাতছানি দিলে নিজের অজান্তেই এসে যাই। এসে দেখি কিছু নেই। ঘুঘু চড়ছে বিরান বাড়িতে। আমাদের জমিজমার দখল ছেড়ে ভিন জাতের কুলাঙ্গার দৈত্যগুলো চলে গেছে মায়ের ভয়ে। আমরা কোন দিন এদের সামনে দাঁড়াতে পারিনি। বাপ মায়ের সামনে মেয়ের বউয়ের ইজ্জতহানি করেছে, কিছুই করতে সাহস হয় নি। কোন রকম প্রাণ নিয়ে ওপাড় বাংলায় গিয়েছি আমরা। বার বার সম্পদ হারাতে হারাতে আমরা এখন নিঃশ্ব। বছরুপী কালনাগের লীলা বুঝিনে। কখনও প্রাণ সংহারে মেতে ওঠে আবার শেখ মুজিব কন্যা, শেখ হাসিনা এলে বছরুপী কালনাগ শান্ত। ফুলে ফলে ধনে ধান্যে সবে ভরে ওঠে। আজিকার শেখ হাসিনা মায়ের শাড়ীর আঁচল ধরে মাতৃভূমিতে ঘুমিয়ে পড়ি শান্তি জড়িয়ে। উত্তরবঙ্গের 'মঙ্গা' উত্তরণের ত্রাণকর্তা জগন্নাথের আশীর্বাদ শেখ হাসিনা। জয়তোঃ শেখ হাসিনা।

ক্ষমতার পালাবদল হলে আমাদের ইজ্জত লয়ে যারা টানাটানি করে আজি দাঁড়িয়ে রাজপথে বজ্রকণ্ঠে গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাগ্রত হই। জাতির সামনে বিশ্ববাসীর সামনে উচ্চকিত হই, আমাদেরও ইজ্জত আছে, মান আছে। এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই পাশবিক অত্যাচারীদের বীজ উপড়ে ফেলব। মেরে তবে মরব আর বীর একবার মরে সাতবার মরে কাপুরুষ। বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এবার তোমায় ভেঙ্গে করব খান্ খান্। মা দুর্গার দশবাহু দিয়ে অসুর বধের পণ এবং অসুর বধ আমাদের শক্তি যোগায়। আর সেই শক্তি ভগবানের দান। আমরা বীর দর্পে ঝাঁপিয়ে পড়ি বিলের ওপাড়ের সন্ত্রাসীদের ওপর। ওরা মার খেয়ে ভয়ে পালায়। আমাদের প্রতিজ্ঞা আর শক্তিতে পশুরা হারে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো সংখ্যালঘুরা বিজয়ে মেতে ওঠে, জান দেবে তবু মাতৃভূমির দখল দেবে না পরস্পরহণকারীদের। বছরুপী কালনাগ তার বিষের

খলি উগড়ে দেয় পশুর শিরায় শিরায়। জনমের মত বহুরূপী কালনাগ বহু রূপের কল্যাণী মনসা দেবী হয়ে বিজয়ের এই দিনে বিলের ওপর মনসা চর্চার আয়োজনে তুষ্ঠ বিলের উত্তর ও দক্ষিণ দু'পাড়ের শান্তিপ্রিয় অধিবাসী।”

গল্পটি এখানে শেষ হয়েও হলো না শেষ। আচমকা আমি তড়িতাহত হলাম, আমি আমার কর্তব্য স্থির করে নিলাম। সমমনা সাথীদের নিয়ে আমি ক্যাম্পাসে মিছিল শুরু করে দিলাম। আমার এ উদ্যোগে মৃণাল ফুল্ল। সে নিজে এসে আমার আরও বিপ্লবে গতি সৃষ্টির প্রয়াসে কাজে নেমে পড়ল। অবসরে নিজেদের বুঝাপড়ার অনঙ্গ প্রেমঘন সময়ে মাতোয়ারা হয়ে জীবনের শূন্যতা কেটে দিয়ে ভবিষ্য কর্তব্য স্থির করে আপন ঘর আর সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গঠনে ব্রতী হলাম। আর তা পেরে জগদীশের গুণগানে আত্মোৎসর্গ করে মনন প্রসারের স্বাদে মজে মৃণাল-মিনতি সাতপাকে যুগল বেঁধে কালনাগের বিলে নৌবিহরে গা ভাসালাম।

৯/১০/২৪ মিরপুর।

নদীতে নদীতে মিলে, বোনে বোনে মিলে না

নদীতে নদীতে কদাচিৎ মিলে অর্থাৎ দু'টি নদী একই সংগমস্থলে মিশে একাকার হয়ে একটি নদীতে পরিণত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে কিন্তু দু'বোনে কালেভদ্রে দেখা হলেও ওদের স্থায়ীভাবে মিলন অকল্পনীয়। দু'চারটে ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি। মেয়েদের চরিত্রে আর নদীর চরিত্রে অনেকটা মিল দেখা যায়। কেন দেখা যায়, কিভাবে দেখা যায়, তার পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক থাকলেও কবি সাহিত্যিকরা দু'টোর যা রূপ দেখতে পেয়েছেন তা কলম ও কল্পনার আঁচড়ে যে কল্পচিত্র অংকন করেছেন মনোহর চিত্তাকর্ষক!

মিলা সাহিত্যের ছাত্রী আর রাকেশ ভূগোলের ছাত্র। দু'জন চাচাত ভাই বোন। ওরা স্কুল আর কলেজে একে অপরদের ভীষণ প্রতিযোগী ছিল। এক নম্বর দু'নম্বরের জন্য প্রথম দ্বিতীয় হতো। দু'জনের পড়াশুনায় প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতের গোপনীয়তা কেউ কাউকে বলতো না। উভয়ে ভীষণ পরিশ্রমী এবং কৌশলী। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হওয়ার দরুণ তাদের প্রতিযোগিতার কৌশল পাণ্টেছে।

একদিন ইউনিভারসিটির বটতলায় বসে ক্লাসের ফাঁকে দু'জনে বসেছিল। তখন পূর্বাহ্ন হয় নি, হওয়ার পূর্বকাল। এমন সময় হঠাৎ মিলা বলে উঠল, 'কি রে রাকেশ, আমাকে এখন আনমনা হতে ভাল লাগে কেন কেবলি মনে হয় কেউ যেন কাছে নেই। আমাকে কেউ ছায়া দিলে ভাল লাগত। আরে বোকা বলে কিরে তুই তো এখন ছায়াতেই বসে আছিস! আর কোন ছায়া চাচ্ছিস? রাকেশ সুধাল। মিলা রাকেশের গায়ে খোঁচা দিয়ে কহিল 'বোকা তুই বুঝবি নে।' রাকেশ জানাল 'ঠিক আছে তুই তাহলে বুঝিয়ে দে?' মিলা সহাস্যে বলল, 'কি খোকা যেন কিছুই বুঝে না?' রাকেশ হতবম্ব হয়ে বোকামির মত মিলার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাকেশ আর মিলা দু'জনের ছাতির মাঝে এই প্রথম মৃদু হৃদকম্প হয়ে ঝাঁকি দিয়ে গেল শরীরকে। রাকেশের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, মিলা তাকে ভালবাসার আলিঙ্গনের বন্ধনে বন্দি করতে চায়। একটু পরেই শ্রেণি কক্ষে পাঠদান শুরু হয়ে গেলে দু'জন দু'অনুষঙ্গে চলে যায়। আগামীকাল ষোল ডিসেম্বর, ছুটির দিন। সে সুযোগে চুটিয়ে রোমানস করতে ইচ্ছে করছে। ডেটিংয়ের কথা রাকেশকে জানিয়ে শ্রেণি কক্ষে পাঠ গ্রহণ শেষে হলে পৌছে

কাপড় ছেড়ে ডোক ডোক দু'গেলাস জল গিলে বিছানায় হেলান দিতেই ঘুম দেবী এসে গেলে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকলে দু'জনেই তড়িঘরি করে একত্র হয়ে বোটানিকেল গার্ডেনে বসে মিলার শ্রেণিকক্ষের স্যারে পুরুষ আর নারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিল যে, নারীকে এখন আর অবলা বলা ঠিক নয় কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে হকারি এমন কি কৃষি কর্ম, দেহ-গ্ল্যামার ব্যবসা হেন কোন কর্ম নেই যা করতে পারে না বা করে না কিন্তু সর্বক্ষেণেই দেখা যাবে তারা তাদের রান্না-তৈজসপত্র আগলে রেখেছে তাদের নিয়ন্ত্রনে। তারা আটপৌরে না হয়েও গৃহস্থালি সব কর্তৃত্ব তাদের হাতে রেখেছে। দাম্পত্য জীবনে একক পুরুষই কাম্য। যৌন জীবন এবং জীবন সঙ্গী হিসেবে অন্য নারীকে কোনক্রমেই সহ্য করে না। সংগত কারণেই সম্পত্তির আধিপত্য তাদের হাতেই থাকে, পুরুষ পাহাড়াদার মাত্র। এ কারণে একানুবর্তী সংসার ভেঙ্গে খান খান হচ্ছে। মেয়েদের এই সর্বগ্রাসী এবং সর্বনাশী চরিত্রও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারা যথাক্রমে কুহেলিকা, ছলনাময়ী, রহস্যময়ী একই সঙ্গে সোহাগিনী, প্রেমময়ী, লাভণ্যময়ী সর্বসহা হাস্যময়ী। পুরুষ আকৃষ্টের কোন গুণটি নেই তাদের! যাকে এক কথায় বলা যায় সর্বগুণে গুণান্বিত। ফলে সম্পর্কে যাই হোক না কেন বৈচিত্রময় চরিত্রের জন্য সংঘর্ষ লেগে যায় সমলিঙ্গে। চৌম্বকীয় সূত্র মূলে বিপরীত লিঙ্গে বিকর্ষণ লক্ষণীয়। ইহাদের উৎস এক হলেও বিকর্ষণজনিত কারণে এরা বিভিন্ন মুখী হয়ে যায়। কাজেই বোনে বোনে বিভিন্ন গতিপথে গমন করে। প্রাকৃতিক কারণে এরা মিলিত হওয়ার সুযোগই পায় না। সামাজিক মিলন ব্যতিরেকে।

পর্বতের একই উৎস থেকে বের হওয়া একাধিক নদী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে বারিধিকে ছুঁয়ে দেয়। পৃথিমধ্যে ভূপ্রাকৃতিক গঠনজনিত কারণে মাটির বিশেষ গুণে একাধিক নদীর মিলন সংগম ঘটেও। প্রবল খরশ্রোতে থেকে পয়োধির বুকে নিঃশেষ হয়। রাকেশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় বলে উঠল, মিলা আমার পেট তো চুঁ চুঁ করছে, তোমার নারীবাদী বয়ান এখন থামিয়ে আসো একটা কিছু খাই। এবার মিলা তার বকবকানি থামিয়ে সুখাল, বল কি খাবে? উত্তরে রাকেশ তার অভিরুচির কথা জানালে দু'জনেই উঠে রেস্টোঁরার দিকে ছুটল।

তারা রেস্তোরাঁয় ফলার এবং কফি গ্রহণ করে পূর্বস্থানে গিয়ে বসে রাকেশ তার ভৌগোলিক জ্ঞান বিতরণ করতে লাগল। বলতে লাগল বড় বড় পর্বত বা গিরি শৃঙ্গ হতে হিমবাহ ধসে পড়ে অনেক সময় নদী সৃষ্টি হয়। যেমন হিমালয় ভূধরের গঙ্গোত্রী নামক স্থান হতে হিমবাহ সৃষ্টি নদীর নাম গঙ্গা। এটি প্রবল খরশ্রোতা এবং একটি জীবন্ত নদী ইহা হতে অনেক শাখানদী এবং শাখা নদী হতে উপনদী হয়েছে কিন্তু এটি কোন নদীর সাথে মিলিত হয়ে আপন গতি প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হয় নি। কবিরী নদীকে নারীর সাথে তুলনা করেছেন। কেন করেছেন এ নিয়ে বিস্তার আলোচনা আছে। এ আলোচনা এ পরিসরে সম্ভব নয়। এ থেকেই হয়তো নারী চরিত্র আর নদী চরিত্র একাত্মা পেয়ে বলা হয়েছে নদীতে নদীতে যেমন দেখা হয় না বা কদাচিৎ হয় তেমনি বোনে বোনে ও মিলন হয় না। হলেও ক্ষণিকের তরে হয়ে ফের বিয়োগ বিচ্ছেদ হয়ে যায়!

মিলারা দু'বোন দু'জন দু'দিকে বিয়ে করে চলে গেলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করবে এ শুন্যতা ঠেকাতে মিলার বাবা পথ খুঁজে পথ পাচ্ছে না। বাবা মা যখন থাকবে না বাড়িতে ঘুঘু চড়বে বৈকি!

রাকেশের পরীক্ষার ফলাফল বেরতে আর মাত্র দু'মাস বাকী। এরই মধ্যে দু' দু'টো কলেজ থেকে অফার এসেছে চাকুরীতে যোগদানের জন্য, প্রতিষ্ঠিত কলেজ। তার ছোট ভাই কলেজে পড়ে। আর আছে সংসারে মা বাবা। তাদের যে জমিজমা আছে তা দিয়েই সংসার চলে যায়। কলেজের চাকুরীতে যোগদানের বিষয়ে মিলাকে জানানো হলে সে হাঁ সূচক মতামত দিলো। একদিন রাকেশ মিলাকে লয়ে বেড়াতে এলো ধলেশ্বরী নদী পাড়ে। নয়নাভিরাম চেউয়ের দৃশ্য দেখে দু'জনই ফুল্ল হয়ে উঠল। নদী ও নারী কতটা একাত্ম হয় তা মিলার ভাব বিহ্বলতা দেখেই বুঝা যাচ্ছিল। সে আস্তে আস্তে প্রেমাসক্ত হয়ে রাকেশের কোলে চলে পড়ল। যেন মনে হলো এতদিনের চেনা মিলা এটি নয়। নির্লজ্জের মত বলে ফেলল আমাদের বিয়ে কবে হবে! চলো এখনি করে ফেলি! রাকেশ বলে দিলো। মিলা আর একটু মুখ গুজে দিল রাকেশের বুকে। রাকেশ মিলার তপ্ত নিঃশ্বাস আর শিহরিত অবশ নারী তনু অনুভব করছিল। জায়গাটা ছিল নির্জন। সুতরাং দু'জনই নির্ভয়ে বুঝে যাচ্ছিল যৌবনের ছোঁয়া, নারী পুরুষের

ছোট গল্পগ্রন্থ-বন্দি কাকাতুয়ার দীর্ঘশ্বাস-১

স্পর্শে স্পর্শে কত মধুর হয়। মিলা বলল, আমাদের ভালবাসার কথা যদি জানাজানি হয়ে যায়! আর নানান মত তৈরী হয় দু'সংসারে তবে বিয়েটাই ভেঙ্গে যাবে। দরকার নেই রে, বাবা! তোমার চাকুরী হয়েছে, কোর্ট মেরেজ কর, আমি হল থেকে সোজা তোমার ছোট্ট কুঠিরে গিয়ে উঠব।

মিলার কথায় রাকেশ তাই করে ফেলল! আস্তে আস্তে বাড়িতে জানাজানি হলো। ওরা একটিলে দু'পাখি মারল! বাবা বাড়ির শিকড় কাটা হলো না। তাই বোনের মিলও কাটল না। বোনের সম্পদ সংরক্ষণ করব আমি মিলা, বাবার নির্দেশে। বাবার ইচ্ছে বহাল রবে। নদীর উৎস যদি থাকে সমৃদ্ধ, নদী শুকায় না, শ্রোতশীলা থাকে। সুখী নারী আর ভরা নদী উৎসমুখের গুণে সুখী।

মিরপুর ঢাকা ২১/১০/২৪।

আমার বুকে বাংলাদেশ আর বঙ্গোপসাগরের বসবাস

বহুকাল পূর্ব হতে বিনোদ বাবুদের ভোলায় মনোহারী মালের দোকান আছে। বংশানুক্রমে বাবুরা ব্যবসা বাণিজ্য করে আসছে। বিনোদ বাদের পার্শ্বের দোকানটিই হরিদাস বাবুর। হরিদাস বাবু বিনোদ বাবুর ফুপাত ভাই। সেসূত্রে তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বৃটিশ বেনিয়াদের শাসনামলে বড় হওয়া বিনোদের বাবা দাদারা এক প্রকার ঔপনিবেশিক মন মানসিকতায় গড়ে ওঠার ফলে পড়ালেখায় মেট্রিকুলেশনের বেশি এগুতে পারেন নি। গ্রামের বিশাল পরিমাণ জমি জেরাত আর ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার ঘটিয়ে তারা ধনাঢ্য জমিদারে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিনোদ বাবুর দু'পুত্র। বড়জন প্রশান্ত ছোটজন সুশান্ত। দু'জনের দু'রকম চরিত্র পড়াশুনার অবসরে একজন ব্যবসায় বসে আন্য জন রখলাধুলায় মতে ওঠে। প্রশান্তের খেলায় বল যোগায় হরিদাসের দসি় মেয়ে আরতি। সে চঞ্চলা, চপলা এবং অনিন্দ্যসুন্দরীও বটে। কিশোর-কিশোরীদের ভেলায় প্রশান্ত পক্ষীয় ভলিবল আর ক্রিকেট খেলায় আরতি বেশ পারদর্শিনী। দু'জনেই খেলতে খেলতে বেড়ে ওঠে। সেসময় তাদের মধ্যে একপ্রকার সখ্যতাও গড়ে ওঠে।

দাদা বড়দাদার নিকট বিনোদ চক্রবর্তী বাবু শুনেছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের শ্লোগান- 'বৃটিশ খোদাও'। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি, মাষ্টার দা সূর্যসেনার আন্দোলন, হাজী শরীয়তউল্লাহ, প্রীতিলতার আত্মত্যাগ এবং সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী আন্দোলন সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ চলে যায়। স্বাধীন ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। টসবগে তরুণ বিনোদ স্বজাত্যবোধে উজ্জীবিত একজন দেশপ্রেমিক। কিছুদিন যেতে না যেতেই পাকিস্তানীদের আসল চরিত্র ফুটে উঠল। পূর্ব পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা বাংলা না মেনে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার জন্য উদ্যত হয়। গুরু হয় ভাষা আন্দোলন। সারা পূর্ব পাকিস্তান মাতৃভাষা বাংলার জন্য সংগ্রামেতে উঠে। যুবক বিনোদ সেদিন বুঝেছিলেন পাকিস্তানীদের দুরভিসন্ধি। ফলে ভাষা আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। এ দেশের মানুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা উদ্ধার করেছিল হায়েনাদের কবল থেকে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে সহীদ হয়েছিল রফিক, শফিক ছালাম বরকত জব্বার ও আরো অনেকে।

গোলামীর শিকল গলায় দিয়ে পাকিস্তানীরা বাঙালীদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যচ্ছিল পরাধীনতার অন্ধকার গর্তে। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলন ১৯৬৬ সালে দেশের মানুষকে আরও স্বশাসনের দিকে সাগ্রহী করে তুলে। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঠুকে দেয়া হলে দেশে গণআন্দোলন শুরু হয়। গণভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানী জাভা সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিবের মুক্তি হয় এবং ১৯৭০ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে আওয়ামীলীগ বিজয়ী হলেও তালবাহানা শুরু করে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে বিরত থাকে ইয়াহিয়া। ৭মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশ্যে রেস কোর্স ময়দানে বক্তৃতা করে ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা মূলক এবং দেশ ও জাতির মুক্তি-স্বাধীনতার ঘোষণা ও ডাক দেন। যার যা আছে তাই নিয়ে বাঙ্গালী মুক্তি ও স্বাধীনতার নংগ্ৰামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২৬ শে মার্চ দিবাগত রাতে ১২.০১ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার সশস্ত্র ঘোষণা পত্র পাঠ করে সমস্ত টেলিগ্রাফ বেতারে প্রেরণ করেন। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র গেরিলা এবং সম্মুখ যুদ্ধে দখলদার পাক বাহিনীকে পরাজিত করি। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিকট ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর পাক হানাদারদের পক্ষে এসে সারা পারল না।

কিশোর-কিশোরী প্রশান্ত ও আরতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিনোদ বাবুর নিক এই স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের ইতিহাস শুনে বিমোহিত শিহরিত এবং স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে যার মত সেদিন প্রস্থান করল।

কিশোরী আরতি এখন যৌবন সম্ভবা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা ফেলেছে। এই বয়ঃসন্ধি কালে ছেলেমেয়েদের আচার আচরণে নতুনত্ব ও ব্যতিক্রমী ভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা উভয়ে এস এসসি এবং এইচ এস সি পাশ দিয়ে ভাল ফলাফল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, নানান অভাব অনটন লেগেই আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছু সামলে নিচ্ছেন। তলেতলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এদেশীয় দোসর, পাক ও মার্কিন ষড়যন্ত্রে রঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের হাতে দেশের শাসন ভার। দীর্ঘ একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন। তারপর আট বছর পরে আবার ২০০৮ এর সাধারণ নির্বাচনের পর

ছোট গল্পগ্রন্থ-বন্দি কাকাতুয়ার দীর্ঘশ্বাস-১

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট পাক-মার্কিন এবং এদেশীয় শিবির জামাতের চক্রান্তে দেশ ছেড়ে প্রধান মন্ত্রী পদে ইস্তফা না দিয়েই ভারতে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর প্রচুর লোক হতাহত হয়। আবার দেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ারি পথে। মার্কিন আপারেশান বিডি-২০১৮ সফল বাস্তবায়ন হয়েছে ২০২৪-এ সরকার পতন হয়ে। সেন্ট মনি দ্বীপ দখলে নেয়ার পরিকল্পনা ডীপ স্টেট পুতুল ইউনুছ সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। এবিষয়টি সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় মাকিনীদেও মুখ পুড়েছে। ছাত্র/ছাত্রীদের পেছনে অর্থ ব্যয় করে।

এরই মধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে। আরতি-প্রশান্ত প্রেম সাগরে পাড়ি দিয়ে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। তারার পড়াশুনা শেষ করে চাকুরী করে। বিনোদ বাবুর বয়স ৯৩ ছুঁই ছুঁই। দেশের পট পরিবর্তনে হিন্দু নিগ্রহ চলছে। পরিবার নিয়ে পশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। বিনোদ বাবু আর কথা বলতে পারে না। তাঁর বুকে বঙ্গোপসাগর ঢেউ খেলছে। ঘুরীঝড় এসে সব তছনছ করছে। দেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ইন্দোপ্যাসিফিক নানা যুদ্ধের ডামাডোল শোনা যাচ্ছে। বারিধির নির্মল হাওয়ায় বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। “আমার বুকের সাগরে আর শান্তির নীলিমার নীল নেই। আমার সাগর হৃদমাঝে তুফানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এ তুফান আমার ছাতি থেকে সাগর কেড়ে নেবার তুফান। রাহুর শনি দশা থেকে ভগবান রক্ষা করুন আমার বুকের বাংলাদেশ আর বঙ্গোপসাগরকে যেখানে আমার বসবাস, পিশাচ ইবলিশের কবল থেকে”- চোখের ইশারা ইংগিতের ভাষায় বিনোদ চক্রবর্তী পয়োধীর বিশালতায় চেয়ে প্রশান্তকে বুঝিয়ে প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকান্তরালে প্রবেশ করে।

২৯/১০/২৪ মিবপুর, ঢাকা

গুজব

শিলার বয়স এখন চৌদ্দ। পেটের দায়ে সে ঘাটে মাছ টোকায়ে। পার্শ্বের বাড়ির ভোলা সেও মাছ টোকায়ের কাজ করে। একদিন বিকেল বেলা ঘাটে যাওয়ার পথে শিলাকে ভোলা অশ্লীল ইংগিত দেয়। এইরূপ দুষ্টামী প্রায় প্রতিদিন সে করে যাচ্ছে। আজ শিলা সহ্য করতে না পেরে লোক সম্মুখে পায়ের জুতো খুলে দাপদাপ লাগিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল। ভোলা এই শরমে প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিল। শিলা চরিত্রহীনা বলে গুজব রটাতে শুরু করল। এই গুজরাটি দ্রুত পাঁচ কান হয়ে ঘাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

শিলা এ অসত্য গুজবের তোপে পড়ে একদিন নদীর পাড়ে বসে অবুরে কাঁদছিল। তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রতন মিয়া। সে এক হোটেলে বয়ের কাজ করে। সে কেঁদে কেঁদে বলল, ‘ভোলা আমার চরিত্র লয়ে গুজব রটাচ্ছে।’

‘ঠিক আছে, আমি সেটা দেখব। এখন হয় ঘাটে যাও টোকাও, না হয় বাড়ি যাও’

রতন নিম্নস্বরে বুঝাতে চাইল। শিলা ততোধিক কান্না জড়িয়ে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ‘ঘাটের মানুষ চরিত্র লয়ে গালি গালাজ করে। কেমনে মাছ টোকাব। আর মাছ না টোকালে বাড়িতে গিয়ে থাব কি?’

রতন বলল, ‘আচ্ছা চাল তরকারী না থাকলে চল কিনে দিই। আর তুমি কি পৈয়াজ খুটতে পারবা? আমি যে হোটেলে কাজ করি সেটা অনেক ব্যস্ত ও বড়। সারা দিনই খন্দের জোটে। সেখানে কাজ চাইলে করতে পার।’

শিলা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে অনাপত্তি জানাল। তারপর দু’জনেই আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিলার মা বাবা দু’জনেই গোয়ালন্দ ঘাটে কাজ করত। বাবা মাছের মহালের ময়লা পরিষ্কারের কাজ করত। মা মাছ দোকানিদের পানি এনে দিত। এতে দু’জনের যে আয় রোজগার হত তাতেই কোন রকম সংসার চলে যেত। এক মেয়ে শিলা। তাকে মায়ের ইচ্ছে থাকে সন্তেও স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়নি। বাজারে মায়ের কাছে কাছে থেকেই বড় হয়েছে। এখন শিলার কয়স বার। পাঁচ বাসি খাবার খেয়ে দু’জনেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। লো মশান ডায়রিয়া এমন পর্যয়ে পৌছিল যে, ডিহাইড্রেশানে পানি শূন্যতায়, মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মর্মান্তিক এ ঘটনায় শিলা দিশেহারা হয়ে পড়ল। রতন শান্তনা দিল।

ওদিকে নবাব আলীর ছেলে রতন। সে ভাল ফুটবল খেলতে পারতো। বল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে সে গোল দিতে ওস্তাদ। শিলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতো। আজ বাপ মারা যাওয়ায় সে হোটেল বয় হিসেবে কাজ করে। ওখানেই সে শিলাকে রান্না ঘরের আয়ার কাজ যোগাড় করে দিয়েছে। এখন শিলা ভালই আছে।

ভোলা শিলাকে উত্যক্ত করে হোটেলে আসা যাওয়ার পথে। এবার রতন গুজব রটানো আর উত্যক্ত করার জবাব দিবার মনস্থির করল। ভোলাকে একদিন জুতা লয়ে দৌড়াতে দেখে রতন সন্দেহবশতঃ সার্টের কলারে ধরে বলছিল, ‘কিরে দৌড়চ্ছিস কেন?’ প্রথমে সে তথমত খেয়ে পরে চুরির কথা স্বীকার করল। রতন বিষয়টি চেপে যাওয়ায় গণপিটুনি থেকে সে দিন সে রেহাই পেয়েছিল। আজ সে কথাই ছড়াতে হবে যাতে তার মুখ পুড়ে। ভোলা জুতা চোর। সে কথা জনে জনে প্রচার দিতে লাগল রতন। উত্যক্ত করার জবাব হাতেনাতেই দিল কিল ঘুষি দিয়ে ইচ্ছেমত একদিন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হাজারো মিথ্যে গুয়েবলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছড়াইছে এদেশীয় দোসর দ্বারা প্রচুর ডলার খরচ করে, করে। উদ্দেশ্য-এ দেশকে অস্থির তালেবানি দেশ বানানো। আর সেন্ট মার্টিন দ্বীপে নৌ এয়ার বেস বানানোর দখলদারিত্য। মার্কিনী এ ডীপ স্টেট কৌশলের বিপক্ষে জনে জনে প্রচার করে বলতে থাকলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। এটি শুধু আওয়ামী লীগ নয়, দেশ প্রেমিক সর্বদলীয় কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথার স্বপক্ষে প্রচার আবশ্যিক।

হোটেলে মানুষের মুখে মুখে এ কথা প্রতিদিন রতন শুনে। বর্তমানে ইউ টিভিবে নানাভাবে রকমারী গুজব রটনা করে চিত্তাকর্ষক করে। বিজ্ঞাপন দেখে মনেই হয় না এটি মিথ্যে গুজব।

যুদ্ধের সময় গুয়েবলস করে, করে সৈন্যদের মন চাঙ্গা আর অপর পক্ষের মন ভেঙ্গে ফেলা হয়।

একটা গুজব রটিয়ে দিয়ে নিমেষেই গণজমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করা যায়। যারা গুজব ছড়ায় তারা পিশাচ ধরণের হয়। যাদুর কাঠি দিয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে।

প্রতিদিন মানুষ দল বেঁধে হোটেলে চা পুরি খাওয়ার আড্ডা দিয়ে আরও কত গুজবের কুটকৌশল বলে সব মনে ধরে রাখা যায় না।

দিনে দিনে শিলা ও রতন ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। পরস্পরের চাওয়া চাওয়া লক্ষণীয়। রতন শিলাকে পার্কে নিয়ে যায়। নদী তীরে বসে গল্পে মেতে ওঠে। শিলার বয়স এখন একুশ, পূর্ণ যৌবনবতী। তার একা একটা ঘরে থাকা বিপদজনক। বাঘ-আতংকগ্রস্থ হরিণীর মত বাঁকা চাহনি দিয়ে রতনকে আক্রমণ করল শিলা। বলল শিলা, কত দিন আর এভাবে চলবে, বিয়ে করবে না!

হঠাৎ এ কথায় রতন চমকে ওঠে সুখাল, বিয়ে করব বৈকি! তবে কনে কে গো শিলা! বাঁকা চাহনির খোঁচা দিয়ে শিলা রতনকে বুঝাল সে-ই কনে। দুটি প্রাণি চোখের ভাষায় মনের ভাব বুঝে নিল! জগতে এ নির্বাক ভাষায় মনের ভাব বিনিময়ের মজাই আলাদা।

রতনের বাবা নেই মা আছে। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে মা খুবই উদ্বিগ্ন। শিলাকে রতনের মায়ের খুবই পছন্দ। হোটেলের হাড়ি পাতিল চেয়ার টেবিল ধোয়া মোছা করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়। তবেই ছুটি মেলে। সেই রাত অবধি মা জেগে থাকে।

কখন রতন আসবে তবেই খাবে। আজ রতনকে খেতে দিয়ে রতনের মা সুখাল, কিরে রতন শিলা মেয়ে কেমন! ওকে আমার পছন্দ! তোর সাথে বেশ মানাবে! রতন লজ্জা জড়িয়ে গো গ্রাসে খেয়ে উঠে গেল। যাবার সময় মায়ের গলা শোনা গেল কিরে কিছুই তো বলে গেলি না! রতন মাথা নিচু করে বলল, তুমি যা ভাল মনে কর, কর। বলেই হন্ হনিয়ে চলে গেল নিজ কামরায় ঘুমাবার জন্য।

মাঝরাত্রে কিসের শব্দে শিলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর থেকে তার ভয় এসেছে, ঘুম আসেনি। ভোলা হারামীর বাচ্চা যে গুজব রটিয়েছিল এতে তার জীবনই বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল, ভগবান সহায় রতন দেবদূত রূপে তার জীবনে সেদিন এসেছিল। সে মনস্থির করল যে আগামীকাল সকালেই জমানো টাকা লয়ে রতনের মায়ের কাছে জমা দিয়ে ওখানে দিন কয়েক থেকে পরে দেখা যাবে কী করা যায়। যেই কথা সেই কাজ, পুটলাপাটিল লয়ে সকালে রতনের মায়ের কাছে হাজির! রতনের মায়ের নিমিত্ত এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! যার পর নেই খুশিতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ঐ দিনই পুরোহিত ঢেকে এনে রতনের সাথে গাটছড়া বেঁধে দেয়া হলো। রতন-শিলা শান্তিতে তার বৃদ্ধা মাকে মাথায় নিয়ে বসবাস করতে লাগল।

৩০/১০/২৪ মিরপুর ঢাকা

অশ্লীলতা

মীনা মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে যায়। সেখানে তার গবেষণার বিষয় ‘অশ্লীলতা জাতীয় অপরাধ প্রবণতা ও তাহা নিরসন’। বিভিন্ন বয়সে মানুষ পারিপার্শ্বিক কারণে অশ্লীল জাতীয় অপরাধে প্রবেশ করে এবং তাহা অবদমন করলে এমনকি মানসিক রোগ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। কাজেই সুস্থ শারীরিক মানসিক জীবন যাপন করতে যাহা কিছু করণীয় এবং বর্জনীয় গল্পাকারে তার শিক্ষক ও গাইড মিঃ সান্ট তাকে বুঝিয়ে দিলেন। এখন তাকে বিভিন্ন বয়সের মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাহা সংঘটন ও প্রমাণ খুঁজে বের করে আনতে হবে। তার এই গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হতো। তাতে তার মধ্যে বিষন্নতা ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য তাকে পরিচিত মুখ এবং বন্ধু খুঁজতে চেষ্টা করতে হচ্ছে।

প্রথমেই সে জরিপ শুরু করে তরুণ তরুণী এবং উচ্চ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের উপর। নিষিদ্ধ এবং পর্দার অন্তরালে সংঘটিত যৌন অশ্লীলতা এবং সুড়সুড়ির মধ্যে ডুবন্ত যুব যুবাদের অনুসন্ধানে গিয়ে সে জানতে পারে ডিজিটাল মাধ্যমে যে নিষিদ্ধ ছবি বিশেষ মানবীর সচিত্র সহবাস, পুরুষ, মহিলার সমকামীতা, হস্তমৈথুন দর্শণোত্তর নিজ দেহে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনের জন্য নিজেই রতিগক্রিয়া আপন হস্তে শুরু করে দেয় কিংবা সম্পর্কে অনুমোদন দেয় না এমন কারুর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে অঘটন ঘটায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরামর্শ (কাউন্সিলিং) এর মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে আবার অনেকেই অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়।

ঘুঘুর ফাঁদ দিয়ে যেমন ঘুঘু ধরা যায় তেমনি চোর দিয়ে চোর ধরা সম্ভব। স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনহানিকারক দিয়ে অনুরূপ রোগাসক্তকে অনুসন্ধানে বেশ অগ্রগতি আসে। এ ক্ষেত্রে শুধু একটু বন্ধুভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল হতে হয়। এমন একজন পেয়েও গেল মীনা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সদালাপী অথচ মদাসক্ত অসুস্থ যৌনাবেগ তাড়িত উচ্চ শিক্ষিত এক যুবক। তার বন্ধুবান্ধব এ দোষের জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাকে ঔষধ দিতে শুরু করলাম। একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পারলাম যে, তার এই ড্রাগ আর নিষিদ্ধ যৌনাচারের মূলে হলো-হতাশা এবং অভিভাবকহীনতা। সে মূলত একজন পথশিশু। তার মা বাবা কে তা সে বলতে পারে না। অনন্য মেধাবী এই

পথশিশুটি সরকারী আশ্রয়ে থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছে। সে দেখেই বলে দিতে পারে এই বয়স্ক মহিলা আর পুরুষ পরকীয়া করে। পরে জরিপে তাই পাওয়া যায়। সে বলে দিতে পারে শহরের কোথায় দূষিত ছবি আপলোড হয়। আজকাল তো ইউটিউবে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা তার যৌনতা প্রদর্শনের প্রতিযোগীতায় নেমে গেছে। পূর্বে বেশ্যাপাড়ায় বেশ্যাদের উলঙ্গ নৃত্য দেখা যেত। এখন প্রকাশ্য জনসমুদ্রে এসব বেশ্যার দেহবিভ্রিন্ন উৎসব চলে। মানুষকে লজ্জা স্থান দেখিয়ে এবং ঘটনা খুলে বলার কোম্পানী খুলে অশ্লীলপনার বেসাতি দেখিয়ে যাচ্ছে।

দেশে দেশে দিকে দিকে হাজার হাজার লাখ লাখ উচ্চবিত্ত কি মধ্য এমনকি নিম্নবিত্ত আবাসিক হোটেলে অবলীলাক্রমে নারীদেহের তেজারতি চলে তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানে মুক্ত বাণিজ্যযুগে বাণিজ্যিক পণ্য প্রচার ও প্রসারে নারীদেহের গ্ল্যামার ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এই কারণে এখন ফ্যাশন নামে পরিচ্ছদ ব্যবস্থাপনা বিষয় ট্যাকনোলজিতে যুক্ত করা হয়েছে। নারীর দেহ প্রদর্শনী মুক্ত বাজারের মুখ্য বিষয়।

এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের দরিদ্র দেশের যুবামহিলাদের যৌন পণ্য হিসেবে কৌশলে দালালরা পাচার করে। এই সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। অর্থনৈতিক সামরিক, বিজ্ঞান এবং শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত অধিকাংশ পশ্চিমাদেশে ফ্রি মিক্সিং এর নামে অবাধে যৌনাচার চলে। এক কথায় গোটা মহীতে মূল্যবান যৌনাচারের অসদব্যবহার হচ্ছে অপরিমেয়।

মীনার পি এইচডি কোর্স শেষের দিকে। অত্যন্ত সফলভাবে পিতৃমাতৃহীন হাডসনকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে মীনা। এখন তাকে সমাজে পুনর্বাসন করতে পারলে ভাল হয়। হাডসনের একজন মেয়ে বন্ধু ছিল। হাডসনের অশ্লীল জীবন যাপনের জন্য যে একদিন ছেড়ে গিয়েছিল আজ সে-ই ফিরে এসেছে। তাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে তবেই মীনা সানন্দে গবেষণায় মনোনিবেশ করল।

একদিন গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে পার্কে এসে নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকন করার উদ্দেশ্যে একাকীই আসে। প্রকৃতি যেন তাকে কল্পনার পাখায় ভর করে নিলো সেই সুদূর অতীতে। ‘মনে পড়ে সেই লম্বা ছিপছিপে গড়নের সদা সহাস্য রশিদের কথা। একদিন স্কুলের উৎসবের দিনে আমাকে একা ডেকে নিয়ে

আড়ালে সুগন্ধী বকুল ফুলের মালা একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আচমকা গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই দু'হাত চেপে ধরে একটি ছোট বাক্য 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলেই উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়েছিল। আমার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া না শুনেই। আমি মাল্য না পারলাম ফেলতে, না পারলাম গিলতে। সে ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিল না। সে বরাবরই প্রথম হতো। আমি আশ্রয় চেষ্টি করেও তাকে ডিঙ্গাতে পারতাম না। কাজেই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত প্রতিযোগীতা ছিল কিন্তু হিংসা ছিল না। আর কোন দিন সেইভাবে রশিদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়নি। তখন আমরা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। বিদায় অনুষ্ঠানের দিন দু'জনের চার চোখ এক করে শুধু মুখ টিপে হাস্য ছাড়া আর আবেগ-ভাব বিনিময় হয়নি। এ যেন এক রূপকথার কল্পকাহিনি যা শুধু স্বপ্ন দেখার জন্যই তুলে রাখা হল আজীবনের জন্য। আমি আর কোন দিন কোন ছেলের দিকে তাকাতে পারলাম না। সেই বকুল ফুলের প্রেম সিঁধিত মাল্য কবে শুকিয়ে গেছে কিন্তু উহার সুস্রাণ আজ অবধি নাসিকা আর মন মুহ্য করে রেখেছে। গোধূলিলগ্ন যাবার সময় হয় হয় এমন সময় দেখি বটবৃক্ষের ছায়া মাড়িয়ে কেউ একজন আসছে। কাছে আসতেই মনে হলো চেনা চেনা। নাহ্ ভুল দেখছি না, এতো রশিদই! অবিকল দশম শ্রেণির সেই রশিদ! কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলে উঠল মীনা, না! আমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আবেগ আটকে রাখতে পারলাম না। খালি জিজ্ঞেস করলাম রশিদ না! সে বলল, হ্যাঁ মীনা! সেদিন তোমাকে কিছু না বলে রহস্য করে চলে গিয়েছি। তার অব্যক্ত ভাব আমাকে অদ্যাবধি কুঁড়ে খাচ্ছে। তোমার আশায় পথ চেয়ে আছি। শ্রুটিকে বিশ্বাস করে এক কঠিন পণ ছিল তোমাকে পাবই! আর কোন মেয়ে আমার হৃদয় কেড়ে নিতে পারেনি। আমি এক মালটি ন্যাশানাল কোম্পানীতে সিডনি প্রধান হিসাবে আছি, বিশাল বাংলো বাড়ি, আমি একা। আর মীনা তুমি! আমি! তোমাকে ছাড়া কি ডাবল হওয়া যায়! স্বপ্নের রাজকুমার! যাক শোন, এখানে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে পি এইচডি করছি। রশিদ বলল, চলো সন্ধ্যা হলো, এখানে আর নিরাপদ নয়, চলো কোন রেষ্টোরায়ে গাড়ি পার্ক করে কফি পান করতে করতে বিয়ের পিঁড়িতে বসার বাকী আলাপ করা যাবে! মীনার অক্ষিযুগল থেকে আনন্দ আর রহস্যের স্কুলিঙ্গ ছিটিয়ে সম্মতিসূচক অস্ফুট স্বরে বলল 'হুম'!

৩১/১০/২৪ মিরপুর

প্রবন্ধ

ভূ-রাজনীতি, অর্থনৈতিক কুটনীতি-দখলদারিত্ব ও নিজ দেশের
শিল্প বাণিজ্যের বাজার সৃষ্টি করার বস্তুগত-আধ্যাত্মিক রণকৌশল
ঃ সেকাল একাল

পুরনো মদ নুতন বোতলে ঢেলে পরিবেশনের ফলে মদাসক্তি একটুও
কমে কি? কেন কমবে বোতল না হয় বদলেছে মদ তো আর বদলায় নি। আবার
আমরা দেখি যে, বছরে একবার সাপ তার চামড়া বদলায়। গা হতে পুরাতন তুক
ফেলে দিয়ে নুতন আবরণ গজাতে সচেষ্ট হয়। ছাল উঠে নব রূপ লয়ে আশী
বিষের তীব্রতা কি এক ফোঁটাও কম দেখা যায়! না কমে না।

সর্বঅর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগ, মধ্য ও বর্তমান যুগের রাজা, জনপ্রতিনিধি,
রাজন্যবর্গের আচরণে ভূ-রাজনীতি, অর্থনৈতিক কুটনীতি-দখলদারিত্ব ও নিজ
দেশের শিল্প বাণিজ্যের বাজার সৃষ্টি করার রণকৌশলে সেকাল একালে কোন
মৌলিক গুণগত বিবর্তন দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে কই!

পাকা কাঁঠাল বিটপের নিম্নকান্ডে ঝুলে থাকলে যেমন সকল বন্যপ্রাণি যথা-
শিয়াল বাদুড়দের লোভের জিব রসে চুর চুর করে যাচ্ছেতাই ভেঙ্গেচুরে এসে
খেয়ে যেতে চায় তেমনি অবস্থা দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য কোন দেশের যথা
বাংলাদেশ। শকুনের শৈন নেত্র আছে পড়েছে এদেশের সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের
উপর।

গরীবের ঘরে সুন্দরী বউ-বি থাকতে নেই। ছোট বড় সকলের কুদৃষ্টি পড়ে
ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক গলিয়ে। কথায় বলে-গরীবের বউ সবার ভাবী। সন্নিহিতে
পাওয়ার বাসনায় অসতের অপকৌশলের শেষ নেই। বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিনস
দ্বীপ, বঙ্গোপসাগরের জলজ সম্পদ, দেশের অভ্যন্তরের ভূ-গর্ভস্থ জ্বালানী সম্পদ
সংরক্ষণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মলগ্নে পাকিস্তানের
পক্ষে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল যুদ্ধের জন্যে। এ নৌবহরটি বঙ্গোপসাগরে
পৌছার পূর্বেই পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে মিত্রবাহিনীর
নিকট। যুক্তরাষ্ট্র আর এদেশীয় এজেন্টদের যৌথ ষড়যন্ত্রে জাতির জনক
বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এখানেই শেষ নয় বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিক
কৌশলগত দখলদারিত্ব হাতে নেয়ার উদ্দেশ্যে লেগেই আছে।

ইচ্ছেমত খবরদারি করে চলছেই। অপশাসন চালিয়ে দিচ্ছে। আর এই চীন তার বাজার সৃষ্টির কৌশলহাতে নিয়ে এগুচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ করছে। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বহুজাতিক বাহিনী গঠন করে ইরাককে করতলগত করে। তেলসমৃদ্ধ এসব করদ রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে চলেছে। আফগানে তালেবান সরকার বসিয়ে ইচ্ছেমত দখলদারিত্বের খায়েশ মিটিয়ে এ অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করছে। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধে ইসরাইলকে মদত দিচ্ছে আমেরিকা। আরও কত কি বলব! সব তথ্য উঠিয়ে আনলে তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে প্রবন্ধ নুইয়ে পড়বে আর তটিনীর মত স্রোতশীলা থাকবে না। তাই আমি বলব গরীবের একমাত্র সম্পদ একখানা পুকুরের পুকুরচুরির হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মোড়লদের কাড়াকাড়ি চলছেই যতই ভাতশূন্য হয়ে শুধু পানির গরম ফেনায় হাড়ি উতড়ে পড়ছে। হাভাতের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রত্যাশা সুদূর পরাহত।

জম্ব জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বুঝি আছে একটি কারণে--সেটি হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বটি অটুট থাকে অন্তর্দৃষ্টি বিকাশের ফলে। ইহা অর্জনের কোন কর্মপ্রচেষ্টা বা সর্বাধিক গুরুত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষালয়ে যে মননের গড়ন হচ্ছে তা অমানবিক। এ মনন অলৌকিক শক্তি অর্জন ও প্রদর্শনের যোগ্যতা সম্পন্ন নয়। এমতাবস্থায় বলা যায় অধুনা পরিচালিত শিক্ষা ও উহার ব্যবহারে অস্ত্র প্রতিযোগীতা পাশবিক পশুত্বেও হিংসারই শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। সত্য সুন্দরের অপমৃত্যু দেখছি। মানুষ তার ভেতরের সৌন্দর্য হারিয়ে দেহাভরণের চাকচিক্য, ইবলিশীয় কুপ্রবৃত্তি চর্চার নরকরাজ্য গড়ছে।

এ কালের পারমানবিক মারণাস্ত্র, ক্ষেপনাস্ত্র আরও নানা যুদ্ধাস্ত্র, হালাকু খা, চেঙ্গিস খানের শাহ, তারও বহু পূর্বের ঢাল তলোয়ার, তীর, বর্শা, বল্লমধারীর রকমারী রণকৌশলের বিষয়ে, সেকালের যুদ্ধ বীরত্ব লয়ে কোন রা করব না। কারণ এয়ে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, মুদ্রার মূল্যমানের তো পরিবর্তন নেই। আমি এমন একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ চাইবো যা প্রণিধানযোগ্য।

একবার হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রহঃ) তাঁর ডেরার আশেপাশে রাজকীয় বাহিনীর আনাগোনা, যুদ্ধ বিগ্রহ বারণ করে বলেছিলেন, তোমরা এসো না, আমাকে বিরক্ত করো না। সেনাবাহিনী আরও উদ্যত হয়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলে তিনি এক মুঠো বালি নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন সেনার দিকে---সাথে সাথে সেনারা অন্ধ হয়ে গেলো এবং প্রস্থান করে পালিয়ে গেলো। আচ্ছা এখানে দরবেশ কী ঢাল তলোয়ার ব্যবহার করলেন নাকি আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ

প্রবন্ধগ্রন্থ: অচেনা পথের পথিক-১

করলেন! আমরা হযরত শাহজালাল (রহঃ) সম্বন্ধে বিদিত হই যে তাঁর আগমন প্রাক্কালে নদীপার হওয়ার যখন উপায় ছিল না জায়নামাজ পেতে সহযাত্রী আউলিয়া সমভিব্যাহারে ওপাড়ে পৌঁছলেন। আবার যখন তাঁর আগমন বিরোধী তীরন্দাজ বাহিনী মুহুমুহু তাঁর দলের ওপর তীর ছুঁড়ছিল তখন তীরের নিশানা উল্টো বের হয়ে তীরন্দাজের শরীরে বিঁধে যাচ্ছিল অলৌকিকভাবে। ইহা যারপর নাই আশ্চর্যের বিষয় কিসের বলে তিনি এটি সম্ভব করেছিলেন! তাই বলা যায়, মস্তিজাত বস্তুগত আবিষ্কারের চেয়ে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্ভূত শক্তি কার্যকরী ও নিখুঁত। আরও বলা যায় বর্তমানে পরমানু অস্ত্র ব্যবহারের বদলে আধ্যাত্মিক অস্ত্র ব্যবহার কি অসম্ভব? কিন্তু তার জন্য যথাযোগ্য শিক্ষাগুরু কই?

আদিকাল হতে মধ্যযুগ অবধি যে সব মারণাস্ত্র ব্যবহার হতো অধুনা তা হয় না, এখন সর্বাধুনিক যা উৎপাদিত হচ্ছে তা অতীব ভয়ংকর, লোমহর্ষক সন্দেহ নাই। আমরা চাই একজন যুধিষ্ঠির, একজন হযরত ওমর(রাঃ), একজন হযরত আলী (রাঃ) যাঁদের দ্যুতিময় ঐশ্বরিক অমিয় অমর মহাসমরাস্ত্রের কোন বিকল্প নেই। যার আঘাত মহীর নরক অতিক্রম করে স্বর্গ ছুঁবে।

মিরপুর, ঢাকা ২৯/৮/২৪

মানবত্ব

‘আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী’ বই পুস্তকে ততটা না হলেও লোকমুখে চালু এ কথা কয়টি সম্পূর্ণ সত্য, না আংশিক সত্য, না মিথ্যা তার বিচারে আমি উন্মুখ নই। চার হাত পায়ে হাঁটলে যেমন জন্তু জানুয়ার হয় তেমনি দু’পায়ে চললে মানুষ হয় না, আর কিছু হতে পারে। পাখ পাখালী হাঁস-মোরগ দু’পা দর্শনধারী তাদের কি আখ্যা দিব? কিচিরমিচির, ভাঁদ ভাঁদ রা শুনে কোন গুণ দেখব? কাজেই মানবের মানবত্ব গুণ বিচারেই হয়, অঙ্গ দর্শনে নয়।

এই গুণ কি? এই গুণ বিকাশের মাধ্যমেই কি মানুষ, প্রকৃত মানুষ হয়? অণেক গুণ বিকশিত হওয়ার আছে। ইহার মধ্যে সর্বোত্তম হল দু্যতি। এই দু্যতি উৎপত্তি লাভ করে হিয়ায়। দু্যতির প্রভা বিচ্ছুরিত নিজ শরীর ভেদ করে চতুর্দিকে সর্বত্র দূরে-নিকটে। উহার বিস্তৃতির পরিধির কোন সীমা পরিসীমা নেই। এইজন্য আওলিয়াগণের দিব্যদৃষ্টি সর্ব সৃষ্টি ও সৃষ্টিভেদে উন্মুক্ত থাকে। তাঁরা এশকে এলাহীর আবেশের মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন। তাঁরা আপন হাস্থি বিলুপ্ত করে ফানাকিল্লাহ হয়ে যান।

এই মানুষটির কী বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এ রকম বিশাল গুণের মনুজ কী রূপে নির্মাণ হয় তা অত্র প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অভিরচির লালসা সামলিয়ে রাখতে পারছি না। চারিত্রিক সৌন্দর্য শিশুকাল থেকেই ফোটে ওঠে। পিতামাতা সর্বাত্মে এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মা-বাবা শিশুকে শেখালো যে তুমি কোথাও যাচ্ছ, পথে দেখলে একজন বৃদ্ধ একটি বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় উঠাতে পারছে না। তখন তুমি কী করবে। তুমি তোমার গাড়ি থামিয়ে লোকটির ধারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কী সমস্যা। লোকটি তার সমস্যার চিত্র তুলে ধরবে। সমাধান করে দিয়ে তুমি যে কাজে যাচ্ছিলে যাবে। এতে তোমার ভেতরের গৌরব নামক ব্যাধিটি নিঃশেষ না হলেও একটি ধাক্কা খাবে। তোমার সাথে কেহ কোন অন্যায় করছে। এমন অবস্থা যে মুখোমুখি প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে যাওয়ার কথা। তুমি বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে প্রস্থান করলে। পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে তুমি বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করলে। এতে রক্তারক্তি থেকে তুমি আপাতত নাজুক অবস্থাকে সামলে নিলে। বিনয়ের ছোঁয়া উদ্যতের গলাকে অধোমুখি করে বিবেকের কাছাকাছি মনকে নিয়ে যায়।

খেলায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে ফুটবলে মধ্যমাঠে কেহ পারে না বলে বল চলে যায় বিপরীত দলের গোলবারে। এখন তোমাকে ফেরাতে হবে। যে করেই হোক তোমাকে বসানোর জন্য তারা অনৈতিক ফাউলের সিদ্ধান্ত

নিল এবং সফল হলো তোমার ঠ্যাঙে কাঁটায়ুক্ত বোটের ল্যাঙ মেরে। তুমি প্যাভেলিয়নে ব্যাক করলে, দীর্ঘদিন হাসপাতালে রইলে কিন্তু প্রতিশোধ নিলে না। আবার খেলতে শুরু করলে। এখানে হিংসার পরাজয় আর ক্ষমার বিজয় হল।

বহুল প্রসিদ্ধ একটি দামী শব্দ আছে-‘গ্রন্থকীট’। তুমি গ্রন্থকীট বলে তোমার শ্রেণিযুক্ত গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ পঠন-পাঠনে একাগ্রচিত্তে মগ্ন থাক বলে তোমার সফলতা অনিবার্য। এখানে তোমার ধৈর্যের বিজয় হল।

জমি চাষে পরিশ্রম হয়। শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয়। তুমি ঘামে নেয়ে উঠলে তবু হাতের কোদাল ছাড়লে না। তুমি শিক্ষিত হয়েও ক্ষেতে কাজ করছ। পাশে আ’লে বসে নিন্দুকেরা ঠাট্টা মস্কারি করছে, তুমি ভ্রংক্ষেপ করলে না। কোন উত্তর না পেয়ে দুষ্টরা চলে যাবে। তুমি কোদাল মেরেই চলেছ। কাজ শেষে সাফল্যের হাসি তুমিই হাসবে। কোন কাজ, কাজই, কাজ ছোট বা বড় নয়, বিদ্রূপে কিছু এসে যায় না-এই জায়গায় এই ধারণা প্রতিষ্ঠা পেল।

তুমি একটি লক্ষ্য সাধনে মনোনিবেশ করলে-উদ্দেশ্যের পরিণতি পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকাই হল দৃঢ়চিত্ততা-ইহা নূয়ের উল্লসিত কীর্তি এনে দেয়।

মনে রাখবে-আত্মবিশ্বাস আত্মোন্নয়নের মেরুদণ্ড-আত্মশ্লাঘায় নয়। তুমি মিছে আত্মশ্লাঘায় আত্মপ্রসাদ লাভ কর। ইহা বিপদে ভেতর থেকে আরও দুর্বল করে দেয়। ফলে জীবনের পরাজয় সংগঠিত হয়।

তোমার পোষাকে তোমার দেহের সৌন্দর্য এনে দেবে-মনের উত্তম রূপ আনবে উন্নত মানবীয় চরিত্র। যাহা অর্জনের বিষয়-বিনা চেষ্টায় নিজের মস্তকে শোভা পায় না-অলংকৃত হয় না।

মিরপুর ঢাকা-১/৯/২০২৪

জিতেন্দ্রীয়

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস-কী করে সাঁতরে বরফ শীতল চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিজয়মাল্য গলে পরেছিলেন পুরো কাহিনি না-ই শুনলে তবে এ যে এক দুঃসাহসী এবং দুর্লভ দুঃসাধ্য অভিযাত্রা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও আলবার্ট অলড্রিন চন্দ্র অভিমুখে অভিযাত্রী হয়ে ইন্দ্র জয় করেছিলেন তাতেই মহাবিশ্বের মহাকাশের পরতে পবতে আরও অভিযাত্রার উচ্চাভিলাষ পুরন হচ্ছে।

বিয়ার গ্রাফিত মহীর মরু-মেরু অগম্য অঞ্চল গমন করে নিরাপদে ফিরে এসে চমক দেখান। সার্ক-কুমীর পরিবেষ্টিত বরফ আচ্ছাদিত জলসমুদ্র অতিক্রম করে গা শিউরে উঠার দৃশ্যপাত ঘটান তাতে তুমি বিস্মিত না হয়ে ও রকম কেউ একজন হয়ে উঠবে সে দুর্দান্ত আশা মনে জাগরুক করে সে পথেই হাঁটবে দুস্ত্রাপ্য ধন পাওয়ার মানসে।

শের-ই-বাংলা কে ছিলেন বরিশালের চাখার গ্রামের শক্তিশালী যুবক তিনি হাতে ঘুষি দিয়ে নারকেল ফাটাতেন। তিনি রাজনীতির প্রাণ পুরুষ। তাঁর মত হতে চাও? তাঁর গুণের অনুসারি হও।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে অজপাড়াগাঁও থেকে হয়ে উঠলেন বাঙ্গালী জাতির ত্রাণ কর্তা-মহান জনক। বিশ্বাস করো এ কোন আলাদিনের প্রদীপ নয়। শিশু কাল থেকে ক্রমাগত চেষ্টা গুণাবলী চর্চার মাধ্যমে অকতোভয় নির্ভীক সিংহপুরুষ পাকিস্তান শকুনের শৈন নেত্র হতে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজ মাতৃভূমি স্বাধীন করেছিলেন। এ জন্য তিনি জাতির জনক স্বাধীনতার স্থপতি। তন্ময় হয়ে এ গুণের দিকে চেয়ে থাকো এবং অব্যাহত একাত্মচিন্তে চর্চা তোমাকে গড়ে তুলবে ঐরূপ গুণান্বিত করে।

হযরত শেখ ফরিদ (রহঃ) তাঁর শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর প্রথমে ছত্রিশ বছর পরে দীক্ষা গুরুর আদেশক্রমে আরও চৌদ্দ বছর বিরলে নির্জনে আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটিয়ে অতঃপর হতে পেরেছিলেন দরবেশ। সুখ স্বচ্ছন্দে আরাম আয়েশে জীবনযাপন করে তবে তিনি কী দরবেশী যোগ্যতা অর্জন করতে পারতেন? তিনি তৎকালীন কাজী তথা বিচারপতির পুত্র ছিলেন। উন্নত গুণসম্পন্ন আত্মার অধিকারী হতে হলে রাজপুত্র না দীনহীন নিঃশ্বপুত্র সে পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্ব রাখে দুঃসাহস, শ্রম আর শ্রমঘন নিষ্ঠা সুতরাং শিক্ষাদীক্ষা শেষে তুমি

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সময় দাও, বিলাসিতায় নয় তবেই তুমি কামিয়ারী খুঁজে পাবে।

এক বিখ্যাত দীক্ষাগুরু বিজ্ঞ আল-ফেসানী কঠোর আত্মিক তপস্যাকে সহজ সুত্রে গেঁথেছিলেন। সেই সহজ সুত্র ধুয়ে পানি খেয়ে আজ অবধি কেউ সত্যিকারের সাধক আউলিয়া হতে পারেন নি। বরং ভন্ড পীর বা বিভ্রাল তপস্বী দ্বারা সমাজ ঢেকে গেছে। তাই বলা যায় মস্তিষ্কজাত সাধারণ শিক্ষার চেয়ে আত্মিক উৎকর্ষজাত দীক্ষা আরো শ্রমলব্ধ এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতার ফসল। কেননা এয়ে ঐশ্বরিক গুণ এবং ঈশ্বরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের সত্য মাধ্যম।

এ বিশেষ গুণ অর্জন করতে হলে বাল্যকাল থেকে তোমাকে ধনী ও গম্ভীর হতে হবে। বিপদ হলো এয়ে, এজন্য ছাত্রসমাজ বা লোক সমাজ তোমাকে গায়ে না মেখে বোকা বানিয়ে রাখবে তখন তুমি তাদের মুখপানে না চেয়ে তোমার সাধারণ লেখাপড়া যদি অধ্যবসায়ের সাথে চালিয়ে যাও তবেই উন্নতির সিঁড়ি ডিঙ্গাতে পারবে। কারণ ঐ সমস্ত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বা লোক সমাজের কোন আত্মিক ঐশ্বর্য প্রাপ্তির লক্ষ্য থাকে না। ফলে তারা তোমাকে বুঝতে না পেরে উল্টো টিটকারী করে বেড়াবে। এতে তুমি দুঃখিত হয়ো না কারণ আখেরে তুমি সুফল পাবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

এখন তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না কর তবেই যত গোলমাল পেকে যাবে। এগুলোর স্বাভাবিক আচরণ মেনে নেবে কিন্তু উদভ্রান্ত চাহিদা অকল্যাণকর নয় শুধু আত্মিক উন্নতি সমূলে বিনাশ করে ফেলে।

তুমি ঠোঁটে যথেষ্টা মিথ্যে বয়ান দিলে-তোমার খোদায়ী জিগির রসাতলে যাবে আর তাসির হবে না। নাকে দুর্নীতির দুর্গন্ধ শুকলে আর জিহ্বা দিয়ে তার স্বাদ অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে গেলে। উদরপূর্তি করলে পরস্পহরণ করে। কী ফায়দা আসবে তোমার রাতভর করা অর্চনায়।

তোমার পা দুটো গীবত, যিনা আর চোগলখোরির নিমিত্তে বেপরোয়া হয়ে থাকে। এখন বলো কী করে তুমি স্বভাবের অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। দস্তুর মত ভয়ংকর নরক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। হিংসা আর রাগের আগুন জ্বালিয়ে অপমৃত্যু আর অপঘাতের জলজ্যাস্ত কারণ হয়ে যাবে। এসবই অন্তর উন্নতির অন্তরায়।

তোমার কান সত্য সুন্দর মধুর বচন শুনে না, মাথার মগজ সুচিন্তা করে না চোখ দু'টো দেখে সং পথে হাঁটে না। তখন তুমি সাথী হলে ডাকুর। সন্নাসী তোমায় দেখে পালাবে। সাধু সঙ্গ সুদূরপর্যাহত।

প্রবন্ধগ্রন্থ: অচেনা পথের পথিক-১

তোমার হাত দু'টি মন্দ কাজে গুছিয়ে লাগাও আর ভাল কাজে হাত গুটাও তাহলে অসুর এসে মনে বাসা বাঁধবে সুর পালাবে অযত্ন অবহেলায়। এখন বলো তোমার প্রার্থীর জীবন সার্থক না বৃথা!

সমস্ত ভাল কর্মের সমষ্টি যোগে আত্মা পরিষ্কার হয়। তার বিপরীত কন্মে কলুষিত, দূষিত হয়। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অথবা ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা জীবনে সব্যসাচী রূপে প্রস্তুত হতে হয়। মগজ যত সহজে আয়ত্বে আসে আত্মা তত সহজে আসে না।

বিশেষ দীক্ষা গুরুত্ব তত্ত্বাবধানে নিবিড়ভাবে সত্য ব্রতে ব্রতী হতে হয়। ফলে সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়।

এ সময় তোমার জীবনটা ভার মনে হবে। নিরস কাজে তোমার অনাগ্রহ দেখা দেবে তবে যথাযথভাবে জীবন যাপন করছ বলে দেখবে তোমার ভাল চিন্তা ও কাজের ফলাফল অপেক্ষা করছে। তখন আনন্দে আটখানা হবে।

ইন্দ্রিয়সমূহের সঠিক কার্যকারীতা খুবই মূল্যবান বদলা নিয়ে আসে। এজন্য নিষ্কর্মার ভাগ্যে কিছুই থাকে না। অপব্যবহারের ফলে আত্মার ঔজ্জল্য থাকে না মরে ভুত হয়। আর মানুষরূপে চেনা যায় না, জন্তুর মত হিংস্র হয়। অঙ্গবিজয় অতীব জরুরী। জিতেন্দ্রীয় হলে নিঃসন্দেহে উন্নত সুগঠিত আত্মা পাওয়া যায়। যে আত্মার অলৌকিক ক্ষমতা থাকে।

মিরপুর ঢাকা ৩/৯/২৪

আত্মার সুরক্ষায় উন্নত চরিত্রের ভূমিকা : বহিঃ/অন্তঃ অঙ্গের ব্যবহার কৌশল

আপাতদৃষ্টিতে বস্তুগত তথা বিজ্ঞানের উন্নতি যে আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পাইতেছে আত্মিক উন্নতি সেইরূপ হইতেছে না বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রম যেন ভ্রমই হয়। বিজ্ঞানে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন হয় তদ্রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বাটখারা আছে। সুত্র হইল নূ চরিত্র উন্নতি সমান সমান আত্মিক উন্নতি হইবে। এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে ধারণ করে আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল যে, একেশ্বর-ভরসায় দৈনিক দশ ঘন্টা জপ করে আগামী পাঁচ বছর পর কাজারাস্তের ঠিক এই দিনে আমি আমার ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অন্তর্দৃষ্টি দিয়া পর্যবেক্ষন করিব। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার জন্য কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। রণে ভঙ্গ না দিয়া, কন্মে ফাঁকি না দিয়া শেষ পর্যন্ত দম লইয়া তীরে উঠিবার আশা অবশ্যই করা যায়।

আত্মাকে সহায়তাকারী একটি বিশেষ অঙ্গ হইতেছে লিভার বা কাল্ব বা কলিজা উহাতে মারাত্মক কতকগুলি দোষ যথা ষড়রিপু উৎপন্ন হয়। উহার মারা বা অর্ধমৃতবৎ হইয়া থাকিলে বিপরীত গুণসমূহ উৎপাদন হয়। যথা লোভের বদলে নির্লোভ, মোহের উল্টো নির্মোহ ইত্যাদি।

তুমি তোমার শ্রমলব্ধ একটি ফল খেয়েছ। ফলের বীচি মাটিতে যত্নসহ পুঁতেছ। এই বীচি হইতে বিশাল মহীৰুহ হইল। বিটপের সবুজ পল্লব হইতে অক্সিজেন নির্গত হইয়া তোমার ফুসফুসে প্রবেশ করিল। ছের বা ছাতি অথবা ফুসফুস হইল লোহিত বিশুদ্ধ করণ স্থান। দূষিত লহর কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃশ্বাসে বাহির হয়। বৃক্ষরা আমোদে তাই পাতা দ্বারা চুষিয়া খায়। গাছের ফল ধরা এবং প্রাণীদের ভক্ষণ পর্যন্ত জপতপসহ প্রতীক্ষা কর। দেখবে আত্মিক উন্নতির পরীক্ষার ফলাফল।

তোমার ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র তথা পাকস্থলী, বৃক্ক, জননতন্ত্র, মূত্র ও পয়নিষ্কাশন তন্ত্র মিলে যে অঞ্চল তাহাই নফস নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে বৃক্ককে দ্বিতীয় মস্তিষ্ক বলে শরীর হইতে সব দূষিত বর্জ্য পৃথক করে বর্জ্যকে ইউরেটরী অর্গানের মাধ্যমে বাহির করিয়া দেয়। এই তো গেলো তরল বর্জ্যের কথা। কঠিন এবং অপাচ্য পদার্থ পায়খানারূপে পায়ু পথে নিষ্কাশন হয়। পিত্তথলি, অগ্নাশয় এই হজম রেচন প্রক্রিয়ায় সহায়ক। প্রশ্ন হইতেছে আমাদের খাবার হইতে যে রক্তমাংশ গঠিত হয় তাহা মেজাজ-স্বভাবে প্রভাব ফেলিয়া থাকে। শতভাগ সং উপায়ে উপার্জিত আহার দ্যুতিময় আত্মা গঠনে উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা রাখে বৈকি! এই সিলেবাসের মেয়াদ আমৃত্যু। অথচ ক্ষুণ্ণবৃত্তি মিটানোর তিন ঘন্টার মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় মানব চেতনায়।

ইহার পর যে বিষয়টি তোমার জীবনে ভীষণ প্রভাব রাখিবে তাহা হইতেছে ভাগ্যের লিখন না যায় খন্ডন। এই ভাগ্যের সুতার নাটাই স্বয়ং বিধাতার হাতে। এই খফী বা ভাগ্য লিখনের সাথে কর্মযোগ মিলিত হয়। শ্রোতস্বিনীর শ্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতে হয় তেমনি কর্মযোগে উর্মিটানে ভাসিয়া ভাসিয়া ভাগ্য তীরে তুমি পৌছিয়া যাইবে।

আখফা বা মগজের উদ্ভাবনী ও বুদ্ধি-প্রজ্ঞাগুণে মনুজে আর সব প্রাণ ও প্রাণী হইতে পৃথক। ইহা ধাতার বিশেষ করুণা এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে মানব মানবের গুণাবলী অর্জন করে। নচেৎ মানুষ মানুষ থাকে না দু'পায়া জানোয়ার হইয়া যায়। কাজেই উন্নত রুহ গঠনে মগজের সর্বোচ্চ ভাল ব্যবহার আশু কর্তব্য।

অন্তঃঅঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করিলে বহিঃঅঙ্গ কাজ শুরু করে দেয়। হাত, পা, কান বহিঃনেত্র, নাক, মুখ অন্তঃঅঙ্গ দ্বারা চালিত হইয়া আপনাপন নিত্য দ্বায়িত্ব সম্পন্ন করে। পায়ের কন্ম হইল শরীরের ভার বহন করা, চলাচল করা। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে নভোযান হইতে শুরু করে অসংখ্য যানবাহন উদ্ভাবন করিয়াছে যাহার ফলে মানব সমাজ দীর্ঘযাত্রার পথ পায়ে আর করে না। আখফা মস্তিষ্কের আবিষ্কারের হেতু যদি পায়ের গতি এইরূপ বুদ্ধি পায় সেই অনুপাতে রুহানী শক্তি কী পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়! উভয় শক্তির উৎস আখফাই। বিজ্ঞানের উন্নতির বাটখারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর রুহানী উন্নতির মাপকাঠি সৎ-সত্য চারিত্রিক গুণ। তাই একটা ছাড়িয়া আর একটার যত্ন নিলে মৃত আত্মা লইয়া দেহান্তরে গমন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

প্রধানত মগজ, কলিজা আর পাকস্থলীর সমবেত উদ্যোগে যাহার কার্যরাস্তা হয় সে হইতেছে হস্ত। যত প্রকার দুষণীয় আছে তাহাই মগজের কুপ্রেরণায় সম্পাদন করে হতভাগ্য হস্তবেচারী। এ হেন রকমারী মিথ্যাচারের জন্য হাত কাঁপে না। বরং খুশীতে ডগমগ হয়। অন্তর্জগতের কুমন্ত্রণার ফসল হস্ত বাহাদুর ফলায়। তাহার নিজের কোন আলাদা এখতিয়ার ইহজগতে নাই।

তোমার জিহ্বা তোমার মগজ, কলিজা এবং উদরের প্ররোচনায় তোমাকে রসাতলে নিয়া ছাড়িবে। উহা নৈতিক চরিত্রের যতটা ক্ষতি করে তাহার সমতুল্য ক্ষতি আর কোন অঙ্গ পারে না। অনুরূপ বড় সমস্যা জননাঙ্গও সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রবন্ধগ্রন্থ: অচেনা পথের পথিক-১

চোখ, নাক, কান সতর্ক থাকিয়াও কলুষিত চিন্তার ফাঁদে পড়িয়া নরক যন্ত্রণা আহ্বান করিতে ছাড়ে না। অবশেষে নৈতিক মানদণ্ড চূড়ান্তরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়া মনুষ্যপদবাচ্যের অযোগ্য মানুষে সয়লাব হইতে দেখি সর্বত্র। তোমার দৈনন্দিন শিক্ষায় যেন সত্য সুন্দর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও মহৎ চরিত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাই কাম্য। তবেই তোমার আত্মা অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের দিকে ধাবমান থাকিবে।

এমতাবস্থায় যৌক্তিকভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আত্মার সুরক্ষায় দ্যুতিময় উন্নত ও শক্তিশালী চরিত্রের ভূমিকা যারপর নাই গুরুত্ববহ এবং বহিঃ/অন্তঃঅঙ্গের সুব্যবহার কৌশল মহিমান্বিত মহামানব বিনির্মাণ করে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উৎকর্ষতার ফলে ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের আবিষ্কার আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুয়েরই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবীয় উন্নত চরিত্র সংবেদনশীলতার সাথে কার্যকরভাবে সর্বাধিক আন্তরিকতার সাথে গঠন করা হইলে নিঃসন্দেহে দিব্যশক্তি সম্পন্ন আত্মা লভ্য হইয়া জীবন সার্থক হইবে। মানব জীবনে এইরূপ সত্যিকারের স্বভাব-চরিত্রের জীবনযাত্রায় বিশেষ প্রতিযোগিতা আনয়ন করা আবশ্যিক। বিজ্ঞান সাধনায় যেইরূপ সুযোগ সুবিধা গুরুত্বসহ দেখা হয় সেইরূপ মনুষ্যত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই ইহার গঠনে আবশ্যিকভাবে গুরুত্ব, সুবিধা ও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তবেই মানব শিশু আকৃষ্ট হইবে এবং মানবত্ব অর্জন করিয়া অমর অলৌকিক পুণ্যাত্মার অধিকারী হইবে।

মিরপুর, ঢাকা। তাঃ- ৫/৯/২৪

চা-বাগান : জীবন সংগ্রামের মাথা কাটে

তুমি চা বাগান দেখিয়াছ কি? কোথাও বাগানটি হাঁটু সমান কোথাও কোমর অবধি উঁচু। কচি পাতা ও কুঁড়ি গজানোর সংগে সংগেই উঠিয়ে নেওয়ার ফলে বিটপ আর বড় হয় না যতটুকু আছে ততটিই বহিয়া যায়। সেই কচি পল্লব আর কুঁড়ি হইতেই স্নায়ু উত্তেজক চা প্রস্তুত হয় গাঁজন প্রক্রিয়ায়। প্রত্যেক মহী যেমন মহীরুহ হইতে চায় তার বাঁচিয় থাকার জীবন সংগ্রামে কিন্তু শমিকেরা মাথা কাটিয়া নেয় আর বৃদ্ধি হয় সুদূরপর্যন্ত।

যেখানে তোমার জীবনের সাধ আর সাধ্য ছিল আলোকিত হইয়া উর্ধ্বে উঠার, যেখানে জীবনের লক্ষ্য ছিল ফুলে ফলে পল্লবে সুশোভিত নয়নের মণি হইয়া জীবন যাপন করার, সেখানে বাগানীর ষড়রিপুর স্নায়বিক উত্তেজনা মিটানোর জন্যে কপোকাত হইয়া হাঁটুর নিচে পড়িয়া থেকে মরিলাম। তোমার সাধ আহলাদ কাটিয়া নিয়া উন্নত প্রযুক্তিতে গড়ান দিয়ে প্রাণে কে কী সুখ পায় জানিনে, তবে তোমার প্রাণ হরণ যে হইয়াছিল জীবনের শুরুতে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুমি কঠিন পরিশ্রমী-শ্রমের বিনিময়ে তুমি সম্পদ অর্জন করিল অনেক। যক্ষের ধনের মত ধন ধরে রেখে জন মানবের অভাবের সুযোগ নিয়া মজুদদারী বাণিজ্য করিল তোমার মূলধন আরও বাড়িয়া গেলো অজানা এক অসুখে তোমাকে ধরিলে তুমি ধরা থেকে হারিয়ে গেলে। অবশেষে তোমার কী অবশেষ থাকল? একটি কালিমায়ুক্ত আত্মা। তোমার এ কাজে কে সহায়তা করল-তোমার কলিজাই। অনুপ্রেরণা কে জুগাল-সে আর কেউ নয় -সোজা উত্তর মগজ, লালনপালন কে করল, নফসে আশ্রয় বা নফস। কেব্লা ফতে-তোমার শেষ পরিণতি ধরে আছ-মণিবন্ধ করে।

ছোট বড় ভেদাভেদ অশান্তি ডাকিয়া আনে। কারণ অধিকার হরণ করে সুখী হওয়ার চেষ্টা করিলে সুখ আসে না, ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়া অটুহাসিতে রূপান্তরিত হইয়া বিদ্রূপ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যে, যে কাজের যোগ্য তাহাকে সে কাজে লাগাও শুধু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হইতে বিরত থাক। কারণ কাহাকে কিরূপ দেওয়া হইয়াছে এ বিষয়ে শ্রুতাই ভাল জানেন।

নিজে নিজে বড় পরিমাপ করে ভিতরে গৌরব ডাকিয়া আনার কোন অর্থই নাই। নিজের ন্যূনতম শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করে দুঃসাহসী অভিযানে আগাইয়া যাও দেখিবে প্রতিকূলতা কাটিয়া উঠিয়াছে, সৎ চেষ্টার জোরে একদিন না একদিন তুমি সফল হইয়াছ। সমুদ্রের ক্যুরাল ওয়ারকারকে দেখিয়াছ? সে আপন মনে শুধু শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়া তাহার সুত্র গাঁথুনি গাঁথিয়াই যায় কোন রূপ সুনাম সম্মান স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় নয় বরং নিজ মনের আনন্দে উৎসাহে। এইটিই তাহার পুজি। খ্যাতি, সন্তোজনপ্রিয়তা অনাবশ্যক অর্থ, কাজের ধ্যান নষ্ট করে, শত্রু বাড়াইয়া দেয় আর সামনে বাড়ার সুযোগই দেয় না। কাজেই এ পথে না হাঁটিয়া, ক্যুরালের মত নিশুপ নীরব অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কন্মণ্ডণে লক্ষ্যে পৌছিয়া পয়োধি বিজয়ই কাম্য। কুটকৌশলের বিজয় টিকে না। ইতিহাস তাহাকে কুটকৌশলী বলিয়া আখ্যা দেয়। মহৎ ব্যক্তিত্ব করে না। প্রাণেশ তাহাকে দুটিময় আত্মা করে তাঁহার কাছে টানিয়া নেয়।

কচু কাটিতে কাটিতে যেমন ডাকাত হয় তেমনি অল্প বিস্তর বা ছোট খাট অপরাধ করিতে করিতে এক সময় বড় অপরাধী বা ডাকাত হয়। এইজন্য সহজ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠা ভাল বা খারাপ যে কোন ব্যাপারেই সমানভাবে খাটে। কোন গুণ বা দোষ বিকাশের নিমিত্ত যথাযথভাবে তাহার পরিচর্যার আবশ্যিকতার দাবী রাখে। মাঝ পথে উহাকে বা উহার বৃদ্ধিকে ছাটিয়া দেওয়া হইলে গুণ বা দোষ খর্বাকার হইয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ হইবে। একপর্যায়ে গডডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে।

মনে কর তুমি আশরাফ বংশের ছেলে। তাই বলিয়া তুমি আতরাফ বংশীয় একজনের সাথে মেলামেশা করিবে না? অবশ্যই করিবে। এইরূপ মেলামেশায় তোমার গুণাবলী প্রতিরোধের মধ্যে দৃঢ়ভাবে টিকিয়া থাকিবে। তোমার জানা উচিত ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রতিযোগীতা হইয়া থাকে। এই প্রতিযোগীতায় একমাত্র উন্মুক্ত চলাফেরাকারীরাই জয়ী হইয়া থাকে। এইখানে রক্ষণশীলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। একটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। জল সমুদ্র হইতে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া উর্ধ্বদিকে উঠে। উর্ধ্বাকাশে প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘনীভূত হইয়া বরফ হয়। মেঘরূপে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। একসময়

প্রবন্ধগ্রন্থ: অচেনা পথের পথিক-১

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকায় এবং বজ্র বৃষ্টি হওয়া শুরু হয়। বৃষ্টি-খাল-বিল-নালা-নর্দমা-বন-জঙ্গল-ভূমি-পাহাড় পর্বত কত না স্থানে পতিত হয়। জল গড়াইয়া নিম্নদিকে যাইতে থাকে। অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। কাজেই বারিধিকে পাওয়া নীরের জন্য সহজ সাধ্য নয়। দীর্ঘপথ পরিক্রমার কঠিন বাধা অতিক্রমের এক দুর্লভ ফসল।

ঠিক তেমনি মনুজের জীবন সংগ্রামের কষ্টসাধ্য দুঃস্থাপ্য ফলের নামই গুণ। ইহা কুসুমাস্তীর্ণ নহে, কন্টকাকীর্ণ। তার ওপর যদি মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম সংকট তৈরী করে দাবাইয়া রাখে তবে ইহাকে উপেক্ষা করিবে কী করিয়া। চা বাগানের মত আমৃত্যু ছাটিয়াই রাখিবে, বাড়িতে দিবে না। এখানেই বুঝি সিদ্ধি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের খাস করুণার রহস্য অনুধাবন করা চলে।

১৯/৯/২৪, মিরপুর, ঢাকা।

সংচরিত্রবান আড়ৎদার

বিদ্যা নেই, বুদ্ধি আছে, আজানুলম্বিত কুর্ভা-মাথায় সুদর্শন পাগরী নেই, আছে হাতাকাটা গেঞ্জি, মুখে দাড়ি নেই, আছে ইয়া বড় বড় গৌফ, আজান পড়িলেই মসজিদে দৌড়ায় না অথচ একাকী দু'হাত তুলে অশ্রু জল জল নেত্রে আপন শ্রষ্টাকে ডেকে যান-তার এ অর্চনা কেউ দেখে না, অথচ শ্রষ্টার নিকট এ উপাসনা গ্রহণযোগ্য কার্যকর। এখন কথা হচ্ছে উনি কে, ইনি সেই মহৎ আড়ৎদার।

দেশে আকাল হলো হঠাৎ পিঁয়াজ আমদানী বন্ধ। সব আড়ৎদার আড়তের দরোজা বন্ধ করে রাখে আর মুখ চেনা খন্দের এলে উচ্চ দাম হাঁকে। বেপারীরা উপায়ন্তর না দেখে চড়া মূল্যেই পিঁয়াজ ক্রয় করে চলে যায়।

ব্যতিক্রম আড়ৎদার পূর্বের মূল্যে বেপারী আসলে মাল বিক্রয় করে। সে শর্ত জুড়ে দেয়, যে দামে দেয়া হলো সীমিত লাভে মানুষকে দ্রব্য দিতে হবে। যে প্রস্তাবে রাজি হয় তার কাছেই মাল দেয়া হয়। এখানে তিনি নির্লোভ।

মানুষের চোখ বড়ই নির্মম। সে আপন পর বুঝে না। সুযোগ পেলেই সৌন্দর্য গ্রাস করতে চায়। মনের মধ্যে সুন্দর ব্যবহারের ফন্দি আঁটে। এ কন্মটি যে নিষিদ্ধ এবং অব্যবহারযোগ্য তা মনের প্রবল চাপে গ্রাহ্যই করে না। আড়তে আসা গরীব অথচ সুন্দরীদের কাজের সময় কাপড় অগোছালো থাকে। সেইটে দেখে অপরাপর দোকানী কুপ্রস্তাব দিয়ে বসে। ফলে ব্যভিচার সম্পাদিত হয়। এই আড়ৎদার চোখের কুকীর্তি বন্ধ করে এবং মনের তোলপাড় সেকারণে অটোমেটিক রুদ্ধ হয়ে যায়। এখন সে বিশুদ্ধ চরিত্রের মালিক।

সাধারণভাবে মানুষ আড়াল করে খাবার খায়। উচ্ছিষ্ট খাবার বাগাড়ে ফেলে দেয়। যা পঁচে যায় এমনকি জন্তু জানোয়ারও চেটে পুটে খেতে পারে না বিশেষ ব্যবস্থার কারণে।

এই লোক তার খাবারের দুইভাগ রেখে এক ভাগ ভাল খাবার রেখে দেয়ার ফলে এটি অবুক্ত কেউ তৃপ্তিসহকারে খেতে পারছে। এখানে সহমর্মিতার গুণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কেনাবেচায় স্বচ্ছতা এবং সততা প্রদর্শন এই আড়ৎদারের বৈশিষ্ট্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কর্মচারী গণের বেতন না কাটা আর সময় মত পরিশোধ করা।

বিনয় আর উগ্রতার যে পার্থক্য তাহা এ-কে না দেখলে বুঝা মুশ্কিল। এখানে সদাচারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

বাজারে একডাকে এবং একনামে তাকে মানুষ চেনে। তার সত্যবাদিতার জুড়ি মেলা ভার। আমানতদারিতার ক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ কারণে তার অনেক শত্রুও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দুর্বৃত্ত তার জন্য ব্যবসা করতে পারে না। ফলে তাকে মারার পরিকল্পনা করে। কিন্তু এরা ঠাঁ জানে না যে এই মানব ইতিমধ্যে মহামানবে পরিণত হয়ে গেছেন। তার জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য চলে আসে। তার চতুর্দিক দিয়ে যে কেউ যেকোন উদ্যোগ নি'ক না কেন তা ভেঙ্গে যায়। এক অজানা ভয়ে অসং মানুষ কাবু হয়ে পড়ে। এখানে তার আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সত্যতা প্রমাণিত হলো।

স্ত্রী-সন্তান সবার সমান হয় না। আন আন খাই খাই না হয়ে সংযত রসনা রাখা নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষার উপর। আড়ৎদারের বিলাসিতা এবং অপব্যয়ের বিষয়ে অনাসক্ত দেখে আদর্শ পরিবার রূপে তার পরিবার গড়ে উঠেছে।

আজ না কাল করব। কাল এলো আবার কাল না করে পরের দিনের নিমিত্ত কাজ ধরে রাখার অনিয়ম অসময়ানুবর্তীতা আড়ৎদারের নেই। ফলে পাওনাদারের অর্থ সময় মত উসুল করার যে স্বতঃপ্রণোদিত তাগিদ উপলব্ধি এ যেন তার অন্যতম রত্ন কঠিন এক লক্ষণ।

পেশাকে কোনই গুরুত্ব না দিয়ে উহা ছোট কি বড় তা মনে করে কেউ যদি আগাইয়া যায় গুণ চর্চার দিকে তবেই সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তুমি সেভাবে চলে অধ্যবসায় আর একাত্মতার সাথে তোমার আত্মিক উন্নতির পথ তালাশ করে নিজেকে তৈরী কর, দেখবে একদিন সঠিক সাধনা বলে হিমালয়ের চূড়ায় উঠেছ।

মিরপুর ২/১০/২৪

মনুষ্যত্ববাদী, ভোগবাদী এবং কুকুর-কুকুরীর সমরোহে শনাক্তকরণ শক্তিসম্পন্ন জীবনযোদ্ধার যাপিত জীবনযাত্রা

মনে কর,তুমি হাটে হাড়ি ভাজতে জান না, মনির-মনিরার গোপন তথ্য জান। একদিন তাদের অসদাচরণের সবটা দেখে ফেলেছ। কিন্তু তুমি কাউকে কিছু জানাও নি।

এতে তুমি এক সাথে দুটো কাজ করলে,এক হলো তুমি অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করলে দুই হলো, তুমি দুর্মুখীদের সামাজিক হামলা থেকে ওদের রক্ষা করলে। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের কমল ফুটেছে, তার সুঘ্রাণ এবং সৌন্দর্যে মানুষ মোহিত এবং মুগ্ধ।

মনির মনিরা স্কুলের উচ্চ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রী। তারা যৌন সম্পদের মূল্য এবং সদব্যবহার না জেনে স্কুলের দেয়ালের পার্শ্বে অগোচরে ভোগ করতে চেষ্টা করল, করল না ঠিক, করেই ফেলল। তাদের শরীর ঘর্মাক্ত আর নিম্নাঙ্গ রসাল হওয়া হেতু কাপড় চোপড় ভেজা। তাদের কামাঙ্গ উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত। মিনিটি দশ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। যেন স্বর্গীয় আনন্দের খোঁজ তারা পেয়ে চোখ বুঁজে ভোগ করছিল। তারা জীবন যুদ্ধের পাথারে অবিম্ব্যকারী জীবন যোদ্ধা এবং অনেকটা কুকুর কুকুরীর মত প্রকাশ্যে যথেষ্ট এবং অগম্যে যৌনাচারে অভ্যস্ত হল। এইদুটো প্রাণির নির্লজ্জতার ফলাফলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্তমানকালের ইউটিভের পর্ণপ্রাণী। তারা দেয়ালের চিপায় কিংবা জঙ্গলের কিনারে অবস্থান নিয়ে এহেন কম্প্রদান করে লজ্জার মাথা খেয়ে তার ছবি প্রকাশ্য দিবালোকে দেখায়। দুনিয়ার মানুষ যেন তাই দেখে উদ্ভুদ্ধ হয়, হচ্ছেও। একি সর্বনাশ!

আগে মানুষ কুকুর কুকুরীর ঘটনা দেখত এবং জানত এখন এরূপ দৃশ্যে মানুষ দ্বারাও হয় তার অবলোকন প্রত্যেকের মুঠোফোনেও পাওয়া যায়, যৌন পল্লী বা দেয়ালের চিপার ভোগ্য বস্তু নয়।

তুমি পথদিয়ে হেঁটে যাচ্ছ এমন সময় দেখলে এক লোক পাঁচা শামুকে পা কেটে বসে আছে। কাটা স্থান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। পাশে আর কেউ নেই। এখন তুমি কী করবে।

এইলোককে কাঁধে চেপে লয়ে গিয়ে হাসপাতালে নিবে নাকি না দেখার ভান করে পালিয়ে যাবে? তুমি যদি প্রথম কাজটি করো তাহলে দয়াবান হলে।

ক্লাশ বিরতির ফাঁকে তোমরা ক'বন্ধু মিলে ক্রিকেট খেলছিলে এমন সময় একজন বলের চোট পেয়ে জখম হলো সে উত্তেজিত হয়ে আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত দিলো। ব্যাপারটি দূর হতে তুমি প্রত্যক্ষ করছিলে। ঝগড়ার বিষয়টি বিচার আকারে প্রধান শিক্ষক অবধি গড়াল। এখন ঘটনাটির বিচারে সাক্ষীর আবশ্যিক। তুমি সাক্ষী মনোনীত হলে। তুমি যা দেখেছ তাই বর্ণনা দিলে। সুষ্ঠু বিচারে তুমি সহায়তা করলে সত্য সাক্ষীর মাধ্যমে। এখানে তুমি সত্যবাদিতার প্রমানক।

অংক বিষয়টি জটিল এবং প্যাঁচানো। তুমি পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে তবেই সমাধান খুঁজে পেলো। এটি অধ্যবসায়। আবার ইংরেজি বিষয় বিদঘুটে এবং বিরক্তিকর। অনেকক্ষণ ব্যাপী অধ্যয়ন মন চাহে না। গড়তে বসে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। পড়া থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখানে একাগ্রচিত্তে ধৈর্যচ্যুতিকে প্রশ্রয় নাদিয়ে ধৈর্য সহকারে তোমার পাঠপর্ব সমাধান করার নামই ধৈর্য ধারণ।

মনে কর তুমি তোমাদের ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হলে। ভিপি হয়েও রক্ত চক্ষু করে প্রধান শিক্ষকের সাথে দাবী উপস্থাপন করতে কে শিক্ষা দিল, কেউ দেয় নি। তোমার ভেতরের জানোয়ারটা বেরিয়ে পড়ছে তাকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখনি বা পার নি। তোমার উগ্রতা একদিন তোমাকেই গিলে ফেলবে। এ আচরণের বদলে তুমি যদি বিনয়ের সাথে টেবিল না চাপড়িয়ে দাবি উপস্থাপন করতে কী ক্ষতি হতো? অন্তত প্রধান শিক্ষক তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ থাকত, দাবীনামার যাই হোক।

এবার আস তুমি ভোগের অসীম লম্বা জিহ্বা নিয়ে। দেখ তুমি পড়াশুনায় খুবই ভাল। কারণ তুমি নিয়মিত পাঠাভ্যাস কর। তোমার সহপাটি পাটদানে অক্ষম থাকে প্রায়ই। তাই তাকে বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয় বৈকি!

সে আর বিদ্যালয়ে যেতে আর্থহি নয়। কাজেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাপের ব্যবসায় মনোযোগী এখন। তা কালক্রমে তার অনেক ধনসম্পদ হয়েছে। সে সম্পাদকের পাহাড় গড়েছে। সম্পদে গা ভাসিয়ে দিয়ে আছে। সে এখন মুর্থ কিন্তু ভোগবাদী কারণ তার মধ্যে শিক্ষা না থাকায় জ্ঞান আসে নি আর জ্ঞান না থাকায় সে আর পশুতে পার্থক্য নেই। আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে, সে এবং পশু সমান জ্ঞানের অধিকারী। পশু আর পেশী শক্তিতে যেখানে রাখঢাক থাকে না সেখানে কুকুর কুকুরীর চিত্রপট দৃশ্যমান হয়।

এবার তোমাকে সুপ্রবৃত্তির ছোট ছোট পাপড়ীকে কুমুদিনী থেকে সযতনে শনাক্ত করে আলাদা করতে হবে এবং তার প্রায়োগিক দিক বিশ্বস্থতার সাথে কাজে লাগাতে হবে। একটি একটি করে মানবীয় যত গুণরাজি আছে তার প্রতিটির বিকাশ হলেই তুমি মহামানব। তখন ভোগ আর পশুত্ব বহুদূর পালিয়ে যাবে। একটা উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক।

তোমরা জান আরবের বেদুইনরা মরুভূমিতে দলবদ্ধভাবে বাস করে অনেকটা আমাদের দেশের বাইদা দলের ন্যায়। এ বেদুইনরার প্রধান জীবিকা পশু পালন। সুতরাং তারা সন্তান সহ নিজেরা দিন ব্যাপী পশুর রাখাল হয়। বংশানুক্রমে পশু পালন করে সন্তানাদিকে এ বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলে। এ শ্রেণির মানবের প্রধান গুণ সরলতা। এই সরলতায় ভর করে সকল প্রকার গুণাবলী বিকাশ লাভ করে। আর যদি কোন শুদ্ধ জ্ঞানের আলো এসে ছায়ার মতো তাদের আগলে রাখে তাহলে তো কথাই নেই সেই জ্ঞান আঁকড়ে ধরে তারা মানবীয় গুণাবলীর জন্য এক এক কিংবদন্তী হয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঐর যামানায় এটি পরিষ্কার হয়। তিনি তো নিজে মহামানব কিন্তু তাঁর সাহাবা তথা সাথীরাও গুণে বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁরা আত্মত্যাগী এবং পশুপ্রবৃত্তি রহিত ছিলেন। অতএব একথা নির্ধিঁদ্বায় বলা যায়, সদপ্রবৃত্তি শনাক্ত করে করে চর্চা করা গুরু হলে অসদপ্রবৃত্তি পালিয়ে যায় তা প্রায় নিশ্চিত।

৫/১০/২৪, মিরপুর ঢাকা।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

প্রথম সর্গ

হৃদয়চারীর বয়ান----

মহান আল্লাহতায়ালার জাত কি? প্রশ্ন, চিন্তা-
ওই গবেষণা বারণ। কারণ তার সীমা নাই,
সসীমের চেষ্টা জানার, হবে যে পন্ড্রম তা।
নবী মুসা (আ:) হন বেহুঁশ, তা দেখবার চাই।
সুরা ইখলাসে আল্লাহ বলেন, নবীকে যে,
“বলুন, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়” জানবেন,
“তিনি অভাবশূন্য” আয়াত দ্বিতীয় ওহে,
“তিনি কাকেও জন্ম দেন নি এবং নহেন
তিনি কারও কর্তৃক জাত” আয়াত তৃতীয়
“আর তাঁর সমতুল্যও কেহ নাই” চতুর্থ-
আয়াত। খাতেমুননবি এর ‘পর নাযেল হয়
ফোরকান। তা-ই হোক মহাকাব্য তরে রপ্ত!

আমি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মুখ গুঁজে,
শুঁকে, শুঁকে শেষে সন্ধান করি স্রষ্টার-
পাই নি আর অন্য সৃষ্টি বহু খুঁজে,
যে লইবে আমার, জীবন-নির্ভর-ভার।
সৃষ্টি ছেড়ে ছেড়ে উঠিলাম উর্ধ্বলোক
হায়, হায়, কোথাও কিছু নেই হেরি,
অবাক বিস্ময়ে তাকাই, অদ্ভুত সুখ
অনুভবি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভেরী
পরি আল্লাহ-আদেশ রুহের গলায়,
নফসে আন্নারা পরিহরি, পিষে পিষে
দু’পায় যত পারি, জীতেন্দ্রীয় এ কায়
যাবে কোথা, দৃঢ় বিশ্বাস আর কিসে?
এল্‌মে লাদুনি আর কল্পনা পাখা মেলি
যত আগাই তত অভিভূত, তার শেষ
নাহি যে, তার শেষ নাহি যে, জলকেলি
করে হংস আজীবন পায় সূচাত্ত কেশ

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

জলশ্রীড়ার? যেথা যাত্রা অনন্ত, অসীম
সেথা পরমেশ খুঁজে কী করে পাবে এ
মনুজে? বিড়ু লীলা-রহস্য বুঝে সসীম
এসব নাস-খান্নাছ-জ্বীনের সাধ্য কিসে?

দ্যুলোক-ভুলোক ঘুরে ঘুরে মুক্তি খুঁজি,
খুঁজি তার উপায়, হায় অসংখ্য ছত্রাক
গিজ গিজ করে মগজে, মিছে লয় বুঝি
অস্তিত্ব হরণ করে আমার, ঘুরে যায় বাঁক
নশ্বর জীবনের, তারপর সয়লাব! সয়লাব!!
মিছে ছত্রাকের, গডডালিকা প্রবাহে চলে
পুত এ ভুবনে, হারায় অদৃশ্যে সত্য ভাব।
মিথ্যের জোয়ারে মনুষ্য-মহাসমুদ্র টলে।
যেন যাদুকরের যাদুর খেলা চলে অখিলে,
চরিত্রহারা রূপ প্রলোভন, রম্য মায়া-কানন,
চৌম্বক প্রাবল্য লয়ে আকর্ষে লৌহ, দ্বিলে।
ধীরে নিয়ে যায় যমালয়ে, আরশীতে আনন
হেরি হতবিহ্বল আপনি! এ কী গো আমি!
হারা হি আপনায় অধোপথে, বর্ণচোরা ইতর!
নরক কুন্ডে, পাব কি শশী, অমাবশ্যার যামী
গিলেছে যখন? থাকিব জাহান্নামের ভিতর
জনম জনম হায়, কর্মযোগে বুঝি এ প্রাপ্তি
নসিবে লিখা! অধর্মে ভাসিলাম কেন গো?
এ রূপ ঘটিবে ইহজীবনের জঘন্য সমাপ্তি
এ পতংগসম বাঁপানো বহিতে যেন গো!
যদি ঘুণাঙ্করেও বুঝিতাম, পাইতাম তবে
মুক্তি রূপ আবে কাউসার স্বর্গীয় পানীয়,
উধাও হত আজি যত যন্ত্রণা, কষ্টরা সবে
শাস্তি থাকিত না কিছু আর নরক জাতীয়।

কী সেই আবে কাউসার! কার লাগি পেয়!!
বুঝা সোজা, দৃঢ় বিশ্বাস তুইয়াবা কাল্মায

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

ইহজীবনে, প্রিয়তম আর সব আবশ্যিক হয়
প্রতিভাত যাঁর নিকট, সে-ই এই স্বর্গরস পায়।
বিধির ভাষ্য, রোজ হাশরের জীবন-জীয়েন
একমাত্র পানীয় আবে কাউসার উপহার তাঁর।
শান্তি-স্বস্থিদায়ী এ পানীয় পাওয়া সত্যি লক্ষণ-
ওই অলি নিঃসন্দেহে আশীর্বাদপুষ্ট বিধাতার।

কেমন জীবনযাপন এমন পূণ্যবানের জানি,
তাহলে যেতে হবে তাঁর সীরাতে,কেরামতে
হতে হবে জীবন-যাপন-স্বরূপ অনুসন্ধানী,
হতে হবে সারথী সাধনার,চড়িতে হবে রথে,
ব্রহ্ম-ব্রতে রুহানী-তাখদ প্রয়োগে একাত্ম যে,
আসুক সে মানুষ ফুল্লচিতে এ পথে সংগ্রামে
আত্মজয়ী বীরেরে চিনি নবী,আরও অনেকে,

পীর, ফকির, দরবেশ, মুনি, ঋষি, অলির নামে।
আত্মশুদ্ধির যাত্রা পথ বন্ধুর নাকি সমতল,এ
কঠিন না নরম, সরল, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম
মনোযোগ গভীর নাকি জপতপে অভ্যাস সই,
পোষাকী নাকি গুণী, গুণে আনে গুণ অনুক্রম,
শর্ত সব পূরণ করে চলে ফলাফলের দিকে
চাহি, ধৈর্য্য যে পথে, সে পথে আছে কাংখিত
সিদ্ধি, লয়ে যায় গোপনে সাধক অভিলাষীকে,
ক্ষণ ক্ষণ লয়ে বহুক্ষণ, ক্রণ হতে গজে ইল্লিত
মানব-প্রাণ,দেখে শিহরিত! কখন করিলে এমন?
সাধক মানেই আলাদা যাপিত জীবন,মিল নেই
কারো সাথে কাজের, একক চেষ্টায় উঠা রতন,
সিদ্ধি লাভ মানে সুস্ম থেকে সুস্ম কাজের স্তরেই
মন দিয়ে স্তর ভেদ করে লক্ষ্যে জয়ী হওয়া।
দৃঢ় বিশ্বাসী মানেই দ্বা'য়ী,দাওয়াত দিয়ে যান,
“হেদায়েত” আল্লাহ তায়ালার খাস রাহীম গুণ-

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

যোগে কেহ যদি পান, তিনিই বিশ্বাসী ভাগ্যবান ।
রিপু পুড়ে পুত হয়ে, আশা আর ভয়ে ভয়ে ডাকুন
আপনার বিভুরে, তারপরেও যায় না বলা বাধ্ধ
মহান ঈশ্বর । এশ্কে এলাহী তরে মৃত্যু কবুল পণ-
প্রাণ যায় যাক, তবু ছাড়িব না পরহেজগারী ঝাড়া-
মৃত্যুই মুক্তি! নিঃশেষে প্রাণ! যদি পাই ঈমান-ধন!

কিসের দৌলত-জ্ঞান-ক্ষমতা আহরি সময় নষ্ট বৃথা?
এ সবের সহীহ ব্যবহারে হয়ত পূণ্য পাওয়া যাইবে,
বিশ্বাস-শক্তি বৃদ্ধির উপায় কি? কোন্ অভ্যাস মিতা?
কাল্গা জপ অহোনির্শ, ধৈর্য্য অভাবে, পরিশ্রমে নাইবে ।
নবীর ছাহাবীর গুণে হুবহু ধরে ধরে যে বেড়ে উঠে সে,
ওয়াসা ওয়াসা শয়তানের প্রতিজ্ঞার ছুরি দিয়ে জবাই
করে অবলীলায়, অন্য লোভ ধ্বংস করে দৃঢ়ভাবে যে,
জয়ের মালা তাঁর, অটল সদাভ্যাসধারীর দুশ্চিন্তা নাই ।
প্রাসাদ নিরাপত্তা নহে, নিরাপত্তা চেতনায়, বিশ্বাসে ঠিক,
যেথা আছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” মূলমন্ত্রে চরম দৃঢ়তা,
ছিন্ন কাঁথায় কি শত্রু-বুহ্যে রহে যে নির্বিকার নির্ভীক,
সে কেহ নয়, “শ্রষ্টার প্রতিভূ মানুষ” ছিল না কারু তা
কাম্য সৃষ্টি তরে আর সৃষ্টির । কেহ হয়, কেহ অহং
বোধে করে নি মাথা নত, আজও চলে হিংসাভাব ।
শ্রষ্টায় ভুলতে, ভুলাতে কাজ করে বহুরূপী খান্নাছগং ।
শ্রষ্টা যা জানে সৃষ্টি তা জানে না-মানুষ গড়বে স্বভাব
অজশ্র বাধা শেষে, বিধির ইচ্ছে মত, হবে ধন্য শ্রষ্টার
আশীর্বাদে, পেছনে পড়ে রবে শয়তানের প্ররোচনা ।
সর্বাদিম নূর মোহাম্মদ (সা:) প্রিয়তম সৃষ্টি বিধাতার,
এ নবীকুল নেতা, রাহমাতাঞ্জিল আলামিন প্রণোদনা
বিস্ময়কর মানবজাতির লাগি, মনুষ্যত্বের মূর্ত প্রতীক ।
অনন্য অনুকরণীয়, একমাত্র শাফায়েত ক্ষমতাদারী,
আবে কাউসার প্রাপ্ত, শূকর গুজারি নামাঝি অধিক,
মাকামে মাহমুদ তাঁরি, সৃষ্টিকুলের বিপদে কাভারী ।

দ্বিতীয় সর্গঃ

ইবলিশঃ

পঞ্চম জিন নবীও বাদশাহ হামুস তনয় খবিস,
ছিল পিতা ইবলিশের, সে খবিস ছিল ভয়ংকর
সিংহের ন্যায়, স্বভাবও তদ্রূপ। সৃষ্টি করেন ঈশ-
খবিসের দেহ পঞ্চ জিন শক্তি দিয়া, চেহারার ‘পর
ধূর্ততার ছাপ। মাতা হামুস তনয়া নিলবিস ঠিক
যেন দেখিতে নেকড়ে বাঘ, নেকড়ে স্বভাব। নরক-
আগুন, খবিস আর নিলবিসের মিলনে দুষ্ট বাতিক
ইবলিশের জন্ম। তাই তার স্বভাবে করা যায় পরখ
ত্রিসত্তার প্রভাব ও প্রকৃতি। ইবলিশ-পিতার বন্ধু
নাম তার “সারবুক” ছিল সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। তার
হাতে করল অর্পণ ইবলিশকে খবিশ অনুসন্ধিৎসু
করিতে বিদ্যা। অতিশয় মেধাবীও স্মৃতিশক্তি যার
সেই ইবলিশ একবার যা শুনত চিরদিন তা রাখতো
স্মরণ, ফলে সারবুকের মনে ধারণা ছিল উচ্চ অতি
সে তার বন্ধু খবিশকে বলতো ইবলিশ হবে বিখ্যাত,
আমার ছাব্বিশ হাজার বছর শিক্ষকতা জীবনে ধী
এমন দেখি নি আর। কিন্তু দুঃখের বিষয় অহংকারী,
বেয়াদব এবং ভীষণ একগুঁয়ে সে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার
এই দোষে হইবে। জিনকুল ধ্বংসকালে অত্যাচারী
সব ধ্বংস হলেও বালক ইবলিশ বিষয়ে লয়ে খোদার
অনুমতি স্নেহবশত ফেরেশতা লালনের তরে তারে
তুলে নিল প্রথম আসমাণে। এবাদত করার কৌশল
শিখিয়ে দিলে অগ্নায়াসে শিখে ইবলিশ একনাগারে
এক হাজার বছর এবাদত করল। এবাদতে মনোবল,
নিষ্ঠা, একগ্রতা দেখে হতবাক ফেরেশতা। যেখানে
ফেরেশতা সৃষ্টি এ লক্ষ্যে! শিক্ষা-দীক্ষা কাজ একটি
ইবলিশ শিখে কানুন এবাদতে অগ্রগামী সে শানে
হয়ে গেল ‘খাশে’, পেলো দ্বিতীয় ব্যোমে স্থির স্থানটি।
আরও মশগুল অর্চনায়, ধন্য হল সে হয়ে ‘আবেদ’
আর এক হাজার বছর কাটে একাগ্রে এবাদতে বসে,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

ওয় অম্বরে হাজার একে হল ‘অলী’ খোশ আমদেদ,
কম্ম এবার ৪র্থ ক্ষিতিতে ভূষিত ‘সালেহ’ রূপ যশে।
এক হাজার বছর করে অর্চনা শেষে ৫ম, ৬ষ্ঠ, সপ্তম,
বেয়াম সকল হয়ে সুখ আবাস তার, সুখী সে উত্তম।
দাসকৃত-আদব শিখে স্বর্গদূত হতে মেধাবী শয়তান,
হয় অধিক জ্ঞান তার, আরাধনায় নামে দ্রুতই বান।
একবিন্দু নেই খালি সেজদা দেয়া স্থান চাঁদ জমিনে,
ইবলিশ হলো নেতা ফেরেশতার আরশেমুয়াল্লাধীনে।
মুয়াল্লিমুল মালাইকাহ আজি সে; সর্বোচ্চ সে সম্মান,
কোথা হতে কোথা গেল শান, অর্চনা মেধার অবদান।

তৃতীয় সর্গ

“জগদীশ্বর কোরআনে বলেন, ‘ওয়াইজ ক্বালা রাব্বুকা
লিল মালাইকাতি, ইন্নিজায়িলুন ফিল আরদি খলিফাহু;
ক্বা-লু আতা মাই ইউ ফসিদু ফীহা ওয়া ইয়াসফিকুজ
দিমা আওয়া নাহনু নুসাবিহু বিহামদিকা ওয়া নুকাদি
সু লাকা, ক্বা-লা ইন্নি আ‘লামু, মা-লা তা‘লামুন’।
ধাতার আদেশ লয়ে হযরত জিবরাইল ভব তলে এসে,
কা‘বা অকুস্থলে একমুঠো ভূ চাহিলে শুনি অবাক কহে,
এ অধম দ্বারা আদম সৃষ্টি স্রষ্টার অভিলাষ! বিচিত্র বেশে,
মনুজে বিধি অভিমুখে ফিরবে গো নরকের শাস্তি বহে!”

ভূ কহে, পণ এ যে দিব না আমায় ওগো যাও ফিরে,
স্বর্গদূত মীকাঈল-ইসরাঈলকে অনুনয় করে বসুন্ধরা,
‘নিও না আমায় চাহি দয়া’, বিমুখে ফিরে ধীরে ধীরে,
জনাব আজরাঈল আসি আচরি ভূ সাথে করি কড়া-
অনীহা মাটির শুনি, শুনি কসম, যমদূত বলে যায় চলি,
যাঁর শুনাও কসম, তাঁর বিধানে তব জোরে নেব দলি,
এসো হে বলে, প্রাণেশ পানে ছুটে লয়েই অবলীলায়,
শুন হে যমদূত সুখালেন প্রাণনাথ, কুহেলিকাময় ভবে,
সৃজিব আদম মনু-মোর খলিফা, হরিবে প্রাণ বলি যবে,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

আজরাঈল বলে ‘যথা আজ্ঞা, নাথ’ মনু যদি দোষ ধরে,
গালিতে মাখে আমার নাম তবে কী হবে সুধায়, ঈশ্বরে ।
শুনে বিভু ক’ন, রবে কারণ মারণ সাধনে লও মনোবল,
‘শত্রু’ নহে রোযা অনলে জড়ায় মরে, দোষ দাবী অচল ।
ঈশ বিধি করি, স্বর্গদূতেরে বলি তায়েফ-মক্কা মাঝখানে,
রাখি রহম বর্ষণ ঢালি ভূ-কাদায় পরিণত দূ’বছরে আনে ।
৪র্থ হতে ষষ্ঠ বছর ধরি শুকনো ঠনঠনে হয় আদম-পুত,
জোটে অষ্টম বছরে, এ খান্নাছ লয়ে সত্তর হাজার স্বর্গদূত ।
আদম দেহ পিঞ্জর রহে ধরিত্রীতলে হেরি দুষ্ট আযাযীল,
বেইজ্জতী মানসে, আর ফিরে যায়; অনাসৃষ্টি ঐ ফাজিল ।
ইতর শয়তান জানে স্বর্গদূত হকে; এটি-ই হবে হবে যে,
রাবুল আলামীনের খলিফা, বসুন্ধরায়, কী করা তবে যে ।
এ-কে প্রাণনাথ করে দিলে আমার অধীন, তারে করিব
ধ্বংস আমি যে, আর হলে অধীন তার, অগোচরে, রহিব ।
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা যে,
অভিশপ্ত ইবলিশ, আদম (আঃ) হযরতের উত্তপ্ত রহা দেহ
বেয়ে ঢুকে যায় নাভি অবধি, আদম-দেহখানি চঞ্চলা যে,
আদম-বপু দুশমন, হিংসা নেশা-ইবলিশ, থুথু তুলে লেহ,
খান্নাছ-থু থু হতে কুকুর হয়, জিব্রাঈল আলাইহিস ছালাম,
হতে হয়ে সৃষ্টি ধাতা-মঞ্জুরে; ইয়াসিন সাল্লাল্লালাহু আলাই-
হি ওয়াসাল্লাম তসবিহ জপরত পুত আরশে, হতেই ঘাম
তাঁর, ঐয়ে ভূভাগ চিহ্নিত যেথা রওজা আজি রহে দাঁড়াই ।
জিব্রাঈল আলাইহি সালাম হযরতের আদেশে বা-খোদার,
মেশক্-অম্বর মিশিয়ে সেথায়, মুখ অবয়ব আদম আলাই-
হি সালাম হযরতের করি দেন নূরানী, সে বিশাল আকার
হযরত আদম আলাইহি সালাম দ্বিগুণ নূরে আদম তাই ।

চল্লিশ দিন অন্তে আদম (আঃ) হযরতের দেহ তৈরী হলে,
ফরমান এলো যে, হযরত জীবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল,

ইসরাফিল সবে যাও, ‘রুহ’বক্ষ পিঞ্জরে, ঐশী কুদরত বলে
আদম দেহে পৌঁছাও; সত্তর সহস্র স্বর্গদূতসহ অমলিন দ্বীল ।

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

রুহ নূর-পাত্রসমেত নূর ঢাকনায় ঢেকে আদম মস্তক ‘পর,
রাখি খুলে ঢাকনা সরানো হয়; সপ্তম অন্তরীক্ষই ভরে যায়
স্বর্গদূত আগমনে, আদেশ রহমানের রুহ দেহে করো ভর,
সাত চক্র দিয়ে পায় না পথ, রুহ যে। না ঢুকে আদম-গায়।
পানাহ্‌ চাহি দয়াল ভয়াল বিড়ুর,কহে রুহ আমি নূর জাত,
কী করে আঁধার আবর্জনায়, গাত্র ভেতরেই ঢুকিব আমি যে,
গায়েবী আওয়াজ এলো-বাধণ বিনে যাও ভেতরে তব ধাত
বিরোধী হলে, এসো হে ফিরে; দেহ রক্ষ যত খুলি নামি যে।
দেহের ভেতরে এসে মস্তক-চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে; সে চোখ খুলে,
রুহ মাথা থেকে নামে কণ্ঠনালী বরাবর,তাহা হতে আসে
বুক অবধি,বুক হতে নাভী নাগাদ এসে থামে কুদরত মূলে।

কাদার দেহে হলো গোশত্ হলো হাড় অস্থি মজ্জা অনায়াসে,
কী অপরূপ কুদরত, এ ক্ষণে ভীষণ চঞ্চল আদম দিয়ে টেস,
জমীন ‘পর উঠিবার চাহে; স্বর্গদূতগণ আদমেতে ভালোবাসে,
এ বান্দাহ তুরা প্রবণ হবেন, এখনও কাদাময় রহে অবশেষ।
আধেক তবু উঠিবার চাহে! ‘খুলিকাল ইনসানু আজ্জুলা’ পুত
বাণী ঈশের প্রমাণক, নিরিখে ঈষ্ট, তাড়াছড়ো নড়া-সাধুবাদ,
হাড় মজ্জা জোড়া রগ মাংশে অবিরাম! অবয়ব দর্শে স্বর্গদূত-
এসে শুইয়ে দিয়ে মুখ মর্দন করে মিটায় আদমের অবসাদ!
আসে স্বল্প পরে হাঁচি ‘হালহামদুলিল্লাহ’ উচ্চারি আদম বোল,
হযরত আদম আলাইহিস সালাম, ‘শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি’ সারে জাহানে,
পরমেশের রাহে পরিগণিত হন, রাব্বুল আলামীন করে কবুল,
গায়েবী আওয়াজে জানান, ‘ইয়ারকামুল্লাহ’ শব্দাবলী প্রদানে।
আলহামদুলিল্লাহ্‌ শুনবে যে বলিবে সে মুমিন ইয়ারকামুল্লাহ,
আল্লাহতায়ালার খলিফা আশরাফুল মাখলুকাত এ মহামানব,
অধীন তাঁর করে রাখা আসমান-জমিন আর সব গায়রুল্লাহ,
ঈমান-একীনে থাকা মনুষ্য দায়, এ নূর-রুহ রাহে রব আদব।

খোদা জিবরাঈল (আঃ) কে জানান, হে জিবরাঈল

তুমি দাও হাঁচি, তিনি আরও বলেন,আমি সৃজিব

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

এক বান্দাহ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম পুত দ্বীল
হযরত আদম (আঃ) উঠি জপ লভি নবজাত নব।
স্বর্ণখচিত মুকুট পরে,সাজ সুশোভিত আদম স্বর্গ-
আসন এক লয়ে বসেন যাহা মোড়া জহরত মনি
গহনায় ঘেরা; উপহার বিধির! আরশ অবধি এ অর্ঘ্য-
দেদীপ্যমান নূরে, সত্য নূরে মোহাম্মদী, রহম অবনী।

চতুর্থ সর্গ

সেজদাহ্ (সম্মান) ও সেজদাহ্ (অর্চনা) পর্ব

মনু,বোধগম্যে আনয়ন কর হে, -স্বর্গদূত মিলে সবে
সেজদাহরত খোদা সকাশে, অর্চনায় সবিনয়ে; অতঃপর
আদম (আঃ) হযরতের সৃজন শুকরিয়ায়,উসিলা লভে
নূরে মোহাম্মাদীর সম্মানে, করে যে সেজদাহ বরাবর
শ্রুস্তার; ফখরবশতঃ ইবলিশ সম্মান সেজদাহ দেয় নি,
কাফের শয়তান আদেশ না মেনে গরবেই মজে সে,
মাটির আদম নামীয় হলেও ছিল নূরে খোদা প্রিয় উনি,
আর সেই বান্দাহ উত্তম সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদী মহত্তম যে।

কালামে পাকে বলিলেন আয়াতে আল্লাহতায়াল্লা যে,
“ওয়া ইজ কুননা লিল মালায়িকাতিস,জুদলি আ-দামা
ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ, আব্বা ওয়াস্থাক বার্বা ওয়া কানা
মিনাল কাফিরিন।”

২য় সেজদাহ্ ছিল আল্লাহ্ তরে; না বুঝে করে না আযাযিল,
খোদার প্রতি সেজদাহ্ বুঝি অর্চনা; শুকর খাঁটি ঈমানের ধারে।
নূরে মোহাম্মদীর উসিলায়,আদম সৃষ্টির প্রতি সম্মাননারে---
যে অর্থে সেজদাহ্,বুঝি সম্মান; বোকা মুর্থ করে ফখর দাখিল।

এই স্থানে রহস্য বা মেসেজ টা কী!

খুঁজে বাহির কর হে মাথা হতে ধী!

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

খাটাও মাথা, মনুকে সেজদা শুনেই,
করিছ বাড়াবাড়ি, অল্প জ্ঞান গুণেই,
ভেঙ্গেছ লাঠিতে সত্য জ্ঞানীর বাড়ি,
পীর তথা জ্ঞান বৃদ্ধের হাটের হাড়ি!
ঈশ হতে আসা পুত রুহ তাহে সৃষ্টি,
সম্মান জানাবে সেজদায় এতো কৃষ্টি-
ঐতিহ্য আছে কোরআণেই, কে বলে
না জেনে কী, গডডালিকা প্রবাহে চলে?

পঞ্চম সর্গ

লা'নত পাওয়া ইরলিশের কিয়ামত পর্যন্ত
প্রাপ্ত ক্ষমতা পর্ব :

বিধির নিজ হাতে গড়া মনুজ-আত্মা অমূল্য,
রুহ-দাম জানে শুধু ধাতা, সৃষ্টি সেরা অমূল্য।
খোদা সুধায় ইবলিশেরে-
'ইয়া ইবলিশ মাম
মান্ আকা আন তাসযুদা লিমা খালাকুতু
বিয়াতা ইয়া আস্তাকবারতা আম কুনতু
মিনাল আ-লীন'।
হায়রে বহি-জ্বীন গরব কেন নৃ মাটি বলে মিছে,
আদম গুণে অসম উঁচু বিনয়ে তৃণসম পদ নিচে।
পিশাচে বলে-
'আনা খাইরুম মিনহু খালাকুতানী মিন
না-রিউ ওয়া খালাকুতানী মিন ত্বীন'
বিধির অভিশাপে আবৃত শয়তান হাড় বজ্জাত,
লানত কিয়ামত অবধি অবিরাম ছুঁড়িছেন নাথ।
বিতাড়িত ফেরেস্তা দল হতে ইবলিশ দেখে সে
কপালের অক্ষি এসেছে বক্ষে, অদ্ভুত সাজে যে-
চেনে বলে শাপের পাপী; ইবলিশ আর্জি জানায়

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

পরমেশ তরে-আমি দুর্ভাগ্যে পতিত আজি দায়
তার আদম,হেতু আদম! জগদীশ বলেন, দেখো
ভাললিপি তব, কী আছে সেথায়? ‘লা’নত’ শেখো
এবার গরবে জীবনে কী ফল আসে-পড়েছ লাজে?
শয়তান জানায়-
“রাব্বি কাআনঘিরনী ইলা-ওমি ইফব’আছুন”

চাহিল ঈশ্ট সমীপে অবকাশ পুনরুত্থান দিন না’জে
সে যেন হয় অলংকৃত; আরও চায় সে মনুজের অস্থি
রগে ঢুকে তার নেত্র আড়ালে যেন থাকে লয়ে সস্থি ।
শ্রষ্টা জানান-

“ফাইল্লাকা মিনাল মুনযরীনা ইলা-
ইয়াওমিল ওয়াজিল মা’লুম”

পেয়ে সব ক্ষমতা শয়তান গিয়ে বসে আদম সকাশে
কেমনে ঢুকিবে ভেতরে সে সুযোগের থাকে তালাশে ।
সে দম্ভ করে বলে

“ফাবিই‘যযিকা লাইগ ওয়ি য়ান্নাহুম আজমাদ্দিনাইল্লা ই’বা-
দাকা মিনহুমুল মুখ্লাছীন ।”

শোন্ হে পাপীষ্ট শয়তান গোমরাহ হবে না সত্যব্রতী যে,
নরকে হবে ঠাঁই তোর ও তোর সব অনুগামীর জেনে নে ।
জগদীশ্বর বলেন-

“ফালহাক্বকু ওয়াল হাক্বক্বাআকুলা লা আমলা আন্না জাহান্নামা
মিনকা ওয়া মিম্মান তাবি আকা মিনহুম আজমাদ্দিন ।”

ষষ্ঠ সর্গ

অন্তর্যামী কর্তৃক তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি মহামানব আদম(আঃ)
এবং মহিযসী হাওয়া(আঃ) কে স্বর্গ দান ।

বিধাতৃর পয়গাম পেয়ে আদম (আঃ) ত্রিবিদে নীত হয়,
মালাকাতুন বহে তাঁরে বিধাতার শুভাশিষ বুঝিয়া লয় ।
সুরলোকে অজস্র নিয়ামত না’জে ভরিয়া প্রাণ ভোগ করি,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

মিটে না আশ, কি নাই কি নাই তাঁর বোধ থাকে মনমরি।
জগদ্বন্ধু বুঝে তা আদমের লাগি জোড়া করার অভিলাষে,
দেবদূত হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে, আদম-ছাতির বাম
হাড় খুলে আনেন, আদম নিদে, ব্যথাহীন অপারেশন রাম।
ব্যথাহীন অপারেশানের রহস্য কী অনন্ত প্রেমের গুপ্তখনি!
দম্পতির এ প্রেম হতে জন্মে বিশ্বপতির মজনু হওয়া-মনি।
পাঁজরের বাম হাড় হতে জগৎপতি মহিয়সী হাওয়া (আঃ)
হযরত আদমের অর্ধাঙ্গিনী জোড়া সৃষ্টি করেন, ঐ মেওয়া
আকর্ষণীয়া সৌন্দর্যরাশি দিয়ে গড়া এক নারী, রূপে গুণে
লাজে প্রজ্জ্বল ভরা এ অপসরী মনে ভাল লাগার বহি বনে
মায়া জাল ফেলে মদন দলন মথন প্রেমাসক্তি উন্মাদনার,
উচাটন মনে ছুঁতে যায় ললনারে, অমনি মালিক-আওয়াজ
ভেসে আসে কানে, ‘খামো’ শাদীপূর্ব-অবলারে ছোঁয়া নিষেধ
ফিরে আসে আদম, শাদীর বাধণ জানায় পরমেশে, ভেদ
বুঝে, হুঁস ফিরে আচমকা আদমের তন্ময় হয়ে বজ্রাঘাতে;
ঘুম হতে জাগ্রত আদম বর সাজে রহে শুভবিয়ের আশাতে

জসৎপতির আজ্ঞা পেয়ে বিয়ের পর্দা লাগিয়ে গহনাগাটি,
মারওয়ারীদ ও হীরা জহরত দিয়ে সাজায় করে পরিপাটি
ফেরেশ্তাগণ; কনে চন্দ্রাবলী সজ্জিতা বাসর কুরসি-আসীন,
দুনিয়ার প্রথম মহিলা রত্ন বলে কথা, আদম-শান্তি আমিন,
নাথ-প্রিয় পৌরুষ আকর্ষী জগৎ-সৃজনীর শাদী মোবারক!
হর্ব আর ধরে না দু্যলোকের মালাকাতুন মহলে বা-হক!
কে দেবেন যুগল বন্ধন আশরাফুল মাখলুকাতের ইজ্জত
রহস্য সে এক! তুবা বৃক্ষের নিচে জড়ো দেবদূতই কত
বিয়ে দেবেন সর্বশক্তিমান প্রাণনাথ নিজে! স্বীয় স্বরূপ পর্দা
খুলে! কী আনন্দ ফেরেছা জাতিকূলে আজি জাগে যেন জর্দা,
গিলে উন্মাদ, স্তুতি ইলাহের গাহিলেন জগন্নাথ আপনার যে

খোতবায়, শুনিয়া কাতর এশকে ফেরেস্তারা তাদের সমারোহে।

করণাময় আজ্ঞা দিলেন :

“সকল স্তব-স্তুতিই আমার, প্রশংসা সম্মান ও বুজুর্গী আমার চাদর,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

মহত্ত্ব বড়ত্ব আমার তহবন্দ, সমগ্র সৃষ্টি আমার দাস দাসী, পয়গম্বররা আমার রাসুল ও ওলী, মুহাম্মদ (সাঃ) আমার হাবীব, বন্ধু ও রাসুল। আমি বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেছি যেন সে সব আমার একত্বে সাক্ষী হয়। সকল ফেরেস্তা, আসমানের সকল অধিবাসী এবং আরশবহন কারীরা আমার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। আমি আমার নতুন সৃষ্টির শক্তি মত্তায় হাওয়াকে আদমের নিকট বিয়ে দিচ্ছি। আদমের উপটোকন এবং হাওয়ার মহর হচ্ছে আমার তসবীহ-তাহলীল এবং আমার পবিত্রতা মহত্ত্ব বর্ণনা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হুকুম কর্তা নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। হে আদম-হাওয়া! তোমরা আমার বেহেস্তে যথারীতি বসবাস করতে থাক। তোমরা তথাকার ফলফলাদি সানন্দে খাও কিন্তু ঐ গাছটির নিকটেও যেও না, যদি যাও তবে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।”

ইহার পর আদম (আঃ) উক্তি :

“সুবহানাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ই-লাহা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবারু ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আযীম।”

শাদীতে ফুল্ল ফেরেস্তারাজি আদম হাওয়া (আঃ), রমনে বাদ সাধে মহর :

ভূ-সৃষ্টি আদম তরে কিসের এত আনন্দ আঞ্জাম সুরলোক জোড়া, ভাবি অবাক হই যেন ঢেউ খেলে সুখ বায় নূরজীবীমন উড়া উড়া, কনে তরে আনে অলংকার ভুরি ভুরি হীরা-জহরত মোবারকবাদ, নৃ-বসুধায় ফুঁকি রুহ-আপনার-মূল্য অতি হরষে মাতি মেটায় সাধ-দ্যুলোক-ভুলোকের যত প্রাণ-অপ্রাণ, আরশ ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির আজ, বাধাহীন নাচে নাচে খুশীতে ডগমগ, উদ্দাম ফেরেস্তা নিয়ামত না'জ।

সর্বৎসহার আবরণে আবৃত মনু রমন দলন মখন স্পৃহায় ছুটে এলো, হাওয়া (আঃ) তনু-ছোঁয়ায়, ভেসে আসে আওয়াজ ‘মহর’ রয়ে গেলো, দশবার পাঠ কর দরুদ আখেরী নবী বরাবর হয়ে যাবে তা আদায়, শুনে আদম (আঃ) দেখতে চাহিলে তাঁরে জগদীশ দিলেন যেই রায়, আপন নখ পানে চেয়ে বেড়ে গেলো পিতৃস্নেহ-সালাম-মান পাঠ করি মেটায় পিয়াস আপনার, ফের পশিল কানে, ঈষ্ট আঙা-এ ত্রিবিদ ভরি দোঁহে চড়িবে ভোগে মত্ত রহিবে নির্দিহায়, ঐ বিটপ ব্যতিরেকে আর যাও ধারে তার, কর ফলার, রেখো মনে নিশ্চিত হবেই জালিম-আচার।

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

দয়াময়ের অনুজ্ঞা-

‘ইন্না লাকা আল্লা-তাজ্জু’আ ফীহা ওয়ালা-তা’রা-ওয়া আল্লা কা লা-ওয়া
লা-তায়মাউ ফীহা-ওয়ালা-তাদ্বাহা ।’

৭ম সর্গ

দুর্বল দানবের কূটচালে প্রতারিত মনু-ঈশ্বরের পদস্থলন, দৈব-
অনুজ্ঞাচ্যুতি, ঐতিহাসিক বিয়োগান্তক চরম অধঃপতন :

ধরিত্রী যবে ছিল জনমানব শূন্য কেমন ছিল তার চিত্রপট,
ছিল না হেতা সমীর দুষণ, ছিল না আজিকার কৃত্রিম জট ।
ভূধর ছিল দাঁড়িয়ে ঐ, উপত্যকা গিরি পথ আর মেরু-মরু,
কী ছিল না! সমতল, বন্ধুর মালভূমি সাগর মহাসাগর তরু-
বন জঙ্গল গহীন আর হিংস্র সরীসৃপ ভয়াল যত বন্য প্রাণি,
তার সাথে জোটে অভিশপ্ত পিশাচ অহংকারী হিংসুটে আনি
আপনার মাঝে পণ, মনুজে করিবে পথভ্রষ্ট, যে করেই হোক
নাগালে পেলেই হয়, খুঁজিতে লাগিল কূটকৌশল, অন্ধ চোখ-
আদমের লাগি পেলো ঈশ শাপ, করি আদমেরে স্বর্গ ছাড়া-
তবেই মিটিবে তার পিয়াস, করিবে আদম সন্তানে সর্বহারা
দলে দলে নরকবাস জুটাবে অভিলাষ তার মনে দানা বাঁধি,
শঠতা জালে আদম! সপ্তাকাশ পাড়িদিল ইসমে আজম সাধি ।
এই সেই ধড়িবাজ, বেঈমান, মোনাফেক ঘৃণ্যঅশরীরী ইবলিশ,
প্রতারক, প্রকাশ্য আদম-শত্রু, অনিষ্টকারী নরককীট যম-বিষ ।

ইলাহি বাণী :

“ফাকুলানা-ইয়া আদামু ইন্না হা-যা-আদুও উল্লাকা আলিয়াও
জ্বিকা ফালা ইউকারি জান্নাকুমা মিনালজান্নাতি ।”
দ্যুলোক নিশ্চিদ্র আটকানো চারিদিক, পিশাচ আসিবে কিসে,
ভক্ষাতে হারাম গন্ধব ফল সেই সুবিধে রহে কি ঈমান পিষে!
হোক না ক্ষমতা যত দানব জপে, ইসমে আজম জপ, ইষ্ট নাম,
হেতা এক শিখন্তী ঐ সুধালে তারে, কে গো তুমি, কোথা ধাম?
আমি ভেতরে চাহি যেতে, শুনে দানব বলে ‘বুট’ আমি স্বর্গ-দূত,
আর জানায় সে, যদি শোন মোরে তবে শেখাব অর্চনা তিন পুত ।

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

হবে না কোনদিন হে তুমি বুড়া, না আসিবে মরণ, হবে স্বর্গবাস,
কেকা কহিল বটে, মানা আছে ভেতরে যাওয়া, মুই হুকুমের দাস।
দুষ্টের মিষ্টি কথা শুনে না বুঝে লয়ে তারে স্বর্গ-তোরণে যায় সে,
ফণী শুনে বৃত্তান্ত কলাপী হতে, শঠে ফের মিথ্যে বেসাতি কহে যে,
স্বর্গ-দূত! শিখতে চাহিলে শিখীর মত নাগে, জুড়ে দিল শর্ত এই,
সুরলোক চাই, কহে অহি, আদম-হাওয়া আছেন সেথা নিষেধই
রহিছে যেতে আর কারু; দুরাচার শুনে কৌশলী জবাব দেয় যে,
জান্নাতে রাখিবে না পা মোটে তার, রবে ভুজঙ্গ-মুখে, কহে সে।
হায় হায় বিষধর একি করল, লয়ে তারে মুখগহ্বরে ছুটে চলে ঐ
মনুজের দৈব মহাসুখাবাস বেহেস্তে যেন হয়নি কিছুই ভাঙ্গেনি দই।
গন্ধব বিটব তলে গিয়ে ক্রন্দন অভিনয় ভান করে মোনাফেক-শঠ,
শুনে গেলমান সব জমে, আসিল হাওয়া সুধায় হেরি কান্না চিত্রপট,
কেন সে কাঁদে কহে জান্নাত হতে বের হতে হবে, আর হলে ফলার,
ঐ হারাম গন্ধব, স্বর্গ হতে হবে না বা'র, আশ্চর্য মিথ্যে ভঙ্গি বলার।

হক মাওলার ভাষা-

‘ক্বালা-ইয়া-আদামু হাল আদুল্লুকা আলা-শাজারাতিল খুলদি ওয়া মুলকিল
লা ইয়াবলা।’

খোদা তা‘লা আরও বলেন-

“ওয়া ক্বা-সামাহুমা-ইন্নি লাকুমা-লামিনালন্ না-ছিহিনা ভাদাল্লা-হুমা
বিগুররিন।”

প্রতারক শয়তানের মিথ্যে কথার ফাঁদে পড়ে গলে যায় হাওয়া ও ভক্ষণ
করি একটি গন্ধব ও দু’টি লয় আদমের তরে, নেমে এলো তমা অনুক্ষণ।
অতীব সরলা নিষ্কলুষ পুণবতীর দয়ার্দ্র চিত্তে শঠের কান্নার ভান ভয়াবহ,
নরক ডেকে আনিল স্বর্গ মাঝে, ঈশ হুকুম অমান্য গন্ধব ফলার হায় দহ-
এবার বহি যন্ত্রণায় মননে-অঙ্গে, অনন্য আদুরে আশরাফুল মাখলুকাত,
করে এমন প্রমাদ, যাঁরে পরমেশ স্বয়ং শাদী দিয়েছেন শান্তি-দুতেরজাত!
কেন করে নি যাচাই মিছে কখন ভনিতারে, এতো হারাম ছিল, তা ছোঁয়া!
আজ্ঞার ব্যত্যয় ইষ্টের! অকল্পনীয় অমার্জনীয় পাপবিষ ভারে তনু নোয়া!
অর্ধাঙ্গিনী যাঁর সেই আদম(আঃ)ও কলুষের অঙ্কুত অসহ লক্ষণস্পর্শ পান,
এ অশুভ গন্ধব ফল-ছালাংশ লোহিত বর্ণ ধারণ করে রোধিরে স্বর্গে ছড়ান।
অলৌকিকরূপে গুনাহ লহু হতে গন্ধব হই আদম (আঃ)-আসনে এসে যায়,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

আপন-মসনদ অনুজ্ঞা পায় তাঁর সরাও বার হাজার ক্রোশদূর, দ্রুত তা ধায়।
গন্ধবের মিস্তি ঘ্রাণ শূঁকে কহিলেন দৃও হও, বিধির নিষিদ্ধ ফল তুমি হে পাপ,
পুনঃপুনঃ আসে সম্মুখে শেষে যান আর হাজার বছর পথ দূরে বলি যা শাপ!
জবান খুলে গন্ধবের, বলে, আপনি লাখে বছর পথ সরে গেলেও আমি হব,
এ সময় হাওয়া হযরত দু'টো গন্ধব-বীচি দেখালেন অগ্রহ ভরে, এ কি তব
হস্তে?' হযরত হাওয়া কহিল, সেই মহীর ফল-বীচি, সুবাসে ভরা, হারাম বটে,
শুনে হযরত আদম (আঃ)জানান, আমি ওয়াদাবদ্ধ বিধাতৃ সকাশে, পিছু হটে
বীচি ভক্ষণে, বলেন চাহি না আমি, এমন নাফরমান হই; জগদীশ বলেন----

“ওয়া লাকাস আহিদনা-ইলা-আ-দামা মিন কাবলু ফানাসিয়া ওয়া লাম নাজিদ
লাহু আযমান।”

বিবি হাওয়ার রূপ ঐশ্বর্য মনোহরা, পেলবিত রূপ লাভণ্যে মুগ্ধ মোহিত মন,
ক্ষণে ভুলে দৃঢ় বিশ্বাস, হয়ে নিরেট পাথরসম আবেগতাড়িত

অদৃষ্টপূর্বাকর্ষণ!

যেন স্বর্ণ ভুলে নরকের চোখ ধাঁধানো আবেশে হারিয়ে গেছেন আপন প্রভু রে,
চির দুর্যোগ তিমিরে! এ কী হলো বাবা আদমের, জান্নাত-সুখ ছাড়ি, কভু, হে,
কেউ যায় তিমির পক্ষিলে জলকেলি তরে! হাওয়া! হাওয়া! বিনে আর নাহি
মগজে, যেন গ্রাসিবে নারীরূপ রমনে মথনে ছোঁবে সেথা আছড়ে পড়িছে দাহি
পতঙ্গরূপ অনল অধর্ম যমকুপে! আহা ধরিরে বীচিদ্বয় যেন ধরে মিছে না-হক,
হাওয়ার গন্ধব বীচি গ্রাসি গ্রাসিলেন তাঁর আজন্মলালিত এশকে এলাহি বা-হক!
মুহুর্তে পড়িল স্বর্ণ মুকুট মস্তক হতে, হলেন বেআব্র দু'জন বেইজ্জত নাফরমান,
ইজ্জত ঢাকবার তরে তরু পল্লবের লাগি, দু'দুষ্কৃতিকারী ছুটছে বেহেস্তে দোজক-
যন্ত্রণা কাতর, দেয় না কেহ তার পাতা হায়রে, পাতকী এমনি দয়াপাত্র আহাম্মক।
শেষে আজির দিল পত্র তার ঢাকিবার গুপ্তস্থান, চন্দন বৃক্ষ দেয় তা, হায়রে কপাল,
মান বাঁচার সদয় ভূমিকায় দয়াবান বিভু দেবেন ইনাম, তাঁরা পান পরিণাম ভয়াল।

আল্লাহ বলেন-----

“ফালাম্মা-যা-ক্বাশ শাজারাতা বানাত লাহুমা-সাও-তুহুমা-ওয়া তোয়াফিক্বা ইয়াখ
ছিফা-নি আলাই-হিমা-মিঁও ওয়ারাক্বিল জান্নাতি।”

নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীকে বেহেস্ত হতে বহিষ্কার :

পাতকে পা রেখে পাতকীরা পুত ত্রিবিদে উলঝুলুল নরক কষ্ট বুকে,
যেন সব অচেনা বিদূষে ভাসমান কেউ হেরে অশুভ, কেউ না ঝুঁকে,
পামর পাপীষ্টে! লজ্জা, ভয়ে জড়োসরো এঁরা, কী আজাব বহে গুনাহে,
ডাকেন রব তিনবার, আসেন জিব্রীল (আঃ) বলেন, ডাকিছেন দোহে,
কান দিন; এবার আদম হযরত বলেন, লাঝায়েক রব, আমি লজ্জিত--
রাবুলআলামীন জানান---

“ওয়া-না-হুমা-রাবুলহুমা-আলাম আনহাকুমা-আন তিলকুমাশ শাজারাতি
ওয়া আকুল লাকমা ইল্লাশ-শাইতোয়া-না লাকুমা-আদুউমমুবীন।”

আত্মোপলব্ধি, আত্মনিশ্চিনায় বিগলিত আদম-হাওয়া ফাঁদ-অন্যায়
কাতর আজি কিংকর্তব্যবিমুঢ়, দয়াময় পানে চাহি দু’জন সন্নিবেশ ছায়ে
তিষ্ঠে প্রাণ-সম্মান রক্ষিতে, সে কী হবে আশা আর পাতক ভয়ে কাঁপি
রহি অসহায় কষ্ট নিংড়ে ঝরে অঝুরে-কলিজায় গুনাহবোধ লহুর ঝাঁপি
আজি কী করে উপেক্ষিবে! দু’চোখ ভরে নিরব ভ্রম অশ্রু নহর প্রবাহ
ক্ষমা চাহি বিভূ সকাশে রহি শোকে পানাহ চাহি আপনারে করি দাহ
আত্মনিবেদন করেন এই বলে সর্বান্তকরণে-

“রব্বানা-যলামনা-আনফুসানা-ওয়া ইল্লাম কাগফিরিলানা-ওয়াতার হমনা-
লানা কুনান্না মিনাল খা-সিরিন।”

রাহমানুরাহিম নির্দেশ দেন :

“ইহ্‌বিতু বা’দুকুম লিবা’দিন আদুউওঁ ওয়ালাকুম ফিল আরধি মুস্তাকারর-
ওঁ ওয়া মাতাউ’ন ইলা-হীন।”

এই মানুষ সৃষ্টিতে মানে সেরা, আবার অধোগামী হলে আশীবিষ, শিখী-
সহযোগী, শয়তান হতে কম দাম হয়, শঠের থাকে রকমারী ঝিকিমিকি!
দু্যলোক সহেনি জীবনে পাতকের ফাঁদে, নামিতে হইল চরণ উপদ্বীপে-
খোরাসানে, আদম-হাওয়া বিয়োগান্তক নৈর্ব্যক্তিক নিঃসঙ্গ মাইনকাচিপে।
বিধির অনুজ্ঞা ভূলে যাওয়া, অশুভ কন্মে লিপ্ত হওয়া, ফের সেরাই থাকা!
হাসি পায়, দুর্ভোগ ছাড়বে না পিছু, জীবন রবে অনুতাপে ভরা দুঃখ মাখা।
কেহ বলে চল্লিশ বছর কেহ তিনশত, যা হোক মাগফেরাতে কাটে সময়,
আজ্ঞা-না-মানা অনুতাপে ভারাক্রান্ত শোকে ক্ষমা চাওয়া অশ্রুর নহর বয়,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

তীরে খেজুর, লবঙ্গ, যায়ফল বিরুৎ হলো, আদম-দুর্দশা শেষ হবার নয়,
ক্ষমা-আশে হাওয়ার(আঃ) হৃদয় নিংড়ানো আঁখিজল হতে মেহেদি, সুরমা,
যত সুবাসের ঘাস, নদী জলেপড়া অশ্রু আনে মারওয়ারীন গহনা রমরমা,
জগৎ হয়ে ওঠে সুশীতল ফুলেল মনোরমা, ঘষে জাগে সুকৃতির সাদারূপ,
আদমের নতজানু ফরিয়াদে শস্য সুফলা অযত্ন সজ্জিতা ভুবন ঝাড়ঝোপ ।

তাকওয়া, যোহদে, ঈমান, একীনে, এখলাছ, রিয়াজত মূলে রিপু পুড়ে পুত,
হযরত আদম (আঃ) কে একদিন হযরত জিব্রীল (আঃ) জানান, হজ্জব্রত,
সম্পাদন লয়ে যা মরণপূর্ব যবনিকাপাত করতে হবে শুনে ঘাবড়ে তড়িত
দৃঢ়পণে রওনা হন কা'বা অভিমুখে বায়তুল মামুরে, সহিহ্ এরাদার সহিত ।

পথে কদম মোবারক যেখানে ছুঁয়ে যায় সেথা মানব বসতি গড়ে উঠে জানি,
ঐ কা'বা ফেরেস্তারা দু'হাজার বছর ধরে তাওয়াফ করছে, ঈশ আজ্ঞা মানি ।
হযরত আদম (আঃ) আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে অবকাশ যাপন
আছেন, এমনি শুভক্ষণে দেখেন হযরত হাওয়া (আঃ) আসছেন অতি আপন
হযরতের অর্ধাঙ্গী জেদার দিক থেকে আরাফাত ময়দানের দিকে, যেন মরু-
ইরিণে শান্তিজল বরষন, তৃষ্ণার্ত বক্ষে সোহাগিনীর ছোঁয়া, যেন কাঁপিছে তরু
বায়ের সোহাগে, ওঠে গিয়ে জড়ায়ে ধরি আনন্দাশ্রু রোধিতে নারি আবেগঘন
মধুমিলন, ধরিত্রী মাঝে মানব-মানবীর আলিঙ্গনে স্বর্গের স্বর্গীয় আমেজ অগণন
ঝুরিছে, তড়িতাকর্ষণে বপু-তনু, কান্নাররোল থামিতে চাহে না, স্বর্গ-দুতরা কাঁদে
হেরি সুদীর্ঘ বিরহ-মিলন! যেন পঙ্কিল পথপরিক্রমা তওবা-জলে ধুয়ে নির্বিবাদে,
আসি তীরে প্রায় দোঁহে হইল সুখ স্বর্গীয় স্বাদে শিহরিত বপু তনুতে শুভবসবাস,
আভাস, ফিরে পাওয়া আপনার অবলা সরলা রূপসী পুণ্যবতী ইলাহী দাসীদাস,
আর নয় ভুল, ভুল হতে শিখে কষ্টে সুপথে এসে মিশে নদ-নদী, পাথারে নির্ভয়,
ঈমান-একীনে-ভরসায় রিপু পুড়ে পুত দুজনার আঁখি পর্দা সরান, রব আজ সদয়,
আরশে হেরি-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(সাঃ), দুজনে আজ্ঞা চাহি,
পাপ মার্জনার, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঐর উসিলায়, মাফ হলো এ নাম কেতনবাহী ।

গাফুরুর রাহিম কহিলেন----

“ফাতালাক্বা আদামা মিররাব্বিহি কালিমা তিন ফাতা-বা আলাইহি ইল্লাহু হুওয়াত
তাউওয়াবুর রাহীম ।”

একদিন হযরত মুসা (আঃ) অর্চনা করি, বলি হে আমার রব, সুরলোকে কী আছে,
প্রাচীর! বিভূ জানান আছে বৈকি! কৌতুহল থামে নি, সুধান আবার বিধির কাছে,
দ্যুলোকে কী দারোয়ান পাহাড়াই! প্রত্যোত্তরে বিধাতৃর জবাব নিশ্চয় আছে, কেন!
মুসা! শুনে রাখ, যা হয়েছে তা আমার বাঞ্চা, এখতিয়ার আর সিদ্ধান্তে ছিল, এ হেন
প্রশ্ন করো না! তকদীরের ভালমন্দ মহান রাক্বুল আলমীনের হাতে, এখতিয়ারে,

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

দৃঢ় বিশ্বাস, অদ্বিতীয়, একেশ্বরে ও রিপু পুড়ে পুতই পৌছে তওবাতুন-নছুহার দ্বারে।
তওবাতুন-নছুহায় মকবুল হযরত আদম(আঃ) এঁর হজ্জব্রত পালন হলে দয়ালু ঈশে,
সুধান, হে জিব্রাঈল, আরাফাত ময়দানের নিকটবর্তী একটি ময়দানে পালকে পিষে,
ঘষে, পিঠে আদমের ঝাঁকি দাও, অগণিত নৃ মনুজ বারে ভরে ভুবন, এরা কারা এত!
জিজ্ঞাসিলে আদমে(আঃ), হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কহেন, এরা মনু, মনুজ সৃষ্টি যত!

তড়িত আওয়াজ আসে ইলাহীর-আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি, আদম শুনে
ক'ন, কিভাবে মোর রব! ফের এলো রবের শব্দ-রইবে কত মাতৃ-জঠরে, বীর্য খুনে
পুরুষ পিঠে, জমিনের উপরে রহিবে কত! জমিনের নিচে মরে রবে অসংখ্য, বুঝি,
প্রশ্ন ফের, হে আমার, মালিক! মানব বিভক্তি থাকবে কী! উত্তর আসিল সোজাসুজি,
ক'ন রব-কেহ হবে মুমিন, কেহবা কাফের আর দেখবে কেউ ধনী কত নিংশে গুজি
করবে হাহাকার! এবার হযরত আদম(আঃ) বলি, পরমেশে সব এক থাকলে জানি
কত উত্তম হত! আওয়াজ এল! যারা শুকরিয়া করবে আমি তুষ্ঠ রব আর না মানি
অনুজ্ঞা মম রবে পড়ে বেশোকর, থাকবে না রেযা আমার সে সব বান্দার 'পর, রেখো
মনে হে আদম! আমার রেযা বিনে মুক্তি নেই কার, আমার রেযা লয়ে ভালো থেকো!
যদি এমন হতো শেষ নবী(সাঃ) এঁর উসিলায় পাতকের ক্ষমা স্বর্গেই চাইতেন আদম-
হাওয়া, পেতেন জানি ক্ষমা আর রেযা মহান ঈশের, থেকে যেতেন দুলোকে একদম!

আল্লাহ সমস্ত রহকে পূর্ব পশ্চিমে সারি করে দাঁড়াতে আজ্ঞা দিলেন, ছিল যারা ডানে,
তাঁরা মুমিন, আর তারও সামনে যারা ছিল তাঁরা আশ্বিয়ায়ে কেরাম, তার সম্মুখ পানে-
হযরত মোহাম্মাদ(সাঃ); বামে আছে কাফেররা, তাদের সম্মুখে জবরদস্ত কাফের আছে,
অতঃপর ইয়াবারে ইলাহী ডাক দিলেন সব রহকে উদ্দেশ্য করে-

“আলাসতুবিরাক্বিকুম”।

রহু সকলে বলেছিল-“কালু বাল্লা”; গাফুরর রাহিম সেজদাদেশ দিলেন সবে র কাছে,
সকল রহের স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ ঘোষণা করিলেন এবার আমাকে সেজদাহ কর,
ডান দিকের সবে করিল সেজদাহ, বামদিকের কেউ করিল না, ফের জগদীশ রহম বর,
দিলেন অনুজ্ঞা পুণঃ সেজদাহের ডান দিকের সবে করিল, কেউ কেউ করিল না, বামের
সবে করিল না, কেউ কেউ সেজদাহ করিল; এরপ হওয়ার রহস্য কী, প্রশ্ন নবী আদামের,
পরওয়ারদিগার সকাশে! মহান পরওয়ারদিগার জানান, প্রথম আদেশে যাঁরা ডান দিকের
সেজদাহ করিল তাঁরা মুমিন আর যারা করেনি তারা কাফের, দ্বিতীয় আদেশ জগদীশের,
সেজদাহ নত হয়েছেন যাঁরা, নিসন্দেহে সৌভাগ্যবান মুসলিম, আর যারা নত হয় নি তারা
মুমিনের গুরসে জন্ম নিলেও কাফের হয়ে মরবে; বাম দিকের তারা কাফের, হয়নি যারা
নত আর যারা নত হয়েছে অমুসলিমের গুরসে জন্মেও মুসলিমের ভাগ্য অর্জন করেছেন;
মহান পরওয়ারদিগার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যারা আত্মঅভিলাষে পরম আনুগত্য করেছেন,
লাভ নেই আমার আর ক্ষতিও নেই যারা আমার না ফরমানী করেছে জগতে রবে সুখে,
পরলোকে রবে দুঃখে আপন কন্মে জোটে পাতকের অমানিশার যন্ত্রণার ক্ষত লয়ে বুকে!

মহাকাব্য: (১ম সর্গ-৮ম সর্গ)

অখিলে বাসে জীবন কেমনে খাটে

এলহাম এলো-থাকো ভারত/চরণ দ্বীপে হে আদম-হাওয়া, সূত কনে লয়ে,
জন্মিবে যারা, একদিন হযরত জিব্রাঈল আসেন সাতটি লৌহ দন্ড বয়ে।
লোহার কারিগরী দিক বুঝানোর লক্ষ্যে তা শেখানোর কন্ম সাধন করিনু,
নরকের দ্বাররক্ষক স্বর্গ-দূত হযরত মালেক থেকে চেয়ে আনো হে ধরিনু
কজায় অনল বটে সে বহি সাতস্তর ভূই ছেদি পুণঃ দোজকে চলি আসি
এক দু'বার নয় সাতবারই, অস্থির চঞ্চল আঙুন যেন ধূই রহমতস্বর্গ হাসি
রবে স্থির, এলো এলহাম। হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) জানান, সর্বনাশি
হুতাসন আনিতে ব্যর্থ মনোরথ, তখন খোদা নিজে ক'ন পাথরে পাথরে,
ঘর্ষণ করি অগ্নি জ্বালাতে; সেমতে লোহা গলিয়েই কৃষি যন্ত্রপাতি সাধরে
বানিয়ে কৃষিকন্ম শুরু করিলা এমন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) জান্নাত হতে
একজোড়া বলদ এনে হাল চাষ পাকা করি, গন্ধব এনে কৃষি তথ্য মতে
সুরলোকের হোক না চাষবাস আদম কর্তৃক, আদম গন্ধব ছিটিয়ে ভূইয়ে
বলদ জোড়ে জোয়ালে, হালচাষ চাহিতে, বলদ না চাষি দে ছুট ভূ ছুইয়ে-
অমনি হযবত আদম লাঠি উঁচিয়ে বেদম প্রহার বিরুক্তি ভরে বলদে ছাড়ি
রহি দূরে বসি আনমনা, বলদের জবান গেলা খুলি বলি-আদম তোমার,
থাকলে মনুষ্যত্ব আসতে হতো না ভূমে স্বর্গ ছাড়ি, রেবেমুরত কোথাকার!
হযরত জিব্রাঈল এসে কহিলা কোথা হচ্ছে যাওয়া চাষ ছাড়ি শুনে, বলি-
বলদ আমাকে অমানুষ বলে গালাগাল করে শাসিয়েছে, ঐ দুঃখ চিন্তে চলি,
যে নাফরমানি করে খোদার এরূপে চলতে হবে যে, ভোগ করি নিয়ামত,
দুঃখ চিন্তে চলি আদম-মনুজ, বেহেস্তে নাফরমান প্রতিক্রিয়া রবে কিয়ামত
অবধি; ফের কর্ষণে গিয়ে একি আচরণ বলদের পেলে বেদম প্রহৃত তারা
কেঁদে বিচার প্রার্থী হয় বিভূ সমীপে, হযরত জিব্রাঈল(আঃ) কহিল, ছন্নছাড়া
কেন আপনি, ছালাম নিন, সদয় হোন পশুর প্রতি, তাহলে সংশোধন হবে,
আল্লাহ দেবেন জবান রহিত করে পশুর; তাহলেই কাজ করাতে না রবে
অসুবিধে, কাজে লেগে যমীনে গমের বীজ উগু করে পরে ফল আসে ঐ,
ফল পাকিলে কেটে নিয়ে খেতে চান, হযরত জিব্রাঈল(আঃ) বলি, লই
পিষে আটা পানি মিশিয়ে রুটি করি পরে খাবেন, হযরত হাওয়া (আঃ) শুনি
করি তাই সুর্যোদয় হেরি সূর্যাস্ত তবেই খেতে চান সিয়াম ব্রতী সময় গুনি।

ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য.....

স্বগতোক্তি

উনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে জন্মগ্রহণকারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, হৃদয়চারী কবি হুমায়ুন আহমেদ কবীর ভূঞার রচিত আশি এবং নব্বই দশকের কাব্য-(১) মুক্তির যুগ-পূরুষ (২) কারাগারে কল্পনা (৩) আহা তুমি ফুটেই দেখ না (৪) সবুজ প্রেমে আগুন (৫) স্বদেশে রামেরা এখন (৬) বিনষ্ট আকাশ (৭) বোনামী সত্তার মুখে ও (৮) সঙ্গিন (৯) কাব্য লক্ষীর ঘর-সংসার (১০) ক্ষুধার মিছিল (১১) বিলাপের সদর্প উপস্থাপনায় উঠে এসেছে একটি বিষয় যা শব্দের আক্রমণে যেন সক্রিয়। জীবন যান্ত্রিক-যন্ত্রণায় আবেগহীন। পঠন-বিমুখ সমাজের মানুষ অর্থ-সম্পদ লিপ্সায় শশব্যস্ত। সমাজের সামাজিক অবক্ষয়, পরিবার ভাংগা গড়ার পশ্চিমা আধিপত্যের যুগে বাঙ্গালীর পারিবারিক বন্ধন যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সূতোর পরিত্যক্ত মালা। সমকালীন এই রূপ-রস-গন্ধ পরিগ্রহ করে কবিতার ভাব উপমা ছন্দের নিপুণ গাঁথুনীতে প্রাজ্ঞ ভাষায় অন্তর্মিল অক্ষরবৃণ্ডে অথবা গদ্য ছন্দে আবর্তিত হয়ে দৃশ্যমান। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির শংকায় কাব্যগ্রন্থের কবিতার বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম। বিষয়-বস্তুর নূতনত্ব, দৃষ্টিনন্দন পরিবেশনা, মনোমুগ্ধকর কাব্যরূপ, ছন্দ প্রকরণ-বৈচিত্র্য আনয়ন, স্বকীয়তা, মৌলিকত্ব, সর্বশেষে মূলভাবে মনুষ্যত্বের সৌন্দর্য সংযোজনা এবং শব্দ-ভাষা প্রয়োগে স্বতন্ত্র পারঙ্গমতাই সাড়া জাগানো কালোত্তীর্ণ এক অনবদ্য সৃষ্টি কবিতা বিনির্মাণ হয়। এই হৃদয়চারী কবির বিশ-উর্ধ্ব বয়স থেকে ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সৃষ্ট কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য-ছাপ আছে কি-না তা জাতীয় সাহিত্য বিদগ্ধজন বিচার করবেন। নিজের ও মানুষের চেতনার গভীরে প্রবেশ করা উপলব্ধি মানের কবিতা জাতীয় সম্পদ। এ সাহিত্য সম্ভার বিচার বিশ্লেষণ করে বিশ্ব সাহিত্যের আংগিনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার নিমিত্তে আয়োজন দরকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান, সাহিত্য আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আমরা এই কবিকে স্বাভাবিক ও বিশিষ্টতার এই জায়গায় পেয়েছি কি না তা 'হৃদয়চারী প্রথম খন্ড কাব্যগ্রন্থ অংশ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হব। 'ক্ষুধার মিছিল' কাব্য একই সময়ের উপহার।

নিবেদিত আলোচ্য সময়ের 'দুই প্রজন্ম' (গম্ভীরা) কাহিনী কাব্য যা সাহিত্য সভায় ব্যবচ্ছেদযোগ্য এবং কাল পরিক্রমায় আকর্ষণ মজাদার লোমহর্ষক গীতিময়তা আধ্যাত্মিকতায় প্রেরণা যোগানো মহৎ সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ্য। এ যে যুগে যুগে কালে কালে মহাসত্যের বাতিঘরে মনুজ-আত্মাকে হাতছানি দেবে। এখানে প্রকৃতির কোলে লালিত মানব ও মানব শিশু ঐশ্বরিক বদান্যতায় কি করে বেঁচে থাকে তা কাব্যিক সৌন্দর্য্যে ধরে রাখা হয়েছে। আত্মিক শক্তির জয়গানে মুখরিত স্রষ্টার স্মরণ ভরসার জায়গাটি করেছে আরো তীব্র মনোমুগ্ধকর। এ কাহিনিকাব্যের আবৃত্তি বা মঞ্চায়নের রেশ শেষ হয়েও হবে না শেষ।

এখন একটু কথা বলতে হয় এই লেখকের ছোট গল্প সাহিত্য নিয়ে। গল্পগ্রন্থ 'দু'পায়া জানোয়ার' যা হৃদয়চারী প্রথম খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে তার সমুদয় ছোট গল্প রসোত্তীর্ণ কি না বিচারের ভার রইল সাহিত্য পন্ডিত ও পাঠকের ওপর।

দু'পায়া জানোয়ারের কদর্য মনোবৃত্তির সফল রূপায়ন, কৌশলী ক্ষুরধার লেখনী বর্ণনাধারা যা পড়ুয়াকে লয়ে যায় অজানা জগতে সেখানে গল্পের চরিত্ররা ফিরে পায় আপনার ঘরানা। সাথে যদি থাকে উন্নত গুণাবলীর চর্চা এবং অবশেষে ভেসে ওঠে জীবন তরী আলোচ্য বই সিরিজে তাই প্রত্যাশা।

মঞ্চ নাটক বিশেষ করে কাব্যনাটক প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। শূকতার কাব্য নাটকটি তার উদাহরণ হতে পারে। ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে নব সমাজ সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রেরণা দাতা যে কাব্যনাটক সেরূপ হলেই ছুঁয়ে যাবে মন। এখানে রচনা শৈলী অপরিহার্য। একই কথা খাটে উপন্যাস: মেঘের আড়ালে সূর্য, মনি কাঞ্চন যোগ প্রভৃতির বেলায়। নদী যেমন তার গতিপথ পরিবর্তন করে তেমনি লেখক মাত্রই নিজ রচনা ধারা আপনার অজান্তেই অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে ছাড়ে। কাব্য: দিব্যসৃষ্টির খোরাকি-লিরিক সিরিজ-১ ও ২, দৈব বাণী ছুঁয়ে যায় কবিতার অলিগলি, উপন্যাস: ঘোটকের জবান, শিশুতোষ কাব্যনাটক: বিরহিনী জলপরী, বিদূষী সফুরা, ছাড়ার বই: সিঁড়ি, শিশুর কাটা কাল জীবন্যাস: সক্রোটস, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ:), হযরত যুল্লুন মিশরী (রহ:) প্রভৃতি। হৃদয়চারী দ্বিতীয় খন্ড: বিলাপ (হুমায়ুন গীতি) গীতি কাব্যের বাণীর উৎস বিদ্যমান, সুর: বিলাপ জাতীয় প্রার্থনা এবং প্রমিত বাংলায় লিখিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে উনষাট বছরের পরিণিত বয়সের এসব সৃষ্টি এই কবি, গীতি কবি, ছোট গল্পকার, নাট্যকার, উপন্যাসিক, জীবন্যাসিক, ছড়াকারকে আজিকার সাহিত্য আসরে আজ উপস্থিত করেছে সৃষ্টির উন্মাদনা দিয়ে আপন মনে, আপনার হৃদয়চারী। ফের ফিরে যাবে সত্য সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টির বাসর বিতানে।

২৫-০৭-২০২২

কিশোরগঞ্জ

ISBN



978-984-98742-0-1

বইটি পেতে ভিজিট করুন:



www.rokomari.com